বেশিকা ভূগোল

লোকেশচন্দ্র চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিলের ভূগোলের
নূতন সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত।

প্রবেশিকা ভূগোল

(একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য)

শ্রীলোকেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এম্‌-এ, বি-টি,
অধ্যক্ষ, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ কলেজ অব এডুকেশন,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৭০০০৩২
প্রাক্তন অধ্যাপক, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, মৌলানা আজাদ (সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা) কলেজ, গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্স ইত্যাদি।

উমা পাবলিশিং
১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক
উমা পাবলিশিং
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

মূল্য—একুশ টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রবীর কুমার পান
লক্ষ্মীসরস্বতী প্রেস
২০৯ বি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের **উচ্চতর মাধ্যমিক** শিক্ষা কাউন্সিলের **ভূগোলের** (Geography) নূতন সিলেবাস অনুসারে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ও ছাত্রীগণের জন্য এই পুস্তকখানা রচিত হইয়াছে।

সিলেবাসের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ে সর্বাপেক্ষা আধুনিক (১৯৭৫ খ্রীঃ) পরিসংখ্যান সহ এই পুস্তকখানা অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষাতে লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয় সহজভাবে বুঝিবার জন্য ছাত্র ও ছাত্রীগণকে সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত চিত্র ও মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে। তবে তাহাদের পক্ষে ভূচিত্রাবলীর বিভিন্ন মানচিত্রের সাহায্য একান্ত আবশ্যক।

আশা করি, এই পুস্তকখানা ভূগোল সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীগণের জ্ঞান অর্জনের পক্ষে সহায়তা করিবে। তাহাছাড়া এই শাস্ত্রের প্রতি তাহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি এবং এ বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানলাভের জন্য তাহাদের অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি করিবে।

এই পুস্তক রচনা সম্পর্কে অনেক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য সুহৃদের নিকট হইতে উৎসাহ ও বহু প্রামাণ্য গ্রন্থের সহায়তা লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই সম্পর্কে শ্রীমতী নীনা ঘোষাল এম এ, বি-এড ও শ্রীগোপীনাথ সাহা এম্ এস-সির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পুস্তকের উন্নতিকল্পে যে-কোন প্রকার সাহায্য কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিব।

বিনীত—

গ্রন্থকার

ঙ

SYLLABUS OF GEOGRAPHY

FOR CLASSES XI & XII

PAPER I—A. Elements of Physical Geography—60 Marks.
B. Principles of Human Geography—20 Marks.

Total—80 Marks

A. Elements of Physical Geography :

1. **The Earth as a Planet.** The major Planets of the Solar System. The Shape of the Earth. The Movements of the Earth and their Effects. The Location of a Place on the Earth's Surface : Latitude and Longitude.

2. **The Earth's Crust.** Major Groups of Rocks—Igneous, Sedimentary, Metamorphic. Rockforming minerals. Movements in the Earth's Crust and the resulting Landforms : Shields and Plateaus, Folded Mountains and Fault Scarps. Volcanoes and Earthquakes.

3. **The Sculpturing of Landforms.** Agents and Processes of Weathering, Erosion, Transport and Deposition. The Work of Running Water, Ground Water, Moving Ice, Wind, Waves and Currents.

[The above Processes and resulting Landforms are to be studied with particular reference to India.]

4. **The Atmosphere.** Composition of the Atmosphere. Elements of Weather and Climate : Temperature, Pressure and Winds, Humidity and Precipitation. Factors influencing Temperature—World Distribution of Temperature. Factors influencing pressure—World distribution of pressure. The Planetary system of Pressure and Winds. Cyclones and Anticyclones. Types of Rainfall and their World Distribution.

5. **The Oceans.** The Relief and Depth of the Ocean Floor. Salinity and Temperature of Ocean waters. Ocean Currents.

B. Principles of Human Geography :

Study of Man and his activities in different Regions of the World. Man's adjustment to Physical Environment in terms of food, shelter and livelihood in Tropical Rainforest, Savanna, Desert, Steppes, Northern Coniferous Forest and Tundra.

PAPER II—A. Geography of Resources and Economic Activities. 60 Marks.
B. Elements of Population and Social Geography. 20 Marks.

Total—80 Marks

A. Geography of Resources & Economic Activities :

1. **Earth's Resources.** World Distribution of Biotic, Mineral and Energy Resources.

(

2. **Man's Utilities of Resou Agriculture and Animal Husbandry** : Different Cropping S and Farming Practices. Irrigation and Agriculture. Major Crop and their World Distribution. Raising of Cattle, Sheep and Goats. 1 Agricultural Regions of the World.

3. **Man's Utilisation of Res. Manufacturing Industries** : Classes of Manufacturing Indes. Factors influencing location of Manufacturing Industries : Raw. terials, Power and Fuel, Labour, Capital, Transportation, Markets, ior Manufacturing Regions of the World.

4. **Transportation and Communication Transportation Routes** : Water Routes, Land Routes : Highw and Railways, Airways.

B. Elements of Population & Social Geograpl

1. **World Population** : Number and Distributi of Population by countries and continents. World Population Gro.b. World Population Problems.

2. **Settlements**. Factors influencing growth of Settlements. Types of Rural Settlements—Dispersed, Linear and Nu ated. Factors influencing development of Urban Settlements. Functio s of Towns and Cities. Satellite Towns. Urban Agglomeration. City and its Hinterland.

General Practical

40 Marks

1. Interpretation of three types of Topographic Maps of India—Plains, Plateaus and Mountains. Meaning of Scales.

2. Study of Contour lines depicting Valleys, Spurs and Scarps : Construction of Topographic Profiles (Sections). Reading of Thermometers—Maximum, Minimum, Dry-and Wet-Bulb, Mercurial Barometer and Raingauge.

3. Drawing of Isotherms, Isobars and Contours from given Values.

4. Identification of Major Rocks and Minerals : Granite, Basalt, Gneiss, Slate, Sandstone, Limestone, Quartz, Feldspar, Mica, Hematite, Galena, Graphite, Chalcopyrite.

5. Laboratory Notebook.

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

প্রাকৃতিক ভূগোল

সূচীপত্র

চতুর্থ অধ্যায়

মানবিক ও সামাজিক ভূগোল

ব্যবহারিক ভূগোল

প্রবেশিকা ভূগোল

প্রথম ভাগ

প্রাকৃতিক ভূগোল

প্রথম অধ্যায়

পৃথিবী-গ্রহ

পৃথিবী ও আমরা—আমরা **মানুষ**, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। আমরা বাস করি পৃথিবীর একটি বিখ্যাত দেশে; তাহার নাম ভারত। তাই আমরা **ভারতবাসী**। এদেশের আকাশ, বাতাস, আলো, নানারকম শস্য, ফল, নদনদী, পাহাড়-পর্বত, জীবজন্তু প্রভৃতি সকলেরই প্রয়োজন আমাদের জীবনধারণ ও অন্যান্য নানা কাজে। ইহাদের সকলকে নিয়াই আমাদের দেশ। তাই ইহাদের প্রত্যেকটিই আমাদের প্রিয়।

আমাদের ভারতের চেয়ে ছোট ও বড় সব মিলিয়া প্রায় দেড়শত দেশ আছে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে আছে হাজার রকমের পার্থক্য, আবার মিলও অসংখ্য। সকল দেশের বা সকল জায়গার মানুষেরই বাঁচিবার ও নানা কাজ করিবার জন্য দরকার জল, মাটি, আলো, বাতাস ও অন্যান্য জিনিসের।

পৃথিবীর এসকল দেশ বা **স্থলভাগকে** ঘিরিয়া আছে বিরাট সাগর, মহাসাগর। এই **বারিমণ্ডলের** মোট আয়তন সমুদয় স্থলভাগের প্রায় আড়াইগুণ। কাজেই বিরাট মহাদেশগুলিও যেন অসীম মহাসমুদ্রের মাঝে মাঝে এক একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ। বহু আগেকার দিনে মনে করা হইত, এই বিরাট জলরাশি মহাদেশগুলির মধ্যে প্রকাণ্ড ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু ক্রমশঃ সেই ধারণা বদলাইয়া গিয়াছে। এখন সাগর, মহাসাগরগুলি বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক। তাহাছাড়া ইহাদের নিজস্ব নানাপ্রকার সম্পদের জন্য ইহাদের 'রত্নাকর' নাম সার্থক।

পৃথিবীর বিস্তীর্ণ জলভাগ ও স্থলভাগকে ঘিরিয়া আছে অসীম, অনন্ত নীল **নভোমণ্ডল**। সেখানে দিবাভাগে আমরা দেখিতে পাই বিরাট সূর্যকে, রাত্রিতে দেখি চন্দ্র ও অসংখ্য নক্ষত্রকে। এই আকাশমণ্ডলের নিম্ন অংশের **বায়ুমণ্ডলের** উষ্ণতা, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির সহিত আমাদের জীবন-মরণের সম্বন্ধ।

এরূপ নানা কারণেই পৃথিবীর স্থলমণ্ডল, জলমণ্ডল ও তাহাদিগকে বেষ্টনকারী বায়ুমণ্ডলের বিষয় জানিবার জন্য এবং এসকল বিষয়ে নিত্য নূতন তথ্য আবিষ্কার করিবার জন্য মানুষের অবিরাম চেষ্টা চলিতেছে। এভাবে আমাদের **জ্ঞান-**

বিজ্ঞানের প্রসারতা ও গভীরতা বৃদ্ধি হইতেছে। এরূপ জ্ঞানবৃদ্ধি ও বিভিন্ন সম্পদের ব্যবহারের ফলে **মানবসমাজ** ক্রমশঃ **উন্নততর স্তরে** পৌছিতেছে।

সৌরজগৎ

পৃথিবী ও সূর্য—রাত্রিতে নির্মেঘ আকাশে আমরা যে সকল নক্ষত্রকে মণিমুক্তার অতিবিচিত্র কারুকার্যের মত দেখি, প্রকৃতপক্ষে তাহারা এক একটি অতিবিরাট সূর্য। আমরা যে সূর্যকে দিনের বেলা দেখি, ইহাদের প্রত্যেকটিই তাহার চেয়ে অনেক বড়। (পৃথিবী হইতে সূর্যের যে দূরত্ব, ইহাদের দূরত্ব তাহার চেয়ে অনেক গুণ বেশী। সেজন্যই ইহাদিগকে এত ছোট দেখায়।) তবে সূর্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশী। বস্তুতঃ আমাদের পৃথিবী সূর্য হইতেই উৎপন্ন এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই অবিরত আকাশমণ্ডলে ঘুরিতেছে। আর এই সূর্যের আলোক ও উত্তাপ লাভ করার ফলেই পৃথিবীর উপরিভাগ (ভূপৃষ্ঠ) আলোকিত ও উষ্ণ হয়। পৃথিবীতে বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থা, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু প্রভৃতির সৃষ্টি ও বৃদ্ধি, এমন কি সমুদ্রস্রোত (জলপ্রবাহ) ও অন্যান্য বহু বিষয়েই সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় সূর্যের আলোক ও উত্তাপের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এসকল কারণেই বলা হয় **সূর্য পৃথিবীর জীবজগতের প্রাণস্বরূপ**। সূর্যের সহিত পৃথিবীর সম্পর্কের অধিক পরিবর্তন ঘটিলে উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর জন্ম-বৃদ্ধি বা পুষ্টি সম্ভবপর হইবে না।

সৌরজগতের অন্তর্গত প্রধান গ্রহসমূহ—আকাশমণ্ডলে সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া **নয়টি** * গ্রহ অনবরত সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এভাবে ঘুরে বলিয়া ইহাদিগকে বলা হয় গ্রহ (Planet = wanderer)। গ্রহসমূহের অন্যতম পৃথিবী। সকল গ্রহই সূর্য হইতে উৎপন্ন। [তবে ইহাদের উৎপত্তির পদ্ধতি সম্বন্ধে মতবাদ বিভিন্ন।]

গ্রহগণের সকলেরই **আকৃতি** প্রায়-গোলাকার, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে **আয়তনের** পার্থক্য প্রচুর। তাহাছাড়া ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও **উপগ্রহ** (Satellite) আছে। যেমন, পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র। ইহা পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে। গ্রহগণের প্রত্যেকের **ভ্রমণপথ** বা কক্ষ (Orbit) পৃথক্ এবং **ভ্রমণের গতিবেগও** আলাদা। তবে সকলেই নিজ নিজ পথে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য হইতে ইহাদের প্রত্যেকের দূরত্ব পৃথক্। তাহাছাড়া ইহাদের পথের আকৃতি উপবৃত্তের (ellipse) মত এবং গতিবেগ আলাদা বলিয়া ইহাদের পরস্পরের মধ্যে **দূরত্ব** বা সূর্য হইতে ইহাদের দূরত্ব সর্বদাই পৃথক্।

---

* যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার একটি গবেষণাগারের মতে গ্রহ দশটি। ঐ গবেষণাগার ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে যে **দশম** গ্রহ আবিষ্কার করিয়াছে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে একস্ (X)। ঐ গবেষণাগারের মতে সূর্য হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ১০০০ কোটি কিমি এবং ইহা ৮০০ বৎসরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

গ্রহগণের মধ্যে **বুধ** সূর্যের নিকটতম এবং আয়তনে ইহাই ক্ষুদ্রতম গ্রহ। সূর্য হইতে অত্যধিক উত্তাপ লাভ করার ফলে এই গ্রহ সম্ভবতঃ প্রাণীহীন। সূর্য হইতে দূরত্ব হিসাবে **শুক্রের** স্থান দ্বিতীয়, তবে আয়তন হিসাবে ইহা ষষ্ঠ। সূর্য হইতে দূরত্ব হিসাবে **পৃথিবীর** স্থান তৃতীয়, আয়তন হিসাবে ইহা পঞ্চম। ইহার একটি উপগ্রহ আছে (চন্দ্র) দূরত্ব হিসাবে **মঙ্গল** চতুর্থ, আয়তন হিসাবে সপ্তম। এত ছোট হইলেও ইহার দুইটি উপগ্রহ আছে। দূরত্ব হিসাবে **বৃহস্পতি** পঞ্চম, আয়তনে ইহাই বৃহত্তম গ্রহ। ইহার উপগ্রহ বারটি। সূর্য হইতে দূরত্ব হিসাবে **শনি** ষষ্ঠ, কিন্তু আয়তন হিসাবে ইহা দ্বিতীয়। ইহার উপগ্রহ দশটি। তাহাছাড়া ইহার চারিদিকে একটি উজ্জ্বল **বলয়** আছে। (এই বলয় সম্ভবতঃ অসংখ্য গ্রহাণুর বা অতিক্ষুদ্র উপগ্রহের সমষ্টি।) দূরত্ব হিসাবে **ইউরেনাস** সপ্তম, কিন্তু আয়তনে তৃতীয় গ্রহ। ইহার উপগ্রহ পাঁচটি। দূরত্ব হিসাবে **নেপচুন** অষ্টম গ্রহ, তবে আয়তনে চতুর্থ। ইহার উপগ্রহ দুইটি। সূর্য হইতে দূরত্ব হিসাবে **প্লুটো** নবম গ্রহ, কিন্তু আয়তনে অষ্টম।

সৌরজগৎ ও ইহার অন্তর্গত গ্রহগণ

গ্রহগণের মধ্যে তুলনা—সূর্য হইতে গ্রহগণের মোটামুটি হিসাবে দূরত্ব ও কোন্‌টি কতদিনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে ইত্যাদি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:—

গ্রহ	স্থান	সূর্য হইতে দূরত্ব কোটি কিমি	আয়তন হিসাবে স্থান	উপগ্রহ কয়টি	কত সময়ে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে
বুধ (Mercury)	প্রথম	৫·৮	নবম	—	৮৮ দিন
শুক্র (Venus)	দ্বিতীয়	১০·৭	ষষ্ঠ	—	২২৫ „
পৃথিবী (Earth)	তৃতীয়	১৪·৯	পঞ্চম	১	৩৬৫$\frac{১}{৪}$ „
মঙ্গল (Mars)	চতুর্থ	২২·৬	সপ্তম	২	৬৮৭ „
বৃহস্পতি (Jupiter)	পঞ্চম	৭৭·১	প্রথম	১২	১২ বৎসর
শনি (Saturn)	ষষ্ঠ	১৪১·৪	দ্বিতীয়	১০	২৯$\frac{১}{২}$ „
ইউরেনাস (Uranus)	সপ্তম	২৮৪·৮	তৃতীয়	৫	৮৪$\frac{১}{১২}$ „
নেপচুন (Neptune)	অষ্টম	৪৪৪·৩	চতুর্থ	২	১৬৫ „
প্লুটো (Pluto)	নবম	৬৬৮·৮	অষ্টম	—	২৪৬$\frac{৭}{১২}$ „

পৃথিবীর আকৃতি ও আয়তন

পৃথিবীর আয়তন—পৃথিবীর আয়তন সম্বন্ধে সুদূর অতীতে মানুষের যে ধারণা ছিল তাহা সীমাবদ্ধ ও ভ্রান্ত। গত ৫০০-৬০০ বৎসরে আফ্রিকা, ওশিয়ানিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং অ্যাণ্টার্কটিকার আবিষ্কারের ফলে সেই ভুল ধারণা দূর হইয়াছে। এখন জানা গিয়াছে, পৃথিবীর উপরিভাগের বা ভূপৃষ্ঠের মোট আয়তন প্রায় ৫২ কোটি বর্গ কিমি (ভারতের আয়তনের প্রায় ১৪০ গুণ)।

পৃথিবীর আকৃতি—সুদূর অতীতে পৃথিবীর আকৃতি সম্বন্ধেও মানুষের ধারণা ছিল ভ্রান্ত। ক্রমশঃ নিম্নলিখিত নানাপ্রকার যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে জানা গিয়াছে ইহার আকৃতি প্রায় **গোলাকার বা অভিগত গোলক** (Oblate Spheroid)।

দিগন্তরেখার পরিধি বৃদ্ধি
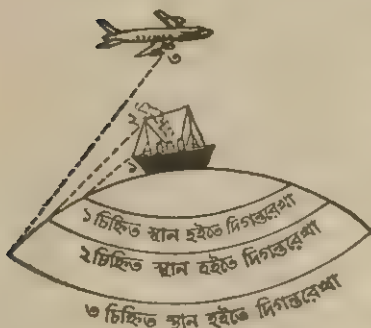
(১) কোন বড় মাঠ, নদীর তীর বা অন্য কোন উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে তাকাইলে দেখা যায় বহুদূরে আকাশ ও পৃথিবী বৃত্তের আকারে মিশিয়া গিয়াছে। দৃষ্টির এই সীমারেখাকে বলা হয় **দিগন্তরেখা** (horizon)। ভূপৃষ্ঠ হইতে ক্রমশঃ যত অধিক উপরে উঠিয়া তাকান যায়, দেখা যায় দিগন্তরেখার পরিধি তত বাড়িয়া
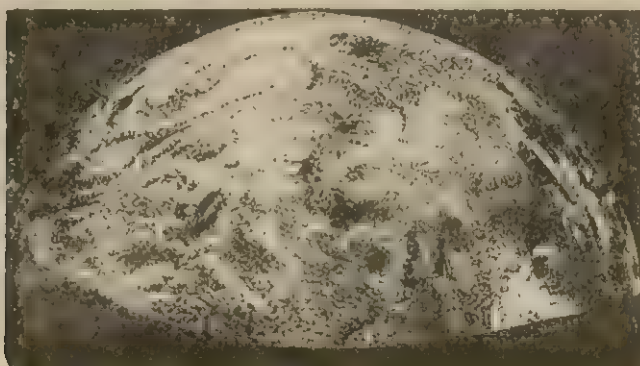
আকাশ হইতে গৃহীত পৃথিবীর ফটোচিত্রের এক অংশ

যাইতেছে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই ইহা গোলাকার। (২) মহাশূন্য হইতে সমগ্র পৃথিবীকেও একসঙ্গে দেখিতে পাইয়াছেন আকাশচারী ও চন্দ্রে অভিযানকারী

বীরের[1] দল। তাঁহাদের গৃহীত **ফটোচিত্র** পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে নির্ভুল প্রমাণ। (৩) অবশ্য চন্দ্রের উপর (চন্দ্রগ্রহণের সময়) **পৃথিবীর ছায়া** দেখিয়া বহুপূর্বেই মানুষ প্রমাণ পাইয়াছেন যে পৃথিবী গোলাকার। (৪) সমুদ্রে **স্টীমার, জাহাজ** প্রভৃতির **গতি** দূর হইতে দেখার পার্থক্যও এবিষয়ে একটি উল্লেখ-যোগ্য প্রমাণ। ইহারা বহুদূরে থাকা-কালে ইহাদের ইঞ্জিন হইতে চোঙের মধ্য দিয়া নির্গত ধোঁয়া আকাশে দেখিয়া মানুষ বুঝিতে পারে ইহারা আসিতেছে। তখন সেদিকে তাকাইলে কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় মাস্তল। ক্রমশঃ স্টীমার নিকটে আসিলে দেখা যায় নীচের দিকের অংশ। পৃথিবীর (সমুদ্রের) উপরিভাগ সমতল হইলে দূর হইতেও সম্পূর্ণ জাহাজ বা স্টীমার দেখা সম্ভব হইত, অবশ্য খুব ছোট দেখাইত। (৫) পৃথিবীর (বিশেষতঃ নদনদী, সমুদ্র প্রভৃতির জলের) উপরিভাগ সমতল কিনা তাহা **প্রত্যক্ষভাবেও পরীক্ষা** করা হইয়াছে। সমান উঁচু তিনটি খুঁটিকে পরস্পর হইতে সমান দূরে ভেলার উপর লম্ব (খাড়া) ভাবে পুঁতিয়া রাখিয়া দূরবীণের সাহায্যে দেখা গিয়াছে প্রথম ও তৃতীয় খুঁটির মাথা যে সমসূত্রে, মাঝখানের খুঁটির মাথা তাহার চেয়ে একটু উপরে। এরূপ আরও অনেক প্রমাণ আছে।
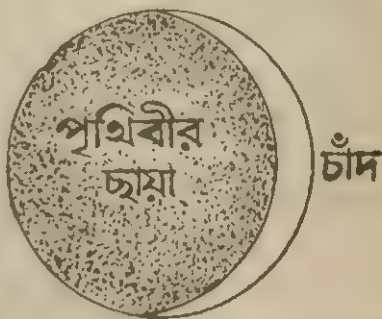
চাঁদের উপর পৃথিবীর ছায়া

জাহাজের বিভিন্ন অংশ দেখা সম্পর্কে পার্থক্য

পৃথিবীর গতি

পৃথিবীর দুইটি গতি—সুদূর অতীতে মানুষের ধারণা ছিল পৃথিবী স্থির। ক্রমশঃ নানা প্রমাণের সাহায্যে জানা গিয়াছে যে ইহা গতিশীল এবং ইহার গতি দুইটি। একটিকে বলে আবর্তন, অপরটির নাম পরিক্রমণ।

আবর্তন বা আহ্নিক গতি– পৃথিবীর এই গতিবশতঃ ইহা অনবরত আপন মেরুরেখার (Axis)[2] চারিদিকে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে আবর্তন করিতেছে। এভাবে

1 সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রের বহু বীর বিভিন্ন সময়ে এসকল অভিযান করিয়াছেন।

2 মেরুরেখা পৃথিবী-গোলকের কেন্দ্র মধ্যদিয়া সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি কাল্পনিক সরল রেখা। ইহা পৃথিবীর ভ্রমণপথের বা কক্ষের সহিত ৬৬½° কৌণিকভাবে অবস্থিত।

একবার সম্পূর্ণরূপে আবর্তনের জন্য প্রয়োজন সূর্যের হিসাবে ২৪ ঘণ্টা, কিন্তু নক্ষত্রের হিসাবে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড। ইহাই সৌরদিন ও নাক্ষত্র দিনের পরিমাপ।

প্রমাণ—(১) আমরা দেখি দিবাভাগে সূর্য এবং রাত্রিতে নক্ষত্রগণ যেন ধীরে ধীরে পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে সরিয়া যাইতেছে। বাস্তবক্ষেত্রে পৃথিবী হইতে গড়ে প্রায় ১০৮ কোটি কি.মি. দূরে অবস্থিত ও পৃথিবীর চেয়ে ১৩ লক্ষ গুণ বেশী আয়তন বিশিষ্ট এবং ৩৳ লক্ষ গুণ অধিক ভারী সূর্যের পক্ষে মাত্র ২৪ ঘণ্টা সময়ে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করা অসম্ভব, এমন কি কল্পনাতীত। বরং পৃথিবীর পক্ষে প্রতি ২৪ ঘণ্টাতে আপন মেরুরেখার চারিদিকে একবার আবর্তন স্বাভাবিক এবং তাহার ফলেই **সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতির আপাতগতি** দেখা সম্ভবপর। (২) তাহাছাড়া **পৃথিবীর আকৃতিও** (মধ্যভাগ স্ফীত এবং মেরুরেখার দুই প্রান্ত সামান্য চ্যাপ্টা) ইহার আবর্তনগতির **প্রমাণ**। (উত্তপ্ত নমনীয় পদার্থের আবর্তনের ফলে এরূপ অবস্থা ঘটে।) (৩) এবিষয়ে নানা স্থানে **প্রত্যক্ষ পরীক্ষাও** করা হইয়াছে। যেমন, খুব উঁচু (৮০-১০০ মি) দালানের উপর হইতে পাথরের টুকরা বরাবর নীচে ফেলিয়া (বায়ু শান্ত থাকা অবস্থায়) দেখা গিয়াছে তাহা সামান্য পূর্বদিকে সরিয়া পড়িয়াছে। আরও উঁচু মন্দিরের চূড়া হইতে তারের মাথায় ভারী দোলক ঝুলাইয়া ও তাহার নীচে আলপিন আঁটিয়া দিয়া ও মেঝেতে বালি ছড়াইয়া দেখা গিয়াছে যে দোলক বরাবর এক দিকে দুলিলেও পিনের দাগ ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। (৫) সম্প্রতি মহাকাশ-চারীগণ দূরবাণের সাহায্যে পৃথিবীর আবর্তন গতি **নির্ভুলরূপে লক্ষ্য** করিয়াছেন।

আবর্তনের ফল—পৃথিবীর আবর্তনের ফলে ভূপৃষ্ঠে দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন—এই অবস্থা ঘটে। তারপর বিভিন্ন সময়ে সূর্যের আলোকলাভের অবস্থা ও পরিমাণ সম্পর্কে পরিবর্তনের ফলেই প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা প্রভৃতি অবস্থা পরপর ঘুরিয়া আসে। (পৃথিবীর আলোকিত ও অন্ধকার অর্ধাংশ দুইটি যে সীমারেখাতে মিলিত হয় তাহাকে বলে আলোকবৃত্ত বা ছায়াবৃত্ত।) আর পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সূর্যের আলোক ও উত্তাপ সম্পর্কে এপ্রকার পরিবর্তনের সহিত উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর জন্ম, বৃদ্ধি, স্বভাব (রাত্রিতে বিশ্রাম) প্রভৃতি বিষয়ের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। তাহাছাড়া পৃথিবীর প্রায় গোল আকৃতি ও আবর্তন গতির ফলে ইহার মধ্যভাগে নিরক্ষীয় অঞ্চলে আবর্তনের
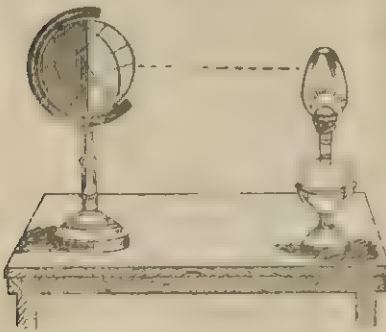
আলো ও ভূগোলকের সাহায্যে পরীক্ষা

গতিবেগ অধিক (প্রতি ঘণ্টায় ১৬৮০ কিমি)। তথা হইতে ক্রমশঃ উত্তর ও দক্ষিণে বেগ কম (৬০ অক্ষরেখাতে ১০৮০ কিমি) এবং উভয় মেরুবিন্দু প্রায় আবর্তন গতিহীন। ইহার ফলে ভূপৃষ্ঠে বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত প্রভৃতির গতিবিক্ষেপ হয়। (উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বাঁকে।)

পরিক্রমণ বা বার্ষিক গতি—পৃথিবীর এই গতিবশতঃ ইহা নির্দিষ্ট পথে বা কক্ষে (Orbit) প্রায় ৩৬৫¼ দিনে (৩৬৫ দিন ৫ ঘটা ৪৮ মিনিট ৪৫ বা ৪৭ সেকেণ্ড) একবার সূর্যকে সম্পূর্ণরূপে প্রদক্ষিণ করে। ইহাই বৎসর গণনার পরিমাপ। [৩৬৫ দিনে এক বৎসর এবং প্রতি চতুর্থ বৎসর (৩৬৬ দিনে) একটি লিপ ইয়ার। যেমন, ১৯৭২, ১৯৭৬, ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ।] এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে পৃথিবী এভাবে আপন মেরুরেখার চারিদিকে **আবর্তন** করিতে করিতে সূর্যকে **পরিক্রমণ** করে।

প্রমাণ—১ বৎসরের বিভিন্ন দিনে আকাশে সূর্যের অবস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ২১শে জুন আমরা সূর্যকে প্রভাতে দেখি সবাপেক্ষা অধিক উত্তর পূর্ব কোণে, ২৩শে সেপ্টেম্বর দেখি ঠিক পূর্বদিকে, ২১শে বা ২২শে ডিসেম্বর সবচেয়ে বেশী দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, আবার ২১শে মার্চ ঠিক পূর্বদিকে। কাজেই জানুয়ারী হইতে জুন সূর্যের আপাতগতি অনুসারে **উত্তরায়ণ** এবং জুলাই হইতে ডিসেম্বর **দক্ষিণায়ন**। [পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি না থাকিলে সূর্যকে বরাবর একই জায়গাতে দেখা যাইত এবং পৃথিবীর এক অংশে চিরদিন, অপর অংশে চিররাত্রি হইত।] (২) বৎসরের বিভিন্ন সময়ে রাত্রিতে **নক্ষত্রগণেরও স্থান পরিবর্তন** (পূর্ব হইতে পশ্চিমে গতি) লক্ষ্য করা যায়।
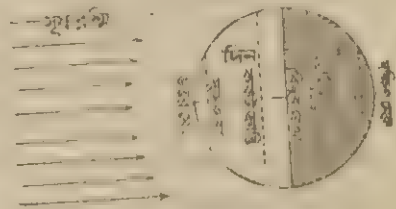
পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি না থাকিলে এরূপ অবস্থা হইতে পারিত

পরিক্রমণের ফল—পৃথিবীর পরিক্রমণ (ও সেই সঙ্গে আবর্তন) গতির ফলে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে **দিবা-রাত্রির দৈর্ঘ্যের** নিম্নলিখিতরূপ **পরিবর্তন** ঘটে।

ডিগ্রি সমাক্ষরেখা	গ্রীষ্মকালে দীর্ঘতম দিবামান	শীতকালে ক্ষুদ্রতম দিবামান
০° (নিরক্ষরেখা)	১২ ঘণ্টা	১২ ঘণ্টা
২২½ উত্তর (কলিকাতা)	১৩ ঘ ৩০ মি	১০ ঘ ৩০ মি
৫১½° উত্তর (লণ্ডন)	১৬ ঘ ৩০ মি	৭ ঘ ৩০ মি
৬৬½° উত্তর বা দক্ষিণ	২৪ ঘ	০ ঘ

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে সূর্যালোক লাভ বা দিবামান সম্পর্কে এপ্রকার পরিবর্তনের ফলে ভূপৃষ্ঠ **পাঁচটি আলোক-মণ্ডলে** (Light Zones) বিভক্ত। এই মণ্ডলগুলি কর্কটক্রান্তি, মকরক্রান্তি, সুমেরু বৃত্ত ও কুমেরু বৃত্ত দ্বারা নির্দিষ্ট।

পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির ফলে ভূপৃষ্ঠে দিবামানের এরূপ পরিবর্তন ভিন্ন সূর্যের উত্তাপ লাভ ও বায়ুমণ্ডলের **উষ্ণতারও[1] পরিবর্তন** হয় প্রচুর। প্রতিবৎসর মাত্র দুই দিন (২১শে মার্চ এবং ২২শে বা ২৩শে সেপ্টেম্বর) সূর্যরশ্মি মধ্যাহ্নে পৃথিবীর ঠিক মধ্যভাগে নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে পতিত হয় এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত হয়। অবশ্য নিরক্ষরেখা হইতে ক্রমশঃ দূরের দিকে সূর্যরশ্মির পরিমাণ কম, উষ্ণতাও কম। কারণ, নিরক্ষরেখাতে ঐ রশ্মি লম্বভাবে পতিত হয় এবং উত্তর ও দক্ষিণে ক্রমশঃ অধিক দূরত্ব অনুসারে অধিক হেলানভাবে পতিত হয়। এই দুই দিন আলোকবৃত্ত বা ছায়াবৃত্ত সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং তাহা নিরক্ষরেখা ও অপর সকল সমাক্ষরেখাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে। কাজেই এই দুই দিন পৃথিবীর **সর্বত্র দিবা-রাত্রি সমান** (প্রত্যেকটি ১২ ঘণ্টা)। উত্তর গোলার্ধের পক্ষে ২১শে মার্চ **মহাবিষুব** (Spring বা Vernal equinox)[2] এবং ২২শে বা ২৩শে সেপ্টেম্বর **জলবিষুব** (Autumnal equinox)।
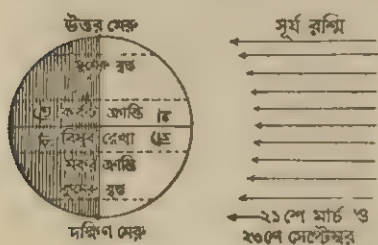
২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর পৃথিবীতে সূর্যের আলোক লাভের অবস্থা

পরিক্রমণ গতিবশতঃ পৃথিবীর ক্রমশঃ স্থান পরিবর্তনের ফলে ২১শে জুন মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি ভূপৃষ্ঠের সর্বাপেক্ষা অধিক উত্তর অংশে কর্কটক্রান্তির (২৩½° উত্তর অক্ষাংশ) উপর লম্বভাবে পতিত হয়। কাজেই ঐ সময় **উত্তর গোলার্ধে দিবাভাগের দৈর্ঘ্য ও উষ্ণতার পরিমাণ** দক্ষিণ গোলার্ধের চেয়ে বেশী, এমন কি উত্তর গোলার্ধেও বৎসরের অন্য সকল সময়ের তুলনায় **অধিক** (পূর্ব পৃষ্ঠার তালিকা দ্রষ্টব্য)। এই দিনই সাধারণতঃ উত্তর
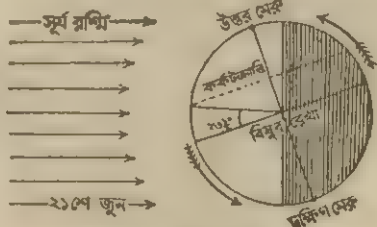
২১শে জুন পৃথিবীতে সূর্যের আলোক লাভের অবস্থা

1 সূর্যের ঠিক চারিপাশে উত্তাপ সম্ভবতঃ ৬০০০° সেলসিয়স (সে)। কিন্তু সূর্যরশ্মি সূর্য হইতে পড়ে ১৪৮ কোটি কিমি দূরে আসিয়া ভূপৃষ্ঠে পৌছে। এই দূরত্বের জন্য ভূপৃষ্ঠে উত্তাপের পরিমাণ কম।

2 Equinox = Equal nox (night), অর্থাৎ দিবা-রাত্রি সমান।

গোলার্ধের গ্রীষ্মকালের মধ্যভাগ ও উত্তরায়ণের শেষ সীমা বা **উত্তর অয়নান্ত দিবস** (Northern Summer Solstice)।

ইহার পর ২২শে বা ২৩শে সেপ্টেম্বর আবার ২১শে মার্চের মত অবস্থা হয়। তারপর ২১শে বা ২২শে ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি ভূপৃষ্ঠের সর্বাপেক্ষা দক্ষিণ অংশে মকরক্রান্তির (২৩½° দক্ষিণ অক্ষাংশ) উপর লম্বভাবে পতিত হয়। কাজেই ঐ সময় **দক্ষিণ গোলার্ধে** দিবাভাগের দৈর্ঘ্য ও উষ্ণতার পরিমাণ উত্তর গোলার্ধের তুলনায় অধিক, এমন কি দক্ষিণ গোলার্ধেও বৎসরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশী। এই দিনই সাধারণতঃ দক্ষিণ গোলার্ধের গ্রীষ্মকালের মধ্যভাগ ও দক্ষিণায়নের শেষ সীমা বা **দক্ষিণ অয়নান্ত দিবস**, কিন্তু উত্তর গোলার্ধের শীতকালের মধ্যভাগ (Northen Winter Solstice)।
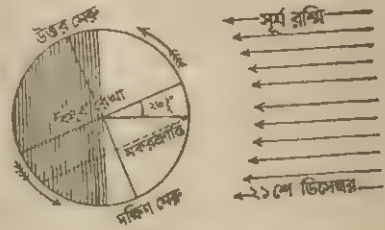
২১শে ডিসেম্বর পৃথিবীতে সূর্যের আলোক লাভের অবস্থা

পৃথিবীর উভয় গতির ফলে দিবারাত্রি ও উষ্ণতার পরিবর্তন সম্বন্ধে আরও ২।১টি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন, **নিরক্ষরেখার** উপর পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির কোন প্রভাব নাই। সেখানে সমস্ত বৎসর দিবা ও রাত্রি সমান (১২ ঘণ্টা), উষ্ণতারও পরিবর্তন নাই (সমস্ত বৎসর উষ্ণতা অধিক)। অপরদিকে **সুমেরুতে ছয় মাস** (২১শে মার্চ হইতে ২২শে বা ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৮৬ দিন) সূর্যরশ্মি পাওয়া যায় বা **ক্রমাগত দিবা**। তখন তাহার বিপরীতদিকে **কুমেরুতে ছয় মাস আঁধার বা রাত্রি**। আবার সুমেরুতে ছয় মাস (২২শে বা ২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে ২১শে মার্চ পর্যন্ত ১৭৯ দিন) আলোর অভাব (ক্রমাগত রাত্রি)। তখন কুমেরুতে ক্রমাগত আলো বা দিন। এরূপ অবস্থার ফলে উত্তর গোলার্ধে নরওয়ের উত্তর সীমার স্থানসমূহ (হ্যামারফেস্ট বন্দর ও আশপাশ) '**নিশীথ সূর্যের দেশ**' নামে পরিচিত। মার্চ-সেপ্টেম্বর মাসে তথায় ঘড়ি হিসাবে গভীর রাত্রি হওয়ার মত সময়েও আকাশে আলো বা '**নিশীথ সূর্য**' (Midnight Sun) দেখা যায়। আবার সুমেরুর ছয় মাস দীর্ঘ আঁধার কালে মাঝে মাঝে উচ্চ আকাশে রামধনুর মত অস্পষ্ট আলো দেখা যায়। তাহাকে বলে **সুমেরুপ্রভা** (Aurora Borealis)। কুমেরু অঞ্চলের ঐরূপ অবস্থাকে বলে **কুমেরুপ্রভা** (Auroa Australis)।

ঋতু পরিবর্তন—পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির (এবং সেই সঙ্গে আবর্তন গতি, প্রায় গোল আকৃতি এবং মেরুরেখার কৌণিকভাবে অবস্থিতি প্রভৃতি) ফলে বৎসরের

বিভিন্ন সময়ে ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ স্থানে (নিরক্ষরেখা ও উভয় মেরু ভিন্ন) দিবামান, সূর্যরশ্মির উষ্ণতা প্রভৃতি সম্বন্ধে পার্থক্য ঘটে। এই গতির ফলে এসকল অবস্থা প্রায় নির্দিষ্ট নিয়মে পরিবর্তিতও হয়। এজন্যই প্রতিবৎসর এক প্রকার অবস্থার (অধিক উষ্ণতা) পর অপর (নাতিশীতোষ্ণ) অবস্থা, এবং তাহার পর অন্য এক (শীতল) অবস্থা যেন চক্রের মত পরিবর্তন করে। ইহাই ঋতু পরিবর্তন।
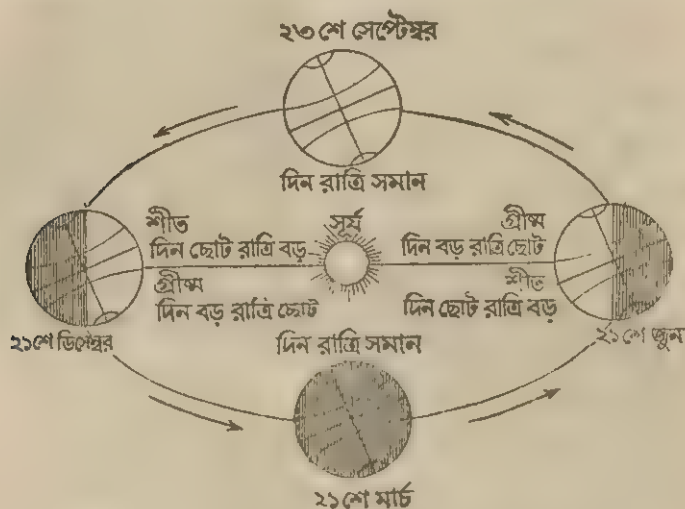
বৎসরের বিভিন্ন সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে দিনরাত্রির অবস্থা

২১শে মার্চ পৃথিবীর সর্বত্র দিবা রাত্রি সমান এবং নিরক্ষরেখা হইতে উত্তর ও দক্ষিণে দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা প্রায় সমানভাবে কম। সেদিনের কিছু আগে এবং পরেও প্রায় তাহারই মত বা কাছাকাছি অবস্থা, অর্থাৎ উত্তর বা দক্ষিণ কোন গোলার্ধেই তখন বেশী শীত বা গরম নয়। উত্তর গোলার্ধের পক্ষে তখন **বসন্ত কাল**।

ইহার পর হইতে উত্তর গোলার্ধে দিবাভাগের দৈর্ঘ্য ও উষ্ণতার পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে থাকে, অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুর আরম্ভ হয়। ২১শে জুন উত্তর গোলার্ধে **গ্রীষ্মকালের** মধ্য অবস্থা। সেদিন এই গোলার্ধে দিবামান দীর্ঘতম এবং উষ্ণতাও স্বভাবতঃ অধিক। দক্ষিণ গোলার্ধের পক্ষে তখন ঠিক বিপরীত অবস্থা, অর্থাৎ তখন শীতকাল।

তারপর ২২শে বা ২৩শে সেপ্টেম্বর আবার ২১শে মার্চের মত অবস্থা। উভয় গোলার্ধে নাতিশীতোষ্ণ অবস্থার মধ্যভাগ। উত্তর গোলার্ধের পক্ষে তখন **শরৎকালের** মধ্যভাগ। (বলা বাহুল্য, তাহার আগে জুন-আগস্ট মাসে আমাদের দেশসহ বহু দেশে **বর্ষাকাল**।) দক্ষিণ গোলার্ধের পক্ষে তখন (শীতকালের অন্তে) বসন্তকাল।

ইহার পর ২১ বা ২২শে ডিসেম্বর উত্তর গোলার্ধে দিবামান সবচেয়ে ছোট এবং উষ্ণতার পরিমাণও স্বভাবতঃ কম। অর্থাৎ তখনই এখানে **শীতকালের** মধ্যভাগ। দক্ষিণ গোলার্ধে তখন বিপরীত অবস্থা, অর্থাৎ গ্রীষ্মকালের মধ্যভাগ। ইহার পরে মার্চ মাসে দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎ কাল।

ভূপৃষ্ঠে কোন স্থানের অবস্থিতি নির্ণয়

অবস্থিতি নির্ণয়ের পদ্ধতি—আমরা সাধারণতঃ কোন পরিচিত জিনিসের সাহায্যে অপর কোন জিনিস বা স্থানের অবস্থিতি নির্ণয় করি। এই উদ্দেশ্যে সচরাচর দিক্ (direction), কৌণিক দূরত্ব, রৈখিক দূরত্ব প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করি। যেমন, ঘরের অমুক কোণে, মাঠের অমুক পাশের অমুক গাছের অমুক দিকে অতদূরে ইত্যাদি বলি। এই পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত ছোট অংশের পক্ষে উপযুক্ত। এখানে প্রায় অজ্ঞাতসারে আমরা গণিত ও জ্যামিতির সাহায্য গ্রহণ করি। বস্তুতঃ ভূপৃষ্ঠের পরিচিত বা অপরিচিত সকল স্থানেরই অবস্থিতি স্থির করিবার জন্য জ্যামিতির সাহায্য দরকার। এই উদ্দেশ্যে **দুইটি** প্রধান ও স্থির বা **নির্দিষ্ট রেখারও** (Lines of Reference) সাহায্য একান্ত আবশ্যক। তাহাদের একটি নিরক্ষরেখা, অপরটি প্রধান দ্রাঘিমারেখা বা মূল মধ্যরেখা। এই দুইটিই কাল্পনিক রেখা।

নিরক্ষরেখা—পৃথিবী-গোলকের উত্তর সীমার সুমেরু বিন্দু ও দক্ষিণ সীমার কুমেরু বিন্দু (দুই স্থির বিন্দু) হইতে সমদূরে পৃথিবীর ঠিক মধ্য অংশের উপর দিয়া একটি সরলরেখা পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টন করিয়া আছে বলিয়া কল্পনা করা হয়। তাই ইহা একটি **স্থির বা নির্দিষ্ট** রেখা। এই রেখার উপরিস্থিত কোন স্থানের কোন অক্ষাংশ নাই। সেজন্য ইহাকে বলা হয় **নিরক্ষরেখা** (Equator)। আবার ইহা একটি বৃত্ত (পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে) বলিয়া ইহাকে **নিরক্ষবৃত্তও** বলা হয়। এই রেখার সাহায্যে বিষুব নির্ণয় করা হয় বলিয়া ইহাকে **বিষুবরেখাও** বলে। এই রেখার সাহায্যে অপর সকল স্থানের অক্ষাংশ বা উত্তর দক্ষিণে দূরত্ব স্থির করা হয়।

ভূ-গোলকে বিষুবরেখা, মেরুরেখা, মধ্যরেখা ও অক্ষরেখাসমূহের অবস্থিতি

প্রধান দ্রাঘিমারেখা—লণ্ডনের পাশের গ্রীনিচ মানমন্দিরের মধ্যদিয়া সুমেরু

হইতে কুমেরু পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে সোজাসুজি বিস্তৃত এবং নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে অবস্থিত রেখাকে বলা হয় প্রধান দ্রাঘিমারেখা। নির্দিষ্ট বিন্দু (সুমেরু, কুমেরু ও গ্রীনিচ মানমন্দির নির্দেশক-বিন্দু) ও নির্দিষ্ট রেখার (নিরক্ষরেখা) সাহায্যে ও উহাদের সহিত নির্দিষ্ট সম্পর্কযুক্ত বলিয়া ইহাও একটি **স্থির** রেখা। এই রেখার সাহায্যে যে-কোন স্থানের ঐ রেখা হইতে পূর্ব-পশ্চিমে দূরত্ব স্থির করা হয়। সেইজন্য ইহার নাম **মূল মধ্যরেখা** বা **প্রধান দ্রাঘিমারেখা**।

অক্ষাংশ বা সমাক্ষরেখা—পৃথিবী প্রায় গোলাকার এবং ইহার উপরিভাগের আয়তন বিরাট। কাজেই ভূপৃষ্ঠের যে-কোন স্থানের অবস্থিতি স্থির করিবার জন্য পৃথিবীর কেন্দ্র-বিন্দু হইতে বিভিন্ন স্থানের কৌণিক দূরত্ব (জ্যামিতির সাহায্যে) স্থির করা দরকার। (ভূপৃষ্ঠ চ্যাপ্টা ও সমতল হইলে রৈখিক মাপে বিভিন্ন স্থানের অবস্থিতি, দূরত্ব প্রভৃতি স্থির করা সম্ভবপর হইত।)
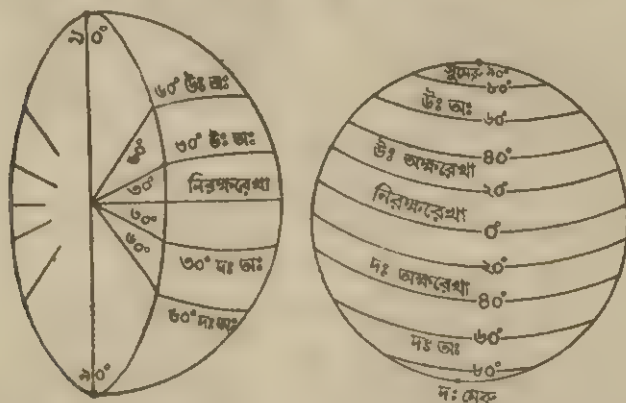
অক্ষাংশ ও অক্ষরেখা

নিরক্ষরেখার সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের যে কোন স্থানের ঐ রেখা হইতে উত্তর বা দক্ষিণদিকে দূরত্ব স্থির করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ভূপৃষ্ঠের ঐ স্থান-নির্দেশক বিন্দুকে একটি কাল্পনিক সরলরেখার সাহায্যে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুর সহিত যোগ করা হয়। আর ঐ বিন্দুর উপর দিয়া (উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত) মধ্যরেখা যেখানে নিরক্ষরেখাকে ছেদ করে, সেই ছেদ-বিন্দুকেও অপর একটি কাল্পনিক সরলরেখার সাহায্যে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুর সহিত যুক্ত করা হয়। এই দুই কাল্পনিক সরলরেখা প্রকৃত পক্ষে পৃথিবী-গোলকের ব্যাসার্ধ। ইহাদের সাহায্যে **পৃথিবীর কেন্দ্রে** যে (কাল্পনিক) **কোণ** উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারাই ভূপৃষ্ঠস্থ স্থানটির নিরক্ষরেখা হইতে উত্তর বা দক্ষিণে **কৌণিক দূরত্ব** বা **অক্ষাংশ** (Latitude) স্থির হয়। নিরক্ষরেখার উত্তরদিকে অবস্থিত স্থানের অক্ষাংশ উত্তর (উঃ অঃ) এবং দক্ষিণদিকে অবস্থিত স্থানের অক্ষাংশ দক্ষিণ (দঃ অঃ)।

যে-কোন বৃত্তের মত পৃথিবী-বৃত্তের কেন্দ্রেও ৩৬০° কোণ উৎপন্ন হয়। এরূপ প্রত্যেক ডিগ্রি কোণকে ৬০ মিনিটে এবং প্রত্যেক মিনিট কৌণিক দূরত্বকে ৬০ সেকেণ্ডে বিভক্ত করা হয়। এজন্য সুমেরুর অক্ষাংশ ৯০° উঃ অঃ, কলিকাতার অক্ষাংশ ২২½° উঃ অঃ (প্রকৃত পক্ষে ২২° ৩৪ উঃ অঃ)। 0° (নিরক্ষরেখা) হইতে ৩০-৩৫° অক্ষাংশসমূহকে বলা হয় **নিম্ন (Low) অক্ষাংশ,** ৩০-৩৫° হইতে ৫০-৫৫° অক্ষাংশ-সমূহকে **মধ্য অক্ষাংশ** এবং ৫০-৫৫° হইতে ৯০° অক্ষাংশকে **উচ্চ অক্ষাংশ** বলা হয়।

ভূপৃষ্ঠস্থ যে-কোন স্থান-নির্দেশক বিন্দুর উপর দিয়া নিরক্ষরেখার সমান্তরাল ভাবে যে রেখা কল্পনা করা হয় তাহাকে বলে **সমাক্ষরেখা** বা **অক্ষরেখা** (Parallel of latitute)। নির্দিষ্ট বিন্দুর অক্ষাংশ অনুসারে অক্ষরেখাগুলিও পরিচিত। তন্মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন, **কর্কটক্রান্তি** (Tropic of Cancer)-এর অক্ষাংশ ২৩½° উঃ অঃ ; **মকরক্রান্তির** (Tropic of Capricorn) ২৩½° দঃ অঃ, **সুমেরুবৃত্তের** ৬৬½° উঃ অঃ ও **কুমেরুবৃত্তের** ৬৬½° দঃ অঃ। প্রত্যেকটি অক্ষরেখাই একটি **বৃত্ত** (পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে), আর নিরক্ষরেখা একটি **মহাবৃত্ত*** (Great circle)। যে-কোন অক্ষরেখার উপর অবস্থিত প্রত্যেক বিন্দুর অক্ষাংশ সমান।

অক্ষাংশ ও ধ্রুবনক্ষত্রের উন্নতি—সুমেরু হইতে ধ্রুবনক্ষত্রের দিকে তাকাইলে তথা হইতে মনে হইবে উহা ঠিক মাথার উপরে, বা উহার উন্নতি ৯০°। কলিকাতা হইতে তাকাইলে দেখা যায় ধ্রুবনক্ষত্রের উন্নতি ২২½° উঃ, আর নিরক্ষরেখার উপরস্থিত যে-কোন স্থান হইতে, ধ্রুবনক্ষত্রের উন্নতি 0° (অর্থাৎ উহা যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া আছে)। এপ্রকার সম্পর্কের জন্য ইহা বলা হয় যে উত্তর গোলার্ধের যে-কোন স্থান হইতে **ধ্রুবনক্ষত্রের উন্নতি** ঐ স্থানের **অক্ষাংশের সমান**। জ্যামিতির সাহায্যে এই বিষয়টি সহজেই প্রমাণ করা সম্ভব। (সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে ধ্রুবনক্ষত্রের উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।)

দেশান্তর ও মধ্যরেখা—মূল মধ্যরেখা বা প্রধান দ্রাঘিমারেখার সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের যে-কোন স্থানের ঐ রেখা হইতে পূর্ব বা পশ্চিমদিকে দূরত্ব স্থির করা হয়। এক্ষেত্রেও অক্ষাংশের মত পৃথিবীর কেন্দ্রে কৌণিক দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। স্থানটি **নিরক্ষরেখার উপর** অবস্থিত হইলে স্থান-নির্দেশক বিন্দুকে একটি কাল্পনিক সরলরেখার সাহায্যে **পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুর** সহিত যুক্ত করা হয়। অপর একটি কাল্পনিক সরলরেখার সাহায্যে নিরক্ষরেখা ও মূল মধ্যরেখার ছেদবিন্দুকে পৃথিবীর কেন্দ্র-বিন্দুর সহিত যুক্ত করা হয়। এই দুই সরলরেখা পৃথিবী-গোলকের ব্যাসার্ধ। ইহাদের

* পৃথিবীর কেন্দ্র এই বৃত্তেরও কেন্দ্র।

সাহায্যে পৃথিবীর কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণদ্বারা ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত স্থানটির মূল মধ্যরেখা হইতে পূর্ব বা পশ্চিমদিকে কৌণিক দূরত্ব বা দ্রাঘিমান্তর বা দেশান্তর স্থির করা হয়।
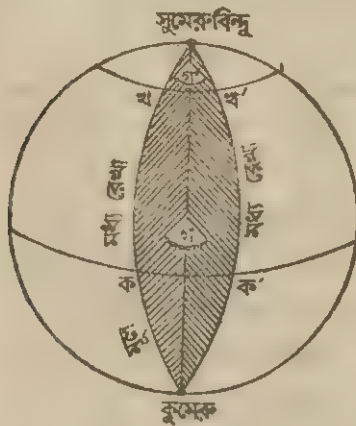
দ্রাঘিমান্তর নির্ণয়

ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত স্থানটি **নিরক্ষরেখার উত্তর বা দক্ষিণে** হইলে একটি কাল্পনিক সরলরেখাদ্বারা ঐ স্থান-নির্দেশক বিন্দুকে উহার সমসূত্রে বা সোজাসুজি পৃথিবীর অক্ষরেখা বা মেরুরেখার সহিত যুক্ত করা হয়। অপর একটি কাল্পনিক সরলরেখার সাহায্যে **মেরুরেখার ঐ বিন্দুকে** উহার সোজাসুজি সমাক্ষরেখা ও মূল মধ্যরেখার ছেদবিন্দুর সহিত যুক্ত করা হয়। (এক্ষেত্রে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুর সহিত কাল্পনিক সরলরেখা দুইটির যোগ স্থাপিত হয় না।) এভাবে রেখা দুইটির সাহায্যে ভূপৃষ্ঠস্থ স্থানটির দ্রাঘিমান্তর বা দেশান্তর জানা যায়। এক্ষেত্রে মূল মধ্যরেখা হইতে পূর্বদিকে ১৮০° এবং পশ্চিমদিকে ১৮০°, মোট ৩৬০° দ্রাঘিমান্তর গণনা করা হয়। পূর্বদিকে দ্রাঘিমান্তরকে পূঃ দ্রাঃ, পশ্চিমদিকের দ্রাঘিমান্তরকে পঃ দ্রাঃ বলা হয়। এক্ষেত্রেও প্রতি ডিগ্রি কোণকে ৬০ মিনিটে ও প্রতি মিনিট কোণকে ৬০ সেকেণ্ডে বিভক্ত করা হয়। যেমন, কলিকাতার দ্রাঘিমান্তর ৮৮½° পূঃ দ্রাঃ (প্রকৃত পক্ষে ৮৮°২৪' পূঃ দ্রাঃ); আর লণ্ডনের দ্রাঘিমান্তর 0°। (গ্রীনিচ মানমন্দির লণ্ডনের পাশেই অবস্থিত।)

বিভিন্ন দ্রাঘিমারেখা বা মধ্যরেখা

ভূপৃষ্ঠস্থ যে কোন স্থান-নির্দেশক বিন্দুর উপর দিয়া সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত সোজাসুজি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এবং নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে অবস্থিত প্রত্যেক কাল্পনিক রেখাকে বলা হয় **মধ্যরেখা** বা **দ্রাঘিমারেখা** বা **দেশান্তররেখা** (Meridian of Longitude)। প্রত্যেকটি মধ্যরেখা একটি **অর্ধবৃত্ত**; পরস্পর বিপরীতদিকে অবস্থিত দুইটি দ্রাঘিমারেখা মিলিয়া একটি বৃত্ত। যেমন, 0° দ্রাঃ

(মূল মধ্যরেখা) ও ১৮০° দ্রাঃ রেখা মিলিয়া একটি বৃত্ত। যে-কোন দ্রাঘিমারেখার উপর অবস্থিত প্রত্যেক বিন্দুর দেশান্তর সমান।

দেশান্তর ও স্থানীয় সময় –পৃথিবীর আবর্তন গতি বশতঃ ইহা অনবরত নিজ অক্ষরেখার চারিদিকে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঘুরিতেছে। ফলে, ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সূর্যের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে ও তাহার আলোক ও উত্তাপ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লাভ করিতেছে। এই অবস্থার সাহায্যেই ভূপৃষ্ঠস্থ প্রত্যেক স্থানের **স্থানীয় সময়** (Local time) স্থির করা হয়। পৃথিবীর একবার সম্পূর্ণরূপে আবর্তনের জন্য প্রয়োজন ২৪ ঘণ্টা সময়। এজন্য সহজ গণিতের হিসাবে জানা যায় যে প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমাতে স্থানীয় সময়ের পার্থক্য ৪ মিনিট। পূর্বদিকের স্থান আগে সূর্যের সম্মুখে উপস্থিত হয় বলিয়া যে-কোন দুইটি স্থানের মধ্যে যেটি পূর্বদিকে, তথায় পশ্চিমদিকের

দ্রাঘিমান্তরের পরিবর্তনের সহিত স্থানীয় সময়ের পরিবর্তনের সম্পর্ক
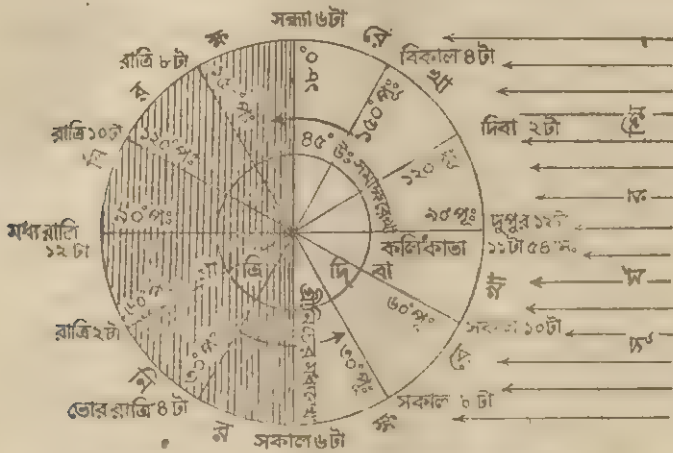
স্থানের তুলনায় স্থানীয় সময় (উপরোক্ত হিসাব অনুসারে) বেশী। যেমন, কলিকাতাতে (৮৮½° পূঃ দ্রাঃ) যখন স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৩০ মি, তখন এলাহাবাদের (৮২½° পূঃ দ্রাঃ) স্থানীয় সময় ঐ দিনেরই সকাল ৮টা ৬ মি।

পূর্ব-পশ্চিমে অধিকদূর বিস্তৃত দেশগুলির বিভিন্ন অংশে উপরিলিখিত কারণে স্থানীয় সময়ের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। যেমন, আসামের পূর্ব অংশে যখন কোন দিন স্থানীয় সময় সকাল ৮টা, তখন গুজরাটের পশ্চিম অংশের স্থানীয় সময় সকাল ৬টা। একই দেশের বিভিন্ন অংশে এভাবে স্থানীয় সময়ের পার্থক্যের জন্য বহু কাজের পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধা হয়। তাই দেশের সাধারণতঃ মধ্যভাগের কোন স্থানের দ্রাঘিমান্তর অনুসারে স্থির করা হয় দেশের প্রমাণ কাল। যেমন, এলাহাবাদের দ্রাঘিমান্তর (৮২½° পূঃ দ্রাঃ) অনুসারে ভারতের **প্রমাণ কাল**:(I. S. T. or

Indian Standand Time) স্থির করা হয়। সমগ্র পৃথিবীর জন্য এরূপ প্রমাণকাল স্থির করা হয় গ্রীনিচের দ্রাঘিমান্তর (0° দ্রাঃ) অনুসারে এবং তাহা **গ্রীনিচ প্রমাণ কাল** (G. M. T.) নামে পরিচিত। পৃথিবীর দেশসমূহের মধ্যে জাপানের স্থানীয় সময় সকলের আগে (এদেশেই সর্বপ্রথম সূর্যের আলো পাওয়া যায়) বলিয়া সেদেশের এক নাম নিপ্পন বা উদীয়মান সূর্যের দেশ।

স্থানীয় সময়, প্রমাণ কাল প্রভৃতির সহিত দ্রাঘিমান্তরের উপরিলিখিত সম্পর্কের ফলে উহাদের সাহায্যেই বিভিন্ন স্থানের দ্রাঘিমান্তর স্থির করা হয়। সাধারণতঃ সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে সূর্যের সর্বোচ্চ উন্নতি বা মধ্যাহ্ন স্থির করা হয়, আর ক্রনোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায় গ্রীনিচের স্থানীয় সময়। কাজেই বিভিন্ন স্থানের স্থানীয় সময়ের সহিত অন্যান্য স্থানের স্থানীয় সময় এবং দ্রাঘিমান্তর সম্বন্ধে বহু সংবাদ ও বিবরণ এই দুই যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায়।

সমাক্ষরেখা ও মধ্যরেখার ব্যবহার ও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য—সমাক্ষরেখার সাহায্যে যে-কোন স্থানের অক্ষাংশ (নিরক্ষরেখার উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিতি) এবং মধ্যরেখার সাহায্যে দ্রাঘিমান্তর (মূল মধ্যরেখার পূর্ব-পশ্চিমে অবস্থিতি) জানা যায়। যে-কোন দুই অক্ষরেখার মধ্যে দূরত্ব সকল সময় সমান (কারণ ইহারা সমান্তরাল রেখা), কিন্তু দুইটি মধ্যরেখার মধ্যে দূরত্ব নিরক্ষরেখা হইতে উত্তর বা দক্ষিণে ক্রমশঃ কম (পৃথিবী-গোলকের আয়তন উত্তর ও দক্ষিণে কম এবং মধ্যরেখাগুলি সুমেরু ও কুমেরুতে পরস্পর মিলিত হয়)। নিরক্ষরেখা হইতে উত্তর ও দক্ষিণে অবস্থিত অক্ষরেখাসমূহের উপর অবস্থিত স্থানগুলিতে উষ্ণতা সাধারণতঃ কম। একই দ্রাঘিমান্তরে অবস্থিত বিভিন্ন স্থানের স্থানীয় সময় সমান।

অনুশীলনী

১। সৌরজগতে কয়টি গ্রহ আছে? ইহাদিগকে গ্রহ বলে কেন? সূর্য হইতে দূরত্ব অনুসারে ইহাদের নাম পর পর লিখ। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি বৃহত্তম ও কোন্‌টি ক্ষুদ্রতম? কোন্‌টির উপগ্রহ সবচেয়ে বেশী? কোন্ কোন্ গ্রহের উপগ্রহ নাই?

২। সৌরজগতের গ্রহগণের মধ্যে সূর্য হইতে দূরত্ব হিসাবে পৃথিবীর স্থান কত? গ্রহগণের আয়তন হিসাবে পৃথিবীর স্থান কত? পৃথিবীর আকৃতি কিরূপ? এবিষয়ে সর্বাপেক্ষা আধুনিক ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ কি? এই সম্বন্ধে আরও দুইটি প্রমাণ উল্লেখ কর। পৃথিবীর উপরিভাগের আয়তন কত?

৩। পৃথিবীর গতি কয়টি? উহাদের নাম কি কি? ঐরূপ নামকরণের কারণ কি? পৃথিবীর আবর্তনগতির ফল সংক্ষেপে উল্লেখ কর। পৃথিবীর পরিক্রমণগতি না

থাকিলে কি সুবিধা বা অসুবিধা হইত ? উত্তর গোলার্ধে কখন গ্রীষ্মকাল ? তখন দক্ষিণ গোলার্ধে কোন্ কাল ? এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ কি ?

৪। ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানের অবস্থিতি কোন্ কোন্ রেখার সাহায্যে স্থির করা হয় ? অক্ষাংশ কাহাকে বলে ? কোন স্থানের অক্ষাংশ কিভাবে স্থির করা হয় ? কোন স্থানের দেশান্তর কিভাবে স্থির করা হয় ? কোন স্থানের স্থানীয় কাল কিভাবে স্থির করা হয় ? ভারতের প্রমাণকাল কিভাবে স্থির করা হয় ?

৫। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ—উত্তরায়ণ, নিরক্ষরেখা, G. M. T.

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূত্বক্

ভূত্বক্—মানুষ এবং প্রায় অসংখ্য প্রকার অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের বাসস্থান পৃথিবীর উপরিভাগ বা **ভূপৃষ্ঠ**। এই অংশ বিরাট ভূগোলকের উপরিভাগের অতি হাল্কা আবরণ(ত্বক্) মাত্র। এই **ভূত্বক্** (Earth's crust) নানাপ্রকার হাল্কা শিলা ও মৃত্তিকাদ্বারা গঠিত। ডিমের তুলনায় তাহার উপরিভাগের খোসা যত হাল্কা, পৃথিবী-গোলকের আয়তনের তুলনায় ভূত্বক্ তাহার চেয়েও হাল্কা।

ভূগর্ভ—বৈজ্ঞানিকগণের মতে সম্ভবতঃ ৫০০ কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবী-গ্রহের সৃষ্টি হয়। আরও ধারণা, তখন ইহা প্রচণ্ড **উত্তপ্ত** ও **গ্যাসীয়** অবস্থায় ছিল। ক্রমশঃ তাপ হারাইয়া ও শীতল হইয়া ইহা **বর্তমান কঠিন রূপ** ধারণ করিয়াছে। এখনও উপরিভাগ হইতে ক্রমশঃ ভিতরদিকে উত্তাপ এত বেশী যে মধ্যভাগের উপাদানসমূহের অবস্থা তরল ও বাষ্পীয় হওয়া স্বাভাবিক। তবে উপরের ও পাশের উপাদানসমূহের প্রচণ্ড চাপে ইহাদের অবস্থা প্রায় ইস্পাতের মত **কঠিন স্থিতিস্থাপক** (elastic)। পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে কেন্দ্র পর্যন্ত বিভিন্ন অংশের গঠন, উপাদান, ওজন প্রভৃতি সম্বন্ধে পার্থক্য বিস্তর। তবে সাধারণতঃ **সমজাতীয় পদার্থের** এক একটি বিরাট অংশ **বা মণ্ডল** থাকা সম্ভবপর। যেমন, সকলের উপরে **ভূত্বকে** আছে মৃত্তিকা এবং তাহার সহিত মিশ্রিত অবস্থায় কাঁকর, বালুকা, কর্দম, পাথর, নুড়ি প্রভৃতি।

বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা, ভূপৃষ্ঠ হইতে বরাবর নীচে কাটিয়া ফেলা সম্ভবপর হইলে দেখা যাইবে যে ভূত্বকের ঠিক নীচে (১২৮০-১৬০০ কি.মি.) **অশ্মমণ্ডল** বা **শিলামণ্ডল** (Lithosphere)। ইহা নানাপ্রকার শিলাদ্বারা গঠিত। তাহাদের মধ্যে উপর অংশে

আছে অপেক্ষাকৃত হাল্কা গ্রেনাইট জাতীয় শিলা। এজন্য বলা হয় হাল্কা উপাদান (Sial) যেন গুরু বা ভারী উপাদানের (Sima) উপর ভাসিয়া আছে। ইহার নীচে (১৬০০-২৮৮০ কি.মি.) আছে আরও গুরু বা ভারী এবং সম্ভবতঃ অক্সাইড-সালফাইড দ্বারা গঠিত এক মণ্ডল। ইহাকে বলা হয় **গুরুমণ্ডল** (Barysphere)। তাহার নীচে পৃথিবীর কেন্দ্রের চারিদিকে (৩২০০ কি.মি.) আছে সর্বাপেক্ষা ভারী উপাদান লৌহ ও নিকেলদ্বারা গঠিত মণ্ডল। ইহাকে বলা হয় **কেন্দ্রমণ্ডল** (Centrosphere)।

শিলা—ভূগর্ভের বিভিন্ন মণ্ডলের নানাজাতীয় উপাদান, উত্তাপ প্রভৃতির সহিত ভূত্বকের গঠন, উপাদান প্রভৃতির সম্পর্ক খুব বেশী। মোটামুটি হিসাবে ভূত্বকের বেশীর ভাগ (৭১%) জলদ্বারা আবৃত **বারিমণ্ডল** এবং বাকী অংশ (২৯%) **স্থলমণ্ডল**। বারিমণ্ডলের তলদেশের ভূভাগ এবং স্থলমণ্ডল নানাজাতীয় উপাদানদ্বারা গঠিত। কোথাও আছে বিরাট আকারের পাথর, কোথাও নুড়ি, কোথাও বালুকা, কোথাও কাদা প্রভৃতি জিনিস। অনেক ক্ষেত্রে ইহাদের সংমিশ্রণও আছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সমুদয় উপাদানের সাধারণ নাম দিয়াছেন **শিলা** (Rock)। [সাধারণভাবে আমরা শিলাদ্বারা কঠিন উপাদান (পাথর) বুঝিলেও এক্ষেত্রে শিলার অর্থ অনেক ব্যাপক।] আমাদের বসবাসের জন্য গৃহনির্মাণ, জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহের জন্য পুকুর ও কূপ খনন, নদীসমূহের গতিপথের অবস্থা, জলপ্রবাহ, জীবিকার জন্য কৃষিকার্য, খনিজ সম্পদ সংগ্রহ, পশুপালন এবং যাতায়াত ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রায় সমুদয় কাজের সহিতই লক্ষ্য করা যায় **শিলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক**।

শিলাসমূহের বিভাগ—শিলাসমূহের মধ্যে উৎপত্তি, গঠন, উপাদান এবং ইহাদের ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে পার্থক্য বিস্তর। প্রধানতঃ ইহাদের উৎপত্তির সহিত উপাদান, গঠন, ব্যবহার ও অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সুতরাং উৎপত্তি অনুসারে শিলাকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

(১) **আগ্নেয় শিলা**—পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে কেন্দ্রের দিকে ক্রমশঃ উত্তাপ অধিক। তাই ভূগর্ভস্থ উপাদানসমূহ প্রচণ্ড উত্তপ্ত অবস্থায় আছে। এসকল উপাদান নানা জাতীয় এবং ইহাদের উপর উত্তাপের প্রভাব সম্বন্ধেও পার্থক্য প্রচুর। তবে উপরের ও পাশের উপাদানসমূহের প্রবল চাপে এগুলির অবস্থা স্থিতিস্থাপক। তাহাছাড়া বহু গ্যাসীয় পদার্থও ইহাদের সহিত মিশ্রিত আছে। সময় সময় কোন-না-কোন কারণে বা বিভিন্ন কারণের সমষ্টিগত ফলে ভূগর্ভের কতক অংশে চাপের পার্থক্য হয়। তখন তথাকার পদার্থসমূহ (প্রধানতঃ চাপ হ্রাসের ফলে) গলিয়া যায়। এই গলিত পদার্থ বা **ম্যাগমা** (Magma) ভূগর্ভের বিভিন্ন দুর্বল অংশের (ফাঁক, ফাটল প্রভৃতি) মধ্যদিয়া **লাভা** রূপে প্রবাহিত হয় এবং সুযোগ পাইলে (ফাঁক, ফাটলের মধ্য দিয়া) ভূপৃষ্ঠে

আসে। যে উপাদানগুলি ভূপৃষ্ঠে আসিবার সুযোগ পায়, আর যেগুলি ঐরূপ সুযোগের অভাবে ভূত্বকের নীচে থাকিতে বাধ্য হয়, তাহাদের সকলগুলিই প্রথম অবস্থায় থাকে তরল ও উত্তপ্ত। ক্রমশঃ তাপ হারাইয়া ও ঘনীভূত হইয়া এগুলি শীতল হয়। ইহাদের সাধারণ নাম **আগ্নেয় শিলা** (Igneous rock)।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় বা ঐ জাতীয় কোন অবস্থায় ভূপৃষ্ঠের **উপরে আসিয়া** (Extrusion) যে সকল আগ্নেয় শিলা সৃষ্ট হয়, তাহাদের উপাদান সাধারণতঃ সূক্ষ্ম এবং স্ফটিকের বা মিছরির দানার মত **কেলাসিত** (crystal)। এই জাতীয় আগ্নেয় শিলার (Volcanic rock) মধ্যে **ব্যাসল্ট** প্রধান। কতক আগ্নেয় পদার্থ ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন ফাটলের মধ্যদিয়া বাহিরে আসিয়া বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। দাক্ষিণাত্য মালভূমির প্রায় ৫ লক্ষ বর্গ কিমি স্থানে আছে এই জাতীয় **লাভাজাত** আগ্নেয় শিলা। স্থানে স্থানে তাহাদের গভীরতা খুব বেশী, আবার কোথাও বা ক্ষয়ীভবনের ফলে সৃষ্টি হইয়াছে কতক **ধাপ** (Lava trap)।

ভূগর্ভস্থ কতক আগ্নেয় পদার্থ ভূপৃষ্ঠের দিকে আসিবার সময় **ভূত্বকের নীচেই** (ভূত্বকের কোন দুর্বল অংশের মধ্যদিয়া বাহিরে আসিবার সুযোগের অভাবে) সঞ্চিত হয় (Intrusion) এবং কালক্রমে তথায় শীতল ও ঘনীভূত হয়। ইহাদের উপাদান সূক্ষ্ম বা কেলাসিত নহে। ইহাদিগকে **পাতালিক** শিলা (Plutonic rock) বলে। স্থানে স্থানে ইহাদের গভীরতা খুব বেশী। এই প্রকার শিলার মধ্যে **গ্রেনাইট** প্রধান। পাতালিক ও ভূপৃষ্ঠের লাভাজাত শিলার মধ্যবর্তী অবস্থায়ও কতক আগ্নেয় (Intrusive) শিলার সৃষ্টি হয়। ইহাদিগকে বলা হয় **হাইপাবিস্যাল** (Hypabyssal) শিলা। ডোলারাইট, গ্রেনোফায়ার প্রভৃতি এই জাতীয় শিলা।

ভূপৃষ্ঠস্থ যাবতীয় শিলার মধ্যে ইহাদের উৎপত্তি হয় সর্বপ্রথম। সেজন্য এগুলি **প্রাথমিক** (Primary) **শিলা**। আর গঠন হিসাবে ইহাদের মধ্যে স্তরের অভাব। একারণে এগুলি **অস্তরীভূত** (Unstratified) **শিলা**। ভূত্বকের যাবতীয় শিলার মধ্যে ইহাদের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী।

গঠন হিসাবে ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় আগ্নেয় শিলার ৯৯% ৮টি উপাদান। তন্মধ্যে অম্লজান সর্বপ্রধান। তারপর সিলিকন। ইহার পর এলুমিনিয়াম, লৌহ, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম।

দুইটি প্রধান আগ্নেয় শিলার (ব্যাসল্ট ও গ্রেনাইট) সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

(ক) **ব্যাসল্ট** (Basalt)—ইহা লাভা হইতে উৎক্ষিপ্ত (Extrusive) আগ্নেয় শিলা। এই জাতীয় শিলার মধ্যে গাঢ় সবুজ, কাল, গাঢ় ধূসর প্রভৃতি রং দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে ফেলস্‌পার ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ থাকে। ব্যাসল্ট জাতীয় শিলার টুকরা

রেলপথে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। পাকা বাড়ীর ছাদ ও পাকা রাস্তা তৈরী প্রভৃতি উদ্দেশ্যেও ইহাদের টুকরার ব্যবহার অধিক।

(খ) **গ্রেনাইট** (Granite)—ইহা ভূত্বকের নীচে সঞ্চিত (Intrusive) আগ্নেয় শিলা (Plutonic rock)। ইহার মধ্যে ফেলস্পারের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী (৬০%), কোয়ার্টজ কম (৩০%)। তারপর অভ্র। ইহার বিভিন্ন উপাদানের পার্থক্য বশতঃ গঠন ও বর্ণের পার্থক্য প্রচুর; প্রায়ই কাল, সাদা ও সবুজের মিশ্রণ সুস্পষ্ট। সুন্দর পাকা বাড়ি, সেতু প্রভৃতি তৈরীর জন্য এগুলি অধিক ব্যবহৃত হয়।
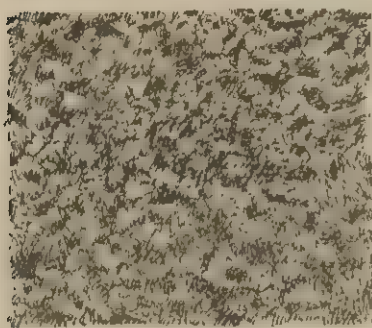
গ্রেনাইট শিলা

(২) পাললিক শিলা

ভূপৃষ্ঠের প্রাথমিক (আগ্নেয়) শিলাসমূহ আদিকাল হইতে সূর্যতাপ, বায়ুর উষ্ণতা ও শৈত্য, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির নানাপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে ও ভাঙ্গিয়া পাথর, নুড়ি, বালুকা ও কাঁকরে পরিণত হয়। তারপর বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, নদী, হিমবাহ প্রভৃতি দ্বারা প্রবাহিত হইয়া এসকল উপাদান সমুদ্র, হ্রদ ও অন্যান্য নিম্নভূমিতে **পলি** (Sediment) রূপে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়। ইহাদের মধ্যে **স্থূল, বড় ও ভারী** অংশ (কাঁকর, নুড়ি প্রভৃতি) স্থির জলে **প্রথমে** তলানি পড়ে। আর **সূক্ষ্ম ও হাল্কা** অংশ (বালুকা, কাদা প্রভৃতি) সমুদ্রের জলের স্রোত ও ঢেউ দ্বারা কিছু **দূরে** গিয়া সঞ্চিত হয়। এসকল তলানি বা পলি কখনও **পাতলা**, কখনও বা **পুরু** স্তরে এবং সময় সময় বহুদূর বিস্তীর্ণ অংশে সঞ্চিত হয়। এসকল সঞ্চিত পদার্থের বিভিন্ন উপাদান প্রথমেই পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ থাকে না। কিন্তু ক্রমশঃ কতক উপাদান (চুন, বালুকা, লৌহ প্রভৃতি) ভূগর্ভের উত্তাপ, উপরের ও পাশের জিনিসের চাপ ও জলের প্রভাবে (আংশিকভাবে গলিয়া) পরস্পর আবদ্ধ হয়, অপর উপাদানসমূহকেও **দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ** করে। [চুন, সুরকি, সিমেন্ট, বালুকা প্রভৃতি দ্বারা ইটগুলিকে পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া বাড়ি, সেতু প্রভৃতি তৈরার উদাহরণ সর্বত্রই দেখা যায়।] পাললিক শিলার স্তরগুলি প্রথমে নরম বা কোমল থাকিলেও কালক্রমে কঠিন শিলাতে পরিণত হয়।

পলিদ্বারা গঠিত বলিয়া এপ্রকার শিলার নাম **পাললিক** (Sedimentary) শিলা। আর স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইয়া সৃষ্টি হয় বলিয়া ইহাদের অন্য নাম **স্তরীভূত** (Stratified) শিলা। ইহাদের স্তরগুলি সাধারণতঃ সুস্পষ্ট। কতক স্তরে স্পষ্ট জলের ঢেউয়ের চিহ্নও দেখা যায়।

পাললিক শিলা—বিভিন্ন স্তর ও ফাটল (ক, খ)

পাললিক শিলার কতক উপাদান **যান্ত্রিক** উপায়ে (Mechanically) পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয়। পাথর, নুড়ি, কাঁকর প্রভৃতির অপেক্ষাকৃত বড় (পরস্পরের ঘর্ষণ ও অন্যান্য কারণে আকৃতি প্রায় গোলাকার) উপাদানের দ্বারা গঠিত পাললিক শিলার উদাহরণ কংগ্লোমারেট। মোটা বা সরু দানার বালুকা দ্বারা গঠিত নানাপ্রকার বেলেপাথর (Sandstone) এবং সূক্ষ্ম বালুকা দ্বারা গঠিত গ্রিট জাতীয় পাললিক শিলা খুব বেশী দেখা যায়। অত্যন্ত সূক্ষ্ম (এক মিলিমিটারের শত ভাগের কম) বালুকা দ্বারা গঠিত কাদাপাথর (Mudstone), শেল প্রভৃতি পাললিক শিলাও প্রচুর দেখা যায়।

কংগ্লোমারেট শিলা

কতক পাললিক শিলার উপাদান **রাসায়নিক** উপায়ে (Chemically) পরস্পরের সহিত যুক্ত। ইহাদের মধ্যে ফ্লিন্ট, জিপসাম, ডোলোমাইট, সৈন্ধব লবণ (Rock salt) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কতক পাললিক শিলার মধ্যে উদ্ভিদ্‌ ও জীবজন্তুর (প্রধানতঃ সামুদ্রিক প্রাণীর) দেহাবশেষের পরিমাণ খুব বেশী। এসকল **জৈব** (Organic) পদার্থ ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়। পাললিক নানাজাতীয় শিলার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপাদানকে পরস্পরের সহিত যুক্ত করা সম্পর্কে ইহাদের প্রভাব অধিক। এই জাতীয় শিলার মধ্যে চুনাপাথর (Limestone), চক, লোহ পাথর (Ironstone), কয়লা, লিগনাইট প্রভৃতি প্রধান। কয়লা ও চুনাপাথরকে **জৈব শিলাও** (Organic rock) বলে। এরূপ কতক শিলার মধ্যে **জীবাশ্ম** (Fossil) বা জীবজন্তু ও উদ্ভিদের কতক অংশের প্রস্তরীভূত (পাথরে পরিণত) অবস্থা দেখা যায়।
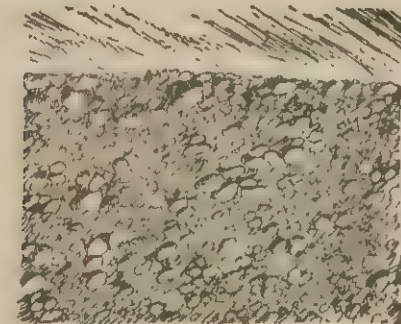
কতক পাললিক শিলার উপাদান প্রধানতঃ **বায়ুদ্বারা প্রবাহিত**। চীনে হোয়াংহো নদীর উপত্যকার লোয়েস শিলা তাহার উদাহরণ।

ভূত্বকের ঠিক উপরিভাগের প্রায় ৭৫% পাললিক শিলা। (তাহার নীচে আগ্নেয় শিলাই অধিক।) পাললিক শিলার মধ্যে কয়লা, খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি পাওয়া যায়।

তিনটি প্রধান পাললিক শিলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

(ক) **বেলেপাথর** (Sandstone)—এই পাথরের মধ্যে বালুকার ভাগ সর্বাপেক্ষা অধিক। বালুকার কণার আকৃতি (ছোট বা বড়), উহাদের সংযোগের দৃঢ়তা প্রভৃতি বিষয়ে পার্থক্য অনুসারে বেলেপাথরের মধ্যে পার্থক্য (কোমল বা শক্ত) প্রচুর। উহাদের রঙের মধ্যেও অনেক পার্থক্য। ধূসর, হলদে ও লাল বেশী, সবুজ বা অন্য রং কম। অধিক বালুকা থাকার ফলে বেলেপাথর অঞ্চলে কূপ, পুকুর প্রভৃতি কম। (এগুলি খনন করা কষ্টকর, খনন করিলেও জল পাওয়া যায় না।) বড় বাড়ি, সেতু প্রভৃতি তৈরার জন্য এই জাতীয় শিলা অধিক ব্যবহৃত হয়।
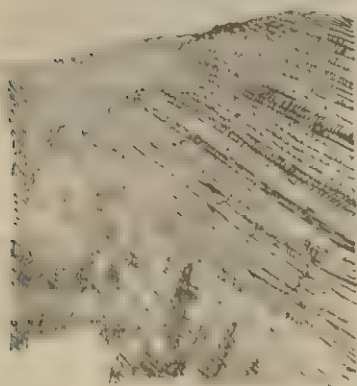
বেলেপাথর

(খ) **শেল** (Shale)—এই পাথরের প্রধান উপাদান কর্দম (বালুকার সূক্ষ্মতম অংশ)। সেজন্য ইহা দৃঢ় বা শক্ত নহে, কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া জল সহজে চুয়াইতে পারে না। সেজন্য এইরূপ শিলাদ্বারা গঠিত অঞ্চলে কূপ ও পুকুরের সংখ্যা অধিক। (খনন করা সহজ ও জল জমা থাকে।) এই জাতীয় শিলার রং সাধারণতঃ ধূসর, কাল, সবুজ, এমন কি লালও আছে। অপেক্ষাকৃত মোটা দানার বালুকা মিশ্রিত থাকিলে এই শিলা অধিক শক্ত হয়।

(গ) **চুনাপাথর** (Limestone)—এই জাতীয় শিলার মধ্যে ঝিনুক, শামুক, জীবজন্তুর দেহাবশেষ (অস্থি প্রভৃতি) প্রচুর। সেজন্য এই শিলাতে চুনের ভাগ অধিক। ফলে, এরূপ শিলার উপর কয়েক ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক এসিড দিলে উহা হইতে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বাহির হয় ও পাথরের উপর বুদ্বুদ্ সৃষ্টি হয়। এরূপ পাথরও শক্ত নহে। সিমেণ্ট, চুন, রাসায়নিক সার প্রভৃতি তৈরার জন্য এরূপ পাথর অধিক ব্যবহৃত হয়। কতক বড় বাড়ী তৈরার জন্যও এরূপ পাথর ব্যবহৃত হয়।

(৩) রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত শিলা

আগ্নেয় ও পাললিক শিলা সূর্যতাপ, বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা, জল, বৃষ্টি, বিভিন্ন জিনিসের চাপ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে দীর্ঘকাল যাবৎ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া পূর্বাপেক্ষা অধিক কঠিন ও কেলাসিত হয়। কখনও বা ভূগর্ভেই এরূপ অবস্থা ঘটে। কাজেই আগেকার রূপ ও অবস্থার পরিবর্তনের ফলে এসকল শিলাকে **রূপান্তরিত** বা **পরিবর্তিত** (Metamorphic) শিলা বলে। এবিষয়ে তাপের প্রভাব অধিক হইলে তাহাকে **থার্মাল** পরিবর্তন (Thermal metamorphism) বলে। আর আগ্নেয় (Igneous) শিলা বা অন্য পদার্থের সংস্পর্শে তাহাদের চারিপাশে পরিবর্তন ঘটিলে তাহাকে **সংস্পর্শ** পরিবর্তন (Contact metamorphism) বলে। সাধারণতঃ তাপ ও চাপ উভয়ের প্রভাবেই সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন হয় এবং তাহাকে **ডাইনামিক** (Dynamic) বা **ডাইনামো-থার্মাল** (Dynamo-thermal) পরিবর্তন বলে। এসকল পরিবর্তন কখনও স্থানীয় (Local), কখনও আঞ্চলিক (Regional). আবার কখনও ভূগর্ভে সম্পন্ন হয় (Plutonic metamorphism)।

উপরিলিখিত পরিবর্তনের ফলে পাললিক বেলেপাথর হইতে সৃষ্টি হয় কোয়ার্ৎজাইট। কর্দম ও কাদাপাথর (Mudstone) হইতে সৃষ্টি হয় শ্লেট, শেল হইতে মাইকা-সিস্ট (Mica schist), আর চুনাপাথর হইতে মর্মরপাথর (Marble)। আগ্নেয় গ্রেনাইট শিলা হইতে সৃষ্টি হয় নীস (Gneiss)।

কয়েকটি পরিবর্তিত শিলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

(ক) **কোয়াৎর্জাইট** (Quartzite)—ইহা বেলেপাথর (পাললিক শিলা) হইতে রূপান্তরিত শিলা, কিন্তু ইহার মধ্যে বালুকার চিহ্ন দেখা যায় না, কোয়ার্ৎজই বেশী। ইহা খুব কঠিন শিলা এবং বেশ উজ্জ্বল, রং নানাপ্রকার।

(খ) **শ্লেট** (Slate)—কর্দম, কাদাপাথর (পাললিক শিলা) হইতে এই রূপান্তরিত শিলার সৃষ্টি, ইহার রং নীল ও কাল রঙের মিশ্রণ (শ্লেট রং নামে পরিচিত)। কাল, ধূসর, সবুজ, এমন কি লাল রংও দেখা যায়। লেখার জন্য এই শিলা অধিক ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাজ্যে ইহা দ্বারা দালান বা ঘরের চালও তৈরী হয়।

(গ) **সিস্ট** (Schist)—ইহা সাধারণতঃ শেল (কাদাপাথর) হইতে উৎপন্ন। ইহার মধ্যে বিভিন্ন উপাদানের পার্থক্য অনুসারে ইহা মাইকা-সিস্ট, হর্নব্লেণ্ড সিস্ট ইত্যাদি নামে পরিচিত।

(ঘ) **নীস** (Gneiss)—গ্রেনাইট (আগ্নেয় শিলা) হইতে এই রূপান্তরিত শিলার সৃষ্টি হয়। ইহার মধ্যে অভ্রের পরিমাণ অধিক। কতক অভ্র কাল (Biotite), কতক সাদা ও কাল প্রায় সমপরিমাণ (Muscovite)।

শিলা-গঠনকারী খনিজ পদার্থ

ভূপৃষ্ঠস্থ প্রত্যেক প্রকার শিলা নানারকম **খনিজ** পদার্থ (Rock-forming minerals) দ্বারা গঠিত। যেমন, কোয়ার্ৎজ, ফেলস্‌পার, অভ্র, হেমাটাইট, ম্যাগনেটাইট প্রভৃতি। এরূপ প্রত্যেকটি খনিজ পদার্থ কতকগুলি **রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ** (Chemical compounds) দ্বারা গঠিত। [কেবলমাত্র স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক প্রভৃতি ইহার ব্যতিক্রম; এগুলি এক একটি রাসায়নিক উপাদান দ্বারা গঠিত।] কতক খনিজ পদার্থের রাসায়নিক উপাদান নির্দিষ্ট (fixed) বা স্থির। যেমন, কোয়ার্ৎজ। কিন্তু অধিকাংশ খনিজ পদার্থের রাসায়নিক উপাদান পরিবর্তনশীল (variable); অর্থাৎ খনিজ পদার্থের মধ্যে একটি উপাদানের পরিবর্তে অন্য উপাদান থাকিতে পারে।

সাধারণতঃ ব্যবহৃত খনিজ পদার্থসমূহ ৯২টি রাসায়নিক উপাদান দ্বারা গঠিত। তন্মধ্যে ১৪টি উপাদানের পরিমাণ মোট উপাদানের ৯৯%। ইহাদের মধ্যে আবার **অম্লজান** ও **সিলিকনের** পরিমাণ ৭৪'০৭%। তারপর **এল্যুমিনিয়াম,** লৌহ প্রভৃতি ছয়টির পরিমাণ ২৪'১৭%। অর্থাৎ এই আটটি উপাদানের পরিমাণ ৯৮'২৪%। নিম্ন তালিকার ১৪টি উপাদানের বাহিরে ৭৮টি উপাদানের পরিমাণ মাত্র ০'৬৮%। ইহাদের মধ্যে তামা, সীসা ও দস্তা গুরুত্বপূর্ণ। এই ৭৮টি উপাদানের মধ্যে বহু উপাদানই হয় দুষ্প্রাপ্য, নতুবা তাহাদের ব্যবহার হয় না।

খনিজ পদার্থ গঠনকারী প্রধান উপাদানসমূহ :—

রাসায়নিক উপাদান	সাঙ্কেতিক চিহ্ন	ভূপৃষ্ঠের শতাংশ	রাসায়নিক উপাদান	সাঙ্কেতিক চিহ্ন	ভূপৃষ্ঠের শতাংশ
অম্লজান (Oxygen)	O	৪৬'৪৬	ম্যাগনেসিয়াম	Mg	২'০৭
সিলিকন	Si	২৭'৬১	টিটেনিয়াম	Ti	০'৬২
এল্যুমিনিয়াম	AL	৮'০৭	উদ্‌জান (Hydrogen)	H	০'১৪
লৌহ	Fe	৫'০৬	ফস্‌ফরাস	P	০'১২
ক্যালসিয়াম	Ca	৩'৬৪	কারবন	C	০'০৯
সোডিয়াম	Na	২'৭৫	সালফার	S	০'০৬
পটাসিয়াম	K	২'৫৮	ক্লোরিন	CL	০'০৫

শিলা-গঠনকারী প্রধান খনিজ পদার্থ—পৃথিবীতে এযাবৎ আবিষ্কৃত বা মানুষের পরিচিত খনিজ পদার্থসমূহের সংখ্যা অনেক। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি (স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি) খুব মূল্যবান্, কতকগুলি (কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি) শক্তির উৎস, কতকগুলি (লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, তাম্র প্রভৃতি) বিভিন্ন শিল্পের উপাদান। আর কতকগুলি (কোয়ার্ৎজ, অভ্র, ফেলসপার প্রভৃতি) বিভিন্ন শিলার প্রধান উপাদান।

মোটামুটি হিসাবে ভূপৃষ্ঠের **শিলাসমূহের সর্বাপেক্ষা অধিক (৫৯%) অংশ সিলিকন**। ইহা কোয়ার্ৎজ, ফেলসপার, অভ্র প্রভৃতির অন্যতম প্রধান উপাদান। ভূপৃষ্ঠের শিলাসমূহের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে এল্যুমিনা (প্রায় ১৫%), ক্লোরাইড (সৈন্ধব লবণ), সালফাইড (লৌহ পাইরাইট), লৌহের অক্সাইড (ম্যাগনেটাইট, হেমাটাইট) ও কারবনেট প্রধান। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল।

(ক) **কোয়ার্ৎজ** (Quartz)—ইহা সিলিকন ও অম্লজান (Oxygen) নামক দুইটি মৌল বা মৌলিক উপাদানদ্বারা গঠিত (SiO_2 বা Silicon dioxide)। ইহার রঙ সাধারণতঃ সাদা বা বর্ণহীন। তবে মলিন পদার্থ মিশ্রিত কোয়ার্ৎজের রং হলদে, লাল, সবুজ, নীল, ধূসর, প্রায় কাল ইত্যাদি।

কোয়ার্ৎজ

বিভিন্ন জাতীয় কোয়ার্ৎজ জেসপার, এগেট, গোলাপী (Rosy) কোয়ার্ৎজ প্রভৃতি নামে পরিচিত। কোয়ার্ৎজের আভা কাচের মত; কতক স্বচ্ছ, কতক অস্বচ্ছ। ইহা খুব শক্ত, কিন্তু ইহার ওজন কম। ইহার সাধারণতঃ ছয়টি দিক্ থাকে (hexagonal), কিন্তু ভাঙ্গিলে টুকরার পাশগুলি বাঁকা। ইহা অতি সাধারণ খনিজ পদার্থ এবং বিভিন্ন শিলার মধ্যে ইহার পরিমাণ খুব বেশী। বালুকার মধ্যে ইহার পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক। সিমেণ্ট, কাচ, পোর্সেলিন, রং, সাবান প্রভৃতি বহু জিনিস তৈরীর ইহা অন্যতম উপাদান।
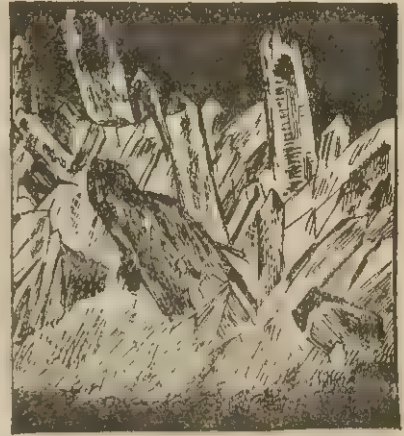
(খ) **ফেলসপার** (Felspar)—ইহা অতি সাধারণ সিলিকেট এবং মধ্যম রকম শক্ত। গ্রেনাইট জাতীয় আগ্নেয়শিলার ইহা একটি প্রধান উপাদান। ইহার ওজন হাল্কা। ইহার দুইটি বিভাগ—(১) **অর্থোক্লেজ বা পটাসিয়াম ফেলসপার**। ইহা পটাসিয়াম-এল্যুমিনিয়াম সিলিকেট (K_2O, Al_2O_3, $6SiO_2$) দ্বারা গঠিত। ইহার রং সাদা বা বর্ণহীন। ধূসর, লাল ও সবুজ রং ক্বচিৎ দেখা যায়। (২) **প্ল্যাজিওক্লেজ ফেলসপার**। ইহা সোডিয়াম-ক্যালসিয়াম-এল্যুমিনিয়াম সিলিকেট দ্বারা গঠিত। ইহার রং ধূসর, ক্বচিৎ সাদা। পোর্সেলিন তৈরীর প্রধান উপাদান ফেলসপার।

(গ) **অভ্র** (Mica)—ইহা একটি মিশ্র সিলিকেট। ইহা পটাসিয়াম-এল্যুমিনিয়াম

সিলিকেট দ্বারা গঠিত। কাল অভ্রের মধ্যে লৌহ ও ম্যাগনেসিয়ামও থাকে। গ্রেনাইটের মধ্যে অভ্রের পরিমাণ খুব বেশী। ইহা খুব কোমল ও হাল্কা পদার্থ। ইহার মধ্যে স্তর অনেক; স্তরগুলি আলাদা করার পর নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে বেতার ও বৈদ্যুতিক শিল্প, মোটরগাড়ির দরজা, জানালা, আলোর চিমনি প্রভৃতি তৈরী প্রধান। চিত্র আঁকা ও ঔষধের উপাদান হিসাবেও অভ্র ব্যবহৃত হয়।

অভ্রের দুইটি বিভাগ—(১) **মাস্কোভাইট** (Muscovite)। পুরু অবস্থায় ইহার রং সামান্য মেটে বা সবুজ, কিছুটা অস্পষ্ট। কিন্তু ইহার স্তরগুলি স্বচ্ছ, রং সাদা বা বর্ণহীন। (২) **বায়োটাইট** (Biotite)—ইহার রং গাঢ় সবুজ, ধূসর বা কাল।

(ঘ) **এল্যুমিনা** (Alumina), **এল্যুমিনিয়াম অক্সাইড** (Aluminium Oxide)—ইহা এল্যুমিনিয়াম ও অক্সিজেনের যৌগিক পদার্থ (Al_2O_3)। ইহার রং সাদা (কোরাণ্ডামের উপাদান)। তবে লাল (পদ্মরাগমণি বা Ruby), নীল (নীলকান্ত-মণি বা Sapphire), হলদে (টোপাজ) ও সবুজ রংও (পান্না বা মরকতমণি বা Emerald) আছে। ইহা উপরিলিখিত মূল্যবান্ প্রস্তর ভিন্ন বক্সাইট, কোরাণ্ডাম প্রভৃতি বহু সাধারণ শিলারও উপাদান।

ভূত্বকের গতি

পৃথিবীর বিভিন্ন গতি ও শক্তি—পৃথিবী-গ্রহের যে দুইটি (আবর্তন ও পরিক্রমণ) গতি আছে, ভূপৃষ্ঠেও (সমগ্র পদার্থের অংশ হিসাবে) সেই দুই গতির প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। আর ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে এই প্রভাব সম্পর্কে প্রচুর পার্থক্যও থাকা স্বাভাবিক। এই দুই গতির মধ্যে **আহ্নিক গতির** প্রভাবে উৎপন্ন **বিকর্ষণ শক্তির** (Centrifugal force) বেগ নিরক্ষীয় অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক। তথা হইতে ক্রমশঃ উত্তর বা দক্ষিণে কম; উভয় মেরুতে সর্বাপেক্ষা কম। ইহা ভিন্ন পৃথিবীর **মাধ্যাকর্ষণ শক্তির** প্রভাবে ভূপৃষ্ঠস্থ উপাদানসমূহ পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়।

ভূপৃষ্ঠের অসমতা—ভূপৃষ্ঠের গঠনকারী শিলাসমূহের মধ্যে ঘনত্ব (density), হাল্কা বা পুরু অবস্থা (thickness) প্রভৃতি বিষয়ের পার্থক্য বিস্তর। ফলে, তাহাদের উপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব সম্বন্ধে তারতম্য অনেক। তবে প্রাকৃতিক কারণে **ভারসাম্য** (isostacy) অবস্থা বর্তমান। তাহার ফলে বিভিন্ন সাগর, মহাসাগর ও মহাদেশসমূহ বর্তমান অবস্থায় রহিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের বর্তমান অসম অবস্থা বা পাহাড়, পর্বত, মালভূমি, সমভূমি প্রভৃতির উচ্চতা সম্পর্কে পার্থক্যও এই ভারসাম্য অবস্থার ফল। কোন কারণে এই সাম্য অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিলে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের বর্তমান ভারসাম্য অবস্থার পরিবর্তন অনিবার্য। কখন কখন **ভূতাত্ত্বিক কারণে** (Geological action) ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশের পরিবর্তন

হয়। যেমন, পাহাড়, পর্বতের বিস্তীর্ণ অংশ কখনও ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এবং ঐ সকল জিনিস সমুদ্রে সঞ্চিত হইতে পারে। এসকল উপাদানের পরিমাণ অধিক হইলে ঐ অঞ্চলে ভারসাম্য অবস্থার পরিবর্তন এবং তাহার ফলে উচ্চতার পরিবর্তন (কতক অংশের উচ্চতা বৃদ্ধি বা উন্নয়ন ও কতক অংশের অবনয়ন বা উচ্চতা হ্রাস) স্বাভাবিক। অবশ্য, এবিষয়ে ভূত্বকের নীচের ভারী উপাদান (Sima) ও তাহার উপরদিকের হাল্কা উপাদানের (Sial) প্রভাবও উল্লেখযোগ্য।

মহাদেশীয় স্থান পরিবর্তন—ভূত্বকের উপরিভাগের স্থলমণ্ডল (ভূপৃষ্ঠের ২৯%) শিলামণ্ডলের উপরিভাগের হাল্কা অংশ (Sial) দ্বারা গঠিত এবং বারিমণ্ডলের তলদেশ ভারী অংশ (Sima) দ্বারা গঠিত। বর্তমানে স্থলমণ্ডলের (মহাদেশসমূহের) অবস্থিতি যেরূপ, বহুপূর্বে সেরূপ ছিল না। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা, তখন ভূপৃষ্ঠের উত্তর অংশে ছিল **আঙ্গারাল্যাণ্ড** ও দক্ষিণ অংশে **গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড** নামে দুইটি বিরাট

অতি প্রাচীনকালে স্থলমণ্ডলের অবস্থা সম্ভবতঃ এরূপ ছিল

ভূভাগ। দক্ষিণের গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড কালক্রমে ভাঙ্গিয়া দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত (দক্ষিণ অর্ধাংশ), অস্ট্রেলিয়া ও অ্যান্টার্কটিকা ভূভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের আকৃতি, ভূগঠন ও বিভিন্ন প্রকার শিলা সম্পর্কে মিল এবং আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী আটলান্টিক মহাসাগরের আকৃতি প্রভৃতি উপরিলিখিত ধারণার

পক্ষে বিশেষ সহায়ক। স্থলমণ্ডলের অংশসমূহের নূতন অবস্থান আগেকার অংশসমূহের **স্থানত্যাগের** (Continental drift) ফলেই সম্ভবপর হইয়া থাকিবে।

ভূপৃষ্ঠের গতির প্রভাব -পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ প্রবল শক্তির (Internal forces) প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, অথবা ক্ষুদ্র অঞ্চলে, হঠাৎ বা ধীরে—নানাপ্রকার গতি হইতে পারে। ইহাদের সাধারণ নাম **ডায়াস্ট্রফিজম** (Diastrophism)। তাহা অপেক্ষা ব্যাপক অর্থে টেকটনিক (Tectonic) শব্দ ব্যবহৃত হয়। কারণ, অগ্ন্যুদ্গিরণও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ভূপৃষ্ঠের **অকস্মাৎ** বা হঠাৎ পরিবর্তনের রূপ দুইটি—(১) **ভূমিকম্প** ও (২) ভূগর্ভ হইতে **আগ্নেয় পদার্থের উদ্গিরণ** (Vulcanicity)। আবার **ধীরে** এবং বহুদূর **বিস্তীর্ণ অংশে** পরিবর্তনেরও রূপ দুইটি। তন্মধ্যে একটি গতি **অনুভূমিক** (Horizontal) বা ভূত্বকের সহিত স্পর্শক (Tangent) স্বরূপ। এপ্রকার গতি (**Orogenic**) অনুসারে দীর্ঘ কিন্তু সঙ্কীর্ণ অঞ্চলে শিলাসমূহ তরঙ্গায়িত হইয়া **বলিত** বা **ভঙ্গিল পর্বতের** (Fold mountain) সৃষ্টি হয়। আর দ্বিতীয় গতি **ঊর্ধ্বাধঃ**, অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে যে-কোন ব্যাসার্ধ অনুসারে (radially) **উপরে** বা **নীচের দিকে** (upwards or downwards)। এরূপ (**Epeirogenic**) গতিবশতঃ ভূপৃষ্ঠের ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ অংশ আগেকার অবস্থা হইতে উন্নত বা অবনত হইয়া পড়ে। এক্ষেত্রে শিলাসমূহ অল্পবিস্তর কাৎ বা হেলান অবস্থায় থাকিতে পারে, কিন্তু তরঙ্গায়িত বা ভাঁজ (folded) হয় না। বহু **মালভূমি** অঞ্চলে এই অবস্থা দেখা যায়। দাক্ষিণাত্য মালভূমির পশ্চিম অংশ এরূপ **উন্নয়নের** উদাহরণ। (এখানকার পশ্চিম অংশে সুরাটের নিকট লাভার উপরিভাগে চুনাপাথরের অবস্থিতি একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।) অপরদিকে কচ্ছের রন অঞ্চলে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পের ফলে অবনয়ন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ স্থলভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া, মহারাষ্ট্রের বোম্বাইয়ের পাশে এবং তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলির নিকট সমুদ্রের কতক অংশে বনের অবস্থিতি ভূভাগের **অবনয়নের** উদাহরণ।

আগ্নেয় পদার্থের উদ্গিরণ

ভূপৃষ্ঠের রূপ

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে আছে ভূমিরূপের নানা বৈচিত্র্য। তবে ভূমিরূপ (Terrain types or elements or landforms) মোটামুটি হিসাবে তিন ভাগে বিভক্ত—(ক) উচ্চভূমি (পাহাড়, পর্বত), (খ) মালভূমি ও (গ) সমভূমি। ইহাদের মধ্যে উচ্চ পর্বত ও উচ্চ মালভূমির আয়তন ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১৮%, নিম্ন মালভূমির আয়তন প্রায় ১৮%, পাহাড়ের আয়তন প্রায় ১০% এবং সমভূমির আয়তন প্রায় ৫৪%। সমভূমির মধ্যে আবার অর্ধেকের কম (ভূপৃষ্ঠের ২৪%) প্রকৃত সমভূমি এবং বাকী অংশ (ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৩০%) উন্নত (১৮০মির অধিক উচ্চ) সমভূমি। ইহাদের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(ক) সিল্ড ও মালভূমি

সিল্ড—বৈজ্ঞানিকগণের মতে পৃথিবীর স্থলমণ্ডলের অন্তর্গত মহাদেশসমূহের কতক অংশ অতিপ্রাচীন। উত্তর গোলার্ধের বহু স্থান প্রাচীন **আঙ্গারাল্যাণ্ডের** ও দক্ষিণ গোলার্ধের অনেক জায়গা প্রাচীন **গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের** অংশ। এসকল প্রাচীন অংশ আদিকাল হইতে প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। তবে ইহাদের পাশে বহু কাল ধরিয়া পলি সঞ্চিত হইয়া বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চল সৃষ্টি হইয়াছে, কতক অংশে পর্বতও সৃষ্টি হইয়াছে। **প্রাচীন** এবং **প্রায় অনড়** বা **অপরিবর্তিত অঞ্চলসমূহকে** (Rigid masses) বলা হয় **সিল্ড** (Shield or Major or Continental blocks)। এরূপ কতক অংশ বিভিন্ন খনিজ সম্পদের জন্য বিখ্যাত।

পূর্ব গোলার্ধে এশিয়া মহাদেশের উত্তর অংশে **সাইবেরিয়াতে** (Siberian platform) এরূপ অংশের উপরিভাগে সঞ্চিত হইয়াছে পরবর্তী পাললিক শিলা। এশিয়াতে **চীনের** পূর্বদিকের কতক অংশ, ভারতের **দাক্ষিণাত্য মালভূমি** অঞ্চল ও **আরব**; **আফ্রিকার** প্রায় সমুদয় অংশ এবং **অস্ট্রেলিয়ার** মধ্য ও পশ্চিম অংশ এরূপ প্রাচীন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ইউরোপের উত্তরপশ্চিম অংশে বাল্টিক সাগরের আশপাশের এরূপ অঞ্চল **বাল্টিক সিল্ড** নামে পরিচিত। তথাকার রাশিয়ার অন্তর্গত (বাল্টিক সাগরের পূর্বদিকের) অংশের উপরিভাগে সঞ্চিত হইয়াছে প্রচুর আধুনিক পাললিক শিলা। সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডে প্রাচীন শিলাই ভূপৃষ্ঠে সুস্পষ্ট।

পশ্চিম গোলার্ধে উত্তর আমেরিকার উত্তর অংশের এরূপ প্রাচীন অঞ্চল **ক্যানাডিয়ান** বা **লরেন্সীয়ান সিল্ড** নামে পরিচিত। দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যভাগ হইতে উত্তরপূর্বদিকে আছে **ব্রেজিল** ও **গিয়ানার** মালভূমি অঞ্চল।

কুমেরুর চতুষ্পার্শ্ববর্তী **অ্যান্টার্কটিক ভূভাগও** (Antarctic shield) এই জাতীয় প্রাচীন অঞ্চলের অন্তর্গত।

মালভূমি—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল (ভূ-পৃষ্ঠের ২৫% এর বেশী) মালভূমি। উৎপত্তি বা সৃষ্টির কারণ, উচ্চতা, আয়তন, উপরিভাগের অবস্থা প্রভৃতি নানা বিষয়ে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর।

সৃষ্টির কারণ—ভূত্বকের প্রবল আন্দোলনের (Tetonic movement) ফলে পাহাড়, পর্বত সৃষ্টির সময় বিভিন্ন পর্বতের মাঝখানের অথবা পাশের কতক স্থান উঁচু হইয়া উচ্চ মালভূমির সৃষ্টি হয়। মধ্য-এশিয়াতে এবং উত্তর আমেরিকার পশ্চিম অংশে **পর্বতবেষ্টিত মালভূমি** (Intermont or Intermontane plateau) অধিক। ভূগর্ভ হইতে প্রবাহিত প্রচুর **লাভা** ভূত্বকের নীচে বা উপরে **সঞ্চিত** হইয়াও মালভূমি সৃষ্টি হয়। ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রাচীন উচ্চভূমি **ক্ষয়প্রাপ্ত** হইয়াও মালভূমি সৃষ্টি হয়। অস্ট্রেলিয়া ও আরবের মালভূমি ইহার উদাহরণ।

উচ্চতা—পৃথিবীর অধিকাংশ মালভূমি ১০০০ মিটারের কম উঁচু অর্থাৎ **নিম্ন মালভূমি**। আফ্রিকা, দাক্ষিণাত্য, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের মালভূমি এই শ্রেণীর। অপরদিকে এশিয়ার **পামির পৃথিবীর উচ্চতম মালভূমি**। পাশের তিব্বত মালভূমি, দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া মালভূমি প্রভৃতি **অতি উচ্চ** (৩৫০০ মিটারের অধিক উঁচু) **মালভূমি**। মধ্যএশিয়া এবং উত্তর আমেরিকার পর্বতবেষ্টিত মালভূমিও উচ্চ মালভূমি।

উপরিভাগের অবস্থা—পৃথিবীর অধিকাংশ মালভূমির উপরিভাগ **বন্ধুর** বা **অসমতল** (Undulating)। অপর দিকে অস্ট্রেলিয়ার মালভূমির অধিকাংশ দীর্ঘকাল অধিক ক্ষয়ীভবনের ফলে **প্রায় সমতল**। মালভূমি অঞ্চলের গঠন, উচ্চতা ও অসমান-ভাবে ক্ষয়ীভবনের ফলে (শিলার পার্থক্য, ক্ষয়কার্য সম্পর্কে নদী, জলস্রোত, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির পার্থক্য প্রভৃতি কারণে) কতক অংশ পরস্পর হইতে প্রায় **বিচ্ছিন্ন** বা আলাদাও হইয়া পড়ে। ছোটনাগপুর মাল-ভূমিতে এরূপ অবস্থা দেখা যায়। কতক বিচ্ছিন্ন ও অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের অবস্থা ছোট ছোট পাহাড়ের মত। আবার বিভিন্ন পর্বতশ্রেণীর দ্বারা প্রায় পরিবেষ্টিত অবস্থায়ও কতক মালভূমি দেখা যায়। মধ্যএশিয়াতে তারিম উপত্যকা, জুয়ডাম, জেকোয়ান প্রভৃতি এবং উত্তর আমেরিকাতে গ্রেট সল্ট লেক বেসিন, কলোরেডো বেসিন প্রভৃতি ইহাদের উদাহরণ। আর কতক মালভূমির ধারগুলি প্রায় খাড়া। ইহাদিগকে **অধিত্যকা** (Table land) বলা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা ও আরবের মালভূমি এই জাতীয়।
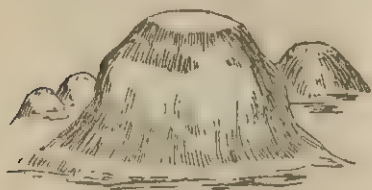
ক্ষয়প্রাপ্ত পাহাড়

মালভূমির প্রভাব—ভূমির উচ্চতার জন্য উচ্চ মালভূমির জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ, কিন্তু পর্বতবেষ্টিত মালভূমি অথবা পর্বতের অনুবাত (leeward) অংশে অবস্থিত মালভূমি প্রায় বৃষ্টিহীন। উত্তর আমেরিকার পর্বতবেষ্টিত মালভূমি ও মধ্য-এশিয়ার গোবি প্রভৃতি একারণে মরুপ্রায়। ভূমির উচ্চতা, বন্ধুরতা, অসুবিধাজনক জলবায়ু প্রভৃতি কারণে মালভূমিসমূহ লোকবসতির পক্ষে অসুবিধাজনক। তবে অধিক খনিজ সম্পদ আবিষ্কার এবং তাহাদের সাহায্যে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগের ফলে কতক মালভূমিতে লোকবসতি যথেষ্ট ঘন। ছোটনাগপুর মালভূমি ইহার উদাহরণ। মালভূমি অঞ্চলে অনেক নদীতে বাঁধ দিয়া জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ও জলসেচের ব্যবস্থা হইতেছে। ফলে, ঐ সকল স্থান ও আশপাশের বিস্তর উন্নতি হইতেছে। এবিষয়েও ছোটনাগপুরের উদাহরণ উল্লেখযোগ্য দামোদর উপত্যকা প্রকল্প ও ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের অধিকাংশ বাঁধ ও জলাশয় ছোটনাগপুরে।

(খ) পর্বত

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের পর্বতসমূহের মধ্যে আকৃতি, আয়তন, উচ্চতা, উৎপত্তি, উহাদের প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে বৈশিষ্ট্য অনেক। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের প্রধান পর্বতসমূহের মধ্যে ভারতের উত্তরে অবস্থিত **হিমালয়** সর্বপ্রধান। তারপর উত্তর আমেরিকার **রকি**, দক্ষিণ আমেরিকার **আন্দিজ**, ইউরোপের **আল্পস**, অস্ট্রেলিয়ার **গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ**। এই পর্বতগুলি বিভিন্ন মহাদেশের অন্তর্গত

প্রধান পর্বতমালা

হইলেও ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে মিল আছে। যেমন, অবস্থিতি হিসাবে রকি ও আন্দিজ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম অংশে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত, আর গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব অংশে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। হিমালয় ভারতের

উত্তর সীমাতে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। ইহার প্রায় সমসূত্রে আল্পস ইউরোপের দক্ষিণ অংশে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। উৎপত্তি হিসাবে ইহারা ভঙ্গিল জাতীয় পর্বত এবং বয়স হিসাবে আধুনিক (Young fold mountains)।

(১) **ভঙ্গিল পর্বত** (Fold mountain)—পৃথিবীর আধুনিক প্রধান পর্বতসমূহ যে সকল স্থানে অবস্থিত বহুপূর্বে তথায় ছিল অতিদীর্ঘ **অগভীর সমুদ্র** (Geosyncline)। যুগ যুগ ধরিয়া তথায় যে সকল পলি সঞ্চিত হইয়াছে তাহাদের গভীরতা বহু হাজার মিটার। একদিকে এভাবে পাললিক শিলার সৃষ্টি, অন্যদিকে বহুকাল যাবৎ ভূগর্ভের প্রবল আন্দোলন (Tectonic movement) ও প্রবল চাপের ফলে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া এসকল ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি হইয়াছে (Diastrophic origin)। আর এই সমুদয় অঞ্চল (Orogenic belt) ভঙ্গিল জাতীয় পর্বত সৃষ্টির পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী বলিয়া গণ্য।

এই পর্বতসমূহের সৃষ্টি বা উৎপত্তি সম্পর্কে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ এগুলিই **সম্ভাব্য কারণ** হিসাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন, পৃথিবীর মধ্যভাগের তুলনায় ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা কম। সুতরাং মধ্যভাগের উপাদান-সমূহ যে হারে সঙ্কুচিত হইতেছে, উপরের শীতল অংশ সেভাবে সঙ্কুচিত হইতে পারে না। ফলে, ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশের শিলাসমূহের উপর চাপের পরিমাণ খুব বেশী। বারে বারে প্রবল **অনুভূমিক পার্শ্বচাপের** (Horizontal or lateral pressure) ফলে কোমল শিলাতে ভাঁজ সৃষ্টির সুযোগ অধিক। এবিষয়ে মহাদেশীয় স্থান পরিবর্তন (Continental drift), ভূগর্ভের প্রবল ভূ-আন্দোলন প্রভৃতির প্রভাবও খুব বেশী সহায়ক।
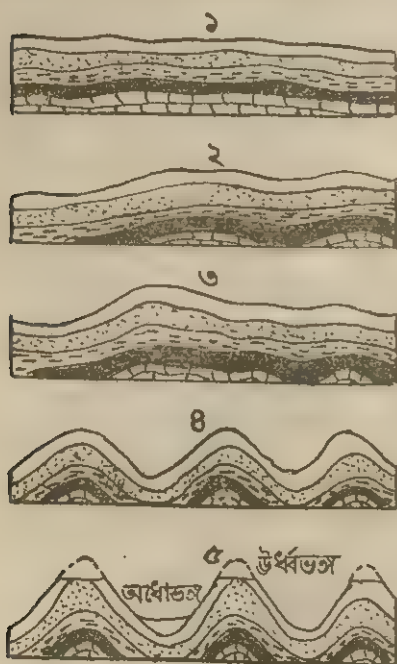
ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টির বিভিন্ন অবস্থা

ভাঁজগুলি (Folds) সহজ বা সরল হইলে দুইটি উঁচু শ্রেণীর বা **ঊর্ধ্ব-ভঙ্গের** (Anticlines) মাঝখানে একটি নীচু অংশের বা **অধোভঙ্গের** (Syncline) সৃষ্টি হয়। অধিক ভাঁজবিশিষ্ট

অংশে বিভিন্ন শিলাস্তরে প্রচুর চ্যুতি বা ফাটলের সৃষ্টি নিতান্ত স্বাভাবিক বিষয়। এমন কি, ঐরূপ কতক অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। অপর দিকে ভূগর্ভ হইতে কতক আগ্নেয় শিলা ঐরূপ দুর্বল অংশের মধ্যদিয়া উৎক্ষিপ্ত হইতে পারে বা ভূপৃষ্ঠের নীচেও সঞ্চিত হইতে পারে। একারণে **হিমালয়, আল্পস, রকি** প্রভৃতি প্রধান পর্বতসমূহের বিভিন্ন অংশে আগ্নেয় শিলাও প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। রূপান্তরিত শিলাও আছে। তাই এসকল পর্বতকে **মিশ্র পর্বত** বলা যাইতে পারে. আফ্রিকার উত্তরপশ্চিম অংশের **আটলাস,** ফ্রান্সের উত্তরপূর্ব অংশের **জুরা** প্রভৃতি পর্বতে কেবল ভঙ্গিল পর্বতেরই লক্ষণ সুস্পষ্ট।

(২) **স্তূপ পর্বত** (Block mountain)—ভূগর্ভে প্রবল আন্দোলনের ফলে কঠিন শিলাদ্বারা গঠিত অঞ্চলে বহু ফাটল বা চির সৃষ্টি হয়। ভূপৃষ্ঠ হইতে নীচের দিকে এরূপ **ফাটল** (Fault) কখন কখন বেশ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। কখন কখন বিভিন্ন ফাটলের মাঝখানের অংশগুলি বিভিন্ন টুকরাতেও (block) বিভক্ত হইতে পারে। পরবর্তী প্রবল ভূ-আন্দোলনের ফলে ফাটলের এক দিকের অংশ অপর দিকের অংশ হইতে পৃথক্ বা বিচ্ছিন্ন ও তথায় **খাড়া ঢালের** মত অবস্থার (Fault escarpment) সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ আরও ভূ-আন্দোলনের ফলে আগেকার বিচ্ছিন্ন অংশসমূহের মধ্যে কতক অংশ অন্য অংশের তুলনায় **উন্নত** (Upthrust) হইতে পারে। আবার কতক অংশ **অবনত** হইতে বা নীচের দিকে বসিয়া যাইতে (Down-thrust) হইতে পারে। পাশাপাশি বিভিন্ন অংশ অসমানভাবে উঁচুনীচু হইতে পারে, কতক অংশ কাৎ বা **হেলানো** ভাবেও থাকিতে পারে (Warping or tilting) এভাবে যদি কোন স্থান উঁচু হইয়া পর্বতের আকার ধারণ করে তবে তাহাকে **স্তূপ পর্বত** বা **চ্যুতি পর্বত** (Block or Fault mountain or Horst) বলে। আর যদি কোন অংশ এভাবে বসিয়া গিয়া উপত্যকাতে (নিম্নভূমি) পরিণত হয় তবে তাহাকে **গ্রস্ত উপত্যকা** (Rift Valley) বলা হয়। দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি, আন্নামালাই, স্কটল্যাণ্ডের গ্র্যাম্পিয়ানস প্রভৃতি স্তূপ পর্বত। আর জর্ডন নদীর উপত্যকা, আফ্রিকার দক্ষিণপূর্ব অংশের হ্রদ অঞ্চলের নিম্নভূমি গ্রস্ত উপত্যকার উদাহরণ। ভারতের নর্মদা ও তাপ্তীর উপত্যকাও সম্ভবতঃ গ্রস্ত উপত্যকা।

পর্বতের প্রভাব—কোন দেশের সীমাতে উঁচু ও দীর্ঘ পর্বতশ্রেণী থাকিলে তাহা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। পর্বত অঞ্চলের পাদদেশ হইতে ক্রমশঃ

উপরদিকে জলবায়ুর এবং সেই সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্ভিদ, কৃষি প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে উচ্চ পর্বতের প্রচুর বৃষ্টির জল ও বরফগলা জল বহু নদনদীর উৎস। পার্বত্য অঞ্চলের কতক নদী জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ও জলসেচের পক্ষেও উপকারী। যাতায়াত, জীবিকা অর্জন প্রভৃতি বিষয়ে অসুবিধার জন্য পার্বত্য ভূমিতে লোকবসতি কম, তবে তথাকার লোকেরা সাধারণতঃ সাহসী, বীর ও কষ্টসহিষ্ণু। বিভিন্ন পাহাড়, পর্বতের গায়ে সুবিধাজনক অংশে বহু বিখ্যাত শৈলনিবাস আছে। ভারতের কাশ্মীর উপত্যকা, সিমলা, দার্জিলিং, ইউরোপের সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সমগ্র পৃথিবীর লোককে আকর্ষণ করে।

আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্প

ভূপৃষ্ঠের অকস্মাৎ বা হঠাৎ পরিবর্তন সম্পর্কে আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্পের প্রভাব অতুলনীয়। তবে প্রবল বন্যা, অত্যন্ত প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত ঝড়, হিমবাহ, হিমানী সম্প্রপাত প্রভৃতি দ্বারাও কখন কখন ভূপৃষ্ঠের কতক অংশের হঠাৎ বিস্তর পরিবর্তন (**ক্ষয় বা ধ্বংসসাধন**) হয়।

(১) **আগ্নেয়গিরি সৃষ্টির কারণ**—আমাদের পৃথিবী নানাজাতীয় উপাদান দ্বারা গঠিত। ভূপৃষ্ঠ হইতে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে উপাদানসমূহ ক্রমশঃ অধিক গুরু বা ভারী এবং তাহাদের উত্তাপও ক্রমশঃ অধিক। ফলে, অভ্যন্তরের প্রচণ্ড উত্তাপে তথাকার উপাদানগুলির গলন্ত বা তরল অবস্থায় থাকা স্বাভাবিক মনে হইলেও চারিপাশের উপাদানসমূহের চাপে এগুলি **স্থিতিশীল**। তবে কখনও প্রচণ্ড ভূ-আন্দোলন বা অন্য কোন কারণে ভূগর্ভে চাপের পরিবর্তন ঘটিলে তথাকার উপাদানসমূহের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়। তখন অভ্যন্তরের উত্তপ্ত উপাদানসমূহ ভূগর্ভ ও ভূপৃষ্ঠের ফাটল, চির বা অন্যান্য দুর্বল অংশের মধ্যদিয়া বাহিরে আসিতে চেষ্টা করে। ইহাদের সহিত অনেক কঠিন পদার্থ, গ্যাসীয় পদার্থ প্রভৃতিও মিশ্রিত থাকে। এই সমুদয় পদার্থের এভাবে বাহিরে আসিবার প্রক্রিয়াকে **আগ্নেয়** পদার্থের **উদ্গিরণ** (Vulcanicity) বলা হয়।

নানা জাতীয় (কঠিন, তরল, বাষ্পীয় প্রভৃতি) উত্তপ্ত পদার্থ ভূপৃষ্ঠের সামান্য নীচে সঞ্চিত হয়। ঐ সঞ্চয়স্থান বা উদ্গিরণের মুখ্য কেন্দ্রকে বলা হয় **আগ্নেয় গহ্বর** (Magma chamber)। তথা হইতে ঐ সকল পদার্থ ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন দুর্বল অংশের (ফাটল, চির প্রভৃতি) মধ্য দিয়া বাহিরে আসিবার পথে কখন কখন বাধা পায় এবং ভূত্বকের নীচেই কোথায়ও সঞ্চিত হইতে বাধ্য হয়। সেখানে ইহাদের আকৃতি নানারূপ। যেমন, উল্লম্ব (Vertical) ফাটলের মধ্যে এসকল পদার্থের আকৃতি হয় প্রায় **স্তম্ভের** (Dykes) মত। কখনও বা উত্তপ্ত উপাদানসমূহ কতক দুর্বল অংশে **অনুভূমিক**

(Horizontal) ভাবে থাকিতে বাধ্য হয়। এরূপ অবস্থাকে **সিল** (Sill) বলে। কখনও বা উপাদানসমূহ **স্তূপের** (Dome) **আকারে** সঞ্চিত হয় (Laccolith)। কখনও বা এরূপ সঞ্চয়ের পরিমাণ এত বিস্তৃত এবং গভীর হয় যে উহাদের কতক অংশ অন্যান্য অংশের তুলনায় বহু পূর্বে শীতল হয় এবং তথায় শিলাসমূহের রূপান্তরও ঘটে। এরূপ অবস্থা **ব্যাথোলিথ** (Batholiths) নামে পরিচিত। ভূত্বকের উপরের অংশের ক্ষয়ীভবনের ফলে এসকল অবস্থা মানুষ দেখিতে পায়। সেজন্য এগুলি **অভ্যন্তরে উৎপন্ন** (Intrusive) আগ্নেয় শিলা রূপে পরিচিত।

কখন কখন অভ্যন্তরের উত্তপ্ত উপাদানসমূহ ভূত্বকের বিভিন্ন দুর্বল অংশের মধ্যদিয়া ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পৌছে। তখন এগুলি বহুদূর পর্যন্তও **উৎক্ষিপ্ত** (Extrusion) হয়। প্রথমে এগুলি নির্গমন পথের বা জ্বালামুখের চারিদিকে উত্তপ্ত তরল পদার্থরূপে সঞ্চিত হয়। গ্যাসীয় পদার্থ, ধূম প্রভৃতি বহুদূরেও ছড়াইয়া পড়ে। এসকল জিনিস ক্রমশঃ শীতল ও ঘনীভূত হয়। এভাবে লাভাপ্রবাহ সঞ্চয়ের ফলে যে পর্বতের সৃষ্টি হয়, তাহাই **আগ্নেয়গিরি** (Volcano)। আর একই কারণে ইহাদিগকে **সঞ্চয়জাত পর্বত**ও (Mountaion of Accumulation) বলে। এইরূপ পর্বতের যে প্রধান মুখ দিয়া এসকল জিনিস বাহিরে আসে তাহাকে **প্রধান জ্বালামুখ** (Crater) এবং আশপাশের অন্যান্য মুখগুলিকে **গৌণ** বা **অপ্রধান জ্বালামুখ** (Secondary crater) বলে। আগ্নেয় পর্বতের জ্বালামুখের মধ্য দিয়া উৎক্ষিপ্ত না হইয়া ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন ফাটলের মধ্যদিয়া উত্তপ্ত লাভা-প্রবাহরূপেও বাহিরে আসিতে পারে (**Fissure eruption**)। দাক্ষিণাত্য মালভূমির লাভা সঞ্চয় ইহার উদাহরণ। (এখানে কোন আগ্নেয়গিরি নাই।) আইসল্যাণ্ড এবং নিউ জীল্যাণ্ডে সম্প্রতিও এরূপভাবে কিছু আগ্নেয় পদার্থ নির্গত হইয়াছে।

আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের চারিদিকে সঞ্চিত লাভাপ্রবাহ

আগ্নেয়গিরির শ্রেণীবিভাগ—কতক আগ্নেয়গিরি অঞ্চলের নিম্ন অংশে এখনও আগ্নেয় পদার্থ সঞ্চয়ের লক্ষণ দেখা যায় এবং যে-কোন সময়ে অগ্ন্যুৎপাতের (Volcanic eruption) যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। এগুলি **জীবন্ত** (Active) আগ্নেয়গিরি। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রায় ৪০০ এই জাতীয় আগ্নেয়গিরি আছে। এরূপ কতক আগ্নেয়গিরি হইতে মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎপাত হয়। এগুলি **সবিরাম** (Intermittent) আগ্নেয়গিরি। ইটালির বিসুভিয়াস, ইন্দোনেশিয়ার বালি-দ্বীপের মাউণ্ট আগুঙ্গ (Mt. Agung) প্রভৃতি এই জাতীয় আগ্নেয়গিরি। আর কতক আগ্নেয়গিরি হইতে প্রায় সর্বদা ভস্ম, লাভা প্রভৃতি নির্গত হয়। সেগুলি **অবিরাম** (Incessant) **আগ্নেয়গিরি**। ইটালির দক্ষিণদিকের লিপারি দ্বীপের স্ট্রম্বলি ইহার উদাহরণ। কতক আগ্নেয়গিরি হইতে বহুকাল অগ্ন্যুৎপাত হয় নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে এই উৎপাত হইতে পারে। এরূপ আগ্নেয়গিরি **সুপ্ত** (Dormant)। জাপানের ফুজিয়ামা এই জাতীয়। আর কতক আগ্নেয়গিরি হইতে কোন কালেই অগ্ন্যুৎপাতের ভয় নাই। সেগুলি **মৃত** (Extinct) আগ্নেয়গিরি। দক্ষিণ আমেরিকার চিম্বোরাজো এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

জীবন্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়া অগ্ন্যুদ্গিরণ হইতেছে

আগ্নেয়গিরির বিস্তৃতি—পৃথিবীর দুইটি অঞ্চলে আগ্নেয়গিরিসমূহ বহুদূর বিস্তৃত। ঐ সকল অংশে ভূপৃষ্ঠ দুর্বল ও তাহাদের আশপাশে ভঙ্গিল পর্বত বিস্তৃত। আগ্নেয়গিরির
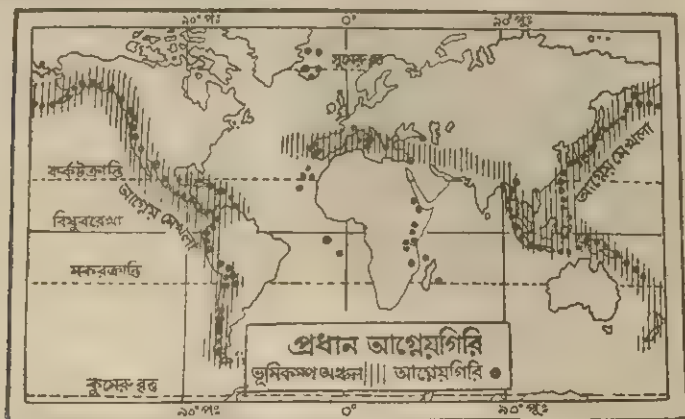
প্রথম সারিটি দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ সীমার হর্ন অন্তরীপ হইতে ঐ মহাদেশের পশ্চিম উপকূল ও উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল দিয়া উত্তরদিকে আলাস্কা পর্যন্ত

বিস্তৃত। তথা হইতে এলিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ হইয়া এশিয়ার পূর্বদিকে জাপান পর্যন্ত এবং সেখান হইতে দক্ষিণে ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার পূর্বদিকের বিভিন্ন দ্বীপ হইয়া নিউ জীল্যাণ্ড পর্যন্ত এই শ্রেণী বিস্তৃত। প্রশান্ত মহাসাগরকে প্রায় ঘিরিয়া আছে বলিয়া এই আগ্নেয়গিরিশ্রেণীকে **প্রশান্ত মহাসাগরের আগ্নেয় মেখলা** (Fiery ring of the Pacific) বলা হয়। এখানকার শাখাপ্রশাখা ভারত মহাসাগর এবং য়্যাণ্টার্কটিকাতেও বিস্তৃত।

আগ্নেয়গিরিসমূহের **দ্বিতীয় সারি** আইসল্যাণ্ড হইতে ইউরোপের পশ্চিমদিক দিয়া আফ্রিকার উত্তরপশ্চিম অংশের নিকট (এজোর্স, কেপ ভার্ড প্রভৃতি দ্বীপ) পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপর একশাখা ভূমধ্যসাগরের মধ্যদিয়া পূর্বদিকে আসিয়া আফ্রিকার পূর্ব অংশ দিয়া দক্ষিণে বিস্তৃত। অপর শাখা আটলাণ্টিক মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপ হইয়া পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রভাব—সাধারণতঃ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ধ্বংসের প্রতীক। ইটালির বিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গিরণের ফলে পম্পে ও হারকুলেনিয়াম নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল। অগ্ন্যুৎপাতের সময় আশপাশে সমুদ্রেও ভীষণ ঝড় ও অন্যভাবে ধ্বংসলীলা সাধিত হয়। কখন কখন অগ্ন্যুৎপাতের সহিত উৎক্ষিপ্ত লাভা, ভস্ম প্রভৃতি সমুদ্রে সঞ্চিত হইয়া দ্বীপও তৈরী হইতে পারে।

(২) **ভূমিকম্প**—কখন কখন ভূত্বকের কতক অংশ হঠাৎ কাঁপিয়া উঠে। গাছপালা, পুকুরের জল, কুঁড়ে ঘর, বড় দালান—সবই কাঁপে। ভূপৃষ্ঠের কোন কারণ বশতঃ এরূপ হয় না। ইহার প্রকৃত কারণ ও কম্পনের বেগ প্রভৃতি জানিতে পারা যায় **ভূকম্পলেখ যন্ত্রের** (Seismograph) যন্ত্রের সাহায্যে। (অবশ্য, তাহাও অত্যন্ত প্রচণ্ড এবং নিতান্ত মৃদু ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে সফল হয় না।) সাধারণতঃ ভূত্বক্ (উপরিভাগ) হইতে ১৫-১৬ কিমি * নীচে এরূপ কম্পনের উৎপত্তি হয় এবং তাহাকে বলে **ভূমিকম্পের কেন্দ্র**। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের উপাদানসমূহ অল্পবিস্তর স্থিতিস্থাপক (Elastic)। সুতরাং ভূমিকম্পের কেন্দ্র হইতে কম্পনের **স্পন্দন** (Vibrations) **তরঙ্গের মত** চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে. ইহার বেগ ভূপৃষ্ঠে প্রতি সেকেণ্ডে গড়ে ৫-৮ কিমি। ভূপৃষ্ঠের তুলনায় ক্রমশঃ অধিক ভিতরে তরঙ্গের গতিবেগ বেশী। কেন্দ্রের সোজাসুজি (Vertically) উপরে ভূত্বকের উপরিভাগে কম্পনের বেগ সর্বাপেক্ষা অধিক। ঐ স্থানকে বলে ভূমিকম্পের **উপকেন্দ্র** (Epicentre)। তথা হইতে ক্রমশঃ

* পৃথিবীর অভ্যন্তরে ভূপৃষ্ঠ হইতে কয়েক শত কিমি নীচেও ভূমিকম্পের উৎপত্তি হইতে পারে। একই সময়ে অনুভূত বিভিন্ন স্থানের ভূমিকম্পের বিবরণ (Seismic records) মিলাইয়া তাহার কেন্দ্র স্থির করা হয়।

দূরের দিকে কম্পনের বেগ কম। এরূপ কম্পন কয়েক সেকেণ্ড মাত্র অনুভূত হয়। তবে কখন কখন এক সঙ্গে বা বারে বারে কয়েক মিনিটও কম্পন অনুভূত হইতে পারে।

ভূমিকম্পের কারণ—প্রচণ্ড ভূ-আন্দোলনের ফলে ভূগর্ভের শিলাসমূহে অনেক চ্যুতি (Fault) সৃষ্টি হয়। কখন কখন ভূগর্ভে প্রবল ঘর্ষণেরও (Friction) সৃষ্টি হয়। অভ্যন্তরের কোন **চ্যুতিরেখা** অনুসারে শিলাসমূহের হঠাৎ **স্থানভ্রষ্ট** (slipping) হওয়াই ভূমিকম্পের সবপ্রধান কারণ। সাধারণতঃ চ্যুতিরেখার দুই পাশে খুব অল্প (কয়েক মিটার) পরিসর স্থানের শিলা এভাবে স্থানচ্যুত হয়। তবে ঐরূপ অঞ্চলের দৈর্ঘ্য বহু কিমি হইতে পারে। এবং তাহার ফলে অত্যন্ত প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইতে পারে। ভূ-আন্দোলনের ফলে ভূগর্ভের কোন স্থান ধসিয়া পড়িলে (Landslides), সমুদ্রের তলদেশের কতক অংশ ধসিয়া গেলে (Submarine slides), ভূগর্ভস্থ কোন গহ্বরের উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া পড়িলে বা অনুরূপ অন্য কোন কারণেও ভূমিকম্প হইতে পারে। তবে এরূপ কারণের গুরুত্ব কম এবং তাহার ফলে প্রবল ভূমিকম্প হয় না। তাহাছাড়া অগ্ন্যুদ্গিরণের অনুকূল অবস্থাতেও আশপাশে ভূমিকম্প হইতে পারে।

ভূপৃষ্ঠের কোন অংশ ধসিয়া বা ভাঙ্গিয়া পড়িলে, এমন কি পার্বত্য অঞ্চলে হিমানী সম্প্রপাতের ফলে আশপাশে যে কম্পন হয় তাহা ভূমিকম্প নহে। (Earth tremor বা ভূপৃষ্ঠের সামান্য কম্পন মাত্র।)

ভূমিকম্পের তরঙ্গ তিন প্রকার। (১) **মুখ্য তরঙ্গ** (Primary or P waves) এগুলি অনুভূমিক (Longitudinal); ভূমিকম্পের কেন্দ্র হইতে বিভিন্ন সরলরেখা অনুসারে চারিদিকে বিস্তৃত হয়। ইহাদের গতিবেগ অন্যান্য তরঙ্গের তুলনায় অধিক। (২) **গৌণ তরঙ্গ** (Secondary or S waves)—এগুলি মুখ্য তরঙ্গকে অনুসরণ করে। ইহাদের গতিবেগও কম। কিন্তু ইহাদের ধ্বংসকারী শক্তি অধিক। (৩) **পরবর্তী তরঙ্গ** (L waves)—মুখ্য ও গৌণ তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠে পৌঁছিবার পর তথায় একপ্রকার নূতন তরঙ্গের সৃষ্টি হইতে পারে। ইহাদের গতিবেগ অন্য দুই প্রকার তরঙ্গের চেয়ে কম, কিন্তু ধ্বংসকারী শক্তি যথেষ্ট প্রবল।

ভূমিকম্পের অঞ্চল—ভূপৃষ্ঠের কয়েকটি দুর্বল অংশে (Seismic belt) অধিক ভূমিকম্প হয়। যেমন—হিমালয়, রকি প্রভৃতি ভঙ্গিল পর্বতের পাদদেশে; জাপান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের খাড়া উপকূলে; কতক খাড়া পাহাড়ের (মেঘালয়ের খাসিয়া, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি) প্রবণভূমিতে (Escarpment) এবং আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে।

প্রভাব—ভূমিকম্পের ফলে **পার্বত্য অঞ্চলে** ভূমির ধ্বস হয়। বিরাট প্রস্তরখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যন্ত ক্ষুদ্র পাথর, নুড়ি প্রভৃতি এভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ার ফলে নীচে সঞ্চিত হইতে পারে। ভূপৃষ্ঠের আগেকার চ্যুতিরেখা বরাবর নূতন ফাটল বা চ্যুতি-

রেখার সৃষ্টি হইতে পারে, কোথাও আগ্নেয়গিরির নূতন জ্বালামুখ সৃষ্টি হইতে পারে। ভূপৃষ্ঠস্থ কোন কোন ফাটলের মধ্যদিয়া বালুকা, কর্দম, উষ্ণ জল প্রভৃতি বাহিরে আসিতে পারে, কোথাও নূতন প্রস্রবণের সৃষ্টি হইতে পারে। আবার পুরানো প্রস্রবণ শুকাইয়া যাইতে পারে, নদীর গতি বন্ধ বা পরিবর্তিত হইতে পারে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে আসামে দিবাং নদীর (ব্রহ্মপুত্রের উপনদী) গতি আংশিকভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে।

ভূমিকম্পের ফলে কচ্ছের একটি ক্ষতিগ্রস্ত অংশ

লোকালয় অর্থাৎ শহর, নগর, গ্রাম, পথঘাট, ক্ষেত্রখামারের পরিবর্তন সম্পর্কে ভূমিকম্পের প্রভাব অতীব ভয়াবহ। ১৯৩৪ খ্রীঃ বিহারের উত্তর অংশে ও ১৯৫৬ খ্রীঃ কচ্ছের অঞ্জর শহরে বহুস্থান সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত ও অনেক লোকের জীবনহানি হয়।

সমুদ্রের তলদেশে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে অত্যন্ত (১৫-১৮মি পর্যন্ত) উঁচু তরঙ্গের এবং বন্যার সৃষ্টি হয়। কখন কখন সমুদ্রে নূতন দ্বীপেরও উৎপত্তি হয়।

অনুশীলনী

১। শিলা কাহাকে বলে? উৎপত্তি অনুসারে শিলাসমূহ কয় ভাগে বিভক্ত? প্রত্যেক প্রকার শিলার দুইটি উদাহরণ দাও। ২। আগ্নেয় শিলা কাহাকে বলে? ইহার এরূপ নামকরণের কারণ কি? ইহা আর কোন্ কোন্ নামে পরিচিত? এরূপ শিলার বৈশিষ্ট্য কি? দুইটি আগ্নেয় শিলার নাম বল ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ৩। পাললিক শিলা কাহাকে বলে? এপ্রকার শিলা কিভাবে সৃষ্টি হয়? ইহাদের আর কি কি নাম আছে? দুইটি পাললিক শিলার নাম বল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৪। জীবাশ্ম কাহাকে বলে? কোন্ জাতীয় শিলাতে ইহা দেখা যায়? ৫। রূপান্তরিত শিলা কাহাকে বলে? ইহার এরূপ নামকরণের কারণ কি? দুইটি রূপান্তরিত শিলার নাম বল এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৬। শিলার মধ্যে কোন্ কোন্ খনিজ পদার্থ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়? তাহাদের মধ্যে তিনটির নাম লিখ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ

দাও। ৭। খনিজ পদার্থের মধ্যে কোন্ কোন্ রাসায়নিক উপাদানের পরিমাণ অধিক? তাহাদের নাম লিখ। ৮। ভূপৃষ্ঠে কয়টি গতি আছে? ভূপৃষ্ঠের অনুভূমিক গতি কোন্‌টি? তাহার ফলে ভূপৃষ্ঠের কি অবস্থা হয়? ঊর্ধ্বাধঃ গতি কোন্‌টি? তাহার ফলে ভূপৃষ্ঠের কি পরিবর্তন হয়? ৯। ভূপৃষ্ঠের অনড় বা প্রায় অপরিবর্তিত অংশ কোথায় কোথায় দেখা যায়? ক্যানাডা ও ইউরোপের উত্তরপশ্চিম অংশের এইরূপ অঞ্চলের কোন্‌টির কি নাম? ১০। মালভূমি সাধারণতঃ কোন্ কোন্ কারণে সৃষ্ট হয়? কোন্ মহাদেশে মালভূমি সবচেয়ে বেশীদূর বিস্তৃত? পৃথিবীর কোন্ মালভূমি সবচেয়ে বেশী উঁচু? প্রায় সমতল মালভূমি, লাভাজাত মালভূমি ও পর্বতবেষ্টিত মালভূমি কোথায় কোথায় দেখা যায়? ১১। ভঙ্গিল পর্বত কাহাকে বলে? পৃথিবীর কোন্ কোন্ অংশে এই জাতীয় প্রধান পর্বত বর্তমান? উহাদের নাম কি? এরূপ পর্বত সৃষ্টির কারণ কি? ভারতে কোথায় এরূপ পর্বত আছে? তাহার নাম কি? ১২। ভূপৃষ্ঠে কোথায় কোথায় চ্যুতি বা ফাটল অধিক দেখা যায়? এদেশের কোন্ কোন্ পর্বতে এরূপ চ্যুতির প্রভাব অধিক? ১৩। আগ্নেয়গিরি কাহাকে বলে? এরূপ বলিবার কারণ কি? আগ্নেয়গিরি সাধারণতঃ কত শ্রেণীর? কোন্ কোন্ স্থানে ইঁহাদের সংখ্যা অধিক? ১৫। ভূমিকম্প কাহাকে বলে? ভূমিকম্পের কারণ কি? ঐ কারণ কিভাবে স্থির করা হয়?

তৃতীয় অধ্যায়

ভূত্বকের পরিবর্তন

পরিবর্তনকারী শক্তি ও পরিবর্তনের প্রণালী

ভূপৃষ্ঠের অসমতা ও তাহার পরিবর্তন—আমাদের পৃথিবী-গ্রহের বয়স সম্ভবতঃ ৫০০ কোটি বৎসর (বেশী বা কমও হইতে পারে)। এই **দীর্ঘ সময়ে** পৃথিবীর আকৃতি, রূপ প্রভৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রথম অবস্থায় পৃথিবী ছিল **উত্তপ্ত গ্যাসীয়** পদার্থ। এখন ইহা এক **কঠিন পদার্থ**। আগেকার **আঙ্গারাল্যাণ্ড** ও **গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড** লইয়া গঠিত পৃথিবী এখন **ছয়টি মহাদেশ ও অ্যান্টার্কটিকা** ভূভাগ লইয়া গঠিত। তাহাছাড়া **আগেকার** উঁচু পাহাড়, **পর্বত** (যেমন, ভারতের আরাবল্লী, বিন্ধ্য প্রভৃতি) ও **মালভূমির** মধ্যে কতক এখন অনেক পরিমাণে

ক্ষয়প্রাপ্ত। আবার **আগেকার নিম্নভূমি** অংশে সৃষ্ট হইয়াছে অনেক **উঁচু পর্বত।** তন্মধ্যে টেথিস সাগর অঞ্চলে হিমালয়ের উদাহরণ সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য।

তারপর ভূপৃষ্ঠে যেখানে যে পাহাড়, পর্বত, মালভূমি প্রভৃতি থাকুক না কেন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে তাহাদের **পরিবর্তন** ঘটিতেছে **প্রতিনিয়ত।** এবিষয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের **উপাদানসমূহের** মধ্যে নানাপ্রকার **বৈষম্য,** পরিবর্তনকারী **শক্তিসমূহের** মধ্যে অসামান্য **পার্থক্য** এবং **অতিদীর্ঘ** (৫০০ কোটি বৎসর) **পরিবর্তনকাল** প্রভৃতি সকল বিষয়েরই প্রভাব সুস্পষ্ট। ফলে, ভূপৃষ্ঠের অসমতা কখনও **অতিধীরে,** কখন বা **দ্রুত,** কখনও **অকস্মাৎ** পরিবর্তিত হইতেছে।
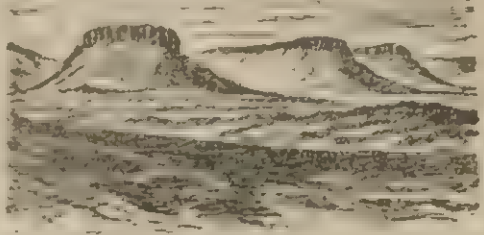
ব্যাসল্ট-গঠিত মালভূমি (আংশিক ক্ষয়প্রাপ্ত)

পরিবর্তনের রূপ—ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনের ফলে সাধারণতঃ অসমতা ক্রমশঃ দূর হইয়া সমপ্রায় বা সমভূমিতে পরিণত হয়। আর এবিষয়ে সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক ও ব্যাপক রূপ ভূপৃষ্ঠে সকলের উপরে মৃত্তিকার আবরণ সৃষ্টি।

পরিবর্তনের বিভিন্ন অবস্থা—পরিবর্তন হঠাৎ বা ধীরে যেভাবেই হয় না কেন, তাহা নিম্নলিখিত বিভিন্ন অবস্থাতে সাধিত হয়: (১) বিচূর্ণীভবন বা আবহবিকার ও ক্ষয়ীভবন, (২) অপসারণ বা প্রবহন এবং (৩) সঞ্চয়ন ও অবক্ষেপণ।

(১) **বিচূর্ণীভবন** বা **আবহবিকার** (Weathering)—ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের নানা প্রকার শিলার উপর বায়ুর উষ্ণতা, চাপ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, হিমবাহ প্রভৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। যেমন, অধিক তাপে শিলাসমূহ প্রসারিত এবং শীতে সঙ্কুচিত হয়। কাজেই যে সকল স্থানে দিবা রাত্রির ও শীত গ্রীষ্মের উষ্ণতার পার্থক্য খুব বেশী তথায় শিলাসমূহ ক্রমাগত একবার প্রসারিত ও একবার সঙ্কুচিত হয়। ফলে, শিলা নরম ও দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ চূর্ণবিচূর্ণ ও পৃথক হইয়া থাকে। মরু অঞ্চলে এই অবস্থা দেখা যায়। এপ্রকার পরিবর্তনকে শিলার **বিচূর্ণীভবন** বা **আবহবিকার** বলে। এই বিচূর্ণীভবন তিন প্রকারের যথা:—(অ) যান্ত্রিক বা সাধারণ আবহবিকার, (আ) রাসায়নিক আবহবিকার এবং (ই) জৈব আবহবিকার।

নিরক্ষীয় অঞ্চল, ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চল, নাতিশীতোষ্ণ সামুদ্রিক অঞ্চল প্রভৃতি **জলবায়ু অঞ্চলে** অধিক আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত এবং প্রচুর উষ্ণতার জন্য অধিক

রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন হয়। অপরদিকে মরু অঞ্চল ও শীতল অঞ্চলে অধিক যান্ত্রিক আবহবিকার হয়। জৈব আবহবিকার প্রায় সর্বত্রই হয়।

(অ) **যান্ত্রিক বা সাধারণ বিচূর্ণীভবন বা আবহবিকার** (Mechanical weathering or Disintegration)—মরু অঞ্চলে প্রধানতঃ বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার পার্থক্যের ফলে এবং পার্বত্য অঞ্চলে তুষার, বরফ প্রভৃতির কার্যের ফলে শিলাসমূহ ভাঙ্গিয়া খণ্ড-বিখণ্ড বা চূর্ণবিচূর্ণ (mainly physical change) হয়।

(ক) **উষ্ণতার প্রভাব**—শুষ্ক, নির্মেঘ স্থানে, বিশেষতঃ মরুভূমিতে, দিবারাত্রির এবং শীত ও গ্রীষ্মঋতুর উষ্ণতার পার্থক্য অধিক। সূর্যের অধিক উত্তাপে প্রস্তর, বালুকা প্রভৃতি অধিক উত্তপ্ত হয় ও বায়ুর উষ্ণতা দ্রুত বৃদ্ধি হয়। আর রাত্রিতে বিশেষতঃ শীতকালে তাপ বিকিরণের (Radiation) ফলে উষ্ণতা অনেক কমিয়া যায়। অনবরত এরূপ প্রক্রিয়ার ফলে শিলাসমূহ ক্রমাগত প্রসারিত ও দ্রুত সঙ্কুচিত হইতে থাকে। সেজন্য শিলাতে ফাটল সৃষ্টি হয় এবং তদনুসারে শিলা ভাঙ্গিয়া খণ্ড বিখণ্ড (Block disintegration) হয়। শিলাসমূহের উপরের ও নীচের অংশের মধ্যেও উষ্ণতা ও শীতলতার প্রভাব সম্বন্ধে পার্থক্য ঘটে। ফলে, উপরের কতক অংশ কখন কখন নীচের অংশ হইতে আল্‌গা বা আলাদা হইয়া পড়ে (Peel off)। আল্‌গা হওয়ার প্রক্রিয়ার (Exfoliation) ফলে বিচ্ছিন্ন শিলাখণ্ডের আকৃতি কখন কখন প্রায় গোল (Spheroidal weathering) হয়।

শিলাসমূহের উপাদান ও গঠন সম্পর্কে পার্থক্যের ফলে উহাদের উপর টানের পরিমাণ সম্বন্ধে পার্থক্য ঘটে (Complex strains)। তাহার ফলে কতক শিলা হঠাৎ ফাটিয়া যায় (Sudden fracture)। মোটা দানাযুক্ত উপাদান (Coarse grained or large crystalled) দ্বারা গঠিত শিলাসমূহ কখন কখন সন্ধ্যার পর ভীষণ শব্দে (বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার শব্দের মত) ফাটিয়া যায় ও ক্রমে **চূর্ণবিচূর্ণ** হয় (Granular disintegration)।

(খ) **তুষার** (Snow)—অধিক শীতে জল তুষারে পরিণত হয়। সাধারণতঃ উচ্চ পর্বত অঞ্চলে ও নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে শীতকালে রাত্রিতে এরূপ অবস্থা ঘটে। জল তুষারে পরিণত হইলে ইহার আয়তন (Volume) বৃদ্ধি হয়। সাধারণতঃ জলের আয়তনের তুলনায় তুষারের আয়তন প্রায় ৯% বেশী। কাজেই জলের তুলনায় তুষার দ্বারা শিলার উপর চাপ বৃদ্ধি হয়। তাহার ফলেও শিলা ফাটিয়া খণ্ড বিখণ্ড হয়। এই অবস্থায় কতক শিলার টুক্‌রাতে কোণ দেখা যায়। শিলার এপ্রকার টুকরা পাহাড়ের গা হইতে নীচের দিকে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া জমিয়া থাকিলে তাহাকে **স্ক্রী** (Scree) বা **ট্যালাস** (Tallus) বলে। যুক্তরাজ্যের হ্রদ অঞ্চল (Lake district), স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য অংশ প্রভৃতি স্থানে এরূপ অবস্থা দেখা যায়।

(গ) **বৃষ্টিপাত**—বৃষ্টির সময় জলবিন্দুর আঘাতে ভূত্বকের সামান্য ক্ষয়ীভবন হয়। মাটির উঁচু ঢিবি বা স্তূপের গায়ে দীর্ঘদিন বৃষ্টির পরে কখন কখন ক্ষয়ীভবনের (Sheet erosion) সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায়। তবে এভাবে ক্ষয়ীভবনের তুলনায় অনেক বেশী ক্ষয়ীভবন হয় **বৃষ্টির জলের প্রবাহ দ্বারা।** মোট বৃষ্টি-পাতের প্রায় অর্ধেক অংশ বাষ্পে পরিণত হয়, ২০% ভূপৃষ্ঠের ঢাল অনু-সারে প্রবাহিত হয় এবং বিভিন্ন নদ-নদীর মধ্যদিয়া সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়। বাকী অংশ ভূপৃষ্ঠের ফাটল ও গহ্বরের মধ্য দিয়া নীচে নামিয়া যায়।
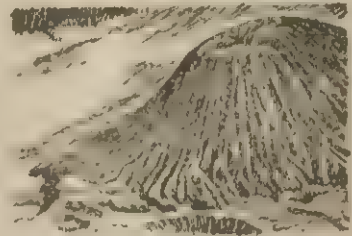
মৃত্তিকাস্তূপের ক্ষয়ীভবন (Sheet erosion)

(ঘ) **রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন** (Chemical weathering or decomposition)—প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে শিলাসমূহের চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার সময় তাহাদের যথেষ্ট রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটে, অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলেও শিলা চূর্ণবিচূর্ণ বা পরিবর্তিত হয়। ইহাকে রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন বলে। বায়ুর উষ্ণতা, জলীয় বাষ্প, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে লোহাতে মরিচা ধরা রাসায়নিক আবহবিকারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শিলাসমূহের রাসায়নিক পরিবর্তন সম্পর্কে জল অতিশয় কার্যকরী। বৃষ্টির জলের সহিত বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই অক্সাইড মিশ্রিত হওয়াতে তাহা সামান্য অম্লভাবাপন্ন হয়। তাই চুনাপাথর, চক প্রভৃতি শিলার মধ্যদিয়া জল প্রবাহিত হওয়ার সময় ইহাদের মধ্যস্থিত চুন জাতীয় পদার্থ (Carbonate of lime) জলের সংস্পর্শে গলিয়া যায়। সেইরূপ ফেলস্পার, গেনাইট প্রভৃতিও গলিয়া যায়। কেবল কর্দম (Clay) ও অন্যান্য অদ্রবণীয় অংশ (insoluble matter) অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে।

জলের সংস্পর্শে শিলার মধ্যস্থিত বিভিন্ন খনিজ পদার্থ বিশেষভাবে পরিবর্তিত হইলে তাহাকে **হাইড্রেশন** (Hydration) বলে। জলের মধ্যস্থিত কার্বন-ডাই অক্সাইডের সংস্পর্শে রাসায়নিক পরিবর্তনকে **কার্বনেশন** (Carbonation) বলে। চুনাপাথর অঞ্চলে এরূপ পরিবর্তন সুস্পষ্ট। বায়ুর মধ্যস্থিত অম্লজানের (Oxygen) সংস্পর্শে রাসায়নিক পরিবর্তনকে **অক্সিডেশন** (Oxidation) বলে। ইহার ফলে অক্সাইড (মরিচা) সৃষ্টি হয়।

(ঙ) **জৈব আবহবিকার** (Biological or organic weathering)—বড় বড় উদ্ভিদের শিকড় এবং কেঁচো, ছুঁচো, খরগোস, 'প্রেইরী ডগ' প্রভৃতি **প্রাণীর** দ্বারা শিলার বিচূর্ণীভবন হয়। ইহাকে জৈব আবহবিকার বলে।

(১ii) **ক্ষয়ীভবন** (Erosion)—বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে কোন স্থানের শিলার আবহবিকার বা চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার পর সাধারণতঃ ঐ সকল শিলাচূর্ণ নদীর জল-স্রোত, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের নিজ নিজ স্থান হইতে অন্যত্র প্রবাহিত হয়। এভাবে পূর্বের স্থানে **ক্ষয়ীভবন** হয়। বিচূর্ণীভবনের মত ক্ষয়ীভবনও রাসায়নিক এবং যান্ত্রিক অথবা সাধারণ—এই দুই প্রকার হইতে পারে। যথা—পাহাড়ের ঢাল হইতে শিলাচূর্ণসমূহ নীচের দিকে গড়াইয়া পড়িলে তথায় **যান্ত্রিক** বা সাধারণ ক্ষয়ীভবন হয়। আর নদী, হিমবাহ প্রভৃতি দ্বারা এসকল উপাদান অন্যত্র সরিয়া গেলে তথায় **রাসায়নিক** ক্ষয়ীভবন হয়। কারণ, এই অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে কিছু রাসায়নিক পরিবর্তনও হয়।

(২) **অপসারণ বা প্রবহন** (Transportation)—বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টি, নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিদ্বারা শিলাচূর্ণ এক স্থান হইতে অন্যত্র প্রবাহিতও হয়। ইহাকে বলে **পরিবহন** বা **প্রবহন** বা **অপসারণ**। ক্ষয়ীভবন ও অপসারণের কাজ একসঙ্গে চলে। শিলাচূর্ণসমূহ এক স্থান হইতে অন্যত্র অপসারণের সময় শিলার আঘাত এবং ঘর্ষণের ফলে ভূপৃষ্ঠের যে ক্ষয় হয়, তাহাকে **কর্ষণ** (Corrosion) বলে। বিচূর্ণীভবন ও অপসারণকে এক সঙ্গে বলা হয় **নগ্নীভবন** (Denudation)।

(৩) **সঞ্চয়ন** (Accumulation) **ও অবক্ষেপণ** (Deposition)—ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানের শিলাচূর্ণ বায়ুপ্রবাহ, নদী, বৃষ্টিপাত, হিমবাহ প্রভৃতি দ্বারা প্রবাহিত হইয়া যদি **স্থলভাগের** অপর কোন অংশে সঞ্চিত হয়, তবে তাহাকে বলে **সঞ্চয়ন**। আর এসকল পদার্থ **সাগর, মহাসাগরে** সঞ্চিত হইলে তাহাকে বলে **অবক্ষেপণ**। এসকল অবক্ষিপ্ত উপাদান (শিলাচূর্ণ) সমুদ্রের তলদেশে দীর্ঘদিন স্তরে স্তরে পলিরূপে সঞ্চিত হওয়ার ফলে কালক্রমে তথায় পাললিক শিলার সৃষ্টি হয়।

ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনের (সৃষ্টি ও ক্ষয়) কাজ চক্রের আকারে চলে—ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন একটি অতিশয় জটিল ও মিশ্র কাজ। কারণ, পরিবর্তনকারী শক্তিসমূহ (Factors) নানাপ্রকার। তাহাদের ক্ষমতা, পরিবর্তনের প্রণালী প্রভৃতিও বিভিন্ন। তারপর যখনই প্রবল ভূ-আন্দোলনের ফলে ভূপৃষ্ঠের কোন অংশ অপর অংশ হইতে উঁচু হইয়া উঠে, তখনই নদী, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি শক্তি দ্বারা সেখানে অন্য নীচু স্থানের তুলনায় অধিক পরিমাণে ক্ষয়কার্য আরম্ভ হয়। এমন কি, পাললিক শিলা দ্বারা ভঙ্গিল পর্বতাদির সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের কতক অংশ ভাঙ্গিয়া যায় এবং ভগ্ন অংশসমূহের কতক ভাগ সাগর, মহাসাগর, হ্রদ প্রভৃতি নিম্নভূমিতে সঞ্চিত হইয়া সেখানে পাললিক শিলা সৃষ্ট হয়। ভূপৃষ্ঠের এই পরিবর্তন সাধারণতঃ অত্যন্ত ধীরে সাধিত হয়। পরিবর্তনের কাজে কিছু কিছু ব্যাঘাতও ঘটে। আবার কখনও বা একটি

ক্ষয়চক্রের (Cycle of erosion) কাজ সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই স্থানটি (ভূ-আন্দোলনের ফলে) কিছু উঁচু হইয়া উঠে এবং সেখানে নূতন ক্ষয়চক্রের সূচনা হয়। ইহাকেই ক্ষয়কার্যের **পুনরুজ্জীবন** (Rejuvenation) বলা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে পূর্বের ক্ষয়কার্যের চিহ্নের উপরে নূতন গঠন ও ক্ষয়কার্যের চিহ্নসমূহ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। বস্তুতঃ **সৃষ্টি ও ক্ষয়ের** কাজ একটির পর অপরটি না হইয়া বরং **পাশাপাশি** ভাবে **চলে**। ফলে, মনে হয়, ইহাদের আদি নাই, অন্তও নাই।

ক্ষয়কার্যের বিভিন্ন অবস্থা ও সমপ্রায় ভূমি (Pene-plain)—ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনের কাজ অবিরাম গতিতে চলিলেও ইহার মধ্যে মধ্যে **বিভিন্ন পর্যায়** (Stage) সুস্পষ্ট "যৌবন", "প্রৌঢ়", "পরিণত" ও "বার্ধক্য" প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বিভিন্ন পর্যায় বুঝানো হয়। কোন ভঙ্গিল পর্বত বা উচ্চ মালভূমির ক্ষয়কার্যের প্রাথমিক অবস্থায় যখন বায়ু, বৃষ্টিপাত, নদী প্রভৃতি শক্তিসমূহ দ্রুত ক্ষয়কার্য সাধন করে তখন ইহাকে ক্ষয়চক্রের **যৌবন** (Youth) বলে। এই অবস্থায় অধিক পরিমাণে ক্ষয়ের নানারকম চিহ্ন সুস্পষ্ট। যেমন—উচ্চভূমির ঢাল খাড়া ও সামঞ্জস্যবিহীন থাকে। ইহার পরে ক্ষয়চক্রের **প্রৌঢ় অবস্থাতে** ক্ষয়ের কাজ কিছুটা কমিয়া যায়। তারপর ক্ষয়চক্রের **পরিণত অবস্থাতে** ভূপৃষ্ঠের পূর্বের উঁচু অবস্থার চিহ্নসমূহ প্রায় বিলুপ্ত হয় এবং ক্ষয়কার্যও হয় নামমাত্র। পরে ক্ষয়চক্রের **বার্ধক্য অবস্থাতে** ভূপৃষ্ঠের পূর্বের উচ্চতা সম্পূর্ণরূপে* ক্ষয় ও অসমতা সম্পূর্ণরূপে দূর হওয়ার ফলে ইহার অবস্থা হয় **সমভূমি** বা নিম্নভূমির মত। ইহাকেই বলা হয় **সমপ্রায় ভূমি** (Pene-plain or almost a plain)। অবশ্য বহু বারের ক্ষয়চক্রের ফলেই এরূপ সমপ্রায় ভূমি সৃষ্টি হয়। তবে ভূপৃষ্ঠের কোন বিস্তৃত অংশেই ক্ষয়চক্রের শেষ অবস্থা সুস্পষ্ট নহে। অনেক ক্ষেত্রেই সমপ্রায় ভূমির মাঝে মাঝে অবশিষ্ট চিহ্ন (Remaining feature) স্বরূপ কঠিন শিলাময় পাহাড়, পর্বতের ছোট ছোট অংশ দাঁড়াইয়া থাকে। ইহাদের **মোনাড্‌নক** (Monad nock) বলা হয়।

বিভিন্ন প্রকার ক্ষয়চক্র—ভূপৃষ্ঠের এক একটি অঞ্চলে পরিবর্তনকারী শক্তিসমূহের মধ্যে এক একটি অধিক কার্যকরী। যেমন, উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে নদীর কাজ, মরুভূমিতে বায়ুর কাজ, সমুদ্র উপকূলে সমুদ্রের কাজ এবং মেরু অঞ্চল ও তুষারাবৃত উচ্চ পর্বতে হিমবাহের ক্ষয়ের কাজ সুস্পষ্ট। নদীর দ্বারা এরূপ অবস্থা ঘটিলে ইহাকে বলে **নদীর ক্ষয়চক্র** (Cycle of fluvial erosion)। বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে ক্ষয়চক্রের

---

* পৃথিবীর যে-কোন অংশে উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে ক্ষয়কার্য আরম্ভ হয়। তারপর তাহা ক্ষয় হইতে হইতে যখন একেবারে সমুদ্রের সমতলে (base level of erosion) আসিয়া পৌঁছে এবং আর ক্ষয় হয় না, তখনই একটি ক্ষয়চক্র সম্পূর্ণ হইল এরূপ মনে করা হয়।

মধ্যে নদীর ক্ষয়চক্রের পরিমাণ ও মানবজীবনের সহিত সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা অধিক। তাহা ছাড়া ইহাদ্বারা ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন এত স্পষ্ট ও সুন্দর যে ইহাকে **স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র** (Cycle of normal erosion) বলা যায়। সমুদ্র দ্বারা এরূপ কাজ হইলে ইহাকে **সামুদ্রিক ক্ষয়চক্র** (Cycle of marine erosion), হিমবাহের দ্বারা হইলে ইহাকে **হিমবাহের ক্ষয়চক্র** (Cycle of glacial erosion), আর বায়ুপ্রবাহের দ্বারা হইলে ইহাকে **বায়ুপ্রবাহের ক্ষয়চক্র** (Cycle of aolian erosion) বলা হয়। বায়ুর ক্ষয়চক্র শুষ্ক অঞ্চলে ঘটে বলিয়া ইহাকে **শুষ্কতার ক্ষয়চক্রও** (Cycle of arid erosion) বলে।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভূপ্রকৃতির পরিবর্তন—ভূত্বকের পরিবর্তনকারী বিভিন্ন শক্তির মধ্যে নদী, জল, হিমবাহ, বায়ু, সমুদ্র প্রভৃতির প্রভাব বেশী। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই **একাধিক শক্তি** পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করে। তবে সাধারণতঃ বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে (Climatic regions) ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন সম্পর্কে নিম্নলিখিত শক্তির কার্যকারিতা অধিক।

নিরক্ষীয় ও মৌসুমী অঞ্চলের অধিক উষ্ণতা ও আর্দ্রতা (বিশেষতঃ দীর্ঘকাল-ব্যাপী প্রবল বৃষ্টিপাত) ভূত্বকের পরিবর্তন সম্পর্কে অত্যন্ত কার্যকরী। তদুপরি এসকল স্থানের বিস্তীর্ণ ও ঘন বনভূমিতে গাছের পাতা, লতা, গুল্ম, ফুল, প্রভৃতি পচিয়া কোমল ও যথেষ্ট পুরু মৃত্তিকাস্তর এবং বিভিন্ন দ্রাবক বা অম্ল পদার্থের (Acid) সৃষ্টি হয়। প্রবল বৃষ্টি এবং নদীপ্রবাহের দ্বারা এসকল জিনিষ দ্রুত ক্ষয় হয় এবং ভূপৃষ্ঠের অসমতা সহজেই দূরীভূত হয়। কখন কখন **অধিক ক্ষয়ীভবনের** ফলে বিভিন্ন শিলার কতক খনিজ পদার্থ প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ল্যাটারাইট, বক্সাইট প্রভৃতি শিলা ইহার উদাহরণ।

উষ্ণ মরু অঞ্চলে শীত-গ্রীষ্ম এবং দিবা-রাত্রির উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্য অধিক। ফলে, এখানকার শিলাসমূহ বার বার প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হয়। এখানে প্রবল বায়ুপ্রবাহ দ্বারা ভূপৃষ্ঠের অধিক পরিবর্তন ঘটে। এখানে সাধারণতঃ শিলাখণ্ডসমূহ পাহাড়াদির তলদেশে সঞ্চিত থাকে। তবে বায়ুবেগে ইহাদের ক্ষুদ্র অংশ এবং বালুকারাশি উড়িয়া গিয়া কোথাও বালিয়াড়ি (Sandune) তৈরী করে, কোথাও পূর্বের বালিয়াড়ি ভাঙ্গিয়া যায়। বালুকা সঞ্চয়ের ফলে তথাকার কতক নিম্নস্থান সমভূমিতেও পরিণত হয়।

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের এক দিকে উষ্ণমণ্ডল, অপরদিকে শীতল অঞ্চল থাকাতে বৃষ্টিপাত এবং তুষারপাত (সাধারণতঃ উচ্চভূমিতে) উভয় শক্তিই কার্যকরী। নদীর কাজও যথেষ্ট বেশী। এখানকার শিলাচূর্ণ, বালুকা প্রভৃতি দ্বারা নিম্ন অংশসমূহ ভরিয়া

গিয়া বিস্তীর্ণ সমভূমি সৃষ্টি হয়। তবে বৃষ্টিপাত, তুষারপাত এবং সর্বোপরি নদীপ্রবাহের ফলে বিভিন্ন উপাদান সাগরাদিতেই সঞ্চিত হয় সবচেয়ে বেশী।

মেরু অঞ্চলে তুষার, বরফ ও হিমবাহ দ্বারা ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটে।

বন অঞ্চলের বিভিন্ন গাছের শিকড় পরস্পরকে এবং মৃত্তিকাকে জালের মত শক্তভাবে আঁকড়াইয়া রাখে। ফলে, এখানে ক্ষয়কার্য কম হয়।

পরিবর্তনকারী শক্তি ও তাহাদের কার্য

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত শক্তি (Factors) দ্বারা ভূপৃষ্ঠের অধিক পরিবর্তন হয়।

(ক) **ভূ-আন্দোলন**—পৃথিবীর অভ্যন্তরে অনবরত ভূ-আন্দোলন হইতেছে। প্রবল ভূ-আন্দোলনের সহিত **ভূমিকম্প** এবং **আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের** সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। ইহাদের দ্বারা অতি **দ্রুত** বা **হঠাৎ** অল্পক্ষণের মধ্যে ভূপৃষ্ঠের বিশেষ পরিবর্তন হয়।

(খ) **জলবায়ু**—ভূপৃষ্ঠের নানাজাতীয় শিলাসমূহের উপর জলবায়ু সংক্রান্ত **বায়ুপ্রবাহ, উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত** প্রভৃতি বিষয়ের প্রভাব খুব বেশী। ইহাদের দ্বারা সাধারণতঃ **ধীরে** পরিবর্তন হয়।

(গ) **প্রাকৃতিক শক্তি**—**নদী, সমুদ্রস্রোত, হিমবাহ** প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা ভূপৃষ্ঠের বিস্তর পরিবর্তন সাধিত হয়। এ বিষয়ে ভূপ্রকৃতির প্রভাব উল্লেখযোগ্য। যেমন, উঁচু পর্বতের খাড়া ঢালে (steep slope) ঢালু অংশ ও সমভূমির তুলনায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। আবার নদ-নদীহীন স্থানের চেয়ে নদ-নদীপূর্ণ অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের অধিক পরিবর্তন ঘটে। এ সম্পর্কে ভূগঠনের (rock composition) প্রভাবও সুস্পষ্ট। যেমন, কোয়ার্ৎজ, গ্রেনাইট প্রভৃতি কঠিন শিলার তুলনায় চুনাপাথর, শেল প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কোমল শিলা অধিক দ্রুত এবং অনেক বেশী পরিমাণে পরিবর্তিত হয়। তবে প্রবল **বন্যা**, ভয়ঙ্কর **ঝড়** প্রভৃতি দ্বারাও কখন কখন অতি অল্প সময়ে ভূপৃষ্ঠের কতক অংশের বিস্তর ক্ষতি হয়।

(ঘ) **উদ্ভিদ্**—উদ্ভিদের শিকড় ও মূলদেশ মৃত্তিকার মধ্য দিয়া বিস্তৃত হওয়ার সময় শিলাতে বিভিন্ন ফাটলের সৃষ্টি হয় ও পূর্বের ফাটলগুলি ক্রমশঃ অধিক চাপে আরও বিস্তৃত হয়। ফলে, শিলাসমূহ খণ্ডবিখণ্ড হয় ও ভূপৃষ্ঠের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়।

(ঙ) **প্রাণী**—পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাণীও ভূপৃষ্ঠের কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করে।

ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনকারী **প্রধান শক্তিগুলির** বিষয় পরের পৃষ্ঠাগুলিতে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(১) নদী ও তাহার কার্য

নদীর গুরুত্ব–ভূত্বকের পরিবর্তন সম্পর্কে নদনদীর **জলের প্রবাহের** বা জলস্রোতের (Running water) গুরুত্ব অতুলনীয়। কারণ, নদীদ্বারাই ভূপৃষ্ঠের **সর্বাপেক্ষা অধিক** পরিবর্তন হয়। আর এই পরিবর্তন ঘটে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র। সেজন্য **নদীর** জলের প্রবাহ (flow) দ্বারা ভূপৃষ্ঠের **ক্ষয়ীভবনকে** (Fluvial erosion) বলা হয় **স্বাভাবিক ক্ষয়ীভবন**।

নদীর বৈচিত্র্য—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের নদনদীসমূহের মধ্যে নানা বিষয়ে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনেক। এই বৈচিত্র্য নির্ভর করে নদীসমূহের উৎস বা উৎপত্তিস্থল হইতে প্রবাহের পথের অবস্থা, ভূমির ঢাল, গঠন, জল লাভের সুযোগ, জলপ্রবাহের সময় ও পরিমাণ, নদীর দৈর্ঘ্য, উপনদী, শাখাপ্রশাখা, মোহনা, খাঁড়ি, বদ্বীপ প্রভৃতি বহু বিষয়ের উপর। পৃথিবীর কতক নদী দৈর্ঘ্যে অতিবৃহৎ। যেমন, আফ্রিকার নীল পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী অথচ উহার কতক অংশ প্রবাহিত হয় মরু অঞ্চলের উপর দিয়া। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন দৈর্ঘ্যে দ্বিতীয়, কিন্তু উহার মধ্যদিয়া প্রবাহিত হয় পৃথিবীর সকল নদীর চেয়ে বেশী জল। এসকল এবং আরও অনেক নদীর মধ্য দিয়া **সমস্ত বৎসর জল** প্রবাহিত হয় (Permanent rivers)। অপর দিকে শুষ্ক অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত অনেক নদীতে (Intermittent rivers) প্রতিবৎসর **কয়েক মাস জল** থাকে। রাজস্থানের কতক নদীর অবস্থা আরও খারাপ। তাহাদের মধ্যদিয়া বৎসরে **এক মাসও** ঠিকমত জল প্রবাহিত হয় **না** (Ephemeral rivers)।

সাধারণতঃ সমভূমির তুলনায় **উচ্চভূমিতে** এবং শুষ্ক অঞ্চলের তুলনায় **আর্দ্র অঞ্চলে** (যেখানে বৃষ্টি অধিক), নদীর জলস্রোতের বেগ বেশী এবং **ক্ষয়কার্য** অধিক। যেমন, আসামে (পার্বত্য অংশে) ব্রহ্মপুত্রের ক্ষয়কার্য বেশী, অথচ বাংলাদেশে (সমভূমিতে) যমুনার (ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন অংশ) ক্ষয়কার্য কম। অপ্রবেশ্য শিলাদ্বারা গঠিত ও আর্দ্র অঞ্চলে নদনদী অনেক। উহাদের উপনদী, শাখা-প্রশাখাও বহু। **প্রবেশ্য শিলা** (চুনাপাথর, বেলেপাথর, বালুকা প্রভৃতি) দ্বারা গঠিত অঞ্চলে নদী খুব কম। এরূপ স্থানের কতক নদী **অন্তঃসলিলা**। বিহারে ফল্গুনদী (গয়ার নিকট) অন্তঃসলিলা। এরূপ অঞ্চলের জলবায়ু শুষ্ক হইলে নদীর সংখ্যা হয় নগণ্য। রাজস্থান তাহার উদাহরণ। কাজেই এরূপ অঞ্চলে নদীদ্বারা ভূত্বকের পরির্তনের পরিমাণও অতি তুচ্ছ। অবশ্য, ঐরূপ স্থানেও হঠাৎ কিছু বেশী বৃষ্টি হইলে বন্যা হয় এবং তাহাদ্বারা বিস্তর ক্ষয়কার্য হয়।

সাধারণতঃ নদীর উচ্চ অংশে, বিশেষতঃ বর্ষাকালে (প্রচুর বৃষ্টির জল লাভের ফলে) অনেক নদীতে **বন্যা** হয়। এমন কি, উচ্চ অংশের প্রচুর জল হঠাৎ নিম্নে সমভূমিতে

পৌঁছিবার ফলে তথায়ও ভয়ানক বন্যা হয়। কোশী, তিস্তা, দামোদর ইহার উদাহরণ। কখন কখন বহু উপনদীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত জল এবং আশপাশের নানা জায়গার জল ভূমির ঢাল অনুসারে নিম্নদিকে প্রবাহের ফলে সমভূমির প্রায় সমুদ্র-সমতলেও বন্যার তাণ্ডব ও ভীষণ ক্ষয়কার্য দেখা যায়। একারণে বাংলাদেশে **পদ্মার** এক অংশের নাম **কীর্তিনাশা**। নদীর এপ্রকার ক্ষয়কার্য সাধারণতঃ **যান্ত্রিক**। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে নদীর তীরে প্রথমে সামান্য ফাটল দেখা যায়। পরে সেই ফাটল ক্রমশঃ বড় হয় এবং ফাটলের মধ্যবর্তী অংশ নদীর জলের মধ্যে পড়িয়া যায়। তবে এরূপ ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে **রাসায়নিক** ক্ষয়কার্যের চিহ্নও সুস্পষ্ট।

নদীর বিভিন্ন অংশ ও ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন—নদনদীসমূহ সর্বপ্রথম যে স্থানের জল লাভ করিয়া নদীরূপে পরিণত হয় তাহাকে বলা হয় নদীর **উৎস** বা উৎপত্তিস্থল (Source)। নদীর উৎস সঠিকভাবে নির্ধারণ সহজ কাজ নয়; কোন কোন ক্ষেত্রে এবিষয়ে মতভেদও আছে। মোটামুটি হিসাবে গঙ্গার উৎস গঙ্গোত্রী অঞ্চলে হিমবাহের নিকটবর্তী অংশ (গোমুখ বা গোমুখী ; ইহা একটি তুষারপূর্ণ গহ্বর)। ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধুর উৎস তিব্বতের দক্ষিণ অংশের মানস সরোবর-রাক্ষসতাল হ্রদ অঞ্চল। কাজেই এসকল নদী তথাকার বরফগলা জল লাভ করে। তথায় সমস্ত বৎসর বরফ জমা থাকিলেও গ্রীষ্মকালে যখন বরফ অধিক গলিয়া যায় তখনই তথা হইতে অধিক পরিমাণে জল লাভের সুযোগ জুটে। দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর সীমা দিয়া প্রবাহিত নর্মদা নদীর উৎস মধ্য-ভারতের মহাকাল বা মাকালা পর্বতের অমরকণ্টক শৃঙ্গের প্রস্রবণ। আর দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি নদীর উৎস পশ্চিমঘাট পর্বতের বিভিন্ন অংশ। এসকল নদী কেবল বৃষ্টির জল দ্বারাই পুষ্ট। স্বভাবতঃ বর্ষাকালে ইহারা যে পরিমাণ জল লাভ করে, অন্য কোন সময় তাহা করে না। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং সিন্ধু প্রভৃতি নদীও হিমালয় অঞ্চল এবং উত্তর ভারতের (সিন্ধু পাকিস্তানের) সমভূমির বৃষ্টির জল অধিক লাভ করে বর্ষাকালে। সুতরাং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে ইহাদের আকৃতি, জলস্রোতের পরিমাণ, গতিবেগ এবং ক্ষয়কার্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই পার্থক্য স্বাভাবিক।

নদী প্রবাহিত হওয়ার সময় যে সকল জায়গার জল ভূমির ঢাল অনুসারে বিভিন্ন ছোট নদীর (উপনদী, প্র-উপনদী প্রভৃতি) মধ্যদিয়া আসিয়া ঐ (বড় বা মূল) নদীতে পতিত হয়, সেই সমুদয় স্থানকে বলে ঐ নদীর **অববাহিকা** বা **পর্যঙ্ক** (River basin)। হিমালয়ের দক্ষিণদিকের ঢালের অধিকাংশ, উত্তর ভারতের সমভূমির বেশীর ভাগ এবং মধ্য ভারতের মালভূমি ও বিন্ধ্য পর্বতের উত্তর ঢাল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল **গঙ্গার অববাহিকা**। অবশ্য দক্ষিণ আমেরিকার **আমাজন নদীর অববাহিকা** ইহার তুলনায় অনেক গুণ বড়। অববাহিকা অঞ্চলের কেবল আয়তন নহে, ভূপ্রকৃতি,

ভূমির ঢাল, বৃষ্টিপাতের সময় ও পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ের উপরও নির্ভর করে নদীর অবস্থা। যেমন, নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু (সমস্ত বৎসর প্রচুর বৃষ্টিপাত), আন্দিজ পর্বত, ভেনিজুয়েলা ও ব্রেজিল মালভূমির ঐ অববাহিকার দিকে ভূমির ঢাল প্রভৃতি কারণেই আমাজন পৃথিবীর বৃহত্তম নদী। উহার উপনদীর সংখ্যা কয়েক শত এবং জলপ্রবাহের বেগ এত বেশী যে মোহনাতে কোন প্রকার সঞ্চয় ও বদ্বীপ সৃষ্টি সম্ভবপর হয় নাই। গঙ্গার তুলনায় সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী, মহানদী প্রভৃতির জলপ্রবাহের পরিমাণ কেন কম, তাহাও ইহাদের অববাহিকার বিষয় আলোচনা করিলে সহজে বুঝিতে পারা যায়।

সাধারণতঃ নদীর উৎস হইতে মোহনা অথবা উৎপত্তি হইতে শেষ পরিণতি পর্যন্ত বিভিন্ন অংশে গতিপথের আকৃতি, আয়তন, জলপ্রবাহ, তাহার নানারূপ কার্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। তদনুসারে নদীর **প্রাথমিক অবস্থা**, **মধ্য অবস্থা** ও **পরিণত অবস্থা**—এই তিন ভাগে নদীকে বিভক্ত করা হয়। নদীতে এই তিন অবস্থার গুরুত্ব এক রকম নয়। গঙ্গানদীতে তিনটি অবস্থাই সুস্পষ্ট এবং যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য গঙ্গা এসকল বিষয়ে আলোচনার পক্ষে একটি আদর্শ নদী।

তবে নদীর এসকল অবস্থার সহিত **ভূপ্রকৃতির সম্পর্ক** এত **ঘনিষ্ঠ** যে ভূপ্রকৃতির অবস্থা অনুসারেই নদীর বিষয় আলোচনা করা অধিক যুক্তিযুক্ত বলিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা। ভূপ্রকৃতির **প্রাথমিক** অবস্থা, **পরিণত** অবস্থা ও **বার্ধক্য** অবস্থা—এই তিন ভাগ অনুসারে নদীর বিভিন্ন অবস্থা ও কাজ নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

(ক) **ভূপ্রকৃতির প্রাথমিক অবস্থা**—ভূপৃষ্ঠের যে সকল স্থানে পাহাড়, পর্বত, মালভূমি প্রভৃতির উপরিভাগে উঁচুনীচু অবস্থা বা অসমতা অত্যন্ত স্পষ্ট, যেখানে ক্ষয়ীভবনের বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা যায় না, তথায় **ভূপ্রকৃতির প্রাথমিক অবস্থা**। ক্ষয়ীভবনের সূত্রপাত বা প্রথম লক্ষণ হিসাবে মৃত্তিকা, বালুকা প্রভৃতির স্তূপের চারিপাশে বর্ষার পর দেখা যায় ক্ষয়কার্যের চিহ্ন (Sheet erosion)। ইহাই ভূপ্রকৃতির **ক্ষয়ীভবনের প্রারম্ভিক** বা **শৈশব অবস্থা**। তারপর বৃষ্টির জল, প্রস্রবণের বা ঝর্ণার জল, অতি উচ্চ পার্বত্য অংশের তুষারগলা জল বা হিমবাহের (বরফের নদী) কতক অংশ গলা-জল প্রভৃতি ভূপ্রকৃতির স্বাভাবিক ঢাল অনুসারে নীচের দিকে বহিয়া যায়। এপ্রকার বিভিন্ন জলস্রোত ক্রমশঃ পরস্পরের সহিত মিলিয়া **ভূমির ঢাল অনুসার** (Consequent to relief) নিম্নদিকে **প্রবাহিত** হয়। এভাবে **নদনদীর** (Consequent stream) **প্রাথমিক অবস্থার** সৃষ্টি হয়। এরূপ যে সকল সূত্র হইতে জল নানাপথে প্রবাহিত হইয়া নদীর সৃষ্টি হয়, তাহাদের মধ্যে যেটি সর্বপ্রধান (যেখান

হইতে নিয়মিতভাবে সবচেয়ে বেশী জল পাওয়া যায়) তাহাকে বলে **নদীর উৎস** (Source)। হিমালয়ের বদরীনাথ শৃঙ্গের পাশের গঙ্গোত্রীর পশ্চিমদিকের গোমুখ বা

গোমুখী গঙ্গার (প্রকৃত পক্ষে ইহার উপনদী ভাগীরথীর) উৎস। মধ্য ও পূর্ব হিমালয়ের প্রচুর বৃষ্টির জল ও বরফগলা জল গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বহু উপনদীর উৎস।

কখন কখন বৃষ্টির জল, প্রস্রবণের জল, তুষারগলা জল প্রভৃতি কোন একটি উচ্চ স্থান হইতে কেবল একদিকে প্রবাহিত হয় না, তথাকার ভূমির ঢাল অনুসারে বিভিন্ন দিকে বহিয়া চলে। যেমন, মহাকাল বা মাকাল পর্বতের বিখ্যাত অমর কণ্টক শৃঙ্গের একটি কাল্পনিক সীমারেখার উত্তর অংশের জল শোন নদীর মধ্যদিয়া উত্তরদিকে ও দক্ষিণ অংশের জল নর্মদা নদীর মধ্যদিয়া পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়। এরূপ কাল্পনিক সীমারেখাকে বলে **জলবিভাজিকা**।
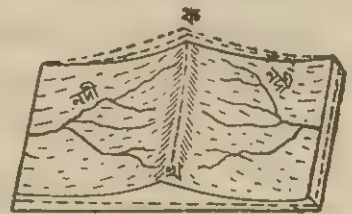
ক-খ জলবিভাজিকা

ভূপ্রকৃতির ক্ষয়ীভবনের শৈশব অবস্থার পরে যত দিন যায় ততই বৃষ্টির জলস্রোত, বিভিন্ন নদীর প্রাথমিক অংশসমূহের গতি ও অন্যান্য শক্তির প্রভাবে একটু একটু করিয়া ক্ষয়ীভবন বৃদ্ধি হইতে থাকে। ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদানসমূহও (পাথর, নুড়ি, কাঁকর প্রভৃতি) জলের বেগে নীচের দিকে বহিয়া চলে। ইহাই **ভূপ্রকৃতির তরুণ অবস্থার** সূত্রপাত, **ক্ষয়ীভবনেরও তরুণ অবস্থার** আরম্ভ। এরূপ ক্ষেত্রে ভূপ্রকৃতির যে অংশে

ভূমির ঢাল যত বেশী খাড়া এবং নদীতে জল লাভের সুযোগ যত অধিক, তথায় নদী তত প্রবলবেগে বহিয়া চলে। এরূপক্ষেত্রে জলপ্রবাহের শব্দ (গর্জন) বহুদূর হইতে শুনা যায়। এখানে জলের প্রচণ্ড বেগে ও তাহার সহিত প্রবাহিত শিলাসমূহের (পাথর,
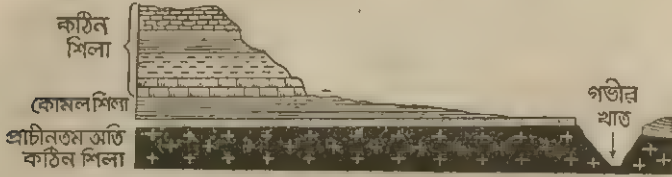
কাঁকর, নুড়ি প্রভৃতি) ঘর্ষণে নদীর পথের বা উপত্যকার **নীচের দিকে ক্ষয়কার্য** (Vertical erosion) **খুব** বেশী এবং তথায় গভীর খাত সৃষ্টি হয়। পাশের দিকে ক্ষয়কার্য (Lateral erosion) তাহার তুলনায় অনেক কম।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে নদীপথের সমুদয় অংশের মধ্য দিয়া সর্বদা জল বহিয়া চলে না। যে অংশের মধ্য দিয়া জল বহিয়া যায় তাহাকেই বলে নদীর **উপত্যকা** (Valley)। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে নদীর গতিপথে জলের পার্থক্যের ফলে নদীর **উপত্যকার** যথেষ্ট **পরিবর্তন** দেখা যায়। যেমন, বর্ষাকালে গঙ্গার উপত্যকা প্রায় সর্বত্রই থাকে প্রশস্ত (বাংলাদেশে পদ্মার উপত্যকা স্থানে স্থানে ৪-৫ কিমি চওড়া) ও জলপূর্ণ, কিন্তু শীতকালের ও গ্রীষ্মকালের প্রথম ভাগে উপত্যকার অবস্থা থাকে শীর্ণ (সরু) ও যথেষ্ট আঁকাবাঁকা। কতক অংশ শুকনাও থাকে। কখনও দেখা যায় বর্ষাকালের প্রশস্ত উপত্যকার তলদেশে কয়েকটি শুকনো খালের পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে শীর্ণ জলস্রোত।

উপত্যকার আকৃতির ও গভীরতার সহিত নদীর ক্ষয়ীভবন ও উপত্যকা অঞ্চলের শিলাসমূহের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। উচ্চ পার্বত্য অংশে নদী কঠিন শিলার উপর দিয়া প্রবাহিত হইলেও প্রবল জলস্রোতের বেগে নিম্নদিকে ক্ষয়কার্য খুব বেশী। ফলে, উপত্যকা থাকে গভীর। কখন কখন দেখা যায় নদীর পথের বা উপত্যকার দুই পাশের ঢাল খাড়া (কখনও পরস্পর প্রায় সমান্তরাল ভাবে খাড়া)। এই অবস্থায় উপত্যকার আকৃতি প্রায় I-এর মত। ইহাদিগকে বলে **গিরিখাত** (Gorge or canyon)। পশ্চিমঘাট বা সহ্যাদ্রি পর্বতে কৃষ্ণা নদীর উৎসের নিকট গিরিখাতের গভীরতা প্রায় ৭০০ মি। হিমালয় পর্বতের পশ্চিম অংশে কাশ্মীরের নাঙ্গা পর্বতের নিকট সিন্ধুনদের গিরিখাত এবং হিমালয়ের পূর্ব অংশে অরুণাচলের উত্তরপূর্ব সীমাতে ব্রহ্মপুত্রের গিরিখাত আরও

বেশী গভীর ও বিখ্যাত। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণপশ্চিম অংশে মরুপ্রায় অঞ্চলের* কঠিন শিলার মধ্যদিয়া প্রবাহিত **কলোরেডো নদীর গিরিখাত** (Grand canyon of the Colorado) পৃথিবীর গভীরতম ও সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গিরিখাত (স্থানে স্থানে ১৮০০ মিঃ'র অধিক গভীর)।

উপত্যকা অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাত হইলে, বিশেষতঃ তথাকার শিলা কোমল হইলে, বৃষ্টির জলদ্বারা উপত্যকার পাশে ক্ষয়কার্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। ফলে, উপত্যকার আকৃতি হয় V-এর মত। পাশের শিলার মধ্যে কিছু কোমল ও কিছু কঠিন (কোমল স্তরের নীচে কঠিন, তাহার নীচে আবার কোমল) স্তর থাকিলে ক্ষয়কার্য সম্পর্কে যথেষ্ট পার্থক্য ঘটে। এজন্য উপত্যকার পাশে সাময়িক ভাবে ধাপের মত অবস্থারও সৃষ্টি হইতে পারে। অবশ্য ক্রমশঃ অধিক ক্ষয়ীভবনের ফলে উপত্যকার উপরদিকের অংশ ক্রমে ক্রমে অধিক প্রশস্ত হইয়া পড়ে। এবিষয়ে নদীর জলস্রোতের সহিত প্রবাহিত শিলার ঘর্ষণের (Corrasion) প্রভাব খুব বেশী। কখন কখন কঠিন শিলাদ্বারা গঠিত অঞ্চলে কাঁকর, বালুকা প্রভৃতির ঘর্ষণের ফলে (প্রধানতঃ ঘূর্ণস্রোতের বেগে) ছোট-বড় গর্তের (Pot-holes) সৃষ্টি হয়।

ভূপ্রকৃতির তরুণ অবস্থাতে নদী কোন কঠিন শিলা অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে কখন কখন এমন জায়গাতে পৌঁছে যেখানে ভূপাত, ধস বা অন্য কোন কারণে ভূমি হঠাৎ খুব খাড়া। এরূপ ক্ষেত্রে **জলপ্রপাত** সৃষ্টি হয়। মধ্যপ্রদেশে নর্মদা নদীর মার্বেল পাথরের উপর (জব্বলপুরের নিকট) জলপ্রপাত, কর্ণাটকে কাবেরী নদীর **শিবসমুদ্রম্** প্রপাত, ঐ রাজ্যে সরাবতী নদীর **যোগপ্রপাত** প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। যোগপ্রপাত এদেশের উচ্চতম জলপ্রপাত।
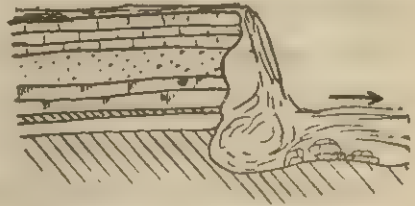
জলপ্রপাত ও জলপ্রবাহের দিক্

পশ্চিমঘাটের গায়ে লাভা অঞ্চলের অনেক ধাপের পাশে সৃষ্টি হইয়াছে ছোট ছোট জলপ্রপাত। জলপ্রপাতের ক্ষয়কার্য † (জলের প্রবলবেগে হঠাৎ নীচের দিকে পতনের

* এরূপ অঞ্চলে বৃষ্টিদ্বারা উপত্যকার পাশের অংশে ক্ষয়কার্য সম্ভবপর নয়।

† ভূত্বকের পরিবর্তন সম্পর্কে জলপ্রপাতের ক্ষয়কার্য উল্লেখযোগ্য। ইহার সৌন্দর্যও কম চিত্তাকর্ষক নয়। যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার সীমান্তে অবস্থিত ইরি ও অন্টেরিও হ্রদের মধ্যবর্তী অংশে সেন্ট লরেন্স নদীর নায়গ্রা জলপ্রপাতের সৌন্দর্য পৃথিবী-বিখ্যাত। আধুনিক কালে জলপ্রপাতের স্রোতের বেগে বহু স্থানে জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়। অনেক নদীতে উঁচু বাঁধ দিয়া ও পাশে বিরাট জলাধার তৈরী করিয়া কৃত্রিম প্রপাত সৃষ্টি করা হয়। শতদ্রু নদীর ভাকরা বাঁধ পৃথিবীর উচ্চতম বাঁধ।

ফল) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জলপ্রপাত অঞ্চলে কঠিন শিলাস্তরের নীচে কোমল শিলাস্তর, তাহার নীচে কঠিন স্তর—এভাবে একজাতীয় শিলাস্তরের নীচে অপর জাতীয় শিলাস্তর থাকিলে অধিক দ্রুত ক্ষয়ীভবন হয়। শিলার অধিক ক্ষয়ীভবনের ফলে বহুকাল পরে দেখা যায় জলপ্রপাত পূর্বের স্থান হইতে কিছু পিছনে সরিয়া যাইতেছে অর্থাৎ প্রপাতের **পিছন দিকে ক্ষয়কার্য** (Head erosion) হইতেছে। আবার কখনও বা বিভিন্ন প্রকার শিলা (সাধারণতঃ কঠিন ও কোমল শিলাস্তর পর পর) পাশাপাশি থাকিলে নদী দ্বারা অসমানভাবে ক্ষয়ীভবন হয়। তাহার ফলে একটি উঁচু জলপ্রপাত সৃষ্টি না হইয়া, সৃষ্টি হয় কয়েকটি **খরস্রোত** (Cataract)। মিশরে নীল-নদের গতিপথে খরস্রোত অনেক।

খরস্রোত

ভূপ্রকৃতির তরুণ (নদীর ক্ষয়ীভবনেরও তরুণ) অবস্থায় নদীর জল ভূপৃষ্ঠের যথেষ্ট খাড়া ঢালের উপর দিয়া প্রবল (ঘণ্টায় ২৫-৩০ কিমি) বেগে নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়। কাজেই এখানে **নদীর জলপ্রবাহের** (Running water) দুইটি কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—(১) **শিলার ক্ষয়ীভবন** (Erosion) এবং (২) ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদানসমূহের **অপসারণ** বা **প্রবহন** (Transportation)। ভূপ্রকৃতির খাড়া অংশে ও বর্ষাকালে উভয় কার্যেরই পরিমাণ অধিক।

(খ) **ভূপ্রকৃতির পরিণত অবস্থা** —অতিদীর্ঘ কাল (লক্ষ লক্ষ বৎসর) নানা-প্রকার প্রাকৃতিক শক্তি (বৃষ্টিপাত, নদী, বায়ুপ্রবাহ, হিমবাহ প্রভৃতি) দ্বারা **ভূপৃষ্ঠের** ক্ষয়ীভবনের ফলে তথাকার **অসমতা** (উঁচু নীচু অবস্থা) কিছু পরিমাণে **দূর** হয়। ভূপ্রকৃতির অবস্থা, ভূভাগের গঠন, শিলাসমূহের উপাদান, বিভিন্ন প্রাকৃতির শক্তির কার্যকারিতা, উহাদের প্রভাব বিস্তারের কাল প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ের উপর ক্ষয়ীভবন নির্ভরশীল। ক্ষয়ীভবনের পরিমাণ ক্রমশঃ বেশী হইলে পাহাড়, পর্বতের পার্শ্বদেশ অনেক মসৃণ হয়। এমন কি শৃঙ্গসমূহের উচ্চতা কিছু পরিমাণে হ্রাস এবং আকৃতিরও কিছু পরিবর্তন ঘটে। এরূপ ক্ষয়ীভবন আরও বেশী হইলে বিভিন্ন পাহাড়ের মাঝখানের উপত্যকা যথেষ্ট বিস্তৃত ও অধিক ঢালু হয়। এগুলিই ভূপ্রকৃতির **পরিণত অবস্থার রূপ**।

ভূপ্রকৃতির এপ্রকার (পরিণত) অবস্থাতে আর্দ্র বা বৃষ্টিবহুল (নিরক্ষীয়, ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ) অঞ্চলে নদনদীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। তাহারা ভূমির ঢাল অনুসারে নিম্নদিকে বহিয়া চলে এবং (পথের বাধা অনেকটা দূর হওয়াতে) সহজভাবে

পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। পরে ইহারা কোন বড় নদীর সহিত যুক্ত হয়। এসকল ছোট নদীকে বলা হয় মূল নদীর **উপনদী** (Tributary)। আগেকার (ভূপ্রকৃতির প্রাথমিক বা তরুণ) অবস্থায় নদী বহিয়া চলে ভূমির **ঢাল অনুসারে** (Conseqent stream)। আর এক্ষেত্রে যেখানে শিলা কোমল ও নদীর প্রবাহের পথে বাধা কম, নদী সেই পথেই বহিয়া চলে। কাজেই ইহাদের গতি ভূপৃষ্ঠের আদি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল নয়, বরং **পরবর্তী** (Subsequent) **অবস্থার** উপর নির্ভর করে ইহাদের গতিপথ। এপ্রকার নদী (Subsequent stream) অনেক ক্ষেত্রে প্রায় সমকোণী ভাবে মূল নদীর (Original or consequent stream) সহিত মিলিত হয়। কখনও এরূপ উপনদীর আবার উপনদী (মূল নদীর প্র-উপনদী বা Subtributary) থাকে। প্রায়-সমান কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত ও যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তিত অঞ্চলে এপ্রকার নদনদীর সংখ্যা অধিক। বলিত বা ভঙ্গিল পর্বত অঞ্চলে উপনদীগুলি প্রায় সমকোণী ভাবে মূল নদীর সহিত যুক্ত হয়। আবার তাহাদের উপনদীও (মূলনদীর প্র-উপনদী) অনুরূপ ভাবে (সমকোণী ভাবে) উপনদীগুলির সহিত মিলিত হয়। ফলে, মূল নদীর সমুদয় উপনদী, প্র-উপনদীসহ অবস্থা **জালের** (Trellised drainage pattern) মত বা ডালপালাযুক্ত **গাছের মত** (Dendritic pattern)। গঙ্গার উপনদীগুলির মধ্যে যমুনা, শোন প্রভৃতি **ডানতটের উপনদী** (Right bank tributary)। কারণ, এগুলি ডানদিক হইতে গঙ্গা নদীর সহিত মিশিয়াছে আর গোমতী, ঘাঘরা, কোশী প্রভৃতি গঙ্গার **বামতটের উপনদী**। চম্বল, বেতোয়া, কেন প্রভৃতি যমুনার উপনদী। দুই নদী বা উপনদীর মাঝখানের জায়গাকে বলা হয় **দোয়াব** [দো বা দুই আপ অর্থাৎ জল]। পঞ্জাবের বারিদোয়াব, জেচনা দোয়াব, উত্তর প্রদেশের গঙ্গা-যমুনা দোয়াব প্রভৃতি বিখ্যাত।

ভূপ্রকৃতির পরবর্তী অবস্থায় উৎপন্ন ও প্রায় সমকোণী ভাবে প্রবাহিত নদীগুলির (Subsequent streams) মধ্যে কতক নদী কখন কখন মূলনদীর (Consequent stream) বিপরীত দিকে বহিয়া চলে। সাধারণতঃ তাহাদের পথের বিশেষ পরিবর্তনের ফলে এরূপ অবস্থা ঘটে। [যেমন, শিলার স্তরগুলি হেলান বা খাড়া ঢাল সৃষ্টি করিতে পারে।] এপ্রকার **বিপরীতদিকে** প্রবাহিত নদীর (Obsequent stream) অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ অবস্থা দেখা যায় সমজাতীয় শিলাদ্বারা (কোমল পাললিক অথবা কঠিন আগ্নেয় শিলা যাহাই হয় না কেন) গঠিত অঞ্চলে। তথায় নদীগুলিও প্রায় **সমজাতীয়** (Insequent streams)। [তাহার প্রধান কারণ ইহাদের প্রবাহের অঞ্চলে ভূগঠন সম্বন্ধে বৈষম্যের অভাব।]

ভূমির ঢাল অনুসারে প্রবাহিত (Consequent) নদীগুলি কখন কখন পথিমধ্যে

প্রবল বাধার ফলে গতি কম-বেশী পরিবর্তন করিতে বাধ্য হয়। গঙ্গার উপনদী **কোশী** নদীর গতি পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার কখনও বা কতক নদী
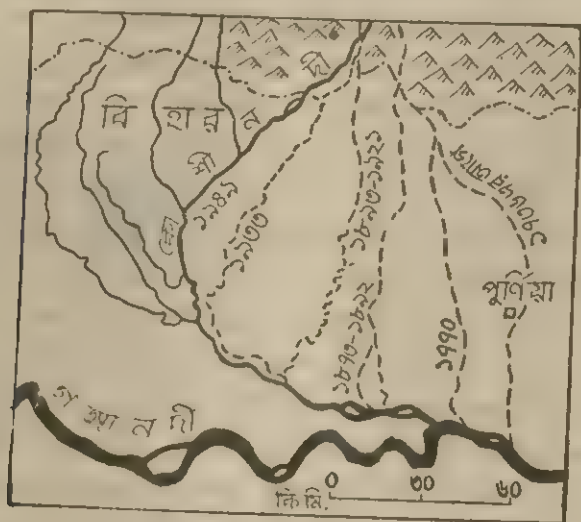
বিভিন্ন সময়ে কোশী নদীর গতি পরিবর্তন

এত প্রবল বা শক্তিশালী হয় যে পথের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া বা ভূমি ক্ষয় করিয়া **আগেকার পথে** বহিয়া চলে (Antecedent stream)।

বিভিন্ন প্রকার নদীর গতিপথের কতক অংশ কোন কারণে অপেক্ষাকৃত উঁচু হইয়া উঠিলে বা তথায় ভূপ্রকৃতির **পুনরুজ্জীবন** (Rejuvenation) হইলে নদীর গতি অপরিবর্তিত থাকে, অথচ তাহার অধিক ক্ষয়কার্যের সুযোগ হয়। (অবশ্য এক্ষেত্রে ভূমির ঢাল যথাসম্ভব আগেকার দিকে থাকা প্রয়োজন।) ভারতের সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, কাবেরী প্রভৃতি নদী তাহাদের নিজ নিজ প্রবাহের অঞ্চলে ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তন সত্ত্বেও পুরানো পথে প্রবাহিত হইতেছে।

ভূপ্রকৃতির সহিত জলের প্রবাহ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মের ফলে যে-কোন উচ্চ স্থান হইতে জলস্রোত ভূমির ঢাল অনুসারে নিম্নদিকে বহিয়া চলে। তাহাদের দ্বারাই নদীর সৃষ্টি হয়। মোটামুটি হিসাবে **কেন্দ্রাতিগ** (Centrifugal) অবস্থার সহিত ইহার তুলনা করা যায়। এরূপ অবস্থার জন্য কোন কোন পাহাড়, পর্বত, মালভূমিতে **জল-বিভাজিকার** সৃষ্টি হয়। ইহার বিপরীত অবস্থা দেখা যায় হিমালয়ের মধ্য অংশে। নেপালে মধ্য হিমালয়ের অন্তর্গত কাঠমণ্ডু উপত্যকার দক্ষিণে মহাভারত পর্বত।

তাহার একটি গভীর গিরিখাতের মধ্য দিয়া ঐ উপত্যকার দিকে প্রবাহিত হয় বাগমতী ও ইহার বিভিন্ন উপনদীর জলধারা। কাজেই **কেন্দ্রাভিগ** (Centripetal) অবস্থার ইহা এক অতুলনীয় উদাহরণ।

ভূপ্রকৃতির পরিণত অবস্থায় বিভিন্ন নদনদীদ্বারা ক্ষয়ীভবনের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, তাহাদের **পিছনদিকে** বা মাথার দিকে বা **উৎসের দিকে ক্ষয়কার্য।** কখন কখন এরূপ ক্ষয়কার্যের ফলে এক নদী অপর নদীর সঙ্গে মিলিত হয় এবং তখন অপর নদীর জল আপন পথে প্রবাহিত না হইয়া নূতন পথে (অপর যে নদীর সহিত তাহা যুক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যদিয়া) বহিয়া চলে। এরূপ অবস্থার বা **নদীগ্রাসের** (River capture or piracy) উদাহরণ দেখা যায় কতক ভঙ্গিল পর্বতে। এসকল ক্ষেত্রে যে নদীর উপরের অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহাকে (অর্থাৎ নিম্ন অংশকে) **মস্তকহীন নদী** (Beheaded stream) বলা হয়। স্বভাবতঃ এরূপ নদীর ক্ষয়ীভবন কমিয়া যায়।

নদীর পিছনদিকে ক্ষয়কার্যের ফলে কখন কখন অপর এক উল্লেখযোগ্য অবস্থার সৃষ্টি হয়। কতক উপনদী যথেষ্ট উঁচু ভূমির উপর দিয়া বহিয়া যাওয়ার অবস্থাতেই নিম্ন অংশের উপর দিয়া প্রবাহিত মূল নদীতে আপন জলধারা প্রবাহিত করিতে বাধ্য হয়। এপ্রকার অবস্থায় উপরের উপনদীর উপত্যকাকে **ঝুলান উপত্যকা** (Hanging valley) বলা হয়। দাক্ষিণাত্যে মালভূমিতে কাবেরীর উপনদী সিমসা ও শরাবতীর এবং হিমালয় অঞ্চলে সিকিমে তিস্তার এক উপনদীর ঝুলান উপত্যকা বিখ্যাত।

ভূপ্রকৃতির পরিণত অবস্থায় নদীর অপর প্রধান কাজ **পরিবহন।** নদীর **ক্ষয়ীভবনের সহিত পরিবহনের সম্পর্ক** খুব গভীর। প্রথমতঃ ক্ষয়ীভবন না হইলে নদী পরিবহন করিবে কি? তারপর নদীর দ্বারা যখন যেখানে যাহা ক্ষয়ীভবন হইবে, তাহা যদি সেখানেই সঞ্চিত হয়, তবে নদীর গতি বন্ধ হইয়া যাওয়ার ভয় খুব বেশী। কাজেই নদীকে আপন পথে চলিতে হইলে ক্ষয়ীভূত জিনিসের **পরিবহন একান্ত আবশ্যক।** পার্বত্য ভূমিতে, আর্দ্র অঞ্চলে, বিশেষতঃ বর্ষাকালে নদীর **পরিবহন ক্ষমতা** খুব বেশী। কাজেই নদীদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত বিভিন্ন উপাদানকে নদীর জলস্রোত সহজেই নিম্নদিকে বহন করে। কখন কখন মূল নদী ও ইহার বিভিন্ন উপনদী

দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত যে সকল জিনিস (পাথর, নুড়ি প্রভৃতি) মূল নদীতে আসিয়া পৌঁছে, নদীর জলস্রোতের তাহা অপেক্ষা অধিক জিনিস বহন করিবার মত ক্ষমতা থাকে। তখন মূল নদী নিজ উপত্যকাতে প্রচুর ক্ষয়কার্য করে। তাহাছাড়া নদীর উপত্যকা সমুদ্র-সমতলে (Sea level) পৌঁছিবার উদ্দেশ্যেও (পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত) নদী নীচের দিকে ক্ষয়কার্য করে। ইহাতেও নদীর উপত্যকার **গভীরতা বৃদ্ধি** (Degrade) হয়। ক্রমশঃ

নদীর উপত্যকার সমুদ্র-সমতলে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত ক্ষয়কার্য (বারে বারে খাড়া ঢাল সৃষ্টি)

একপক্ষে নদীর ক্ষয়কার্য বৃদ্ধির ফলে এবং অন্যপক্ষে বিভিন্ন উপনদীদ্বারা আনীত উপাদানসমূহের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য নদীতে এত বেশী পাথর, নুড়ি, কাঁকর প্রভৃতি আসিয়া পৌঁছে যে তখন নদীর দ্বারা এগুলি **বহন** করা **কষ্টসাধ্য** (Overloaded) হইয়া পড়ে। তখন নদীর ক্ষয়কার্য বন্ধ থাকে, পরিবহনই মূল কাজ। ক্রমে ক্রমে একদিকে নদীর উপত্যকাতে পাথর, কাঁকর প্রভৃতি উপাদানের পরিমাণ বাড়িতে থাকে, অন্যদিকে নদীর গতিবেগ (ঘণ্টায় সাধারণতঃ ৩-৫ কিমি) ও বহনের ক্ষমতা এত কমিতে থাকে যে নদী ঐ সকল জিনিস সম্পূর্ণরূপে বহন করিতে পারে না। তাহাদের কতক অংশ নদীর উপত্যকার তলদেশে সঞ্চিত হয়। ফলে, তথাকার **উচ্চতা বৃদ্ধি** (Aggrade) হয়। কাজেই নদীর **পরিবহনের সঙ্গে ক্ষয়ীভবনের গভীর সম্পর্ক** সুস্পষ্ট।

নদীর জলপ্রবাহ যে সকল জিনিস বহন করে তাহাদের কতক অংশ ভূপ্রকৃতির পরিণত (ও নদীর মধ্য) অবস্থাতে নদীর উপত্যকার তলদেশে সঞ্চিত হইলেও প্রচুর
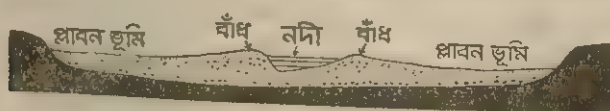
জিনিস বন্যার জলের সহিত নদীর পথের বাহিরে চলিয়া যায়। এসকল জিনিসের এক অংশ নদীর পথের দুই পাশে ধীরে ধীরে পলিরূপে সঞ্চিত হইয়া উঁচু হয়। এভাবে নদীতটে সৃষ্টি হয় **স্বাভাবিক বাঁধ** (Levee)। আর বন্যার জলের সহিত প্রবাহিত কাঁকর, বালুকা প্রভৃতির বৃহত্তর অংশ **সঞ্চিত** হয় নদীতটের বাহিরে দুই ধারের নীচু জমিতে। ধীরে ধীরে ঐ **নীচু জমি** পরিণত হয় **সমভূমিতে**। বন্যা ও প্লাবনের ফলে

এই ভাবে উৎপন্ন সমভূমিকে বলা হয় **প্লাবন ভূমি** (Flood plain)। ইহা বন্যার দান স্বরূপ। পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী-হুগলি নদীর দুই তীরে দীর্ঘ বাঁধ এবং তাহার বাহির দিকে বহুদূর পর্যন্ত প্লাবনভূমি বিস্তৃত। আরও বহু স্থানে এরূপ অবস্থা দেখা যায়। তাহাছাড়া এই অবস্থার শেষ ভাগে নদী এত দুর্বল হইয়া পড়ে যে পথে কঠিন শিলাস্তূপ দ্বারা কোথাও বাধা পাইলে ইহা গতি কিছু পরিবর্তন করিয়া অপেক্ষাকৃত কোমল শিলার
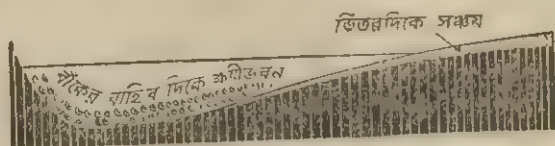
উপর দিয়া বহিয়া চলে। এজন্য এক্ষেত্রে নদীর গতি প্রায়ই **আঁকাবাঁকা** (Meander)। এরূপ বাঁকের যে দিকে জলের আঘাত লাগে তথায় ভূমি ক্ষয় হয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত জিনিস তাহার বিপরীত দিকে সঞ্চিত হয়। এরূপ সঞ্চয়ের স্থানে চর, বালুচড়া প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। কখন কখন নদীর পথের বাঁক ক্রমশঃ অত্যন্ত পরিবর্তিত হয় এবং তখন বাঁকের দুই মাথার মধ্যে দূরত্ব প্রায় সম্পূর্ণ হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায় নদীর জল ঐ দূরত্বটুকু ভাঙ্গিয়া প্রায় সোজাপথে বহিয়া চলে। তখন নদীর পরিত্যক্ত পথের অবস্থা হয় বাঁকা হ্রদের মত। ইহাদিগকে বলে **অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ** (Horse-shoe or oxbow lake)। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে এরূপ হ্রদ অনেক।

অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ সৃষ্টি

ভূপ্রকৃতির পরিণত অবস্থাতে নদীর উপত্যকার তলদেশে ক্ষয়ীভবনের তুলনায় পার্শ্বদিকে ক্ষয়ীভবন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। ফলে, **উপত্যকা** ক্রমে ক্রমে অধিক **প্রশস্ত** (অথচ অগভীর হয়)। তাই এখানকার **উপত্যকার আকৃতি** প্রশস্ত V-এর মত।
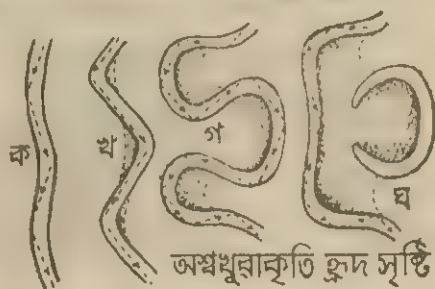
উপরিলিখিত বিভিন্ন অবস্থার ফলে ভূপ্রকৃতির পরিণত (ও নদীর মধ্য) অবস্থাতে নদীর (১) **ক্ষয়ীভবন**, (২) **পরিবহন** ও (৩) **সঞ্চয়**—এই তিন কার্যই উল্লেখযোগ্য।

(৩) **ভূপ্রকৃতির বার্ধক্য অবস্থা**—বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিদ্বারা ভূপৃষ্ঠের লক্ষ লক্ষ বৎসর ক্ষয়ীভবনের ফলে উপরিভাগের বিভিন্ন অসমতা ক্রমে ক্রমে দূর হইয়া **প্রায় সমভূমির** মত (Peneplane) অবস্থা সৃষ্টি হয়। এরূপ **সমপ্রায় ভূমিতে**

পরিণতিই ভূত্বকের পরিবর্তনের **চরম** বা **শেষ অবস্থা**। তাহার মাঝে মাঝে কঠিন শিলাদ্বারা গঠিত কতক **নীচু পাহাড়** বিচ্ছিন্নভাবে (Monadnock) দাঁড়াইয়া থাকে। এগুলি অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন পাহাড়, পর্বতের **ক্ষয়ীভূত অংশ** বা অবশেষ মাত্র। ইহাদের আকৃতি প্রায় গোলাকার।

ভূপ্রকৃতির এই অবস্থায় **নদীরও বার্ধক্য** বা শেষ অবস্থা। এক্ষেত্রে নদীর তলদেশ প্রায় সমুদ্র-সমতলে পৌঁছে এবং তাহার জলের গতিবেগ সম্পূর্ণ হ্রাস পায় (ঘণ্টায় আধ কিমিরও কম)। সেজন্য এখানে নদীর ক্ষয়ীভবন সম্পূর্ণ বন্ধ। তবে নদীর জলের সহিত যে সকল জিনিস (পাথর, কাঁকর, বালুকা প্রভৃতি) এখানে আসিয়া পৌঁছে তাহাদিগকে সমুদ্রের দিকে **পরিবহন** এখানে নদীর অন্যতম প্রধান কাজ। বস্তুতঃ নদীর উপরদিকের অংশে এসকল জিনিস জলের সহিত কম মিশ্রিত থাকাতে তথাকার জল যেরূপ পরিষ্কার থাকে, ক্রমশঃ নীচের দিকে ঐ সকল উপাদান ক্রমশঃ বেশী মিশ্রিত থাকার ফলে **জলের রং** অনেক বেশী **ঘোলা** বা কর্দমাক্ত। বর্ষাকালে নদীর জল ঘোলা থাকে বৎসরের অন্য সকল সময়ের চেয়ে বেশী।

এখানে নদীর অধিক দুর্বলতাহেতু গতিবেগ প্রায় সম্পূর্ণ হ্রাস পায়। তাহার ফলে নদী কাঁকর, বালুকা প্রভৃতিকে সমুদ্র পর্যন্ত বহন করিতে পারে না। তাহাদের অনেকটাই নদীর মুখে বা মোহনাতে সঞ্চিত হয়, বাকী অংশ সমুদ্রে গিয়া তলানি পড়ে। কাজেই এই অবস্থাতে **সঞ্চয়ই** নদীর সর্বপ্রধান কাজ। এই অবস্থার ফলে নদীমুখে মগ্নচড়া, চর বা দ্বীপ সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এগুলি পরস্পর যুক্ত বা মিলিত হয়, পাশের স্থল-ভাগের সহিতও ধীরে ধীরে যুক্ত হয়। এভাবে নদীর পথ বন্ধ হইয়া যায়। তখন নদী তাহার মধ্য দিয়া নূতন পথ তৈরী করিয়া বহিয়া চলে। এভাবে নদীর মোহনাতে সৃষ্টি হয় প্রায় ত্রিকোণাকার ভূমি। ইহাকে বলে **বদ্বীপ** (Delta)। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ ও বাংলাদেশ (পশ্চিমে রাজমহল হইতে পূর্বদিকে গারো পাহাড় এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত) **গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার বদ্বীপ**। ইহাই **পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ**। নদীর নিম্নগতি ও মোহনাতে প্রচুর পলি সঞ্চয়ের ফলে ও বদ্বীপের ভূমি ক্রমশঃ বিস্তৃত হওয়াতে কখন কখন বড় বড় বন্দরের বিস্তর ক্ষতি হয়। পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা বন্দর কিছুদিন পূর্বেও ভারতের সর্বপ্রধান বন্দর ছিল, এখন ভাগীরথী-হুগলি নদীর মোহনাতে পলি সঞ্চয়ের ফলে ইহার দুরবস্থা। এখন বড়

সমুদ্রগামী জাহাজ খুব কমই কলিকাতা বন্দরে আসিতে পারে। (তাহাও জোয়ারের সময় পাইলট লঞ্চ বা স্টীমারের সাহায্যে।) উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি নদীর বদ্বীপের বিস্তারের ফলে তথাকার নিউ অর্লিন্স বন্দরও তাহার পূর্বগৌরব হারাইয়াছে।

কোন নদীর মধ্য দিয়া অত্যধিক জল প্রবল বেগে প্রবাহিত হইলে উহার বেগের জন্য নদীমুখে বা মোহনাতে বদ্বীপ সৃষ্টি হইতে পারে না। এবিষয়ে নদীর জল ভিন্ন জোয়ার-ভাঁটার প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। যেমন, নিরক্ষীয় অঞ্চলের বিরাট জলপ্রবাহের জন্য দক্ষিণ আমেরিকার **আমাজন** নদীর মোহনাতে বদ্বীপ নাই, অথচ ইহার মোহনা প্রায় ৪০০ কিমি চওড়া। আর জোয়ার-ভাঁটার প্রভাবে ইংলণ্ডের **টেমস্, হাম্বার** প্রভৃতি নদীর মোহনাতেও বদ্বীপ নাই। গভীর খাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ভারতের **নর্মদা ও তাপ্তী** নদীর মোহনাতেও বদ্বীপ নাই।

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নদীর মোহনা অধিক চওড়া হইলে তাহাকে খাড়ি বা ফার্থ বলে। যেমন, ইংলণ্ডের টেমস নদীর **খাড়ি** (Estuary), ফোর্থ নদীর **ফার্থ** (Firth)। কতক নদীর এপ্রকার খাড়িতে জোয়ারের বেগ খুব বেশী এবং তথা হইতে জল অত্যন্ত উঁচু হইয়া স্থলভাগের ভিতর দিকে অগ্রসর হয়। ইহাকে **বাণডাকা** (Tidal bore) বলে। ইহা একদিকে ক্ষতিকর, বিশেষতঃ বন্যাদ্বারা আশপাশের ক্ষতি হয়। অপর দিকে ইহা হিতকর, কারণ এরূপ জলের বেগে জাহাজ দেশের মধ্যে অনেক দূর প্রবেশ করিতে পারে।

(২) ভূপৃষ্ঠের নিম্ন অংশে জল ও তাহার কার্য

ভূপৃষ্ঠের নিম্ন অংশে জল কোথায় পাওয়া যায়—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক এবং তাহা বৎসরব্যাপী। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পশ্চিম উপকূলেও প্রায় বৎসরব্যাপী বৃষ্টি, তবে পরিমাণ কম। ক্রান্তীয় অঞ্চলের মৌসুমী ও অন্যান্য অংশে বৎসরে একবার অধিক বৃষ্টি হয়। মরু অঞ্চল বৃষ্টিহীন। বাকী অঞ্চলসমূহে মধ্যম রকম, সামান্য, প্রায় তুচ্ছ—এরূপ বিভিন্ন ধরনের বৃষ্টি হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে উপরিলিখিত নানাভাবে **মোট** যে পরিমাণ **বৃষ্টি** হয়, তাহার সিকিভাগের অধিক (প্রায় ৩০ %) বিভিন্ন স্থানে ভূপৃষ্ঠের চিব়, ফাটল, ছিদ্র প্রভৃতির মধ্য দিয়া ক্রমশঃ **ভূপৃষ্ঠের নীচে** চলিয়া যায়। ভূত্বকের **নিম্ন অংশের** এই **জলরাশি** (Subsurface water or underground water or ground water) বেশীর ভাগ ভূপৃষ্ঠ হইতে ১০০০ মিটারের মধ্যে থাকে। তবে ইহার **নিম্ন সীমা** ভূপৃষ্ঠ হইতে ১০ কিমি হইতে পারে। এই জলরাশি নীচের দিকে কতদূর পৌঁছিতে পারে তাহা নির্ভর করে শিলার গঠন,

ছিদ্র, ফাটল প্রভৃতির উপর। যে সকল শিলার মধ্য দিয়া জল সহজে নীচে নামিতে বা বহিয়া যাইতে পারে তাহাদিগকে বলে **প্রবেশ্য** (Permeable) শিলা, আর যে শিলার মধ্য দিয়া তাহা করা সম্ভব নয় তাহা **অপ্রবেশ্য** (Impermeable) শিলা। সাধারণতঃ উপরের শিলাসমূহের প্রবল চাপে ক্রমশঃ নীচের শিলার মধ্যস্থিত ছিদ্র, ফাটল প্রভৃতি বন্ধ হইয়া যায়। এজন্যই ভূপৃষ্ঠস্থ জলের ১০ কিমির নীচে নামা সম্ভবপর নয়।

ভূপৃষ্ঠের নিম্ন অংশের জলরাশি সাধারণতঃ নিম্নলিখিত অঞ্চলে অধিক পাওয়া যায়:—(১) **আর্দ্র অঞ্চলে** মৃত্তিকা ও হাল্কাভাবে (loose) অবস্থিত শিলাসমূহের মধ্যে সাধারণতঃ **২৫ মিটারের মধ্যেই** প্রচুর জল থাকে। আমাদের দেশে বর্ষাকালে ভূপৃষ্ঠের এক মিটার নীচেই প্রচুর জল পাওয়া যায়। এরূপ অঞ্চলে অগভীর কূপ, কুয়ো, ইঁদারা, পুকুর, দীঘি, খাল প্রভৃতিতে সারা বৎসর অথবা বৎসরের অধিকাংশ সময় জল পাওয়া যায়। এসকল অঞ্চলে স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ প্রচুর, কৃষিকার্যও সহজে সফল হয়। (২) ভূপৃষ্ঠের কতক জল বিভিন্ন **প্রবেশ্য শিলাস্তরের** মধ্য দিয়া ঢালুদিকে স্বাভাবিক ভাবে বহিয়া যায়. এরূপ শিলার মধ্যস্থিত ছিদ্র বা ফাটলের পরিমাণ, শিলার গভীরতা, ঢাল প্রভৃতির উপর তথাকার জলের পরিমাণ নির্ভর করে। এই জাতীয় (প্রবেশ্য) শিলার উপরে ও নীচে অপ্রবেশ্য শিলাস্তর থাকিলে এই অংশ পর্যন্ত গভীর কূপে জল পাওয়া যায়। এইরূপ প্রবেশ্য স্তরের নিম্ন অংশেই জল বেশী থাকে। সুতরাং তথায় কূপ গভীর না হইলে তাহার মধ্য হইতে বেশী জল পাওয়া যায় না। (৩) ভূপৃষ্ঠের কতক **কঠিন শিলার** মধ্যস্থিত কিছু কিছু চির বা ফাটলের মধ্যেও সামান্য পরিমাণ জল সঞ্চিত থাকিতে পারে।

জলপ্রাপ্তির অঞ্চল—ভূত্বকের ঢাল, জলের সরবরাহ ও স্বাভাবিক গতি, ভূপৃষ্ঠস্থ শিলার উপাদান প্রভৃতি বিষয়ে পার্থক্য অনুসারে ভূপৃষ্ঠের নিম্ন অংশের জলের অবস্থিতি সম্পর্কে পার্থক্য প্রচুর। তদনুসারে তিনটি অঞ্চল উল্লেখযোগ্য:—(১) **শুষ্ক অঞ্চল** (Zone of aeration)—এখানকার শিলা অধিক ছিদ্র বা ফাটলযুক্ত। তাহাদের মধ্য দিয়া জল সহজে অন্যত্র চলিয়া যায়। তাই এখানে জল সঞ্চিত থাকে না। কাজেই এখান পর্যন্ত মাটি খুঁড়িলে জল পাওয়া যায় না। (২) **আর্দ্রতার অন্তবর্তী অঞ্চল** (Zone of intermittent saturation)—বর্ষাকালে জলের উপরিসীমা (Water table) ভূপৃষ্ঠের যে অংশ পর্যন্ত পৌঁছে শুষ্ক সময়ে (শীতকালে ও গ্রীষ্মকালের প্রথম ভাগে) জলের উপরিসীমা সেখান হইতে নিম্নদিকে নামিয়া যায়। এই দুই সীমার মধ্যবর্তী অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। স্বভাবতঃ এখানে বর্ষাকালে সহজে জল পাওয়া যায়, কিন্তু শুষ্ক সময়ে জল পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। (৩) **চির আর্দ্র অঞ্চল** (Zone of

permanent saturation)—এই অঞ্চলের গভীরতা সাধারণতঃ ১০০-১০০০ মি। এখানে গভীর কূপে সমস্ত বৎসর জল পাওয়া যায়।

ভূ-পৃষ্ঠের নিম্ন অংশের জলের প্রবাহ ও বিভিন্ন প্রকার প্রস্রবণ সৃষ্টি—ভূমির ঢাল অনুসারে (উঁচু হইতে নিম্নদিকে) প্রবাহ জলের স্বাভাবিক ধর্ম বা স্বভাব। এসম্পর্কে ভূপৃষ্ঠের উপরে ও নীচে একই নিয়ম। সেজন্য ভূপৃষ্ঠের নীচের জলও নিম্নদিকে বহিয়া চলে। তবে এবিষয়ে শিলার গঠন, শিলাস্তরের গভীরতা, ঢাল প্রভৃতির প্রভাব খুব বেশী। প্রবেশ্য শিলাস্তরের মধ্যদিয়া জল সহজে প্রবেশ করিতে ও প্রবাহিত হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠে কোন ফাটল থাকিলে তাহার মধ্যদিয়া কিছু জল বাহিরে আসে। এভাবে **অতি সাধারণ প্রস্রবণের** (ঝর্ণা বা Surface spring) সৃষ্টি হয়। এরূপ প্রস্রবণের জলের পরিমাণ কম এবং বর্ষা ভিন্ন অন্য সময় ক্বচিৎ জল পাওয়া যায়। তবে প্রবেশ্য শিলাস্তরের নীচে অপ্রবেশ্য শিলাস্তর থাকিলে ঐ অপ্রবেশ্য শিলার ঠিক উপরে জলের সঞ্চয়ের সুবিধা অধিক। তথায় জলের সঞ্চয়ের ফলে প্রবেশ্য শিলার নীচের দিকের অংশ **আর্দ্র** বা **পরিপৃক্ত** হয়। তবে ক্রমশঃ উপরে আর্দ্রতার পরিমাণ কম। তারপর প্রবেশ্য শিলাস্তরের জল নীচের অপ্রবেশ্য শিলার উপরিভাগের ঢাল অনুসারে নিম্নদিকে বহিয়া চলে। এরূপ ক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠের কোন ফাটল প্রবেশ্য শিলার নীচের অপ্রবেশ্য শিলাস্তর পর্যন্ত অথবা তাহার উপরে আর্দ্র অংশ পর্যন্ত পৌছিলে, বা নীচের অপ্রবেশ্য শিলাস্তর কোথাও ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌছিলে, ঐ ফাটলের মধ্যদিয়া নীচের জল ভূপৃষ্ঠে আসে। এভাবে যে প্রস্রবণের সৃষ্টি হয় তাহার মধ্যদিয়া সমস্ত বৎসর জল পাওয়া যায়। তাহাকে **অবিরাম প্রস্রবণ** (Perennial or outcrop spring) বলে। বর্ষাকালে অধিক জল ভূত্বকের নীচে প্রবেশ ও সঞ্চয়ের সুযোগ পায়। তাই তখন পরিপৃক্ত বা আর্দ্র অঞ্চলের উপরিসীমা (Water table) উঁচু হয়। ফলে, তখন প্রস্রবণের মধ্য দিয়া বেশী জল বাহিরে আসে। অন্য সময় বৃষ্টির জল কম পাওয়া যায় বলিয়া ভূপৃষ্ঠের নীচে জলের উপরিসীমা অনেক নীচে নামিয়া যায়। তখন অনেক প্রস্রবণের মধ্য দিয়া জল পাওয়া যায় না, অথচ বর্ষাকালে পাওয়া যায়। এরূপ প্রস্রবণকে বলা হয় **সবিরাম প্রস্রবণ** (Intermittent spring)।

আর্টেজীয় প্রস্রবণ ও কূপ—আর এক জাতীয় প্রস্রবণের মাধ্যমে অনেক বেশী জল পাওয়া যায়। এরূপ প্রস্রবণের সৃষ্টি হয় যেখানে দুইটি অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের মাঝখানে একটি প্রবেশ্য শিলাস্তর কতক পরিমাণে অর্ধচন্দ্রের বা ডোঙ্গার (Synclinal) মত বাঁকিয়া থাকে। তথায় প্রবেশ্য শিলাস্তরে ভূপৃষ্ঠের জল প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে পরিপৃক্ত অংশের জলের উপরিসীমা পর্যন্ত বা তাহা অপেক্ষা নীচে কোথাও গর্ত বা ফাটল থাকিলে ঐ গর্ত বা ফাটলের মধ্যদিয়া জল (অধিক চাপের ফলে) বেগে

বাহির হয়। এরূপ প্রস্রবণকে **আর্টেজীয় প্রস্রবণ** বলে। সাধারণতঃ পাললিক শিলা অঞ্চলে এরূপ অবস্থা দেখা যায়। হিমালয়ের পাদদেশে বেলেপাথর অঞ্চলে, সাতপুরা পর্বতের উত্তরদিকে কংগ্লোমারেট শিলা অঞ্চলে এজাতীয় অবস্থা প্রচুর দেখা যায়। তামিলনাড়ুর নেভেলিতে এরূপ অবস্থার জন্য লিগনাইটের খনন কার্যে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এজন্য তথায় অনবরত পাম্প করিয়া জল বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

কতক মরুপ্রায় অংশেও এরূপ প্রস্রবণের সাহায্যে প্রচুর জল লাভের সুযোগ আছে; সেজন্য ঐ সকল স্থানে ভূপৃষ্ঠ হইতে নীচের দিকে পরিপৃক্ত অংশ পর্যন্ত গভীর কূপ খনন করা হয়। ইহাদিগকে বলা হয় **আর্টেজীয় কূপ** (Artesian well)। [ফরাসী
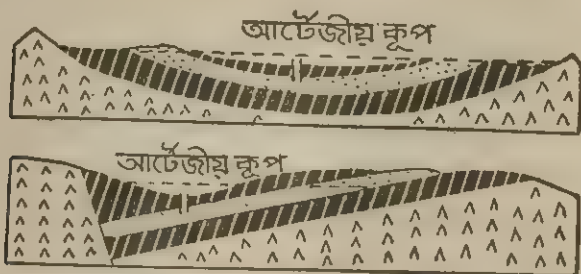
দেশের আঁতোয়া (Artois) প্রদেশে সর্বপ্রথম ঐ প্রকার কূপের জল পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া ঐ স্থানের নাম অনুসারে এই জাতীয় কূপের এরূপ নামকরণ হইয়াছে।] এরূপ কতক কূপ ৮০০ মিটারের অধিক গভীর। অস্ট্রেলিয়াতে এরূপ কূপের সাহায্যে মেষ ও গরু পালনের পক্ষে খুব সুবিধা হইতেছে।

উষ্ণ ও খনিজ প্রস্রবণ—সাধারণতঃ প্রস্রবণের জল শীতল। তবে কখন কখন পৃথিবীর মধ্যভাগের উত্তপ্ত পদার্থসমূহের সংস্পর্শে তথাকার জলও উষ্ণ হয় এবং তাহার কতক অংশ প্রস্রবণের মধ্য দিয়া বাহিরে আসে। ইহাদিগকে **উষ্ণ প্রস্রবণ** (Thermal or Hot spring) বলে। বিহারে মুঙ্গের জেলার সীতাকুণ্ডে ও আশপাশে, মহারাষ্ট্রে পশ্চিমঘাটের পশ্চিম পাদদেশের নিকট সঙ্গমেশ্বরে এবং উত্তর প্রদেশে কুমায়ুন অঞ্চলে কামেট ও নন্দাদেবী শৃঙ্গের পাশে কতক বিখ্যাত উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণের জলে খনিজ পদার্থের পরিমাণ প্রচুর। ইহাদিগকে **ধাতব** বা **খনিজ প্রস্রবণ** (Mineral spring) বলা হয়। বিহারের রাজগীর, উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বক্রেশ্বর প্রভৃতি স্থানের খনিজ প্রস্রবণ বিখ্যাত। বক্রেশ্বরের

জলের উষ্ণতা ৫৩-৭২° সে. এবং তাহাতে গন্ধকের পরিমাণ প্রচুর। ঐ প্রস্রবণ হইতে মূল্যবান্ অ্যামোনিয়া গ্যাস পাওয়া যায়।

গাইসার—কতক উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে কিছু সময় পর পর (সর্বদা নহে) উষ্ণ জল ও বাষ্প ফোয়ারার মত বাহিরে আসে। ইহাদিগকে গাইসার (Geyser) বলে। যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েলোস্টোন ন্যাশন্যাল পার্কের 'Old faithful' গাইসার বিখ্যাত। আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে এরূপ অবস্থা বেশী দেখা যায়। এপ্রকার কতক স্থানে উষ্ণ জল ১০০ মি. পর্যন্ত উঁচু হইয়া বাহির হয় এবং সে সময় প্রচণ্ড শব্দও হয়।

ভূত্বকের পরিবর্তন সম্পর্কে **প্রস্রবণের** মুখ্য **প্রভাব** খুব বেশী নয়, কিন্তু গৌণ প্রভাব যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন স্থানের প্রস্রবণ হইতে বহু নদনদী প্রাথমিক অবস্থায় প্রচুর জল লাভ করে। অনেক শুষ্ক অঞ্চলে প্রস্রবণকে কেন্দ্র করিয়া লোকবসতি বিস্তার লাভ করে। পশু পালন, এমন কি কৃষি সম্পর্কেও প্রস্রবণের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। কতক খনিজ প্রস্রবণের জল নানা রোগের ঔষধ।

ভূ-পৃষ্ঠের নিম্ন অংশের জলের যান্ত্রিক ক্ষয়ীভবন—ভূপৃষ্ঠের নিম্ন অংশের জলের প্রবাহের ফলে তথাকার **কোমল শিলা** অধিক পরিমাণে **ক্ষয়প্রাপ্ত** হয়। কখন কখন দেখা যায় যে ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের মাঝে মাঝে অপেক্ষাকৃত **কঠিন শিলার স্তম্ভ** দাঁড়াইয়া আছে। তাহাছাড়া ভূপৃষ্ঠের নীচে জলপ্রবাহের ফলে অনেক সময় তথাকার কতক স্থান যথেষ্ট পিচ্ছিল হইয়া পড়ে। আর তাহাদের উপরে ভূপৃষ্ঠে হয়ত পাহাড় অঞ্চলের মধ্য দিয়া টানেল তৈরী বা অন্য কোন কারণে বিস্তর পাথর কাটা হইয়াছে বা তথা হইতে প্রচুর পাথর অন্যত্র সরাইয়া নেওয়া হইয়াছে। অথবা হয়ত অন্য কোন কারণে তথাকার ভূমির (বিশেষতঃ পাহাড়ের) ঢাল খুব খাড়া। ঐরূপ স্থানের বিভিন্ন ফাটলের মধ্যদিয়া জল প্রবাহিত হওয়ার সময় কতক অংশ গলাইয়া ও ভাঙ্গিয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে কখন কখন উপরের বিরাট অংশ হঠাৎ ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িয়া যায়। ইহাকে **ভূপাত** বা **ধস** (Landslide) বলে। বর্ষাকালেই বেশী ধস হয়। প্রকাণ্ড ধসের ফলে আশপাশের বিস্তর ক্ষতি হয়। কাশ্মীরে, হিমালয় পর্বতে প্রকাণ্ড ধসের ফলে সিন্ধু নদের গতি সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং পাথর, নুড়ি প্রভৃতি দ্বারা নদীর পথে এক বিরাট হ্রদ সৃষ্টি হইয়াছিল।

অনুরূপ অবস্থাতে খুব উঁচু পাহাড়ের উপরদিকের বরফাবৃত অঞ্চলের ছোট, এমন কি বিস্তীর্ণ অংশও কখন কখন ধসিয়া পড়িতে পারে। ইহাকে **হিমানী সম্প্রপাত** (Avalanche) বলে। ইহার ফলে নীচের অংশের প্রভূত ক্ষতি হয়। আবার কখন কখন পাহাড়ের খাড়া ঢাল দিয়া উপরের অংশের শিলা, নুড়ি, মৃত্তিকা প্রভৃতি নীচে **গড়াইয়া পড়িতে পারে** (Soil creep)। উপরিলিখিত বিভিন্ন

অবস্থার ফলে পাহাড়, পর্বতের কতক অংশে খুব খাড়া ঢালের সৃষ্টি হইতে পারে। ঐ সকল স্থানে পরে নদী, তুষার প্রভৃতি দ্বারা অধিকতর ক্ষয়ীভবন, এমন কি পুনরায় ধসের সৃষ্টি হইতে পারে। অপর দিকে ধসের ফলে পতিত পাথর, নুড়ি প্রভৃতি নীচের অংশে (পাহাড়ের গায়ে) প্রচুর পরিমাণে জমিবার ফলে **ধাপের মত অবস্থারও** সৃষ্টি হইতে পারে।

ভূপৃষ্ঠের নিম্ন অংশে জলের রাসায়নিক পরিবর্তন—বৃষ্টির জল ভূপৃষ্ঠ হইতে নীচের (ভিতর) দিকে নামিয়া যাওয়ার কালে অথবা ভূপৃষ্ঠের নিম্ন অংশে ভূমির ঢাল অনুসারে প্রবাহিত হওয়ার সময়, নানারকম গ্যাস ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ তাহার সহিত মিশ্রিত হয়। কতক গ্যাস ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ জলের সহিত মিশ্রিত হইলে ঐ জল বহু উপাদানকে সহজে গলাইতে পারে। যেমন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা অঙ্গারাম্লজান মিশ্রিত জলদ্বারা চুনাপাথর সহজে গলিয়া যায়। তাই এরূপ মিশ্রিত জলদ্বারা বিভিন্ন শিলার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে।

এরূপ জল **চুনাপাথর অঞ্চলের** উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ার সময় ঐ শিলার বিভিন্ন ফাটল ক্রমশঃ বড় হয় এবং শিলাসমূহ খণ্ড বিখণ্ড বা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়. বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে ক্লিন্টস বা লেপিস বলে। তাহাছাড়া জলের সংস্পর্শে ঐ শিলা (ইহা প্রবেশ্য এবং সহজে গলনশীল) গলিয়া তথায় বিভিন্ন আকৃতির **গুহা** বা **গহ্বর** সৃষ্টি হয়। হিমালয় অঞ্চলে এরূপ বহু গুহা আছে। কতক গুহার নিম্ন অংশে হয়ত কিছু জল জমিয়া থাকে, কিন্তু অধিকাংশ জল গুহার মধ্যদিয়া নীচের দিকে চুয়াইয়া যায়। তারপর ঐ চুয়ানো জল যখন গুহার উপর অংশ হইতে নীচে পড়ে, তখন জল বাষ্পে পরিণত হইলেও তাহার সহিত মিশ্রিত চুণ বিন্দু বিন্দু অবস্থায় গুহার মেঝেতে জমিতে থাকে। চুনের বিন্দুগুলি এভাবে জমিয়া কালক্রমে ছোট বড় স্তম্ভের আকার ধারণ করে। ইহাদিগকে **স্ট্যালেগমাইট** (Stalagmite) বলে। আবার গুহার উপর দিকের যে সকল স্থান হইতে জল চুয়াইয়া পড়ে তথায়ও দেখা যায় বিন্দু বিন্দু চুণ জমিয়া আছে। কালক্রমে সেখানে কতক স্তম্ভের সৃষ্টি হয়। তবে সেগুলি উপর হইতে নীচের দিকে ঝুলিয়া থাকে। তাহাদিগকে বলে
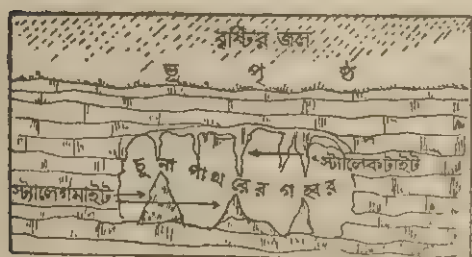
স্ট্যালেকটাইট ও স্ট্যালেগমাইট

স্ট্যালেকটাইট (Stalactite)। কখন কখন উভয় জাতীয় স্তম্ভ মিলিতও হইতে পারে। মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের নিকট এরূপ অবস্থা দেখা যায়।

চুনাপাথর অঞ্চলে জল খুব সহজে চুয়াইয়া যাইতে পারে বলিয়া তথায় নদনদী সৃষ্টির সুযোগ কম। আবার এরূপ কতক স্থানে অধিক ক্ষয়ীভবন ও সঞ্চয় প্রভৃতির ফলে ভূপৃষ্ঠ বিচিত্র রূপ (অল্প গভীর বা অধিক গভীর খাত, গহ্বর, খাড়া ভগ্ন অংশ ইত্যাদি) ধারণ করে। য়্যাড্রিয়াটিক সাগরের উত্তরপূর্বদিকে ইটালির ট্রিয়েস্টির আশপাশে চুনাপাথর অঞ্চলে এই অবস্থা খুব স্পষ্ট এবং তাহা **কার্স্ট** (Karst or Carso) ভূপ্রকৃতি নামে পরিচিত। তথাকার নামানুসারে অন্যান্য স্থানের চুনাপাথর অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতিকেও বলা হয় কার্স্ট।

(৩) হিমবাহ

উভয় মেরু অঞ্চলে প্রবল শীতের জন্য সমস্ত বৎসর তুষারপাত হয়। আর নাতি-শীতোষ্ণ ও উষ্ণ মণ্ডলের উচ্চভূমিতে সাধারণতঃ শীতকালে তুষাররাশি সঞ্চিত হয়। নীচের দিকে তুষারের কতক অংশ বসন্ত ও গ্রীষ্ম কালে গলিয়া যায় এবং বাকী তুষার স্থির থাকে। যে নির্দিষ্ট সীমারেখার উপরিভাগের তুষার কখনও গলে না, তাহাকে **হিমরেখা** (Snow line) বলে। মেরুদ্বয়ে **স্থায়ী হিমরেখা** সমভূমিতে অবস্থিত, গ্রীনল্যাণ্ডে ইহার উচ্চতা ৬০০ মিঃ, ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডে ৯০০ মিঃ, আল্পস পর্ব্বতে ২,৭০০ মিঃ, হিমালয়ের উত্তর অংশে প্রায় ৬,২০০ মিঃ। (এখানে সূর্যরশ্মি দক্ষিণ অংশের মত সোজাসুজি পাওয়া যায় না বলিয়া শীত অধিক।) আর পূর্ব্ব আফ্রিকা ও হিমালয়ের দক্ষিণ অংশে হিমরেখার উচ্চতা ৪,৮০০ মিঃ। শীতকালে অধিক শীতের জন্য হিমরেখা সাময়িকভাবে গ্রীষ্মকালের হিমরেখার তুলনায় অধিক নিম্নে নামিয়া যায়।

পৃথিবীর সর্বত্র উপরদিকের তুষারের চাপে নীচের তুষাররাশি দৃঢ় হইয়া বরফে পরিণত হয়। এপ্রকার বরফস্তূপ শীতের তুষারপাতের ফলে যথেষ্ট বড় ও উঁচু হয়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে ইহার উপরদিকের কতক অংশ গলিয়া যায় বলিয়া তখন কিছুটা ক্ষীণ হয়। তুষারগলা জল বরফ-স্তূপের নীচের দিকে গড়াইবার সময় এখানকার তীব্র শীতে পুনরায় তুষারে পরিণত হয় এবং বরফস্তূপকে আরও দৃঢ় করে। এরূপ অবস্থার ফলে মেরু অঞ্চলে ও কতক পার্বত্য অংশে বিভিন্ন বৎসরে সঞ্চিত তুষাররাশির ভিন্ন ভিন্ন **স্তরের চিহ্ন** (Indication of stratification) সুস্পষ্ট। উভয় মেরু অঞ্চলে ও হিমালয়, আল্পস প্রভৃতি পর্বতের উচ্চ অংশে বিশাল **তুষার অঞ্চলের** (Snow fields) সৃষ্টি হয়। মোটামুটি হিসাবে ভূপৃষ্ঠের ১০% তুষার অঞ্চলের অন্তর্গত।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বিরাট বিরাট বরফস্তূপের কতক অংশ মাঝে মাঝে গলিয়া

যায়। ঐ বরফগলা জল আবার অধিক শীতে তুষারে পরিণত হয়। এরূপ বরফস্তূপ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ভূমির ঢাল অনুসারে নিম্নদিকে বিস্তৃত হয়। ইহাকে বলা হয় **হিমবাহ** (Glacier) বা বরফের নদী। ভারতের উত্তর অংশে কারাকোরম পর্বতের **গ্রেট বাল্‌টরো পৃথিবীর দীর্ঘতম** (৫৭-৫৮ কি. মি. দীর্ঘ) **হিমবাহ।** এভারেস্ট শৃঙ্গের নিকট রংবুক, কাংশুঙ্গ প্রভৃতি আরও অনেক প্রসিদ্ধ হিমবাহ আছে।

হিমবাহের প্রবাহ বা গতি—উপরের তুষারের চাপে হিমবাহের নীচে বরফ সৃষ্টি হয়, আবার কিছু পরিমাণ বরফ গলিয়া যায়। ইহাতে তুষারস্তূপের নীচের অংশ পিচ্ছিল হয়। এই অবস্থাতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে কঠিন বরফস্তূপ ধীরে * ধীরে নীচে নামিয়া আসে। ইহার গতি গ্রীনল্যাণ্ডে দৈনিক গড়ে প্রায় ২ মিটার (গ্রীষ্মকালে অধিক), কিন্তু আল্পস পর্বতে হিমবাহের গতি তাহার $\frac{১}{৪}$ অংশ।

হিমানী সম্প্রপাত—হিমবাহের পার্শ্বদেশ অপেক্ষা মধ্যভাগের গতিবেগ বেশী, আবার নিম্নদিকের তুলনায় উপরদিকের গতিবেগ অধিক। হিমবাহ পাহাড়, পর্বতের খাড়া অংশে পৌছিলে তাহার নিম্ন অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পাহাড়, পর্বতের কতক অংশসহ প্রচণ্ড বেগে নীচে পড়িয়া যায়। এই ঘটনাকে বলে **হিমানী সম্প্রপাত** (Avalanche)। ইহার ফলে বহু পর্বতারোহী ও পার্বত্য অঞ্চলের পশুপালকের মৃত্যু এবং গাছপালা, জীবজন্তু প্রভৃতির বিস্তর ক্ষতি হয়।

তুষারস্তূপ ও হিমবাহের বিভাগ—পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সঞ্চিত তুষারস্তূপ ও হিমবাহ চারি ভাগে বিভক্ত।

(ক) **বরফস্তূপ**—উচ্চ মালভূমি ও পর্বতের উপরিভাগে বিরাট বরফস্তূপ (Ice-sheets and Ice-caps) সঞ্চিত হয়। পরে এখান হইতে উপত্যকা-হিমবাহের উৎপত্তি হয়।

(খ) **মহাদেশীয় বরফস্তূপ ও হিমবাহ**—উভয় মেরু অঞ্চল পৃথিবীর শীতলতম অংশ। তাই উভয় মেরুর চারিপাশে সমুদ্র ভাসমান বরফের রাজ্য। বরফের $\frac{৯}{১০}$ ভাগ জলের নীচে থাকে, তবু সেখানকার বরফস্তূপ অতি বিরাট। পূর্ব্বে সেখানকার বরফস্তূপ আরও বেশী বিস্তৃত ছিল। কখনও কুমেরুর চতুর্পার্শ্বস্থ **অ্যান্টার্কটিকার বরফস্তূপের** আয়তন প্রায় ৯০ লক্ষ বর্গ কি মি বা সমগ্র ইউরোপের প্রায় সমান। এই বিরাট বরফের রাজ্যের মধ্যভাগের বরফের উচ্চতা ২২৮৬ মি, বাহিরের প্রান্তদেশের উচ্চতা ২৪৪ মি। উত্তর গোলার্ধের গ্রীনল্যাণ্ডের বরফস্তূপের আয়তন প্রায় ১৩ লক্ষ বর্গ কি মি বা উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চলের প্রায় সমান। সেখানে মধ্যভাগের বরফ-

---

* হিমবাহের মধ্যভাগে ও উপরের অংশে ঘর্ষণ (Friction) কম বলিয়া ঐ দুই অংশে হিমবাহের গতি অধিক, হিমবাহের দুই পাশে ও নীচে গতি স্বভাবতঃ কম।

স্তূপের উচ্চতা য়্যাণ্টার্কটিকার মধ্যভাগের বরফস্তূপের চেয়েও বেশী। এই দুই জায়গার বরফস্তূপের আয়তন পৃথিবীর অপর সকল অংশের তুষারস্তূপ ও হিমবাহের চেয়ে অনেক বেশী। এখানকার সমুদয় বরফ গলিয়া যাওয়া সম্ভব হইলে পৃথিবীর সকল সাগর, মহাসাগরের জলের পরিমাণ এত বাড়িয়া যাইবে যে ৬০-৬৫ মি পর্যন্ত উঁচু সমুদয় স্থলভাগ জলে ডুবিয়া যাইবে। সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চলের কতক বরফস্তূপ বা **হিমশৈল** (Iceberg) ভাসিতে ভাসিতে বহুদূর চলিয়া আসে। উষ্ণতর অংশে ইহা অধিক গলিতে আরম্ভ করিলে প্রচুর কুয়াসা হয়, আর ইহার মধ্যস্থিত কাঁকর, বালুকা, নুড়ি প্রভৃতি সমুদ্রের তলদেশে জমিয়া **মগ্নচড়ার** (.Submerged bank) সৃষ্টি হয়।

মেরু অঞ্চলের আশেপাশে নোভাজেম্‌লা, আইসল্যাণ্ড, স্পিটস্‌ বারজেন প্রভৃতি দ্বীপে বিরাট বরফস্তূপ আছে। এসকল বরফস্তূপকে **দ্বৈপ বরফ** বলা হয়।

(গ) **উপত্যকা হিমবাহ বা পার্বত্য হিমবাহ**—বহুপূর্বে (বরফ যুগে) বিভিন্ন স্থানের উচ্চ পর্বতসমূহের উপরিভাগে বিস্তীর্ণ বরফময় অঞ্চলের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাদের কতক অংশ পরে হিমবাহরূপে বিভিন্ন উপত্যকার মধ্য দিয়া নীচের দিকে নামিয়া আসে; ইহাদিগকে **উপত্যকা হিমবাহ** (Valley glacier) বলে। উচ্চ পর্বত-সমূহে পরবর্তী সময়ে সঞ্চিত বরফস্তূপের কতক অংশও আগেকার বিভিন্ন উপত্যকার মধ্য দিয়া হিমবাহরূপে প্রবাহিত হয়। ইহাকে **পার্বত্য হিমবাহও** (Mountain or Alpine glacier) বলা হয়। এরূপ স্থানে বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি হইলে হিমবাহের পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পূর্বে যেখানে হিমবাহ ছিল, পরে সেখানে হিমবাহ দেখা যায় না। এইরূপ অবস্থাকে **হিমবাহের পশ্চাৎ অপসরণ** (retreat) বলা হয়। আল্পস পর্বত অঞ্চলে ইহার প্রমাণ আছে।

পার্বত্য অঞ্চলে বরফস্তূপের মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড **ফাটল** থাকে; তাহাকে **বার্গস ক্রাণ্ড** (Bergs-chrund) বলে। পার্বত্য অঞ্চলের যে অংশের ঢাল অধিক, সেখানে বরফের মধ্যে ফাটল আরও বড়। ইহাদিগকে **ক্রিভাস** (Crevasse) বলা হয়। অধিক ঢালু অংশ হইতে কখন কখন **তুষারপ্রপাত** (জলপ্রপাতের মত) হয়; ইহাকে বলা হয় **সিরাক** (Seracs)। ফ্রান্সে মণ্ট ব্ল্যাঙ্ক শৃঙ্গ অঞ্চলে তুষারপ্রপাত দেখা যায়।

(ঘ) **পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশের হিমবাহ**—উপত্যকার হিমবাহ নীচে নামিয়া আসিয়া কখন কখন পর্বতের পাদদেশে বহুদূর বিস্তৃত হয়। ইহার অবস্থা বরফের হ্রদের মত। ইহাকে **পাদদেশের হিমবাহ** বলে। **আইস্‌ল্যাণ্ড, আলাস্কা** এবং **য়্যাণ্টার্কটিকাতে** এপ্রকার বিস্তীর্ণ হিমবাহ আছে। পাদদেশের হিমবাহের অগ্রভাগকে **বরফের লোব** (Lobe of ice) বলে।

হিমবাহের কার্য

নদীর জলস্রোতের মত হিমবাহও (ক) ক্ষয়, (খ) বহন ও (গ) সঞ্চয়—এই তিন প্রকার কাজ করে।

(ক) **হিমবাহের ক্ষয়কার্য**—হিমবাহ দুইভাবে ইহার উপত্যকার ক্ষয়কার্য করে। যেমন, (১) ইহার কতক অংশ গলিয়া জলে পরিণত হয়, আবার এই জলের কতক অংশ শীতে বরফে পরিণত হয়। এরূপ পরিবর্তনের সময় উপত্যকার ও হিমবাহের তলদেশের বহু **প্রস্তরখণ্ড** পূর্বের অবস্থা হইতে **বিচ্ছিন্ন** হয়। ইহাকে Plucking বলে। (২) তাহা ছাড়া হিমবাহের তলদেশের প্রস্তরখণ্ডসমূহের **ঘর্ষণে** (Abrasion) উপত্যকার অধিক ক্ষয়ীভবন হয়। পাথর, নুড়ি প্রভৃতির ঘর্ষণে উপত্যকার গায়ে দাগ পড়ে ও মসৃণ **শিলাচূর্ণ** (Rock flour) সৃষ্টি হয়। অধিক ঘর্ষণের ফলে হিমবাহ-উপত্যকার পার্শ্বদেশের (Sides) অবস্থা হয় খুব খাড়া এবং ইহার **আকৃতি** হয় U-এর মত। উপত্যকার এরূপ অবস্থার নাম **সার্ক** (Cirque)। পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি সার্কের (Cirque) মাঝখানের খাড়া উঁচু অংশকে **এরিটিস** (Aretes) বলা হয়, আর পাশাপাশি অবস্থিত তিন, চারিটি সার্কের মধ্যভাগের পিরামিডের মত উচ্চভূমিকে **পিক** (Peak)
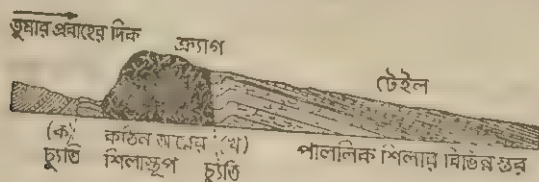
বলে। হিমবাহের প্রবাহের পথে খুব কঠিন শিলাখণ্ড থাকিলে হিমবাহ তাহাকে, এমন কি তাহার পিছনদিকের (Lee) কতক অংশকে, ক্ষয় করিতে অসমর্থ হয়। এসময় ঐ শিলাখণ্ডের পিছনদিকে কতক অংশ অন্যান্য স্থানের তুলনায় উঁচু হইয়া থাকে। ইহাকে ঐ শিলাখণ্ডের লেজের মত মনে হয়। কঠিন শিলার সম্মুখের ও পিছন দিকের এইরূপ অবস্থাকে ক্র্যাগ ও টেইল (Crag and tail) বলে।

কখন কখন U-আকৃতিবিশিষ্ট উপত্যকার **মধ্যভাগে** (হিমবাহ গলিয়া) **হ্রদ** সৃষ্টি হয়। অসমানভাবে ক্ষয়ীভবনের ফলে কখনও বা এরূপ উপত্যকার কতক অংশে **ধাপ** বা সিঁড়ির মত অবস্থা ঘটে। ইহাকে বেঞ্চ (Benches) অথবা আল্পস (Alps) বলে।

লম্বিত বা ঝুলান উপত্যকা—পার্বত্য অঞ্চলের কতক নদী ও উপনদীর উপত্যকার মধ্য দিয়া কখন কখন হিমবাহ প্রবাহিত হয়। উপনদীর উপত্যকার তুলনায়

মূল নদীর উপত্যকার মধ্য দিয়া অধিক বরফের প্রবাহের ফলে তাহা অধিক গভীর হয়। পরে বরফ গলিয়া গেলে দেখা যায় যে উপনদীর উপত্যকা উপরে ও মূল নদীর উপত্যকা নীচে। এরূপ অবস্থায় উপরের উপনদীর উপত্যকাকে ঝুলান উপত্যকা (Hanging Valley) বলে। কখন কখন হিমবাহ-উপত্যকার শেষ অংশে অত্যন্ত খাড়া অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইহাকে ট্রাফ এণ্ড (Trough end) বলে। ঐ অংশ দিয়া জল প্রায় প্রপাতের মত নীচে মূল নদীতে পড়িতে পারে।

(খ) **হিমবাহের পরিবহন**—তুষার ও হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে প্রচুর প্রস্তর, কাঁকর প্রভৃতি হিমবাহের উপর পতিত হয়। ইহাদের কতক অংশ হিমবাহের ফাটলের (Crevasse) মধ্যদিয়া হিমবাহের তলদেশে গিয়া সঞ্চিত হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রস্তর, বালুকা ও কর্দম-মিশ্রিত এসকল উপাদানকে বোল্ডার ক্লে (Boulder clay) বা টিল (Till) বলে। ইহাদের অপর কতক অংশ হিমবাহের সহিত ক্রমশঃ নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়।

(গ) **হিমবাহের সঞ্চয়কার্য**—হিমবাহের সহিত প্রবাহিত প্রস্তরখণ্ড, বালুকা, কর্দম প্রভৃতি ক্রমশঃ ইহার পথের আশেপাশে এবং তলদেশে সঞ্চিত হয়। ইহাদিগকে

(ক) পার্শ্ব গ্রাবরেখা (খ) মধ্য গ্রাবরেখা (ক) পার্শ্ব গ্রাবরেখা

গ্রাবরেখা (Moraine) বলে। উপত্যকার পার্শ্বে সঞ্চিত গ্রাবরেখাকে **পার্শ্ব গ্রাবরেখা** (Lateral moraine), দুইটি হিমবাহের মিলনের ফলে ইহাদের মধ্য অংশে সঞ্চিত গ্রাবরেখাকে **মধ্য গ্রাবরেখা** (Medial moraine) এবং হিমবাহের নিম্ন অংশে সঞ্চিত গ্রাবরেখাকে **ভূমি গ্রাবরেখা** (Ground moraine) বলে। তারপর

হিমবাহের শেষ প্রান্তে যেখানে ইহা গলিয়া যায়, সেখানে **প্রান্ত গ্রাবরেখা** (Terminal moraine) সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সময়ে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে হিমবাহের আয়তন মাঝে মাঝে কমিয়া যাইতে পারে। ইহাকে **হিমবাহের প্রত্যাবর্তন** (Retreat) বলে। এরূপ অবস্থার ফলে একাধিকবার প্রান্ত গ্রাবরেখা সৃষ্টি হইতে পারে। তাহাদের মাঝখানে জল জমিয়া **হ্রদও** তৈরী হইতে পারে। গ্রাবরেখা দ্বারা কখন কখন **বৃত্তাংশ** তৈরী হয়। কখনও বা গ্রাবরেখা বিভিন্ন আকৃতি ও আয়তনের **স্তূপের** আকারে সারিতে সারিতে সঞ্চিত হয়। বিস্তীর্ণ স্তূপকে **ড্রামলিন** বলে। ইহার আকৃতি উল্টান নৌকার মত। আয়ারল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে এইরূপ অবস্থা দেখা যায়। ফিন্‌ল্যাণ্ড, সুইডেন প্রভৃতি দেশে হিমবাহের তলদেশে মোটা বালুকারাশি এবং প্রস্তরখণ্ড দেখা যায়। ইহাদিগকে বলা হয় **এস্কার**। নদীর বদ্বীপের মত কৌণিক আকৃতিতে সঞ্চিত এরূপ উপাদানকে বলা হয় **ক্যামেস**। কখনও বা নিম্নস্থানসমূহ গ্রাবরেখা দ্বারা ভরিয়া গিয়া উর্বর **হিমবাহ সমভূমি** (Glacial plain) সৃষ্টি হয়। উত্তর আমেরিকার প্রেইরী তৃণভূমিতে প্রাচীন আগাসিস হ্রদ অঞ্চলে এভাবে বিস্তীর্ণ উর্বর সমভূমি সৃষ্টি হইয়াছে।

(৪) বায়ুপ্রবাহ ও তাহার কার্য

বায়ুর মধ্যস্থিত অম্লজান, অঙ্গারাম্লজান, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি উপাদান দ্বারা বিভিন্ন উপায়ে ভূপৃষ্ঠের **রাসায়নিক পরিবর্তন** হয়। যেমন, বায়ুর মধ্যস্থিত **অম্লজানের** (Oxygen) সংস্পর্শে লোহাতে মরিচা পড়ে এবং লৌহমিশ্রিত শিলার অধিক পরিবর্তন হয়। আর **অঙ্গারাম্লজানের** (Carbon di-oxide) সংস্পর্শে
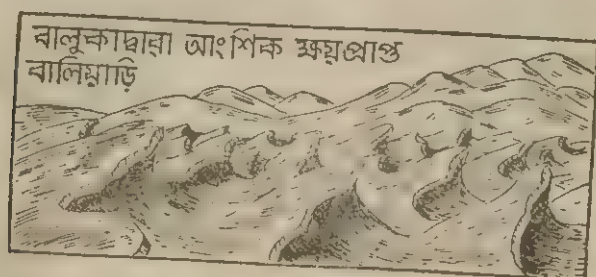
(বিশেষতঃ ইহা বৃষ্টির জলের সহিত মিশিয়া) চুনাপাথরের সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন ঘটায়। সাধারণতঃ শুষ্ক বায়ুর চেয়ে **জলীয় বাষ্পপূর্ণ** আর্দ্র বায়ু দ্বারা ভূপৃষ্ঠের

অধিক* ক্ষয় হয়। অথচ বায়ুদ্বারা ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন হয় **মরুভূমিতে**। কারণ তথায় বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। তাছাড়া সেখানে ক্ষয়ীভবন সংক্রান্ত অন্যান্য শক্তি কার্যকরী নয়। মোটামুটি হিসাবে ভূ-পৃষ্ঠের ⅕ অংশের অধিক মরুভূমি বা মরুপ্রায়। ইহাদের বৃহত্তম অংশ আফ্রিকাতে। **সমুদ্রের উপকূল** ও অন্যান্য বালুকাময় স্থানে বায়ুর ক্ষয়কার্যের পরিমাণ মরুভূমি অঞ্চলের পরে।

বায়ুর দ্বারা ভূপৃষ্ঠের কিছু **যান্ত্রিক** বা সাধারণ **পরিবর্তনও** ঘটে। যেমন, মরুভূমিতে বালুকা, কাঁকর ও প্রস্তরখণ্ড-মিশ্রিত প্রবল বায়ুর বেগে পাহাড়, টিলা প্রভৃতির কতক অংশ ভাঙিয়া চুরমার হয়। কোথাও কোথাও অবশিষ্ট অংশ স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া থাকে। কোথাও বা মরুভূমির নিম্ন অংশে বালুকারাশি জমিয়া তাহা সমভূমিতে পরিণত হয়। তাহাছাড়া মরুভূমিতে ও সমুদ্রের উপকূলে বায়ুবেগে পূর্বের বালিয়াড়ি ভাঙিয়া নিত্য নূতন বালিয়াড়ি সৃষ্টি হয়।

মরু অঞ্চলে লাল বেলেপাথরের স্তম্ভ

বায়ুপ্রবাহের কাজও নদীর জলস্রোতের কাজের মত ক্ষয়ীভবন, বহন ও সঞ্চয়—এই তিন ভাগে বিভক্ত। যেমন—

(১) **বায়ুপ্রবাহের ক্ষয়ীভবন** (Aelian erosion) তিন ভাগে বিভক্ত:

(ক) **অবনমন—মরু অঞ্চলে** বায়ুপ্রবাহের প্রথম কাজ অবনমন (Deflation)। বায়ুপ্রবাহ মরুভূমির উপরিভাগের শুষ্ক ও আলগা ভাবে অবস্থিত বালুকারাশিকে সহজে উড়াইয়া লইয়া যায়। ফলে, তথায় নানারকম নিম্নভূমির সৃষ্টি হয়। যেমন, নীলনদের পশ্চিমদিকে চুনাপাথর অঞ্চলে কাইয়ুম নিম্নভূমির তলদেশ সমুদ্রসমতল হইতে প্রায় ৪০ মি ও কাটারা নিম্নভূমির তলদেশ প্রায় ১৩৪ মিঃ নীচু। এরূপ কতক নিম্নভূমিতে মরূদ্যান, কোথাও বা লবণাক্ত জলের হ্রদ আছে।

---

* মিশরের মরুভূমিতে যে মনুমেন্টের মত Obelisk ৩,০০০ বৎসর প্রায় অপরিবর্তিত ছিল, তাহা নিউ ইয়র্কের সেনট্রাল পার্কে স্থানান্তরের ফলে তথাকার আর্দ্র জলবায়ুর জন্য শীঘ্র ক্ষয় হইতে লাগিল। এজন্য তথায় তাহাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

(খ) **ঘর্ষণ**—মরু অঞ্চলে প্রবল বায়ুপ্রবাহের সহিত প্রচুর বালুকা এবং কখন কখন অত্যন্ত কঠিন কোয়ার্ৎজ শিলার নানাপ্রকার টুকরা প্রবাহিত হয়। উহাদের ঘর্ষণের (Abrasion) ফলে ভূপৃষ্ঠের উপরদিকে এক মিটারের মধ্যেই বায়ুদ্বারা অধিক ক্ষয়কার্য হয়। সমজাতীয় শিলা প্রায় সমানভাবে ক্ষয় ও মসৃণ হয়। তবে সাধারণতঃ শিলা-সমূহের গঠন বিভিন্ন বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ অবস্থার সৃষ্টি হয়। কোথায়ও দেখা যায় কেবল আঁচড় কাটার চিহ্ন, কোথাও জোরে দাগ কাটার চিহ্ন, কোথাও মৌচাকের মত অবস্থা।

কোয়ার্ৎজের দীর্ঘদিন ঘর্ষণের ফলে বিভিন্ন শিলার টুকরাগুলি ভাঙ্গিয়া বড় অংশগুলি নিকটেই পড়িয়া থাকে। কখন কখন ঘর্ষণ ও ক্ষয়ের ফলে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ও প্রায় সমান উঁচু স্তম্ভের মত সৃষ্টি হয়। ইহাদের বলা হয় **জুগেন**। কখনও ঘর্ষণের ফলে ঢেউয়ের মত অবস্থার সৃষ্টি হয়। কখনও বা শিলার সম্মুখভাগ (যেদিকে বায়ুর আঘাত লাগে) প্রায় গোলাকার থাকে এবং তাহার উপরিভাগের অবস্থা হয় একটি নৌকার উল্টান অবস্থার মত। এরূপ পৃথক্ পৃথক্ শিলাস্তম্ভ পাশাপাশি থাকিলে তাহাকে **ইয়ারডাঙ্গ** বলে। মধ্য-এশিয়ার মরু অঞ্চলে এরূপ অবস্থা দেখা যায়।
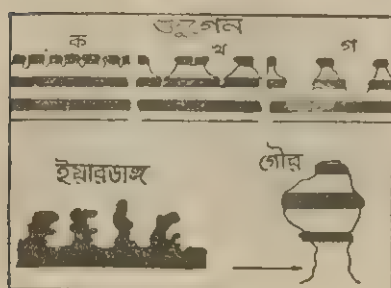
আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিতে শিলাসমূহের অসমানভাবে ক্ষয়ের ফলে দেখা যায় শিলাস্তম্ভের নীচের অংশ সরু, উপরদিক্ তাহার তুলনায় বিস্তৃত। ইহাদের বলা হয় **গৌর**। দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমিতে দেখা যায় অসমান ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত কঠিন শিলাস্তম্ভ বা **ইন্‌সেল্‌বার্জ**।

কখন কখন দেখা যায় একটি শিলাস্তর ধীরে ঢালু হইয়া গিয়াছে। ইহাকে **পেডিমেণ্ট** বলা হয়। পাহাড় ও মালভূমির শিলার গায়ে ক্রমাগত বালুকার সহিত প্রবাহিত কোয়ার্ৎজ ও অন্যান্য কঠিন উপাদানের ঘর্ষণ হয়। তাহার ফলে শিলা ক্ষয় (Attrition) হইতে হইতে তাহাও প্রায় গোলাকার বালুকাকণাতে পরিণত হয়। ইহাদের আকৃতি সরিষা, রাগি, বাজরা প্রভৃতির মত। মরু অঞ্চলের ক্ষয়ীভবনের ইহাই শেষ পরিণতি।

(২) **পরিবহন**—মরুভূমির ক্ষয়প্রাপ্ত ছোট ও হাল্‌কা উপাদানগুলি প্রবল বায়ু দ্বারা বহুদূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। সাহারা মরুভূমির লাল বালুকা ইটালি এবং ফ্রান্সের দক্ষিণ অংশ পর্যন্ত (কখন কখন ইংলণ্ডের নিকট পর্যন্ত) প্রবাহিত হয়।

(৩) **সঞ্চয়**—মরু অঞ্চলে বায়ুর সঞ্চয় কার্যসম্পর্কে পার্থক্য বিস্তর। বড় বড় পাথর ক্ষয়প্রাপ্ত অঞ্চলের নিকটেই সঞ্চিত হয়, কারণ বায়ু এগুলিকে সরাইতে পারে না। কিন্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম বালুকারাশি বায়ুবেগে বহুদূরে গিয়া সঞ্চিত হয়। বস্তুতঃ মরুভূমিতে প্রবল ঝড়ের সময় বালুকারাশি এত বেশী উড়িতে থাকে যে তাহার ফলে মাঝে মাঝে চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া যায়, এমন কি সূর্যকেও দেখা যায় না। সেজন্য নীলনদের উপত্যকাতে ইউক্যালিপ্টাস, বাবলা (Acacia), খেজুর প্রভৃতি গাছের সারি রোপন করিয়া তথাকার মরূদ্যানগুলিকে বালুকার আক্রমণ হইতে রক্ষা করা হয়। বায়ুবেগে প্রবাহিত বালুকারাশি পথে কোথাও সামান্য দু একটি বড় পাথরের টুকরাতে বাধা পাইলেই কিছুক্ষণের মধ্যে তথায় **বালিয়াড়ি** (Sand-dune) বা বালুকার বেশ বড় ঢিবি সৃষ্টি হয়। তাহা আধ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বালিয়াড়ির বাহির দিক্‌কে (যেদিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়) বলা হয় বালিয়াড়ির **মস্তক** (Head-dune), আর
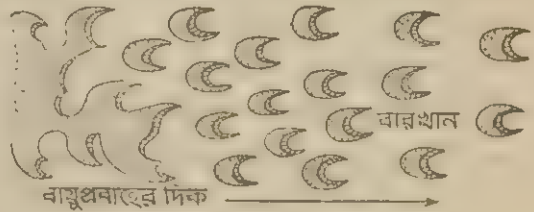
ভিতর দিককে বলা হয় বালিয়াড়ির **পুচ্ছ** বা লেজ। বহু দীর্ঘ বালিয়াড়িকে বলা হয় **সীফ বালিয়াড়ি**। বড় বালিয়াড়ির সামনে অবস্থিত ছোট বালিয়াড়িকে **অগ্রগামী** বালিয়াড়ি বলে। অর্ধচন্দ্রের মত বাঁকা বালিয়াড়িকে বলে **বারখান**। পূর্ব তুর্কীস্থানের মরু অঞ্চলে বায়ু কয়েক মাস উত্তরদিকে ও কয়েক মাস দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়। ফলে, তথায় বাঁকা বালিয়াড়িগুলিও বিভিন্ন সময়ে তাহাদের দিক্ পরিবর্তন করে।

মরু অঞ্চলে ছোট পাহাড়, মালভূমি প্রভৃতি ক্ষয়ীভবনের ফলে **মরু-সমভূমি** (Desert plain) হয়। নীচু জায়গাগুলিতে বালুকা সঞ্চয়ের ফলেও সমভূমি সৃষ্টি হয়।

লোয়েস—মধ্য-এশিয়ার গোবি মরুভূমির হল্‌দে বালুকারাশি উড়িয়া গিয়া হোয়াংহো নদীর অববাহিকার প্রাচীন শিলার উপর সঞ্চিত হইয়াছে। তথাকার আয়তন প্রায় ৬½ লক্ষ বর্গ কি. মি এবং বালুকারাশি স্থানে স্থানে ৯১-৩০৫ মিঃ গভীর। এই অঞ্চল "**লোয়েস**" (Loess) **সমভূমি** বা নিম্ন মালভূমি নামে পরিচিত।

সমুদ্র-উপকূলে বায়ুর কার্য—সমুদ্র-উপকূলেও বায়ুদ্বারা ভূপৃষ্ঠের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। বায়ুর প্রভাবে নেদারল্যাণ্ডস, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের এবং ভারতের পশ্চিম উপকূলে (কচ্ছ উপকূলে) বালুকা সঞ্চয়ের ফলে কতক ভূমির উর্বরতা নষ্ট হইয়াছে।

(৫) সমুদ্রস্রোত, জোয়ার-ভাটা ও তরঙ্গের কার্য

সামান্য ঢেউ বা মৃদু তরঙ্গের ফলে সমুদ্রের জল সর্বদা উঠানামা করে, কিন্তু প্রায় একই জায়গাতে থাকে, অন্যত্র প্রবাহিত হয় না। সেজন্য ইহাদ্বারা উপকূলের সামান্যই ক্ষয়ীভবন হয়। ইহার সহিত কিছু কিছু বালুকা, কাঁকর প্রভৃতি তীরভূমির উপরদিকে সঞ্চিত হয়। কাজেই ইহার কাজ **গঠনমূলক**। অপরদিকে প্রবল বায়ুপ্রবাহ, জোয়ার-ভাঁটা ও সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে সমুদ্রে **প্রকাণ্ড তরঙ্গ** সৃষ্টি হইলে জল উপকূলের দিকে অগ্রসর হয়। ইহাদ্বারাও উপকূলে বালুকার সঞ্চয় হয়। তবে ইহার বেগে উপকূলের যথেষ্ট ক্ষয়ীভবনও হয় এবং ইহা তটভূমি হইতে ফিরিবার কালে বালুকা, কাঁকর প্রভৃতিকে সমুদ্রের দিকে লইয়া যায়। অতএব ইহার কাজ প্রধানতঃ ক্ষয় বা **ধ্বংসমূলক**। কাজেই সমুদ্রের কাজও তিন প্রকার—ক্ষয়ীভবন, পরিবহন ও সঞ্চয়। নিম্নে তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(ক) **ক্ষয়ীভবন**—সমুদ্রের তরঙ্গ, প্রবল বায়ুপ্রবাহ, জোয়ার-ভাঁটা, সমুদ্রস্রোত প্রভৃতি পরস্পরের সহযোগিতায় সমুদ্রের উপকূলে ক্ষয়কার্য করে। প্রথমতঃ ঢালু উপকূলের উপর দিয়া সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গের জল বহু দূর আগাইয়া যায় এবং তাহার আঘাতে ও ইহার সহিত প্রবাহিত শিলা, নুড়ি, বালুকা প্রভৃতির ঘর্ষণে শিলাসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হয়। তারপর একদিকে জোয়ার, সমুদ্রস্রোত প্রভৃতি দ্বারা উপকূলে জলের চাপ বাড়ে, অপর দিকে তথাকার ফাটল, গর্ত ইত্যাদির মধ্যে বায়ুর চাপ বৃদ্ধি হয়। পরে জল সমুদ্রের দিকে সরিয়া গেলে বায়ুর অধিক চাপের প্রভাবে উপকূলের শিলাসমূহ আরও বেশী ফাটিয়া যায়। জলের রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও ক্ষয়কার্যের সাহায্য হয়। বিশেষতঃ নদীর জলে অঙ্গারাম্লজান জাতীয় জিনিস থাকাতে উপকূলের চুনাপাথর অঞ্চলের ক্ষয়ীভবন সম্পর্কে বায়ুর রাসায়নিক প্রভাব খুব বেশী।

সমুদ্রদ্বারা অধিক ক্ষয়ীভবনের ফলে উপকূলের খাড়া অংশও ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া ঢালু হয় এবং নীচের দিকে বালুকা, কাঁকর প্রভৃতি অনেক দূর পর্যন্ত সঞ্চিত হয়। বালুকা,

কাঁকর প্রভৃতি সঞ্চিত তটভূমিকে বলা হয় **বালুকাময়** তীর বা **সৈকত** (Sea beach)। খাড়া উপকূলের কোমল শিলা দ্বারা গঠিত দুর্বল অংশে ফাটল থাকিলে তথায় গহ্বর বা গুহা সৃষ্টি হয়। কখন কখন দুই গুহার মধ্যভাগের জায়গার অবস্থা হয় একটি স্তূপের (Stack) মত। কোথাও বা দেখা যায় উপকূলের ক্ষয়াভবনের ফলে কতক অবশিষ্ট অংশ স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া থাকে।

(খ) **অপসারণ বা পরিবহন**—প্রবল তরঙ্গ সমুদ্রের দিকে ফিরিয়া আসিবার সময় প্রচুর ক্ষয়প্রাপ্ত জিনিস বহন করিয়া আনে। ভাঁটার সময়ও একই অবস্থা হয়।

(গ) **সঞ্চয়**–স্থলভাগের ক্ষয়প্রাপ্ত অসংখ্য জিনিস, বায়ুপ্রবাহ, তরঙ্গ, নদীর জলস্রোত প্রভৃতি দ্বারা সমুদ্রে আসিয়া সঞ্চিত হয়। সাধারণতঃ ভারী জিনিসগুলি উপকূলের নিকট এবং হাল্কা ছোট জিনিসগুলি সমুদ্রের ভিতর দিকে অর্থাৎ উপকূল হইতে দূরে সঞ্চিত হয়। এবিষয়ে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, উপকূলের যে অংশ পর্যন্ত ঝড়ের সময় সমুদ্রের তরঙ্গ ও জোয়ারের জল পৌছে তথায় বালুকা, কাঁকর প্রভৃতি অধিক সঞ্চিত হয়। সঞ্চিত পদার্থসহ এই অংশকে **সৈকত** বা সমুদ্রতীর (Sea beach) বলে। সৈকতভূমির উপরদিকের কতক অংশে বালিয়াড়ি থাকিতে পারে এবং নীচের দিকে শিলা, কাঁকর প্রভৃতির উপর সমুদ্রের উদ্ভিদ্‌ও জন্মিতে পারে। কখন কখন অসমান উপকূলের সম্মুখভাগে বালুকা, কাঁকর প্রভৃতি সঞ্চিত হইয়া বেশ
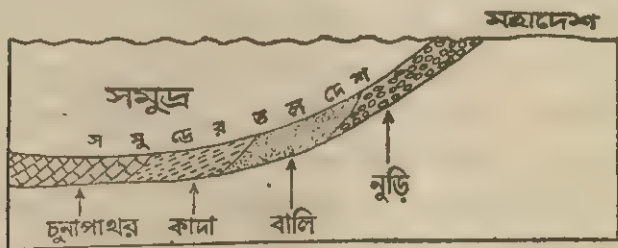
বড় **বাঁধের** (Bar) সৃষ্টি হয়। কখনও বা বাঁধ নদীর মোহনা অতিক্রম করিয়া স্থলভাগের দিকেও বেশ কিছুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এ প্রকার বাঁধকে বলা হয় **স্পিট** (Spit)। কখন কখন প্রবল বায়ুবেগে বালুকারাশি সমুদ্রতটে সঞ্চিত হওয়াতে তথায় **বালিয়াড়ির বাঁধ** (Dune-belt) তৈরী হয়। কোথাও কোথাও বালিয়াড়িকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাঁধের পাশে বন সৃষ্টি করা হয়। কখনও বা উপকূলরেখা ও বাঁধের মধ্যভাগে বালুকা, কাদামাটি, জল প্রভৃতি জমিয়া **কর্দমময় সমভূমি** (Mud-flat) বা **লবণাক্ত জলাভূমি** (Salt-marshes) সৃষ্টি হয়। ক্রমে এসকল স্থানে ঘাস এবং নানাপ্রকার উদ্ভিদ্ জন্মে। পরে লবণের ভাগ কমিলে এখানে ফসলের আবাদ

করা হয়। স্থলভাগ হইতে প্রবাহিত কাঁকর, বালুকা, নুড়ি প্রভৃতি উপকূল ভাগ হইতে ক্রমশঃ দূরের দিকে সঞ্চিত হওয়ার ফলে সমুদ্র দূরে সরিয়া যায়। কখনও বা এসকল জিনিস উপকূল হইতে একটু দূরে সঞ্চয়ের ফলে তথায় দ্বীপ সৃষ্টি হয়। এমন কি, এই দ্বীপ ক্রমে উপকূলের সহিত যুক্ত হইতে পারে।

অনুশীলনী

১। কোন্ কোন্ শক্তিদ্বারা ভূপৃষ্ঠের অধিক পরিবর্তন হয়? তাহাদের নাম লিখ। ২। ভূত্বকের পরিবর্তন সম্পর্কে কোন্ কোন্ অবস্থা উল্লেখযোগ্য? উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৩। ভূপৃষ্ঠের আকস্মিক বা হঠাৎ পরিবর্তন হয় কিভাবে? কোন্ কোন্ শক্তিদ্বারা এরূপ পরিবর্তন হয়? ৪। নদী দ্বারা ভূপৃষ্ঠের কি কি ভাবে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়? নদীর গতি অনুসারে উহার পরিবর্তনের অবস্থাকে কত ভাগে বিভক্ত করা হয়? ভাগগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৫। ভূপ্রকৃতির অবস্থার সহিত নদীর কিরূপ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়? ভূপ্রকৃতির প্রাথমিক অবস্থাতে নদীর কিরূপ অবস্থা দেখা যায়? তথায় নদীর কোন্ কোন্ কাজ উল্লেখযোগ্য? এবিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৬। ভূপ্রকৃতির পরিণত অবস্থাতে নদীর কোন্ কোন্ কাজ উল্লেখযোগ্য? তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৭। ভূপ্রকৃতির বার্ধক্য অবস্থাতে নদীর কোন্ কোন্ কাজ উল্লেখযোগ্য? ভূপ্রকৃতির প্রাথমিক ও এই অবস্থার মধ্যে নদীর কাজ সম্বন্ধে কোন্ কোন্ বিষয়ে খুব বেশী পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়? ৮। ভূপৃষ্ঠের নীচের অংশের জলদ্বারা কিভাবে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন হয়? জলদ্বারা চুনাপাথরের অঞ্চলে পরিবর্তনের উল্লেখ কর। ৯। প্রস্রবণ কাহাকে বলে? সবিরাম, অবিরাম ও আর্টেজীয় প্রস্রবণের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। ১০। হিমবাহ কাহাকে বলে? হিমবাহ কত প্রকার? হিমবাহদ্বারা কিভাবে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন হয়? গ্রাবরেখা কাহাকে বলে? ইহা কয় প্রকার? ১১। বায়ুদ্বারা ভূপৃষ্ঠের কোন্ অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্তন হয়? কিভাবে তথায় পরিবর্তন হয়, তাহা আলোচনা কর। তরঙ্গ ও সমুদ্রস্রোত দ্বারা কিভাবে ভূত্বকের পরিবর্তন হয়? সংক্ষেপে আলোচনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

বায়ুমণ্ডল

পৃথিবীর জীবমাত্রই জীবনধারণের জন্য বায়ুর উপর নির্ভরশীল। মানুষ অথবা অপর কোন জীবজন্তু বা উদ্ভিদ কাহারও পক্ষেই বায়ু ভিন্ন বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর নহে। যে-কোন সময়েই কোন বদ্ধ জায়গাতে বা ভিড়ের মধ্যে একটু হাওয়া গায়ে লাগিলে সকল মানুষই আপনা হইতে বলিয়া ফেলেন, আঃ কি আরাম! গরমের সময় বিশেষভাবে বায়ুর উপকারিতা বুঝা যায় জীবকুলের জীবনের জন্য অপর অত্যাবশ্যক পদার্থ জল। তাহারও উপাদান বায়বীয় পদার্থ (হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন)। বস্তুতঃ জলের এরূপ প্রয়োজনীয়তার জন্যই ইহার আর এক নাম জীবন। তারপর উদ্ভিদ ও যাবতীয় জীবজন্তুর অন্য অত্যাবশ্যক পদার্থ সূর্যের উত্তাপ এবং আলোক। তাহাও পৃথিবীতে পৌঁছে বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া।

বায়ুমণ্ডলের গভীরতা—পৃথিবী-গোলক বায়ুদ্বারা পরিবেষ্টিত। আর এই বায়ু নানাপ্রকার গ্যাসীয় উপাদান দ্বারা গঠিত। এরূপ গ্যাসীয় উপাদানের কতক অংশ একটি **বলয়ের মত** পৃথিবীকে **বেষ্টন** করিয়া আছে। সেজন্যই ইহাকে বলে **বায়ুমণ্ডল** (Atmosphere)। ভূপৃষ্ঠ হইতে এই মণ্ডলের উপরদিকের সীমা (অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের গভীরতা) কম পক্ষে ৩২০-৪৮০ কিমি। পৃথিবীর প্রবল আকর্ষণে এই মণ্ডলটি ভূপৃষ্ঠের সঙ্গেই লাগিয়া আছে এবং পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবর্তন করিতেছে। (অবশ্য আবর্তনের সময় পৃথিবীর তুলনায় ইহা সামান্য পিছনে পড়িয়া থাকে।)

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর—বায়ুমণ্ডল সাধারণতঃ তিনটি স্তরে বিভক্ত। তবে ইহাদের উপরিভাগে চতুর্থ স্তর সম্পর্কে বর্তমানে গবেষণাদি চলিতেছে।

(১) **ট্রপোস্ফীয়ার** (Troposphere)—ইহা বায়ুমণ্ডলের নিম্নতম স্তর ; ভূপৃষ্ঠ হইতে ১৬ কি. মি. পর্যন্ত উঁচু। এই অংশে ভূপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর উষ্ণতা-মাত্রা কমিয়া যায়। ইহাই মেঘের রাজ্য এবং এখানেই বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। (২) **স্ট্র্যাটোস্ফীয়ার** (Stratosphere) - বায়ুমণ্ডলের এই স্তর বা অঞ্চল ভূপৃষ্ঠ হইতে ১৬-৮০ কি. মি. উঁচু। এখানে মেঘ পৌঁছিতে পারে না, বিদ্যুৎও দেখা যায় না। এখানে বায়ুর উষ্ণমাত্রার হ্রাস হয় না এবং বায়ু প্রবাহহীন ও শীতল। (৩) **আয়নস্ফীয়ার** (Ionsphere)—বায়ুমণ্ডলের এই অঞ্চল ভূপৃষ্ঠ হইতে ৮০-৬৪০ কি. মি. উঁচু। (৪) **এক্সস্ফীয়ার** (Exosphere)—বায়ুমণ্ডলের ভূপৃষ্ঠ হইতে ৬৪০ কি. মি.র অধিক উঁচু অংশ এই স্তরের বা অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানকার বায়ু এত হাল্কা যে এখানে তাহার অস্তিত্ব প্রায় বুঝা যায় না।

বায়ুর উপাদান—বায়ু নানাপ্রকার গ্যাসীয় উপাদান দ্বারা গঠিত। তন্মধ্যে দুইটি প্রধান। সাধারণ হিসাবে বায়ুর প্রায় ২১% **অম্লজান** (Oxygen) ও প্রায় ৭৯% **যবক্ষারজান** (Nitrogen)। আর বাকী সমুদয় উপাদানের পরিমাণ ১%-এর কম। তন্মধ্যে আছে অতি সামান্য পরিমাণ অঙ্গারাম্লজান (Carbon-di-oxide or Carbonic acid gas), উদ্‌জান (Hydrogen), হিলিয়াম্ (Helium), আরগন (Argon) প্রভৃতি গ্যাস, জলীয় বাষ্প (Water vapour), ধূম, ধূলি, বালুকণা প্রভৃতি কত কি। বায়ুর এসকল **উপাদানের প্রভাব** বিচিত্র। যেমন, অম্লজান দ্বারা জীবদেহে রক্তের মলিনতা দূর ও স্বাভাবিক শ্বাসকার্যের সাহায্য হয়, যবক্ষরজান দ্বারা উদ্ভিদের খাদ্য সরবরাহ হয়, জলীয় বাষ্প দ্বারা বৃষ্টি ও তুষারপাত হয়, ধূলিকণা দ্বারা উষা ও গোধূলির আলোক অস্পষ্ট হয়, আর ধূলিকণাকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্টি হয় মেঘ, বৃষ্টি ও কুয়াসা।

আবহাওয়া ও জলবায়ু : বিভিন্ন উপাদান—আমরা সকলেই যে-কোন স্থানে দিবারাত্রির বিভিন্ন সময়ে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি সম্পর্কে পরিবর্তন লক্ষ্য করি। এরূপ পরিবর্তন কখনও ঘটে ধীরে, কখনও বা হঠাৎ ; কখনও অল্প পরিমাণে, কখনও বা অত্যধিক পরিমাণে। বায়ুমণ্ডলের নিম্নতম স্তরের এরূপ **সাময়িক** (কিছু ক্ষণের বা কয়েক দিনের) পরিবর্তনের অবস্থাকে বলা হয় **আবহ** ও **আবহাওয়া** (Weather)। আবহাওয়ার অনবরত পরিবর্তনের সহিত আমাদের নানা কাজের সম্পর্ক সুস্পষ্ট। যেমন, বর্ষাকালে এখনই বাহিরে যাওয়া ঠিক হইবে কিনা, না একটু দেরী করা উচিত, সঙ্গে ছাতা নেওয়া প্রয়োজন কিনা ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তার অভিজ্ঞতা আছে ছেলে, বুড়ো, পুরুষ সকলেরই।

আমাদের জীবনে অনেক বিষয়ে বায়ুমণ্ডলের এরূপ সাময়িক অবস্থার বা আবহাওয়ার উপর নির্ভর না করিয়া **দীর্ঘ সময়ের গড় অবস্থা** লক্ষ্য করা দরকার। যে-কোন স্থানের কৃষকগণের এবিষয়ে অভিজ্ঞতা খুব বেশী। এরূপ গড় অবস্থা স্থির করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমে দিনের বিভিন্ন সময়ের অবস্থার সাহায্যে স্থির করা হয় **দৈনিক গড়*** (Daily mean or average) অবস্থা। তারপর মাসের বিভিন্ন দিনের অবস্থার সাহায্যে স্থির করা হয় **মাসিক গড়** অবস্থা এবং ১২ মাসের গড় অবস্থার সাহায্যে স্থির করা হয়

$$\text{*দৈনিক গড় অবস্থা} = \frac{\text{দৈনিক সর্বোচ্চ অবস্থা} + \text{সর্বনিম্ন অবস্থা}}{২}$$

$$\text{মাসিক গড় অবস্থা} = \frac{\text{মাসের সকল দিনের গড় অবস্থার যোগফল}}{\text{মাসের দিন-সংখ্যা}}$$

$$\text{বাৎসরিক গড় অবস্থা} = \frac{\text{প্রত্যেক মাসের গড় অবস্থার যোগফল}}{১২}$$

বাৎসরিক গড় অবস্থা। আবহ বিভাগের (Meteorological Department) মতে প্রত্যেক স্থানের ৩০-৩৫ বৎসরের গড় অবস্থার সাহায্যে স্থির করা হয় **জলবায়ুর** (Climate) অবস্থা। ইহা অপেক্ষা কম সময়ের গড় অবস্থার সাহায্যে জলবায়ু সম্পর্কে **নির্ভরযোগ্য** ধারণা লাভ করা যায় না।

যে-কোন স্থানের আবহাওয়া ও জলবায়ু যে সকল উপাদানের উপর নির্ভরশীল তাহাদের মধ্যে বায়ুর উষ্ণতা ও চাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত প্রধান। ইহাদের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(১) **বায়ুর উষ্ণতা**—প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে বায়ু নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতিতে উষ্ণ হয়—(১) **পরিচলন** (Conduction)—কোন উত্তপ্ত পদার্থ হইতে উত্তাপ অন্য অপেক্ষাকৃত শীতল পদার্থে সঞ্চারিত হয় এবং উভয় পদার্থের উষ্ণতা সমান না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলে। একারণে উত্তপ্ত সূর্যকিরণ লাভ করিয়া শীতল কঠিন ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। (২) **বিকিরণ** (Radiation)—সূর্যতাপের দ্বারা ভূপৃষ্ঠের শিলাসমূহ উত্তপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু তাপ বিকিরণ করে। বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন (ঠিক ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন) স্তর ঐ বিকীর্ণ উত্তাপ লাভ করিয়া উষ্ণ হয়। (৩) **পরিবহন** (Convection)—বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তরের বায়ু উষ্ণ হওয়ার ফলে প্রসারিত ও হাল্কা হয় এবং উপরে উঠিয়া যায়। এভাবে তথায় যে আংশিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য চারিদিক্ হইতে কতক শীতল বায়ু তথায় আসে। তবে ইহাও ভূপৃষ্ঠের বিকীর্ণ উত্তাপ লাভ করিয়া ক্রমশঃ উষ্ণ ও হাল্কা হয় এবং উপরদিকে উঠিয়া যায়।

কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর বায়ুর উষ্ণতা নির্ভরশীল—সৌরতাপ, ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের অক্ষাংশ, ভূমির উচ্চতা, স্থল ও জলভাগের অবস্থান, পর্বতের অবস্থান, সমুদ্রের অবস্থান, বায়ুপ্রবাহের দিক্ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের পার্থক্য অনুসারে বায়ু ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে উষ্ণ হয়। এসকল বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(ক) **সৌরতাপ**—সৌরজগতের কেন্দ্র ও প্রাণস্বরূপ **সূর্যের উত্তাপ ও আলোক** লাভ করিয়াই পৃথিবী উত্তপ্ত হয়। সূর্যের ঠিক উপরিভাগের উত্তাপের পরিমাণ সম্ভবতঃ ৬০০০° সে। (উহার কেন্দ্রের উত্তাপ সম্ভবতঃ ৮০০০ গুণ অধিক।) আলোক-তরঙ্গরূপে (Light-waves) সৌরশক্তি চারিদিকে বিস্তৃত হয় এবং তাহা আকাশমণ্ডলের মধ্যদিয়া প্রায় ১৫ কোটি কিমি দূরে আসিয়া ভূপৃষ্ঠে পৌঁছে। এভাবে বিকীর্ণ সৌরশক্তি বা সৌরতাপকে বায়ুমণ্ডলের কোন উপাদানই সোজাসুজি সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করিতে পারে না। (কারণ, বায়ু গ্যাসীয় পদার্থের সমষ্টি।) তবু এই সৌরতাপের **শক্তির** (Insolation) **প্রভাবেই** বায়ুমণ্ডল উষ্ণ হয়; পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্ম হয়।

পৃথিবীতে সৌরতাপ লাভ করা সম্পর্কে সূর্য হইতে **পৃথিবীর দূরত্ব, পৃথিবীর আকৃতি, অবস্থিতি এবং গতির প্রভাব** সুস্পষ্ট। সূর্য হইতে পৃথিবী গড়ে প্রায় ১৫ কোটি কিমি দূরে বলিয়া ভূপৃষ্ঠ সৌরতাপের সামান্য অংশই লাভ করে। কিন্তু এই দূরত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব অনেক কম বা অনেক বেশী হইলে উত্তাপের পরিমাণের অনেক পরিবর্তন হইত এবং তাহা পৃথিবীর পক্ষে ক্ষতিকর হইত। তারপর পৃথিবীর অবস্থিতি হিসাবে ভূপৃষ্ঠের যে স্থানে যখন মধ্যাহ্ন, সেখানে তখন সূর্যকিরণ লম্বভাবে পতিত হয়। সূর্যরশ্মি তখন বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে কম স্তর ভেদ করে এবং ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে কম আয়তনবিশিষ্ট স্থানে পতিত হয়। কাজেই এবিষয়ে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের অবস্থিতির প্রভাব সুস্পষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর গোলাকৃতির প্রভাবও বুঝা যায়। কারণ, পৃথিবীর আকৃতি অন্যরূপ হইলে ভূপৃষ্ঠে উষ্ণতার এরূপ অবস্থা হইত না। উপরিলিখিত অবস্থার ফলে ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক স্থানে প্রতিদিন সবচেয়ে বেশী উত্তাপ পাওয়া যায় তথাকার মধ্যাহ্নের ঠিক পরে। উত্তর গোলার্ধে মে-জুন মাসে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে বহুদিন এই অবস্থা থাকে। ফলে, এক সময়ে (মে-জুন মাসে) উত্তর গোলার্ধে ও অন্য সময়ে (ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে) দক্ষিণ গোলার্ধে বৎসরের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উত্তাপ পাওয়া যায়। আর রাত্রিতে ভূপৃষ্ঠ দিবাভাগের সঞ্চিত তাপ বিকিরণ করে। সেজন্য প্রত্যেক স্থানে মধ্যরাত্রির পরে ভূপৃষ্ঠ সবচেয়ে বেশী শীতল হয়। দিবারাত্রির মধ্যে উষ্ণতার এরূপ পার্থক্য সবচেয়ে বেশী দেখা যায় শীত ও গ্রীষ্মকালে। কারণ, গ্রীষ্মকালে সবচেয়ে বেশী সময় উষ্ণতা পাওয়া যায় এবং তাহার পরিমাণও বেশী। শীতকালের অবস্থা তাহার ঠিক বিপরীত। এবিষয়ে পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক উভয় গতির প্রভাব সুস্পষ্ট।

(খ) **অক্ষাংশ**—বায়ুর উষ্ণতা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে **অক্ষাংশের গুরুত্ব** অধিক। আমাদের পৃথিবী গোল এবং আকাশমণ্ডলে এমনভাবে অবস্থিত যে সূর্যের কিরণ একমাত্র **পৃথিবীর কেন্দ্রের** উপরিভাগে সমস্ত বৎসর লম্বভাবে পতিত হয়। আর ভূপৃষ্ঠ হিসাবে নিরক্ষরেখার উভয় দিকে বিস্তৃত **উষ্ণমণ্ডলের** (Tropical belt) বিভিন্ন অংশে বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সূর্যরশ্মি **লম্বভাবে** পতিত হয়। ফলে, ভূপৃষ্ঠের যে স্থানের অক্ষাংশ যত বেশী, সেখানে সূর্যকিরণ তত অধিক তির্যক্ বা হেলানভাবে পতিত হয়। অর্থাৎ নিরক্ষরেখা হইতে উত্তর ও দক্ষিণদিকে বায়ুমণ্ডলের **উষ্ণতা** ক্রমশঃ কম। এজন্যই মে-জুন মাসে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের (৫০-৬০° উঃ অঃ) অবস্থা প্রায় আরামদায়ক নাতিশীতোষ্ণ, অথচ আমাদের দেশে (৮-৩৭° উঃ অঃ) তখন গ্রীষ্মকাল।

(গ) **উচ্চতা**—উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ যে তাপ বিকিরণ করে, বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন (ভূপৃষ্ঠের সংলগ্ন) স্তর তাহার কতক অংশ গ্রহণ করিয়া উষ্ণ হয়। কাজেই বায়ুমণ্ডলের ক্রমশঃ উপর দিকে উষ্ণতা কম। তাহাছাড়া উষ্ণ বায়ু উপর দিকে উঠিবার কালে ক্রমশঃ তাপ বিকিরণ করিয়া শীতল হয়। উপরের শীতল বায়ুর সংস্পর্শেও তথাকার বায়ুর উষ্ণতা কিছু কম। মোটামুটি হিসাবে উষ্ণমণ্ডলে ভূপৃষ্ঠ হইতে ১৩-১৬ কিমি. এবং ৫০° অক্ষাংশে ৮ কিমি. উচ্চ অংশ পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রত্যেক ১৫৫ মি. **উচ্চতায়** ১° সে. হিসাবে **উষ্ণতা** কম (Lapse rate)। বায়ুর উষ্ণতা এভাবে হ্রাস পায় বলিয়াই
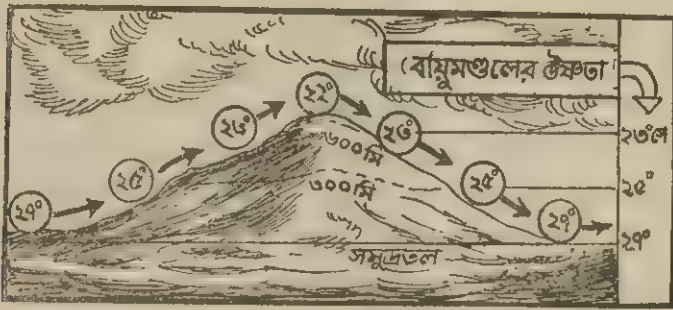
গ্রীষ্মকালে দার্জিলিং, শ্রীনগর, মুসৌরি ও দেরাদুন প্রভৃতি স্থানের অবস্থা **আরামদায়ক নাতিশীতোষ্ণ**। এসম্পর্কে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভূপৃষ্ঠ যে উত্তাপ বিকিরণ করে তাহা বায়ুমণ্ডলের অধিক উপরের স্তর পর্যন্ত পৌছিতে পারে না। তাহা সাধারণতঃ মেঘের নীচে থাকিয়া যায়। এজন্য **মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি** শীতল হইতে পারে না। অথচ নির্মেঘ রাত্রিতে ভূপৃষ্ঠ হইতে বিকীর্ণ তাপ অধিক উপরে উঠিতে পারে। সেজন্য তখন ভূপৃষ্ঠে অধিক শীত বোধ হয়। (বিশেষতঃ বৃষ্টির পরে শীত বেশী।)

বায়ুমণ্ডলের উপরদিকে উষ্ণতা হ্রাস সম্পর্কে **বিপরীত অবস্থাও** ঘটে। বিশেষতঃ পার্বত্য অঞ্চলে ইহা লক্ষ্য করা যায়। তথায় দীর্ঘ সময় শান্ত, শীতল, নির্মেঘ ও নির্মল আবহাওয়াতে বায়ুমণ্ডলে উচ্চচাপ থাকে। কখন কখন এরূপ **শীতল বায়ু** মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নিচের দিকে নামিয়া আসে। এরূপ **নিম্নগামী** বায়ু (Katabatic wind) পর্বতের উপত্যকার নিম্ন অংশে সঞ্চিত হয় ও অধিক শীতল হয়। ফলে, তখন তাহার উপর দিকের বায়ু থাকে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ।

(ঘ) **সমুদ্র হইতে দূরত্ব**—সমুদ্রের জলরাশির ও সমুদ্রবায়ুর প্রভাবে উপকূলের বায়ুতে অধিক **জলীয় বাষ্প** থাকে। আবার জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুর পক্ষে শুষ্ক বায়ুর

চেয়ে তাপ শোষণ ও সংরক্ষণের ক্ষমতা অধিক। সেজন্য **উপকূল ও দ্বীপ** অঞ্চলের জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু **মৃদুভাবাপন্ন ও আরামদায়ক**। উপকূল হইতে দেশের অভ্যন্তরের দিকে বায়ু ক্রমশঃ অধিক শুষ্ক। তাহাছাড়া দেশের মধ্যভাগে শীত-গ্রীষ্মের এবং দিবা-রাত্রির উষ্ণতার পার্থক্য অধিক। এজন্যই **মহাদেশগুলির মধ্যভাগের** জলবায়ু মহাদেশীয় (Continental) বা চরম (Extreme) প্রকৃতির। বিশেষতঃ **মরু অঞ্চলে** (বায়ু অত্যন্ত শুষ্ক বলিয়া) দিবারাত্রি ও শীতগ্রীষ্মের উষ্ণতার পার্থক্য সবচেয়ে বেশী। যেমন, বোম্বাইয়ের তুলনায় জয়পুরের গ্রীষ্মের উষ্ণতা বেশী, শীতের উষ্ণতা কম।

(ঙ) **সমুদ্রস্রোত**—বিভিন্ন সাগর, মহাসাগরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে উষ্ণ ও শীতল স্রোত প্রবাহিত হয়। ইহাদের প্রবাহের অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী অংশে বায়ুর উষ্ণতা সম্বন্ধে ইহাদের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। যেমন, **শীতল লাব্রাডর স্রোতের** প্রভাবে উত্তর আমেরিকার সেণ্ট লরেন্স নদীর জল শীতকালে বহুদিন জমিয়া থাকে। এমন কি, নিউ ইয়র্কেও তখন প্রচুর তুষারপাত হয়। অথচ **উষ্ণ আট্‌লাণ্টিক স্রোতের** প্রভাবে ইহাদের তুলনায় অনেক উত্তরে অবস্থিত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও নরওয়ের উপকূলে শীতকালেও বরফ জমে না এবং তথায় সমস্ত বৎসর জাহাজ যাতায়াত করে।

(চ) **বায়ুপ্রবাহ**—ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশের উপর দিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বায়ু প্রবাহিত হয়। বায়ুর উষ্ণতা সম্পর্কে ইহাদের প্রভাব প্রচুর। যেমন, সুমেরু অঞ্চলের **তীব্র শীতল বায়ুর** প্রভাবে উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগে সেণ্ট লুই নগর পর্যন্ত এবং সাইবেরিয়ার শীতল বায়ুর জন্য চীনের ইয়াংসি কিয়াং নদীর উপত্যকা পর্যন্ত শীতকালে জল জমিয়া যায়। অপরদিকে উত্তর আমেরিকার পশ্চিম অংশের রকি অঞ্চলের **উষ্ণ চিনুক বায়ুর** জন্য তথাকার পর্বতের পাদদেশে উষ্ণতা কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া যায়।

(ছ) **ভূমির ঢাল**—পৃথিবীর মেরুরেখা ইহার কক্ষের সহিত ৬৬½° কৌণিক বা হেলানভাবে থাকিয়া নির্দিষ্ট গতিতে অনবরত সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সেজন্য সূর্যের কিরণ বৎসরের বিভিন্ন সময়ে কেবলমাত্র উষ্ণমণ্ডলের মধ্যবর্তী অংশে লম্বভাবে পতিত হয়। তাই এই অঞ্চলের অন্তর্গত উত্তর গোলার্ধের পাহাড়, পর্বতসমূহের উত্তর ঢালের তুলনায় দক্ষিণ ঢালে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের পাহাড়, পর্বতের দক্ষিণ ঢালের তুলনায় উত্তর ঢালে সূর্যের কিরণ অনেক বেশী খাড়াভাবে পতিত হয়। তাই এরূপ উচ্চভূমির বিভিন্ন ঢালে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার পার্থক্য প্রচুর। যেমন, হিমালয়ের উত্তর ঢালে ৪,২৭০ মিঃ উচ্চে হিমরেখা অবস্থিত, অথচ দক্ষিণ ঢালে হিমরেখার উচ্চতা আরও বেশী (৪,৮৮০ মিঃ)।

(জ) **ভূমির উপাদান**—ভূমির উপাদানের সহিত বায়ুর উষ্ণতার সম্পর্ক যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ। যেমন, সূর্যতাপের সাহায্যে কঠিন পাথরের পক্ষে (কোমল মৃত্তিকার চেয়ে) উষ্ণ হইতে যেমন বেশী সময় দরকার, তাপ বিকিরণের ফলে তাহার শীতল হাওয়ার জন্যও দরকার তেমনই বেশী সময়। আবার কোমল মাটি, পাথর প্রভৃতির তুলনায় **বালুকাময় ভূমি** সূর্যতাপের দ্বারা অনেক বেশী উষ্ণ হয় এবং তাপ বিকিরণ করিয়া ইহা শীতলও হয় অনেক বেশী পরিমাণে। একারণেই পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে রাজস্থানের শীত-গ্রীষ্মের উষ্ণতার পার্থক্য অনেক বেশী।

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন উপাদানের পার্থক্য অনুসারে ভূত্বকে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা সম্পর্কে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে ছায়াযুক্ত স্থানে যখন বায়ুর উষ্ণতা ২৪° সেঃ, তখন অল্পদূরে বালুকাময় স্থানে বায়ুর উষ্ণতা ৩৯° সেঃ, আর পিচ দ্বারা আচ্ছাদিত পাকা রাস্তার উপর বায়ুর উষ্ণতা তখন ৪৮° সেঃ। এজন্যই গ্রীষ্মকালে দুপুরবেলা ঐরূপ রাস্তার পিচ গলিয়া যায়।

(ঝ) **উদ্ভিদ্**—বিভিন্ন স্থানের বায়ুর উষ্ণতার সহিত উদ্ভিদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। উদ্ভিদ্ বায়ুর কিছু উষ্ণতা শোষণ করে, আবার (পাতার মধ্যদিয়া) কিছু জলীয় বাষ্প ত্যাগ করে। বায়ুর উষ্ণতা সম্পর্কে উদ্ভিদের প্রভাব মরু অঞ্চল ও নিরক্ষীয় অঞ্চলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লক্ষ্য করা যায়। বন অঞ্চলে বায়ুর উষ্ণতা তৃণভূমি ও মরুভূমির চেয়ে স্বভাবতঃ কম। [বনের গাছ কাটিয়া ফেলিবার ফলে উষ্ণতা বাড়িয়া যায়।]

ভূপৃষ্ঠে উষ্ণতার বণ্টন ও সমোষ্ণ রেখা—নানা কারণে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের উষ্ণতার পরিমাণ সম্পর্কে পার্থক্য প্রচুর। বিশেষতঃ উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল তখনই দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল। আবার প্রত্যেক গোলার্ধেই সমভূমির তুলনায় পর্বতে উষ্ণতা কম। বিভিন্ন স্থানের নাম ও পাশে উষ্ণতার প্রকৃত মাপ বা অঙ্ক লেখা হয়। কখন কখন দৈনিক, মাসিক বা বাৎসরিক গড় উষ্ণতার পরিমাণ দ্বারা, কখনও কোন স্থানের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন উষ্ণতার পার্থক্য দ্বারা উষ্ণতা সম্পর্কে এরূপ অবস্থা নির্দ্দেশ করা হয়। লেখ-চিত্রের (Graph) সাহায্যেও উষ্ণতার অবস্থা নির্দ্দেশ করা হয়।

বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা—**পৃথিবীর** বিভিন্ন অংশের কয়েকটি **প্রধান স্থানের** সমুদ্র-সমতল হইতে উচ্চতা এবং জানুয়ারী মাসের ও জুলাই মাসের বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার পরিমাণ (গড় অঙ্ক) পরপৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

এশিয়া মহাদেশ

স্থানের নাম	উচ্চতা* (মিটার)	উষ্ণতা (°সে) জানুয়ারী	উষ্ণতা (°সে) জুলাই	স্থানের নাম	উচ্চতা* (মিটার)	উষ্ণতা (°সে) জানুয়ারী	উষ্ণতা (°সে) জুলাই
এডেন	২৯	২৭	৩৪	করাচি	—	১৫	৩২
আঙ্কারা	৯০৫	৪	২৯	কাঠমণ্ডু	—	১৭	২৯
বাগদাদ	৩৮	১৬	৪৩	লাহোর	২১৪	২১	৩৮
ব্যাঙ্কক	—	৩১	৩২	মাদ্রাজ	—	২৯	৩৬
বোম্বাই	—	২৮	২৯	ম্যানিলা	১৫	৩০	৩১
কলিকাতা	—	২৭	৩২	নূতন দিল্লী	২১৭	২১	৩৬
কলম্বো	—	৩০	২৯	পিকিং			
চুংকিং	২২৯	৯	৩৪	(বিজিং)	৪০	২	৩২
জাকার্তা	—	২৮	৩০	রেঙ্গুন	—	৩১	১৯
হংকং	৩৩	১৭	৩০	সিওল	—	০	২৯
জেরুসালেম	৮১০	১৩	৩০	সাংহাই	—	৮	৩২
কাবুল	১৮১৬	২	৩৩	তেহরান	১২২০	৮	৩৮
উলানবাটোর	—	−১৯	২২	টোকিও	—	৯	২৮

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র

স্থানের নাম	উচ্চতা* (মিটার)	উষ্ণতা (°সে) জানুয়ারী	উষ্ণতা (°সে) জুলাই	স্থানের নাম	উচ্চতা* (মিটার)	উষ্ণতা (°সে) জানুয়ারী	উষ্ণতা (°সে) জুলাই
লেনিনগ্র্যাড	—	−৫	২২	মস্কো	১৪৬	−৬	১৫
আর্কেঞ্জেল	—	−১৩	১৮	ওডেসা	—	−২	২৬
স্বার্ডলোভস্ক	—	−১৪	২১	ভ্লাডিভস্টক	—	−১১	২২
ইয়াকুটস্ক	১০০	−৪৩	২৩				

ইউরোপ

স্থানের নাম	উচ্চতা* (মিটার)	উষ্ণতা (°সে) জানুয়ারী	উষ্ণতা (°সে) জুলাই	স্থানের নাম	উচ্চতা* (মিটার)	উষ্ণতা (°সে) জানুয়ারী	উষ্ণতা (°সে) জুলাই
আমস্টার্ডম	—	৪	২১	বার্সিলোনা	৯৫	১৩	২৭
বেওগ্র্যাড	—	৩	২৯	বার্লিন	—	২	২৩
এডিনবরা	—	৬	১৮	জেনিভা	৪০৬	৪	২৫
হাম্বুর্গ	—	২	২১	হেলসিঙ্কি	—	−৩	২২
লিসবন	—	১৩	২৬	লণ্ডন	—	৭	২৩
বুডাপেস্ট	১৩০	২	২৮	মাদ্রিদ	৬০২	৮	৩০
মুনিখ	৫২৭	১	১২	অসলো	৯৬	−১	২৩
প্যারিস	—	৬	২৫	রোম	—	১২	৩১
ভিয়েনা	২০১	১	২৪	জুরিখ	৫৭০	৯	৩০

স্থানের নাম	উচ্চতা* (মিটার)	উষ্ণতা (°সে) জানুয়ারী	উষ্ণতা (°সে) জুলাই	স্থানের নাম	উচ্চতা* (মিটার)	উষ্ণতা (°সে) জানুয়ারী	উষ্ণতা (°সে) জুলাই
			উত্তর আমেরিকা				
এডমণ্টন	৬৫৮	—৯	২৩	মণ্ট্রিল	৩০	—৬	২৬
কুইবেক	—	—৮	২৫	ভ্যাঙ্কুবার	—	৫	২৩
উইনিপেগ	২৪২	—১৪	২৬	বোস্টন	—	২	২৭
শিকাগো	১৯০	০	৭৭	হনলুলু	—	২৫	২৮
ফোনিক্স	১১১২	১৮	৪০	লস এঞ্জেলস	—	১৮	২৭
নিউ অর্লিন্স	—	১৭	৩২	নিউ ইয়র্ক	—	৩	২৮
সল্ট লেক সিটি	১২৮৯	২	৩৩	সান ফ্রান্সিস্কো	—	১৩	১৭
ওয়াশিংটন	—	৬	৩০	গুয়াটেমালা	১৫০৩	২৩	২৬
হাভানা	৬১	২৬	৩২	কিংসটন	—	৩০	৩২
মেক্সিকো সিটি	২৩০৭	১৯	২৩	মিয়ামি	—	২৩	৩১
			ওশিয়ানিয়া				
ডারউইন	—	৩২	৩০	মেলবোর্ন	—	২৬	১৩
পার্থ	৬০	২৯	১৭	সিডনি	৪৩	২৬	১৬
অকল্যাণ্ড	৭৯	২৩	১৩	ওয়েলিংটন	—	২১	১২
			দক্ষিণ আমেরিকা				
এণ্টোফাগাস্টা	—	২৫	১৭	বোগোটা	২৬৬২	১৯	১৮
বুয়েনস আইরেস	—	২৯	১৪	লাপাজ	—	১৭	১৭
লিমা	—	২৮	১৯	মানাওস	—	৩২	৩৪
মন্টিভিডিও	—	২৮	১৪	প্যারামারিবো	—	২৯	৩০
কিটো	২৭৫৭	২২	২২	রিওডি জেনিরো	—	২৯	২৪
সাও পাওলো	৭৯৫	২৭	২২				
			আফ্রিকা				
আক্রা	৬৪	৩০	২৭	আদ্দিস আবাবা	২৪৪০	২৪	২১
কায়রো	১১৬	১৮	৩৬	য়্যালিয়ার্স	—	১৫	২৮
ক্যাসাব্লাঙ্কা	৫৬	১৭	২৬	কেপ টাউন	—	২৬	১৭
এণ্টেবে	১১৭১	২৭	২৫	ডাকার	—	২৬	৩১
খার্টুম	৩৮৫	৩২	৩৮	জোহান্সবার্গ	১৬৮০	২৬	১৭
লুয়াণ্ডা	১৭২	২৮	২৩	লিওপোল্ডভিল	৩০০	৩০	২৭
নাইরোবি	১৬৭৭	২৫	২১	মোগাডিসু	—	২৯	২৮
ত্রিপলি	—	১৬	২৯	স্যালিসবারি	১৪৬৫	২৬	২১
টিউনিস	—	১৪	৩২	জাঞ্জিবার	—	৩২	২৮

তবে সমগ্র পৃথিবীর বা কোন মহাদেশের অথবা কোন দেশের বিস্তীর্ণ অংশের উষ্ণতার পরিমাণ সম্পর্কে সাধারন অবস্থা **মানচিত্রে সমোষ্ণ রেখা** আঁকিয়া সবচেয়ে বেশী ভালভাবে প্রকাশ করা যায়। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানের প্রকৃত উষ্ণতার পরিমাণকে সমুদ্র-সমতলের হিসাবে (গড়ে ১৫৫ মি উচ্চতায় ১° সে কম এই হিসাবে) পরিবর্তিত করা হয় (Converted to sea level) এবং প্রত্যেক স্থান-নির্দেশক বিন্দুর পাশে পাশে পরিবর্তিত উষ্ণতার অঙ্ক লেখা হয়। ইহার পর যে সকল স্থানের (পরিবর্তিত) উষ্ণতার পরিমাণ সমান, তাহাদিগকে একটি রেখা দ্বারা যুক্ত করা হয়। ইহা প্রকৃতপক্ষে **সমুদ্র-তলের সমোষ্ণরেখা** (Sea level Isotherm)। ব্যবহারিক ভূগোল অংশ দ্রষ্টব্য।
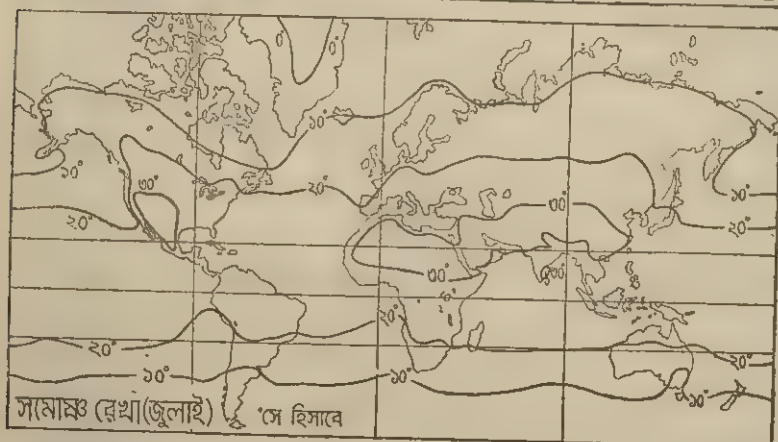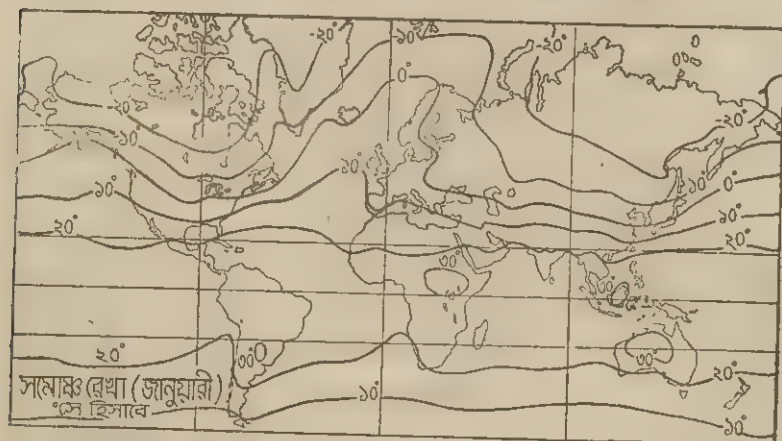
শীত ও গ্রীষ্মকালের সমোষ্ণরেখা—উপরে পাশাপাশি দুইখানা মানচিত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জানুয়ারী ও জুলাই মাসের উষ্ণতার অবস্থা ১০° সে অন্তর অঙ্কিত সমোষ্ণরেখার সাহায্যে নির্দেশ করা হইয়াছে। **জানুয়ারী** মাসের সমোষ্ণ

রেখার মানচিত্রের সাহায্যে স্পষ্ট বুঝা যায় যে তখন **দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল।** দক্ষিণ গোলার্ধে অস্ট্রেলিয়ার মধ্য হইতে পশ্চিম অংশ, মধ্য আফ্রিকার কতক জায়গা ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যভাগের কতক স্থানে এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলের ইন্দোনেশিয়াতে তখনকার উষ্ণতার পরিমাণ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী (৩০° সে র অধিক)। **উত্তর গোলার্ধে** তখন **শীতকাল।** উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার মধ্যভাগ হইতে উত্তর অংশের বহু স্থানে তখন উষ্ণতার পরিমাণ হিমাঙ্কের নীচে। উত্তরদিকের বহু স্থানে তখনকার উষ্ণতা –২০° সে'র নীচে।

অপরদিকে **জুলাই** মাসের সমোষ্ণ রেখার মানচিত্রে দেখা যায় যে তখন **উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল।** তখন মধ্য এশিয়ার দক্ষিণ অংশ, উত্তর আফ্রিকা এবং উত্তর আমেরিকার মধ্য ও দক্ষিণদিকের বহু স্থানে উষ্ণতা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী (৩০° সে'র অধিক)। এই অঞ্চল হইতে উত্তর ও দক্ষিণে উষ্ণতা ক্রমশঃ কম। উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগ অধিক বিস্তৃত বলিয়া গ্রীনল্যাণ্ডের কতক অংশে তখনও উষ্ণতা হিমাঙ্কের নীচে।

(২) **বায়ুর চাপ**—পৃথিবী চারিদিকে অসীম বায়ুমণ্ডল দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানকার বায়ুর উষ্ণতার সহিত চাপের সম্পর্ক এবং বায়ুর চাপের সহিত বায়ুপ্রবাহের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট। বায়ুর উষ্ণতা ও প্রবাহ আমরা অনুভব করি, কিন্তু চাপ অনুভব করি না। অথচ পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, কোন বাধা না পাইলে বায়ু সকল জিনিসকে ঊর্ধ্ব, অধঃ ও পার্শ্বদিক্ হইতে চাপ দেয়। তবে ভূপৃষ্ঠস্থ প্রত্যেক প্রাণীর শরীরের অভ্যন্তরীণ (Internal) চাপ বাহিরের বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান। সেজন্য একটি চাপ অপর চাপকে কার্যকরী হইতে দেয় না। অথচ সমুদ্রতলে প্রতি বর্গ ইঞ্চি স্থানে চাপের পরিমাণ ৭৬০ মি মি বা প্রতি সেন্টিমিটারে প্রায় ১'০৩ কেজি।

কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর বায়ুর চাপ নির্ভরশীল—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বায়ুর চাপের সহিত বায়ুমণ্ডলের গভীরতা, বায়ুর উষ্ণতা, ভূপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা ও বায়ুর মধ্যস্থিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। ইহাদের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(ক) **বায়ুমণ্ডলের গভীরতা**—বায়ুমণ্ডলের উপরিসীমা অনিশ্চিত, তবে বায়বীয় উপাদানসমূহের প্রায় ৪০% ভূপৃষ্ঠ হইতে ৫ কিমির মধ্যে, ৯০% ১৬ কিমির মধ্যে এবং প্রায় সমুদয় অংশ ৩২ কিমির মধ্যে অবস্থিত। বায়ুর চাপ বলিলে বায়ুমণ্ডলের এই সকল অংশেরই চাপ বুঝায়।

(খ) **বায়ুর উষ্ণতা**—বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রমশঃ অধিক হাল্কা

হয়। কাজেই উষ্ণ বায়ুর চাপ কম, শীতল বায়ুর চাপ বেশী। এজন্য স্থান, কাল ও ঋতুভেদে বায়ুর উষ্ণতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর চাপের পরিবর্তন হয়।
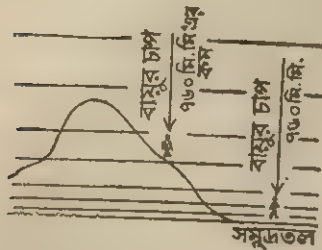
(গ) **ভূপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা**—ভূপৃষ্ঠের সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলের নিম্নতম অংশে (উপরের অংশসমূহের চাপের ফলে) চাপ বেশী এবং ক্রমশঃ উপরদিকে বায়ুর চাপ কম।

(ঘ) **জলীয় বাষ্প**—শুষ্ক বায়ু অপেক্ষা জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু হাল্কা। তাই সমুদ্রের তীরে সকল সময় ও অন্য সর্বত্র বর্ষাকালে বায়ু চাপ কম।

ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা, বায়ুর উষ্ণতা ও চাপের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক সাধারণতঃ নিম্নরূপ:

সমুদ্রতল হইতে ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা (মিটার)	বায়ুর উষ্ণতা (°সে)	বায়ুর চাপ (মিমি)	সমুদ্রতল হইতে ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা (মিটার)	বায়ুর উষ্ণতা (°সে)	বায়ুর চাপ (মিমি)
−৫০০*	১৮·৩	৮০৬·২	২০০০	২·০	৫৯৬·২
০	১৫·০	৭৬০	২৫০০	−১·২	৫৬০·১
৫০০	১১·৭	৭১৬	৩০০০	−৪·৫	৫২৫·৮
১০০০	৮·৫	৬৭৪·১	৩৫০০	−৭·৮	৪৯৩·২
১৫০০	৫·২	৬৩৪·২	৪০০০	−১১·০	৪৬২·২

সাধারণতঃ ফোর্টিন ব্যারোমিটার (Barometer) নামক চাপমান যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর চাপ নির্ণয় করা হয়। বায়ুর চাপ হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই যন্ত্রের মধ্যস্থিত পারদ উঠানামা করে। তবে সাধারণতঃ **সমুদ্রতলের** হিসাবে ব্যারোমিটার যন্ত্রে **বায়ুর চাপ নির্ণয়** করা হয়। তথায় ব্যারোমিটারের মধ্যস্থিত পারদস্তম্ভের উচ্চতা ৭৬০ মিমি বা ৭৬ সেমি এবং তাহার ওজন ১০০০ মিলিবার (মি বা)। ইহাই তথায় বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান। কোন উঁচু স্থানে বায়ুর চাপ ব্যারোমিটারের সাহায্যে স্থির করিবার পর তাহাকে আবার সমুদ্র সমতলের হিসাবে পরিবর্তিত করা হয়।

বায়ুর চাপের পার্থক্য—ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে একই সময়ে বায়ুর উষ্ণতার ও চাপের পার্থক্য থাকে, আবার একই স্থানে বিভিন্ন সময়ে বায়ুর উষ্ণতার ও চাপের পার্থক্য ঘটে। সাধারণতঃ (ক) ক্রমশঃ অধিক উচ্চ স্থানে বায়ুর চাপ কম, (খ) অধিক

* সমুদ্রসমতল হইতে ৫০০ মি পর্যন্ত গভীর স্থানসমূহ।

উষ্ণ বায়ুরও চাপ কম, (গ) অধিক জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুর চাপ কম এবং (ঘ) এজন্য সমুদ্রতল হইতে ক্রমশঃ উপর দিকে এবং মেরু অঞ্চল হইতে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে বায়ুর চাপ কম। তাহাছাড়া অধিক উষ্ণ জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুর চাপ শীতল ও শুষ্ক বায়ুর চাপের তুলনায় কম।

বায়ুমণ্ডলের চাপ—**পৃথিবীর** বিভিন্ন অংশের কয়েকটি **প্রধান স্থানের** জানুয়ারী মাসের ও জুলাই মাসের বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিমাণ (অঙ্ক) নিম্নে দেওয়া গেল।

স্থানের নাম	চাপ (মি বা) জানুয়ারী	চাপ (মি বা) জুলাই	স্থানের নাম	চাপ (মি বা) জানুয়ারী	চাপ (মি বা) জুলাই
		এশিয়া মহাদেশ			
এডেন	১০১৫	১০০৩	আঙ্কারা	৯০৪	৯০০
বাগদাদ	১০২২	৯৯৭	ব্যাঙ্কক	১০১৭	১০০৮
বোম্বাই	১০১৩	১০০৩	কলিকাতা	১০১৫	৯৯৮
কলম্বো	১০১২	১০০৮	জাকার্তা	১০১১	১০০৯
হংকং	১০২৪	১০০৭	জেরুসালেম	৯২৬	৯১৭
করাচি	১০১৮	৯৯৭	লাহোর	১০২০	৯৯৬
মাদ্রাজ	১০১২	১০০২	ম্যানিলা	১০১৬	১০০৯
নূতন দিল্লী	৯৯১	৯৭৩	পিকিং		
রেঙ্গুন	১০১৮	১০০৮	(বিজিং)	১০১৬	১০০৬
টোকিও	১০১৭	১০১০	সাংহাই	১০২৩	১০০৪
		সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র			
লেনিনগ্র্যাড	১০১৩	১০০৫	মস্কো	১০১৩	১০০৩
আর্কেঞ্জেল	১০২৩	১০০৫	ওডেসা	১০১৭	১০০৩
স্বার্ডলোভস্ক	১০১৬	১০০৫	ভ্লাডিভস্টক	১০২৩	১০১১
ইয়াকুটস্ক	১০২৪	১০১০			
		ইউরোপ			
বেওগ্র্যাড	১০১৭	১০১৫	বার্লিন	১০১৩	১০১০
জেনিভা	১০১৪	১০১৬	হাম্বুর্গ	১০১২	১০০৯
হেলসিঙ্কি	১০০৫	১০০৬	লিসবন	১০১৬	১০১৮
বুডাপেস্ট	১০১৭	১০১২	কোপেনহেগেন	১০১১	১০০৬
মুনিখ	১০১৪	১০১৫	অসলো	১০০৮	১০০৪
প্যারিস	১০১০	১০১৬	রোম	১০১১	১০১২
স্টকহোম	১০০৭	১০০৫	জুরিখ	১০১৩	১০১৫

স্থানের নাম	চাপ জানুয়ারী (মি বা)	চাপ জুলাই (মি বা)	স্থানের নাম	চাপ জানুয়ারী (মি বা)	চাপ জুলাই (মি
উত্তর আমেরিকা					
এডমণ্টন	১০২০	১০১৩	মন্ট্রিল	১০১৪	১০১২
টরণ্টো	১০২৩	১০১৪	ভ্যাঙ্কুবার	১০১৯	১০১৮
উইনিপেগ	১০১৯	১০১৬	এঙ্করেজ	১০১২	১০১৩
বোস্টন	১০১২	১০১২	শিকাগো	১০১৮	১০১৫
হনলুলু	১০১৮	১০১৭	মিয়ামি	১০১৮	১০১৭
নিউ অর্লিন্স	১০২০	১০১৫	নিউ ইয়র্ক	১০২০	১০১৫
সল্ট লেক সিটি	১০১৯	১০১২	সান ফ্রান্সিস্কো	১০২২	১০১৪
ওয়াশিংটন	১০১৭	১০১৪	ফোনিক্স	১০১৮	১০০৯
হাভানা	১০১৯	১০১৬	মেক্সিকো সিটি	১০১১	১০১২
ওশিয়ানিয়া					
ডারউইন	১০০৮	১০১৩	মেলবোর্ন	১০১৪	১০২২
পার্থ	১০১৪	১০১৭	সিডনি	১০১৫	১০২২
অকল্যাণ্ড	১০১৬	১০১৬	ওয়েলিংটন	১০১৪	১০১৩
দক্ষিণ আমেরিকা					
বুয়েনস আইরেস	১০০৯	১০২১	লাপাজ	১০১৮	১০১২
ম্যারাকাইবো	১০১২	১০১০	মন্টিভিডিও	১০১২	১০২০
রিওডি জেনিরো	১০১২	১০২০	সান্টিয়াগো	১০১২	১০২০
সাও পাওলা	১০১২	১০১৯			
আফ্রিকা					
আক্রা	১০১১	১০১৪	য়্যালজিয়ার্স	১০১৩	১০১৬
কায়রো	১০১৯	১০০৬	কেপ টাউন	১০১৩	১০২০
ক্যাসাব্লাঙ্কা	১০২২	১০১৬	ডাকার	১০১৩	১০১২
খার্টুম	১০১১	১০০৬	লিওপোল্ডভিল	১০১১	১০১৬
লুয়াণ্ডা	১০১০	১০১৬	নাইরোবি	১০০৫	১০০৮
টিউনিস	১০১৩	১০১৬			

সমচাপ বা সমপ্রেষ রেখা—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বায়ুর চাপের পরিমাণ সাধারণ অঙ্ক দ্বারা, লেখচিত্র (Graph) আঁকিয়া অথবা মানচিত্রে সমচাপ রেখা আঁকিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বায়ুর চাপের অবস্থা সমচাপ বা সমপ্রেষ রেখার সাহায্যে বেশ ভালভাবে বুঝান যায়। এরূপ রেখা আঁকিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানের বায়ুমণ্ডলের প্রকৃত চাপের পরিমাণকে সমুদ্রতলে পরিবর্তিত (Reduced to sea level) করা হয়।

তারপর মানচিত্রে নির্দিষ্ট স্থানে বিন্দুদ্বারা স্থানসমূহকে নির্দেশ করা হয় এবং ইহাদের পাশে পাশে পরিবর্তিত চাপাঙ্ক লেখা হয়। তারপর সাধারণতঃ নির্দিষ্ট মিলিবার (mb বা millibar বা মিবা) অন্তর **সমপ্রেষ** বা **সমচাপ রেখা** (Isobar) আঁকা হয়। কোন স্থানের এপ্রকার মানচিত্রকে **চাপ মানচিত্র** (Pressure map) বলে।

উপরের মানচিত্রে **জানুয়ারী** মাসের সমপ্রেষ রেখা লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে তখন **দক্ষিণ গোলার্ধে** স্থলগুলের মধ্য অংশে [যেমন, দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যভাগ, আফ্রিকার মধ্য অংশ হইতে দক্ষিণদিকের মধ্যভাগ এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তর অংশ ও

ইন্দোনেশিয়ার কতক অংশে] বায়ুর চাপের পরিমাণ **খুব কম** (১০০৮ মি বা)। তখনই তথাকার পক্ষে **গ্রীষ্মকাল**। তথা হইতে উত্তর ও দক্ষিণ উভয়দিকে বায়ুর চাপ অধিক। উত্তর গোলার্ধে **এশিয়ার মধ্যভাগে** তখন তীব্র **শীত** এবং তথাকার বায়ুমণ্ডলে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উচ্চচাপ (১০৩২ মি বা)। উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগেও তখন প্রবল উচ্চচাপ (১০২০ মি বা)। ইহাদের পাশেই সমুদ্রে (আটলান্টিক মহাসাগরের উচ্চ অংশে আইসল্যাণ্ডের পাশে ও প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর অংশে এলিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের পাশে) বিরাট স্থলভাগের মধ্যভাগের তুলনায় শীত কম। কাজেই এসকল অংশের তখনকার নিম্নচাপ উল্লেখযোগ্য (১০০২ মি বার কম, আইসল্যাণ্ডের পাশে ৯৯৬ মি বা।).

জুলাই মাসের মানচিত্রের সমপ্রেষ রেখার সাহায্যে বুঝা যায় যে তখন **উত্তর গোলার্ধে**, বিশেষতঃ এশিয়ার দক্ষিণ অংশে বায়ুর চাপ সবচেয়ে কম (১০০২ মি বার কম)। এসময় এখানে **উষ্ণতা** সবচেয়ে **বেশী**। দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীতকাল এবং বায়ুর চাপ সর্বাপেক্ষা অধিক। (আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের কতক অংশে ১০২৬ মি বার অধিক।)

দৈনিক আবহ মানচিত্র—দৈনিক আবহাওয়ার সাধারণ চিত্রে (Synoptic chart) যে-কোন একদিনে বা কোনও একটি সময়ে বহু স্থানের বায়ুর উষ্ণতা ও চাপের পরিমাণ এবং বায়ুপ্রবাহের দিক্ প্রভৃতি নির্দেশ করা হয়। এরূপ মানচিত্র আঁকিবার জন্য বিভিন্ন স্থানের উষ্ণতার ও চাপের পরিমাণকে প্রথমে সমুদ্র-সমতলের হিসাবে পরিবর্তিত করা হয়। তারপর একখানা মানচিত্রে এসকল স্থানের অবস্থিতি নির্দেশ করা হয়। ইহার পর সমোষ্ণ রেখা, সমচাপ রেখা প্রভৃতি আঁকা হয় ও বায়ুপ্রবাহের দিক্ প্রভৃতি নির্দেশ করা হয়। বিভিন্ন **আবহ কেন্দ্র** (Meteorological centre) হইতে এরূপ দৈনিক আবহ মানচিত্র (Daily Weather map) প্রকাশ করা হয়। যে-কোন স্থানের আবহাওয়ার অবস্থা আলোচনা, পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেওয়া (Weather forecast) এবং বিমানপোতের যাতায়াত প্রভৃতি বিষয়ে এরূপ মানচিত্রের উপযোগিতা অধিক। এজন্য আমাদের দেশে কলিকাতা, পুণা প্রভৃতি কেন্দ্রের আবহ মানচিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) **বায়ুপ্রবাহঃ—বায়ুমণ্ডলের উচ্চ ও নিম্নচাপের সহিত সম্পর্ক**—বায়ু দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ ইহার প্রবাহের দিক্ ও গতি বুঝিতে পারা যায়। এসকল বিষয়ের সহিত বায়ুর চাপের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ভূপৃষ্ঠের কতক বিস্তীর্ণ অংশে কখন কখন বায়ুর অধিক উষ্ণতা ও প্রচুর জলীয় বাষ্পের জন্য **নিম্নচাপ অঞ্চল** সৃষ্টি হয়। অপর কতক অংশে বায়ুর কম উষ্ণতা ও প্রচুর জলীয় বাষ্পের কম **উচ্চচাপ**

অঞ্চল সৃষ্টি হয়। এই দুই বিপরীত অঞ্চলের মধ্যে সমতা (Epuilibrium) রক্ষার জন্য প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে প্রচেষ্টা চলে। তাই নিম্নচাপ অঞ্চলের আংশিক শূন্য অবস্থা (Partial vacuum) অধিক সময় থাকিতে পারে না। উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে বায়ু নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। ইহাই **বায়ু** (Wind) **প্রবাহের** মূল কথা বা বিষয়। আরও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে বায়ুর চাপের অনবরত পরিবর্তন ঘটে। ফলে, বায়ুও অনবরত প্রবাহিত হয়; অর্থাৎ **বায়ু** সর্বদা **চঞ্চল**।

বায়ুপ্রবাহের দিক্—বায়ু কখন কোন্ দিকে ও কিরূপ বেগে প্রবাহিত হইবে, তাহা নির্ভর করে নিম্নলিখিত কতকগুলি আনুসঙ্গিক প্রাকৃতিক বিষয়ের উপর।

(ক) নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণ বায়ু উপর দিকে প্রবাহিত হয়। এই উষ্ণ বায়ু উর্ধ্ব আকাশ দিয়া মেরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় এবং ক্রমশঃ শীতল ও ভারী হওয়ার ফলে মেরু অঞ্চলে নামিয়া আসে। (খ) বায়ুমণ্ডলের সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে উভয় মেরুর উচ্চচাপ অঞ্চলের শীতল বায়ু বায়ু-মণ্ডলের নিম্নস্তর দিয়া নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে বহিয়া যায়। কাজেই বায়ুর প্রবাহ সম্পর্কে বায়ুর চাপের পরিবর্তনের (Barometric gradient) প্রভাব সুস্পষ্ট। (গ) পৃথিবীর আবর্তন গতি বশতঃ সকল প্রকার বায়ু প্রবাহিত হওয়ার সময় (ফেরেলের সূত্র অনুসারে) বাঁকিয়া যায়। ফলে, উত্তর গোলার্ধে সুমেরু অঞ্চল হইতে সুমেরুবৃত্তের দিকে এবং কর্কটক্রান্তির নিকট হইতে নিরক্ষরেখার দিকে বায়ু আসে উত্তরপূর্ব দিক হইতে। আর কর্কটক্রান্তির নিকট হইতে সুমেরুবৃত্তের দিকে বায়ু যায় পশ্চিমদিক হইতে। দক্ষিণ গোলার্ধে কুমেরু অঞ্চল হইতে কুমেরুবৃত্তের দিকে এবং মকরক্রান্তির নিকট হইতে নিরক্ষরেখার দিকে বায়ু আসে দক্ষিণপূর্ব দিক হইতে। আর মকরক্রান্তির নিকট হইতে কুমেরুবৃত্তের দিকে যায় পশ্চিমদিক হইতে। (ঘ) বায়ু প্রবাহিত হওয়ার সময় পথিমধ্যে মালভূমি বা পাহাড়, পর্বতে বাধা পাওয়ার ফলে (Effect of friction) তাহার স্বাভাবিক গতি পরিবর্তিত হয়। (ঙ) বায়ু যেদিক হইতে প্রবাহিত হয় তাহার নাম অনুসারে **বায়ুপ্রবাহের নামকরণ** হয়; যথা—উত্তরদিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ুকে বলে "উত্তরে হাওয়া"। আমাদের দেশের উপর দিয়া শীতকালে "উত্তরে হাওয়া" বহিয়া থাকে।

বায়ুর চাপবলয়—ভূপৃষ্ঠের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রায় সমস্ত বৎসর বায়ুমণ্ডলের কতকটা নির্দিষ্ট চাপ লক্ষ্য করা যায়। কোথাও উচ্চচাপ, কোথাও বা নিম্নচাপ এক একটি অংশে ভূপৃষ্ঠকে যেন একটি **বলয়ের মত** ঘিরিয়া রহিয়াছে। সেইজন্য ভূপৃষ্ঠে বায়ুর নিম্নলিখিত **চাপবলয়সমূহ** (Pressure belts) সুস্পষ্ট। (ইহাদের কারণ সঠিক ভাবে নির্দেশ করা সম্ভবপর নহে)।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের অবস্থা প্রায় সমজাতীয় (Homogeneous) এবং

চাপবলয়সমূহকে কতক পরিমাণে আদর্শ (Ideal or planetry) বলিয়া মনে করিলে ইহাদের বিষয় বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

(ক) **নিরক্ষীয় নিম্নচাপ শান্তবলয়**—পৃথিবীর মধ্যভাগে নিরক্ষীয় অঞ্চলে (বিষুবরেখার দুই পাশে ৫-১০° অক্ষাংশের মধ্যে) সমস্ত বৎসর অধিক সৌরতাপ পাওয়া যায়। তাহার প্রভাবে এখানকার বায়ু উষ্ণ। তাহা ক্রমশঃ হালকা এবং প্রসারিত হইয়া প্রায় ১০-১৩ কিমি পযন্ত **উপরদিকে** উঠিয়া যায়। তথা হইতে এরূপ বায়ুর কতক অংশ উত্তরদিকে ও কতক দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়। কাজেই নিরক্ষীয় অঞ্চল তখন আংশিকভাবে বায়ুশূন্য হয়। তাই তখন এখানকার বায়ুর চাপ খানিকটা কমিয়া যায়। আবার এই অংশে ভূপৃষ্ঠে জলভাগ (বিভিন্ন সাগর, মহাসাগর) অধিক বিস্তৃত বলিয়া এখানকার উষ্ণ বায়ুর সহিত প্রচুর **জলীয় বায়ু** মিশ্রিত থাকে। এসকল কারণে এই

অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলের **চাপ খুব কম**। পৃথিবীর মধ্যভাগকে একটি বলয়ের মত বেষ্টনকারী এরূপ নিম্নচাপ অঞ্চলকে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় বলা হয়। পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির ফলে এই বলয় বৎসরের বিভিন্ন সময় ৫-১০° উত্তর-দক্ষিণে সরিয়া যায়।

নিরক্ষীয় অঞ্চলের আংশিকভাবে বায়ুশূন্য অংশ পূরণ ও বায়ুমণ্ডলের সমতা রক্ষা করিবার জন্য উত্তর ও দক্ষিণদিকের উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে কতক (শীতল) বায়ু এদিকে প্রবাহিত হয়। কিন্তু তাহাও এখানে পৌছিয়া উষ্ণ হইয়া **উপরদিকে** উঠিয়া যায় (Convection current)। সেজন্য ঠিক নিরক্ষীয় অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া বায়ুর এক স্থান হইতে অন্য স্থানের দিকে বা পার্শ্বদিকে গতি বা প্রবাহ বুঝা যায় না। কাজেই এখানে ভূপৃষ্ঠে সর্বদা **শান্তভাব** (Calm) বর্তমান। একারণেই এই অঞ্চলকে **নিরক্ষীয় শান্তবলয়** (Equatorial doldrums) বলে। এখানে জলভাগ অধিক বিস্তৃত এবং সৌরতাপও সমস্ত বৎসরই অধিক। ফলে, এখানকার জলরাশি হইতে প্রচুর জলীয় বাষ্প উত্থিত হয়। সেজন্য বায়ুতে **আর্দ্রতা** প্রচুর। এরূপ বায়ু উপরদিকে উঠিবার কালে ঘনীভূত হয় এবং সেজন্য আকাশে মেঘের সৃষ্টি হয়। তাহার ফলে এখানে **পরিচলন বৃষ্টি** হয়। আবার অধিক বৃষ্টির ফলে এখানকার বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা কিছু বাড়ে।

(খ) **ক্রান্তীয় উচ্চচাপ শান্তবলয়**—নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণ বায়ু যত উপরে উঠে, ইহা ক্রমশঃ তত তাপ বিকিরণ করে এবং উপরদিকের শীতল বায়ুর অধিক সংস্পর্শে আসে। কাজেই ইহা ধীরে ধীরে অধিক শীতল হয়। স্বভাবতঃ এরূপ শীতল, ঘনীভূত ও ভারী বায়ু নীচে নামিতে চেষ্টা করে। কিন্তু নিম্নদিক হইতে প্রবাহিত উষ্ণ বায়ু এবিষয়ে বাধা সৃষ্টি করে। তখন নিরক্ষীয় অঞ্চলের **উচ্চ আকাশের বায়ুর** কতক অংশ উত্তর ও দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়। এভাবে উত্তর ও দক্ষিণদিকে প্রবাহিত বায়ু পথিমধ্যে আরও **শীতল** ও **ভারী** হয় এবং উত্তর গোলার্ধে প্রায় ৩০° উত্তর সমাক্ষরেখাতে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে প্রায় ৩০° দক্ষিণ সমাক্ষরেখাতে আংশিকভাবে নিম্নদিকে **নামিয়া আসে**। পৃথিবী গোলাকার বলিয়া এখানে ভূপৃষ্ঠের আয়তন নিরক্ষীয় অঞ্চলের আয়তনের চেয়ে (অন্ততঃ ১৩%) কম। কাজেই এখানে বায়ুপ্রবাহ **পুঞ্জীভূত** (Crowded) হয়। তাহার ফলেও বায়ুর **চাপ বৃদ্ধি** হয়।

ইহা ভিন্ন বায়ুমণ্ডলের সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে **মেরু অঞ্চল** (উচ্চচাপ অঞ্চল) হইতে কিছু **শীতল বায়ু** নিরক্ষীয় অঞ্চলের (নিম্নচাপ অঞ্চলের) দিকে সর্বদা প্রবাহিত হয়। ইহার কতক অংশ ক্রান্তীয় অঞ্চলে আসিয়া নিরক্ষীয় অঞ্চল হইতে আগত বায়ুর সহিত **মিলিত হয়**। কাজেই এই অঞ্চলে (৩০° উঃ অঃ বা দঃ অঃ) দুই দিক্ (নিরক্ষীয় অঞ্চল ও মেরু অঞ্চল) হইতে আগত বায়ুপ্রবাহ মিলিত হওয়ায় ফলেও বায়ুর **চাপ বৃদ্ধি** হয়। এইজন্যই কর্কটক্রান্তির নিকট (৩০° উত্তর অক্ষাংশের আশেপাশে) **কর্কটীয়** (Tropic of Cancer) **উচ্চচাপ বলয়,** আর মকরক্রান্তির নিকট (৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশের আশেপাশে) **মকরীয়** (Tropic of Capricorn) **উচ্চচাপ বলয়** সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির ফলে কর্কটীয় উচ্চচাপ বলয় উত্তর গোলার্ধের গ্রীষ্মকালে ৫-১০° উত্তরদিকে (৩০-৪০° উঃ অঃ পর্যন্ত) এবং মকরীয় উচ্চচাপ বলয় দক্ষিণ গোলার্ধের গ্রীষ্মকালে ৫-১০° দক্ষিণে (৩০-৪০° দঃ অঃ পযন্ত) সরিয়া যায়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জলবায়ু সম্পর্কে বায়ুবলয়ের ও বায়ুপ্রবাহের এইরূপ স্থান পরিবর্তনের প্রভাব খুব বেশী।

কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ অঞ্চলে শীতল ও ভারী বায়ু কেবলমাত্র নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়। কাজেই এখানেও বায়ু পার্শ্বদিকে প্রবাহহীন। সেজন্য এই দুই ক্রান্তীয় অঞ্চলেও বায়ুমণ্ডলের শান্তভাব। আর তাই ইহাদিগকে **ক্রান্তীয় শান্তবলয়** (Tropical belts of calm) বলা হয়।

অশ্ব অক্ষাংশ—পূর্বকালে জাহাজসমূহ কাপড়ের তৈরী পালের সাহায্যে বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করিত। বহুপূর্বে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের মধ্য দিয়া উত্তর আমেরিকা হইতে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে যাওয়ার সময় ঐরূপ কোন জাহাজ কর্কটীয়

শান্তবলয়ে বাধ্য হইয়া কয়েক দিন প্রায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এক সময়ে নাবিকগণের মনে হইল, জাহাজখানাকে হাল্কা করিতে পারিলে হয়ত উহার চলিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। তাহাছাড়া জাহাজ-বোঝাই ঘোড়াগুলির খাদ্য ও পানীয়ের চিন্তাও ছিল। নানা চিন্তার পর ঐ জাহাজ হইতে কতকগুলি ঘোড়াকে তথাকার সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করা হইল। তখন হইতে কর্কটীয় উচ্চচাপ শান্তবলয়কে (কাহারও কাহারও মতে মকরীয় উচ্চচাপ শান্তবলয়কেও) বলা হয় 'অশ্ব অক্ষাংশ' (Horse latitude)।

ক্রান্তীয় ও নিরক্ষীয় অঞ্চলে বায়ুর পার্থক্য—নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয়, এই উভয় অঞ্চলে বায়ুর শান্তভাব। কিন্তু নিরক্ষীয় অঞ্চল অতিশয় আর্দ্র নিম্নচাপ বলয়, আর ক্রান্তীয় অঞ্চল প্রায় শুষ্ক উচ্চচাপ বলয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের **উষ্ণ** বায়ু **উর্ধ্বগামী** বলিয়া ইহা ক্রমশঃ **শীতল** ও **ঘনীভূত** হয়। ফলে, এখানে খুব বেশী **বৃষ্টি** হয়। আর ক্রান্তীয় অঞ্চলের **শীতল** বায়ু **নিম্নগামী** বলিয়া ক্রমশঃ ইহার **উষ্ণতা বৃদ্ধি** হয়। তাই এখানে বৃষ্টি প্রায় হয় না। এজন্য (মহাদেশসমূহের পশ্চিম অংশে) **ক্রান্তীয় অঞ্চলে** পৃথিবীর বেশীর ভাগ **মরুভূমি** সৃষ্টি হইয়াছে।

(গ) **মেরুবৃত্ত অঞ্চলের বা মেরুদেশীয় অঞ্চলের নিম্নচাপ বলয়**—পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে ইহা (পৃথিবীর সকল অংশ) অনবরত মেরুরেখার চারিদিকে আবর্তন করে। এজন্য উভয় মেরু অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলে **আবর্তের** (Polar whirl) সৃষ্টি হয় ও তথায় বায়ুর নিম্নচাপের দিকে খানিকটা ঝোঁক (tendency) দেখা যায়। কিন্তু তথায় (মেরুর চারি পাশে) এই আবর্তনের শক্তির তুলনায় **শীতলতার শক্তি** অধিক প্রবল। সেজন্য এখানে বায়ুর **চাপ** খুব **বেশী**। কিন্তু মেরুবিন্দুদ্বয়ের পর হইতে নিরক্ষরেখার দিকে ভূপৃষ্ঠের **আয়তন** ক্রমশঃ অনেক বেশী। অথচ পৃথিবীর সকল অংশই প্রতি ২৪ ঘণ্টাতে একবার সম্পূর্ণরূপে আপন মেরুরেখার চারিদিকে আবর্তন করে। ফলে, উভয় **মেরুদেশীয়** (সুমেরুবৃত্ত ও কুমেরুবৃত্ত) **অঞ্চলে** পৃথিবীর **আবর্তনের বেগ** মেরুদ্বয়ের নিকট ইহার আবর্তনের বেগের তুলনায় অনেক **বেশী**। এজন্য উভয় মেরু হইতে নিরক্ষীয় উষ্ণ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত শীতল ও ভারী বায়ু মেরুদেশীয় অঞ্চলে পৌঁছিয়া গতিশীল পৃথিবীর বিকর্ষণশক্তির (Centrifugal force) প্রভাবে ছিটকাইয়া যায় ও **প্রসারিত** হয়। ফলে, এখানে বায়ুর **চাপ কম**। সুমেরু বৃত্তের নিকটবর্তী এরূপ নিম্নচাপ অঞ্চলকে (৬০° উত্তর অক্ষাংশ) **সুমেরু বৃত্তের** (Arctic circle) **নিম্নচাপ বলয়** বলা হয়। আর কুমেরু বৃত্তের নিকটবর্তী এরূপ অঞ্চলকে (৬০° দঃ অঃ) বলা হয় **কুমেরুবৃত্তের** (Antarctic circle) **নিম্নচাপ বলয়**। পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির ফলে উত্তর গোলার্ধের গ্রীষ্মকালে সুমেরুবৃত্তের

নিম্নচাপ বলয় ৬৫-৭০° উঃ অঃ পর্যন্ত এবং দক্ষিণ গোলার্ধের গ্রীষ্মকালে কুমেরুবৃত্তের নিম্নচাপ বলয় ৬৫-৭০° দঃ অঃ পর্যন্ত সরিয়া যায়।

(ঘ) **উভয় মেরুর (মেরুস্থানীয়) উচ্চচাপ বলয়**—সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চলে **তীব্র শীতের** জন্য বায়ুও শীতল। তারপর জলীয় বাষ্পের অভাবে (শীতের জন্য বাষ্প সৃষ্টি হইতে পারে না) বায়ু ভারী। (জলীয় বাষ্পযুক্ত বায়ু হাল্কা।) তাহা ভিন্ন নিরক্ষীয় অঞ্চল হইতে উভয় মেরুর দিকে উচ্চ আকাশ দিয়া প্রবাহিত উষ্ণ বায়ু ক্রমশঃ **শীতল ও ভারী** হইয়া আংশিকভাবে ক্রান্তীয় অঞ্চলে নামিয়া পড়িলেও বাকী অংশ উভয় মেরুতে গিয়া পৌছে। (এজন্য সেখানকার সামান্য আয়তনবিশিষ্ট স্থানে বায়ু **পুঞ্জীভূত**।) এসকল কারণে উভয় মেরুতে বায়ুর **চাপ খুব বেশী।** উত্তর মেরুর উচ্চচাপ অঞ্চলকে **সুমেরুর উচ্চচাপ বলয়,** আর দক্ষিণ মেরুর উচ্চচাপ অঞ্চলকে **কুমেরুর উচ্চচাপ বলয়** বলে।

প্রধান বায়ুপ্রবাহসমূহ

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে বায়ুমণ্ডলে কয়েকটি নির্দিষ্ট উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ বলয়ের অবস্থিতির ফলে বায়ুর চাপ সম্পর্কে সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে বায়ু সাধারণতঃ নির্দিষ্ট দিকে, অর্থাৎ **উচ্চচাপ কেন্দ্র হইতে নিম্নচাপ কেন্দ্রের** দিকে প্রবাহিত হয়। এজন্য ভূপৃষ্ঠে কয়েকটি নিয়ত বায়ুবলয় আছে। ইহাছাড়া স্থানবিশেষে ও সময় বিশেষেও বায়ুর চাপের খুব বেশী পরিবর্তন ঘটে। ঐ সকল ক্ষেত্রেও বায়ুর সাধারণ ধর্ম বা নিয়ম অনুসারে বায়ু উচ্চচাপ হইতে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। এজন্য ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া প্রবাহিত বায়ু নিম্নলিখিত চারি ভাগে বিভক্ত :—

(ক) **নিয়ত বায়ু**—নির্দিষ্ট উচ্চচাপ বলয় হইতে নির্দিষ্ট নিম্নচাপ বলয়ের দিকে যে বায়ু **নির্দিষ্টভাবে** বহিয়া যায়, তাহার নাম **নিয়ত বায়ু** (Constant or planetary winds); যথা—আয়ন বায়ু ও মেরু বায়ু। ইহাদের প্রবাহের অঞ্চল অনুসারে ভূপৃষ্ঠে নির্দিষ্ট **বায়ুবলয়** (Wind belts) সৃষ্টি হইয়াছে।

(খ) **সাময়িক বায়ু**—দিবা-রাত্রির বিভিন্ন সময়ে ও বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে নানা স্থানে বায়ুর উষ্ণতা ও চাপের পার্থক্য হয়। তখন তথায় **সাময়িক** (Periodical or seasonal) **বায়ু** প্রবাহিত হয়। যথা—স্থলবায়ু, সমুদ্র বায়ু, মৌসুমী বায়ু।

(গ) **আকস্মিক বায়ু**—কোথাও হঠাৎ বা অতি অল্প সময়ের মধ্যে বায়ুর চাপের অধিক পরিবর্তন হইলে **আকস্মিক** বা **অনিশ্চিত** বা **অনিয়মিত** (Sudden or irregular) বায়ু প্রবাহিত হয়। যথা—ঘূর্ণবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণবাত।

(ঘ) **স্থানীয় বায়ু**—কোন কোন অঞ্চলে কোন কোন সময়ে **স্থানীয় কারণে**

বায়ুর চাপের পার্থক্য হয়। তাহার ফলে তখন তথায় স্থানীয় (Local) বায়ু প্রবাহিত হয়। যথা—সাইমুম্, খামসিন্, চিনুক, লু প্রভৃতি।

নিয়ত বায়ু

ভূপৃষ্ঠস্থ নিয়ত বায়ু তিন ভাগে বিভক্ত: আয়ন বায়ু, পশ্চিমা বায়ু ও মেরু বায়ু।

(১) **আয়ন বায়ু**—কর্কটীয় উচ্চচাপ বলয় (৩০° উঃ অঃ) হইতে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে বায়ু নিয়ত প্রবাহিত হয়। ইহা উত্তর গোলার্ধের উপর দিয়া আসিবার সময় (ফেরেলের সূত্র অনুসারে) ডানদিকে বাঁকিয়া থাকে। সেজন্য ইহা সর্ব্বদা উত্তর-পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবাহিত হয়। তাই ইহার নাম **উত্তরপূর্ব্ব আয়ন বায়ু**। আর মকরীয় উচ্চচাপ বলয় (৩০° দঃ অঃ) হইতে যে নিয়ত বায়ু নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলের
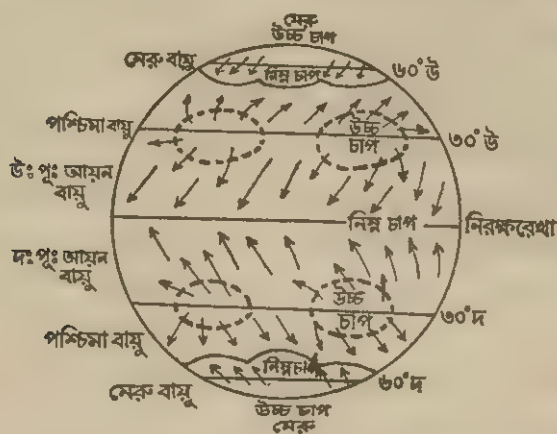
দিকে প্রবাহিত হয়, ইহা দক্ষিণ গোলার্ধের উপর দিয়া আসিবার সময় বাম-দিকে বাঁকিয়া যায়। সেজন্য ইহা সর্ব্বদা দক্ষিণ-পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবাহিত হয়। তাই ইহার নাম **দক্ষিণপূর্ব আয়ন বায়ু**। এই দুই বায়ুপ্রবাহের দিক্ ও গতি ক্বচিৎ পরিবর্তিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে (নিয়ত বায়ু) আয়নবায়ু (Trade wind) বলা হয়। ["To blow trade=to blow steadily in a constant direction."] মহাসাগরসমূহের মধ্যঅংশে ইহাদের **প্রবাহের দিক্ ও গতির স্থিরতা** (Constaney) প্রায় ৯০% এবং সাগর, মহাসাগর অঞ্চলে গড়ে ৭০%। (মহাসাগরসমূহের পশ্চিম অংশে এই বায়ুপ্রবাহের স্থিরতা সবচেয়ে কম।) এই বায়ুপ্রবাহের গতি ঘণ্টায় সাধারণতঃ ১৬-৩২ কিমি। (তবে প্রতি ঘণ্টায় ৪০ কিমি পর্যন্ত হইতে পারে।)

এই দুই বায়ুপ্রবাহ পালতোলা জাহাজ, নৌকা প্রভৃতির যাতায়াতের ও তাহাদের মাধ্যমে বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধাজনক। উত্তর গোলার্ধের গ্রীষ্মকালে উত্তরপূর্ব আয়ন

বায়ু ৩০° উঃ অঃ হইতে ১০° উঃ অঃ মধ্যে এবং শীতকালে ২৩½° উঃ অঃ হইতে ৫° উঃ অঃ মধ্যে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণপূর্ব্ব আয়নবায়ু প্রবাহের অঞ্চলও গ্রীষ্ম ও শীতকালে অনুরূপভাবে উত্তর-দক্ষিণে সরিয়া থাকে।

(২) **পশ্চিমা বায়ু**—উত্তর গোলার্ধে কর্কটীয় উচ্চচাপ বলয় (সাধারণতঃ ৩৫° উঃ অঃ) হইতে এই বায়ুপ্রবাহ সুমেরু দেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের (৬০° উঃ অঃ) দিকে (অর্থাৎ এই বায়ু নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের বিপরীত দিকে) প্রবাহিত হয়। আর দক্ষিণ গোলার্ধে মকরীয় উচ্চচাপ বলয় (৩৫° দঃ অঃ) হইতে এই বায়ুপ্রবাহ কুমেরু দেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের (৬০° দঃ অঃ) দিকে প্রবাহিত হয়। তবে ঋতুপরিবর্তনের সহিত চাপবলয়ের স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বায়ুবলয়েরও কিছু স্থান পরিবর্তন হয়। উভয় গোলার্ধের এই বায়ুপ্রবাহের **গতি অনিয়মিত** এবং তাহা প্রায়ই **পরিবর্তিত** হয়। বিশেষতঃ উত্তর গোলার্ধে সুমেরু অঞ্চল হইতে ও দক্ষিণ গোলার্ধে কুমেরু অঞ্চল হইতে প্রবাহিত শীতল মেরু বায়ুর সহিত প্রায়ই ইহার সংঘর্ষ হয়। ফলে, এই বায়ুপ্রবাহের অঞ্চলের **আবহাওয়া** খুব বেশী **পরিবর্তিত** হয়। এই বায়ুপ্রবাহ সাধারণতঃ পশ্চিমদিক্ হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহা **পশ্চিমাবায়ু** (Westerlies) নামে পরিচিত।

উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণপশ্চিম দিক্ হইতে বায়ু অপেক্ষাকৃত অধিক সময় প্রবাহিত হয় বলিয়া ঐ বায়ুর নাম **দক্ষিণ-পশ্চিম পরিবর্তনশীল বায়ু** (South westerly variables)। উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগ অধিক বিস্তৃত। এখানকার ভূপ্রকৃতির পার্থক্যও যথেষ্ট। একারণেও এখানে এই বায়ুর গতি ও বেগ পরিবর্তিত হয়।

প্রবল পশ্চিমা বায়ু ও গর্জনশীল চল্লিশা—দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে ৪০-৬০° দক্ষিণ অক্ষাংশে স্থলভাগ অতি সামান্য, অধিকাংশই জলভাগ। সুতরাং সেখানে পশ্চিমা বায়ু **প্রবল বেগে** প্রবাহিত হয়। প্রধানতঃ এই বায়ুপ্রবাহের ফলে তথাকার (সমুদ্রের উপর) আকাশ থাকে মেঘাচ্ছন্ন এবং প্রায়ই **প্রবল ঝড়বৃষ্টি** হয়। নাবিকগণের পক্ষে এই অবস্থা অত্যন্ত অসুবিধাজনক। সেজন্য তাঁহারা ইহাকে বলেন **প্রবল পশ্চিমা বায়ু** (Brave westerlies or West winds) এবং এই অঞ্চলকে, বিশেষতঃ ৪০° দক্ষিণ অক্ষাংশকে, বলেন **গর্জনশীল চল্লিশা** (Roaring forties)।

(৩) **মেরু বায়ু**—উত্তর গোলার্ধে সুমেরুর উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে অত্যন্ত শীতল ও শুষ্ক (জলীয় বাষ্পহীন) বায়ু সুমেরু দেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। এই **সুমেরু বায়ু** (North Polar winds) সাধারণতঃ উত্তরপূর্বদিক হইতে আসে। গ্রীষ্মকালের তুলনায় **শীতকালে** এই বায়ু অনেকদূর দক্ষিণে (এশিয়া ও উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগে) প্রবাহিত হয়। তবে এই বায়ুও অত্যন্ত অনিয়মিত। দক্ষিণ

গোলার্ধে কুমেরুর উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে অত্যন্ত শীতল বায়ু কুমেরু দেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। **কুমেরু বায়ু** (South Polar winds) সাধারণতঃ দক্ষিণপূর্ব দিক্ হইতে প্রবাহিত হয়। ঐ অঞ্চলে **য়্যান্টার্কটিকাতে উচ্চচাপ** প্রবল, আর পাশের **সমুদ্রে** তুলনামূলক ভাবে **নিম্নচাপ** বিস্তৃত। সেজন্য দক্ষিণ গোলার্ধের উপর দিয়া এই বায়ু অনেক দূর উত্তরে অগ্রসর হয়।

সাময়িক বায়ু

জল ও স্থলের মধ্যে সৌরতাপ গ্রহণ, সংরক্ষণ, বায়ুর চাপ প্রভৃতি সম্পর্কে পার্থক্য প্রচুর। সেকারণে বিভিন্ন ঋতুতে এবং দিবারাত্রির বিভিন্ন অংশেও বায়ুর উষ্ণতা ও চাপের পার্থক্য ঘটে। ফলে, বায়ুপ্রবাহেরও পরিবর্তন ঘটে। এরূপ বায়ুকে **সাময়িক বায়ু** বলে। বিভিন্ন প্রকার সাময়িক বায়ুর মধ্যে (১) সমুদ্র বায়ু, স্থল বায়ু ও (২) মৌসুমী বায়ু উল্লেখযোগ্য।

(১) **সমুদ্র বায়ু—দিবাভাগে** বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য হইতে অধিক উত্তাপ লাভ করিয়া ভূপৃষ্ঠস্থ স্থলভাগ জলভাগের চেয়ে বেশী উত্তপ্ত হয়। কাজেই **স্থলভাগের** উপরদিকের বায়ু তখন অধিক উষ্ণ ও হাল্কা হয় এবং এখানে **নিম্নচাপ** সৃষ্টি হয়। তখন এই বায়ু উপরদিকে উঠিয়া যায়। কিন্তু তখন **জলভাগের** বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে এবং এখানে **উচ্চচাপ** থাকে। কাজেই জলভাগের উচ্চচাপ অঞ্চলের বায়ু স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে এই বায়ুপ্রবাহ থাকে মৃদু; **অপরাহ্নে** ইহার বেগ অধিক বুঝা যায়। সমুদ্র হইতে আসে বলিয়া এপ্রকার বায়ুর নাম সমুদ্র বায়ু (Sea breeze)।
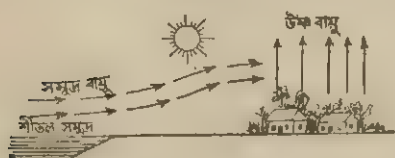
স্থল বায়ু—সন্ধ্যার পর সূর্যের কিরণ পাওয়া যায় না। বরং ভূপৃষ্ঠ দিনের বেলা যে পরিমাণ উত্তাপ লাভ করে, সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি তাহার কতক অংশ বিকিরণ করে। কাজেই সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি যত বাড়িতে থাকে স্থলভাগ তত দ্রুত শীতল হয়। তাই **রাত্রিতে স্থলভাগের** উপরদিকের বায়ুতে **উচ্চচাপ** সৃষ্টি হয়। কিন্তু, **জলরাশি** রাত্রিতে সেরূপ দ্রুত তাপ বিকিরণ করিতে পারে না। কাজেই তুলনামূলকভাবে তখন তথায় বায়ুর **চাপ** থাকে **কম**। সেজন্য তখন বায়ুমণ্ডলের সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে

উচ্চচাপযুক্ত স্থলভাগের শীতল বায়ু নিকটবর্তী সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। স্থলভাগ হইতে আসে বলিয়া এই বায়ুর নাম স্থল বায়ু (Land breeze)। মধ্যরাত্রির পূর্ব হইতে এরূপ বায়ু সমুদ্রের দিকে বহিতে থাকে। তবে দেশের অভ্যন্তরে **শেষ রাত্রিতে** ইহার প্রভাব অধিক বুঝা যায়।

ভোরের দিকে স্থলভাগ সূর্যের কিরণ লাভ করিয়া উষ্ণ হইতে আরম্ভ করে এবং স্থল বায়ুর প্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়। সমুদ্র বায়ুর ও স্থল বায়ুর প্রভাবে বড় বড় নদীর তীর, হ্রদ অঞ্চল ও সমুদ্র-উপকূলের অবস্থা নাতিশীতোষ্ণ এবং আরামদায়ক। গ্রীষ্মকালে বৈকালবেলা এই রূপ সমুদ্র বায়ুর জন্য কলিকাতাতে বেশ আরাম বোধ হয়।

(২) **মৌসুমী বায়ু**—সাময়িক বায়ুর অপর প্রধান উদাহরণ মৌসুমী বায়ু। পৃথিবীর যে সকল অংশে বিস্তীর্ণ জলভাগ ও স্থলভাগ পাশাপাশি অবস্থিত, তথায় স্থল ও জলরাশির মধ্যে শীত ও গ্রীষ্মকালের উষ্ণতার পার্থক্য দিবা ও রাত্রির উষ্ণতার পার্থক্যের তুলনায় বেশী। তথায় স্থলভাগ গ্রীষ্মকালে তথাকার আশপাশের জলভাগের চেয়ে বেশী উত্তপ্ত হয়। কাজেই দিবাভাগে জলরাশি হইতে প্রবাহিত সমুদ্র বায়ুর মত **গ্রীষ্মকালে** সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্পপূর্ণ **জল মৌসুমী বায়ু** (Water monsoon) স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়; আবার এই সকল স্থানে শীতকালে জলভাগের চেয়ে স্থলভাগ অধিক শীতল হয়। কাজেই রাত্রিতে স্থলভাগ হইতে প্রবাহিত স্থল বায়ুর মত এ সকল স্থানে **শীতকালে** স্থল হইতে শুষ্ক **স্থল মৌসুমী বায়ু** (Land monsoon) অপেক্ষাকৃত কম শীতল জলরাশির দিকে প্রবাহিত হয়। বিভিন্ন ঋতুর পরিবর্তন অনুসারে এইপ্রকার বায়ুর দিক্ পরিবর্তিত হয় বলিয়া ইহা **মৌসুমী বায়ু*** (Monsoon or Seasonal wind)।

আকস্মিক বা অনিয়ত বায়ু

পৃথিবীর যে-কোন অংশে নদীর ধারে গেলে দেখা যায়, নদীর জল অবিরাম গতিতে হ্রদ বা সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাহার এরূপ প্রবাহের মধ্যেও মাঝে মাঝে ঘূর্ণিপাক সৃষ্টি হয়। সেরূপ ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন নিয়ত বায়ু অঞ্চলেও যথেষ্ট পরিবর্তন (ঘূর্ণিপাকের মত অবস্থা) হয়। কখন কখন পরিবর্তন হয় খুব হঠাৎ। এরূপ আকস্মিক বায়ু মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত; যথা—ঘূর্ণবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণবাত।

(১) **ঘূর্ণবাত**—ভূপৃষ্ঠের উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ, উভয় অংশে ঘূর্ণবাতের প্রাদুর্ভাব অধিক। ইহাদের উৎপত্তির কারণ, গতি, প্রভাব প্রভৃতি সম্পর্কে পার্থক্য প্রচুর। অল্প-পরিসর কোন স্থানে বায়ুর উষ্ণতা হঠাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে প্রবল **নিম্নচাপ কেন্দ্রের**

* আরবী শব্দ 'মৌসিম'=ঋতু। সুতরাং মৌসুমী বায়ু=ঋতু অনুসারে পরিবর্তিত বায়ু।

("Low") সৃষ্টি হয়। তখন এখানে কিছু সময় বায়ুমণ্ডল শান্ত গম্ভীর ভাব (Lull) ধারণ করে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই চারিদিকের শীতল ও উচ্চচাপ অঞ্চলসমূহ হইতে বিভিন্ন বায়ুপ্রবাহ এই নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে **বেগে** ধাবিত হয়। **উত্তর গোলার্ধে** এরূপ নিম্নচাপ কেন্দ্রের অভিমুখে প্রবাহিত বায়ু ডানদিকে বাঁকিয়া **বামাবর্তে** বা ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে (Anti-clockwise) বহিয়া যায়। আর **দক্ষিণ গোলার্ধে** এরূপ নিম্নচাপ কেন্দ্রের অভিমুখে প্রবাহিত বায়ু বামদিকে বাঁকিয়া **দক্ষিণাবর্তে** বা ঘড়ির কাঁটার গতি অনুসারে (Clockwise) বহিয়া থাকে। এভাবে উষ্ণমণ্ডলে ঘূর্ণবাতের (Cyclone) সৃষ্টি হয়। এই বায়ুপ্রবাহ নিম্নচাপ **কেন্দ্রে** পৌঁছিয়া উষ্ণ ও হাল্কা হইয়া নিরক্ষীয় অঞ্চলের বায়ুপ্রবাহের মত উপরদিকে উঠিয়া যায় (Convection current) এবং ক্রমশঃ প্রসারিত হয়। তথায় এই বায়ুর মধ্যস্থিত **জলীয় বাষ্প** ক্রমশঃ **ঘনীভূত** হয় ও **মেঘ** সৃষ্টি হয়। এজন্য উষ্ণ অঞ্চলে ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রে **বৃষ্টি** হয়, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেও ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রে বৃষ্টি হয়। আর শীতল অঞ্চলে ঘূর্ণবাতের সময় **তুষারপাত** হয়। ঘূর্ণবাত কোন স্থান পার হইয়া যাওয়ার পরে তথাকার আকাশ পরিষ্কার হয়।
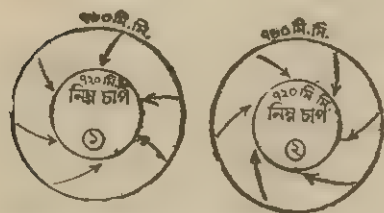
১নং চিত্র উত্তর গোলার্ধে ঘূর্ণবাতের গতি
২নং চিত্র দক্ষিণ গোলার্ধে ঘূর্ণবাতের গতি

বৃহৎ ঘূর্ণবাত সাধারণতঃ **দুর্বল**। তাহা **ধীরে** (ঘণ্টায় প্রায় ২৫ কিমি বেগে) প্রবাহিত হয় এবং ভাঙ্গিয়া গিয়া কতক ক্ষুদ্র ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হয়। আর ক্ষুদ্র অথচ **প্রবল ঘূর্ণবাত প্রচণ্ড বেগে** প্রবাহিত হয়। ইহাদের ফলে **ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি** ও বিস্তর **ক্ষতি** হয়। প্রচণ্ড ঘূর্ণবাতসমূহ কোন **সমুদ্রের** উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ার সময় কখন কখন তথাকার জলরাশিকে এরূপ প্রবলভাবে আকর্ষণ করে যে তাহার কতক অংশকে উঁচুতে তুলিয়া ফেলে। এভাবে **জলস্তম্ভ** (Water spout) সৃষ্টি হয়। এরূপ প্রবল ঘূর্ণবাত কোন **মরুভূমির** উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ার সময় তথাকার বালুকারাশিকেও আকর্ষণ করিয়া উপরে তুলিয়া ফেলে। ইহাকে **বালুকাস্তম্ভের** (Column of sand) মত দেখা যায়।

বিভিন্ন অঞ্চলে ঘূর্ণবাত সম্পর্কে পার্থক্য—নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ঘূর্ণবাত মৃদু, আর **উষ্ণ** অঞ্চলের ঘূর্ণবাত সাধারণতঃ অত্যন্ত প্রবল। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ঘূর্ণবাত সাধারণতঃ পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়, আর উষ্ণ অঞ্চলের ঘূর্ণবাত সাধারণতঃ পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়। উষ্ণ অঞ্চলের **প্রবল** ঘূর্ণাবাতের ফলে

বিমানপোত ও জাহাজ চলাচলের পক্ষে বিশেষ বাধা হয় এবং অল্পক্ষণের মধ্যে আবহাওয়ার ও ভূপৃষ্ঠের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে; বাড়ীঘর, গাছপালা প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া যায়, এমন কি বহু লোকের মৃত্যু ঘটে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মৃদু ঘূর্ণবাতের ফলে জলবায়ুর ও ভূপৃষ্ঠের অনেক কম পরিবর্তন হয়। বরং এরূপ ঘূর্ণবাতের সংখ্যা অনেক বেশী বলিয়া ইহা এখানকার জলবায়ুর ও মানবজীবনের একঘেয়েমি (Monotonous) অবস্থা দূর করিয়া তাহার মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আনয়ন করে।

(ক) **নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ঘূর্ণবাত**—এরূপ ঘূর্ণবাতের কারণ সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন কাজ। সুমেরু অঞ্চলের **শীতল** বায়ু সাধারণতঃ উত্তর-পূর্বদিক হইতে আসে এবং কর্কটক্রান্তির নিকটবর্তী অঞ্চলের **উষ্ণ** (যথেষ্ট পরিবর্তনশীল) পশ্চিমাবায়ু পশ্চিম দিক্ হইতে প্রবাহিত হয়। ইহাদের পরস্পরের পথ পৃথক্। ইহাদের পথের কাল্পনিক সীমারেখাকে বিচ্ছেদ রেখা (Line discontinuity) বলে। তবে উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ কখন কখন শীতল বায়ুপ্রবাহের পথে প্রবেশ করে। তখন দুই বায়ুপ্রবাহের মধ্যে **সংঘর্ষ** হয়। তাহার ফলে বায়ু তরঙ্গের ("Waves") ও তাহার মধ্যভাগে সাধারণতঃ **অগভীর নিম্নচাপ** কেন্দ্রের (Shallow depression) সৃষ্টি হয়। এপ্রকার ঘূর্ণবাত (Temperate cyclone) সাধারণতঃ পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে (পশ্চিমাবায়ুর দিক্ অনুসারে) প্রবাহিত হয়। এই বায়ুপ্রবাহের অগ্রভাগকে বলে **উষ্ণ অগ্রভাগ** (Warm front)। এরূপ ঘূর্ণবাতের কেন্দ্র (নিম্নচাপ কেন্দ্র) যতই প্রবল হইতে থাকে শীতল বায়ুপ্রবাহ নীচ হইতে উষ্ণ বায়ুপ্রবাহকে ততই **উপর দিকে** ঠেলিয়া তোলে এবং তাহা ক্রমশঃ **শীতল** হয়। এভাবে **শীতল অগ্রভাগের** (Cold front) **সৃষ্টি** হয়। উষ্ণ অগ্রভাগের ফলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া **বৃষ্টি** আরম্ভ হয়। **যুক্তরাষ্ট্রে** এরূপ অবস্থাতে প্রবল ঝড় এবং মাঝে মাঝে শিলাবৃষ্টি হয়। এইরূপ অবস্থাকে **লাইন স্কোয়াল** (Line-squal) বলে। তাহা ছাড়া শীতল অগ্রভাগের ফলেও কখন কখন প্রচুর বৃষ্টি হয়, তবে উষ্ণতা অনেক কমিয়া যায়। শীতল অগ্রভাগের প্রভাবে সম্মুখের উষ্ণ বায়ু ভূপৃষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণরূপে উপরে উঠিয়া গেলে ঘূর্ণবাত লোপ পায়। এই অবস্থা সবচেয়ে বেশী দেখিতে পাওয়া যায় **ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে**। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে মৃদু ঘূর্ণবাতের **সংখ্যা বহু**। তাহার ফলে **আবহাওয়ার** প্রায়ই **পরিবর্তন** হয়। তাহাদ্বারা জীবনের একঘেয়েমিও অনেক দূর হয়। এপ্রকার কতক ঘূর্ণবাত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের (১৫০০ কিমি. পর্যন্ত) উপর দিয়া বহিয়া যায়। এরূপ ঘূর্ণবাত অনেক সময় বায়ুচাপ রেখার প্রায় সমান্তরালভাবে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়।

উষ্ণ অঞ্চলের ঘূর্ণবাত—উষ্ণমণ্ডলে সাধারণতঃ ৫-২০° উত্তর বা দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যবর্তী অংশে অল্প সময়ের মধ্যে বায়ুমণ্ডলের চাপ **হঠাৎ** অনেক নামিয়া যায়।

তখন এসকল স্থানে অত্যন্ত **প্রবল নিম্নচাপ কেন্দ্রের** (Deep depression) ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হয়। উষ্ণমণ্ডলের এরূপ **ঘূর্ণবাতের** (Tropical cyclone) **কেন্দ্রকে** ঘূর্ণবাতের **চক্ষু** (Eye of the cyclone) বলা হয়। এইরূপ কেন্দ্রে **স্থির শান্ত** অবস্থা থাকে, কিন্তু চারিদিক হইতে বায়ু **অত্যন্ত তীব্র বেগে** (কখন কখন ঘণ্টায় ১৬০-২০০ কিঃ মিঃ) কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। আর সেই সঙ্গে **বিদ্যুৎ** ও **বজ্রপাতের** সহিত **মুষলধারে** বৃষ্টি আরম্ভ হয়।

এপ্রকার ঘূর্ণবাত বিভিন্ন স্থানে নানা নামে পরিচিত। যেমন, **বঙ্গোপসাগরের** ঘূর্ণবাতের নাম **সাইক্লোন** (Cyclone)। ইহা সাধারণতঃ উত্তর ও উত্তরপূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। ইহাদ্বারা **উড়িষ্যা হইতে বাংলাদেশ** পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টি এবং কখন কখন বিস্তর ক্ষতি হয়। চীনসাগরে এবং জাপান হইতে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত অঞ্চলে এপ্রকার ঘূর্ণবাতের নাম **টাইফুন** (Typhoon)। আটলান্টিক মহাসাগরের বিভিন্ন অংশে, বিশেষতঃ মেক্সিকো উপকূল, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে এরূপ প্রবল ঘূর্ণবাতকে বলে **হারিকেন** (Hurricane=Spirit of the evil)। টাইফুন ও হারিকেন নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ঘূর্ণবাতের তুলনায় কম (৩৫০—৪৫০ কিমি) বিস্তৃত অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। কিন্তু ইহাদের গতিবেগ **অত্যন্ত প্রবল** (ঘণ্টায় ১৫০-৩০০ কিমি পর্যন্ত)। ফলে, ইহাদের **ধ্বংসলীলা** অতিভীষণ। আমাদের দেশের চৈত্র-বৈশাখ মাসের **কালবৈশাখী** (Nor'wester) এবং **আশ্বিন-কার্তিকের ঝড়ও** অনেক সময় এরূপ প্রবল আকার ধারণ করে। ইহাদের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর মোহনার নিকট দিয়া প্রবাহিত **টর্নেডোর** (Tornado) বেগ অধিক প্রবল। সাধারণতঃ অল্প (২-৩ কিমি) জায়গার উপর দিয়া প্রবাহিত এরূপ প্রবল ঘূর্ণবাত দ্বারা ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা ঘটে।

(২) **প্রতীপ ঘূর্ণবাত**—সাধারণতঃ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের কতক অল্প পরিসর স্থানে মাঝে মাঝে **তীব্র শীতের** জন্য **উচ্চচাপ কেন্দ্রের** সৃষ্টি হয়। ইহার বাহির দিকে শীত কম, বায়ুর চাপও কম। তখন এই উচ্চচাপ কেন্দ্র হইতে শীতল ও শুষ্ক বায়ু চারিদিকে নিম্নচাপ অঞ্চলের অভিমুখে প্রবাহিত হয়। ফলে, ইহার গতি থাকে ঘূর্ণবাতের বিপরীত দিকে অর্থাৎ **উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণাবর্তে** (Clockwise), আর **দক্ষিণ গোলার্ধে বামাবর্তে** (Anti-clockwise)। এই বায়ুকে **প্রতীপ ঘূর্ণবাত** (Anti-cyclone)
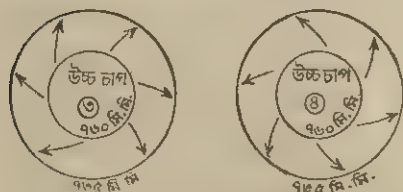
৩ নং চিত্র উত্তর গোলার্ধে প্রতীপ ঘূর্ণবাতের গতি
৪নং চিত্র দক্ষিণ গোলার্ধে প্রতীপ ঘূর্ণবতের গতি

বলে। ইহা পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়। এরূপ বায়ু দীর্ঘস্থায়ী, কিন্তু ইহার গতি ঘূর্ণবাতের মত প্রবল নহে। ইহার প্রভাবে **শীত বৃদ্ধি** হয়, কখন কখন **তুষারপাত** হয় ; কিন্তু আকাশ নির্মল থাকে।

স্থানীয় বায়ু

স্থানীয় বায়ু—ভূপৃষ্ঠে কখন কখন পাশাপাশি জায়গাতে **ভূপ্রকৃতি** সম্পর্কে বিস্তর **পার্থক্য** দেখা যায়। যেমন, কোথাও উঁচু পাহাড়, পর্বতের পাশে আছে সমভূমি, কোথাও সাগর, কোথাও বা মরুভূমি। ফলে, পাশাপাশি অঞ্চলে বায়ুর **উষ্ণতা, চাপ** প্রভৃতি সম্পর্কেও **পার্থক্য** প্রচুর। তাই এরূপ অঞ্চলে বৎসরের বা দিনের কতক নির্দিষ্ট সময়ে নিম্নলিখিত রূপ স্থানীয় বায়ু (Local winds) প্রবাহিত হয়। স্বভাবতঃ যে সকল স্থানের ভূপ্রকৃতির পার্থক্য যত বেশী, সেখানে এরূপ স্থানীয় বায়ুর প্রভাবও তত অধিক (Maximum in areas of contrast)।

পার্বত্য অঞ্চলের উষ্ণ বায়ু—কঠিন শিলাদ্বারা গঠিত উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল রাত্রিতে অধিক শীতল হয় এবং তখন পর্বতে উচ্চচাপ সৃষ্টি হয়। তাই রাত্রিতে পর্বত হইতে শীতল ও শুষ্ক বায়ু পর্বতের বিভিন্ন উপত্যকার মধ্য দিয়া সমভূমির (নিম্নচাপ অঞ্চলের) দিকে প্রবাহিত হয়। **সংকীর্ণ উপত্যকার** মধ্য দিয়া নিম্নদিকে আসিবার সময় ইহা যত **নীচে** নামে ক্রমশঃ তত অধিক **উষ্ণ** (Adiabatic warming) হয়।

এরূপ বায়ু বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন, ইউরোপের আল্পস্ পর্বত হইতে রাত্রিতে প্রবাহিত এরূপ বায়ুকে সাধারণতঃ **ফন** (Fohn) বলে। আল্পসের বহু উপত্যকার মধ্য দিয়া রাত্রিতে এরূপ শুষ্ক বায়ু উত্তরদিকে মধ্য-ইউরোপের সমভূমির (নিম্নচাপ অংশের) দিকে বহুদূর বহিয়া যায়। নিম্নদিকে এই বায়ুর প্রভাবে কখন কখন বায়ুর **উষ্ণতা** এত **বৃদ্ধি** হয় যে তাহার প্রভাবে এখানকার বরফ তাড়াতাড়ি গলিয়া যায়। ফলে, এরূপ সময় কখন কখন পর্বত অঞ্চল হইতে **হিমানীসম্প্রপাত** (Avalanche) হয়। আর নিম্ন অংশে কখন কখন অতি সামান্য স্ফুলিঙ্গ হইতে ভয়ঙ্কর **আগুন** জ্বলিয়া উঠে। আমেরিকার রকি পর্বত অঞ্চল হইতে নীচে সমভূমির দিকে প্রবাহিত এরূপ বায়ুর নাম **চিনুক** (Chinook)। [রেড ইণ্ডিয়ানগণের ভাষাতে 'চিনুক=তুষার-ভক্ষক' (Snow-eater)।] পর্বতের উপত্যকা দিয়া নিম্নদিকে প্রবাহিত এই জাতীয় উষ্ণ বায়ুকে ক্যালিফোর্নিয়াতে **সাণ্টানাস্** (Santanas), দক্ষিণ আফ্রিকাতে **বার্গ** (Berg), দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়েডর রাজ্যে আন্দিজ পর্বতে **নেভাদাস** (Nevadas) বলে।

পার্বত্য অঞ্চলে উষ্ণতার বিপরীত অবস্থা (Inversion of temperature)—রাত্রিকালে উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল হইতে প্রবাহিত **শীতল বায়ুর** প্রভাবে

পার্বত্য উপত্যকার **নিম্ন অংশে** বা আরও নীচে কোন নদীর অববাহিকা অঞ্চলে (Basin) বায়ুর উষ্ণতা **হিমাঙ্কের নীচেও** নামিয়া যাইতে পারে। অথচ তখন উপরদিকে পাহাড়ের ঢালে ইহার চেয়ে অধিক উষ্ণতা থাকিতে পারে। কাজেই এরূপ অবস্থাতে উষ্ণতার **বিপরীত অবস্থা** ঘটে। যেমন, উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমদিকের পার্বত্য অঞ্চলে পাইস্ শৃঙ্গে (৪৩৫৩ মি উচ্চ) কখনও -৪৫° সে-র নীচে উষ্ণতা নামে নাই, অথচ তাহার পূর্বদিকে মাণ্টানা রাজ্যে মাইলস্ সিটিতে -৬০° সে উষ্ণতা লক্ষ্য করা গিয়াছে। রাত্রিতে শীতল বায়ু যেভাবে বিভিন্ন পার্বত্য উপত্যকার মধ্য দিয়া নীচের দিকে নামিয়া আসে, গ্রীনল্যাণ্ড ও মেরু অঞ্চলের বিভিন্ন দ্বীপ হইতেও শীতল বায়ু সেভাবে চারিদিকে প্রবাহিত হয়।

পার্বত্য অঞ্চল হইতে প্রবাহিত শীতল বায়ু—কখন কখন পার্বত্য অঞ্চল হইতে শীতল বায়ু রাত্রিতে **সমভূমির দিকে** বহিয়া যায়। এই বায়ু বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন—**শীতকালে** ফ্রান্সে রোন নদীর উপত্যকা দিয়া ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের সমভূমি অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত শীতল বায়ুর নাম **মিস্ট্রাল** (Mistral)। ইহার পূর্বদিকে ইটালির উত্তর অংশের সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত শীতল বায়ুর নাম **ট্রামণ্টানা** (Tramontana), আর আড্রিয়াটিক সাগরের দিকে প্রবাহিত শীতল বায়ুকে বলা হয় **বোরা** (Bora)। এই জাতীয় সাময়িক শীতল বায়ুকে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশে বলে **নর্দার** (Norther), মেক্সিকোতে ইহার নাম **নর্টা** (Norta)। দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমালা হইতে আর্জেন্টিনার দিকে প্রবাহিত শীতল বায়ুকে বলা হয় **পাম্পেরো** (Pampero)। পেরুদেশে ইহার নাম **পুনা**। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসে এরূপ শীতল বায়ুর নাম **সাদার্লি বার্স্টার** (Southerly burster)।

উষ্ণমণ্ডল হইতে প্রবাহিত বায়ু—উষ্ণমণ্ডলের কতক স্থান হইতে গ্রীষ্মকালে কিছু কিছু স্থানীয় বায়ু প্রবাহিত হয়। যেমন, সাহারা মরুভূমি হইতে কতক শুষ্ক উষ্ণ বায়ু ভূমধ্যসাগর পার হইয়া ইটালির দুই পাশ দিয়া উত্তর-পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়। ইহার নাম **সিরক্কো** (Sirocco)। স্পেনে ইহাকে বলা হয় **লেভেসে** (Leveche)। এরূপ উষ্ণ বায়ুকে মিশরে বলা হয় **খাম্‌সিম** (Khamsim)। অস্ট্রেলিয়াতে এরূপ উষ্ণ বায়ুর নাম **ব্রিক্ ফিল্ডার্স** (Brick-fielders), আর্জেন্টিনাতে ইহার নাম **জোণ্ডা** (Zonda)।

উপরিলিখিত উত্তপ্ত ও শুষ্ক বায়ুর সহিত বালুকা মিশ্রিত থাকার ফলে কৃষিকার্যের ক্ষতি হয়। আর সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবাহিত আর্দ্র, উষ্ণ বায়ু মানুষের পক্ষে অস্বস্তিকর।

মরু অঞ্চলের বায়ু—মরু অঞ্চলের অত্যন্ত উত্তপ্ত অংশ হইতে কখন কখন আগুনের মত উত্তপ্ত বালুকাকণা-মিশ্রিত **প্রচণ্ড উত্তপ্ত** বায়ু বাহির দিকে প্রবাহিত

হয়। এরূপ ঝড়ের মুখে পড়িলে জীবজন্তু মূর্চ্ছিত হয়, এমন কি তাহাদের গায়ে ফোস্কা পড়ে। সাহারা অঞ্চলে এরূপ প্রচণ্ড **বালুকা ঝড়কে** (Dust-devil) **সিমুম** (Simoom , বলে। পূর্ব তুর্কিস্থানের তারিম উপত্যকায় ইহাকে বলা হয় **কারাবুরন** (Karaburan)। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে গ্রীষ্মকালে দুপুরের পর যে প্রবল উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হয় ইহার নাম **লু** (Loo)। ইহার তীব্রতার জন্য লোকজন তখন সাধারণতঃ ঘরের বাহিরে আসে না। এ সকল স্থানে সন্ধ্যার সময় যে **ধূলি-ঝড়** বহে ইহাকে বলা হয় **আঁধি**।

বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত

বায়ুর আর্দ্রতা—বায়ুর উপাদানের প্রায় ৭৮% নাইট্রোজেন ও প্রায় ২১% অক্সিজেন। কাজেই বায়ুর মধ্যস্থিত জলীয় বাষ্প (Water vapour) সহ অন্যান্য উপাদানের মোট পরিমাণ ১%-এর কম। কখন কখন বায়ুতে জলীয় বাষ্প প্রায় থাকে না। এরূপ বায়ু **শুষ্ক** (Dry)। আর অধিক জলীয় বাষ্পযুক্ত বায়ুকে **আর্দ্র** (Damp or humid) বায়ু বলে। আর্দ্র বায়ুর **উষ্ণতা কমিয়া গেলে** ইহার পক্ষে নূতন জলীয় বাষ্প গ্রহণ করা অসম্ভব, বরং ইহার মধ্যস্থিত জলীয় বাষ্প **ঘনীভূত** (Condensed) হয়। অধিক জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে অক্ষম বায়ুকে **পরিপৃক্ত** (Saturated) বায়ু বলে। অপরদিকে বায়ুর (এমন কি, আর্দ্র ও পরিপৃক্ত বায়ুর) **উষ্ণতা বৃদ্ধির** সঙ্গে সঙ্গে ইহার **জলীয় বাষ্প ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি** হয়।

বায়ুর মধ্যে **জলীয় বাষ্পের** পরিমাণ অতি তুচ্ছ হইলেও বিভিন্ন উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর জীবনের উপর ইহার **প্রভাব** খুব বেশী। আর্দ্র বায়ু বৃষ্টিপাতের পক্ষে অত্যাবশ্যক। আবার উদ্ভিদের পক্ষে বৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। ইহার সম্পূর্ণ অভাব হইলে উদ্ভিদহীন মরুভূমির সৃষ্টি হয়। অপরদিকে মানুষের পক্ষে শুষ্ক বায়ুর তুলনায় আর্দ্র বায়ু অধিক অস্বাস্থ্যকর ও অস্বস্তিকর।

বায়ুর আর্দ্রতা সৃষ্টি এবং পরিবর্তনের রহস্য—সূর্যের উত্তাপের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের সাগর, মহাসাগর, হ্রদ, নদী প্রভৃতির জলরাশি বাষ্পে পরিণত হয় এবং বায়ুপ্রবাহের সহিত উর্ধ্বদিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু যত উপরদিকে উঠে, তত অধিক **শীতল** ও **ঘনীভূত** হয়। এভাবে **মেঘ** সৃষ্টি হয়। এই মেঘ হইতেই বৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ ঘনীভূত জলীয় বাষ্পই বৃষ্টি, তুষার প্রভৃতিরূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। এই বৃষ্টির জল, তুষারগলা জল প্রভৃতিই হ্রদ, নদী, সাগর প্রভৃতিতে গিয়া সঞ্চিত হয় এবং সেখানে সূর্যের উত্তাপ লাভ করিয়া আবার বাষ্পে পরিণত হয়। জলীয় বাষ্প ও বৃষ্টির এইরূপ পরিবর্তনকে বলা হয় **জলচক্র** (Water cycle)। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের

পরিমাণ বেশী হইলে **আর্দ্রতা অধিক** (High humidity) হয়, আর জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমিলে **আর্দ্রতা কম** (Low humidity) হয়।

জলীয় বাষ্পযুক্ত বা আর্দ্র বায়ু পরিপৃক্ত হওয়ার সময় নিম্নলিখিত অবস্থার সৃষ্টি হয়

(ক) **শিশির**—বর্ষার পরে শরৎকালে বায়ুতে প্রচুর আর্দ্রতা থাকে। তখন আর্দ্র বায়ু সন্ধ্যাকাল হইতেই শীতল ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে পরিপৃক্ত হয় এবং তাহার ফলে রাত্রিতে ঘাস, পাতা প্রভৃতির উপর প্রচুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলের কণা সঞ্চিত হয়। ইহাকে শিশির (Dew) বলে। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি অপেক্ষা মেঘশূন্য রাত্রি অধিক শীতল। এজন্য নির্মল বা মেঘশূন্য রাত্রিতে অধিক শিশির সঞ্চিত হয়। (শীতকালে বায়ুর উষ্ণতা আরও কমিয়া যায়। কিন্তু সে সময়ে এদেশে বায়ুতে আর্দ্রতা অনেক কম থাকে। তাই তখন শরৎকাল অপেক্ষা অনেক কম শিশির সঞ্চিত হয়। অবশ্য তখন খুব বেশী কুয়াসা হয়।)

(খ) **তুহিন**—শীতল ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে জলাভূমি ও নিম্নভূমিতে এবং উষ্ণমণ্ডলের পার্বত্য অংশে কখনও বায়ুর উষ্ণতা খুব বেশী কমিয়া গেলে বায়ুর মধ্যস্থিত জলীয় বাষ্প দ্বারা কঠিন তুহিনের (Frost) সৃষ্টি হয়।

(গ) **কুয়াসা**—জলীয় বাষ্প কখন কখন রাত্রিতে আকাশের সূক্ষ্ম ধূলিকণাকে আশ্রয় করিয়া অতিক্ষুদ্র জলবিন্দুতে পরিণত হয় এবং ধোঁয়ার মত ভূপৃষ্ঠের কিছু উপরে ভাসিয়া থাকে। ইহাকে **কুজ্ঝটিকা** বা কুয়াসা (Fog) বলে। নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড ও জাপানের নিকট শীতল ও উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের মিলনের ফলে সকল ঋতুতেই কুয়াসা দেখা যায়। আমাদের দেশে শীতকালে কখন কখন খাল, বিল, নদী ও পুকুরের ধারে অত্যন্ত ঘন কুয়াসা হয়।

(ঘ) **তুষার**—শীতপ্রধান দেশ এবং অত্যুচ্চ পর্বতে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হওয়ার সময় অধিক শীতল বায়ু প্রবাহিত হইলে ইহার প্রভাবে ক্ষুদ্র জলকণাসমূহ অতিরিক্ত শীতল ও ঘনীভূত হইয়া (ময়দার সূক্ষ্ম গুঁড়ির মত) তুষার (Snow) সৃষ্টি হয়। তুষারপাতের সময় এরূপ গুঁড়িই আকাশ হইতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়।

(ঙ) **মেঘ ও বৃষ্টিপাত**—জলীয় বাষ্প খুব হাল্কা। তাই ইহা সহজেই বায়ুপ্রবাহের সহিত উপর দিকে উঠিয়া যায়। এদিকে ভূপৃষ্ঠ হইতে ক্রমশঃ উপরদিকে বায়ুর চাপ কম। তাই ক্রমশঃ অধিক উপরে বায়ু অধিক প্রসারিত হয়। আবার ভূপৃষ্ঠ হইতে ক্রমশঃ উপরদিকে বায়ুর উষ্ণতার পরিমাণও কম। সেজন্য উপরদিকে প্রবাহিত বায়ু উচ্চ আকাশে (তথাকার শীতল বায়ুর সংস্পর্শে) ক্রমশঃ অধিক শীতল হয়। তখন ঐ বায়ুর অন্তর্গত জলীয় বাষ্প তথাকার সূক্ষ্ম ধূলিকণাকে আশ্রয় করিয়া অতি ক্ষুদ্র জলবিন্দুতে পরিণত হয়। ইহাদের দ্বারাই মেঘ সৃষ্টি হয়। উচ্চ আকাশে বায়ুমণ্ডলের

উষ্ণতা আরও কমিয়া গেলে মেঘের মধ্যস্থিত জলকণাসমূহ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া আরও বড় হয় এবং তখন **বৃষ্টিপাত** হয়।

বিভিন্ন প্রকার বৃষ্টি—স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত * নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত :—

(১) **পরিচলন বৃষ্টি**—নিরক্ষীয় অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিচলন বৃষ্টি হয়। তথাকার প্রায় সমুদয় বৃষ্টিই এই জাতীয়। এপ্রকার বৃষ্টির সহিত ভূপৃষ্ঠের পাহাড়, পর্বত প্রভৃতির অবস্থিতির কোন প্রকার সম্পর্ক নাই। বরং **আর্দ্র বায়ুর ঊর্ধ্বপ্রবাহের** (Convection current) **সহিতই** ইহার **সম্পর্ক**। পৃথিবীর সর্বত্র সূর্যতাপে বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি হয় এবং তখন বায়ু প্রসারিত হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমস্ত বৎসরই উষ্ণতা অধিক। কাজেই তথায় বায়ুর উষ্ণতাও স্বভাবতঃ অধিক। আবার এই অঞ্চলে সাগর, মহাসাগরের বিস্তৃতি সর্বাপেক্ষা অধিক। ফলে, এখানে জলীয় বাষ্প প্রচুর। কাজেই এখানকার বায়ু **উষ্ণ** ও **জলীয় বাষ্পপূর্ণ**। তারপর এখানকার অধিক উত্তাপের জন্য বায়ু উষ্ণ হইয়া সোজাসুজি উপরদিকে উঠিয়া যায়। এভাবে উপরদিকে প্রবাহের কালে ক্রমশঃ অধিক প্রসারণের ফলে ও উপরের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এই বায়ু ক্রমশঃ শীতল হয়। ক্রমে ক্রমে এই বায়ু পরিপৃক্ত হয়। এই বায়ু তখন অধিক ঘনীভূত হয় এবং তাহার ফলে উচ্চ আকাশে মেঘ সৃষ্টি হয়। তাহা দ্বারা সোজাসুজি নীচে ভূপৃষ্ঠে বৃষ্টি হয়; ইহাকে বলে পরিচলন বৃষ্টি (Convectional rain)। **বিদ্যুৎ, বজ্রপাত ও প্রবল ঝড়** এরূপ বৃষ্টির ঘনিষ্ঠ সঙ্গী। নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিকাতে, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর অববাহিকাতে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয় অঞ্চলে সকালবেলা হইতে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু উপরদিকে উঠিতে থাকে এবং আকাশে ক্রমশঃ মেঘের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। আর দুপুরের পরে বজ্র, বিদ্যুৎ ও ঝড়সহ পরিচলন বৃষ্টি (Thunder shower) হয়। প্রায় প্রতিদিনই এরূপ অবস্থা হয়। তথাকার বৃষ্টির পরিমাণ স্বভাবতঃ খুব বেশী। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেও গ্রীষ্মকালের প্রথমভাগে কখন কখন সামান্য পরিচলন বৃষ্টি হয়। (তথাকার উচ্চ আকাশে তখনও শীতকালের প্রভাব থাকিয়া যায় এবং বায়ু সহজেই শীতল হয়।)
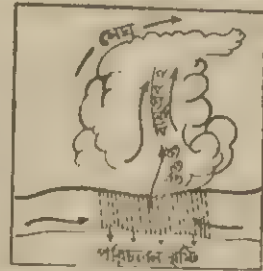
* বর্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকার কতক স্থানে বিমানপোত হইতে মেঘের মধ্যে শুষ্ক বরফ (Dry ice) বা ঐরূপ হিমশীতল পদার্থ ইঞ্জেকসন করিয়া বা খাল ও নদীর জল বিক্ষিপ্ত করিয়া অথবা বিভিন্ন গ্যাসযুক্ত বেলুনের সাহায্যে ও অন্যান্য উপায়ে কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা হইতেছে।

(২) **শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি**—ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া প্রবাহিত আর্দ্র বায়ু পথিমধ্যে পাহাড়, পর্বত ও উচ্চ মালভূমিতে বাধা পাইলে উপরদিকে উঠিতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় বায়ুর চাপ ক্রমাগত কমিয়া যায়। তাহাছাড়া উপরদিকে উঠিবার সময় বায়ু ক্রমশঃ অধিক প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং ক্রমশঃ অধিক শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া অধিক শীতল হয়। তখন ইহার আর্দ্রতা বৃদ্ধি হয় এবং ইহা পরিপৃক্ত ও ঘনীভূত হইয়া মেঘের সৃষ্টি করে। এই মেঘের দ্বারা পর্বতের **প্রতিবাত পার্শ্বে** বা যেদিক দিয়া বায়ুপ্রবাহ উপরে উঠিতে থাকে (Windward side) প্রচুর বৃষ্টি হয়। ইহাকে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি (Orographic or Relief rain) বলে। মহারাষ্ট্রে পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে, মেঘালয়ে গারো, খাসিয়া প্রভৃতি পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে এবং আরও উত্তরে হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ ঢালে সবচেয়ে বেশী শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি হয়।
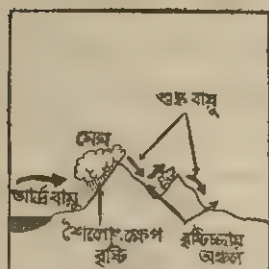
বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল—আর্দ্র বায়ু আপন প্রবাহের দিক অনুসারে অগ্রসর হইতে হইতে যখন কোন পাহাড়, পর্বত পার হইয়া বিপরীত দিকে পৌঁছে, তখন ইহার মধ্যে আগেকার তুলনায় জলীয় বাষ্প কম থাকে। (কারণ, উপর দিকে উঠিবার কালে ইহার মধ্যস্থিত জলীয় বাষ্পের কতক অংশ ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। উপরদিকে অধিক শীতে কতক অংশ তুষাররূপেও পরিণত হইতে পারে।) তারপর বায়ুমণ্ডলের উপরদিকের তুলনায় নীচের দিকে উষ্ণতা বেশী। তাই ঐ বায়ু নীচের দিকে নামিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে ইহার উষ্ণতা কিছু বৃদ্ধি হয়। তাহাছাড়া পাহাড় হইতে নীচে নামিবার সময় বায়ু ক্রমশঃ ঘনীভূত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার উষ্ণতা বাড়িয়া যায়। (উপরের দিকে উঠিবার কালের বিপরীত অবস্থা।) ইহার ফলে তখন বায়ুর আর্দ্রতা কমে। (বায়ুর মধ্যস্থিত জলীয় বাষ্পের কিছু অংশ অধিক তাপে বাষ্পীভূত হয়।) তাই এরূপ বায়ুর পক্ষে পর্বতের **অনুবাত পার্শ্বে** অর্থাৎ যে ঢাল দিয়া বায়ু নীচে নামিয়া আসে (Leeward side) বেশী বৃষ্টিপাত করানো সম্ভবপর হয় না। বরং এরূপ স্থান প্রায় বৃষ্টিহীন ; ইহাকে **বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল** বলে। যেমন, পশ্চিমঘাটের পূর্বদিকের ঢাল ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যভাগ এবং খাসিয়া পাহাড়ের উত্তরদিকে শিলং অঞ্চল।

(৩) **ঘূর্ণিবৃষ্টি** (Cyclonic rain)—**নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে** বহুদূর (১৫০০ কিমি পর্যন্ত) বিস্তৃত অংশে প্রায়ই ঘূর্ণবাত হয় এবং তাহা পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে পূর্ব-দিকে অগ্রসর হয়। ঘূর্ণবাত সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রচুর জলীয়

বাষ্প সংগ্রহ করে। এরূপ ঘূর্ণবাতের ফলে **বিস্তীর্ণ অংশে** (সাধারণতঃ ঘূর্ণবাতের প্রারম্ভে ও শেষে) বৃষ্টি হয়। মহাদেশসমূহের পশ্চিম উপকূলের কতক অংশে এই **বৃষ্টি প্রচুর** এবং এরূপ বৃষ্টি চলে **বহু দিন**। অন্যত্র ঘূর্ণিবৃষ্টির পরিমাণ কম।

অপরদিকে **উষ্ণমণ্ডলের** ঘূর্ণবাত অত্যন্ত প্রবল। তাহাদের প্রভাবে অনেক সময়েই **বজ্র, বিদ্যুৎ** ও **ঝড় সহ প্রবল বৃষ্টি** হয়। বস্তুতঃ এই অঞ্চলের অধিকাংশ বৃষ্টির সহিতই ঘূর্ণবাতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বনের অসংখ্য গাছের পাতার মধ্য দিয়া প্রচুর জলীয় বাষ্প বাহির হয়। তাই এখানকার বায়ুও শীতল। সেজন্য এখানে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু ঘনীভূত হইয়া প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

(৪) **শিলাবৃষ্টি**—নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের উষ্ণতর অংশে ও উপক্রান্তীয় (Sub-tropical) অঞ্চলে প্রবল ঝড়, টর্নেডো প্রভৃতি প্রবাহিত হওয়ার সময় বায়ুর উষ্ণতা ও চাপের পার্থক্যবশতঃ জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু অনবরত উঠা-নামা করে। এ সময় সেখানে হঠাৎ অধিক শীতল বায়ু প্রবাহিত হইলে অথবা অপর কোন কারণে বায়ুর উষ্ণতা হঠাৎ খুব কমিয়া গেলে শিলাবৃষ্টি (Hailstorm) বা করকাপাত হয়।

বৃষ্টিপাতের অঞ্চল—পৃথিবীর মধ্যে কেবল মরু ও মেরু অঞ্চল বৃষ্টিহীন। (মরু অঞ্চলে বায়ুর মধ্যস্থিত জলীয় বাষ্প শুষ্ক হইয়া যায়, আর মেরু অঞ্চলে তীব্র শীতের জন্য জলীয় বাষ্পদ্বারা তুষারপাত হয়।) তাহাছাড়া পৃথিবীর বাকী প্রায় সমুদয় স্থানেই বৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে **নিরক্ষীয় অঞ্চলের** বৃষ্টির পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক এবং তথায় বৃষ্টি হয় সমস্ত বৎসর। আর তাহা পরিচলন বৃষ্টি পৃথিবীর বিভিন্ন **পাহাড়, পর্বতের প্রতিবাত অংশে** প্রচুর শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি হয়। ভূপৃষ্ঠের বাকী বেশীর ভাগ জায়গার বৃষ্টি সম্পর্কে ঘূর্ণবাতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে এবিষয়েও কতক বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। যেমন, **ক্রান্তীয় অঞ্চলে** অধিক বৃষ্টি হয় মহাদেশসমূহের পূর্ব উপকূলে এবং গ্রীষ্মকালেই এরূপ বৃষ্টি বেশী। **নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে** বেশী বৃষ্টি হয় মহাদেশসমূহের পশ্চিম উপকূলে। শীতকালেই এরূপ বৃষ্টি বেশী। মহাদেশসমূহের মধ্যভাগে বৃষ্টি কম। তাহাছাড়া বিভিন্ন **বন** অঞ্চলে যথেষ্ট বৃষ্টি হয়।

বৃষ্টিপাতের **সময়, পরিমাণ** প্রভৃতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রভাব অধিক।

(১) **অক্ষাংশ**—নিম্ন অক্ষাংশে (উষ্ণমণ্ডলে) দ্রুত ও অধিক বাষ্পীভবনের ফলে বৃষ্টি বেশী। উচ্চ অক্ষাংশে (হিম মণ্ডলে) বাষ্পীভবন ও বৃষ্টি দুইই কম। মধ্য অক্ষাংশে (নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে) বাষ্পীভবন ও বৃষ্টি দুইই মধ্যম রকম।

(২) **মহাদেশসমূহের পূর্ব বা পশ্চিম অংশে অবস্থিতি**—নিম্ন অক্ষাংশে মহাদেশসমূহের পূর্ব অংশে (আয়ন বায়ু ও মৌসুমী বায়ু প্রভৃতির প্রভাবে) বৃষ্টি

বেশী। আর নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে মহাদেশসমূহের পশ্চিম ভাগে (পশ্চিমা বায়ু দ্বারা) বৃষ্টি বেশী।

(৩) **পর্বতের বিস্তার, উচ্চতা ও ভূমির ঢাল**—সমভূমি অপেক্ষা উচ্চভূমিতে বৃষ্টি অধিক। কারণ, বায়ু যত উপরে উঠে ইহা তত বেশী শীতল ও ঘনীভূত হয়। (অবশ্য পর্বতের খুব বেশী উঁচু অংশে তুষারপাত হয়।) উচ্চ ভূমির বা পর্বতের যে ঢালে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু বাধা পায় সে ঢালে বৃষ্টি অধিক, তাহার বিপরীত ঢালে বৃষ্টি কম। ঐ বিপরীত পার্শ্বে কখন কখন বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল সৃষ্টি হয়। বায়ুপ্রবাহের পথে বহুদূর বিস্তৃত আড়াআড়ি ভাবে অবস্থিত পাহাড়, পর্বতের গায়ে বৃষ্টি বেশী। যেমন, পশ্চিমঘাট পর্বতের দীর্ঘ পশ্চিম ঢালে বৃষ্টি হয় খুব বেশী। অপর পক্ষে কোন পর্বতের পাশ দিয়া বায়ু চলিয়া যাইতে পারিলে তথায় বৃষ্টি কম হয়। এজন্য আরাবল্লী পর্বতের দক্ষিণ ঢালে বৃষ্টি হয়, কিন্তু অন্য ঢালে বৃষ্টি হয় না।

(৪) **সমুদ্র হইতে দূরত্ব**—সমুদ্র হইতে দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর মধ্যস্থিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমিয়া যায়। ফলে দূরের দিকে বৃষ্টির পরিমাণও কম। যেমন, আরব সাগরের ঠিক পূর্বদিকে পশ্চিমঘাটের পশ্চিমদিকে বৃষ্টি বেশী, অথচ মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে বৃষ্টি কম।

(৫) **সমুদ্র স্রোত**—উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের উপর দিয়া প্রবাহিত বায়ু দ্বারা অধিক বৃষ্টি হয়। কারণ, এরূপ বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি হয় এবং ইহা যথেষ্ট জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে। শীতল স্রোতের উপর দিয়া প্রবাহিত বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি হইতে পারে না, উহা জলীয় বাষ্পও গ্রহণ করিতে পারে না। তাই উহার দ্বারা বৃষ্টিও হয় না। উষ্ণ আটলান্টিক স্রোতের উপর দিয়া প্রবাহিত বায়ু দ্বারা ইউরোপের পশ্চিম অংশে বৃষ্টি বেশী। অবশ্য এক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়েরও প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

(৬) **বায়ুপ্রবাহ**—বায়ু কোন্ দিক্ হইতে প্রবাহিত হয় এবং ইহা ভূপৃষ্ঠের কোন্ অংশের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহার উপর বৃষ্টিপাত নির্ভর করে। সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবাহিত আয়ন বায়ু দ্বারা মহাদেশসমূহের পূর্ব অংশে এবং পশ্চিমা বায়ু দ্বারা পশ্চিম অংশে বৃষ্টি হয়। আর পরিচলন বায়ুদ্বারা নিরক্ষীয় অঞ্চলে বৃষ্টি হয়।

(৭) **তাপবলয় ও চাপবলয়**—নিরক্ষীয় নিম্নচাপ-বলয়ে অধিক বৃষ্টি হয়, কিন্তু ক্রান্তীয় উচ্চ-চাপবলয়ে ও মেরু উচ্চচাপ বলয়ে বৃষ্টি কম। বিভিন্ন ঋতুতে বায়ুর তাপ-বলয়ের ও চাপবলয়ের স্থান পরিবর্তনের সহিত বায়ুবলয়েরও স্থান পরিবর্তন হয় এবং বৃষ্টি-পাতের কিছু পরিবর্তন ঘটে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ইহার প্রধান উদাহরণ।

বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ণয় ও তাহা প্রকাশের পদ্ধতি—(১) বৃষ্টিমাপক যন্ত্রের (Rain gauge) সাহায্যে বৃষ্টির পরিমাণ স্থির করা হয়। একটি খোলা জায়গাতে

ভূপৃষ্ঠ হইতে সামান্য উঁচুতে ইহা স্থাপন করা হয়। নির্দিষ্ট সময় পর পর মাপিয়া দেখা হয় ঐ যন্ত্রে কি পরিমাণ বৃষ্টির জল সঞ্চিত হইয়াছে। [ব্যবহারিক ভূগোল দ্রষ্টব্য।]

নিম্নলিখিত নানাভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রকাশ করা হয়।

(১) **অঙ্ক দ্বারা প্রকাশ**—বায়ুর উষ্ণতা বা চাপের মত বৃষ্টিপাতের পরিমাণও সাধারণ অঙ্ক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কখনও বা বৃষ্টিপাতের সঠিক পরিমাণ প্রকাশ না করিয়া বিভিন্ন সময়ের (মাস, ঋতু, বৎসর প্রভৃতির) গড় বৃষ্টিপাতের অঙ্ক দ্বারা (Mean of rainfall) ঐ সময়ের বৃষ্টির পরিমাণ প্রকাশ করা হয়।

(২) **নানাপ্রকার রেখচিত্র** (Graph), **স্তম্ভ** (Rainfall column বা Columnar diagram) অথবা বৃষ্টিপাত নির্দেশক **মানচিত্রের** (Rainfall map) সাহায্যেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বুঝান যায়।

(৩) **স্বাভাবিক অবস্থা হইতে পার্থক্য নির্দেশ**—আবার কখন কখন স্কেল অনুযায়ী একটি খাড়া স্তম্ভ (Column) আঁকা হয়। তাহার পাশে পাশে বিভিন্ন বৎসরগুলি পর পর লিখিয়া দেওয়া হয়। তারপর স্তম্ভের মধ্যে একটি অনুপাত অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিন্দু দ্বারা প্রত্যেক বৎসরের বৃষ্টির পরিমাণ প্রকাশ করা হয়। এইরূপ চিত্র দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায়, কোন স্থানে কোন্ কোন্ বৎসরের বৃষ্টির পরিমাণ স্বাভাবিক (Normal years), কোন্ বৎসরের বৃষ্টির পরিমাণ অত্যধিক ও তজ্জন্য বন্যা (Flood years) হওয়া স্বাভাবিক, আর কোন্ বৎসরের বৃষ্টির পরিমাণ একান্ত কম এবং কোথায় কোন্ বৎসর দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা আছে (Famine years)।

প্রত্যেক স্থানের স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের (Normal rainfall) তুলনায় কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে বৃষ্টির পরিমাণ কত বেশী বা কম (Variation from norm) তাহা (স্বাভাবিক অবস্থায় বৃষ্টিপাতের অঙ্কের তুলনায় + বা – চিহ্ন এবং ব্যতিক্রমের পরিমাণ দ্বারা) প্রকাশ করিয়াও তথাকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বুঝান যায়।

(৪) **বৃষ্টিপাত অনুযায়ী দিবস নির্ণয়**—কোন স্থানে বিভিন্ন মাসে এবং বৎসরে মোট কতদিন বৃষ্টি হয় তাহার হিসাব অনুসারেও তথাকার বৃষ্টিপাতের অবস্থা সাধারণভাবে প্রকাশ করা যায়। যেমন, এশিয়ার কলম্বো ও ম্যানিলাতে১৫০ দিনের বেশী বৃষ্টি হয়। করাচিতে বৃষ্টি হয় বৎসরে ১০।১১ দিন, এডেনে বৃষ্টি হয় মাত্র ৪ দিন। আবার বৃষ্টিপাতের দিনের সংখ্যার সহিত পরিমাণ তুলনা করিলে বৃষ্টিপাতের অবস্থা বুঝা যায়। দিনের সংখ্যা বেশী অথচ পরিমাণ কম হইলে বুঝা যায় গুঁড়ি গুঁড়ি বা অল্প সময় বৃষ্টি হয়। আর দিনের সংখ্যা কম ও পরিমাণ বেশী হইলে বুঝা যায় অধিক সময় ও জোরে বৃষ্টি হইয়াছে।

(৫) **ঘন্টা হিসাবে বৃষ্টির পরিমাণ প্রকাশ**—কোন স্থানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কি ভাবে বা কি পরিমাণ বৃষ্টি হয় তাহা বিভিন্ন ঘণ্টা হিসাবেও দেখান যায়।

সমবৃষ্টি বা সমবর্ষণ রেখা—মানচিত্রে সমবৃষ্টি বা সমবর্ষণ রেখা (Isohyets) আঁকিয়াও বিভিন্ন স্থানের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বুঝান যায়। যে-কোনও দেশ বা মহাদেশের সীমারেখা মানচিত্রে নির্দিষ্ট স্থানে যে-কোন নির্দিষ্ট সময়ের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ লিখিয়া যে সকল স্থানে ঐ সময়ের বৃষ্টির পরিমাণ সমান, তাহাদিগকে একটি স্বাভাবিক রেখা দ্বারা যোগ করা হয়। তাহা হইলেই মানচিত্রে সমবর্ষণ বা সমবৃষ্টি রেখা আঁকা হয়। এরূপ মানচিত্রে এক একটি নির্দিষ্ট মাপের বৃষ্টির পরিমাণ বা অঞ্চল বুঝাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ছায়াপাত (Shade) অথবা রঙও ব্যবহার করা হয়।

বৃষ্টিপাত—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের কয়েকটি **প্রধান** স্থানের জানুয়ারী মাসের ও জুলাই মাসের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (অঙ্ক) ও বৎসরে কতদিন বৃষ্টি হয় তাহার সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল।

স্থানের নাম	বৃষ্টি (সেমি) জানুয়ারী	বৃষ্টি (সেমি) জুলাই	কতদিন বৃষ্টি হয়	স্থানের নাম	বৃষ্টি (সেমি) জানুয়ারী	বৃষ্টি (সে মি) জুলাই	কতদিন বৃষ্টি হয়
এশিয়া মহাদেশ							
এডেন	·৮	—	৪	আঙ্কারা	৩	৬	৬৮
বাগদাদ	৩	—	২৪	ব্যাঙ্কক	—	৩১	৮৮
বোম্বাই	·২	৬০	৭৩	কলিকাতা	১	৩২	৮৪
চুংকিং	১·৭	১৩·৩	৯৯	কলম্বো	৮·৩	১১	১৫৩
জাকার্তা	৪১	৭	১২৫	হংকং	৩	৩৫	১১০
জেরুসালেম	৩	—	—	করাচি	১·২	৩·৭	১১
লাহোর	২·৩	১৩	২৯	মাদ্রাজ	২·৮	৯·৫	৫৮
ম্যানিলা	২	৪৩	১৫৯	নূতন দিল্লী	২·৫	১৯	৩৪
পিকিং (বিজিং)	·২	১৬	৬৭	রেঙ্গুন	·৫	৫৪	১২৫
তেহ্‌রান	৪	·৫	৩৩	টোকিও	৫·৫	১৩	১০৭
উত্তর আমেরিকা							
এডমণ্টন	২·৩	৮·৭	১৩৩	মন্ট্রিল	৯	৯·৫	১৫৭
টরণ্টো	৭	৭	১৪৫	ভ্যাঙ্কুবার	২১·৫	৩	১৭২
উইনিপেগ	২·৩	৭·৮	১১৮	বোস্টন	৯·২	৮·৭	১২৫
শিকাগো	৫·৩	৮·৫	১২৪	মিয়ামি	২	২৩	১৩৫
নিউ অর্লিন্স	১১	১৬	১২২	নিউ ইয়র্ক	৫	২	১২৫
সল্ট লেক সিটি	২	২	—	সান ফ্রান্সিস্কো	৮	—	৬৭
ওয়াশিংটন	৮	৯·৮	১২৪	গুয়াটেমালা	·৩	৬	—
হাভানা	২	৯	৮৯				

স্থানের নাম	বৃষ্টি (সেমি) জানুয়ারী	বৃষ্টি (সেমি) জুলাই	কতদিন বৃষ্টি হয়	স্থানের নাম	বৃষ্টি (সেমি) জানুয়ারী	বৃষ্টি (সেমি) জুলাই	কতদিন বৃষ্টি হয়
সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র							
লেনিনগ্রাড	২·৫	৬	—	মস্কো	২·৮	৭	—
আর্কেঞ্জেল	২·৪	৬	—	ওডেসা	২·৩	৫·৩	৬৬
ভ্লাডিভস্টক	২·৫	৫·৫	৬৯	ইয়াকুটস্ক	২·৩	৪·৩	—
ইউরোপ							
বেওগ্র্যাড	৩	৬·৭	৯১	বার্লিন	৪·৩	৭·৫	১০৮
হেলসিঙ্কি	৪·৫	৫·৫	—	কোপেনহাগেন	৩·৭	৬	—
মুনিখ	৯	১৯	১৩৭	অসলো	·৩	৮·৫	—
প্যারিস	৩·৭	৫·৫	—	রোম	৪·৪	১	৭৬
ভিয়েনা	৩·৭	৭·৮	১০০	ওয়ারশ	৩	৭·৫	১০৫
দক্ষিণ আমেরিকা							
বোগোটা	৯·২	৬·৫	১৬৭	বুয়েনস আইরেস	৭·৮	৫·৫	৯৩
লাপাজ	৪	১	—	মানাওস	২৩	৩·৫	১৬১
মন্টিভিডিও	৩·৬	৯	৭১	কুইটো	৮	২·৮	১৮৬
রিওডি জেনিরো	১৭	৫	১৩০	সান্টিয়াগো	২	৭	৩১
সাও পাওলো	২৭	৩	১৪৪				
আফ্রিকা							
আক্রা	৬	৫	৫৪	আদ্দিস আবাবা	১·৫	২৭·৫	১৩৮
য়্যালজিয়ার্স	১০	—	৭৬	কেপ টাউন	—	১৫	৬৯
ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা	৮	—	৬১	ডাকার	—	১৪	৩৮
এন্টেবে	৬·৪	৭·৫	১৭০	জোহান্সবার্গ	২৭	—	৭২
খার্টুম	—	২	১৬	লিওপোল্ডভিল	৪	—	—
লুয়াণ্ডা	—	১	—	নাইরোবি	৪·৮	২·৩	—
টিউনিস	৪	—	১০২				
ওশিয়ানিয়া							
ডারউইন	৪০	—	৯৫	মেলবোর্ন	৪·৮	৪·৫	১৫৬
পার্থ	—	২০	১২৮	সিডনি	৯·২	১২	১৫২
অকল্যাণ্ড	৪·৮	৪·৫	১৯৩	ওয়েলিংটন	৮·২	১৪	১৬৫

বৃষ্টিপাত সম্পর্কে উপরিলিখিত হিসাব অনুসারে অঙ্কিত ১১৮ পৃষ্ঠায় **জানুয়ারী মাসের** সমবৃষ্টি রেখার মানচিত্র দেখিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে ঐ সময় দক্ষিণ

গোলার্ধে দক্ষিণ আমেরিকার বেশীর ভাগ জায়গাতে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়াতে এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব উপকূলে প্রচুর
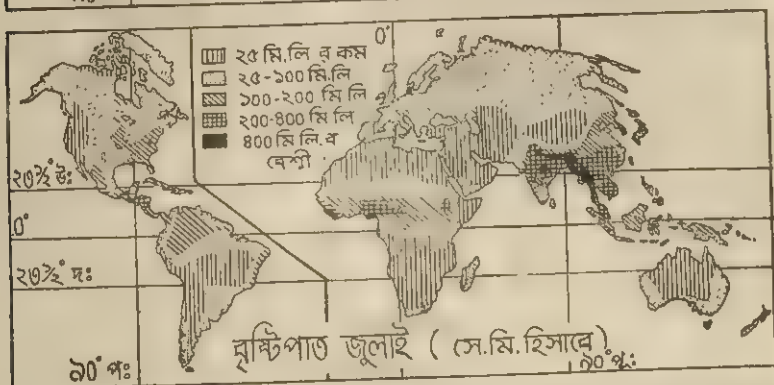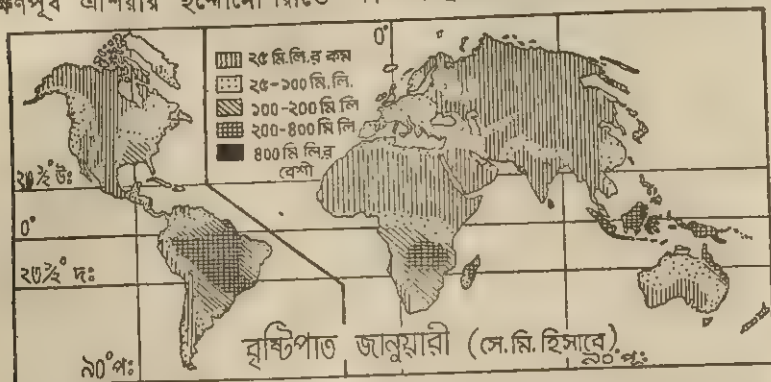
(২০—৪০ সেমির বা ২০০—৪০০ মিমির বেশী) বৃষ্টি হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই সময়ই এসকল স্থানের পক্ষে **গ্রীষ্মকাল**। তাই তখন **দক্ষিণ গোলার্ধের** স্থলভাগে নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয় এবং দক্ষিণপূর্বদিক্ হইতে প্রবাহিত জলীয় বাষ্পপূর্ণ আয়ন বায়ু দ্বারা এ সকল স্থানে অধিক বৃষ্টি হয়। এই সময় **উত্তর গোলার্ধে শীতকাল** এবং এখানকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বায়ুর আর্দ্রতা কম, বৃষ্টির পরিমাণও কম। (অনেক স্থানে ১০ সেমির বা ১০০ মিমির কম এবং তাহাদের তুলনায় অনেক বেশী জায়গার অবস্থা প্রায় শুষ্ক।) তবে তখন উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের পশ্চিম অংশে পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে কিছু বেশী বৃষ্টি হয়। অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমদিকের অর্ধেক অংশ এবং দক্ষিণ আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিমদিকের সামান্য স্থানের অবস্থা তখন শুষ্ক।

এই পৃষ্ঠার **জুলাই মাসের** সমবৃষ্টি রেখার মানচিত্রে দেখা যাইতেছে যে এই সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৃষ্টি সবচেয়ে বেশী। আফ্রিকার মধ্যভাগ সহ পশ্চিমদিকের গিনি উপকূলে তখন বৃষ্টি সবচেয়ে বেশী (২০—৪০ সেমির বা ২০০—৪০০

মিমির অধিক)। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর অংশে এবং উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশেও এসময় বৃষ্টি বেশী (১০—২০ সেমি বা ১০০—২০০ মিমির বেশী)। এই সমুদয় স্থানেই তখন **গ্রীষ্মকাল** এবং এখানকার স্থলভাগে নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। ফলে, বিভিন্ন সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবাহিত আয়ন বায়ুর ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে **মৌসুমী বায়ুর** প্রভাবে এরূপ বৃষ্টি হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের দক্ষিণ অংশে ও অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশে তখন পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি হয়। আর তখন দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্বদিকের মাদাগাস্কার দ্বীপে দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুর দ্বারা কিছু (২·৫—১০ সেমি বা ২৫ –১০০ মিমি) বৃষ্টি হয়। এই সময়ও উত্তর গোলার্ধের মধ্য-এশিয়া হইতে উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বৃষ্টি প্রায় হয় না।

অনুশীলনী

১। বায়ু কোন্ কোন্ উপাদান দ্বারা গঠিত? ইহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ উপাদানের পরিমাণ অধিক? ২। কোন স্থানের আবহাওয়া দ্বারা কি বুঝ? জলবায়ুদ্বারা কি বুঝ? জলবায়ু কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল? ৩। কোন স্থানের উষ্ণতা কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল? এই বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৪। বায়ুর চাপ বলিলে কি বুঝ? কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর বায়ুর চাপ নির্ভরশীল? বায়ুর প্রবাহের সহিত চাপের সম্পর্ক কি? ৫। ভূপৃষ্ঠে বায়ুর কয়টি নির্দিষ্ট চাপবলয় আছে? একটি চিত্র আঁকিয়া ঐ বলয়গুলির অবস্থিতি দেখাও। তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৬। সমুদ্রসমতল হইতে উপরদিকে বায়ুর চাপের পরিবর্তন হয় কেন? ৭। নিয়ত বায়ু কাহাকে বলে? ভূপৃষ্ঠে কয়টি নিয়ত বায়ু প্রবাহিত হয়? ইহাদের প্রত্যেকের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৮। স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ু কাহাকে বলে? এগুলি নিয়ত বায়ু বলিয়া গণ্য নয় কেন? ৯। ঘূর্ণবাত কাহাকে বলে? উহা কি ভাবে সৃষ্টি হয়? উষ্ণমণ্ডলের কয়েকটি প্রধান ঘূর্ণবাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। নাতিশীতোষ্ণ ও উষ্ণ মণ্ডলের ঘূর্ণবাতের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে পার্থক্য অধিক? ১০। সমোষ্ণরেখা, সমচাপ রেখা ও সমবৃষ্টি রেখা কিভাবে আঁকা হয়? এরূপ যে-কোন এক প্রকার রেখার উপযোগিতা আলোচনা কর। ১১। বৃষ্টিপাত কয় ভাগে বিভক্ত? পরিচলন ও শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টির কোন্টি পৃথিবীর কোন্ অংশে অধিক কার্যকর? নিম্নলিখগুলির সংক্ষিপ্ত টিকা লিখ :—গর্জনশীল চল্লিশা, অশ্ব অক্ষাংশ, প্রতীপ ঘূর্ণবাত, নিরক্ষীয় শান্তবলয়।

পঞ্চম অধ্যায়

বারিমণ্ডল

বারিমণ্ডলের সৃষ্টি—আমাদের পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় উত্তপ্ত গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল। ক্রমশঃ শীতল হইয়া বর্তমান কঠিন অবস্থায় পৌছিয়াছে। এরূপ পরিবর্তনের সময় ইহার উপরিভাগ বা ভূপৃষ্ঠ অসমানভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছে। এভাবে ভূত্বকে যে নিম্ন অংশসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে তথায় জল সঞ্চিত হইয়া **বারিমণ্ডলের** সৃষ্টি হইয়াছে। এসকল অংশেই দেখিতে পাইতেছি বিভিন্ন সাগর, মহাসাগর।

ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৭১% বারিমণ্ডলের অন্তর্গত এবং তাহার মোট আয়তন প্রায় ৩৬ কোটি বর্গ কিমি। এই মণ্ডলের অন্তর্গত প্রধান মহাসাগরসমূহের আয়তন নিম্নরূপ।

মহাসাগর	আয়তন (কোটি বর্গকিমি)	গভীরতার গড় (কিমি)	মোট বারিমণ্ডলের কত শতাংশ (%)
প্রশান্ত	১৬·৪	৪	৪৫
আটলান্টিক	৮·২	৩·২	২১
ভারত	৭·৩	৩·৬	১৮

মহাসাগরসমূহের তলদেশের গভীরতা ও ভূপ্রকৃতি—আধুনিক **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে** শব্দতরঙ্গের (Sound wave) সাহায্যে সাগর, মহাসাগরের তলদেশের গভীরতা স্থির করা হয়। এই পদ্ধতিতে বারিমণ্ডলের গভীরতা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণ জানা গিয়াছে।

জলের গভীরতা (মি)	আয়তন (লক্ষ বর্গ কিমি)	মোট বারিমণ্ডলের কত শতাংশ (%)
০-২০০	২৬০	৭
২০১-৯০০	১৮০	৫
৯০১-১৮০০	১৩০	৩·৫
১৮০১-৩৬০০	৭০০	১৯
৩৬০১-৫৪০০	২০০০	৫৮
৫৪০০-এর অধিক	২৬০	৭

বিভিন্ন সাগর, মহাসাগরের তলদেশ গভীরতার পার্থক্য অনুসারে নিম্নলিখিত চারিভাগে বিভক্ত :—

(ক) **মহীসোপান**—মহাদেশসমূহের চারিদিকের কতক অংশ সমুদ্র (জল) দ্বারা আবৃত। এখানকার জলরাশির গভীরতা খুব সামান্য। সমুদ্রের এরূপ অগভীর অঞ্চল

(Shallow platform) খুব ধীরে (১° অপেক্ষা কম কৌণিকভাবে) সমুদ্রের দিকে ঢালু। মহাসাগর পর্যঙ্কের (Ocean basin) এরূপ অগভীর (মাত্র ১০০ ফ্যাদম্ বা প্রায় ২০০ মি গভীর) অংশকে **মহীসোপান** (Continental shelf) বলে। এই মহীসোপানই মহাদেশসমূহের শেষ প্রান্ত বা সীমা বলিয়া গণ্য। এখানকার আয়তন সমুদ্রের তলদেশের মোট আয়তনের ৫%। ইউরেশিয়ার উত্তরদিকে বিস্তীর্ণ সমভূমি থাকার ফলে উত্তর মহাসাগরের মহীসোপান প্রায় ১,২৮০ কি. মি বিস্তীর্ণ। তবে **পৃথিবীর বৃহত্তম মহীসোপান** ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমে। উত্তর সাগর ও ইহার আশপাশের কতক স্থান ইহার অন্তর্গত। এই অঞ্চলের সমুদ্রতল ২০০ মিঃ উঁচু হইলে ইউরোপের স্থলভাগ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ছাড়াইয়া আট্লাণ্টিকের কতক অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। অগভীর মহীসোপান সামুদ্রিক মাছ ধরিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। আর বিস্তীর্ণ মহীসোপানে সঞ্চিত প্রস্তর, কাঁকর, বালুকা, কাদা প্রভৃতি স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়। ইহাদের দ্বারা কালক্রমে পাললিক শিলা সৃষ্টি হয়।

(খ) **মহীঢাল**—সাগরগর্ভে মহীসোপানের পরের অংশ অনেক বেশী ঢালু (Steeper slope)। ইহা ২-৫° কৌণিক ভাবে, কখনও বা হঠাৎ খুব খাড়া হইয়া
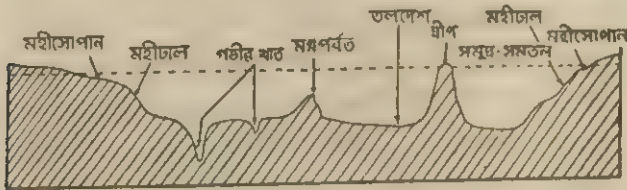
সাগর, মহাসাগরের মধ্যভাগের দিকে নামিয়া যায়। সাগরাদির এরূপ অধিক ঢালু অংশকে **মহীঢাল** (Continental slope) বলে। এখানকার আয়তন সমুদ্রের তলদেশের মোট আয়তনের ৩-৫% (মহীসোপানের আয়তনের চেয়ে কম)। এরূপ অংশে জলজন্তুর দেহাবশেষ ও অন্যান্য কতক জিনিস সঞ্চিত হয়।

(গ) **মহাসাগরের তলদেশের প্রধান অংশ**—মহীঢালের পরে মহাসাগরসমূহের তলদেশের মোট আয়তনের ৬০-৭০% অংশ ১৮০০ মিটারের অধিক গভীর। তবে এখানকার কোথাও আছে জলমগ্ন **মালভূমি**, কোথাও দীর্ঘ **অনুন্নত পর্বতশ্রেণী**। তন্মধ্যে মধ্য-আট্লাণ্টিকের উচ্চ অঞ্চল (Mid-Atlantic ridge) প্রসিদ্ধ। কোথাও বা জলমগ্ন **আগ্নেয়গিরির** শিখরদেশ মহাদেশীয় দ্বীপ রূপে জলরাশির উপরিভাগে ভাসিয়া আছে। তবে সমুদ্রের তলদেশের গভীরতার তুলনায় এরকম অংশের উচ্চতা অতি সামান্য। সেজন্য সমুদ্রের তলদেশকে **গভীর সমুদ্রের সমপ্রায়ভূমি** (Abyssal plain) বলে।

(ঘ) **সমুদ্রের তলদেশের গভীর খাত**—কোন কোন মহাসাগরের তলদেশে অত্যন্ত গভীর খাত (Troughs or trenches) আছে। ইহাদের অধিকাংশ এশিয়া মহাদেশের কতক উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের অনতিদূরে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। যেমন—মিণ্ডানাও, মারিয়ানা প্রভৃতি খাত।

মহাসাগরসমূহের তলদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

প্রশান্ত মহাসাগর

মহীসোপান ও মহীঢাল—প্রশান্ত মহাসাগরের মহীসোপান সঙ্কীর্ণ। এই মহাসাগরের পশ্চিম অংশের ওখটস্ক সাগর, পীত সাগর, পূর্ব চীন সাগর প্রভৃতি ও উত্তরদিকের বেরিং সাগর এই মহীসোপানের অন্তর্গত। ইহাদের পর হইতেই এই মহাসাগরের মহীঢাল আরম্ভ হইয়াছে।

তলদেশের গভীর অংশ ও মগ্ন মালভূমি—এই মহাসাগরের তলদেশের প্রায় ৭৫% অংশ ৩৬০০ মি র অধিক গভীর এবং ইহার তলদেশ অনেক পরিমাণে সমতল। এখানে সামান্য কয়েকটি উন্নত **মালভূমি** (Submarine plateau) আছে। এরূপ মগ্ন মালভূমির মধ্যে **অ্যাল্‌ব্যাট্রস্ প্লেটো** (Albatross plateau) প্রধান। ইহা ক্যালিফোর্নিয়া হইতে ইকোয়েডর পর্যন্ত বিস্তৃত। চিলির পশ্চিমদিকে আছে **সাউথ ইস্টার্ন প্যাসিফিক প্লেটো**, আর প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অংশ হইতে অ্যান্টার্কটিকা পর্যন্ত **প্যাসিফিক-অ্যান্টার্কটিক-রিজ** বিস্তৃত। এগুলি এই মহাসাগরের পূর্ব অংশে। এই মহাসাগরের পশ্চিম অংশেও (অস্ট্রেলিয়ার ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের পূর্বদিকে) কতক উচ্চ অংশ আছে। ইহা ভিন্ন এই মহাসাগরের নানাস্থানে আছে অসংখ্য দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ। ইহাদের মধ্যে কতক আগ্নেয় দ্বীপ ও কতক প্রবালদ্বীপ। আগ্নেয় দ্বীপগুলির মধ্যে **হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ** সর্বপ্রধান।

গভীর খাত—প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে গভীর খাত অনেক। ইহাদের বেশীর ভাগ এশিয়া ও আমেরিকার উচ্চ পর্বতসমূহের অনতিদূরে, স্থানে স্থানে ইহাদের প্রায় সমান্তরাল। নিউ গিনির উত্তরদিকের **মারিয়ানা** পৃথিবীর গভীরতম **খাত** (Trench)। ইহা সমুদ্রতল হইতে ৫,৯৪০ ফ্যাদম বা ১০,৮৭০ মিঃ গভীর। এই মহাসাগরের **ফিলিপাইন** বা **মিণ্ডানাও খাত** (৫,৯০০ ফ্যাদম), আরও উত্তরে **জাপান খাত, কুরিল খাত, অ্যালুয়েশিয়ান খাত** প্রভৃতি এশিয়ার নিকটবর্তী অংশে অবস্থিত। আর নিউ জীল্যাণ্ডের উত্তরপূর্বদিকে আছে **টোঙ্গা** ও **কার্মাডেক খাত** (৫,১৫০ ফ্যাদম)। এই মহাসাগরের পশ্চিম অংশের তুলনায় পূর্ব অংশে (আমেরিকার দিকে) খাত কম; ইহাদের গভীরতাও কম। এখানকার একমাত্র

উল্লেখযোগ্য গভীর খাত **আটাকামা** (দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমদিকে—গভীরতা ৪,১৭৫ ফ্যাদম)।

আট্‌লান্টিক মহাসাগর

উত্তর আট্‌লান্টিকের মহীসোপান—ইহা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিস্তৃত মহীসোপান। ফলে এখানকার সাগর ও উপসাগর অগভীর। এই মহাসাগরের পূর্ব অংশে (এই মহীসোপানের অন্তর্গত) **উত্তর সাগর ও বাল্টিক সাগরের** গভীরতা প্রায় ১০০ ফ্যাদম বা ১৮৩ মিঃ। এই দুই সাগরের সংযোগস্থলের (ডেনমার্ক ও সুইডেনের মাঝখানের) জলরাশি মাত্র ২০ মিঃ গভীর। পূর্বদিকের **ভূমধ্যসাগর** যথেষ্ট গভীর (গভীরতম অংশ প্রায় ৪,৫৭৫ মিঃ)। পশ্চিমদিকে **বেফিন উপসাগর ও হাড্‌সন উপসাগর** ২০০ মিঃর কম গভীর। এই দিকের **মেক্সিকো উপসাগর** প্রায় ভূমধ্যসাগরের মতই গভীর (গভীরতম অংশ ৩,৮১২ মিঃ)। ইহার দক্ষিণদিকে **ক্যারিবিয়ান সাগরের** গভীরতা প্রায় দ্বিগুণ (৭,১৬৮ মিঃ)।

দক্ষিণ আট্‌লান্টিকের মহাসোপান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। তাই এই মহাসাগরের উপকূল অংশে সাগর, উপসাগর খুব কম।

এই মহাসাগরের পূর্ব অংশের ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিমদিকের নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড দ্বীপ প্রকৃতপক্ষে এই দুই অংশের মহাসোপানের উচ্চতম অংশ। এই মহাসাগরে দ্বীপের সংখ্যা কম। তন্মধ্যে গ্রীনল্যাণ্ড, আইস্‌ল্যাণ্ড ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ উল্লেখযোগ্য। তারপর হইতেই এই মহাসাগরের **মহীঢাল** আরম্ভ হইয়াছে।

তলদেশের গভীর অংশ ও মগ্ন মালভূমি—উত্তর আটলান্টিকের উত্তর অংশ অগভীর। গ্রীনল্যাণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিমদিকের কতক অংশ ব্যতীত আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যবর্তী অংশের জলের গভীরতা ১০০০ মিঃর কম। এখানকার গভীরতম অংশসমূহ ৩,৬০০ মিঃর কম গভীর। এখান হইতে দক্ষিণে প্রায় সমুদয় অংশ ৩,৬০০ মিঃর বেশী গভীর। এই মহাসাগরের মধ্য অংশ দিয়া S-আকৃতিতে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত **মধ্য আটলান্টিকের উচ্চ অঞ্চল** (Mid-Atlantic ridge) এখানকার তলদেশের সর্বপ্রধান বৈচিত্র্য। এই উচ্চভূমির উত্তর অংশকে **ডল্‌ফিন্ উন্নত অঞ্চল** (Dolphin ridge) ও দক্ষিণ অংশকে **চ্যালেঞ্জার** (Challenger) **উন্নত অঞ্চল** বলে। সমুদ্রতল হইতে এই অংশের গভীরতা প্রায় ৩,০০০ মিঃ। ইহার উত্তর অংশের নাম **টেলিগ্রাফ** (Telegraph) **মালভূমি**। ইহার পূর্বদিকের অংশের নাম **উইভিল-টম্‌সন** (Wyville Tomson) **ও ফারো-আইস্‌ল্যাণ্ড উন্নত অঞ্চল**। আইস্‌ল্যাণ্ড ও গ্রীনল্যাণ্ডের মধ্য অংশের নাম **গ্রীনল্যাণ্ড উন্নত অঞ্চল** এবং এই দ্বীপের পশ্চিম-

দিকের অংশের নাম **বেফিন-গ্রীন্‌ল্যাণ্ড উন্নত অঞ্চল**। দক্ষিণ আট্‌লান্টিক মহাসাগরের চ্যালেঞ্জার উন্নত অঞ্চলের দক্ষিণ অংশের ত্রিস্তান-দা-কুন্‌হা দ্বীপের নিকট

মহাসাগরসমূহের তলদেশের অবস্থা

হইতে **ওয়াল্‌ফিস্ বা ওয়াল্‌ভিস্ (Walvis) উন্নত উঞ্চল** উত্তর-পূর্বদিকে এবং **রিও গ্যাণ্ডে উন্নত অঞ্চল** পশ্চিমদিকে বিস্তৃত হইয়াছে।

এই মহাসাগরের মধ্য অংশে কতক ছোট মহাদেশীয় দ্বীপ আছে। ইহাদের মধ্যে য়্যাজোর্স, সেণ্ট হেলেনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমদিকে **বার্মুডা** একটি **প্রবাল দ্বীপ** (Coral island), আর পূর্বদিকের **মেডিরা** একটি **আগ্নেয় দ্বীপ**।

গভীর খাত—আটলান্টিক মহাসাগরের গভীর খাতের সংখ্যা খুব কম। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ঠিক উত্তরদিকে পোর্টোরিকো দ্বীপের নিকট অবস্থিত **পোর্টোরিকো খাত** (Puerto Rico deep) এই মহাসাগরের গভীরতম খাত (গভীরতা ৮,৫০০ মিঃ)। দক্ষিণ আমেরিকার হর্ন অন্তরীপের পূর্বদিকের **দক্ষিণ স্যাণ্ডউইচ** (South Sandwitch) **খাত** এই মহাসাগরের দ্বিতীয় গভীরতম খাত (৮,২৩৫ মিঃ)। মধ্য-আট্‌লান্টিক উন্নত অঞ্চলে (নিরক্ষরেখা ও ২০° পঃ দ্রাঃ রেখার সংযোগস্থলের নিকট) অবস্থিত **রোমান্‌সে খাত** (Romanche deep or gap) এই মহাসাগরের তৃতীয় গভীর খাত (৭,৩২০ মিঃ)।

ভারত মহাসাগর

মহীসোপান ও মহীঢাল—ভারত মহাসাগরের মহীসোপানের আয়তন অত্যন্ত কম। এই মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিমদিকে মহীসোপানের অন্তর্গত **পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগর** অতিশয় অগভীর। ইহারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্থলভাগদ্বারা বেষ্টিত এবং ইহাদের দুইটিরই দক্ষিণ অংশ—লোহিত সাগরের দক্ষিণে

বাবেলমাণ্ডেল প্রণালী এবং পারস্য উপসাগরের দক্ষিণ অংশে হরমুজ প্রণালী অতি সংকীর্ণ। ইহাদের পর হইতে **মহীঢাল** আরম্ভ হইয়াছে।

তলদেশের গভীর অংশ ও মগ্ন মালভূমি—এই মহাসাগরের প্রায় ৬০% অংশ ৩,৬০০ মিঃর বেশী গভীর। এখানকার পশ্চিম অংশে **মাদাগাস্কার** দ্বীপ এবং উত্তর অংশের **সিংহল দ্বীপ** আফ্রিকা ও এশিয়ার বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র। পূর্বদিকের আন্দামান, নিকোবর প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ মহাদেশীয় দ্বীপ। ইহারা নিমজ্জিত পর্বতশ্রেণীর শৃঙ্গমাত্র। এই মহাসাগরে কতক প্রবাল দ্বীপ আছে। ইহাদের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমদিকের **লাক্ষা দ্বীপ, মাল দ্বীপ** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এই মহাসাগরের তলদেশের বৃহত্তম উন্নত অংশ কুমারিকা অন্তরীপের নিকট হইতে দক্ষিণে য়্যাণ্টার্কটিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণ অংশে (৩০-৫০° দঃ অঃ) ইহার বিস্তার সবচেয়ে বেশী; নাম **আম্‌স্টার্‌ডম-সেণ্ট পল উন্নত অঞ্চল**। তাহার উত্তরদিকে পর পর **সেণ্ট পল-চ্যাগস্** ও **লাক্ষা দ্বীপ-চ্যাগস্ উন্নত অঞ্চল**। আফ্রিকার মাদাগাস্কারের দক্ষিণদিকে আছে **মাদাগাস্কার উন্নত অঞ্চল** এবং **প্রিন্স এডওয়ার্ড ক্রোজের উন্নত অঞ্চল**। মাদাগাস্কারের উত্তর-পূর্বদিকের **সেচিলিস উন্নত অঞ্চল** স্থানে স্থানে সমুদ্র সমতল হইতে ১০০০ মিঃর কম গভীর।

গভীর খাত—জাভা দ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত **শুণ্ডা খাত** (৭,৩২০ মিঃ) এই মহাসাগরের একমাত্র গভীর খাত।

প্রশান্ত, আটলাণ্টিক ও ভারত মহাসাগরের তলদেশের তুলনা—

	প্রশান্ত মহাসাগর	আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর	ভারত মহাসাগর
মহীসোপান—	কম বিস্তৃত।	অধিক বিস্তৃত; উত্তর অংশে বিস্তার সর্বাপেক্ষা অধিক।	কম বিস্তৃত।
তলদেশের গভীরতা—	গভীরতম মহাসাগর; গভীরতা গড়ে ৪ কি. মি.; ৭৫% অংশ ৩,৬০০মিঃর অধিক গভীর।	গভীরতা তৃতীয়; গভীরতা গড়ে ৩ কি মি; উত্তর ভিন্ন বাকী প্রায় সমুদয় অংশ ৩,৬০০ মি. গভীর।	গভীরতা দ্বিতীয়; গভীরতা গড়ে ৩½ কি. মি.; ৬০% অংশ ৩,৬০০ মি. গভীর।

	প্রশান্ত মহাসাগর	আটলান্টিক মহাসাগর	ভারত মহাসাগর
মগ্ন মালভূমি—	আয়তন কম; য়্যাল্‌বেট্রস প্লেটো প্রধান।	আয়তন বেশী; উত্তরে অধিক বিস্তৃত। মধ্য-আটলান্টিক রিজ প্রধান।	আয়তন কম; আমস্টার্ডম-সেন্ট পল রিজ প্রধান।
গভীর খাত—	সংখ্যা অধিক; মারিয়ানা খাত গভীরতম। অন্যান্য—মিণ্ডানাও বা ফিলিপাইন খাত, জাপান খাত, কুরিল খাত, এ্যালুয়েশিয়ান খাত, টোঙ্গা খাত, কার্মাডেক খাত, আটাকামা খাত।	সংখ্যা কম; পোর্টোরিকো খাত গভীরতম। অন্যান্য—দক্ষিণ স্যাণ্ডউইচ খাত, রোমান্‌সে খাত।	এক মাত্র উল্লেখযোগ্য খাত —শুণ্ডা খাত।

উত্তর মহাসাগর—এই মহাসাগর প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্থলদ্বারা বেষ্টিত এবং প্রায় গোলাকার। ইহার গভীরতা গড়ে প্রায় ৩,৭৫০ মিঃ, গভীরতম অংশ প্রায় ৫,৫০০ মিঃ। এখানকার জলরাশি প্রায় স্থায়ীভাবে তুষার দ্বারা আবৃত। এখানে নোভাজেম্‌লা, স্পিটস্ বার্জেন প্রভৃতি দ্বীপ আছে।

দক্ষিণ মহাসাগর—প্রশান্ত, আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগর দক্ষিণদিকে পরস্পরের সহিত মিলিয়া কুমেরুকে ঘিরিয়া আছে। ইহা পৃথক্ মহাসাগর নহে; তবে ৪০-৫০° দঃ অঃ-এর দক্ষিণ অংশকে দক্ষিণ মহাসাগর বলা হয়। এখানকার জলরাশি উত্তর মহাসাগরের প্রায় দ্বিগুণ গভীর; ইহার কেন্দ্রস্থলে য়্যান্টার্কটিকা ভূভাগ পৃথিবীর সপ্তম মহাদেশরূপে গণ্য।

মহাসাগরের জলরাশি

সাগর, মহাসাগরের জলের সহিত নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় আছে। ইহাদের জন্য সাগর, মহাসাগরের বিভিন্ন অংশে জলরাশির মধ্যে স্বাদ, বর্ণ প্রভৃতি সম্পর্কে পার্থক্য বিস্তর। এসকল খনিজ পদার্থের অধিকাংশ সাগরাদির সৃষ্টির সময়ই তথাকার ভূপৃষ্ঠে উপস্থিত ছিল এবং ক্রমশঃ তথাকার জলের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ভূপৃষ্ঠের অন্যান্য স্থানের খনিজ পদার্থের অতি সামান্য অংশই বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, নদীর জলস্রোত প্রভৃতির সাহায্যে আসিয়া সমুদ্রে পৌঁছে এবং সমুদ্রজলের সহিত মিশ্রিত হয়।

(ক) **জলের বর্ণ**—জল স্বভাবতঃ বর্ণহীন, কিন্তু নানা কারণে গভীর সমুদ্রের জলের রঙ নীল। প্রশান্ত মহাসাগরের কতক অংশে জীবন্ত আগ্নেয়গিরির জন্য জলের রঙ লাল। আর লোহিত সাগরে একপ্রকার ক্ষুদ্র উদ্ভিদের জন্য জলের রঙ লাল। চীনের 'লোয়েস' মালভূমি অঞ্চলের হল্‌দে মৃত্তিকা মিশ্রণের ফলে হোয়াংহো নদীর জলের রঙ হল্‌দে। আর ইহা যে পীত সাগরে (Yollow sea) পড়িতেছে সেখানকার জলের রঙও হল্‌দে।

(খ) **লবণতা**—সাগরজলের ৩½% বিবিধ খনিজ দ্রব্য দ্বারা গঠিত ; ইহার মধ্যে সাধারণ লবণ প্রায় ২¾%। (তন্মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট প্রভৃতি প্রধান।) এত বেশী লবণের জন্য সমুদ্রের জলরাশি সাধারণতঃ লোনা বা লবণাক্ত। বিভিন্ন মহাসাগরের জলের সম্পূর্ণ লবণ সংগ্রহ করিতে পারিলে ইহা দ্বারা সমুদয় ভূপৃষ্ঠ আরও প্রায় ১২২ মিঃ উঁচু হইতে পারে।

সমুদ্রের জলের উপরিভাগে লবণের পরিমাণ সম্পর্কে পার্থক্য—বিরাট মহাসাগরের বিভিন্ন অংশে জলের লবণতার **পার্থক্য** কম। [ক্রান্তীয় অঞ্চলে ৩·৭% (সর্বাপেক্ষা অধিক), নিরক্ষীয় অঞ্চলে ৩·৫%, এবং শীতল অঞ্চলে ৩·২% (সর্বাপেক্ষা
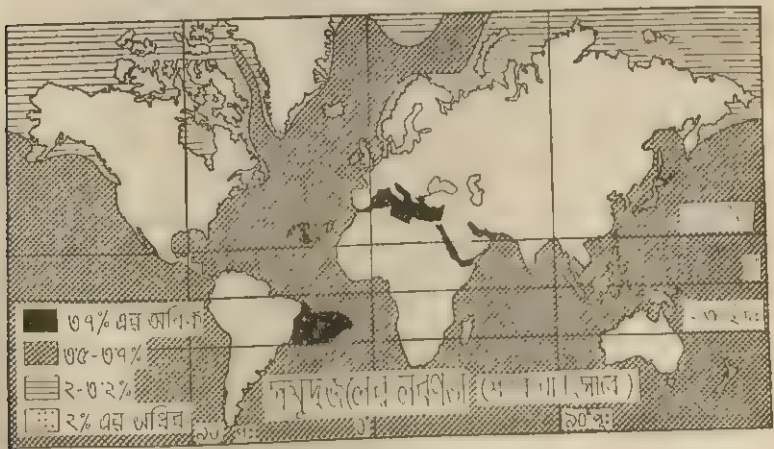
কম)।] ক্ষুদ্রতর **সাগর, উপসাগরের** জলে লবণতার **পার্থক্য অধিক**। ইহাদের ক্ষেত্রে বাষ্পীভবন, তুষার-গলা জল, বৃষ্টির জল প্রভৃতির প্রভাব অধিক। বৃষ্টির জল, নদীর জল ও তুষার-গলা জলে লবণের পরিমাণ খুব কম ; ইহা **সুপেয়** বা মিষ্টি জল। এজন্য মেরু অঞ্চলে (অধিক বরফ-গলা জলের জন্য) ও নিরক্ষীয় অঞ্চলে (খুব

বেশী বৃষ্টির জলের জন্য) সাগর, মহাসাগরের জলের উপরিভাগে লবণতা (Surface salinity) কম। স্থলদ্বারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে বেষ্টিত সমুদ্রজলের লবণতা প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল :—(১) কি পরিমাণ বরফগলা জল বা বৃষ্টির জল সাগরে আসিয়া জমা হয় এবং (২) সাগরাদির কি পরিমাণ জল বাষ্পে পরিণত* হয়। ক্রান্তীয় অঞ্চলে সামান্যই বৃষ্টির জল পাওয়া যায়। এখানে নদনদীও স্বভাবতঃ কম। তাই বিভিন্ন নদীর মধ্য দিয়া এখানকার সাগরাদিতে সুপেয় জল লাভের সুযোগও কম। এখান হইতে জল অধিক পরিমাণে বাষ্পে পরিণত হয়। এজন্য ক্রান্তীয় অঞ্চলের **লোহিত সাগর** এবং **ভূমধ্যসাগরের জল অধিক লবণাক্ত**। গ্রীষ্মকালে লোহিত সাগরের জলে লবণতার পরিমাণ প্রায় ৪%, ভূমধ্যসাগারর পূর্ব অংশেও প্রায় ঐরূপ (৩.৯%), অথচ পশ্চিম অংশে জিব্রাল্টারের পাশে আটলান্টিক মহাসাগরের সহিত মিলনস্থলের নিকট প্রায় ৩.৬%।

অপরদিকে **নাতিশীতোষ্ণ** অঞ্চলের **বাল্টিক সাগরে** অধিক তুষারগলা জল ও নদীর জল পাওয়া যায় (ইউরোপের বহু নদ-নদী এই সাগরে পতিত হইয়াছে)। এখানকার জলের বাষ্পীভবনও কম। তাই এই সাগরের জলে লবণতা **সর্বাপেক্ষা কম**। সেজন্য তথাকার লবণের পরিমাণ সুইডেনের পাশে ১.১%, বোথনিয়া উপসাগরের পাশে মাত্র ০.২%। **নিরক্ষীয় অঞ্চলে** অধিক বাষ্পীভবন হওয়া সত্ত্বেও এখানে খুব বেশী বৃষ্টির জল ও নদীর জল পাওয়া যায়। তাই এখানকার সমুদ্রজলে লবণের পরিমাণ কম।

(গ) **ঘনত্ব ও চাপ**—জলের লবণতা ও উষ্ণতার সহিত ঘনত্ব ও চাপের সম্পর্ক খুব গভীর। সুপেয় জলের তুলনায় লবণাক্ত জল অধিক ভারী। ফলে, সমান উষ্ণ জলের কতক অংশে লবণতা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঘনত্ব বৃদ্ধি হয়। আবার সমান লবণাক্ত জলের কতক অংশে উষ্ণতা কমিলে সঙ্গে সঙ্গে এই জলের ঘনত্ব বৃদ্ধি হয়। অপরদিকে কোথাও অধিক বৃষ্টির জল বা নদীর জল বা বরফ-গলা জল পাওয়া গেলে, অথবা জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি হইলে জলের ঘনত্ব কমিয়া যায়। আবার কোথাও জল হইতে অধিক বাষ্পীভবন হইলেও তথাকার জলের ঘনত্ব বৃদ্ধি হয়। এসকল কারণে নিরক্ষীয় অঞ্চলের **আমাজন** নদীর সুপেয় জল দক্ষিণ আমেরিকার তটরেখা হইতে প্রায় ৩২০ কিঃ মিঃ দূর পর্যন্ত আটলান্টিক মহাসাগরের লবণাক্ত জলরাশির উপর অংশে (ভাসিয়া) থাকে।

---

* বাষ্পীভবনের ফলে জলের লবণতা বৃদ্ধির সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ এশিয়া মাইনরের বান হ্রদ (৩৩%), জর্ডনের মরুসাগর (Dead sea) (২৩.৮%), যুক্তরাষ্ট্রের রকি অঞ্চলের গ্রেট সল্ট লেক (২২%)। বৃহৎ কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণপূর্ব অংশে লবণতা অধিক (১৭%), কিন্তু উত্তরে ভল্‌গা ও উরল নদীর মোহনাতে কম (মাত্র ১.৩%)।

(ঘ) **উষ্ণতা**—পৃথিবীর যে-কোন অংশে জল ও স্থলে সূর্যের তাপ পাওয়া গেলেও, সৌরতাপ দ্বারা স্থলভাগের চেয়ে জলভাগ ধীরে উষ্ণ হয়। আবার উহা শীতলও হয় স্থলভাগের চেয়ে দেরীতে। এদিকে সমুদ্রে অনবরত উষ্ণ ও শীতল জলের মিশ্রণ ঘটে। এসকল কারণে সমুদ্রজলের বিভিন্ন সময়ের উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্য কম। যথা—সমুদ্রজলে দিন-রাত্রির উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্য অতিসামান্য (মাত্র ১° ফা), শীত-গ্রীষ্মের উষ্ণতার পার্থক্য তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী (১০°ফা'র কম)। তবে নিরক্ষীয় অঞ্চল হইতে মেরুর দিকে সমুদ্রজলের **উপরিভাগের উষ্ণতা** (Surface temperature) স্থলভাগের উষ্ণতার তুলনায় অধিক দ্রুত কমিয়া যায় ; উত্তর গোলার্ধের তুলনায় দক্ষিণ গোলার্ধে উষ্ণতা আরও দ্রুত কমে। কারণ, দক্ষিণে মহাসাগরসমূহ অধিক দূর বিস্তৃত এবং পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। এখানে নাতিশীতোষ্ণ ও মেরু অঞ্চলের জলের অধিক সংমিশ্রণ ঘটে। তবে সাগরাদির আবর্তন, নিকটবর্তী স্থলভাগের প্রভাব প্রভৃতি কারণে জলের উষ্ণতার পরিমাণ বিভিন্ন সমুদ্রে একই হারে পরিবর্তিত হয় না। বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্ন অক্ষাংশে সমুদ্রজলের উষ্ণতার পরিবর্তন নিম্নরূপ :—

উত্তর অক্ষাংশ	সমুদ্রজলের উষ্ণতা (°সে)			দক্ষিণ অক্ষাংশ	সমুদ্রজলের উষ্ণতা (°সে)		
	আট্‌লাণ্টিক	ভারত	প্রশান্ত		আট্‌লাণ্টিক	ভারত	প্রশান্ত
০—১০°	২৬'৭	২৭'৯	২৭'১	০—১০°	২৫'২	২৭'৪	২৬'০
১০—২০°	২৫'৮	২৭'২	২৬'৫	১০—২০°	২৩'২	২৫'৯	২৫'১
২০—৩০°	২৪ ২	২৬'১	২৩'৪	২০—৩০°	২১'২	২২'৫	২১'৫
৩০—৪০°	২০'৪	—	১৮'৬	৩০—৪০°	১৬'৯	১৭'০	১৭'০
৪০—৫০°	১৩'২	—	১০'০	৪০—৫০°	৮'৭	৮'৭	১১'২
৫০—৬০°	৮'৭	—	৫'৭	৫০—৬০°	১'৮	১'৬	৫'০
৬০—৭০°	৫'৬	—	—	৬০—৭০°	-১'৩	-১'৫	-১'৩

উপরিলিখিত অবস্থা হইতে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে উষ্ণমণ্ডলে (৩০° উঃ অঃ—৩০° দঃ অঃ মধ্যে) ভারত মহাসাগরের জলের উষ্ণতা অপর দুই মহাসাগরের জলের উষ্ণতার চেয়ে বেশী, আর উত্তর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে আটলাণ্টিকের জলের উষ্ণতা প্রশান্ত মহাসাগরের জলের উষ্ণতার চেয়ে বেশী এবং দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে আটলাণ্টিকের জলের উষ্ণতা ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের জলের উষ্ণতার চেয়ে বেশী।

উভয় মেরুর আশপাশে সমুদ্রজলের উষ্ণতা সেখানকার স্থলভাগের উষ্ণতার তুলনায় অধিক তাড়াতাড়ি কমিয়া যায়। কিন্তু শীতকালে সেখানে স্থলভাগের উষ্ণতা জলরাশির উষ্ণতার তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি কমে।

সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে নীচের দিকে উষ্ণতার পরিবর্তন—সমুদ্রের উপরিভাগের জলের (Surface skin) উষ্ণতার পরিবর্তনের সহিত নিম্নদিকের জলের উষ্ণতার পরিবর্তনের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। তবে এক্ষেত্রেও মহাসাগরসমূহের উষ্ণতার পরিবর্তনের সহিত সাগর, উপসাগরের পরিবর্তনের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

মহাসাগরসমূহের উপরিভাগ হইতে ৭০০-৮০০ ফ্যাদম বা প্রায় ১২৫০-১৫০০ মিঃ মধ্যে জলের উষ্ণতা খুব **দ্রুত কমিয়া যায়**। যেমন, ভারত মহাসাগরের উপরিভাগে জলের উষ্ণতা ২৭° সে, কিন্তু ৮০০ ফ্যাদম গভীর অংশের উষ্ণতা মাত্র ৫° সে। আশ্চর্যের বিষয় **তাহার নীচে** উষ্ণতার পরিমাণ **প্রায় অপরিবর্তিত** থাকে। এজন্য বঙ্গোপসাগরে প্রায় ১০০০ ফ্যাদম গভীর অংশ পর্যন্ত জলের উষ্ণতা ১৫-২° সে। অথচ ক্ষুদ্র **সাগর, উপসাগরের** ক্ষেত্রে ইহার **ব্যতিক্রম** সুস্পষ্ট। যেমন, ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর প্রভৃতির জলের সহিত ভারত মহাসাগর বা আটলান্টিক মহাসাগরের গভীর অংশের জলের যোগাযোগ নাই। ফলে, **লোহিত সাগরের** নিম্নতম অংশের জলের উষ্ণতা প্রায় ২১° সে এবং **ভূমধ্যসাগরের** নিম্নতম অংশের জলের উষ্ণতা প্রায় ১৫° সে।
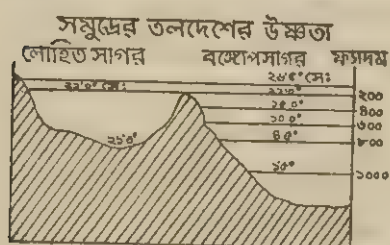
(ঙ) **সমুদ্র-তরঙ্গ**—বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন চাপবলয় ও বায়ুবলয়ের অবস্থিতির ফলে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে বায়ু নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয়। সাগরাদির উপর দিয়া এরূপ বায়ুপ্রবাহের ফলে ইহাদের জলরাশির উপরিভাগে সামান্য তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। তাহার ফলে সমুদ্রের জল এক মিটারেরও কম উঠা-নামা করে, কিন্তু কোন দিকে প্রবাহিত হয় না। তবে সমুদ্রের কোন অংশে প্রবল ঝড় বা ভূমিকম্প হইলে বা প্রকাণ্ড হিমশৈল ভাসিয়া গেলে, উঁচু তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।

সমুদ্র-স্রোত—সাগর, মহাসাগরসমূহের বিভিন্ন অংশে জলের মধ্যে নানাবিষয়ে পার্থক্যের ফলে উহাদের উপরিভাগ দিয়া জল প্রায় নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয়। জলের এরূপ প্রবাহকে বা জলস্রোতকে সমুদ্রস্রোত বলে।

সমুদ্রস্রোত সৃষ্টি ও প্রবাহের কারণ—উষ্ণমণ্ডলে, বিশেষতঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রের জল অধিক সৌরতাপ লাভ করিয়া অধিক উষ্ণ হয়। উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা অধিক প্রসারিত হয়। তাহার ফলে ইহার ঘনত্ব কমে। অপর দিকে মেরু অঞ্চলের অধিক শীতল জল খুব ভারী। তারপর সাগর, মহাসাগরসমূহের বিভিন্ন

অংশের জলের মধ্যে লবণতার পার্থক্য সুস্পষ্ট। এসকল কারণে বিভিন্ন সমুদ্রের জলরাশির উপরিভাগে সমতার (Level) ব্যতিক্রম ঘটে। কাজেই জলরাশি সমূহের উপরিভাগে **সমতাবিধানের** উদ্দেশ্যে কিছু জল এক অংশ হইতে অন্য অংশের দিকে প্রবাহিত হয়।

সমুদ্রজলের এরূপ প্রবাহ সম্পর্কে বিভিন্ন সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবাহিত **নিয়ত বায়ুর** প্রভাব খুব বেশী বা ইহাই সমুদ্রস্রোতের মূল **কারণ**। বায়ুপ্রবাহ জলরাশির উপরদিকের অংশকে নিজের প্রবাহের দিক্ অনুসারে প্রবাহিত করিতে (Trades blow the waters) যথেষ্ট সাহায্য করে। সমুদ্রস্রোতের উৎপত্তি সম্পর্কে পৃথিবীর আবর্তন গতি, মহাদেশ ও মহাসাগর-সমূহের অবস্থিতি, আয়তন প্রভৃতির প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। তাহাছাড়া বিভিন্ন স্রোতের মিলনস্থলে (Convergence) কিছু জল নিম্নদিকে নামিয়া যায়। মেরু অঞ্চলেও সমুদ্রের জল অধিক ভারী বলিয়া নীচের দিকে প্রবাহিত হয়। এসকল অবস্থাও সমুদ্রস্রোত সৃষ্টির পক্ষে এবং মানবজীবনের উপর ইহার অধিক প্রভাব বিস্তারের পক্ষে সহায়ক।

সমুদ্রস্রোতের শ্রেণীবিভাগ—উষ্ণ অঞ্চলের, বিশেষতঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলরাশি সহজেই উত্তপ্ত ও প্রসারিত হয়। কাজেই এরূপ জল হাল্কা। অপরদিকে শীতপ্রধান অঞ্চলের জলরাশি তীব্র শীতে অধিক সঙ্কুচিত হয়; তাই ইহা ভারী। এজন্য উষ্ণ অঞ্চলের সমুদ্রের জল সমুদ্রের উপর অংশ দিয়া **পৃষ্ঠপ্রবাহ** (Surface current) রূপে সমুদ্রের শীতল অংশের দিকে প্রবাহিত হয়। ইহাকে বলে **উষ্ণ** (Warm) **স্রোত**। ইহার ফলে উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্রে আংশিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তখন এখানকার জলের **সমতা রক্ষার** উদ্দেশ্যে শীতপ্রধান অঞ্চলের সমুদ্রের জল **অন্তঃপ্রবাহ** (Under current)-রূপে সমুদ্রপৃষ্ঠের (Sea surface) নীচ দিয়া উষ্ণ অঞ্চলের দিকে বহিয়া যায়। ইহাকে **শীতল স্রোত** (Cold current) বলে। উষ্ণ সমুদ্র-স্রোত শীতল অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় ক্রমশঃ অধিক শীতল ও ভারী হইয়া শীতলতর অংশে পৌঁছিয়া তথাকার শীতল জলের সহিত মিশিয়া ডুবিয়া যায়। অপরদিকে শীতল সমুদ্রস্রোত উষ্ণ মণ্ডলের দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় ক্রমশঃ উষ্ণ এবং হাল্কা হইয়া উষ্ণমণ্ডলের উষ্ণ স্রোতের পৃষ্ঠপ্রবাহের সহিত মিশিয়া যায়।

এরূপ অবস্থার ফলে **নিরক্ষীয়** অঞ্চলের অধিক উষ্ণ ও হাল্কা জল এই অঞ্চলের উষ্ণ বায়ুপ্রবাহের মত ঊর্ধ্ব (উপর) দিকে প্রবাহিত হয়। অপরদিকে **মেরু অঞ্চলের** জল ক্রমশঃ অধিক ভারী হইয়া অনবরত নীচের দিকে নামিয়া যায়। তাই এই দুই অংশে ঊর্ধ্বাধঃ (Up and down) প্রবাহ বা **পরিচলন স্রোত** (Convection current) সৃষ্টি হয়।

স্রোতের গতি ও নামকরণ—বিভিন্ন সাগরের সমুদ্রস্রোতসমূহের গতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রভাব উল্লেখযোগ্য :—

(ক) সমুদ্রস্রোত সৃষ্টির **মূল কারণ** বায়ুপ্রবাহ। এজন্য প্রধানতঃ নির্দিষ্ট **বায়ুপ্রবাহের দিক্** অনুসারে সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ উষ্ণমণ্ডলে আয়নবায়ুর প্রভাবে স্রোতসমূহ সাধারণতঃ উত্তরপূর্ব বা দক্ষিণপূর্ব দিক হইতে, আর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে সাধারণতঃ পশ্চিম দিক্ হইতে প্রবাহিত হয়। (খ) সমুদ্রজলের উপরিভাগের সমতাবিধানের উদ্দেশ্যে সমুদ্রস্রোতসমূহ সাধারণতঃ উষ্ণ অঞ্চল হইতে শীতল অঞ্চলের দিকে এবং শীতল অঞ্চল হইতে উষ্ণ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। (গ) এভাবে প্রবাহিত হওয়ার সময় পৃথিবীর আবর্তন গতিবশতঃ সমুদ্রস্রোত বায়ুপ্রবাহের মত উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বাঁকিয়া যায়। ইহারই নাম ফেরেলের সূত্র (Ferrel's law)। (ঘ) উষ্ণ সমুদ্রস্রোত সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়া **পৃষ্ঠপ্রবাহ** রূপে, আর শীতল স্রোত সমুদ্রের উপরিভাগের (Surface) জলরাশির কিছু নীচ দিয়া **অন্তঃপ্রবাহ** রূপে বহিয়া থাকে। (ঙ) সমুদ্র-স্রোত পথিমধ্যে কোন স্থলভাগে বাধা পাইলে তথায় দিক্ পরিবর্তন করে। সমুদ্রস্রোতের গতিবেগ সাধারণতঃ কম, কিন্তু গভীর সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়া জলস্রোত কিছু দ্রুত প্রবাহিত হয়।

সমুদ্রস্রোতসমূহ স্থলভাগের যে অংশের পাশ দিয়া বহিয়া যায় সাধারণতঃ তাহার নাম অনুসারে ইহাদের **নামকরণ** হয়। যেমন, পেরু স্রোত, জাপান স্রোত, ব্রেজিল স্রোত প্রভৃতি, আর নিরক্ষীয় অঞ্চলে উত্তর বা দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত। তবে কোথাও অন্য কোন বিষয়ের অধিক প্রভাব থাকিলে তাহার নাম অনুসারেও স্রোতের নামকরণ হয়। যেমন, ভারত মহাসাগরে মৌসুমী স্রোত।

প্রধান সমুদ্রস্রোতসমূহ ও মানবজীবনের সম্পর্ক

প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের পরস্পরের মধ্যে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তার এবং নির্দিষ্ট অংশের উপর দিয়া প্রবাহিত আয়ন ও পশ্চিমাবায়ুর প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে মিল প্রচুর। সেজন্য ইহাদের স্রোতসমূহের মধ্যেও মিল অনেক। কিন্তু **ভারত মহাসাগর** উত্তরদিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত এবং এই মহাসাগরের উত্তর ভাগে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব খুব বেশী। সেজন্য ভারত মহাসাগরের স্রোতের সহিত এই দুই মহাসাগরের স্রোতের গতি, দিক্ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ মিল নাই।

আট্‌লান্টিক মহাসাগর স্রোত

আট্‌লান্টিক মহাসাগরের উষ্ণ অঞ্চলের উপর দিয়া উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু* নিয়ত প্রবাহিত হয়। ইহাদের প্রভাবে বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ দিক্‌ দিয়া দুইটি উষ্ণ জলস্রোত পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়। ইহাদের মধ্যে নিরক্ষরেখার উত্তরদিক্‌ দিয়া প্রবাহিত স্রোতকে **উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত** বলে, আর নিরক্ষরেখার দক্ষিণদিক্‌ দিয়া প্রবাহিত স্রোতকে **দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত** বলে। এই দুই স্রোতের মধ্য অংশে নিরক্ষীয় শান্ত বলয়ে একটি **নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত** (Counter Equatorial current) পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। জুলাই মাসে ইহার প্রভাব অধিক, কিন্তু ডিসেম্বর মাসে মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। পশ্চিমদিকে প্রবাহিত দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলের পূর্বদিকে সেণ্ট রক অন্তরীপের নিকট বাধা পাইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার এই **দুই শাখার** একটি ক্ষুদ্র, অপরটি বৃহৎ। ক্ষুদ্র শাখাটি ব্রেজিল দেশের পূর্বদিক্‌ দিয়া **ব্রেজিল স্রোত**রূপে দক্ষিণদিকে বহিয়া যায় এবং ক্রমশঃ শীতল হয়। দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় দক্ষিণ সীমার নিকট পৌছিয়া পৃথিবীর আবর্তন গতি ও দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে এই স্রোত পূর্বদিকে বাঁকিয়া যায়। তারপর দক্ষিণ মহাসাগরের শীতল **কুমেরু স্রোতের** (Antarctic current) সহিত ইহা মিলিত হয়। এই স্রোতের কতক অংশ পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে পূর্বদিকে চলিতে চলিতে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপের নিকট বাধা পায় এবং আফ্রিকার পশ্চিমদিক্‌ দিয়া উত্তরদিকে প্রবাহিত হয়। এখানে ইহার নাম শীতল **বেঙ্গুয়েলা স্রোত**। উত্তরদিকে (উষ্ণমণ্ডলের দিকে) অগ্রসর হওয়ার সময় ইহা ক্রমশঃ উষ্ণ হয় এবং পৃথিবীর আবর্তন গতি ও দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রভাবে উত্তর-পশ্চিমদিকে বাঁকিয়া যায়। পরে ইহা দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হয়। এসকল স্রোতের গতি দৈনিক গড়ে ১৬-২৭ কিমি।

দক্ষিণ আটলান্টিকের শীতল কুমেরু স্রোতের অপর কতক অংশ দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বদিকের উপকূল ও ব্রেজিল স্রোতের মাঝখান দিয়া কিছুদূর উত্তরদিকে অগ্রসর হয়। এখানকার ফক্‌ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের নাম অনুসারে ইহার নাম **ফক্‌ল্যাণ্ড স্রোত**।

উষ্ণ উপসাগর স্রোত ও উত্তর আট্‌লান্টিক স্রোত—আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত ব্রেজিলের পূর্বদিকে সেণ্ট রক্‌ অন্তরীপের নিকট বাধা

* ভূপৃষ্ঠের নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়া নিয়মিতভাবে বায়ু প্রবাহিত হয়। ৩০° উঃ অঃ হইতে বিষুবরেখার দিকে প্রবাহিত হয় উত্তর-পূর্ব আয়নবায়ু এবং ৩০° দঃ অঃ হইতে নিরক্ষরেখার দিকে দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু। ৩০° উঃ অঃ হইতে ৬০° উঃ অঃ অভিমুখে এবং ৩০° দঃ অ. হইতে ৬০ দঃ অঃ এর দিকে বহিয়া যায় পশ্চিমাবায়ু। সুমেরু হইতে ৬০° উঃ অঃ-এর দিকে প্রবাহিত হয় উত্তর-পূর্ব মেরু বায়ু এবং কুমেরু হইতে ৬০° দঃ অঃ-এর দিকে প্রবাহিত হয় দক্ষিণ-পূর্ব মেরু বায়ু।

পাইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর ইহার **বৃহত্তর শাখা** ব্রেজিলের পাশ দিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হয়। অল্প পরেই কেরিবীয়ান সাগরের মধ্যদিয়া ইহা **মেক্সিকো উপসাগরে** উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হয়। এই মিলিত উষ্ণ স্রোতটি এখান হইতে অগভীর ফ্লোরিডা প্রণালীর মধ্যদিয়া উত্তর-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। তারপর পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে এই সমুদ্রস্রোত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণপূর্ব উপকূলের নিকট দিয়া উত্তর-পূর্বদিকে অগ্রসর হয়। তখনই ইহার নাম **উষ্ণ উপসাগর স্রোত** (Gulf Stream)। প্রথম অবস্থাতে এই স্রোতটি প্রায় ৬৪ কিঃ মিঃ বিস্তৃত থাকে এবং প্রতি ঘণ্টায় ৩-১০ কিঃ মিঃ বেগে প্রবাহিত হয়। এখানে ইহার জলের উষ্ণতা আনুমানিক ২৯° সেঃ। ক্রমশঃ **পশ্চিমাবায়ুর** প্রভাবে ইহা **বহুদূর বিস্তৃত** হইয়া (উত্তর আট্‌লান্টিকের মধ্যভাগে প্রায় ৪৮০ কিঃ মিঃ বিস্তৃত হইয়া) অত্যন্ত **ধীর গতিতে** (দৈনিক মাত্র ৮-১০ কিঃ মিঃ) অগ্রসর হয়।

ধীরে ধীরে ইহা **তিন শাখায়** বিভক্ত হইয়া আগাইয়া চলে। ইহাদের মধ্যে **দক্ষিণদিকের শাখাটি** পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে প্রায় পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া ইউরোপের স্পেন ও পর্তুগালের নিকট পৌছে এবং এখানে স্থলভাগে বাধা পাইয়া দক্ষিণদিকে বাঁকিয়া যায়। আবার উত্তর মহাসাগরের শীতল স্রোতের একটি শাখা উত্তর আট্‌লান্টিকের মধ্য দিয়া অন্তঃপ্রবাহরূপে প্রবাহিত হইয়া পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে এখানে পৌছে। এদিকে আসিবার পথে ঐ শীতল স্রোত ক্রমশঃ উষ্ণ হয় এবং এখানে আসিয়া উষ্ণ উপসাগর স্রোতের সর্বদক্ষিণ শাখার সহিত মিলিত হয়। এই মিলিত স্রোত **ক্যানারি** (Canaries) **স্রোত**রূপে আফ্রিকার পশ্চিমদিক্ দিয়া কিছুদূর দক্ষিণে অগ্রসর হয় এবং ফেরেলের সূত্র অনুসারে ক্রমে ডানে বা পশ্চিমদিকে বাঁকিয়া উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হয়। এভাবে আট্‌লান্টিকের মধ্য অংশে একটি **ঘূর্ণস্রোত** সৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যভাগে জল প্রবাহহীন। এই স্রোতশূন্য অংশে প্রচুর ঘাস, খড় প্রভৃতি সঞ্চিত হয় ও কতক জলজ উদ্ভিদ্ জন্মে। এই অংশের নাম **শৈবাল সাগর** (Sargasso Sea)। ইহার দক্ষিণদিক্ দিয়া উষ্ণ **নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত** (Counter current) পূর্বদিকে বহিয়া যায়। আফ্রিকার পশ্চিমদিকে ইহারই নাম **গিনি** (Guinea) **স্রোত**। ইহার গতিবেগ দৈনিক গড়ে ৩২ কি মি।

উত্তর আট্‌লান্টিক স্রোতের **দ্বিতীয়** বা মধ্যের **শাখাটি** প্রধান ও অধিকদূর বিস্তৃত। প্রবল পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে ইহা ইউরোপের পশ্চিমদিক্ দিয়া গিয়া নরওয়ের উত্তরসীমা ছাড়াইয়া উত্তরদিকে বহুদূর চলিয়া যায়। তবে এখানে উহার গতিবেগ খুব কম (দৈনিক গড়ে ৮-১০ কি মি)। এই দুর্বল স্রোতটি **উত্তর আট্‌লান্টিক মৃদু স্রোত** (North Atlantic Drift বা Gulf Stream Drift বা West Wind Drift)

নামে পরিচিত। উত্তর সীমাতে ইহার নাম **নরওয়ে** (Norwegian) **স্রোত**। উপসাগর স্রোতের তৃতীয় বা **উত্তরদিকের শাখা** একটু পশ্চিমে বাঁকিয়া আইস্‌ল্যাণ্ডের পাশদিয়া উত্তরদিকে চলিয়া যায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রস্রোতের মধ্য উষ্ণ উপসাগর স্রোত ও (পরবর্তী অবস্থায়) উত্তর আট্‌লাণ্টিক স্রোতের **প্রভাব** সবচেয়ে বেশী। উত্তর আট্‌লাণ্টিকের পশ্চিম সীমা হইতে পূর্ব সীমা পর্য্যন্ত প্রবাহিত এই উষ্ণ স্রোতের প্রবাহের ফলে তথাকার সমুদ্রের জল জমিয়া যাইতে (বরফে পরিণত হইতে) পারে না। কাজেই বৎসরের কোন সময়েই **জাহাজের যাতায়াতের** পক্ষে অসুবিধা হয় না। তাই এই অঞ্চলের দুই পাশের বহু দেশ শিল্প, বাণিজ্যে উন্নত। উত্তর আট্‌লাণ্টিকের পশ্চিমে যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা, আর পূর্বদিকে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ফ্রান্স, পূঃ ও পঃ জার্মানী, নেদারল্যাণ্ডস্‌ প্রভৃতি দেশ বিশেষভাবে এই সুবিধা লাভ করে। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী জাহাজ এই সমুদ্রস্রোত অনুযায়ী উত্তর আট্‌লাণ্টিক সমুদ্রপথে যাতায়াত করে। তাহাছাড়া এই স্রোতের প্রভাবে আশপাশের দেশসমূহের জলবায়ু* সম-অক্ষাংশে অবস্থিত অন্যান্য জায়গার তুলনায় উষ্ণতর ও আরামদায়ক। এই অঞ্চলের কতক অংশে বিপরীত দিক্‌ হইতে প্রবাহিত শীতল স্রোতের সহিত উষ্ণ স্রোতের মিলনের ফলে মগ্নচড়ার সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ সকল স্থানে মাছ ধরিবার ও মাছের ব্যবসায়ের সুযোগ খুব বেশী। পৃথিবীর দুইটি সর্বপ্রধান মৎস্যচারণ অঞ্চলের একটি উত্তর আট্‌লাণ্টিকের পশ্চিম অংশে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকট হইতে ল্যাব্রাডর পর্যন্ত ও অপরটি পূর্ব অংশে উত্তরে নরওয়ের উপকূল হইতে দক্ষিণে স্পেনের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত (উত্তর সাগরও ইহার অন্তর্গত)।

উত্তর আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের শীতল স্রোত ও হিম প্রাচীর—উত্তর মহাসাগরের শীতল **সুমেরু স্রোত** (Arctic cold current) দক্ষিণের উষ্ণ অঞ্চলের জলরাশির সমতাবিধানের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। ক্রমশঃ অধিক বিস্তৃত অংশের দিকে আসিতে আসিতে ইহা **দুই শাখায়** বিভক্ত হয়। ইহার এক ভাগ উত্তর আট্‌লাণ্টিক স্রোতের নীচ দিয়া পূর্বদিকে আসিয়া আফ্রিকার নিকট ক্যানারি স্রোতের সহিত মিলিত হয়।

আর ইহার অপর ভাগ গ্রীনল্যাণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিমদিক্‌ দিয়া **গ্রীনল্যাণ্ড স্রোত** রূপে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়। তারপর এই দ্বীপের দক্ষিণ অংশে এই দুই শাখাস্রোত পরস্পরের সহিত মিলিত হয় এবং উত্তর আমেরিকার ল্যাব্রাডর উপদ্বীপের পূবদিক্‌ দিয়া

---

* তবে দেশের যে অংশের নিকট দিয়া শীতল ল্যাব্রাডর স্রোত প্রবাহিত হয় তথাকার জলবায়ু এই স্রোতের প্রভাবে অধিক শীতল। কাজেই কানাডার পূর্ব উপকূলে, এমন কি সেণ্ট লরেন্স নদীর উপকূলে শীতকালে শীতের পরিমাণ খুব বেশী এবং তখন এখানকার জল বহুদিন জমিয়া থাকে।

শীতল **ল্যাব্রাডর** (Labrador)-**স্রোতরূপে** দক্ষিণদিকে বহিয়া যায়। **নিউ ফাউণ্ড-ল্যাণ্ডের** নিকট পৌঁছিয়া ইহা আবার **দুই ভাগে** বিভক্ত হয়। ইহার এক শাখা উত্তর আমেরিকার ঠিক উপকূলের নিকট দিয়া দক্ষিণদিকে বহিয়া যায়, আর অপর শাখা উষ্ণ উপসাগর স্রোতের নীচ দিয়া অন্তঃপ্রবাহরূপে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয়।

উত্তর আমেরিকার পূর্বদিকে নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের কিছুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত উষ্ণ উপসাগর স্রোতের নীল জল উত্তর-পূর্ব দকে বহিয়া যায়, আর তাহার পাশ দিয়া শীতল ল্যাব্রাডর স্রোতের সবুজ জল দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়। এভাবে এখানে পাশাপাশি দুই **বিপরীত স্রোত** পরস্পর বিপরীত দিকে বহিয়া যায়। সেজন্য এখানে ইহাদের গতি ও মধ্যভাগের সীমারেখা সুস্পষ্ট। এই সীমারেখাকে বলে **হিম প্রাচীর** (Cold wall)। এই অবস্থার **প্রভাব** নানা বিষয়ে **গুরুত্বপূর্ণ**। যেমন, এই রেখার দুই পাশের উষ্ণ ও শীতল জলের উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। তাহাছাড়া এখানে উষ্ণ ও শীতল সমুদ্র-স্রোত (বিপরীত দিকে হইলেও) পাশাপাশি প্রবাহিত হয়। এরূপ অবস্থার ফলে এখানে প্রায়ই **কুয়াসা** হয় এবং বৎসরের সকল ঋতুতে **ঘূর্ণবাত** বা ঝড় হয়।

শীতল ল্যাব্রাডর স্রোত দক্ষিণদিকে আসিতে আসিতে ক্রমশঃ উষ্ণ হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বদিকে কড অন্তরীপের নিকট পৌঁছিয়া উষ্ণ উপসাগর স্রোতের সহিত মিশিয়া যায়। কাজেই এই শীতল স্রোতের সহিত যে হিমশৈল (Iceberg) সুমেরু অঞ্চল হইতে বহিয়া আসে, তাহা এখানে গলিয়া যায়। কাজেই এই হিমশৈলের সহিত প্রবাহিত কাঁকর, বালুকা প্রভৃতি উপাদান এখানে সমুদ্রতলে পতিত ও সঞ্চিত হয়। এভাবে এখানে প্রকাণ্ড মগ্নচড়া সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা **নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কস্** বা **গ্রেট ব্যাঙ্কস্** বা **গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্কস্** নামে পরিচিত।

প্রশান্ত মহাসাগর স্রোত

আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর স্রোতের সহিত প্রশান্ত মহাসাগরের স্রোতের মিল অনেক। তবে আট্‌লাণ্টিকের তুলনায় প্রশান্ত মহাসাগর অনেক বেশী বিস্তৃত। তাই এই মহাসাগরে নিরক্ষরেখার দক্ষিণদিক্ দিয়া দক্ষিণ নিরক্ষীয় উষ্ণ স্রোতটি দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন-বায়ুর প্রভাবে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের নিকট হইতে প্রায় ১২,৮০০ কিঃ মিঃ পশ্চিমদিকে গিয়া দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়ার নিকট পৌঁছে। ইহাকে বলে **দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর স্রোত**। এখানে এই স্রোত **তিন ভাগে** বিভক্ত হয়। ইহার **এক শাখা** ইন্দোনেশিয়ার পাশ দিয়া ভারত মহাসাগরের দিকে যায়। **দ্বিতীয় শাখা** অস্ট্রেলিয়ার পূর্বদিক্ দিয়া **পূর্ব অস্ট্রেলিয়া** বা **নিউ সাউথ ওয়েলস্ স্রোত-রূপে** দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়। ইহার অবস্থা আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের ব্রেজিল

স্রোতের মত। প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অংশে (প্রায় ৪০° দঃ অঃ) ইহা কুমেরু স্রোতের সহিত মিশিয়া পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে পূর্বদিকে বহিয়া যায়। এই স্রোতের
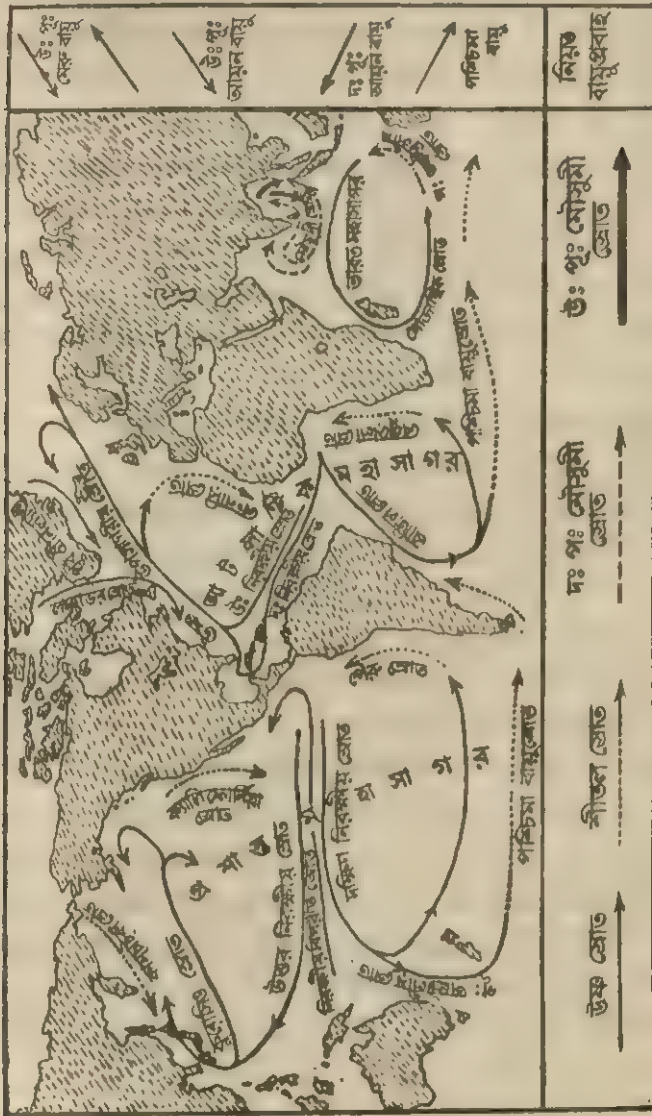
কতক অংশ দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ অংশের হর্ন অন্তরীপের নিকট বাধা পায় এবং এই মহাদেশের পশ্চিমদিক্ দিয়া উত্তরদিকে প্রবাহিত হয়। এখানে ইহার নাম শীতল

হামবোল্ড (Humboldt) স্রোত বা **চিলি** (Chilian) স্রোত বা **পেরু** (Peruvian) স্রোত। ইহার অবস্থা আট্‌লান্টিকের বেঙ্গুয়েলা স্রোতের মত। উত্তরদিকে অগ্রসর হওয়ার কালে এই স্রোত ক্রমশঃ অধিক উষ্ণ হয় এবং দক্ষিণপূর্ব আয়নবায়ুর প্রভাবে উত্তর-পশ্চিমদিকে যায়। এভাবে চলিতে চলিতে ইহা প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের **তৃতীয় শাখা** দ্বারা দক্ষিণ আমেরিকার অল্প দূরে কতকগুলি **ঘূর্ণ স্রোতের** (Circular current) সৃষ্টি হয়। ইহাদের অবস্থা আটলান্টিকের ঘূর্ণস্রোতের মত। তারপর প্রশান্ত মহাসাগরে নিরক্ষ-রেখার উত্তরদিক্ দিয়া উত্তর নিরক্ষীয় উষ্ণ স্রোত উত্তর-পূর্ব আয়নবায়ুর প্রভাবে পশ্চিমদিকে বহিয়া যায়। ইহাকে বলে উত্তর **প্রশান্ত মহাসাগর স্রোত**। এই স্রোত ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের মাঝখানের অংশ দিয়া উষ্ণ **নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত*** (Counter current) পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়।

উষ্ণ কুরোশিয়া বা জাপান স্রোত—উষ্ণ উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর স্রোত উত্তর-পূর্ব আয়নবায়ুর প্রভাবে পশ্চিমদিকে চলিতে চলিতে এশিয়ার দক্ষিণপূর্ব উপকূলে ইন্দোনেশিয়ার উত্তর অংশ বাধা পায়। এখান হইতে ইহা উত্তরদিকে অগ্রসর হয় এবং পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে বাঁকিয়া জাপানের পূর্বদিক দিয়া উত্তরপূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। এখানে ইহার নাম **উষ্ণ কুরোশিও** (Kuroshio) বা **কুরোশিয়া** (Kuro-Siwa) বা **জাপান স্রোত**। এই স্রোতের একটি অংশ জাপানের পশ্চিমদিক্ দিয়াও উত্তরদিকে প্রবাহিত হয়। ইহার নাম **সুসিমা** (Tsushima) **স্রোত**। কুরোশিয়া স্রোতটি পথে ক্রমশঃ অধিক বিস্তৃত হয় এবং পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে উত্তরপূর্বদিকে অগ্রসর হয়। এই অংশে ইহা **উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর স্রোত** (North Pacific Drift) বা **পশ্চিমা বায়ু স্রোত** (West Wind Drift) প্রভৃতি নামে পরিচিত। ইহার অবস্থা কতকটা আটলান্টিক মহাসাগরের **উপসাগর স্রোত** ও পরে **উত্তর আটলান্টিক স্রোতের** মত। তবে কুরোশিয়া স্রোতের গতিবেগ তাহার তুলনায় কম। ক্যানাডার পশ্চিমদিকে পৌছিয়া ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ইহার এক শাখা দক্ষিণদিকে বাঁকিয়া শীতল **ক্যালিফোর্নিয়া স্রোতের** সহিত মিলিত হয়। অপর শাখা উত্তরদিকে বাঁকিয়া আলাস্কার পাশ দিয়া এশিয়ার উত্তরপূর্ব অংশের এলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত যায়। এই উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে এশিয়ার উত্তরপূর্ব সীমার নিকটও

---

* প্রশান্ত মহাসাগরের এই প্রতিস্রোতটি আট্‌লান্টিক মহাসাগরের প্রতিস্রোত অপেক্ষা অধিক লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবতঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলে আট্‌লান্টিক মহাসাগর অপেক্ষা প্রশান্ত মহাসাগর অধিক বিস্তৃত বলিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের এই স্রোতটি অধিক উল্লেখযোগ্য।

সমুদ্রের জল শীতকালে জমিয়া যায় না। ফলে, এখানকার অবস্থা জাহাজ, স্টীমার প্রভৃতির যাতায়াতের পক্ষে সুবিধাজনক।

সুমেরু (Arctic) স্রোত ও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের শীতল স্রোত—উত্তর মহাসাগরের শীতল সুমেরু স্রোতের কতক অংশ বেরিং প্রণালীর মধ্যদিয়া **বেরিং স্রোতরূপে** দক্ষিণে আসে এবং পরে ওখটস্ক সাগরের মধ্যদিয়া **কামচাট্কা স্রোতরূপে** এশিয়ার পূর্ব উপকূলের নিকট দিয়া দক্ষিণদিকে আসে। এই শীতল স্রোতের কতক অংশ **ওয়াশিয়ো** (Oyashio) **স্রোত** নামে উষ্ণ কুরোশিয়া স্রোতের নীচ দিয়া (তাহার অন্তঃপ্রবাহরূপে) তাহার বিপরীত দিকে যায়। এই স্রোতের জল ক্রমশঃ উষ্ণ হইয়া উপরে উঠে ও কুরোশিয়ো স্রোতের জলের সহিত মিশিয়া যায়।

সুমেরু স্রোতের অপর কতক অংশ উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর স্রোতের নীচ দিয়া অন্তঃপ্রবাহরূপে দক্ষিণ-পূর্বদিকে আসে এবং **ক্যালিফোর্নিয়া স্রোতরূপে** ক্যালিফোর্নিয়ার নিকট দিয়া দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়। শীতকালে (নবেম্বর-জানুয়ারী) ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত ও ক্যালিফোর্নিয়ার ভূভাগের মাঝখান দিয়া ডেভিডসন স্রোত নামে একটি প্রতিস্রোত (Counter-current) উত্তরদিকে প্রবাহিত হয়। পাশে মধ্য আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের নিকট দিয়া **মৌসুমী স্রোত** প্রবাহিত হয়। এখানকার মৌসুমী বায়ু অনুসারে ইহা বিভিন্ন ঋতুতে আপন গতি ও দিক্ পরিবর্তন করে। ইহার অবস্থা ভারত মহাসাগরের মৌসুমী স্রোতের মত।

ভারত মহাসাগর স্রোত

ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ অংশের সমুদ্র স্রোতের সহিত আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অংশের স্রোতের মিল আছে। নিরক্ষরেখার দক্ষিণ দিক দিয়া প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আগত দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত উষ্ণ **নিরক্ষীয়** স্রোত মিলিত হয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রভাবে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়। ইহাকে বলা হয় **ভারত মহাসাগর স্রোত**। এই স্রোতটি পশ্চিমদিকে মাদাগাস্কর দ্বীপের নিকট পৌঁছিয়া **দুই শাখাতে** বিভক্ত হয়। ইহার এক শাখা দক্ষিণদিকে যায়, আর অন্য শাখা যায় উত্তরে। **দক্ষিণদিকের শাখার** কতক অংশ **মোজাম্বিক** (Mozambique)) **স্রোতরূপে** মাদাগাস্কার দ্বীপের পশ্চিমদিক্ দিয়া এবং অন্য অংশ **মাদাগাস্কর স্রোতরূপে** মাদাগাস্কার দ্বীপের পূর্বদিক্ দিয়া দক্ষিণদিকে বহিয়া যায়। মাদাগাস্কার দ্বীপের দক্ষিণদিকে এই দুই স্রোত পরস্পর মিলিত হইয়া আফ্রিকার দক্ষিণ সীমার নিকট দিয়া দক্ষিণে বহিয়া যায়। এখানে ইহার নাম **আগুলহাস** (Agulhus) স্রোত। ইহার অবস্থা আটলান্টিক মহাসাগরের ব্রেজিল স্রোত ও প্রশান্ত মহাসাগরের

পূর্ব অস্ট্রেলিয়া স্রোতের মত। পরে কুমেরু স্রোতের সহিত মিলিত হইয়া পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে ইহা পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। এই শীতল স্রোতের কতক অংশ দক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্শ্বের নিকট পৌঁছিয়া **পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্রোতরূপে** এখান হইতে উত্তরদিকে বহিয়া যায়। ক্রমশঃ ইহা অধিকতর উষ্ণ হয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রভাবে পশ্চিমদিকে বাঁকিয়া যায়। পরে এই স্রোতটি ভারত মহাসাগরের নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিয়া যায়। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্রোতটি প্রশান্ত মহাসাগরের পেরু স্রোত বা আটলান্টিক মহাসাগরের বেঙ্গুয়েলা স্রোতের চেয়ে দুর্বল।

মৌসুমী স্রোত—ভারত মহাসাগরের উত্তর অংশের সমুদ্রস্রোতের সহিত আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর অংশের স্রোতের মিল নাই। ইহার প্রধান কারণ, ভারত মহাসাগর উত্তরদিকে এশিয়া ও পশ্চিম দিকে আফ্রিকা মহাদেশ দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাহাছাড়া ভারত মহাসাগরের এই অংশে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। (এই বায়ু নিয়তবায়ুর মত সমস্ত বৎসর একই দিকে প্রবাহিত হয় না; বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইহার দিক্ পরিবর্তন হয়।) এরূপ অবস্থার ফলে ভারত মহাসাগরের নিরক্ষীয় স্রোতের যে শাখা মাদাগাস্কারের নিকট হইতে উত্তরদিকে বাঁকিয়া যায়, তাহা এই অঞ্চলের প্রবল মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বিভিন্ন ঋতুতে গতি ও দিক্ পরিবর্তন করে। তাই এই স্রোতকে **মৌসুমী স্রোত** (Monsoon Drift) বলে। **গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর** প্রভাবে ইহা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী স্রোতরূপে আফ্রিকার পূর্ব অংশের নিকট দিয়া উত্তর-পূর্বদিকে বহিয়া যায়। আফ্রিকার উত্তরপূর্বদিকে এই সময় ইহার নাম **সোমালি স্রোত**। তারপর ইহা আরব সাগরের মধ্যদিয়া পূর্বদিকে আসিয়া একটু বাঁকিয়া বঙ্গোপসাগরের দিকে চলিয়া যায়। আবার **শীতকালে** ভারত মহাসাগরের উত্তর অংশের সমুদ্রস্রোত **উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর** প্রভাবে উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে (অর্থাৎ এই অংশের গ্রীষ্মকালের স্রোতের বিপরীত দিকে) বহিয়া যায়।

ভারত মহাসাগরের মৌসুমী স্রোত এবং নিরক্ষীয় স্রোতের মধ্য ভাগের অংশ দিয়া **ভারতীয় প্রতিস্রোত** (Counter current) পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়।

সমুদ্র স্রোতের সহিত মানবজীবনের সম্পর্ক—বিভিন্ন সাগর, মহাসাগর-সমূহের উষ্ণ ও শীতল সমুদ্র-স্রোতের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় মহাদেশ-সমূহের উপকূলে মানবসমাজের জীবন ধারণ ও জীবিকা সম্পর্কে নানাকাজে। যেমন—

(১) **যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা**—উষ্ণ স্রোতের অনুকূলে জলযানসমূহের **চলাচলের** পক্ষে সুবিধা অধিক। শীতল সমুদ্র স্রোতের গতিপথে তীব্র শীত ও হিমশৈল প্রভৃতির জন্য তাহাদের যাতায়াতের পক্ষে অসুবিধা ঘটে। বস্তুতঃ **আটলান্টিক**

মহাসাগরের **উষ্ণ স্রোতের** (North Atlantic Drift) অনুকূলে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী জাহাজ যাতায়াত করে। অবশ্য এ সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়েরও প্রভাব খুব বেশী। এই উষ্ণ আট্‌লান্টিক স্রোতের প্রভাবে **নরওয়ের উত্তর-পশ্চিম অংশেও** সমস্ত বৎসর জাহাজ চলাচল করিতে পারে। অপর পক্ষে ইহার দক্ষিণে বাল্টিক সাগরে উষ্ণ সমুদ্র স্রোত পৌছে না বলিয়া শীতকালে এখানকার জল জমিয়া যায়। (২) **জলবায়ুর অবস্থা**—হিমমণ্ডলের এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের শীতলতর অংশে অবস্থিত বিভিন্ন সাগরের জল শীতকালে জমিয়া যায়। কিন্তু এসকল সাগরের শীতল অংশেও উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে শীতকালে বরফ জমিতে পারে না। বরং যে উপকূলের নিকট দিয়া উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত হয় তথায় উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে **উষ্ণতা বৃদ্ধি** হয়। (৩) অপরদিকে শীতল স্রোতের প্রভাবে নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের উষ্ণতর অংশের সমুদ্রেও জলরাশি জমিয়া যাইতে পারে। তাহাছাড়া যে উপকূলের নিকট দিয়া শীতল সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হয়, তথায় শীতল স্রোতের প্রভাবে **শীত** বৃদ্ধি হয়। যেমন, নিউ ইয়র্কের নিকট দিয়া শীতল ল্যাব্রাডর স্রোত প্রবাহিত হয় বলিয়া শীতকালে তথায় তীব্র শীত বোধ হয় এবং **সেণ্ট লরেন্স নদীর জল জমিয়া** যায় ও যাতায়াতের পক্ষে অসুবিধা হয়। (৪) আবার সমুদ্রের যে অংশে উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহার উপর দিয়া প্রবাহিত বায়ু অধিক **জলীয় বাষ্প গ্রহণ** করিয়া থাকে। তাহার ফলে নিকটবর্তী উপকূলে এই বায়ু দ্বারা অধিক বৃষ্টি হয়। অপর দিকে সমুদ্রের যে অংশে শীতল স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহার উপর দিয়া প্রবাহিত বায়ু দ্বারা তুষারপাত হয়। এজন্যই ইংলণ্ডের পশ্চিম উপকূলে উষ্ণ আটলান্টিক স্রোতের প্রভাবে অধিক বৃষ্টি হয়। কিন্তু একই অক্ষাংশে অবস্থিত উত্তর আমেরিকার পূর্বদিকে (ল্যাব্রাডর উপকূলে) শীতল **ল্যাব্রাডর** স্রোতের প্রভাবে **তুষারপাত** হয়। (৫) উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনস্থলে ইহাদের পরস্পরের জলের মধ্যে উষ্ণতার অধিক পার্থক্যের ফলে এবং অতি অল্প স্থানের মধ্যে উষ্ণতার অধিক পরিবর্তনের জন্য **কুয়াসা** ও **ঝড়বৃষ্টি** হয়। এজন্য নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড ও জাপানের নিকট প্রায় বার মাস কুয়াসা দেখা যায়। অধিক কুয়াসা যাতায়াতের পক্ষে অসুবিধাজনক। (৬) **মগ্নচড়ার সৃষ্টি**—উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনস্থলে সমুদ্রে **মগ্নচড়ার সৃষ্টি** হয়। উত্তর আমেরিকার নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকট এভাবেই বিখ্যাত গ্রেট ব্যাঙ্কস বা গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্কস মগ্নচড়া সৃষ্টি হইয়াছে। আর ইউরোপের উত্তর সাগরে আছে ডগার ব্যাঙ্কস ও এরূপ কয়েকটি মগ্নচড়া। (৭) **মাছ ধরিবার ও মাছের ব্যবসায়ের কেন্দ্র**—উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনস্থলে এবং মগ্নচড়ার নিকট সমুদ্রে অধিক অম্লজান (Oxygen) ও মাছের উপযোগী খাদ্য পাওয়া যায়। তাহাছাড়া মাছ সাধারণতঃ স্রোতের বিপরীত

দিকে চলে। তাই ইংলণ্ড, জাপান ও নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড প্রভৃতির নিকটবর্তী সমুদ্র বিভিন্ন স্রোতের মিলনস্থল মাছ ধরিবার ও মৎস্য ব্যবসায়ের প্রধান অঞ্চল।

অনুশীলনী

১। গভীরতার পার্থক্য অনুসারে সাগর, মহাসাগরের তলদেশ কতভাগে বিভক্ত? প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ বর্ণনা কর। আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য অধিক উল্লেখযোগ্য? ২। কোন্ মহাসাগরে গভীর খাত অধিক? সেগুলি কোথায় অবস্থিত? পাঁচটি অতিগভীর খাতের নাম লিখ। ৩। ভারত মহাদেশের তলদেশের উন্নত অংশগুলি কোন্‌দিকে? তাহাদের নাম লিখ। ৪। সাগর, মহাসাগরের জলে লবণতার সাধারণ পরিমাণ কিরূপ? কোথায় কোথায় লবণতার অধিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়? এরূপ পার্থক্যের কারণ কি? বাল্টিক ও লোহিত সাগরের মধ্যে লবণতার অবস্থা তুলনা কর। ৫। সাগর মহাসাগরের জলের উষ্ণতা সম্পর্কে নিরক্ষীয় অঞ্চল হইতে উভয় মেরুর দিকে কিরূপ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়? সমুদ্রেরজলে উপরিভাগ হইতে নীচের দিকে উষ্ণতার কিরূপ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়? ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগরের জলের উষ্ণতা তুলনা কর। এই দুই পাশাপাশি সাগর, মহাসাগরের জলে উষ্ণতা সম্পর্কে এপ্রকার পার্থক্যের কারণ কি? ৬। সমুদ্রস্রোত কেন সৃষ্টি হয়? আটলান্টিক মহাসাগরের কোন্ স্রোতের প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক? ঐ স্রোতটির গতিপথ এবং পথের বিভিন্ন অংশে উহার অবস্থা বর্ণনা কর। উহার প্রভাবও উল্লেখ কর। ৭। প্রশান্ত মহাসাগরের কোন্ স্রোতকে আটলান্টিকের সর্বপ্রধান স্রোতের সহিত তুলনা করা যায়? ঐ স্রোতটির গতি ও অবস্থা বর্ণনা কর। ৮। ভারত মহাসাগরের স্রোত সম্বন্ধে কি কি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য? এই মহাসাগরের স্রোতের অবস্থা সংক্ষেপে উল্লেখ কর। ৯। মানবজীবনের উপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব বর্ণনা কর। ১০। নিম্নলিখিতগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টিকা লিখ—মহীসোপান, শৈবাল সাগর, নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত ও হিম প্রাচীর।

দ্বিতীয় ভাগ

মানবিক ভূগোলের মূল তত্ত্বসমূহ

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের জীবন ও কার্য

আমাদের পৃথিবী বিরাট সৌরমণ্ডলের অন্তর্গত একটি গ্রহ। ইহার আয়তনও অধিক। (ভূপৃষ্ঠের আয়তন প্রায় ৫২ কোটি বর্গ কিমি, অর্থাৎ ভারতের আয়তনের প্রায় ১৪০ গুণ।) তারপর পৃথিবী আপন মেরুরেখার চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে অনবরত সূর্যের চারিদিকে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। (ইহার কক্ষের আকৃতি Ellipse বা উপবৃত্তের মত।) তাহাছাড়া ভূপৃষ্ঠের প্রায় ২৯% স্থলভাগ এবং তাহার বিভিন্ন অংশে আছে ভূপ্রকৃতির নানা বৈচিত্র্য। তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে বিরাট সাগর, মহাসাগর (ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৭১%)। এবং সমুদয় স্থলভাগ ও জলভাগকে ঘিরিয়া আছে বায়ুমণ্ডল। এপ্রকার অবস্থা ও নানা বৈচিত্র্যের ফলে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে দৈনিক **আবহাওয়ার** ও **জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য** এত বেশী যে সকল বিষয়ে মিলযুক্ত দুইটি স্থান খুঁজিয়া পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এমন কি, যে-কোন একটি স্থানেও পর পর কয়েক দিন সম্পূর্ণ এক রকম অবস্থা দেখা যায় না। একই দিনের বিভিন্ন অংশের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা যায় প্রায় সর্বত্র।

সেজন্য ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের জলবায়ু সম্পর্কে **গড়** (Average) **অবস্থা** ও **সাধারণ** বা মোটামুটি **মিল** অনুসারে কয়েকটি প্রধান **জলবায়ু অঞ্চলে** বিভক্ত করার রীতি প্রচলিত। আমাদের সকলের পক্ষে জলবায়ু সম্পর্কিত আলোচনা এবং নানা বিষয়ে তাহার প্রভাব লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, একদিকে **ভূপ্রকৃতি** ও অন্যান্য **প্রাকৃতিক** বিষয়ের সহিত **জলবায়ুর সম্পর্ক** অতিশয় গভীর বা ঘনিষ্ঠ। অপরদিকে **জলবায়ু** সংক্রান্ত বিভিন্ন অবস্থার **সহিত** প্রত্যেক অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ, জীবজগৎ, লোকবসতি ও তাহাদের জীবিকা, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক উন্নতি প্রভৃতি **নানা বিষয়ে সম্পর্ক** খুব ঘনিষ্ঠ। ফলে, ভূপৃষ্ঠে **ভৌগোলিক অঞ্চল** নির্ণয় সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জলবায়ুর প্রভাব সবচেয়ে বেশী। সেজন্য প্রধানতঃ **জলবায়ুর ভিত্তিতে** পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানবসমাজের জীবন ও জীবিকার বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

এরূপ আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রথমে অঞ্চলসমূহকে প্রধানতঃ **উষ্ণতার পার্থক্য** অনুসারে (ইহাই জলবায়ুর মূল ভিত্তি বলিয়া) উষ্ণ, নাতিশীতোষ্ণ ও শীতল—এই **তিন**

প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইল। তারপর আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য বিষয়ের সহিত মানুষের জীবন ও জীবিকার সম্পর্ক অনুসারে তিন প্রধান ভাগকে **ক্ষুদ্রতর অঞ্চলে** বিভক্ত করা হইল।

উষ্ণ অঞ্চল

ভূপৃষ্ঠের প্রায় ⅓ অংশ স্থানের বার্ষিক গড় উষ্ণতা ২৪° সে'র (সেলসিউস) অধিক। [এখানকার কতক অংশে বৎসরের বিভিন্ন সময়ের উষ্ণতার পার্থক্য খুব কম, আবার কতক অংশে ঐরূপ পার্থক্য যথেষ্ট।] এই অঞ্চল সাধারণতঃ কর্কটক্রান্তির উত্তর হইতে মকরক্রান্তির দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার বিভিন্ন অংশের মধ্যে বায়ুর আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতি বিষয়ে পার্থক্য প্রচুর। তদনুসারে এই অঞ্চল চারিটি ক্ষুদ্রতর অঞ্চলে বিভক্ত।

(ক) মৌসুমী অঞ্চল *

বিস্তৃতি—মহাদেশসমূহের পূর্বদিকের যে সকল অংশ মোটামুটি হিসাবে কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির মধ্যবর্তী, সেগুলি উষ্ণ মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্গত। উত্তর গোলার্ধে কর্কটক্রান্তির বেশ কিছুদূর উত্তর (প্রায় ৪০° উঃ অঃ) পর্যন্ত মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। **দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে** এই জলবায়ুর **প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক**। এখানকার বাহিরে আফ্রিকার পূর্ব অংশে আবিসিনিয়া, উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো উপসাগরের উপকূলের সামান্য অংশ এবং দক্ষিণ গোলার্ধে কেবল অস্ট্রেলিয়ার উত্তর অংশের অতি অল্প স্থানে এই জলবায়ুর প্রভাব বর্তমান।

ভূপ্রকৃতি হিসাবে এখানকার বিস্তীর্ণ অংশ **সমভূমি**। তবে এখানে মালভূমি এবং পাহাড়, পর্বতও প্রচুর। ভারত, ব্রহ্মদেশ, চীন প্রভৃতি দেশে পাহাড়, **পর্বত-সমূহের অবস্থিতি** এই সকল স্থানের জলবায়ু সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

* মৌসুমী অঞ্চল আমাদের ভারতসহ পৃথিবীর অর্ধেক লোকের বাসভূমি। সেজন্য এখানকার বিষয় সর্বপ্রথম আলোচিত হইল। অন্যান্য অঞ্চলের আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রয়োজনমত এখানকার বিষয় উল্লেখ বা এখানকার অবস্থার সহিত তুলনা করা যাইবে।

জলবায়ু—এই অঞ্চলের অন্তর্গত স্থানসমূহে **বসন্তকালে** (উত্তর গোলার্ধে মার্চ মাসে) জলবায়ুর অবস্থা **আরামদায়ক**। তবে এই ঋতু স্বল্পস্থায়ী। অল্প কয়েকদিন পর হইতেই এখানে বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি হইতে থাকে। বিশেষতঃ কর্কটক্রান্তির নিকটবর্তী স্থানসমূহে **গ্রীষ্মকালে** (উত্তর গোলার্ধে মে-জুন মাসে) বায়ুমণ্ডলের **উষ্ণতা** নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণতার চেয়েও বেশী (২৭-৩২° সে)। স্বভাবতঃ তখন এখানে **প্রবল নিম্নচাপ কেন্দ্রের** সৃষ্টি হয় এবং অধিক উষ্ণ বায়ু হাল্কা হইয়া উপরদিকে উঠিয়া যায়। অবস্থিতি হিসাবে এই অঞ্চলের পাশেই বিরাট জলমণ্ডল—দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগর। স্বভাবতঃ ঐ সকল মহাসাগরের উপরিভাগে বায়ুর উষ্ণতা কম। (তাহা কর্কটক্রান্তির নিকটবর্তী অংশের স্থলভাগের বায়ুর মত উষ্ণ হইতে পারে না।) ফলে, তথায় অপেক্ষাকৃত উচ্চচাপ থাকে। আরও দক্ষিণে, অর্থাৎ দক্ষিণ গোলার্ধে তখন (মে-জুন মাসে) শীতকাল এবং বায়ুর উষ্ণতা কম ও চাপ অধিক।

এরূপ অবস্থার ফলে **দক্ষিণ গোলার্ধের উচ্চচাপ** অঞ্চল হইতে বায়ু উত্তরদিকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। (বায়ুর সাধারণ ধর্ম বা স্বভাব অনুসারে ইহা সর্বত্র উচ্চচাপ হইতে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়।) নিরক্ষীয় অঞ্চলের নিম্নচাপের তুলনায় ঐ সময় কর্কটক্রান্তির নিকটবর্তী অংশের নিম্নচাপ অধিকতর প্রবল। সেজন্য দক্ষিণদিক হইতে প্রবাহিত বায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চল অতিক্রম করিয়া **কর্কটক্রান্তির নিকটবর্তী প্রবলতর নিম্নচাপ** অঞ্চলের দিকে আসে। এভাবে আসিবার সময় ঐ বায়ুপ্রবাহের দিক্‌পরিবর্তন ঘটে। প্রথমে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে বায়ু দক্ষিণপূর্বদিক্‌ হইতে আসে। কিন্তু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করিবার পর পৃথিবীর আহ্নিক গতির প্রভাবে ঐ বায়ু ফেরেল সূত্র অনুসারে উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে বাঁকিয়া দক্ষিণপশ্চিমদিক হইতে উত্তরপূর্বদিকে আসে।

এই বায়ু বিরাট মহাসাগর ও সাগরাদির উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রচুর জলীয় বায়ু সংগ্রহ করে। তাই ইহা **অত্যন্ত আর্দ্র** (Wet or humid) অবস্থায় কর্কটক্রান্তির নিকটবর্তী অংশে পৌঁছে। এই বায়ুর কতক অংশ দাক্ষিণাত্য মালভূমির পশ্চিম অংশে পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে (প্রতিবাত অংশে) এবং ব্রহ্মদেশের আরাকান উপকূলের পর্বতসমূহেরও পশ্চিম ঢালে বাধা পায়। একারণে তথাকার পর্বতসমূহের **প্রতিবাত অংশের** তখনকার বৃষ্টির পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক (গড়ে ১০০-২০০ সেমি)। এই বৃষ্টি **শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টির** (Relief rain) প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গ্রীষ্মকালে প্রধানতঃ দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমীবায়ুর সহিত দক্ষিণপূর্ব এবং দক্ষিণদিক হইতে আগত মৌসুমী বায়ুর মিলিত প্রবাহ বাংলাদেশ ও ভারতের দক্ষিণপূর্ব অংশের উপর দিয়া অগ্রসর হয়। এই বায়ু হিমালয় পর্বতমালা ও তাহার দক্ষিণপূর্বদিকে অবস্থিত

মেঘালয়ের গারো, খাসিয়া প্রভৃতি পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে বাধা পায় আরও বেশী। এসকল কারণে এখানকার ঐ সময়ের **বৃষ্টি সর্বাপেক্ষা অধিক**। বস্তুতঃ মেঘালয়ের শিলংএর নিকটবর্তী **চেরাপুঞ্জি** ও **মসিনরাম** বা মৌসমাইয়ের বৃষ্টি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক (১২০০ সেমির বেশী)। এইরূপ বৃষ্টি সম্পর্কে স্থান দুইটির অবস্থিতি ও তথাকার ভূপ্রকৃতির (দক্ষিণদিকে খাড়া ঢাল ও মাঝখানের ফাঁকের ঠিক উত্তরে উহাদের অবস্থিতি) প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
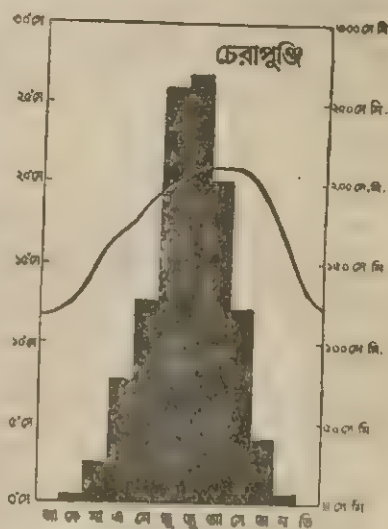
স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে নিরক্ষরেখা হইতে উত্তরে কর্কটক্রান্তি পর্যন্ত স্থানসমূহ উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু প্রবাহের অঞ্চল। কিন্তু উপরিলিখিত অবস্থার ফলে তখন এই সকল স্থানের উপর দিয়া বায়ু প্রবাহিত হয় তাহার বিপরীত দিক (দক্ষিণপশ্চিমদিক) হইতে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এক্ষেত্রেও বায়ু তাহার স্বাভাবিক ধর্ম (উচ্চচাপ হইতে নিম্নচাপের দিকে প্রবাহ) অনুসারেই প্রবাহিত হয়।

এই সময়ের প্রবল বর্ষণের জন্য তখন এখানকার পক্ষে **বর্ষাকাল**। আর এই প্রকার বৃষ্টির ফলে বায়ুর উষ্ণতা হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক। তাহাছাড়া এ বিষয়ে পৃথিবীর আবর্তন গতির প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। ফলে, ইহার পরে **শরৎকালে** (উত্তর গোলার্ধে সেপ্টেম্বর মাসে) উত্তর গোলার্ধের অন্তর্গত মৌসুমী অঞ্চলের এসকল স্থানে বায়ুর উষ্ণতা থাকে অনেক কম, বৃষ্টিও কমিয়া যায়।

ইহার পর **শীতকালে** (উত্তর গোলার্ধে ডিসেম্বর-জানুয়ারী) এসকল স্থানে বায়ুর উষ্ণতা নিতান্তই কম (১২ ১৫° সে) এবং চাপ অধিক। অথচ তখন (ডিসেম্বর-জানুয়ারী) দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। সেজন্য তখন তথায় বায়ুর উষ্ণতা অধিক ও নিম্নচাপ। অবস্থার এপ্রকার পরিবর্তনের ফলে তখন উত্তর গোলার্ধের মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্গত স্থানসমূহের উপর দিয়া বায়ু প্রবাহিত হয় মোটামুটি হিসাবে দক্ষিণপশ্চিমদিকে। এই বায়ু প্রধানতঃ স্থলভাগের উপর দিয়া আসে বলিয়া **শুষ্ক** (অধিক জলীয় বায়ু গ্রহণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত)। তাই তখন বৃষ্টি প্রায় হয় না।

উপরিলিখিত অবস্থা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে মৌসুমী অঞ্চলে বায়ু বৎসরের সকল সময় নিয়মিতভাবে একই দিকে প্রবাহিত হয় না। বরং **ঋতু অনুসারে দিক্ পরিবর্তন** করে। বায়ুপ্রবাহের এরূপ দিক্ পরিবর্তনের সময় (একবার বৈশাখ মাসে বর্ষাকালের আগে ও একবার কার্তিক মাসে বর্ষার পরে) তথায় ঝড়বৃষ্টি হয়। ঋতুর (মরসুম বা মৌসুম) পরিবর্তনের সহিত বায়ুর এপ্রকার দিক্ পরিবর্তনের সম্বন্ধের জন্য এই অঞ্চলের বায়ুপ্রবাহকে বলা হয় **মৌসুমী বায়ু**। আর এই সকল স্থানের জলবায়ুর উপর এই বায়ুর প্রভাব অধিক। আবার এখানকার উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ সম্পদ্ এবং মানবিক নানা বিষয়ের উপর জলবায়ুর প্রভাব অসামান্য। এসকল কারণে এই অঞ্চল **মৌসুমী অঞ্চল** নামে সুপরিচিত।

ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে উত্তর গোলার্ধের অন্তর্গত মৌসুমী অঞ্চলে বায়ু শুষ্ক থাকিলেও দক্ষিণ গোলার্ধের অন্তর্গত অস্ট্রেলিয়ার উত্তর অংশের দিকে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা আর্দ্র। (তাহা ভারত মহাসাগরের উপর দিয়া ঐ স্থানের দিকে আসে।) একারণে তখন তথায় বৃষ্টি হয়। স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায় অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে তখন গ্রীষ্মকাল। আরও লক্ষ্য করা দরকার যে মে-জুন মাসে অস্ট্রেলিয়াতে শীতকাল এবং তখন তথায় বায়ুর উচ্চচাপ। সেজন্য তখন অস্ট্রেলিয়ার উত্তর অংশ বৃষ্টিহীন।

সুতরাং মৌসুমী অঞ্চলের জলবায়ুর নিম্নলিখিত **বৈশিষ্ট্য** উল্লেখযোগ্য। তথায় গ্রীষ্মকাল ও শীতকালে বিভিন্ন দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। সমস্ত বৎসরে **একবার বর্ষাকাল** (স্বভাবতঃ গ্রীষ্মকালের পরে) এবং বাকী সময় প্রায় বৃষ্টিহীন। **ভারত ও বাংলাদেশে** মৌসুমী জলবায়ুর অবস্থা প্রায় **আদর্শ স্থানীয়,** অথবা এই দুই দেশের জলবায়ু মৌসুমী অঞ্চলের জলবায়ুর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ—এখানকার জলবায়ু (বিশেষতঃ একটি আর্দ্র ও একটি শুষ্ক ঋতু) **পর্ণমোচী** (Deciduous) গাছের পক্ষে অনুকূল। এরূপ গাছের মধ্যে শালের সংখ্যা সবাপেক্ষা অধিক। এই অঞ্চলের বহু স্থানে বিস্তীর্ণ **শালবন** আছে। তবে এখানকার গাছের মধ্যে **সেগুন** (Teak) সর্বশ্রেষ্ঠ। খদির বা খয়ের, হলদু, লরেল, অর্জুন, গাম্ভীর, জারুল, শিমূল, শিরীষ, ছাতিম প্রভৃতি অন্যান্য **পর্ণমোচী** গাছও এখানে অনেক। যে সকল অংশে বৃষ্টি বেশী তথায় আবলুস, গর্জন, শিশু, চাপলাস, পুন, তুন, বিশপ উড, রোজ উড (লোহাকাঠ), বোগাপোমা প্রভৃতি প্রশস্ত পত্রযুক্ত **চিরহরিৎ** (Evergreen) গাছও প্রচুর। এই অঞ্চলের বহু স্থানে আছে উভয় জাতীয় গাছের **মিশ্র বন**। তাহাছাড়া আম, জাম, কাঁটাল, তালগাছ, বাঁশ ঝাড়, লোনা জমিতে (সমুদ্রতীরবর্তী অংশে) সুপারি, নারিকেল প্রভৃতি গাছও অনেক। এই অঞ্চলে বিস্তীর্ণ তৃণভূমির অভাব। তবে মাঝে মাঝে অনেক **নিকৃষ্ট**

তৃণভূমি এবং ছোট গুল্মের **ঝোপ জঙ্গল** আছে। আর পর্বতের উপরদিকে আছে পাইন, ফার, দেবদারু প্রভৃতি **সরলবর্গীয়** (Coniferous) গাছ।

এসকল গাছের **শক্ত কাঠ** ঘরবাড়ি, সেতু, নানারকম আসবাব প্রভৃতি তৈরীর প্রধান উপাদান। **রেলপথের তক্তা** (Railway sleeper) হিসাবে শালকাঠের চাহিদা অধিক। আর মূল্যবান আসবাব, জাহাজ, স্টীমার, রেলগাড়ীর বিভিন্ন অংশ প্রভৃতি তৈরীর জন্য **সেগুন কাঠের** প্রয়োজন। সরলবর্গীয় গাছের কোমল কাঠদ্বারা তৈরী হয় কাগজের মণ্ড। তাহাছাড়া জ্বালানি কাঠ, কাঠকয়লা তৈরীর কাঠ, চামড়া মজবুত (Tan) করার জন্য কতক ছাল ও ফল প্রভৃতিও যথেষ্ট মূল্যবান্ সম্পদ।

জীবজন্তু ও প্রাণিজ সম্পদ—মৌসুমী অঞ্চলের বনে **বাঘ, ভল্লুক, হাতী, বন্য মহিষ, গণ্ডার, হরিণ, বানর** প্রভৃতি প্রাণী অনেক। ইহাদের চর্ম, শিং, অস্থি প্রভৃতি মূলবান্ বনজ সম্পদ। তাহাছাড়া মধু, মোম, লাক্ষা প্রভৃতিও যথেষ্ট মূল্যবান্। এই অঞ্চলে বিস্তীর্ণ তৃণভূমির অভাব সত্বেও নিকৃষ্ট তৃণভূমিগুলিতে ও চাষের জমিতে বিভিন্ন ফসলের চাষের ফাঁকে ফাঁকে পালন করা হয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী **গরু ও মহিষ**। এখানে **মেষ, ছাগ, হাঁস,, মোরগ** প্রভৃতিও প্রচুর। বনে নানাপ্রকার **সাপ ও পাখী** অসংখ্য। আর নদনদী, খাল, বিল, পুকুর, দীঘি প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ জলাশয় এবং পাশে বিভিন্ন সাগরের অগভীর অংশে পাওয়া যায় নানাজাতীয় **মাছ** ও অন্য বহুরকম জলজন্তু।

লোকবসতি ও জীবিকা—এখানকার বিস্তীর্ণ সমভূমি, বিশেষতঃ নদী-উপত্যকার ও সমুদ্রের উপকূলের **উর্বর ভূমি** এবং **মৌসুমী জলবায়ু** লোকবসতি, যাতায়াত ও কৃষি প্রভৃতির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সেজন্য এখানে বাস করেন **পৃথিবীর অর্ধেক** মানুষ। এখানকার কতক অংশের লোকবসতির **ঘনত্ব** পৃথিবীতে **সর্বাপেক্ষা অধিক**। এখানে স্বভাবতঃ কৃষিই তাহাদের **সর্বপ্রধান উপজীবিকা**। তবে এখানে শীতকাল বৃষ্টিহীন বলিয়া তখন চাষের পক্ষে **সেচ** একান্ত আবশ্যক। বস্তুতঃ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সেচ ব্যবস্থা আরম্ভ হয় এই অঞ্চলে। (মহেঞ্জোদড়োর ভগ্নাবশেষ তাহার প্রমাণ।) পশুপালন, মৎস্যশিকার, বনজ ও খনিজ সম্পদ সংগ্রহ, শিল্প প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা অর্জনের সুযোগ এখানে প্রচুর।

যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা—এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ সমভূমি অংশে **জলপথ** ও **রেলপথ** প্রচুর। পার্বত্য ও নদীবহুল অংশে বা বনাঞ্চলে পথের অভাব। তাই তথায় যাতায়াত ও পরিবহনের অসুবিধা অধিক। অপরদিকে এখানকার নদী ও বহু খাল **অভ্যন্তরীণ নৌপথ** হিসাবে বিখ্যাত। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, ইরাবতী, মেকং, মেনাম, সি কিয়াং প্রভৃতি নদী এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। **সমুদ্রপথে** যাতায়াত ও

পরিবহনের সুযোগও এই অঞ্চলের উপকূলবর্তী দেশগুলির পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্। **বিমানপথে** যাতায়াত ব্যবস্থাও এখানে উন্নত। বস্তুতঃ পৃথিবীর বহু আন্তর্জাতিক সংস্থার বিমানপোত এখানকার উপর দিয়া যাতায়াত করে। এখানে অনেক আন্তর্জাতিক বিমানস্টেশনও আছে।

অর্থ নৈতিক উন্নতি—মৌসুমী অঞ্চল পৃথিবীর অন্যতম প্রধান **কৃষি অঞ্চল**। এই অঞ্চলের ৭০-৭৫% লোকের জীবিকা কৃষি। এখানকার বিভিন্ন ফসলের মধ্যে **ধান, পাট, আখ, চা, তৈলবীজ,** রাগি, বাজরা, জোয়ার প্রভৃতির উৎপাদন **পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক**। এখানে **কার্পাস, তামাক** প্রভৃতিও জন্মে প্রচুর। এখানে **বনজ সম্পদ** (কাঠ), **খনিজ সম্পদ** (কয়লা, লৌহ, তাম্র, ম্যাঙ্গানিজ) ও **প্রাণিজ সম্পদ** (দুধ, মাংস প্রভৃতি) প্রচুর। ইহাদের সাহায্যে নানারকম **শিল্পও** এখানে উন্নত। বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে **কার্পাস, পাট, চা** প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ সম্পদভিত্তিক শিল্প, **লৌহ, ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং** প্রভৃতি খনিজ সম্পদভিত্তিক শিল্প, চর্মশিল্প, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানকার কতক শিল্পাঞ্চল (কলিকাতা শিল্পাঞ্চল, সাংহাই, বোম্বাই প্রভৃতি) পৃথিবী-বিখ্যাত।

(খ) নিরক্ষীয় অঞ্চল

বিস্তৃতি—নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণে ৫-১০° উঃ অঃ হইতে ৫-১০° দঃ অঃ পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকার কঙ্গো-অববাহিকা ও গিনি উপকূল এবং দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন-অববাহিকা এই অঞ্চলের অন্তর্গত। তন্মধ্যে আয়তন হিসাবে **আমাজন-অববাহিকা** বৃহত্তম। এই অববাহিকার **ভূপ্রকৃতিরও** একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা একটি নিম্নাঞ্চল; তাহার তিনদিকে (উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে) উচ্চভূমি, পূর্বদিকে আটলান্টিক মহাসাগর। নিরক্ষীয় অঞ্চলের আফ্রিকা ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত অংশের ভূপ্রকৃতি সমভূমি ও সামান্য উচ্চভূমি।

জলবায়ু—এই অঞ্চলের জলবায়ু সম্পর্কে এখানকার **অবস্থিতি** অত্যন্ত **গুরুত্বপূর্ণ**। নিরক্ষরেখাতে সমস্ত বৎসর দিনরাত্রি সমান এবং এখানে সূর্যরশ্মি কখনও হেলানভাবে পতিত হয় না। ফলে, এখানে **সমস্ত বৎসরই উষ্ণতার** অবস্থা প্রায় একপ্রকার। এখানকার বার্ষিক গড় উষ্ণতা ২৬-২৭° সে; বিভিন্ন মাসের উষ্ণতার পার্থক্য ১° হইতে ৫° সে মাত্র। কাজেই এখানে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মত কিছু সময় গ্রীষ্ম ও কিছু সময় শীত ঋতু দেখা যায় না। সমস্ত বৎসর এক (সাধারণ হিসাবে গ্রীষ্ম) ঋতু। তবে এখানে দিনের বিভিন্ন অংশে **উষ্ণতার পার্থক্য** অধিক। সেজন্য

প্রতিদিনই সকালের দিকে আরামদায়ক অবস্থা। তারপর বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা বৃদ্ধি। বিশেষতঃ ঐসঙ্গে আর্দ্রতারও বৃদ্ধি। সেজন্য দুপুরের চরম উষ্ণতার

পরে প্রায় রোজই বৃষ্টি হয়। তাহার পরে আবার উষ্ণতা ক্রমশঃ কমে। সন্ধ্যাকালে অবস্থা বেশ আরামদায়ক। মধ্য ও শেষ রাত্রিতে সামান্য শীত বোধ হয়।

এই অঞ্চলের জলবায়ু সম্পর্কে **সমুদ্রের প্রভাব** অধিক। এখানে অধিক উচ্চতার জন্য সমস্ত বৎসর বায়ুতে নিম্নচাপ। বস্তুতঃ ইহা একটি **স্থায়ী নিম্নচাপ অঞ্চল** (Low pressure belt)। স্বভাবতঃ আশপাশের সমুদ্র হইতে আর্দ্র বায়ু অনবরত এদিকে প্রবাহিত হয়। এখানে পৌঁছিয়া ঐ বায়ু সোজাসুজি উপর দিকে উঠিতে থাকে। (নিম্নচাপ অঞ্চলের বায়ুর ঊর্ধ্বপ্রবাহই স্বাভাবিক নিয়ম।) ইহাই **পরিচলন বায়ু** (Convection current of wind) নামে পরিচিত। কাজেই এখানে বায়ুর **শান্ত** (উপর দিকে প্রবাহ, পাশের দিকে প্রবাহের অভাব), **আর্দ্র** ও **উষ্ণ** অবস্থা। এজন্য গুমট ভাব খুব বেশী। তাহা মানুষের পক্ষে কষ্টদায়ক। দুপুরের দিকেই এই অবস্থা বেশী অনুভূত হয়। তাহার পূর্বেই আকাশ কালমেঘে আচ্ছন্ন হয়। দুপুরের পরেই **বজ্রবিদ্যুৎ** সহ **প্রচুর বৃষ্টি** হয়। এইরূপ বৃষ্টির জন্য পাহাড়, পর্বতের গায়ে বায়ুপ্রবাহের বাধা পাওয়া আবশ্যক নহে। বরং আর্দ্র বায়ু উপরে উঠিবার সময়ই ঘনীভূত ও মেঘে পরিণত হয়। এখানে সোজাসুজি নীচের দিকে বৃষ্টিপাত হয়। ইহাই **পরিচলন বৃষ্টি** নামে পরিচিত এখানকার বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণ গড়ে ২০০ সেমির অধিক। এখানে **প্রতি মাসেই বৃষ্টি** হয়। বস্তুতঃ বৃষ্টিহীন দিনের সংখ্যাও নিতান্ত কম। কাজেই এখানে দিনের বিভিন্ন অংশে আবহাওয়ার পার্থক্য সত্ত্বেও জলবায়ু অনেকটা **একঘেয়ে** (Monotonons)। অবশ্য সমুদ্রের **উপকূলে** সামুদ্রিক বায়ুর জন্য অবস্থা কিছুটা আরামদায়ক। উপকূল হইতে মধ্যভাগের দিকে অস্বস্তিকর অবস্থা ক্রমশঃ অধিক (এবিষয়ে এখানকার বিস্তীর্ণ বনের প্রভাবও উল্লেখযোগ্য।)

স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ—এখানকার বৎসরব্যাপী **উষ্ণ আর্দ্র**

জলবায়ু উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। কাজেই এখানে অধিক গাছ জন্মে ও গাছগুলি তাড়াতাড়ি বড় হয়। তাহাদের **ডালপালা অনেক** এবং **পাতাগুলি** বেশ **বড়** (প্রশস্ত পত্রযুক্ত)। এখানকার গাছের পাতা কখনও একসঙ্গে ঝরিয়া পড়ে না। (মৌসুমী অঞ্চলের শুষ্ক শীতকালের মত এখানে গাছের পত্রহীন অবস্থা দেখা যায় না। অর্থাৎ এখানে পর্ণমোচী গাছ নাই। অবশ্য পাতাগুলি স্বাভাবিক নিয়মে কিছু কিছু সব সময়ই ঝরিয়া পড়ে।) তাই এখানকার গাছগুলি **চিরহরিৎ** (Evergreen)। এখানকার গাছে **সমস্ত বৎসর নূতন পাতা** জন্মে, ফুল, ফলও জন্মে। এখানকার এক গাছের ডালপালা অনেক সময়ই অন্য গাছের ডালপালার সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং পরস্পর পরস্পরকে আঁকড়াইয়া রাখে। নানারকম লতাও এবিষয়ে সাহায্য করে। কাজেই এখানে বনের গাছ কাটা বেশ কষ্টকর। এখানে আবলুস, মেহগিনি, রবার প্রভৃতি মূল্যবান্ গাছ এবং অসংখ্য রকমের অন্যান্য গাছ জন্মে। এখানকার ঘন গাছপালা ও তাহাদের ডালার জন্য সমুদয় অঞ্চল অন্ধকার। বস্তুতঃ সূর্যের আলো ও উত্তাপ লাভের আশায় গাছগুলি যেন পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় অধিক উঁচু হইতে থাকে। উপর দিকে পরগাছা, ঝুলান লতাও প্রচুর। বনের বাহিরদিকে (বিশেষতঃ নদীর ধারে) ঝোপ জঙ্গল অধিক, কিন্তু বনের মধ্যভাগে খুব কম (আলোর অভাব এজন্য প্রধানতঃ দায়ী)।

এই অঞ্চলের বনের মধ্যে **আমাজন-অববাহিকার বন** সবচেয়ে বেশী বিস্তৃত ও ঘন। ইহা **সেলভাস** নামে পরিচিত। (এই অঞ্চল বহুদিন পর্তুগালের অধীন ছিল। এই শব্দও পর্তুগীজ।) এখানকার ও আফ্রিকার কঙ্গো-অববাহিকার বনে নানারকম শক্ত কাঠ, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি পাওয়া যায়। তবে বনের গাছ কাটা ও বন হইতে কাঠ সরবরাহের পরিমাণ কম। উপযুক্ত স্থলপথের অভাব, অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু, যানবাহনের অসুবিধা প্রভৃতি ইহার প্রধান কারণ।

জীবজন্তু ও প্রাণিজ সম্পদ—এখানকার ঘন বনে গরিলা, সিম্পাঞ্জী ও নানা প্রকার বানর অধিক। এগুলি **বৃক্ষচারী** প্রাণী। নানাপ্রকার পাখী, সাপ, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতিও এখানে অনেক। এখানকার একপ্রকার পোকা (Tse Tse) ও কতক পিপীলিকা বিষাক্ত। ঘন বনের জন্য এখানে বাঘ, হাতী, গণ্ডার, বন্য মহিষ প্রভৃতি **বৃহদাকার পশুর অভাব**। (তাহাদের পক্ষে এখানে বিচরণ কষ্টকর।) সেজন্য এই অঞ্চলে প্রাণিজ সম্পদের পরিমাণও কম। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চলে গরু, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি পালন করা হয়। এই অঞ্চলের নদনদীসমূহে মাছও প্রচুর। তাই এসকল স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে মাংস, দুধ, চর্ম, মাছ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

লোকবসতি ও জীবিকা—নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবায়ু মানুষের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। এখানকার অনেক জায়গা জলাভূমি ও বন অঞ্চল। এখানে হিংস্র জন্তুর উৎপাত এবং রোগের প্রাদুর্ভাবও অধিক। সেজন্য এখানে যাতায়াতের এবং জীবিকা অর্জনের সুযোগ কম। ফলে, এই অঞ্চলে **লোকবসতি খুব কম**; বহু স্থান জনহীন বা প্রায় জনহীন। এখানকার আদি অধিবাসিগণ প্রধানতঃ **নিগ্রো** জাতীয়। তবে ইউরোপের কতক লোকও এখানে আছে। কঙ্গো অঞ্চলে বেলজিয়ামের এবং ব্রেজিলে পর্তুগালের লোক অধিক। বন হইতে কাঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ সংগ্রহ, পশু ও মৎস্য শিকার স্থানীয় লোকদের প্রধান উপজীবিকা। জুম চাষ ও আধুনিক পদ্ধতিতে চাষও কতক লোকের প্রধান জীবিকা।

এশিয়ার দক্ষিণপূর্ব অংশের **মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার** অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক্। এখানে বসতি, যাতায়াত (প্রধানতঃ নৌপথ ও বিমানপথে) ও জীবিকা অর্জনের (কৃষি, খনিজ সম্পদ সংগ্রহ, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির মাধ্যমে) সুযোগ অধিক। সেজন্য এখানে **লোকবসতি অধিক**, স্থানে স্থানে বসতির ঘনত্ব মৌসুমী অঞ্চলের মত। এখানে এসকল বিষয়ে সুবিধার জন্য ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের কতক লোক এবং বহু ইউরোপীয়ও আসিয়া স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছেন। (ইন্দোনেশিয়া কিছুদিন পূর্বেও ওলন্দাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল।)

যাতায়াত ও পরিবহন—কঙ্গো ও আমাজন নদীর অববাহিকা অঞ্চলে গভীর বনের জন্য বিমানপথ ও স্থলপথে যাতায়াত ব্যবস্থা অনুন্নত। এমন কি, নদীর মধ্যদিয়া নৌকা, লঞ্চ, স্টীমার প্রভৃতির সাহায্যে যাতায়াতও যথেষ্ট অসুবিধাজনক। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াতে বন্ধুর ভূপ্রকৃতি ও বহু নদী, খাল প্রভৃতির জন্য স্থলপথ ও রেলপথের প্রসার বা উন্নতি অসুবিধাজনক। কিন্তু তথায় নৌপথ ও বিমানপথে যাতায়াতের সুযোগ অধিক। সিঙ্গাপুর, বাটাভিয়া প্রভৃতি আন্তর্জাতিক বিমানস্টেশন ও বন্দর।

অর্থনৈতিক উন্নতি—নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও **মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার** অর্থনৈতিক **উন্নতি অসামান্য**। পৃথিবীর প্রায় ৯০% স্বাভাবিক **রবার** এখানকার বিভিন্ন আবাদ (Rubber plantations) হইতে পাওয়া যায়। এখানে এপ্রকার আবাদ তৈরীর পক্ষে এখানকার উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু ও সামান্য ঢালু ভূপ্রকৃতি অত্যন্ত অনুকূল। তাহাছাড়া এখানকার **খনিজ সম্পদ** (টিন), **কৃষিজ সম্পদ** (ধান, আনারস, কলা, চা, কফি, কোকো প্রভৃতি) ও কতক **শিল্প** (চা, কার্পাস, রবার প্রভৃতি) অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক। এই অঞ্চল পৃথিবীর একটি প্রধান সমুদ্রপথের পাশে অবস্থিত বলিয়া এখানকার পক্ষে বিদেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ অধিক।

আফ্রিকার **কঙ্গো** কতক **অঞ্চলে খনিজ** সম্পদ (তাম্র, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি) পাওয়া যায়। (কাটাঙ্গার তাম্রখনি বিখ্যাত।) পশ্চিমে **গিনি** উপকূলে **কোকো** গাছের আবাদ অনেক। এসকল কারণে এখানকার কতক অংশের অর্থনৈতিক উন্নতি অধিক। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন-অববাহিকাতে বনজ রবার গাছের রস সংগ্রহ, কাঠ সংগ্রহ, বন্য পশু ও মৎস্য শিকারই অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তি। সুতরাং নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্যান্য স্থানের তুলনায় তথাকার উন্নতি কম।

(গ) উষ্ণমণ্ডলের (ক্রান্তীয়) তৃণভূমি (সাভানা) অঞ্চল

বিস্তৃতি—মহাদেশসমূহের উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত অংশের মধ্যভাগ সাধারণতঃ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এসকল স্থান উত্তর গোলার্ধে ৫-১০° উঃ অঃ হইতে ২৫-৩০° উঃ অঃ পর্যন্ত এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ৫-১০° দঃ অঃ হইতে ২৫-৩০° দঃ অঃ পর্যন্ত বিস্তৃত।
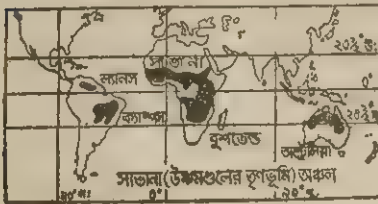
আফ্রিকাতে এই অঞ্চলের বিস্তার সর্বাপেক্ষা অধিক। তথাকার মধ্যভাগের বিস্তীর্ণ অংশ (নিরক্ষীয় অঞ্চলের কঙ্গো-অববাহিকার চারিপাশ) ও তাহার উত্তরপূর্বে সুদান এই অঞ্চলের অন্তর্গত। দক্ষিণ আমেরিকাতে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দক্ষিণপূর্বে (ব্রেজিলের কতক অংশ) ও উত্তরে ভেনিজুয়েলা এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। অস্ট্রেলিয়ার উত্তরদিকের কতক স্থান (উত্তর উপকূল ভিন্ন) এই অঞ্চলের অন্তর্গত। **ভূপ্রকৃতি** হিসাবে এই সমুদয় অঞ্চল প্রায় এক জাতীয় (মালভূমি)।

জলবায়ু—এই সকল স্থান ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া উত্তর গোলার্ধের অন্তর্গত অংশে মে-জুন মাসে (তথাকার গ্রীষ্মকালে) এবং দক্ষিণ গোলার্ধের অন্তর্গত অংশে ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে (তথাকার গ্রীষ্মকালে) উষ্ণতা অধিক (২৭-২৮° সে)। প্রত্যেক অংশে নিজ নিজ শীতকালে উষ্ণতা কম (১০-১৫° সে)। সেজন্য এই অঞ্চলে **গ্রীষ্ম ও শীতকালের উষ্ণতার পার্থক্য** অধিক (গড়ে ১৫° সে) এখানে **দিবাভাগ ও রাত্রির উষ্ণতার পার্থক্যও** প্রায় ঐরূপ। বিশেষতঃ মরু অঞ্চলের পাশের স্থানসমূহের শীত-গ্রীষ্ম ও দিবারাত্রির উষ্ণতার পার্থক্য অধিক, আর নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে বৎসরের বিভিন্ন মাসের পার্থক্য কম।

এই অঞ্চলের উপর দিয়া সাধারণতঃ **আয়ন বায়ু** (উত্তর অংশে উত্তরপূর্ব আয়ন বায়ু ও দক্ষিণ অংশে দক্ষিণপূর্ব আয়ন বায়ু) প্রবাহিত হয়। ঐ বায়ুর আর্দ্রতা মহাদেশ-

সমূহের পূর্ব উপকূল হইতে মধ্যভাগের দিকে ক্রমশঃ কম। ফলে, এই অঞ্চলেরও মধ্যভাগের দিকে **বৃষ্টি** ক্রমশঃ **কম** (২৫-৫০ সে.মি.)। নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে বৃষ্টি বেশী, পূর্ব উপকূলের দিকেও বেশী। উপকূলের দিকে মাঝে মাঝে প্রবল ঝড়ও হয়।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ– এখানকার উষ্ণ স্বল্প আর্দ্র জলবায়ু বড় গাছের পক্ষে বিশেষ অনুকূল নহে, কিন্তু তৃণগুল্মের পক্ষে অনুকূল। সেজন্য এখানে আছে **বিস্তীর্ণ তৃণভূমি**। এখানকার **ঘাস** নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমির ঘাসের মত কোমল নহে, বরং বেশ **বড়** (৩-৪ মিটার পর্যন্ত উঁচু), মোটা ও শক্ত। মাঝে মাঝে বড় **গাছ**ও আছে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে গাছের সংখ্যা অধিক, আর মরু অঞ্চলের দিকে কম। এই অঞ্চলের মধ্যভাগের অবস্থাই এখানকার স্বাভাবিক রূপ। অবশ্য **গ্রীষ্মকালের** প্রখর উত্তাপে ঘাসগুলি যেন পুড়িয়া যায়, আবার **বৃষ্টির পর** নূতন ঘাসের জন্ম হয়। এপ্রকার তৃণ আগে কেবল বন্য পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। এখন কাগজ তৈরীর উপাদান হিসাবে ইহাদের ব্যবহার বাড়িতেছে। তাহাছাড়া এই অঞ্চলের ক্রমশঃ অধিক পশুপালনের ব্যবস্থা হইতেছে।

সাভানা অঞ্চলের বড় ঘাস ও গাছ।

নামকরণ—এখানকার অবস্থিতি ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের জন্য এই জঙ্গল **উষ্ণ মণ্ডলের** বা **ক্রান্তীয় তৃণভূমি** নামে পরিচিত। আফ্রিকাতে এপ্রকার অবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং সেখানে এই অঞ্চল **সাভানা অঞ্চল** নামে পরিচিত। সুদানে ইহা যথেষ্ট বিস্তৃত বলিয়া ইহাকে **সুদানী অঞ্চল**ও বলা হয়। এই অঞ্চলের অন্যান্য অংশ দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলাতে **ল্যানস্** (Llanos), বলিভিয়াতে **মণ্টানা**, ব্রেজিলে **ক্যাম্পস্**, আর্জেন্টিনাতে **এল্‌গ্র্যান চাকো** বা **শাকো**, আফ্রিকার দক্ষিণ অংশে **বুশভেল্ড** প্রভৃতি নামে পরিচিত।

জীবজন্তু ও প্রাণিজ সম্পদ—এই অঞ্চল **হাতী, জিরাফ, জেব্রা, হরিণ,** খরগোশ প্রভৃতি **তৃণভোজী প্রাণীর** স্বাভাবিক বাসভূমি। তবে ইহাদের মাংসের লোভে **বাঘ, সিংহ,** চিতাবাঘ, ভল্লুক প্রভৃতি **মাংসাশী** প্রাণীও আশপাশের অপেক্ষাকৃত ঘন ঝোপজঙ্গলে বাস করে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের নিকটবর্তী অংশে বানর, পাখী প্রভৃতি অধিক ; আর মরু অঞ্চলের ধারে এমু, অস্ট্রিচ প্রভৃতি বড় (স্থলচর) পাখী বেশী। এখানকার প্রাণিজ সম্পদের মধ্যে নানাপ্রকার পশুর চর্ম, অস্থি, হাতীর দাঁত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

লোকবসতি ও জীবিকা—এই অঞ্চলের জলবায়ু মানুষের বসতি ও জীবিকার পক্ষে বিশেষ অনুকূল নহে। সেজন্য এখানকার **লোকবসতি কম**। আগে বহু স্থান প্রায় জনহীন ছিল এবং অনেক লোক **যাযাবরের** জীবন যাপন করিত। আজও এরূপ লোকের সংখ্যা যথেষ্ট (তাঁহারা পশুর দলসহ ঘুরিয়া বেড়ান)।

আগেকার দিনে এখানকার লোকের প্রধান জীবিকা ছিল **পশুশিকার**। তাই এই অঞ্চলকে বহুদিন "শিকারীদের স্বর্গ" বলিয়াও বর্ণনা করা হইত। এখন শিকারের সুযোগ অনেক কম। (বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য বিস্তর ব্যবস্থা হইয়াছে)। তাহাছাড়া অনেক জায়গাকে উৎকৃষ্ট চারণভূমিতে (Ranching ground or ranch) পরিণত করা হইয়াছে। এসকল স্থানে দলে দলে গরু, ঘোড়া, মেষ প্রভৃতি **পশু পালন** করা হয়। অনেক সময় পশুপালক ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া পশুর দলের পাহারা দেন।

তাহাছাড়া এসকল অঞ্চলের কতক অংশ **কৃষিকার্যে**ও ব্যবহৃত হইতেছে। ফলে, এখানকার কতক লোকের তাহাই ক্রমশঃ প্রধান জীবিকাতে পরিণত হইতেছে।

যাতায়াত ও পরিবহন—এই অঞ্চলে স্থলপথ অনেক, কিন্তু রেলপথ এখনও কম। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্থলপথ, রেলপথ ও বিমানপথের ক্রমশঃ অধিক উন্নতি হইবে। এখানে নৌপথের সুযোগ কম। (নদী কম, সমুদ্রও বহুদূর।)

অর্থনৈতিক উন্নতি—আগেকার দিনে পশুর চর্ম, অস্থি, হাতীর দাঁত প্রভৃতি সরবরাহ ছিল এখানকার অর্থনৈতিক উন্নতির মূল ভিত্তি। ক্রমশঃ এখানে গরু, ঘোড়া, মেষ প্রভৃতি পশুপালন এবং কার্পাস, ভুট্টা, আখ প্রভৃতি ফসলের চাষ বৃদ্ধির ফলে এখানকার অর্থনৈতিক অবস্থার **ক্রমশঃ উন্নতি** হইতেছে। ভবিষ্যতে এই সকল উপাদানের সাহায্যে নানারকম শিল্পও উন্নতিলাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

(ঘ) উষ্ণ মরু অঞ্চল

বিস্তৃতি—মহাদেশসমূহের উষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত অংশের মধ্যভাগ হইতে পশ্চিম-দিকের স্থানসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। উত্তর গোলার্ধের স্থানসমূহ কর্কটক্রান্তির এবং দক্ষিণ গোলার্ধের স্থানসমূহ মকরক্রান্তির আশপাশে বিস্তৃত। **আফ্রিকাতে** এই অঞ্চলের বিস্তৃতি **সর্বাপেক্ষা অধিক**। উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম সীমা হইতে এশিয়ার আরব, ইরান হইয়া পাকিস্থানের ও ভারতের থর পর্যন্ত উষ্ণ মরু বিস্তৃত।
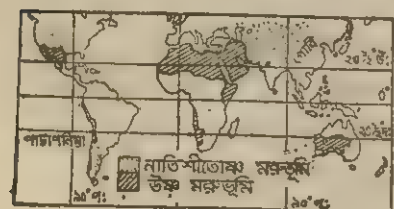
উত্তর আমেরিকাতে মেক্সিকোর সামান্য অংশের অবস্থা এইরূপ। আর দক্ষিণ গোলার্ধে

অস্ট্রেলিয়ার মধ্যভাগ হইতে পশ্চিম অংশ, দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিমদিকের কতক অংশ ও দক্ষিণ আমেরিকার চিলির উত্তর অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই সমুদয় অঞ্চলের মধ্যে ভূপ্রকৃতি হিসাবে পার্থক্য সামান্য; অধিকাংশ স্থান মালভূমি।

জলবায়ু—এই অঞ্চলের অবস্থিতি (ক্রান্তিবৃত্তের পাশে), মৃত্তিকা (প্রস্তর ও বালুকাময়) প্রভৃতির প্রভাবে নিজ নিজ **গ্রীষ্মকালের** (উত্তর গোলার্ধে মে-জুন, দক্ষিণ গোলার্ধে ডিসেম্বর-জানুয়ারী) **উষ্ণতা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক** (৩৮° সে)। অপরদিকে শীতকালের উষ্ণতা খুব কম ১০-১৫° সে)। সেজন্য এখানে **গ্রীষ্ম ও শীতকালের উষ্ণতার পার্থক্য** পৃথিবীর মধ্যে **সর্বাপেক্ষা অধিক**
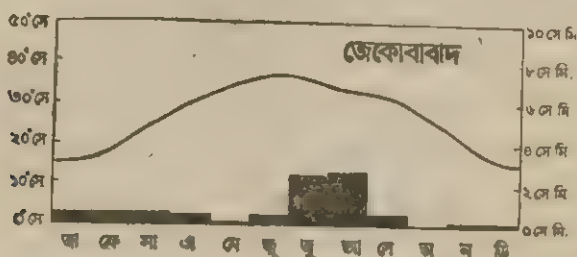
(২৮-৩০° সে)। এখানে দিবা ও রাত্রির উষ্ণতার মধ্যেও পার্থক্য খুব বেশী। এখানে দিবাভাগে প্রচণ্ড উত্তাপ পাওয়া গেলেও রাত্রিতে শীত লাগে, এমন কি তুষারপাত হইতে পারে। উষ্ণতার এইপ্রকার পার্থক্য শিলাসমূহের চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া ও বালুকা সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক। বালুকা দিবাভাগে, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে, অধিক উত্তপ্ত হয়, আবার রাত্রিতে অধিক শীতল হয়। প্রস্তরেরও এই অবস্থা। কাজেই **প্রস্তর ও বালুকাময়** ভূমি মরুভূমি সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক। প্রস্তরময় বিরাট মরুভূমিকে **হামাদা** ও বালুকাময় প্রকাণ্ড মরুভূমিকে **এর্গ্** বলে।

গ্রীষ্মকালের এরূপ প্রচণ্ড উষ্ণতার জন্য তথাকার **বায়ু** অত্যন্ত শুষ্ক। তাই তখন বৃষ্টি হইতে পারে না। আয়ন বায়ু ঐ অঞ্চলে পৌছাইলেও স্থলভাগের উপর দিয়া বহুদূর প্রবাহের ফলে তাহা থাকে শুষ্ক। কাজেই তাহা দ্বারাও বৃষ্টি হয় না। তারপর নিরক্ষীয় অঞ্চল হইতে যে আর্দ্র বায়ু অনবরত উপরদিকে প্রবাহিত হয়, তাহার কতক অংশ ক্রান্তীয় অঞ্চলে নামিয়া আসে। নীচে নামিবার সময় বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি হয় এবং জলীয় বাষ্প-ধারণের ক্ষমতা বাড়ে। কাজেই তাহা দ্বারাও তথায় বৃষ্টি হয় না। কাজেই এই অঞ্চল **সমস্ত বৎসরই বৃষ্টিহীন**। কোন কোন বৎসর ১০-২০ সে মি বৃষ্টি হইতেও পারে, আবার কতক স্থানে বৎসরে ৫ সেমিও বৃষ্টি হয় না।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ—শুষ্ক অঞ্চল উদ্ভিদের জন্মের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক। এজন্য এখানকার বহু স্থান প্রায় উদ্ভিদ্‌শূন্য, আর কতক স্থানে

সামান্য উদ্ভিদ্ জন্মে। এখারকার উদ্ভিদের কতক **বৈশিষ্ট্য** উল্লেখযোগ্য। যেমন, পাতার মধ্যদিয়া যাহাতে উদ্ভিদের জলীয় পদার্থ বাহির হইয়া যাইতে না পারে, সেজন্য উদ্ভিদ্ পাতাশূন্য, অথবা যে সামান্য পাতা জন্মে সেগুলি তৈলাক্ত। আত্মরক্ষার জন্য উদ্ভিদ কাঁটাযুক্ত। জল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য উদ্ভিদের ছাল পুরু ও শিকড় দীর্ঘ। ফণিমনসা, পান্থপাদপ, বাবলা প্রভৃতি কাঁটাযুক্ত গুল্ম ও খেজুর গাছ মরুভূমির উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ্। তথাকার কোন স্থানে ভূত্বকের নীচে জল থাকিলে তথায় অধিক উদ্ভিদ্ জন্মে। এরূপ স্থানকে **মরূদ্যান** (Oasis) বলে। মরুভূমির কতক অংশে নিকৃষ্ট তৃণও জন্মে।

খেজুর ও নানারকম কাঁটা মরুভূমির প্রধান উদ্ভিজ্জ সম্পদ।

জীবজন্তু ও প্রাণিজ সম্পদ- জল ও উদ্ভিদের অভাব বশতঃ এখানে জীবজন্তু কম। উট এখানকার সর্বপ্রধান জীব। (ইহা জল পান না করিয়া কয়েক দিন বাঁচিতে পারে।) নিকৃষ্ট তৃণভূমিতে ঘোড়া, মেষ, গাধা প্রভৃতি পালন করা হয়। এখানে উটপাখীও বাস করে। উটের দুধ ও মাংস এখানকার প্রধান প্রাণিজ সম্পদ।

লোকবসতি ও জীবিকা—রুক্ষ জলবায়ু, উত্তপ্ত বালুকারাশি, খাদ্য ও জলের অভাব, যাতায়াত ও জীবিকার অসুবিধা প্রভৃতি কারণে মরুভূমির বহু স্থান জনহীন, বাকী অংশেও লোকবসতি খুব কম। অনেকেই **যাযাবর** (পশুর দলসহ ঘুরিয়া বেড়ান)। তন্মধ্যে বেদুইনগণ প্রসিদ্ধ। খেজুরের ব্যবসা, উট ও অন্যান্য পশুপালন, পথিকগণকে পথ দেখানো প্রভৃতি এখানকার লোকের জীবিকা। কতক মরূদ্যানে সেচের সাহায্যে সামান্য ফসল উৎপাদনও কতক লোকের জীবিকা।

যাতায়াত ও পরিবহন—মরুভূমিতে যাতায়াত ও পরিবহনের জন্য **উটের** উপরই নির্ভরতা সবচেয়ে বেশী। এখানে উটের এক একটি বড় দল (Caravan) প্রচুর মালপত্র ও লোকজন লইয়া যাতায়াত করে। সেজন্য সেখানকার উটকে মরুভূমির জাহাজও বলা হয়। ঘোড়াও একাজে কিছু কিছু ব্যবহৃত হয়। ক্রমশঃ মোটরগাড়ীতে এবং বিমানপোতের সাহায্যে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হইতেছে।

অর্থনৈতিক উন্নতি—বহুকাল উট ও খেজুরই ছিল বিভিন্ন মরুভূমির প্রধান সম্পদ। ক্রমশঃ মরুভূমির স্থানে স্থানে **খনিজ দ্রব্যের** সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমির কতক অংশে স্বর্ণখনি আছে। দক্ষিণ আমেরিকার চিলির আটাকামা' মরুভূমিতে তাম্র ও নাইট্রেট (এক প্রকার খনিজ লবণ), পেরুতে খনিজ তৈল, আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিতে লবণ, দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমিতে তাম্র, এশিয়ার আরব দেশে খনিজ তৈল পাওয়া যায়। মরুভূমিতে একমাত্র নদীতীরে ও কতক মরূদ্যানে সামান্য চাষ-আবাদ হয়। এবিষয়ে মিশরের অবস্থা নিতান্তই

ব্যতিক্রম। তথায় নীলনদের উপর আগেকার বাঁধগুলি এবং নূতন আসোয়ান বাঁধ ও পাশে 'নাসের সাগর' তৈরীর ফলে জলসেচের সাহায্যে যথেষ্ট চাষ-আবাদ হয়। মরু অঞ্চলে শিল্পের সুবিধা খুব কম। ফলে, এখানকার অর্থ নৈতিক অবস্থা এখনও অনুন্নত।

নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল

ভূপৃষ্ঠের প্রায় অর্ধেক স্থান নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। মোটামুটি হিসাবে উত্তর গোলার্ধে কর্কটক্রান্তি ও সুমেরু বৃত্তের মধ্যে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে মকরক্রান্তি ও কুমেরু বৃত্তের মধ্যে এই অঞ্চল বিস্তৃত। এরূপ বিস্তীর্ণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের কতক অংশ উষ্ণ অঞ্চলের পাশে অবস্থিত বা উষ্ণতর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল (Warm Temperate zone), কতক অংশ শীতল অঞ্চলের পাশে বা শীতলতর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল (Cool Temperate zone)। আর এই দুইয়ের মধ্যভাগ প্রকৃত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। (আমাদের মত উষ্ণ মণ্ডলের লোকের কাছে তাহাও মৃদুশীতল।) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পূর্বদিকের অংশে সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে ও পশ্চিমদিকের অংশে শীতকালে বৃষ্টি হয়। মধ্যভাগের অধিকাংশ জায়গাতেই বৃষ্টি অতি সামান্য। এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে বায়ুর উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, উদ্ভিদ প্রভৃতির পার্থক্য অনুসারে এই অঞ্চল নিম্নলিখিত ছয় ভাগে বিভক্ত।

(ক) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল

বিস্তৃতি -মহাদেশসমূহের পশ্চিম অংশে উত্তর গোলার্ধে ৩০-৪০° উঃ অঃ-এর মধ্যভাগের এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ৩০°-৪০ দঃ অঃ-এর মাঝখানের স্থানসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। সুতরাং ইহা উষ্ণতর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পশ্চিম অংশ। ভূমধ্যসাগরের আশপাশের বেশীর ভাগ জায়গা, যেমন—ইউরোপের দক্ষিণ অংশ, এশিয়ার পশ্চিম অংশ ও আফ্রিকার উত্তর অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। তাই এই সকল স্থানকে বলা হয় **ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল**। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণপশ্চিম অংশে ক্যালিফোর্নিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম অংশে চিলির মধ্যভাগ, আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমার কতক অংশ এবং অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশেও জলবায়ু, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি এরূপ। তাই জলবায়ু অঞ্চল হিসাবে এসকল স্থান ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। এই সকল অংশের মধ্যে ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে পার্থক্য কম।
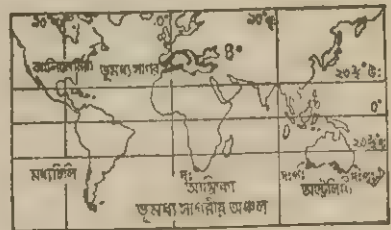
জলবায়ু—এই সকল স্থানের নিজ নিজ **গ্রীষ্মকালে** অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে মে-জুন মাসে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ২১°-২৭° সে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উপকূল হইতে মধ্যভাগের দিকে গ্রীষ্মকালে উষ্ণতার পরিমাণ ক্রমশঃ বেশী।
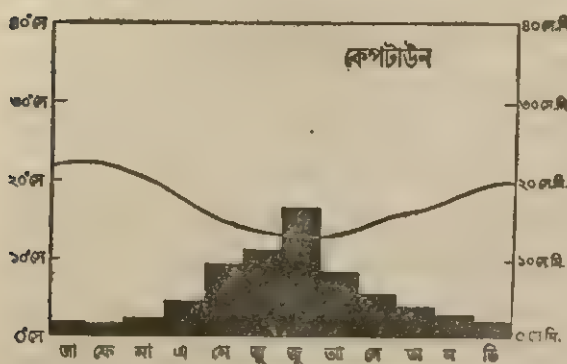
এই অঞ্চলের প্রত্যেক স্থানে নিজ নিজ **শীতকালে** উষ্ণতা থাকে মাত্র ১০°-১৩° সে। কিন্তু তখন তথায় উজ্জ্বল **সূর্যকিরণ** পাওয়া যায়। সেজন্য তখনও অধিক শীত বোধ হয় না। পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির ফলে উত্তর গোলার্ধের শীতকালে (ডিসেম্বর-জানুয়ারী) **বায়ুবলয়সমূহ** কিছুদূর দক্ষিণে সরিয়া যায়। তখন দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। আর দক্ষিণ গোলার্ধের শীতকালে (মে-জুন) বায়ুবলয়সমূহ কিছুদূর উত্তরে সরিয়া যায়। তখন উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। তাই উত্তর ও দক্ষিণ দুই গোলার্ধের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে নিজ নিজ **শীতকালে** ঐ সকল স্থানের উপর দিয়া **পশ্চিমাবায়ু** প্রবাহিত হয় এবং তাহাদ্বারা ঐ সকল স্থানে ৫০-১০০ সেঃ মিঃ **বৃষ্টি হয়**। উপকূল হইতে মধ্যভাগে শীতকালে শীত বেশী, বৃষ্টি কম।

এখানে বৃষ্টিপাত সম্পর্কে দুইটি **বৈশিষ্ট্য** উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, এখানে বৃষ্টিপাতের সহিত শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে চাপবলয় ও বায়ুবলয়সমূহের স্থান পরিবর্তনের সম্পর্ক সুস্পষ্ট। দ্বিতীয়তঃ, ক্রান্তীয় অঞ্চলের দিক্ হইতে ক্রমশঃ দূরের (মেরুর) দিকে শীতকাল অনেক বেশী দিন স্থায়ী এবং তথায় বৃষ্টিপাতের সময় এবং পরিমাণ বেশী।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ—এখানে শীতকালে যথেষ্ট বৃষ্টি হয়। তাই তখন এখানে চাষাবাদ হয়। গ্রীষ্মকালে এখানে বৃষ্টি হয় না। তাই তখন এখানকার স্বাভাবিক উদ্ভিদগুলির যাহাতে কোন ক্ষতি না হয় সেই উদ্দেশ্যে গাছগুলি শীতকালেই বৃষ্টির সময় প্রচুর জল সঞ্চয় করিয়া রাখে। আর গাছের জল যাহাতে সহজে বাষ্পীভূত হইতে না পারে সেজন্য এখানকার অনেক গাছের পাতা ও ছাল পুরু, কতক গাছের পাতার উপর আছে মোমের বা তেলের প্রলেপের মত পদার্থ বা পাতা শুঁয়ো দ্বারা ঢাকা থাকে। তাহাছাড়া আশপাশের জায়গা হইতে অধিক রস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কতক গাছের শিকড় পেঁয়াজের মত, আর বহু নীচ হইতে রস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কাহারও

শিকড় খুব দীর্ঘ। জল সঞ্চয়ের ফলে এখানকার গাছগুলি সাধারণতঃ **চিরহরিৎ** জাতীয়। এরূপ গাছের মধ্যে চেস্টনাট, সিডার, কর্ক ওক, তুঁত (Mulberry) প্রভৃতি প্রধান। (তুঁতগাছের কচিপাতার সাহায্যে পালন করা হয় প্রচুর গুটিপোকা। তাহার গুটির সাহায্যে উৎপন্ন হয় খাঁটি রেশম।) অস্ট্রেলিয়াতে এরূপ অঞ্চলে জন্মে ইউক্যালিপ্‌টাস জাতীয় জারা ও কৌরী গাছ। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অ লভ, বাদাম, আখরোট, কমলালেবু প্রভৃতি ফলের গাছও প্রচুর।

জীবজন্তু ও প্রাণিজ সম্পদ্—এই অঞ্চলে তৃণভূমি কম; সেজন্য মেষ, ছাগ, গরু প্রভৃতি পশুও কম। তবে স্পেন দেশের তৃণভূমিতে ছাগ ও বিখ্যাত **মেরিনো মেষ** অনেক। (এই অঞ্চলে ঘন বন নাই; তাই বন্য ও হিংস্র জীবজন্তু প্রায় দেখাই যায় না।) খাঁটি রেশম, মেরিনো মেষের উৎকৃষ্ট পশম প্রভৃতি এখানকার প্রধান প্রাণিজ সম্পদ। এখানে ঘি কম; তাই অলিভ তৈলের উৎপাদন ও চাহিদা অধিক।

অর্থনৈতিক উন্নতি—এই অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টিপাতের ফলে যথেষ্ট **চাষ-আবাদ** হয়। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী **আঙ্গুর** ও **কমলালেবু** এবং প্রচুর বাদাম, আখরোট, পিচ, আপেল, অলিভ প্রভৃতি ফল ও **গম** এখানে জন্মে। প্রচুর আঙ্গুর ও তুঁতগাছ জন্মে বলিয়া এখানকার **মদ্য** ও **রেশম শিল্প** বিখ্যাত। তাহাছাড়া এখানে প্রচুর অলিভ তৈল (Olive oil), সাবান প্রভৃতি তৈরী হয়।

এই অঞ্চলের অন্তর্গত উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াতে **খনিজ তৈল** এবং ইউরোপের ইটালিতে সুন্দর **মার্বেল** পাথর প্রভৃতি পাওয়া যায়। তার উপর ক্যালিফোর্নিয়ার হলিউডের উজ্জ্বল আকাশ ও চমৎকার জলবায়ুর জন্য তথাকার **চলচ্চিত্র** (Cinematography) শিল্প বিশেষ উন্নত।

অধিবাসী ও উপজীবিকা—এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম, যাতায়াত ব্যবস্থাদি উন্নত। তার উপর এখানে জীবিকা অর্জনের সুবিধা বেশী। ফলে, এখানে বহু লোক বাস করেন। কৃষি, শিল্প প্রভৃতি এখানকার অধিকাংশ লোকের জীবিকা। বিভিন্ন দেশ হইতে বহু ভ্রমণকারী এখানে আসেন। তাই এখানে হোটেলের ব্যবসায় দ্বারাও অনেকে জীবিকা অর্জন করেন।

যাতায়াত ও পরিবহন—এই অঞ্চলে পূর্বকালে বড় বড় নৌকা ও কাঠের জাহাজের সাহায্যে নৌপথে ও উট, গাধা, ঘোড়া প্রভৃতির সাহায্যে স্থলপথে মানুষ যাতায়াত ও জিনিসপত্র আমদানি-রপ্তানি করিতেন। বহু প্রাচীনকালেও **গ্রীস, রোম** (ইটালি) প্রভৃতি শিক্ষা, সভ্যতা ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। ভূমধ্যসাগরীয়

অঞ্চলে এখন **স্থলপথে**, **রেলপথে**, **আকাশপথে** এবং **জলপথে** যাতায়াতের সুবিধা খুব বেশী।

(খ) পূর্ব্ব উপকূল (চীনদেশীয়) অঞ্চল

বিস্তৃতি—মহাদেশসমূহের পূর্ব অংশে ৪০-৫০° সমাক্ষরেখার মধ্যভাগের স্থানসমূহ, অর্থাৎ উষ্ণতর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পূর্বভাগ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। চীনের মধ্য ও উত্তর অংশ, জাপানের ও কোরিয়ার দক্ষিণ অংশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের, আফ্রিকার ও অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

জলবায়ু—এই অঞ্চলের **গ্রীষ্মকালের** উষ্ণতা ২১-২৭° সে (ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের তখনকার উষ্ণতার মত)। তখন মধ্যভাগের দিকে উষ্ণতার পরিমাণ ক্রমশঃ বেশী। তাই তখন মধ্য অংশে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। ফলে, পূর্ব-দিকের সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু মধ্যভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। তাহাছাড়া তখন (উত্তর গোলার্ধের গ্রীষ্মকালে) চাপবলয় ও বায়ুবলয়গুলি

মার্কুইরিয়,সার্জেলীয় জলবায়ু চীনদেশীয় জলবায়ু

উত্তরদিকে সরিয়া থাকে। সেজন্য তখন এই অঞ্চলে আয়নবায়ুর প্রভাব যথেষ্ট। ফলে, তখন এই অঞ্চলে মধ্যম রকম **বৃষ্টি** হয়। **শীতকালে** এখানে উষ্ণতা থাকে ১০-১৩° সে। (এসময়ের উষ্ণতার অবস্থাও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উষ্ণতার মত।) তবে কখন কখন মধ্যভাগে উষ্ণতা হিমাঙ্কের কাছাকাছি নামিয়া যায় এবং তখন এখানে উচ্চ চাপের সৃষ্টি হয়। তাই তখন মধ্যভাগ হইতে শীতল বায়ু বাহির দিকে প্রবাহিত হয়। ঐ বায়ুতে আর্দ্রতা কম। সেজন্য তখন এখানে বৃষ্টি হয় না। তবে অধিক শীতে ঐ বায়ুর প্রভাবে **তুষারপাত** হয়। এখানকার উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের অবস্থা কিছুটা মৌসুমী অঞ্চলের মত। তবে এই অঞ্চল ক্রান্তিবৃত্তের অল্প দূরে বলিয়া ইহাকে **আর্দ্র উপক্রান্তি অঞ্চল** (Humid Sub-tropical region) বা **উষ্ণতর নাতিশীতোষ্ণ মৌসুমী অঞ্চল** (Warm Temperate Monsoon region or Warm Temperate Eastern Margin type) বলা হয়। এরূপ জলবায়ুর প্রভাব চীনদেশের পূর্ব অংশের মধ্যভাগে সবচেয়ে বেশী। এজন্য ইহাকে **চীনদেশীয় জলবায়ুও** (China type) বলে।

এই অঞ্চলে মধ্যে মাঝে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হয়। চীন, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

পূর্বদিকের অংশে টাইফুন, ব্রেজিলের পূর্বদিকের অংশে পাম্পেরো, অস্ট্রেলিয়ার পূর্বদিকের অংশে সাদার্লি বাস্টার প্রভৃতি ঘূর্ণবাত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

দক্ষিণ গোলার্ধের ৪০-৫০° দঃ অক্ষাংশে স্থলভাগ কম এবং সমুদ্র অধিক বিস্তৃত। তাই তথাকার জলবায়ু অন্যরূপ। তথায় সমুদ্রের প্রভাবে শীতকালে বেশী শীত পড়ে না এবং উচ্চ চাপের সৃষ্টি হয় না। সেখানে সর্বদা আয়ন বায়ুর প্রভাব অধিক এবং সেজন্য প্রায় সমস্ত বৎসর বৃষ্টি হয়।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ—উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুর জন্য পূর্ব উপকূল অঞ্চলে **চিরহরিৎ** ও **পর্ণমোচী** বৃক্ষের **মিশ্র বনভূমি** যথেষ্ট বিস্তৃত। এখানে ওক, চেস্টনাট, বীচ প্রভৃতি গাছ অধিক। উচ্চভূমি অংশে (পাহাড়, পর্বতে) আছে পাইন, ফার প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি। এখানকার বনের নানারকম (মিশ্র জাতীয়) গাছের কাঠ মূল্যবান্। এখানে মৌসুমী অঞ্চলের মত বাঁশ, কর্পূর, তালজাতীয় গাছ, নানারকম গুল্ম প্রভৃতিও যথেষ্ট।

জীবজন্তু ও প্রাণিজ সম্পদ্—এখানকার বন অঞ্চলে বাঘ, হাতী, গণ্ডার, বাইসন প্রভৃতি নানারকম প্রাণী বাস করে। আর এই অঞ্চলের তৃণভূমিতে প্রচুর **গরু, মহিষ**, শূকর, ঘোড়া প্রভৃতি পশু পালন করা হয়। মাংস, দুধ, চর্ম প্রভৃতি প্রাণিজ সম্পদ্ এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। জাপানে তৃণভূমি খুব কম; তাই তথায় পশুর সংখ্যাও কম। এই অঞ্চলে সমুদ্রে মাছ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ **জাপানের** উপকূলে ধরা পড়ে পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী মাছ**।

অর্থনৈতিক উন্নতি—এখানকার যে অংশে উষ্ণ মৌসুমী অঞ্চলের মত বৃষ্টি বেশী, তথায় **ধান, কার্পাস, তুঁতগাছ, চা, আখ** প্রভৃতি ফসল জন্মে, আর যেখানে বৃষ্টি কম তথায় জন্মে **সয়াবীন** বা **ভাটকলাই, গম** ও **যব**।

অধিবাসী ও উপজীবিকা—এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। যাতায়াত, জীবিকা অর্জন প্রভৃতি বিষয়েও এখানে বিশেষ সুবিধা আছে। তাই এখানে লোকবসতি অধিক। **চীনদেশের লোকসংখ্যা** পৃথিবীতে প্রথম। তাহাদের অধিকাংশ বাস করেন দেশের পূর্বদিকের অংশে (এই অঞ্চলে)। **কৃষি** ও **পশুপালন** তাহাদের অনেকের প্রধান উপজীবিকা। চীন, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই অঞ্চলের অন্তর্গত অংশে কার্পাস, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতি শিল্প বিশেষ উন্নত। অস্ট্রেলিয়াতেও **শিল্পসমূহ** ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে। অন্যান্য অংশে শিল্পসমূহ তেমন উন্নত নহে।

যাতায়াত ও পরিবহন—এই অঞ্চলের **স্থলপথ, রেলপথ, সমুদ্রপথ**

এবং **আকাশপথে** যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত। এখানে নদ-নদীও অনেক। তাই তাহাদের মধ্য দিয়া বহু নৌকা ও স্টীমার যাতায়াত করে।

(গ) পশ্চিম উপকূল (মৃদুশীতল সামুদ্রিক) অঞ্চল

বিস্তৃতি—নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মধ্যভাগের পশ্চিম অংশে অর্থাৎ মহাদেশসমূহের পশ্চিম অংশে ৪৫-৬৫° অক্ষরেখার মাঝখানের স্থানসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। উত্তর গোলার্ধে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জসহ উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, ক্যানাডার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ, যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম অংশ এবং দক্ষিণ গোলার্ধে চিলির দক্ষিণ অংশ, টাস্‌মেনিয়া, নিউজীল্যাণ্ড প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

জলবায়ু—এই অঞ্চলে **গ্রীষ্মকালে** বায়ুর উষ্ণতা ১৫-১৮° সে, এবং **শীতকালের** উষ্ণতা ২-৫° সে। কাজেই এখানকার উভয় ঋতুর উষ্ণতাই পাশের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উষ্ণতার তুলনায় অনেক কম। কিন্তু এখানকার বরাবর মহাদেশসমূহের মধ্যভাগের উষ্ণতার তুলনায় বেশী। এবিষয়ে এখানকার পাশে সমুদ্রের অবস্থিতি ও তাহার প্রভাব উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলে **সমস্ত বৎসর পশ্চিমা বায়ু** প্রবাহিত হয়, তবে শীতকালেই তাহার বেগ অধিক। সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবাহিত বায়ুর মধ্যে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকে। সেজন্য এখানে প্রায় সমস্ত বৎসর **বৃষ্টি** হয়, তবে **শীতকালেই** বেশী। তাহাছাড়া এখানকার উপকূল অঞ্চলে প্রায় সমস্ত বৎসর মাঝে মাঝে মৃদু ঝড় হয়; শীতকালে তাহার প্রকোপ বেশী। ইহাদের দ্বারা মানুষের জীবনে সজীবতা ও বৈচিত্র্য আসে। (এরূপ ঝড় পূর্ব উপকূলের টাইফুন, হারিকেন প্রভৃতির ঝড়ের তুলনায় অনেক মৃদু।) এখানে শীতকালে মাঝে মাঝে তুষারপাত হয়। এখানকার বিভিন্ন অংশের ভূপ্রকৃতির পার্থক্য এবং সমুদ্র হইতে দূরত্বের জন্য বার্ষিক বৃষ্টিপাত সম্পর্কে পার্থক্য বিস্তর (৫০-৫০০ সে মি)। এসকল স্থান **পশ্চিমাঞ্চলের মৃদুশীতল সামুদ্রিক জলবায়ু** (West coast Cool Temperate Oceanic or Maritime or Marine climate) **অঞ্চল** নামে পরিচিত। এখানকার লোকের নিকট এপ্রকার জলবায়ু আরামদায়ক (Cool Temperate), কিন্তু উষ্ণ অঞ্চলের জলবায়ুর তুলনায় যথেষ্ট শীতল। তাই ইহাকে **মধ্যম শীতল সামুদ্রিক জলবায়ুও** বলা হয়।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ—এখানকার জলবায়ুর জন্য এই অঞ্চলে এলম্, মেপল, বীচ, বার্চ প্রভৃতি **পর্ণমোচী** গাছের বন যথেষ্ট বিস্তীর্ণ। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের আশপাশে (যেখানে বায়ুর উষ্ণতা বেশী) কতক **ওক** গাছ আছে। ইহাদের পুরু ছালের মধ্যে যথেষ্ট জল সঞ্চিত থাকে বলিয়া এগুলি **চিরহরিৎ** গাছ। এখানকার

পুরু ছালযুক্ত কর্ক ওক গাছের ছাল দ্বারা বোতলের ছিপি (Cork) তৈরী হয়। এখানকার উচ্চভূমিতে কতক **সরলবর্গীয়** গাছও জন্মে। এই অঞ্চলের মধ্যভাগের দিকে (উপকূল হইতে দূরে) যথেষ্ট **তৃণভূমি** আছে। এখানে আপেল, পিচ্, বেরি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার **ফল** প্রচুর জন্মে। পাহাড় অঞ্চলের **বন** হইতে অনেক মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়।

জীবজন্তু ও প্রাণিজ সম্পদ—এখানকার তৃণভূমির যে অংশে বৃষ্টি অধিক, তথায় ঘাস অধিক ও বেশ কোমল (ঘাসের চাষ হয়)। সেজন্য এখানে বহু **গরু** পালন করা হয়। নেদারল্যাণ্ডস্, ডেনমার্ক, নিউ জীল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের **গাভী** গুলি বিখ্যাত। তৃণভূমির যে অংশে বৃষ্টি কম এবং ঘাস ছোট, তথায় অসংখ্য **মেষ** পালন করা হয়। এখানে অনেক শূকর এবং ঘোড়াও আছে। এপ্রকার পশুপালনের ফলে এখানে প্রচুর মাংস, দুধ, মাখন ও পনীর পাওয়া যায়। তাহাছাড়া এখানকার পাশে সমুদ্রে **মাছ** ধরা হয় খুব বেশী। পৃথিবীর অন্যতম **প্রধান মৎস্যাঞ্চল** এখানে।

লোকবসতি ও জীবিকা—এই অঞ্চলের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। এখানে নানা উপায়ে জীবিকা অর্জন এবং যাতায়াত প্রভৃতি বিষয়ে সুবিধা খুব বেশী। ফলে, এখানকার লোকবসতি অধিক। ইউরোপের উত্তরপশ্চিম অংশের (বিশেষতঃ শিল্পাঞ্চলের) লোকবসতির ঘনত্ব খুব বেশী। এখানে **কৃষি** এবং **শিল্প** দুইই মানুষের প্রধান জীবিকা। খনির কাজ, পশুপালন, বাণিজ্য, মৎস্য শিকার প্রভৃতি দ্বারাও এখানে জীবিকা অর্জনের সুযোগ প্রচুর।

অর্থনৈতিক উন্নতি—এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ সমভূমিতে **কৃষিকার্যের** সুযোগ খুব বেশী। শীতকালে প্রচুর চাষ হয়। ঐ সময়ের ফসলের মধ্যে **গম** প্রধান। তাহাছাড়া এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের **চারণভূমিতে** বহু মেষ, গরু, শূকর প্রভৃতি **পশু পালন** করা হয়।

এখানে প্রচুর কয়লা, লৌহ ও অন্যান্য **খনিজ সম্পদ** এবং **জলজ বিদ্যুৎশক্তি** উৎপন্ন হয়। তাই এখানে কার্পাস, রেশম, ইস্পাত প্রভৃতি **শিল্প** বিশেষ উন্নত। অবশ্য এসকল শিল্পের জন্য কতক উপাদান (Raw material) অন্যান্য স্থান হইতে আমদানি করা হয়। এখানকার মৃদুশীতল জলবায়ু, যাতায়াত ও পরিবহনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা, সুশিক্ষিত শ্রমিক ও প্রচুর অর্থবল প্রভৃতি এখানকার শিল্পোন্নতির প্রধান কারণ। উপরিলিখিত নানাকারণে এখানকার দেশগুলির আর্থিক অবস্থা খুব ভাল।

যাতায়াত ও পরিবহন—এই অঞ্চলে **স্থলপথ ও রেলপথ** জালের মত ছড়াইয়া আছে। এখানকার **নদীসমূহ** অনেক **খালের** সাহায্যে পরস্পরের সহিত

যুক্ত এবং তাহাদের মধ্যদিয়া অসংখ্য নৌকা, স্টীমার প্রভৃতি যাতায়াত করে। এখানে **সমুদ্রপথে** যাতায়াত ও পরিবহনের সুবিধাও খুব বেশী এবং এখানকার লোকেরাই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ নাবিক। তাহাছাড়া এখানে **বিমানপথে** যাতায়াতের ব্যবস্থা খুব উন্নত। বস্তুতঃ পৃথিবীর মধ্যে এখানকার যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা সর্বোত্তম।

(ঘ) নাতিশীতোষ্ণ (মহাদেশীয়) তৃণভূমি অঞ্চল

বিস্তৃতি—মহাদেশসমূহের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অন্তর্গত অংশের মধ্যভাগে ৩০-৫০° সমাক্ষরেখার মাঝখানের স্থানসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। উত্তর গোলার্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের মধ্যভাগের বিস্তৃত অংশ এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ অংশ, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মাঝখানের কতক অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

জলবায়ু—এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালের উষ্ণতা ১৫-২১° সে, কিন্তু (এসকল স্থান সমুদ্র হইতে বহুদূরে বলিয়া) শীতকালের উষ্ণতা হিমাঙ্কের (Freezing point) অনেক নীচে। সেজন্য এখানকার জলবায়ু শীতলতর নাতিশীতোষ্ণ (Cool temperate)।

এখানে **শীত-গ্রীষ্মের উষ্ণতার পার্থক্য** খুব বেশী, দিবা-রাত্রির উষ্ণতার পার্থক্যও যথেষ্ট। সমুদ্র হইতে দূরত্বের ফলে এখানে বৃষ্টি প্রায় হয় না, কেবল গ্রীষ্মকালে সামান্য (২৫-৫০ সে মি) বৃষ্টি হয়। অবশ্য শীতকালে এখানে তুষারপাত হয়। তাই এখানকার জলবায়ু **মহাদেশীয়** বা **চরম** (Continental or Extreme) প্রকৃতির।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ—চরম জলবায়ুর জন্য এখানে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী দূর **বিস্তীর্ণ তৃণভূমি** সৃষ্টি হইয়াছে। এখানে বসন্তকালে বরফগলা জল পাইয়া চারিদিক্ নূতন সবুজ ঘাসে ঢাকিয়া যায়। সে এক মনোরম দৃশ্য। তারপর গ্রীষ্মকালে প্রখর রৌদ্রে সমস্ত ঘাস পুড়িয়া যায়। আর শীতকালে সমস্ত অঞ্চল সাদা তুষার ও বরফদ্বারা ঢাকিয়া যায়। (উপযুক্ত পরিমাণ জলের অভাবে) এখানে বড় গাছ কম। এরূপ তৃণভূমিকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বলে **প্রেইরি**, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রে **স্টেপস্**, দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনাতে **পাম্পাস**, দক্ষিণ আফ্রিকাতে **ভেল্ড**। আর অস্ট্রেলিয়াতে উহার নাম **ডাউনস্**। এই প্রকার বিস্তীর্ণ তৃণভূমির জন্য এই অঞ্চল পৃথিবীর **শ্রেষ্ঠ চারণভূমি**।

জীবজন্তু ও প্রাণিজ সম্পদ—এখানকার তৃণভূমির ঘাস সাভানা অঞ্চলের ঘাসের তুলনায় ছোট ও নরম ; তাই উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য। ফলে, এখানে অসংখ্য **গরু, মেষ, শূকর, গাধা, ঘোড়া** প্রভৃতি পালন করা হয়। এশিয়ার স্টেপ ও আফ্রিকার ভেল্ড তৃণভূমিতে গরু, ঘোড়া, গাধা, উট ও হরিণ অধিক; উত্তর আমেরিকার প্রেইরীতে গরু, ঘোড়া, গাধা ও মেষ বেশী। অস্ট্রেলিয়ার ডাউনস্-এ গরু, ক্যাঙ্গারু ও মেষ অধিক। উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার যে অংশে বৃষ্টি বেশী ও ঘাস বড়, তথায় দুধের গরু বেশী পালন করা হয়। আর যে অংশে বৃষ্টি কম ও ঘাস ছোট, তথায় মাংসের জন্য গরু ও মেষ বেশী পালন করা হয়। স্বভাবতঃ এই অঞ্চলে মাংস, দুধ, মাখন, পনীর প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া যায়।

অধিবাসী ও জীবিকা—এখানকার লোকবসতি মধ্যম রকম। (অধিক শীতল জলবায়ু ঘনবসতির পক্ষে বাধা।) এখানকার অধিকাংশ লোকের জীবিকা **পশুপালন** ও **কৃষিকার্য**। এখানে জলসেচের সাহায্য ক্রমশঃ অধিক স্থানে **গম, যব** প্রভৃতি ফসল জন্মে। অধিক শস্য উৎপাদনের স্থানসমূহকে বলে **শস্যভাণ্ডার** (Granaries)। (এখানে লোকসংখ্যা মধ্যম রকম বলিয়া উৎপন্ন শস্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করা সম্ভবপর। তাহার কতক অংশ অন্যত্র রপ্তানিও হয়।) স্টেপ অঞ্চলের কিরঘিজ এবং প্রেইরির রেড্ ইণ্ডিয়ানগণের মধ্যে অনেকে এখনও যাযাবর। এখানকার তৃণভূমির কতক অংশে প্রতি দলে এত বেশী পশু থাকে যে স্টেপ অঞ্চলের **কাজাক** ও অন্যান্য **কিরঘিজ** জাতীয় লোক, দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনার পাম্পাস তৃণভূমির **গৌচা** এবং যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের কতক মানুষও ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া পশুপালন করেন।

অর্থনৈতিক উন্নতি—অধিক পশুপালনের ফলে এখানে প্রচুর দুধ, মাংস, পশুর চামড়া, শিঙ প্রভৃতি পাওয়া যায় এবং এসকল জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে বিদেশে রপ্তানিও হয়। আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রেলিয়া **পশুর মাংস, পশম, দুধ** প্রভৃতি রপ্তানির জন্য বিখ্যাত। এই অঞ্চলে **গম পেষণ** এবং **পশম** ও **চর্মশিল্প** উন্নত। ক্যানাডার উপনিবেশ নগরের আশপাশে কৃষিকার্য ও বিভিন্ন শিল্প প্রেইরি অঞ্চলের মধ্যে এত বেশী উন্নত যে ঐ নগরকে বলে "**প্রেইরির রাণী**"।

যাতায়াত ও পরিবহন—পূর্ব্বকালে এসকল স্থানে ঘোড়া, গাধা ও উটের পিঠে চড়িয়া যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল। এখন **জলপথ, বিমানপথ,** এবং **রেলপথের** প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। বস্তুতঃ, পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ **ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে** এবং উত্তর আমেরিকার **ক্যানাডিয়ান্ প্যাসিফিক,**

ক্যানাডিয়ান ন্যাশনাল, নর্দান প্যাসিফিক, সার্দান প্যাসিফিক, ইউনিয়ন প্যাসিফিক প্রভৃতি প্রধান রেলপথগুলির দীর্ঘ অংশ এই অঞ্চলের উপর দিয়া বিস্তৃত। এখানে নৌপথে যাতায়াতের সুযোগ কম।

(ঝ) শীতলতর পূর্ব উপকূল বা লরেন্সীয় অঞ্চল

বিস্তৃতি—মহাদেশসমূহের শীতলতর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পূর্ব অংশে ৫০-৬৫° অক্ষরেখার মাঝখানের স্থানসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। উত্তর আমেরিকার পূর্বদিকে সেণ্ট লরেন্স নদীর অববাহিকা সমেত নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড, এশিয়ার পূর্বদিকে মাঞ্চুরিয়া বা মাঞ্চুকোও (আমুর নদীর অবাহিকা সহ), কোরিয়া ও জাপানের উত্তর অংশ প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

জলবায়ু—এই অঞ্চলে **গ্রীষ্মকালে** অল্প কয়েকদিন বায়ুর উষ্ণতা থাকে ১৫-২৪° সে। এখানে **শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী** এবং তখনকার উষ্ণতা হিমাঙ্কের নীচে। ফলে, তখন দীর্ঘ দিন তুষারপাত হয়। অনেক ক্ষেত্রে তুষারস্তূপ খুব উঁচু হইয়া জমিয়া থাকে। এই অঞ্চলের উপর দিয়া সমস্ত বৎসর পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হয়। কিন্তু তাহা সমুদ্র হইতে বহুদূর স্থলভাগের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া এখানে পৌঁছে। ফলে, এখানে গ্রীষ্মকালে কয়েক দিন বৃষ্টি একটু বেশী এবং দীর্ঘ শীতকালে তুষারপাতের ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টি সামান্য। এই অঞ্চলের অন্তর্গত এশিয়ার মাঞ্চুরিয়া বা মাঞ্চুকোও এবং উত্তর আমেরিকার সেণ্ট লরেন্স নদীর অববাহিকার নাম অনুসারে এখানকার জলবায়ুকে **মাঞ্চুরিয়ার জলবায়ু** (Manchuria type) বা **সেণ্ট লরেন্সের জলবায়ু** (St. Lawrence type বা Cool Temperate Eastern Margin type) বলে।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ—অধিক শীতল জলবায়ুর জন্য এখানে গাছপালা কম। এখানে বৎসরের অনেক সময় বৃষ্টিহীন বলিয়া এখানকার উষ্ণতর অংশে জন্মে কতক **পর্ণমোচী** গাছ। আর শীতলতর অংশে জন্মে পাইন, ফার প্রভৃতি কতক **সরলবর্গীয়** গাছ। এসকল গাছের কাঠ মূল্যবান্ সম্পদ।

জীবজন্তু ও প্রাণিজ সম্পদ—এখানকার বনে সেব্‌ল, আরমাইন, শ্বেত শৃগাল, শ্বেত ভল্লুক প্রভৃতি বহু **দীর্ঘ লোমযুক্ত** প্রাণী আছে। ইহাদের পশম, চর্ম প্রভৃতি মূল্যবান্। এই অঞ্চলের নিকটবর্তী অংশে সমুদ্রে প্রচুর **মাছ** ধরা হয়। পৃথিবীর দুইটি **প্রধান মৎস্যাঞ্চল** এই অঞ্চলের পাশে।

অধিবাসী ও উপজীবিকা—একই (৫০-৬৫° উঃঅঃ) অক্ষাংশে অবস্থিত মহাদেশ-

সমূহের পশ্চিম অংশ বা সামুদ্রিক অঞ্চলের চেয়ে এখানে জলবায়ু অধিক শীতল এবং এখানে জীবিকা অর্জনের সুযোগ কম। তাই এখানে লোকবসতি কম।

অর্থনৈতিক উন্নতি—এখানে কিছু কিছু গম, যব, রাই, ওট, সয়াবীন প্রভৃতি ফসল জন্মে। এই অঞ্চলের পাশে সমুদ্রে প্রচুর মাছ ধরা হয়। পশ্চিম উপকূলের (সামুদ্রিক অঞ্চল) তুলনায় মাঞ্চুরীয় অঞ্চল অর্থনৈতিক বিষয়ে কম উন্নত। তবে উত্তর আমেরিকার **লরেন্সীয় অঞ্চলের** ক্ষেত্রে ক্যানাডার দক্ষিণপূর্ব অংশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব অংশ অর্থনৈতিক বিষয়ে **অধিক উন্নত**। প্রায় ইউরোপের মত। তাহার কারণ অনেক। যেমন, এখানে একদিকে গম, যব প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন হয়, অপর দিকে বনে (ক্যানাডা সমেত) পাওয়া যায় প্রচুর কোমল কাঠ এবং তাহার মণ্ড দ্বারা তৈরী হয় উৎকৃষ্ট কাগজ। এই অঞ্চলের পাশে নায়গ্রা জলপ্রপাতের সাহায্যে প্রচুর জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয় এবং নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড অঞ্চলে খুব বেশী মাছ ধরা পড়ে। এখানকার খনিজ সম্পদ্‌ও প্রচুর। এখানে যানবাহনের সুযোগও বেশী।

যাতায়ত ও পরিবহন—এই অঞ্চলে **স্থলপথ, রেলপথ** ও **আকাশপথ** যথেষ্ঠ উন্নত। তারপর **সেণ্ট লরেন্স নদী** এবং বিভিন্ন **খালের** মধ্য দিয়াও যাতায়াতের সুবিধা আছে। তবে শীতকালে অধিক তুষারপাতের জন্য যাতায়াতের ব্যাঘাত ঘটে। পাশের আটলাণ্টিক মহাসাগরের জন্য এখানে **নৌপথে** যাতায়াত ও পরিবহনের সুযোগ খুব বেশী।

(চ) শীতলতর মহাদেশীয় (সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য) অঞ্চল

বিস্তৃতি—মহাদেশসমূহের মধ্যভাগে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের যে সকল অংশ মেরু-বৃত্তের নিকট অবস্থিত সেগুলি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। কাজেই লরেন্সীয় অঞ্চলের মত ইহাও শীতলতর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ইউরেশিয়া ও উত্তর আমেরিকার উত্তর অংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখানকার অন্তর্গত।

জলবায়ু—এই অঞ্চলে বৎসরের খুব কম সময় মৃদু ধরনের **গ্রীষ্মকাল**; তখনকার বায়ুর উষ্ণতা ১০-২১° সে। ইহাকে আমাদের দেশের হিসাবে গ্রীষ্মকাল বলা যায় না। এখানে **শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী**। ফলে, তথায় তখন উষ্ণতা থাকে হিমাঙ্কের বহু নীচে, প্রায় -১১° হইতে -৯° সে। ফলে, তথায়
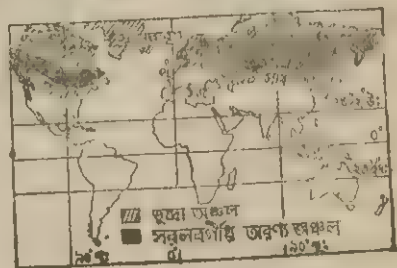
শীত-গ্রীষ্মের উষ্ণতার পার্থক্য খুব বেশী এবং বাৎসরিক গড় উষ্ণতা (Mean Annual temperature) প্রায় হিমাঙ্কের নীচে। বৎসরের বেশীর ভাগ সময় এখানে তুষার জমিয়া থাকে। এখানকার প্রবল উচ্চচাপ কেন্দ্র হইতে চারিদিকে প্রবাহিত হয় তীব্র শীতল বায়ু। বসন্তকালে এখানকার কিছু বরফ গলিয়া যায়। গ্রীষ্মকালের প্রথম ভাগে এই অঞ্চলে সামান্য (২৫-৩৮ সে মি) বৃষ্টি হয়।
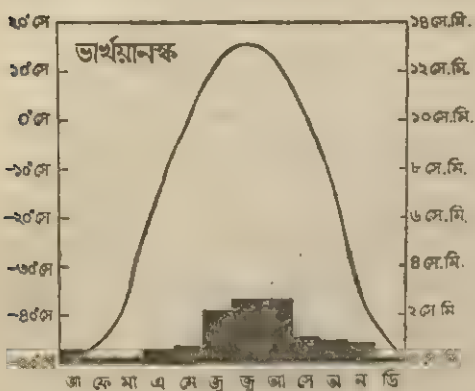
স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ—শীতল ও আর্দ্র জলবায়ুর জন্য এখানে সৃষ্টি হইয়াছে পাইন, স্প্রুস প্রভৃতি **সরলবর্গীয় বৃক্ষের** পৃথিবীর মধ্যে **বৃহত্তম বন**। সাইবেরিয়াতে ঐ বন **তৈগা** নামে পরিচিত। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার (নরওয়ে ও সুইডেনের) উত্তর অংশ ও ফিনল্যাণ্ডেও এরূপ বন বিস্তীর্ণ। ক্যানাডার বনও অতি বৃহৎ। এসকল বন হইতে পাওয়া যায় পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী** পরিমাণ মূল্যবান্ কাঠ।

জীবজন্তু ও প্রাণিজ সম্পদ—এখানকার বিরাট বনে শ্বেত ভল্লুক, শ্বেত শৃগাল, সেব্‌ল, মার্টেন, আরমাইন, প্রভৃতি দীর্ঘ লোমযুক্ত বহু প্রাণী বাস করে। বন্য প্রাণীসমূহের দীর্ঘ লোম ও চর্ম অত্যন্ত মূল্যবান্। এখানে ও আশপাশে তৃণভূমি কম। তাহার সাহায্যে তাই এখানে খুব অল্প সংখ্যক দীর্ঘলোমযুক্ত মেষ, ছাগ প্রভৃতি পশুপালন করা হয়।

অধিবাসী ও উপজীবিকা—অত্যন্ত শীতল জলবায়ু এবং যাতায়াত ও জীবিকা অর্জনের অসুবিধার জন্য এখানকার লোকবসতি খুব কম। কাঠের ব্যবসায় ও পশু শিকার এবং পশুর চর্ম, পশম, শিং প্রভৃতি সংগ্রহ ও রপ্তানি তাহাদের জীবিকা। এসকল কাজ করার উদ্দেশ্যে এখানকার স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মকালে বহু লোক বিদেশ হইতেও এখানে আসেন।

অর্থনৈতিক উন্নতি—এখানকার বন হইতে **মূল্যবান্ কাঠ** এবং রজন, ধুনা, আলকাতরা প্রভৃতি নানারকম **বনজ সম্পদ** রপ্তানি হয়। এখানে দীর্ঘ শীতকাল আরম্ভ হওয়ার আগেই বড় বড় গাছ কাটিয়া টুকরা করিয়া রাখা হয়। তীব্র শীতে

এগুলি বরফ দ্বারা চাপা পড়িয়া থাকে। তারপর বসন্তকালে বরফ গলিতে আরম্ভ করিলে গাছের ঐ সকল টুকরা বা গুঁড়িকে একত্র করিয়া বাঁধিয়া নদীর মধ্য দিয়া টানিয়া সুবিধাজনক স্থানে নেওয়া হয়। ইহাকে লাম্বারিং (Lumbering) বলা হয়। এখানকার গাছগুলির শক্ত কাঠ দ্বারা তৈরী হয় জাহাজ, স্টীমার, গাড়ি, আসবাব প্রভৃতি। কোমল কাঠ দ্বারা তৈরী হয় প্লাইউড ও কাঠের মণ্ড। ঐ মণ্ড দ্বারা তৈরী হয় **কাগজ, নানারকম বোর্ড** এবং **প্ল্যাস্টিকের** জিনিস। এই অঞ্চলে পশু শিকারের সুযোগ প্রচুর। আশপাশের তৃণভূমিতে কতক পশু পালন করা হয় ও সামান্য রাই, বীট, আলু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

যাতায়াত ও পরিবহন—এখানে বৎসরের অধিকাংশ সময় প্রচুর বরফ জমিয়া থাকে বলিয়া স্থলপথ, নৌপথ এবং রেলপথে যাতায়াত খুবই কষ্টকর। কাজেই কোনরূপ পথেরই অধিক বিস্তার হইতেছে না। এখানে আকাশপথে যাতায়াতও অসুবিধাজনক।

শীতল জলবায়ু অঞ্চল

পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ সীমার কতক স্থান এই অঞ্চলের অন্তর্গত। উত্তর গোলার্ধে সুমেরু অঞ্চলে মহাদেশসমূহের কতক অংশ বিস্তৃত। দক্ষিণ গোলার্ধে কুমেরুর চতুর্দিকে ঘিরিয়া আছে অ্যান্টার্কটিকা ভূভাগ। তাহার বাহিরে স্থলভাগ খুব কম। শীতল জলবায়ু অঞ্চল দুই ভাগে বিভক্ত।

(ক) তুন্দ্রা অঞ্চল

বিস্তৃতি—ইউরেশিয়া ও ক্যানাডার উত্তর সীমায় (সুমেরু বৃত্তের উত্তরে) কতক স্থান এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

জলবায়ু—তথায় প্রকৃত গ্রীষ্মকাল নাই। তবে বৎসরের কিছু সময় (দিবাভাগে) বায়ুমণ্ডলে ২০° সে উষ্ণতা থাকে। বৎসরের অবশিষ্ট সময় (৮-৯ মাস) তীব্র শীত পড়ে এবং মাঝে মাঝে **ভীষণ তুষার ঝড়** প্রবাহিত হয়। ফলে, বহুশত ফুট পর্যন্ত উঁচু হইয়া বিরাট **তুষারস্তূপ** জমিয়া থাকে। ২-৩ মাস সামান্য বেশী উষ্ণতা থাকাকালে তুষারের কতক অংশ গলিয়া যায়। ঐ সময়ে সামান্য বৃষ্টিও হয়। ঐরূপ সামান্য উষ্ণ কালেই তথায় দিবালোকের সময় থাকে খুব দীর্ঘ (২০-২৩ ঘণ্টা)। তখনই নরওয়ের হ্যামারফেস্ট বন্দরের নিকট হইতে আকাশে **"নিশীথ সূর্য"** দেখা যায়। আবার এই অঞ্চলের **দীর্ঘ** (৮-৯ মাস) **শীতকালে** দিবামান থাকে খুব ছোট; অনেকদিন সূর্যকে মাত্রও দেখা যায় না। অর্থাৎ তখন বেশীরভাগ সময়ই রাত্রির মত অন্ধকার। তখন

মাঝে মাঝে উচ্চ আকাশে সামান্য আলো বা **মেরুজ্যোতি** দেখা যায়। সুমেরুর নিকট উহাকে বলে অরোরা বরিয়েলিস্ এবং কুমেরুর নিকট বলে আরোরা অস্ট্রেলিস্।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ—তীব্র **শীতল** জলবায়ুর ফলে এসকল স্থানে দীর্ঘ শীতকালে কোন উদ্ভিদ্ জন্মে না, কিন্তু সামান্য উষ্ণকালে তুষার গলিয়া গেলে অল্প সময়ের মধ্যে কিছু **গুল্ম** এবং আইসল্যাণ্ড পপি, ফরগেট-মি-নট, রকরোজ প্রভৃতি ফুলের চারা গাছ ও শৈবাল (Moss) জন্মে। শীতের প্রারম্ভেই এগুলি মরিয়া যায়।

জীবজন্তু ও প্রাণিজ সম্পদ—এখানে বল্গাহরিণ, স্লেজ কুকুর, শ্বেত খরগোশ প্রভৃতি **দীর্ঘলোমযুক্ত পশু** বাস করে। এখানাকার সামান্য গুল্মই ইহাদের খাদ্য। আবার ইহাদের ও বিভিন্ন সামুদ্রিক জীবের মাংসের লোভে এখানে বাস করে বহু দীর্ঘলোমযুক্ত **শ্বেত ভল্লুক**। ইহাদের পশম ও চর্ম মূল্যবান্। ইহা ভিন্ন সমুদ্রে আছে বহু **সীল, সিন্ধুঘোটক** এবং কতক **মাছ**।

অধিবাসী ও উপজীবিকা—তীব্র শীতল জলবায়ু সত্ত্বেও ক্যানাডার উত্তর অংশে **এস্কিমো**, সাইবেরিয়ার উত্তর অংশে **স্যামোয়েদ** ও **ইয়াকুট** এবং ফিন্‌ল্যাণ্ড ও রাশিয়ার উত্তর অংশে **ল্যাপ** জাতীয় কিছু লোক বাস করে। ইহারা সকলে প্রায় একই শ্রেণীর মানুষ। ইহারা শীতকালে বরফ দ্বারা আবৃত ঘরে ('ইগলু'তে) এবং সামান্য উষ্ণকালে (বরফ গলিয়া যায় বলিয়া) চামড়ার তৈরী তাঁবুতে বাস করেন। ইহাদের অনেকে **যাযাবর** এবং পশু, পাখী ও মাছ শিকার ও বল্গাহরিণ, ক্যারিবু প্রভৃতি **পশু পালন** করেন। কতক লোক পাথর, কাঠ প্রভৃতি দিয়া **ঘরবাড়ী** তৈরী করিয়া স্থায়ী ভাবে বাস করেন। আজকাল স্থানে স্থানে (ভূগর্ভে Hote house তৈরী করিয়া) কিছু উত্তাপ সরবরাহ করা হয় এবং তাহার সাহায্যে সামান্য **চাষ-আবাদ** হইতেছে।

অর্থনৈতিক উন্নতি—এখানকার উপকূলে বহু অর্থব্যয়ে কয়েকটি **বন্দর** তৈয়ারী করিয়া এবং সমুদ্রে বিশেষ ধরনের (বরফ কাটিবার ব্যবস্থাযুক্ত) জাহাজ ব্যবহার করিয়া এখান হইতে নৌপথে মাছ, বল্গাহরিণের মাংস প্রভৃতি রপ্তানি হইতেছে। এখানে পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে গরম জলের নলের (Pipe) পাশে পাশে পানীয় জলের নল বসান হইতেছে। ল্যাপল্যাণ্ডে কিছু খনিজ দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এখানে এসকল ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এখানকার অধিবাসিগণের ঘরবাড়ী, পোশাক, খাদ্য এবং আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হইতেছে।

যাতায়াত ও পরিবহন—তীব্র শীতের জন্য এখানে যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা। পূর্বে চাকাহীন **স্লেজগাড়ীই** যাতায়াতের প্রধান ব্যবস্থা ছিল। এখনও ঐরূপ অনেক গাড়ী আছে। বল্গাহরিণ বা স্লেজ কুকুর তাহা টানিয়া নেয়। এখন নৌপথে

বরফ কাটিয়া চলিবার মত বিশেষ ধরনের **স্টীমার** ও **জাহাজ** যাতায়াত করে। জাহাজ চালাইবার কাজে আণবিক শক্তিও ব্যবহৃত হইতেছে।

(খ) চিরতুষারাবৃত মেরু অঞ্চল

বিস্তৃতি—তুন্দ্রা অঞ্চলের বাহিরে উভয় গোলার্ধে মেরুবিন্দু দুইটির চারিদিকে তীব্র শীতের জন্য অনবরত তুষার পড়ে ও সকল সময় সমুদ্রের জলরাশির উপরিভাগ জমিয়া

শক্ত বরফে পরিণত হয়। তাহার উপরদিকের অংশকে স্থলভাগের মত মনে হয়। তাই তাহাকে **ভাসমান* বরফের রাজ্য** বা **চিরতুষারাবৃত অঞ্চল** বলে। সাহসী মেরু অভিযাত্রীরা এই বরফের উপর দিয়া হাঁটিয়া যান। তবে বরফস্তূপের ফাটলের (Crevasse) মধ্য দিয়া নীচে পড়িয়া গেলে মৃত্যুর ভয় থাকে। এই অঞ্চলের অন্তর্গত দক্ষিণ মেরুর চারিদিকের **য়্যাণ্টার্কটিকা** ভূভাগ একটি উঁচু মালভূমি। ইহা গড়ে প্রায় ১,৮৩০ মি এবং স্থানে স্থানে ৩,০৫০ মি পর্যন্ত উঁচু। এখানকার তুষারস্তূপ পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী উঁচু**। এই ভূভাগ আয়তনে এত বড় যে ইহাকে পৃথিবীর সপ্তম মহাদেশ বলা হয়। উত্তর মেরুর নিকটবর্তী গ্রীনল্যাণ্ড দ্বীপও চিরতুষারাবৃত অঞ্চলের **অন্তর্গত**।

জলবায়ু—এই অঞ্চলের সমস্ত বৎসরের **উষ্ণতা হিমাঙ্কের নীচে**। তাই এখানে **চিরতুষার** বিরাজমান। উভয় মেরুবিন্দুতে ছয় মাস একসঙ্গে আলো, আর বাকী ছয় মাস একসঙ্গে অন্ধকার। এই অঞ্চলে চিরকাল শীতকাল (গ্রীষ্ম বা অন্য কোন ঋতু নাই)। তবে প্রতি বৎসর ২-৩ মাস উষ্ণতা সামান্য বেশী থাকে। তখন বিরাট তুষারস্তূপের সামান্য অংশ গলিয়া বরফের কর্দম সৃষ্টি হয়; তাহা তীব্র শীতল। এই

* জলের তুলনায় বরফ অনেক হাল্কা বলিয়া জলের উপর ভাসে। প্রকাণ্ড হিমশৈলগুলির প্রায় $\frac{৯}{১০}$ অংশ জলের মধ্যে ও $\frac{১}{১০}$ অংশ জলের উপর ভাসিয়া থাকে।

অঞ্চলে মাঝে মাঝে অতি ভয়ঙ্কর **তুষার ঝড়** প্রবাহিত হয়। তখন বরফের টুকরা চারিদিকে বেগে ছুটিতে থাকে।

এই অঞ্চলের গুরুত্ব—তীব্র শীতল জলবায়ুর জন্য চিরতুষারাবৃত অঞ্চল উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু শূন্য। মানবসমাজের স্থায়ী বসতি সম্পর্কেও এখানকার গুরুত্ব নাই। তবে **মেরু অভিযান** সম্পর্কে এই অঞ্চল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। য়্যাণ্টার্কটিকাতে কিছু খনিজ সম্পদের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে।

যাতায়াত ও পরিবহন—মেরু অভিযানকারীরা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ হইতে যতদূর সম্ভব জাহাজে আসিয়া তারপর এই অঞ্চলের কঠিন বরফের উপর দিয়া খুব সন্তর্পণে কিছুদূর হাঁটিয়া মেরুতে পৌছিয়াছেন। কিছুকাল যাবৎ এখানে **বিমানপথে** কিছু কিছু অভিযান (যাতায়াত) আরম্ভ হইয়াছে। সর্বপ্রথম ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট **জাহাজ** (লেনিন) **আণবিক শক্তির** (Atomic energy)† সাহায্যে মুরমানস্ক হইতে সুমেরুর দিকে সফল অভিযান করিয়াছে। তখন হইতে কিছু কিছু জাহাজ বরফস্তূপ কাটিয়া খুব সন্তর্পণে এখানে যাতায়াত করে।

পার্বত্য জলবায়ু অঞ্চল

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পার্বত্য অঞ্চলে জলবায়ু সম্পর্কে বৈচিত্র্য অনেক। পৃথিবীর সকল স্থানেই পর্বতের পাদদেশ হইতে ক্রমশঃ উপরদিকে এবং পার্বত্য অঞ্চলের বাহিরদিকের তুলনায় মধ্যভাগে জলবায়ুর তারতম্য প্রচুর। তদনুসারে পার্বত্য অঞ্চল দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত।

(ক) নাতিশীতোষ্ণ মরু অঞ্চল

বিস্তৃতি—প্রধানতঃ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের কতক পর্বতবেষ্টিত স্থান এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এশিয়াতে মঙ্গোলিয়ার গোবি মালভূমি, উত্তর আমেরিকার পশ্চিমদিকের পার্বত্য অঞ্চলের কলোরেডা মালভূমি এবং দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ অংশে আন্দিজ পর্বতের পূর্বদিকে অবস্থিত প্যাটাগোনিয়া মালভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

জলবায়ু—এসকল স্থানে ভূমির উচ্চতার জন্য নিজ নিজ গ্রীষ্মকালে (উত্তর গোলার্ধে মে-জুন, দক্ষিণ গোলার্ধে ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাস) উষ্ণতা মধ্যম রকম, শীতকালের উষ্ণতা খুব কম। কাজেই এরূপ প্রত্যেক স্থানে গ্রীষ্ম ও শীতকালের উষ্ণতার পার্থক্য প্রচুর। আর দিবা-রাত্রির উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী। ফলে,

† এরূপ জাহাজের ঠিক পিছনে পিছনে ২।১ খানা জাহাজ বাষ্পীয় শক্তিতে চলিতে পারে। কয়েক মিনিটের মধ্যে জল আবার বরফে পরিণত হয় বলিয়া বেশী সংখ্যক জাহাজ এভাবে এখানে চলিতে পারে না।

এখানকার জলবায়ু **চরম** বা **মহাদেশীয়** প্রকৃতির। এখানকার ভূভাগ উচ্চ পর্বত-বেষ্টিত বলিয়া প্রায় **বৃষ্টিহীন,** তবে **শীতকালে** এখানে **তুষারপাত** হয়।

তবে এসকল স্থানের ভূপ্রকৃতি (উচ্চ মালভূমি) এবং অবস্থিতি হেতু (উষ্ণ মরুভূমিগুলির তুলনায় বেশী মেরুর দিকে বা নিরক্ষ অঞ্চল হইতে দূরের দিকে অবস্থিতি) এখানকার উষ্ণতা কম। ফলে, গোবি, কলোরেডো প্রভৃতিকে বলা হয় **নাতিশীতোষ্ণ মরুভূমি** (Temperate desert)।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও জীবজন্তু—এখানকার কতক অংশে সামান্য তৃণভূমি আছে, এসকল স্থানে মেষ, ছাগ, ঘোড়া প্রভৃতি কতক পশু পালন করা হয়।

অধিবাসী ও উপজীবিকা এবং অর্থনৈতিক অবস্থা—এখানকার জলবায়ু লোকের বসবাস ও কঠিন কাজের পক্ষে অসুবিধাজনক ; যোগাযোগের ব্যবস্থাও অনুন্নত। ফলে, উষ্ণ মরু অঞ্চলের মত এখানেও লোকবসতি অতি সামান্য। তাহাদের মধ্যে অনেকেই যাযাবর এবং সাধারণতঃ পশু পালন করিয়া জীবিকা অর্জন করেন। তবে কতক অংশে জলসেচের সাহায্যে সামান্য গম, যব প্রভৃতি ফসল জন্মে। কতক স্থানে কিছু কিছু খনিজ দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

যাতায়াত ও পরিবহন—উষ্ণ মরুর মত এখানেও উটই যাতায়াতের প্রধান উপায়। এখানে ভূ-প্রকৃতি বন্ধুর বলিয়া স্থলপথ তৈরী করাও অসুবিধাজনক।

(খ) শীতল পার্বত্য অঞ্চল

বিস্তৃতি—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বহু উচ্চ পর্বত আছে। তাহাদের মধ্যে এশিয়ার হিমালয়, উত্তর আমেরিকার রকি, ইউরোপের আল্পস্, দক্ষিণ আমেরিকার আণ্ডিজ ইত্যাদি আয়তন ও উচ্চতা উভয় হিসাবে খুব বড়। আর আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো, কেনিয়া প্রভৃতি আয়তনে ছোট। এগুলি মালভূমির উচ্চ অংশ বা পর্বতশৃঙ্গ।

জলবায়ু—নিরক্ষীয় অঞ্চল হইতে উভয় মেরুর দিকে যেরূপ ধীরে ধীরে জলবায়ুর পরিবর্তন হয়, পৃথিবীর সর্বত্র উচ্চ **পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশ হইতে** ক্রমশঃ **উপরদিকেও জলবায়ুর সেরূপ পরিবর্তন** ঘটে। তবে অবস্থিতির পার্থক্যবশতঃ আফ্রিকার **কিলিমাঞ্জারোর** পাদদেশে নিরক্ষীয় জলবায়ু, ভারতে **হিমালয়ের** পাদদেশে মৌসুমী জলবায়ু এবং ইউরোপে **আল্পসের** পাদদেশে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু। কিন্তু সকল পর্বতেরই ক্রমশঃ **উপরদিকের জলবায়ু শীতলতর**। ফলে, কিলিমাঞ্জারোতে ৫,৪৯০ মিঃ উচ্চ অংশে, হিমালয়ে ৪,৮৮০ মিঃ উচ্চ অংশে এবং আল্পসে ২,৭৪৫ মিঃ উচ্চ অংশে হিমরেখা (Snow line) এবং তাহার উপরদিকে

চিরতুষার বর্তমান। এখানকার জলবায়ু মেরু অঞ্চলের জলবায়ুর মত। বস্তুতঃ বিভিন্ন পর্বতের মধ্যে যেটি নিরক্ষরেখা হইতে যত বেশী দূরে অবস্থিত, তথায় তত কম উচ্চতাতে এরূপ তীব্র শীতল অবস্থা বর্তমান। ভূমির উচ্চতার সহিত জলবায়ুর এরূপ সম্পর্কের জন্যই দক্ষিণ আমেরিকাতে বিষুবরেখার নিকট অবস্থিত **কিটো** নগরের (২,৭৪৫ মি উচ্চ) জলবায়ু **চিরকাল বসন্ত** প্রকৃতির।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ—পার্বত্য অঞ্চলের নিম্নদিক্ হইতে উপরদিকে জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের পরিবর্তন প্রচুর। সেজন্য হিমালয় পর্বতের দক্ষিণদিকের পাদদেশে জন্মে মৌসুমী অঞ্চলের চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষ, তাহার উপর আছে সরলবর্গীয় বৃক্ষ এবং ক্রমশঃ আরও উপরে জন্মে শীতল অঞ্চলের গুল্ম, তৃণ ও শৈবাল। আবার আল্পস্ পর্বতের পাদদেশে আছে পর্ণমোচী বৃক্ষ এবং ক্রমশঃ উপরে জন্মে সরলবর্গীয় বৃক্ষ ও তৃণ।

জীবজন্তু ও প্রাণিজ সম্পদ—বিভিন্ন পর্বতের গায়ে গভীর অরণ্যে বাস করে নানাপ্রকার জীবজন্তু। পার্বত্য অঞ্চলে আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলের ও ভারতের মৌসুমী অঞ্চলের ঘন বনে বাঘ, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু অনেক। বহু পর্বতের নিম্ন অংশে ও ঢালের তৃণভূমিতে গরু, মেষ প্রভৃতি পশুপালন করা হয়। আর উপর দিকে মিশ্র বৃক্ষের বনে বাস করে হরিণ, চমরী (Yak), লামা প্রভৃতি পশু। দীর্ঘলোমযুক্ত পশুর পশম ও কতক পশুর চর্ম মূল্যবান্ সম্পদ্।

অধিবাসী ও উপজীবিকা—পর্বতসমূহের উপত্যকা অংশে এবং বিভিন্ন ঢালের সুবিধাজনক স্থানে যথেষ্ট লোক বাস করেন। পশুপালন, কাঠ সংগ্রহ, কুটির শিল্প প্রভৃতি ইহাদের জীবিকা। এখানকার সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্য এরূপ কতক স্থানে বহু **স্বাস্থ্যনিবাসও** আছে। ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশে হিমালয়ের গায়ে বহু বিখ্যাত **শৈলাবাস** (Health resort) আছে। ইউরোপের সুইজারল্যাণ্ডে স্বাস্থ্যনিবাস ইহাদের তুলনায় সংখ্যায় অনেক বেশী ও অধিক সুন্দর।

অর্থনৈতিক উন্নতি—পার্বত্য অঞ্চলে **কাঠ সংগ্রহ, পশুশিকার, পশুপালন, কৃষিকার্য** প্রভৃতি অধিবাসিগণের প্রধান উপজীবিকা। উষ্ণমণ্ডলে বিভিন্ন পর্বতের নীচের দিকের ঢালুতে ধান, চা, কমলালেবু, তুঁতগাছ প্রভৃতির চাষ হয়। কতক সুবিধাজনক স্থানে ভ্রমণকারিগণের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াও (হোটেলের ব্যবসা দ্বারা) অনেকে জীবিকা অর্জন করেন। এখানে কতক শিল্পও উন্নত। জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠের ও পশমের শিল্প বিখ্যাত। সুইজারল্যাণ্ডে ঘড়ি, চকোলেট প্রভৃতি শিল্প বিখ্যাত।

এখানে প্রচুর জলজ বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয়। কাজেই পার্বত্য অঞ্চলে যাতায়াত, খাদ্য সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে অসুবিধা সত্ত্বেও কতক অংশের, বিশেষতঃ স্বাস্থ্যনিবাস-সমূহের, অধিবাসিগণের আর্থিক অবস্থা ভাল।

যাতায়াত ও পরিবহন—পার্বত্য অঞ্চলে যাতয়াতের অসুবিধা খুব বেশী. এখানে বহু অর্থব্যয়ে **স্থলপথ** তৈরী করা হয়। কোন কোন পাহাড়, পর্বতের মধ্য দিয়া টানেল বা সুড়ঙ্গ তৈরী করা হইয়াছে। ইটালিতে আল্পস পর্বতের এবং উত্তর আমেরিকাতে রকি পর্বতের বেশ কয়েকটি টানেলের মধ্য দিয়া **রেলপথও** বিস্তৃত হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশে আন্দিজ পর্বতে ৪,৫৭৫ মি়র উপর দিয়াও রেলপথ গিয়াছে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে বানিহালের নেহেরু টানেলও যাতায়াতের পক্ষে বিশেষ উপকারী। অনেক পর্বতে Rope wayএর সাহায্যে মাল-পত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত মানুষের সামঞ্জস্য বিধান

মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। আদি মানুষের সৃষ্টি হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষ **প্রকৃতির ক্রোড়ে** লালিত-পালিত। প্রকৃতির সহিত মানুষের **সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতম**। **আদিযুগে** মানুষ যখন প্রায় পশু স্তরে ছিল, তখনও মানুষ প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিয়াছে। তবে তখন মানুষ ছিল **প্রকৃতির উপর** একান্ত **নির্ভরশীল**। কাজেই তখনকার নির্ভরশীল সামঞ্জস্য বিধানের (Passive adjustment) ফলে মানুষ বাস করিত গাছের কোটরে বা পাহাড় ও পর্বতের গুহাতে। তখন মানুষ আহার করিত গাছের ফল, মূল অথবা পশু, পাখীর মাংস বা মাছ, যাহা অনায়াসে বা অল্প আয়াসে সংগ্রহ করা সম্ভবপর ছিল.

ক্রমে মানুষ আপন বুদ্ধিবলে প্রকৃতির বিভিন্ন **সম্পদের** সন্ধান লাভ করিতে লাগিল এবং আপনাদের জীবন ধারণের সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদকে নানা কাজে **ব্যবহার** করিতে আরম্ভ করিল প্রথম দিকে মানুষ নিজেদের **বাসস্থানের আশ-পাশের** সম্পদই ব্যবহার করিত। কিন্তু ক্রমশঃ তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং উন্নততর জীবন-যাপনের ইচ্ছার ফলে জিনিসের চাহিদা বহুগুণ বাড়িয়া চলিয়াছে। তাই মানুষ নিজ নিজ বাসভূমি ছাড়িয়া ক্রমশঃ **দূরের** জায়গার **সন্ধানে** বাহির হইয়াছে এবং বিভিন্ন **অপরিচিত** বা সামান্য পরিচিত স্থানে গিয়াও তথাকার **পরিবেশের** সহিত **সামঞ্জস্য বিধান** করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এপ্রকার ব্যবস্থার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ও উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার মানুষ বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল, নদ-নদী পার হইয়া স্থলপথে আসিয়াছে ভারতে। ইহাই **আর্যগণের ভারতে আগমন** বলিয়া পরিচিত। ইউরোপের স্পেন ও পর্তুগালের বহু মানুষ গিয়াছেন **দক্ষিণ আমেরিকাতে,** ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের মানুষ গিয়াছেন **উত্তর আমেরিকাতে**। অনেকে গিয়াছেন **আফ্রিকা** ও **ওশিয়ানিয়াতে**। এভাবে পৃথিবীর বহু **মনুষ্যহীন অঞ্চলে** স্থাপিত হইয়াছে **লোকবসতি**। প্রত্যেক জায়গাতে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের **প্রয়োজনমত পরিবর্তন** করিয়া **সামঞ্জস্য বিধান** (Active adjustment) করিতেছেন। সকল ক্ষেত্রেই **প্রকৃতি** মানুষের সহিত **সহযোগিতা** করিতেছে। তবে প্রকৃতির এরূপ অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং মানুষের চেষ্টা সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বা অঞ্চলে প্রাকৃতিক অবস্থার, বিশেষতঃ ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ও স্বাভাবিক উৎপন্ন দ্রব্যাদির পার্থক্যের ফলে **মানবসমাজের খাদ্য, আশ্রয়** এবং **জীবিকা** প্রভৃতি সম্পর্কে লক্ষ্য করা যায় বিস্তর **পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য**।

পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চলে মানুষের উপরিলিখিতরূপ সামঞ্জস্য বিধানের বিষয় নিম্নে আলোচিত হইল।

(ক) ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল (বা আর্দ্র) অরণ্য অঞ্চল

উত্তরে কর্কটক্রান্তির আশপাশ হইতে দক্ষিণে মকরক্রান্তির আশপাশ পর্যন্ত পৃথিবীর মধ্যভাগ ক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানকার মাঝখানে নিরক্ষরেখার উত্তর-দক্ষিণে ৫-১০° উঃ অঃ হইতে ৫-১০° দঃ অঃ পর্যন্ত অঞ্চলের জলবায়ু সারা বৎসর উষ্ণ আর্দ্র প্রকৃতির। এরূপ জলবায়ু প্রশস্ত পত্রযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষের জন্মের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। তবে এখানকার এই জাতীয় বনের বৃহত্তম অংশ দক্ষিণ আমেরিকাতে **আমাজন নদীর অববাহিকা** অঞ্চলে বিস্তৃত। ব্রেজিল দেশের অধিকাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানকার বন **সেলভাস** নামে পরিচিত। এই জাতীয় বনের দ্বিতীয় বৃহৎ অংশ আফ্রিকার মধ্যভাগে **কঙ্গো নদীর অববাহিকা** অঞ্চলে। **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার** ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতির কতক অংশেও আছে এই জাতীয় গাছের বন। ইহাই এরূপ বনের তৃতীয় অঞ্চল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ **মৌসুমী অঞ্চলও** ক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানকার যে সকল অংশে বৃষ্টিপাত অধিক, তথায়ও এই জাতীয় **চিরহরিৎ গাছ** প্রচুর। অবশ্য তথায় **পর্ণমোচী** গাছও অনেক। (শীতকাল বৃষ্টিহীন বলিয়া পর্ণমোচী

গাছ জন্মে।) এজন্য মৌসুমী অঞ্চলে **মিশ্র বৃক্ষের বনই** অধিক। তবে এখানে ক্রমশঃ লোকবসতি বৃদ্ধির ফলে সমভূমি অঞ্চল এখন প্রায় বনশূন্য।

খাদ্য –দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলের মধ্যভাগ প্রায় জনহীন, বাহিরের দিকে **লোকবসতি** আছে। কিন্তু তাহাও খুব **কম**। ইহারা **পিগমি** জাতীয়। এ সকল অঞ্চল ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি খাদ্যশস্য উৎপাদনের পক্ষে অনুপযোগী। সেজন্য এখানে এই জাতীয় খাদ্যের প্রচলন কম এখানে পশু পাখীর **মাংস, মাছ, ফলমূল** প্রভৃতি মানুষের প্রধান খাদ্যদ্রব্য। তবে বনের মধ্যভাগে ও বাহিরের যে সকল অংশে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, তথায় বাহির হইতে **খাদ্যদ্রব্য আমদানি** করা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার **ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া** প্রভৃতি স্থানে লোকবসতি ঘন। এখানে আদিবাসী (পিগমি জাতীয়) ভিন্ন এশিয়া ও ইউরোপের উন্নত শ্রেণীর লোকও অনেক। তাহাদের চেষ্টায় এখানে প্রচুর **ধান** জন্মে এবং তাহাই **প্রধান খাদ্যদ্রব্য**। অন্যান্য স্থান হইতেও এখানে নানাপ্রকার **খাদ্যদ্রব্য আমদানির** সুবিধা প্রচুর।

মালয়েশিয়ার সমুদ্র উপকূলের ঘরবাড়ি, পাশে মাছ ধরিবার নৌকা

ঘরবাড়ি –এখানকার বন ও জলাভূমিতে অধিকাংশ ঘরবাড়ি **মাচার** উপর তৈরী। এখানে কাঠ সুলভ বলিয়া কাঠের তৈরী বাড়িই সবচেয়ে বেশী। অবশ্য ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি স্থানে দালান, টিনের ঘর প্রভৃতির সংখ্যা অধিক। অধিক বৃষ্টির জন্য এখানকার ঘরবাড়ির **চাল** অধিক **ঢালু** (প্রায় খাড়া)। অনেক ঘরের ছাউনি খড়ের। আমাজন

স্যাঁৎসেঁতে অঞ্চলের মাচাঘর, দূরে পাহাড়

ও কঙ্গো নদীর অববাহিকার ঘন বনের ঘরবাড়ি ইহাদের তুলনায় অনেক **নিকৃষ্ট** ধরনের। আদিযুগের **কুঁড়ে জাতীয়** ঘরই এখানে বেশী।

জীবিকা—এখানকার গভীর **বন** হইতে মেহগিনি, সেগুন, আবলুস, লোহাকাঠ প্রভৃতি মূল্যবান **কাঠ সংগ্রহ** এবং তাহা বিদেশে রপ্তানি মানুষের প্রধান উপজীবিকা। রবার (গাছের রস), চিকেল, ব্রেজিল নাট, পাম গাছের তৈল প্রভৃতি **বনজ সম্পদ সংগ্রহও** অনেকের প্রধান জীবিকা। এসকল স্থানের কতক অংশে আগেকার ঘন বন পরিষ্কার করিয়া তথায় রবার গাছ, নারিকেল ও কলা গাছ, কাকাও (কোকো), ম্যানিলা শণ প্রভৃতি গাছের **আবাদ** ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। সিঙ্কোনা গাছের ছাল (কুইনাইন তৈরীর উপাদান), কোব্রেরাচো, ওক, হেমলক, বাবলা, সোঁদরী প্রভৃতি গাছের ছাল (চামড়া মজবুত করার উপাদান), নানাপ্রকার লতা, বেত প্রভৃতি **রপ্তানিও** এখানকার কতক লোকের জীবিকা।

ইন্দোনেশিয়া, আন্দামান নিকোবর, মালয়েশিয়া প্রভৃতি স্থানে ধান, কলা, আনারস, চা, কফি, কোকো প্রভৃতির **চাষ** বহু লোকের জীবিকা। এরূপ কতক স্থানে **খনিজ সম্পদ** সংগ্রহ ও নানাপ্রকার **শিল্প** ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে এবং বহু লোক তাহাদের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করেন। এসম্পর্কে আফ্রিকার কঙ্গো অঞ্চলের কাটাঙ্গার তাম্র খনির এবং ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার **টিনের খনির** নাম বিশেষভাবে **উল্লেখযোগ্য**।

(খ) সাভানা

মহাদেশসমূহের উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত অংশের মধ্যভাগ সাধারণতঃ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এসকল স্থান উত্তর গোলার্ধে ৫-১০° উঃ অঃ হইতে ২৫-৩০° উঃ অঃ পর্যন্ত এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ৫-১০° দঃ অঃ হইতে ২৫-৩০° দঃ অঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। **আফ্রিকাতে** এই অঞ্চল সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। সুদানেই বেশী। তাহার পর **দক্ষিণ আমেরিকার** স্থান। **অস্ট্রেলিয়াতেও** এই জাতীয় তৃণভূমি যথেষ্ট বিস্তৃত। সমগ্র সাভানা অঞ্চলে গ্রীষ্মকালের উষ্ণতা অধিক, শীতকালের কম। এখানে দিবাভাগের তুলনায় রাত্রির উষ্ণতা কম। এখানে **বৃষ্টিপাত খুব কম ;** গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অন্য সময় প্রায় বৃষ্টিহীন। বৃষ্টিপাতের এপ্রকার অবস্থার ফলে এই অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ দীর্ঘ তৃণ এবং তাহার মাঝে মাঝে কতক গাছ। এজন্য এই অঞ্চল **ক্রান্তীয় তৃণভূমি** নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের অন্তর্গত দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনার উত্তর অংশে ও বলিভিয়ার দক্ষিণ অংশে বিস্তৃত **এল্‌গ্র্যান শাকোর (চাকো)** তুলনায় অস্ট্রেলিয়ার

সাভানা নিম্ন মালভূমি এবং ব্রেজিলের **ক্যাম্পস**, ভেনিজুয়েলার **ল্যানস** ও বলিভিয়ার **মন্টানা** উচ্চভূমি। সুতরাং ইহাদের মধ্যে জলবায়ুর পার্থক্য (উচ্চ অংশে উষ্ণতা কম) সুস্পষ্ট। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত অঞ্চলে গাছপালার সংখ্যাও আফ্রিকার সুদানী অঞ্চলের তুলনায় অধিক।

খাদ্য—আফ্রিকার অন্তর্গত সাভানা অঞ্চলে লোকবসতি খুব কম। তাই এখানে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদাও কম। তারপর এখানকার জলবায়ু **ধান** চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়। **গমও** এখানে জন্মে খুব কম। ফলে, এখানকার মানুষের খাদ্যের মধ্যে ভাত এবং গম কম। ইহাদের প্রধান খাদ্য **ভুট্টা, রাগি, বাজরা** জাতীয় খাদ্যশস্য, চীনাবাদাম ও চুপড়ি আলু। তবে এই অঞ্চলে গরু, মেষ, ছাগ, ঘোড়া, উট প্রভৃতি পশু পালনের ফলে বিভিন্ন **পশুর মাংস** ও **দুধ** মানুষের অন্যতম প্রধান খাদ্য। এখানে মাছের অভাব।

এই অঞ্চলের অন্যান্য অংশে লোকবসতি কম। উহাদেরও খাদ্য অনেক পরিমাণে আফ্রিকার সুদানী (সাভানা) অঞ্চলের মত। তবে দক্ষিণ আমেরিকাতে বিভিন্ন নদ, নদী ও অন্যান্য জলাভূমিতে **মাছ** প্রচুর। তাই তাহা একটি প্রধান খাদ্যদ্রব্য। তাহাছাড়া কফি, কোকো, ইয়ারবা মাটে (চা জাতীয় পানীয়) প্রভৃতির প্রচলন অধিক। অস্ট্রেলিয়ার সাভানা অঞ্চলের লোকবসতি খুব কম। তবে তাহাদের প্রধান খাদ্য গম, মাংস, দুধ প্রভৃতি।

ঘরবাড়ি—এই অঞ্চলের জলবায়ু কিছু পরিমাণে চরম প্রকৃতির। তাহাছাড়া এখানে বন্য জন্তুর উৎপাতও অধিক। ফলে, এই অঞ্চলের ঘরবাড়ি অনেক মজবুত। ঘরের **দেওয়াল মাটির** তৈরী এবং খুব পুরু। রৌদ্রে শুকান ইট, **পাথর** ও **কাঠের** তৈরী ঘরও অনেক। ঘরের **চাল ঢালু**। বৃষ্টির জল তাহার উপর দিয়া সহজে গড়াইয়া যায়। খড়, টালি প্রভৃতির ছাউনি অধিক। অবশ্য বর্তমানে পাকা বাড়ি বা দালানের সংখ্যা বাড়িতেছে।

জীবিকা পূর্বে এখানকার লোকের প্রধান উপজীবিকা ছিল **পশু শিকার** ও **কাঠ সংগ্রহ**। এখানকার কতক কাঠ খুব মূল্যবান্। তন্মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনার কুয়েবরাচো অন্যতম। [ঐ গাছের কাঠ এত শক্ত যে গাছ কাটিবার সময় কুঠার ভাঙ্গিবার ভয় থাকে। (Quebracho শব্দের অর্থ axe-breaker)। চামড়া মজবুত করিবার জন্য এই গাছের ছালের চাহিদা খুব বেশী।] আজকাল গরু, মেষ, ঘোড়া প্রভৃতি **পশু পালন** এবং ধান, ভুট্টা, আখ, কার্পাস প্রভৃতি ফসলের উৎপাদন বা **কৃষিকাজ** এখানকার অধিকাংশ লোকের জীবিকা। এখানে **পশুপালনের** পক্ষে

কতক **অসুবিধা** আছে। তাহাদের মধ্যে মানুষ ও জীবজন্তু সকলের পক্ষে হিংস্র বন্য জন্তুর উৎপাত অন্যতম। ইহা ভিন্ন সি সি (Tse tse) পোকার দংশন মানুষের পক্ষে এবং নাগানার (Nagana) দংশন গরু ও ঘোড়ার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাহাছাড়া বৎসরের কয়েক মাস এখানে বৃষ্টির অভাবে ঘাস শুকাইয়া যায়। তখন পানীয় জলেরও খুব অভাব হয়। অপর দিকে গ্রীষ্মকালের সামান্য বৃষ্টির সাহায্যেই এখানে **কৃষিকার্যের ক্রমশঃ উন্নতি** হইতেছে। সুদানের **কার্পাস** প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। তাহাছাড়া এখানকার ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক লোক চর্ম, পশম, কার্পাস প্রভৃতি নানাপ্রকার **শিল্পের** সাহায্যে জীবিকা অর্জন করিতেছেন। হাতীর দাঁত, অস্থি, বিভিন্ন পশুর **মাংস, চর্ম,** পশম, শিং প্রভৃতির **রপ্তানিও** এখানে অনেক লোকের প্রধান জীবিকা। দক্ষিণ আমেরিকার ক্যাম্পস (ব্রেজিল), ল্যানস (ভেনিজুয়েলা) প্রভৃতি অঞ্চলের ক্রান্তীয় তৃণভূমি হইতে শুষ্ক গ্রীষ্মকালে (যখন স্বাভাবিক তৃণের অভাব ঘটে) পশুর দলকে ব্রেজিলের কতক তৃণাঞ্চলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানে প্রচুর ঘাসের চাষ হয়। তথায় পশুগুলি কিছুকাল বিচরণ করিয়া যথেষ্ট হৃষ্টপুষ্ট হয়। তখন তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া হয় মাংস সরবরাহের জন্য নির্দিষ্ট কেন্দ্রে।

(গ) মরু অঞ্চল

পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অংশ মরু অঞ্চল। তাহার দুই ভাগ উষ্ণ মরু অঞ্চল ও নাতিশীতোষ্ণ মরু অঞ্চল। (১) তন্মধ্যে **উষ্ণ মরু** অঞ্চল মহাদেশসমূহের উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত মধ্যভাগ হইতে পশ্চিমদিকের প্রায় উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর গোলার্ধের স্থানসমূহ কর্কটক্রান্তির আশপাশে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের স্থানসমূহ মকরক্রান্তির আশপাশে। উত্তর গোলার্ধে উষ্ণ মরুভূমি আফ্রিকার পশ্চিম সীমা হইতে ভারতের থর বা মরুস্থলী (রাজস্থান) পর্যন্ত বিস্তৃত। অবশ্য ইহার বৃহত্তম অংশ **আফ্রিকার সাহারাতে** এবং তারপর এশিয়ার **আরব** অঞ্চলে। তাহাছাড়া সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের দক্ষিণ অংশে কাস্পিয়ান সাগর ও আরল সাগরের পাশে সামান্য অংশ, আরও দক্ষিণে ইরাক, ইরান, আফগানিস্থান, পাকিস্তান ও ভারতের থর পর্যন্ত স্থানসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। উত্তর আমেরিকার মেক্সিকোর সামান্য অংশও উষ্ণ মরু। দক্ষিণ গোলার্ধে অস্ট্রেলিয়ার মধ্য ভাগ হইতে পশ্চিম অংশ, দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিমদিকের কতক অংশ এবং দক্ষিণ আমেরিকার চিলির উত্তর অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। (২) **নাতিশীতোষ্ণ** মরু অঞ্চল উষ্ণ মরু অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম বিস্তৃত। উত্তর গোলার্ধে মধ্য এশিয়ার গোবি বা শামো মরুভূমি, উত্তর আমেরিকার পশ্চিম অংশে কলোরেডো

অঞ্চল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগনিয়া মরুভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ মরুভূমি অঞ্চলে **জলবায়ুর** চরম অবস্থা, বৃষ্টির অভাব, উদ্ভিদের অভাব প্রভৃতি বিষয়ে মিল বিস্তর। তবে নাতিশীতোষ্ণ মরুভূমি **উচ্চ পার্বত্য** অংশে (এশিয়ার মধ্যভাগের উচ্চ মালভূমি অঞ্চলে, উত্তর আমেরিকাতে পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলে এবং দক্ষিণ আমেরিকাতে আন্দিজ পর্বতমালার পাদদেশে) অবস্থিত বলিয়া এসকল স্থানের গ্রীষ্মকালের উষ্ণতা উষ্ণ মরুভূমি অঞ্চলের তুলনায় সামান্য কম। অবশ্য এ বিষয়ে এসকল স্থানের অবস্থিতির অপর বিষয়ের প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। কারণ, সাহারা, থর প্রভৃতির তুলনায় গোবি **উচ্চতর অক্ষাংশে** বা নিরক্ষ রেখা হইতে অধিক উত্তরে অবস্থিত। সেরূপ চিলির উত্তর অংশের মরুভূমি হইতে প্যাটাগনিয়াও উচ্চতর অক্ষাংশে বা নিরক্ষরেখা হইতে অধিক দক্ষিণে অবস্থিত।

খাদ্য—মরু অঞ্চলে রুক্ষ জলবায়ু, বসতির অসুবিধা, যাতায়াত ও জীবিকা অর্জনের অসুবিধা প্রভৃতি কারণে লোকবসতি খুব কম। এখানে বহু লোক আজও **যাযাবর**। প্রধানতঃ বৃষ্টির অভাবে এখানে কৃষিকার্য সম্ভবপর নয়। সেজন্য এখানকার লোকের প্রধান খাদ্য **খেজুর**। (তাহা এখানে মরূদ্যানগুলিতে সবচেয়ে বেশী জন্মে। এখানকার চাহিদা মিটাইয়া প্রচুর পরিমাণে রপ্তানিও হয়।) তারপর সামান্য গম, যব, ধান। (ইহাদের কতক মরূদ্যানে জন্মে, কতক আমদানি করা হয়।) **উটের দুধ, মাংস, মেষের মাংস** প্রভৃতিও এখানকার লোকের অন্যতম প্রধান খাদ্য। এখানে মাছের অভাব। তবে যে সকল অংশে **যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা** উন্নত এবং লোকের আর্থিক অবস্থা ভাল, তথায় **প্রায় সকল রকম খাদ্যই** আমদানি ও ব্যবহার করা হয়। দক্ষিণপশ্চিম এশিয়ার আরব অঞ্চল তাহার প্রধান উদাহরণ।

মাঙ্গোলিয়ার মরুপ্রায় অঞ্চলের যাযাবর

ঘরবাড়ি—এখানকার বহু লোক **যাযাবর**। তাহারা উট, ঘোড়া, মেষ প্রভৃতি পশুর দলসহ ঘুরিয়া বেড়ায়। **তাঁবুই** তাহাদের ঘরবাড়ি। মরূদ্যানের আশপাশে বা অন্য যেখানে সামান্য তৃণ পাওয়া যায়, পশুর দল সহ সেখানেই তাহারা তাঁবু ফেলিয়া

সাময়িক ভাবে বসতির ব্যবস্থা করে। তবে অনেক **মরূদ্যানের** নীচে ভূগর্ভে যথেষ্ট জল পাওয়া যায় এবং তাহার ফলে তথায় ধান, গম, তামাক, কার্পাস প্রভৃতি ফসল কিছু কিছু উৎপন্ন করা হয়। ঐ সকল স্থানের আশপাশে পশুপালনের স্থযোগও অধিক। কাজেই ঐরূপ স্থানে কতক লোক **স্থায়ী ভাবে বাস** করেন। তথাকার চরম জলবায়ুর জন্য **ঘরবাড়ির দেওয়াল** খুব **পুরু**। পাথরের টুকরা ও মাটি এরূপ বাড়ি তৈরীর প্রধান উপাদান। এখানে বৃষ্টির অভাব। তাই ঘরের চাল সমতল। বালুকার ঝড় ও প্রচণ্ড সৌরতাপ এবং মানুষ (শত্রু) যাহাতে ঘরের মধ্যে সহজে প্রবেশ করিতে না পারে সেজন্য ঘরের **দরজা** ছোট, জানালা প্রায় থাকে না। আর দরজার ঠিক সামনে থাকে বেশ মজবুত বাধা (পাথরের দেওয়াল)। তাহার পাশ দিয়া ঘুরিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। তবে আজকাল যে সকল স্থানে লোকের জীবিকা, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতি উন্নত, তথায় **পাকা বাড়ি** (দালান) অনেক।

জীবিকা—উট, ঘোড়া, মেষ প্রভৃতি **পশু পালন** এখানকার অনেক লোকের (প্রধানতঃ যাযাবরগণের) প্রধান উপজীবিকা। ঐ সকল পশুর পশম, চর্ম প্রভৃতির সাহায্যে নানারকম **শিল্পদ্রব্য** তৈরীও ইহাদের অন্যতম জীবিকা। তবে মরূদ্যানগুলিতে সামান্য **কৃষি** ও **ফল** (খেজুর), বিভিন্ন গাছের (বাবলা জাতীয়) কাঁটা **সংগ্রহ**, কতক গাছের রস সংগ্রহ প্রভৃতিও অনেকের জীবিকা। সম্প্রতি বিভিন্ন মরুভূমিতে নানারকম খনিজ দ্রব্যের সন্ধান পাওয়ার ফলে **খনিজ সম্পদ সংগ্রহ** অনেকেরই প্রধান জীবিকা। বস্তুতঃ খনিজ সম্পদের জন্য অনেক জায়গার আগেকার চেহারা পরিবর্তিত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন রূপ দেখা যাইতেছে। আরব দেশে খনিজ তৈল, কালাহারি (দক্ষিণ আফ্রিকা) তাম্র, সাহারাতে লবণ, চিলির আটাকামা মরুভূমিতে তাম্র ও নাইট্রেট (লবণ জাতীয় জিনিস) পাওয়ার ফলে বহু বিদেশীয় লোকও তথায় জীবিকা অর্জনের (খনিজ সম্পদ সংগ্রহ, বাণিজ্য প্রভৃতি) জন্য বাস করেন। স্থানীয় লোকদেরও জীবিকার প্রভৃত পরিবর্তন হইতেছে।

(ঘ) স্টেপ অঞ্চল

মহাদেশসমূহের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মধ্য ভাগে ৩০-৫০° সমাক্ষরেখার মাঝখানের স্থানসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। উত্তর গোলার্ধে **যুক্তরাষ্ট্র** ও **সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের মধ্যভাগের** বিস্তীর্ণ অংশ এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণদিকের কিছু জায়গা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার সামান্য অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। উত্তর গোলার্ধের অন্তর্গত অংশ আয়তনে বহুদূর বিস্তৃত এবং

তাহার প্রায় সমুদয় অংশই সমভূমি। দক্ষিণ গোলার্ধের অন্তর্গত অংশের আয়তন কম এবং তাহার অনেকটাই নিম্ন মালভূমি। দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত অংশের উচ্চতা সামান্য বেশী।

এখানকার জলবায়ু শীতলতর নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতির (গ্রীষ্মকালের উষ্ণতাও ১৫-২০° সের নীচে এবং শীতকালে বহু দিন হিমাঙ্কের নীচে। ফলে, এখানে শীতকালে প্রচুর তুষারপাত হয়। আর গীষ্মকালে সামান্য বৃষ্টি হয়। এপ্রকার অবস্থার জন্য এখানে সৃষ্টি হইয়াছে পৃথিবীর **বৃহত্তম তৃণভূমি**। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে জলবায়ুর পার্থক্য অনুসারে এখানকার **ঘাসের অবস্থা** যথেষ্ট পরিমাণে **পরিবর্তিত** হয়। বসন্তকালে ঘাস থাকে সবুজ ও মসৃণ। এখানকার ঐ সময়ের **কোমল ঘাস** পশুপালনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গীষ্মকালে ঘাসের অনেকটা পুড়িয়া যায়। কাজেই ঐ সময় **পশু** পালনের পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধা হয়। সেজন্য কোথাও **ঘাসের চাষ** করা হয়, আর কোথাও কোথাও **পশুর** দলকে ঘাসের সন্ধানে অন্য জায়গাতে লইয়া যাওয়া হয়।

নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি সাধারণতঃ **স্টেপস** নামে পরিচিত। তাহা হইলেও বিভিন্ন মহাদেশে এরূপ তৃণভূমির আলাদা নাম আছে। সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রে উহা স্টেপস নামেই পরিচিত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে উহার নাম **প্রেইরি**, দক্ষিণ আমেরিকাতে **পাম্পাস**, অস্ট্রেলিয়াতে **ডাউনস** ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে **ভেল্ড**।

খাদ্য—এই অঞ্চলের লোকবসতি মধ্যম রকম। তাহাদের প্রধান খাদ্য **গম**। তাহা এখানেই জন্মে। বস্তুতঃ এখানকার গমের উৎপাদন এত বেশী যে এই অঞ্চলকে **শস্যভাণ্ডার** (Granaries) বলা হয়। এখান হইতে প্রচুর গম নানাস্থানে রপ্তানি হয়। এই অঞ্চলের তৃণভূমি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত এবং সেজন্য এখানে মেষ, ছাগ, গরু, শূকর, ঘোড়া প্রভৃতি পশুপালনের সুযোগও সবচেয়ে বেশী। ফলে, এখানে **মাংস, দুধ** এবং **দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য** (পনীর, মাখন প্রভৃতিও) প্রচুর। স্বভাবতঃ এখানকার লোকের খাদ্যদ্রব্য উৎকৃষ্ট ধরনের। সবজি, ফল প্রভৃতিও এখানে যথেষ্ট জন্মে এবং প্রচুর পরিমাণে খাওয়া হয়। তবে এখানে মাছের ব্যবহার কম। (নদনদী, হ্রদ, সাগর হইতে মাছ পাওয়ার সুবিধা কম।)

ঘরবাড়ি--এই অঞ্চলের লোকের ঘরবাড়ি দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ এখানকার যে সকল অংশ মরুপ্রায় অঞ্চলের আশপাশে, তথায় পশুর খাদ্য সমস্ত বৎসর পাওয়া কষ্টকর। কাজেই তথাকার মানুষ তাহাদের **পশুর দলসহ** বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে **ঘুরিয়া বেড়ায়**। পশুর খাদ্য সংগ্রহই তাহাদের এভাবে ঘুরিবার প্রধান কারণ। ফলে, তাহাদের ঘরবাড়ি তৈরীর জন্য **যাযাবর** জীবন যাপনের পক্ষে

উপযোগী হাল্কা ও সহজে বহন করা যায় এবং নূতন জায়গাতে সহজে স্থাপন করা যায় এমন উপাদান আবশ্যক। স্বভাবতঃ কাপড়ের **তাঁবু** এজন্য সর্বশ্রেষ্ঠ। তবে ইহাদের আকৃতি, আয়তন প্রভৃতি সম্পর্কে পার্থক্য প্রচুর।

যাযাবরগণের তাঁবু

আধুনিক কালে এখানে অনেক ক্ষেত্রেই পশুপালনের ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হইতেছে। বৎসরের যে সময়ে (গ্রীষ্মকালে) **স্বাভাবিক** তৃণ পুড়িয়া যায় এবং পশুদলের খাদ্যের অভাব হয়, তখনও যাহাতে তাহাদের অসুবিধা না হয় সেজন্য অনেক ক্ষেত্রে **ঘাসের চাষ** করা হয়। আগে হইতে কতক খাদ্য সংগ্রহও করিয়া রাখা হয়। তারপর গরুর দুধের সাহায্যে মাখন, পনীর প্রভৃতি তৈরী ও সরবরাহ, মাংস, চর্ম প্রভৃতি সরবরাহ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে অনেক যন্ত্রপাতিও আজকাল ব্যবহৃত হয়। কাজেই এখন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় পশুপালনের অঞ্চলে ও আশপাশে আছে ছোট, বড় নানা রকম **খামার**। এরূপ কতক খামার বা **স্থায়ী ঘরবাড়ি** তৃণাঞ্চলের পাশে পাহাড়ের পাদদেশে বা গায়েও তৈরী হয়। **হিমালয়ের** মত উচ্চ পর্বত এবং **পামিরের** মত উচ্চ মালভূমির গায়েও অনেক তৃণভূমি আছে। অনেক ক্ষেত্রে ইহাদের পাশের সুবিধাজনক স্থানে বিভিন্ন ফসল ও ফলের চাষও হয়।

স্টেপ অঞ্চলের খামার

পাহাড়ের পাদদেশে সুন্দর খামার

জীবিকা—আগেকার দিনে স্টেপ অঞ্চলের তৃণভূমিতে পশুপালকগণ ছোট ছোট

দলে বিভক্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আজও এশিয়ার পশ্চিম অংশে কাস্পিয়ান সাগরের তীর হইতে মঙ্গোলিয়ার ও মাঞ্চুকোওর (মাঞ্চুরিয়ার) উত্তর অংশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ স্টেপ অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে **কাজাক, কালমুক, কিরঘিজ, মঙ্গোল** প্রভৃতি এরূপ ছোট ছোট পশুপালক দল দেখা যায়। উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেইরি অঞ্চলের **রেড ইণ্ডিয়ানগণের** মধ্যেও কতক এই জাতীয় (**যাযাবর**)। তবে আজকাল উত্তর গোলার্ধে স্টেপ অঞ্চলের অনেক অংশে, প্রেইরি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনার বিস্তীর্ণ পাম্পাস অঞ্চলে, অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের ডাউনস্ তৃণাঞ্চলে এবং দক্ষিন আফ্রিকার ভেল্ড তৃণভূমিতে এক এক দলে বিচরণ করে কয়েক শত গরু, কয়েক হাজার মেষ। ছাগ, শূকর প্রভৃতির এক একটি দলও বিরাট। ফলে, ইহাদের এক একটি দলের সঙ্গে থাকেন **অশ্বারোহী** কয়েকজন **পশুপালক**। দক্ষিণ আমেরিকার পাম্পাস তৃণভূমির এরূপ পশুপালকগণকে বলা হয় **গৌচো**।

আজকাল এসকল তৃণভূমিতে পশুপালন সংক্রান্ত নানা বিষয়ে ক্রমাগত উন্নতির ফলে মানুষের জীবিকা সম্পর্কেও বিস্তর পরিবর্তন হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল প্রভৃতি অনেক দেশে **দুধের** জন্য যে সকল **গরু** পালন করা হয় তাহাদিগকে বিচরণ করিতে দেওয়া হয় **সর্বোৎকৃষ্ট তৃণভূমিতে**। স্বভাবতঃ এরূপ গরুর জাতি খুব ভাল এবং তাহারা দুধ দেয় প্রচুর (সাধারণতঃ আমাদের দেশের ২০।২৫টি গরুর চেয়েও বেশী)। আর এরূপ অঞ্চলে **মাখন, পনীর** প্রভৃতি তৈরী, তাহাদিগকে সংরক্ষণ (হিমায়ন ব্যবস্থা), কৌটায় ভরিয়া বিদেশে রপ্তানি ইত্যাদি নানা কাজ এখানকার অনেক লোকের জীবিকা।

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের মাখন, পনীর ইউরোপের বাজারেও রপ্তানি হয় প্রচুর। অপরদিকে মাংস সরবরাহের জন্যও কতক গরু পালন করা হয়। তাহাদিগকে অধিক হৃষ্টপুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে কিছু সময় **উৎকৃষ্ট তৃণভূমিতে** (Ranch or Ranching ground) **অবাধে বিচরণ** করিতে দেওয়া হয়। কখন কখন কচি ভুট্টার ক্ষেতেও ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তারপর ইহাদিগকে প্রেরণ করা হয় নির্দিষ্ট **কসাইখানা** অঞ্চলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের **শিকাগো** এজন্য পৃথিবী-বিখ্যাত। এপ্রকার বৃহৎ কসাইখানা অঞ্চলে ও আশপাশে **মাংস সংরক্ষণ**, প্যাক করা, **চর্ম মজবুত** (Tan) করা, পশুর রক্ত, অস্থি, শিং, যকৃৎ প্রভৃতির সাহায্যে **নানারকম শিল্পদ্রব্য** তৈরীর ব্যাপক ব্যবস্থা আছে। বহুলোক এসকল কাজ দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন। আজকাল **জাহাজের হিমায়ন কক্ষের** মাধ্যমে মাংস বহু দূর দেশে (অন্যান্য মহাদেশেও)

সরবরাহ করা হয়। দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা ও উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পশুমাংস ইউরোপের বড় বড় বাজারে নিয়মিতভাবে সরবরাহ হয়।

তৃণভূমি অঞ্চলের প্রাণিজ সম্পদভিত্তিক উপরিলিখিত বিভিন্ন শিল্প ভিন্ন **কৃষিকার্য** (বিশেষতঃ গম, বীট প্রভৃতি ফসলের চাষ) এবং ঐ সকল **কৃষিজ সম্পদের** উপর নির্ভরশীল নানাপ্রকার **শিল্পও** (গম পেষণ, পাওরুটি, বিস্কুট, কেক প্রভৃতি তৈরী) অনেক লোকের জীবিকা।

(ঙ) সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি

উত্তর গোলার্ধের অন্তর্গত মহাদেশসমূহের উত্তরদিকের বিস্তীর্ণ অংশ (নাতি-শীতোষ্ণ অঞ্চলের উত্তর অংশ) এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ইউরেশিয়ার অন্তর্গত **সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রে** এই অঞ্চলের বিস্তৃতি **সর্বাপেক্ষা অধিক।** তারপর উত্তর আমেরিকার **ক্যানাডার** স্থান। এই দুই অঞ্চলের বাহিরে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায় বিভিন্ন পর্বতের উচ্চ অংশসমূহে। আল্পস, আন্দিজ, রকি এবং হিমালয়ের উচ্চ অংশে এরূপ বন আছে। তবে এখানে ইহাদের বিস্তৃতি অধিক নহে। উষ্ণতর অংশের বেশীর ভাগ গাছ পর্ণমোচী অথবা চিরহরিৎ (প্রশস্ত পত্রযুক্ত)। শীতলতর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বৎসরের অধিকাংশ সময় জল (বরফগলা জল ও কিছু বৃষ্টির জল) পাওয়া যায় এবং উষ্ণতা কম বলিয়া সরলবর্গীয় (চিরহরিৎ) গাছ জন্মে। এখানে প্রচুর তুষারপাত হয় বলিয়া গাছের পাতা যেন আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই অত্যন্ত সরু। (ফলে, পাতার উপর বরফ জমিয়া থাকিতে পারে না।) আর গাছের ডালপালাও কম। কাজেই গাছের **আকৃতি সরলবর্গীয়** (Coniferons)। ডাল কম থাকার ফলে গাছে গ্রন্থি বা গেরোও কম। কাজেই এরূপ কাঠ আসবাবপত্র, জাহাজ, গাড়ি, সুন্দর বাক্স প্রভৃতি তৈরার পক্ষে সুবিধাজনক। আর গাছের কোমল অংশসমূহ মণ্ড তৈরীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

খাদ্য—বিস্তীর্ণ বনভূমির জন্য এসকল স্থানে লোকবসতি কম। কাজেই এখানে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদাও কম। এসকল স্থানের আশপাশে কিছু **গম, যব, রাই, ওট, সয়াবীন** বা ভাটকলাই প্রভৃতি ফসল জন্মে এবং এগুলিই এখানকার লোকের প্রধান খাদ্য। এই অঞ্চলের আশপাশে প্রচুর **ফল** জন্মে। কাজেই এখানে ফলের ব্যবহারও যথেষ্ট। তাহাছাড়া পাশের তৃণাঞ্চল হইতে এখানে **মাংস** ও **দুগ্ধজাত দ্রব্য** সরবরাহ হয়। কাজেই ঐরূপ খাদ্যদ্রব্য এখানে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। এখানে মাছের ব্যবহার কম। (খাদ্য সম্বন্ধে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির সহিত এখানকার মিল প্রচুর।)

ঘরবাড়ি—এখানকার ঘরবাড়ি তৈরীর সর্বপ্রধান উপাদান কাঠ। আগেকার দিনে **কাঠের মাচাঘর** তৈরী হইত, কিন্তু এখন কাঠের সাহায্যে তৈরী হয় সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি। এই জাতীয় কাঠের সাহায্যে চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বহু প্রাচীনকালেও সুন্দর **রাজপ্রাসাদ, মন্দির** (প্যাগোডা) প্রভৃতি তৈরী হইয়াছে। এরূপ কতক বাড়ির কারুকার্য আজও দর্শককে মুগ্ধ করে। আবার ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বন অঞ্চলের পাশে ইট, পাথরের তৈরী অনেক **আধুনিক বাড়ি** আছে। এরূপ কতক বাড়ি ঐ সকল মহাদেশের অন্যান্য অংশের বৃহৎ ঘরবাড়ির মত।

জীবিকা—কাঠ সংগ্রহ ও তাহা বিভিন্ন কেন্দ্রে **সরবরাহ** এখানকার অধিবাসিগণের **প্রাচীন জীবিকা**। তখন সাধারণ কুঠারের সাহায্যে এসকল গাছ কাটা হইত; আর গাছগুলি শীতকালের আগেই কাটিয়া টুকরা করিয়া মজবুত দড়ি বা শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত। তারপর বসন্তকালে বরফ গলিয়া গেলে ঐ সকল কাঠের গুঁড়িগুলিকে বিভিন্ন করাতঘরে টানিয়া আনা হইত। এখন এবিষয়ে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের মোট আয়তনের প্রায় ৪০% এরূপ বনভূমি এবং তাহার আয়তন পৃথিবীর অরণ্য অঞ্চলসমূহের মধ্যে বৃহত্তম। তাহা **তৈগা** নামে পরিচিত। সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে এই বিরাট বনভূমি ও বনজ সম্পদের গুরুত্ব স্বভাবতঃ খুব বেশী। পাশের নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড এবং উত্তর আমেরিকার ক্যানাডার সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমির গুরুত্বও ঐ সকল দেশের পক্ষে খুব বেশী।

এসকল দেশে এখন আধুনিক পদ্ধতিতে **যন্ত্রের সাহায্যে গাছ কাটা** হয়। গাছ কাটিবার আগে পরীক্ষা করিয়া কোন্ বৎসর কোন্ কোন্ গাছ কাটা হইবে তাহা স্থির করা হয়। তারপর গাছ কাটিয়া বিশেষভাবে তৈরী **ট্রাকের সাহায্যে** গাছের গুঁড়িগুলিকে নির্দিষ্ট কেন্দ্রে **সরবরাহ** করা হয়। অবশ্য আগেকার পদ্ধতিতেও বহু গাছের গুঁড়ি সরবরাহ হয়। কাঠ সরবরাহ ও কাঠের সাহায্যে বিভিন্ন **শিল্পদ্রব্য তৈরী** তথাকার মানুষের অন্যতম প্রধান জীবিকা। কাষ্ঠশিল্পের কেন্দ্র সাধারণতঃ বন অঞ্চলের আশপাশে। তবে যথেষ্ট দূরেও অনেক কেন্দ্র আছে। সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত বিভিন্ন কেন্দ্রে **জাহাজ, স্টীমার** ও অন্যান্য জলযান তৈরী হয়। আর স্থলভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন কেন্দ্রে তৈরী হয় নানারকম **গাড়ি** (রেলগাড়ি, বাস, ট্রাক, লরি ও মোটর গাড়ির অংশ), **আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতির** অংশ, **বাক্স, সেতুর** অংশ ইত্যাদি অসংখ্য জিনিস। তাহাছাড়া কোমল কাঠের সাহায্যে তৈরী হয় মণ্ড। তাহা দ্বারা তৈরী হয় **প্ল্যাস্টিকের** অসংখ্য জিনিস, **কাগজ ও বোর্ড** প্রভৃতি নানারকম জিনিস। ফলে, মানুষের জীবিকা হিসাবে ইহাদের গুরুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে।

তাহাছাড়া এই বিস্তীর্ণ বন হইতে পাওয়া যায় শ্বেত ভল্লুক, শ্বেত শৃগাল, সেবল, মার্টেন, আরমাইন প্রভৃতি নানারকম লোমশ প্রাণীর **চর্ম** ও **পশম**। এখানকার বিভিন্ন পশুর অস্থি প্রভৃতিও যথেষ্ট মূল্যবান্। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু লোক এসকল জিনিস সংগ্রহ ও তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এখানে আসেন।

(চ) তুন্দ্রা অঞ্চল

উত্তর গোলার্ধের মহাদেশসমূহের (এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার) উত্তর সীমার কতক স্থান (সাধারণতঃ সুমেরুবৃত্তের উত্তরদিকে অবস্থিত) এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এসকল স্থানে বৎসরের কয়েক (২।৩) মাস দিবাভাগে বায়ুমণ্ডলে ২০° সে উষ্ণতা থাকে, কিন্তু রাত্রিতে উষ্ণতা অনেক নীচে (হিমাঙ্কে বা তাহার নিম্নে) নামিয়া যায়। কাজেই এখানে প্রকৃত **গ্রীষ্মকাল নাই**। বৎসরের বাকী সময় দিবাভাগে উষ্ণতা কখনও হিমাঙ্কের কাছাকাছি ও **অধিকাংশ সময় হিমাঙ্কের নীচে** থাকে। এপ্রকার তীব্র শীতের জন্য এখানে বড় গাছ জন্মে না। তবে যে সময় উষ্ণতা সামান্য বেশী থাকে তখন কিছু গুল্ম ও শৈবাল জন্মে। তবে এই সময়ই এখানে কতক ফুল ফুটে। তাহাদের মধ্যে আইসল্যাণ্ড পপি, ফরগেট-মি-নট, রকরোজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

খাদ্য—এখানে তীব্র শীতের জন্য লোকবসতি অতি সামান্য। সুতরাং খাদ্যের প্রয়োজন কম। এখানকার লোকের প্রধান খাদ্য মাছ ও মাংস। এখানে **বল্গাহরিণ** ও **ক্যারিবু** (এক জাতীয় হরিণ) পালন করা হয়। সুতরাং তাহাদের মাংস সুলভ। তারপর এই অঞ্চলের পাশে উত্তর মহাসাগরে প্রচুর **মাছ** ধরা হয়। আর এখানে **পাখীও** শিকার করা হয় অনেক। সুতরাং আমিষ জাতীয় খাদ্য এখানে প্রচুর। পূর্বে এখানে পানীয় জলের অভাব ছিল। ক্রমশঃ উষ্ণ জলের পাইপের পাশে পাশে পানীয় জলের পাইপ বসাইয়া এখানে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। ভূগর্ভে Hot house তৈরী করিয়া তথা হইতে উষ্ণতা সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং তাহার সাহায্যে ২।৩ মাস (উষ্ণতা অপেক্ষাকৃত বেশী থাকাকালে) সামান্য কৃষির ব্যবস্থা হইতেছে। খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ সম্বন্ধে ইহার গুরুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে।

ইগলু

ঘরবাড়ি—এখানে বৎসরের বেশীর ভাগ সময় প্রচুর বরফ জমা থাকে। তাহার বড় বড় টুকরার সাহায্যে আশ্রয়স্থল তৈরী করিয়া তাহার মধ্যেই বসবাসের রীতি এখানে পূর্বকাল হইতে প্রচলিত ছিল। এরূপ আশ্রয়স্থল **ইগলু** নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে প্রবেশের পথ (দরজা) অত্যন্ত ছোট (হামাগুড়ি দিয়া চলিবার মত)। তীব্র শীতল বায়ুপ্রবাহ, হিংস্র শ্বেত ভল্লুক প্রভৃতি জন্তুকে বাধা দেওয়ার জন্য বরফস্তূপের সাহায্যে ইগলুর সামনে দেওয়াল তৈরী করা হয়। আর বৎসরের যে কয়েকমাস বরফ গলিয়া যায় তখন এখানকার লোকেরা বাস করেন সীলের চামড়ার তৈরী **তাঁবুতে**। তবে আজকাল বরফস্তূপের নীচ হইতে পাথরের টুকরা খুঁড়িয়া নিয়া এবং সমুদ্রে ভাসমান কাঠ, গাছ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া বা অন্যান্য স্থান হইতে কিছু কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক ঘরবাড়ি তৈরী হইতেছে।

এস্কিমোদের তাঁবু

জীবিকা—**বল্গাহরিণ ও ক্যারিবু** (হরিণ) **পালন** এখানকার লোকের প্রধান জীবিকা। যাতায়াত ও পরিবহনের সুবিধার জন্য এখানে পালন করা হয় **স্লেজ কুকুর**। (ইহারা বরফের উপর দিয়া স্লেজগাড়ি টানিয়া নেয়।) ইউরোপের উত্তর সীমার ল্যাপল্যাণ্ডে কিছু খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য অংশের মানুষও এখানে আগেকার তুলনায় বেশী আসিতেছেন। ইহাদের সহিত মেলামেশার ফলে এখান হইতে বল্গাহরিণ, ক্যারিবু প্রভৃতির **মাংস**, সীলের চর্ম প্রভৃতি অন্যত্র **রপ্তানি** হইতেছে।

এস্কিমোদের স্লেজগাড়ী

আবার মোটা ও গরম জামা কাপড়, কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক জিনিস

চর্ম সংগ্রহের জন্য শাল শিকার করিয়া এস্কিমো গৃহে ফিরিতেছেন

এখানে আমদানি হইতেছে. ফলে, মানুষের জীবিকা হিসাবে বাণিজ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। এখানে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থারও উন্নতি হইতেছে।

অনুশীলনী

১। মৌসুমী অঞ্চলের এরূপ নামকরণের কারণ কি? এখানকার জলবায়ু, বিশেষ ভাবে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের অবস্থা এবং কারণ বর্ণনা কর. এখানকার লোকবসতি কিরূপ? কেন? এখানকার লোকের উপজীবিকা বর্ণনা কর. এখানে কোন্ কোন্ ফসল অধিক উৎপন্ন হয় এবং কোন্ কোন্ শিল্প অধিক উন্নত?

২। নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবায়ু বর্ণনা কর। এখানে কোন্ জাতীয় উদ্ভিদ অধিক জন্মে? এখানকার বিভিন্ন অংশের বনের নাম লিখ। এখানে লোকবসতি কিরূপ ও কেন? এখানকার লোকের ঘরবাড়ির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। এখানকার অর্থনৈতিক উন্নতির

পক্ষে বাধা কি? কিভাবে তাহা দূর করা যায়? ৩। সাভানা অঞ্চল কাহাকে বলে? পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এই জাতীয় অঞ্চল কোন্ কোন্ নামে পরিচিত? এখানকার স্বাভাবিক উদ্ভিদ কিরূপ? এখানকার লোকের প্রধান জীবিকা বর্ণনা কর। আগেকার তুলনায় আজকাল এবিষয়ে কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়? ৪। পৃথিবীর কোন্ অংশে উষ্ণ মরু অধিক বিস্তৃত? এসকল স্থানের জলবায়ু কিরূপ? নাতিশীতোষ্ণ মরু কাহাকে বলে? এরূপ মরুভূমি কোথায় দেখা যায়? মরুঅঞ্চলে লোকবসতি কিরূপ? কেন? এখানে লোকের ঘরবাড়ি কিরূপ? মরু-অঞ্চলের কোন্ কোন্ অংশে অর্থনৈতিক উন্নতি অধিক? তথাকার লোকের জীবিকা উল্লেখ কর। ৫। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। তথাকার এপ্রকার বৈশিষ্ট্যের কারণ কি? পৃথিবীর কোন্ কোন্ অংশে এই জাতীয় জলবায়ু দেখা যায়? এসকল স্থানের স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য কি? এখানকার লোকের জীবিকা উল্লেখ কর। ৬। সামুদ্রিক পশ্চিম উপকূল অঞ্চল বলিলে কোন্ কোন্ স্থান বুঝায়? ঐ সকল স্থানের জলবায়ু কিরূপ? তথাকার লোকবসতি ও তাহাদের জীবিকা বর্ণনা কর। ৭। নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি পৃথিবীর কোন্ কোন্ অংশে দেখা যায়? উহাদের কোন্‌টি কি নামে পরিচিত? ঐ সকল স্থানের জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ বর্ণনা কর। তথায় লোকের প্রধান জীবিকা কি? কেন? এসকল স্থানের জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের সহিত ক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলের জলবায়ু ও উদ্ভিদের পার্থক্য উল্লেখ কর। ৮। সরলবর্গীয় বৃক্ষ কাহাকে বলে? উহাদের বৈশিষ্ট্য কি? প্রশস্ত পত্রযুক্ত চিরহরিৎ গাছ ও পর্ণমোচী গাছের সহিত এখানকার গাছের পার্থক্য উল্লেখ কর। প্রত্যেক অঞ্চলের কয়েকটি প্রধান গাছের নাম লিখ। সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন কোথায় অধিক বিস্তৃত? তথাকার বন কি নামে পরিচিত? তথায় লোকের জীবিকা বর্ণনা কর। ৯। তুন্দ্রা অঞ্চল কোথায়? তথাকার জলবায়ুর অবস্থা কিরূপ? তথাকার লোকের খাদ্য ও ঘরবাড়ি বর্ণনা কর। তথায় লোকের জীবিকা কি? ১০। ভাসমান বরফের রাজ্য কোথায়? তথাকার এরূপ অবস্থার কারণ কি? ১১। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে উচ্চ পর্বতসমূহের পাদদেশ হইতে ক্রমশঃ উপরদিকে জলবায়ু ও উদ্ভিদের কিরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়? কেন?

তৃতীয় ভাগ

সম্পদ ও অর্থনৈতিক কার্যাবলী

সপ্তম অধ্যায়

পার্থিব সম্পদ

আমাদের পৃথিবীর সৃষ্টির কাল হইতে ইহার রূপ ও প্রকৃতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া ইহা বর্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। এই দীর্ঘ সময়ে ভূপৃষ্ঠে সৃষ্ট হইয়াছে অসংখ্য উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু। ইহাদের প্রত্যেকের সহিত লক্ষ্য করা যায় ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু প্রভৃতি বিষয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আবার ইহাদের সকলের সহিত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সম্পর্ক অতি নিবিড়। বস্তুতঃ মানুষ যখন অতি প্রাচীনকালে প্রায় পশুস্তরে ছিল, তখন বিভিন্ন প্রকার **উদ্ভিদ** ও **জীবজন্তুর** বিশেষ কোন ব্যবহার বা মূল্য ছিল না। তখন এগুলি ছিল **নিরপেক্ষ সামগ্রী**। মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির ক্রমোন্নতির ফলে উদ্ভিদ্, জীবজন্তু প্রভৃতির ব্যবহার ও মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, অর্থাৎ এগুলি মানব-সমাজের পক্ষে ক্রমশঃ অধিক **মূল্যবান্ সম্পদে** (Resource) পরিণত হইতেছে।

তাহাছাড়া মানুষ আপনাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র ভূপৃষ্ঠস্থ স্থল-মণ্ডলের উপরিভাগের এসকল জিনিস বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করিয়া ক্ষান্ত নহে। জল-মণ্ডলের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রাণী (মাছ ও অন্যান্য জলজন্তু), সামুদ্রিক উদ্ভিদ প্রভৃতিকেও মানুষ নানা কাজে ব্যবহার করিতেছে। স্থলমণ্ডলের ক্রমশঃ নীচের দিকে সন্ধান করিয়া বহু খনিজ সম্পদ আবিষ্কার ও তাহাদের সাহায্যে নূতন নূতন জিনিস তৈরী করিতেছে। তারপর বিভিন্ন খনিজ সম্পদ (কয়লা, খনিজ তৈল), বায়ু, জল প্রভৃতির সাহায্যে নূতন নূতন শক্তির উৎস আবিষ্কার করিতেছে। বস্তুতঃ এভাবে বিভিন্ন উপাদান আবিষ্কারের ফলে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে পৃথিবী অনন্ত সম্পদের অফুরন্ত আকর। অপরদিকে মানুষও যে পৃথিবীর অন্যান্য জীবের তুলনায় কত অধিক উন্নত স্তরের প্রাণী তাহাও প্রমাণিত হইতেছে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ মানুষের আকাশপথে পরিভ্রমণ, চন্দ্রে অবতরণ, সম্প্রতি মানুষের তৈরী ভাইকিং আকাশযানের মঙ্গল গ্রহে অবতরণ ও পৃথিবীর মানুষের নির্দেশে তথায় যন্ত্রের মাধ্যমে নানা কাজের কথা ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন সম্পদের মধ্যে উদ্ভিজ্জ ও খনিজ সম্পদ এবং শক্তির উৎস সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(ক) উদ্ভিজ্জ সম্পদ

প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত স্বাভাবিক উদ্ভিদের সম্পর্ক—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত স্বাভাবিক উদ্ভিদের সম্পর্ক **সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ।** কারণ, উদ্ভিদ্ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত এক স্থানেই থাকে (জীবজন্তুর মত স্থান ত্যাগ করিতে পারে না) এবং তাহার সকল অবস্থা প্রকৃতির প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ঐ প্রভাব অনুসারেই বীজ হইতে অঙ্কুর হয়, তারপর চারা গাছ বড় হয়, তাহা অসংখ্য ফল ফুলে সুশোভিত হয় এবং শেষে উদ্ভিদের মৃত্যু হয়। সেজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা প্রভৃতির তারতম্য অনুসারে কোথাও আছে ঘন বন, কোথাও বা আছে ফাঁকা ফাঁকা গাছ। কোথাও আছে বড় তৃণময় ভূমি, আর কোথাও আছে ছোট ছোট ঘাসে ঢাকা সবুজ গালিচার মত তৃণাঞ্চল। বিভিন্ন স্থানের **স্বাভাবিক উদ্ভিদের** অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তথাকার **প্রাকৃতিক পরিবেশ** অর্থাৎ ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায় এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে নিম্নলিখিত **সম্পর্ক** সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

(১) **ভূপ্রকৃতি**—ভূকৃতির বিভিন্ন বিষয় বা অবস্থা, যথা—ভূমির উচ্চতা, উচ্চ-ভূমির ঢাল (Slope), উহার বিস্তৃতি (Direction) প্রভৃতির সহিত উদ্ভিদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। যেমন, ভূমির উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা হ্রাস হয়। ফলে, পর্বতের নিম্ন অংশের প্রশস্ত পত্রের বৃক্ষের পরিবর্তে উপরদিকে জন্মে সরুপাতা-যুক্ত সরলবর্গীয় বৃক্ষ।

(২) **মৃত্তিকা**—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মৃত্তিকার গঠন এবং উপাদানের পার্থক্যের ফলেও উদ্ভিদের পার্থক্য ঘটে। যেমন, শুষ্ক বালুকাময় স্থানে জন্মে অতি সামান্য খেজুর, বাবলা, ফণিমনসা প্রভৃতি কাঁটা-যুক্ত গাছ ও গুল্ম। আর সমুদ্রতীরের লোনা কাদা মাটিতে জন্মে সুঁদরী, গেওয়া, গরান প্রভৃতি শক্ত কাঠের গাছ।

(৩) **সূর্য্যরশ্মি ও বায়ুর উষ্ণতা**—সূর্যরশ্মি ও সৌরতাপের সহিত বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার সম্পর্ক সুস্পষ্ট। আবার বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে জন্মে চিরহরিৎ, পর্ণমোচী ও সরলবর্গীয় বৃক্ষ এবং গুল্ম ও তৃণ। এ সম্পর্কে ইহা উল্লেখযোগ্য যে গ্রীষ্মকালে ১০° সেঃ-র কম উষ্ণতাতে উদ্ভিদ্ জন্মিতেই পারে না। এজন্য ভূপৃষ্ঠের অতি শীতল অঞ্চল আর্দ্রতা সত্ত্বেও প্রায় উদ্ভিদ্‌শূন্য।

(৪) **বায়ুপ্রবাহ**—বায়ুপ্রবাহের সহিত মেঘ ও বৃষ্টির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, আবার বৃষ্টির সহিত উদ্ভিদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বায়ুপ্রবাহের সহিত সাক্ষাৎভাবেও উদ্ভিদের সম্পর্ক খুব নিবিড়। কোথাও বায়ু অধিক বেগে প্রবাহিত হইলে উদ্ভিদ্ হইতে অধিক জলীয়

বাষ্প নিঃসরণ হয়। ফলে, তথায় বিস্তৃত ও ঘন বন জন্মিতে পারে না। তাছাড়া টাইফুন, হারিকেন, টর্নেডো প্রভৃতি প্রবল ঝড়ের ফলে বনের ভীষণ ক্ষতি হয়।

(৫) **বৃষ্টিপাত**—বৃষ্টিপাতের সহিত উদ্ভিদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট। যেমন, কোথাও বৃষ্টির পরিমাণ যত অধিক এবং যত বেশী সময় ব্যাপিয়া বৃষ্টি হয়, তথায়
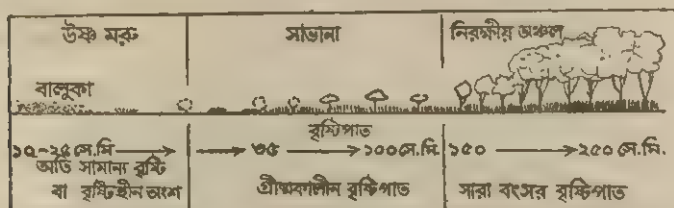
উদ্ভিদ্ তত বড় এবং তাহাদের ডালপালা তত বেশী ও ঘন। বস্তুতঃ ঐরূপ স্থানেই সৃষ্টি হয় ঘন বন। তারপর বৃষ্টির পরিমাণ ও সময় কমিবার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ্ ক্রমশঃ অধিক ছোট ও সংখ্যায় কম হইতে থাকে। সাভানা অঞ্চল ইহার উদাহরণ। আর সর্বশেষে বৃষ্টিহীন স্থান অধিক উষ্ণতা সত্ত্বেও হয় উদ্ভিদ্‌শূন্য মরুভূমি।

উদ্ভিদের সহিত মানবসমাজের সম্বন্ধ—প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত উদ্ভিদের সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্ঠ, উদ্ভিদের সহিত মানবসমাজের সম্পর্কও প্রায় তেমনই ঘনিষ্ঠ। এই সম্পর্ক দুই প্রকার—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ।

(ক) **প্রত্যক্ষ সম্পর্ক** -প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন স্থানের **বনভূমি** হইতে পাওয়া যায় নানারকম গাছের ছাল, লতাপাতা, কাঠ, ফুল, ফল, ধুনা, রজন প্রভৃতি বনজ **সম্পদ্**। বিভিন্ন গাছের কোমল কাঠদ্বারা তৈরী হয় বহু রকম আসবাবপত্র, আর মণ্ড দ্বারা তৈরী হয় কাগজ, বোর্ড, সেলুলয়েডের জিনিসপত্র প্রভৃতি নানারকম **শিল্পদ্রব্য**। কঠিন কাঠদ্বারাও বহু প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী হয়। গাছের পাতা, ফল, ফুল, ছাল, এবং বহু লতা, গুল্ম প্রভৃতির সাহায্যে তৈরী হয় **রাসায়নিক** দ্রব্য ও নানাপ্রকার **ঔষধ**। বাঁশ, বেত, বড় বড় তৃণ প্রভৃতির সাহায্যেও তৈরী হয় বহু জিনিস। আবার **তৃণভূমিতে** দেখা যায় নানারকম বন্য প্রাণী। আজকাল বিভিন্ন তৃণভূমিতে পালন করা হয় অসংখ্য মেষ, ছাগ, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি প্রাণী।

(খ) **গৌণ বা পরোক্ষ সম্পর্ক**—বনভূমি বা উদ্ভিদের সহিত মানুষের পরোক্ষ বা গৌণ সম্পর্কও কম নয়। যথা—বিভিন্ন গাছের ও ঘাসের শিকড় মৃত্তিকাকে শক্তভাবে আঁকড়াইয়া রাখে বলিয়া বৃষ্টিপাত ও বন্যা দ্বারা **ভূমির ক্ষয়** কম হয়। ফলে, মৃত্তিকার উর্বরা শক্তি হ্রাস পায় না এবং সেজন্য ফসলের উৎপাদনের হারও কমে না। তাহাছাড়া

গাছের পাতা, লতা প্রভৃতি পচা **হিউমাস সার** দ্বারা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি হয়। তারপর বন অঞ্চলে গাছের বাধার ফলে নীচের দিকে বন্যার বেগ কমে, আর উপরদিকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু কিছুটা বাধা পায় বলিয়া তথায় অধিক **বৃষ্টি** হয়। আবার অধিক বৃষ্টি বন ঘন হওয়ার পক্ষে সাহায্য করে। তাছাড়া বিস্তৃত বন অঞ্চলে ঘূর্ণীবাত বা ঝড় বাধা পাইলে উহার বেগ কতক পরিমাণে কমে। ফলে, তাহাদ্বারা মানুষের ঘরবাড়ী, শস্য প্রভৃতি নষ্ট করার শক্তিও কিছুটা কমে। আবার কোথাও কোথাও মরুভূমির পাশে বন সৃষ্টি করিয়া মরুভূমির বিস্তার বন্ধ করা হয়।

বন ধ্বংস, সংরক্ষণ ও সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের প্রভাব—পূর্বে পৃথিবীর ৪০% বনভূমি ছিল, কিন্তু এখন মাত্র ২৫-২৭% বনভূমি। তাই বিভিন্ন দেশের বনের যাহাতে আর বেশী ক্ষতি না হইতে পারে সে উদ্দেশ্যে, বিশেষতঃ উদ্ভিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া মানুষ সর্বত্র **বনসমূহ সংরক্ষণের** ও **নূতন বন সৃষ্টির** জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে।

বিভিন্ন মহাদেশে বনসমূহের বিস্তৃতি—বিভিন্ন মহাদেশে বনসমূহের বিস্তৃতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত অবস্থা সহজেই লক্ষ্য করা যায়ঃ—

এশিয়া—এই মহাদেশের প্রায় ২০% বনভূমি। সমস্ত পৃথিবীর মোট বনের ১৩% এখানে। এরূপ বনের বৃহত্তর অংশের গাছ পর্ণমোচী, চিরহরিৎ ও মিশ্র জাতীয় এবং বন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত মৌসুমী ও নিরক্ষীয় অঞ্চলে অধিক বিস্তৃত।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র—এদেশের বনভূমি এশিয়া এবং ইউরোপ উভয় মহাদেশে বিস্তৃত। এখানকার বনের অধিকাংশ (৮০%) **সরলবর্গীয়** বৃক্ষের এবং কম (দক্ষিণ) অংশ পর্ণমোচী বৃক্ষের বন। উভয় প্রকার বন মিলিয়া এদেশের অরণ্য অঞ্চল **পৃথিবীতে বৃহত্তম**।

আফ্রিকা—এখানকার মোট আয়তনের ১৫% বনভূমি। পৃথিবীর মোট বনের মাত্র ১১% এখানে অবস্থিত। এই মহাদেশের মধ্যভাগের বনের গাছ চিরহরিৎ ও প্রশস্ত পত্রযুক্ত। এই মহাদেশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অভাব।

উত্তর আমেরিকা—এখানকার প্রায় ৩১% বন। পৃথিবীর ১৯% বন এখানে অবস্থিত। এখানকার বনের ৭০% গাছ সরলবর্গীয়।

দক্ষিণ আমেরিকা—উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুর ফলে এখানকার মোট আয়তনের ৪০% বনভূমি। পৃথিবীর আর কোন মহাদেশে আয়তনের তুলনায় এত বেশী বন নাই। পৃথিবীর ২৮% বন এখানে অবস্থিত অর্থাৎ এশিয়ার বনের আয়তনের চেয়ে সামান্য

কম। এখানে **প্রশস্ত পত্রযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষের বন সর্বাপেক্ষা অধিক।** এই মহাদেশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন নাই।

ইউরোপ—এখানকার উত্তর অংশের আর্দ্র জলবায়ুর ফলে এখানকার ৪০-৪৪% বনভূমি। সমস্ত পৃথিবীর ১২% বন এখানে অবস্থিত। এখানকার বনের ৫৫-৬০% গাছ **সরলবর্গীয়**।

ওশিয়ানিয়া—এখানকার মাত্র ৯% বনভূমি। পৃথিবীর মোট বনভূমির মাত্র ২% এখানে অবস্থিত। তাহার ৯০% প্রশস্ত পত্রযুক্ত পর্ণমোচী গাছের বন।

অ্যান্টার্কটিকা—দক্ষিণ মেরুর নিকটবর্তী এই ভূভাগের আয়তন প্রায় ইউরোপের আয়তনের সমান। তবে তীব্র শীতের জন্য ইহা উদ্ভিদশূন্য।

বিভিন্ন বনজ সম্পদ্ ও তাহাদের ব্যবহার—বিভিন্ন বন হইতে সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় কাঠ। আর পাওয়া যায় কতক ফল মূল, রস ও অন্যান্য বনজ দ্রব্য। মানবসমাজের নানা কাজে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী।

(ক) **কাঠ সরবরাহ ও কাষ্ঠশিল্প**—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যে সকল কাঠ পাওয়া যায় তাহাদের কতক শক্ত, কতক কোমল। এরূপ বিভিন্ন জাতীয় কাঠ নিম্নলিখিত নানা কাজে ব্যবহৃত হয়:

(১) **জ্বালানি কাঠ**—পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক কাঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জ্বালানি কাঠের ৭০% কঠিন কাঠ। কয়লা, গ্যাস, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতির ক্রমশঃ অধিক ব্যবহারের ফলে জ্বালানি কাঠের চাহিদা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। আবার বনসমূহ ক্রমশঃ কাটিয়া ফেলিবার ফলে জ্বালানি কাঠের সরবরাহও কমিয় যাইতেছে।

(২) **নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত কাঠ**—বৃহৎ বন অঞ্চলের আশ-পাশে সুবিধাজনক স্থানে **কাষ্ঠ-শিল্পের বড় বড় কেন্দ্র** আছে। বিভিন্ন বন হইতে বড় বড় ট্রাকের সাহায্যে কাঠের গুঁড়ি ঐ সকল কেন্দ্রে আনা হয়। তারপর তথায় অনেক করাতঘরে (Saw mill) স্বয়ংক্রিয়
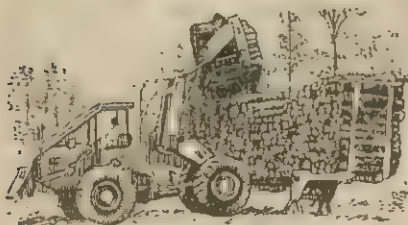
(Automatic) ও অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে গাছের গুঁড়িগুলিকে কাটিয়া বিভিন্ন মাপের কাঠের তক্তা ও টুকরা তৈরী করা হয়। পৃথিবীর $\frac{১}{২}$ অংশ কাঠ ঘরবাড়ী, কল-কারখানা, আসবাবপত্র, সেতু, স্টীমার, নৌকা, রেলগাড়ী, ট্রাক, মোটর গাড়ী প্রভৃতি নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত হয়। কতক কাঠের বাড়ি (প্রাচীন প্রাসাদ, মন্দির বা প্যাগোডা) তাহাদের সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। বর্তমানে ঘরবাড়ী, সেতু প্রভৃতি নির্মাণকার্যে ইট, পাথর, সিমেন্ট, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতির ক্রমশঃ অধিক ব্যবহারের ফলে এসকল কাজে কাঠের চাহিদা কমিয়া যাইতেছে। অপরদিকে কাঠকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে অধিকতর শক্ত করা হইতেছে এবং ঘরের বা অপর যে-কোন জিনিসের ভিতরের জায়গা যাহাতে কমিয়া না যায় সেই উদ্দেশ্যে মোটা কাঠের পরিবর্তে সরু প্লাইউড ক্রমশঃ অধিক ব্যবহৃত হইতেছে।
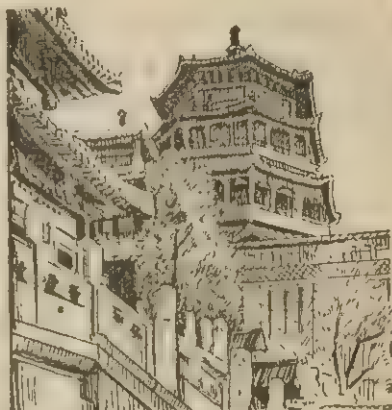
কাঠের তৈরী প্রাচীন প্রাসাদ

(৩) **কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজ**—পৃথিবীর $\frac{১}{১০}$ অংশ কাঠ ব্যবহৃত হইতেছে কাষ্ঠমণ্ড (Wood pulp), কাগজ ও প্ল্যাস্টিকের (কৃত্রিম কাঠ) নানা-রকম জিনিস তৈরীর উদ্দেশ্যে। এজন্য অনেক কাঠের টুকরা গুঁড়া করিয়া তাহাদিগকে রাসায়নিক পদার্থের সহিত মিশাইয়া প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী করা হয়।

শিক্ষার প্রসারের ফলে পৃথিবীর সর্বত্র কাগজের চাহিদা বাড়িতেছে এবং কাগজ শিল্পের উন্নতি হইতেছে। কাগজের ৯০% উপাদান **পাইন, ফার, হেমলক, স্প্রুস** প্রভৃতি সরলবর্গীয় গাছের কোমল কাঠের মণ্ড। তবে উষ্ণ মণ্ডলে কতক শক্ত কাঠ, বাঁশ, সাবই ঘাস প্রভৃতি দ্বারাও কাগজের মণ্ড তৈরী হয়।

পৃথিবীর দুইটি অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী কোমল কাঠ, প্রচুর নরম জল ও জলজ বিদ্যুৎশক্তি, প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি, প্রচুর মূলধন এবং কাগজ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস অধিক পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থানে যাতায়াত এবং পরিবহনের ব্যবস্থাও উত্তম। তাই তথায় কাগজশিল্প অধিক উন্নত। এই অঞ্চল দুইটির মধ্যে একটি (ক) **উত্তরপশ্চিম ইউরোপের** অন্তর্গত সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র,

ফিন্‌ল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, জার্মানী (পূঃ ও পঃ) এবং যুক্তরাজ্য। দ্বিতীয় অঞ্চল (খ) যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরপূর্ব ও ক্যানাডার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ। তথা হইতে হ্রদ অঞ্চল হইয়া পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত এই শিল্প বিস্তৃত। জাপানেরও কাগজ শিল্প উন্নত।

(৬) **কৃত্রিম রেশম ও প্লাস্টিকের জিনিস**—কোমল কাঠের মণ্ড দ্বারা কৃত্রিম রেশম ও প্লাস্টিকের নানারকম কাপড়, বর্ষাতি (Rain coat), রেডিওর বাক্স, চিরুণী, ব্যাগ, জুতা, কৃত্রিম দাঁত ইত্যাদি অসংখ্য জিনিস তৈরী হইতেছে। জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি এবিষয়ে অগ্রণী।

(৫) **রেলপথের স্লিপার**—পৃথিবীর প্রায় ২% কাঠ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

(৬) **খনির জন্য কাঠ**—বিভিন্ন খনিতে প্রচুর কাঠ ব্যবহৃত হয়। খনির ভিতর হইতে কয়লা বা অন্যান্য খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করার পর ঐ স্থান যাহাতে ধসিয়া না পড়ে এই উদ্দেশ্যে খনির ভিতর বিস্তর কাঠের খুঁটি দেওয়া হয়।

(৭) **অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত কাঠ**—কাঠের সাহায্যে অসংখ্য রকম প্যাকিং বাক্স, নানারকম সৌখীন জিনিস এবং নিত্য প্রয়োজনীয় বহু জিনিস, আসবাবপত্র ইত্যাদি তৈরী হয়। তাছাড়া এলকহল, গ্লুকোজ প্রভৃতি বহু জিনিসও কাঠের সাহায্যে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে তৈরী হইতেছে।

(খ) **অপরাপর বনজ সম্পদ্**—বহু গাছের পাতা-লতা, শিকড়, ফুল, ফল প্রভৃতি নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের কতক সোজাসুজি (direct) খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আর কতক দ্বারা ঔষধপত্র ও রঙ তৈরী হয়। আলকাতরা, রজন, লাক্ষা, মোম, মধু প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য বনজ সম্পদ্।

উদ্ভিদ্ অঞ্চলসমূহের শ্রেণীবিভাগ ও বিস্তার

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ্ জন্মে। ফলে, কতক অংশে আছে ঘন ও বিস্তৃত বন, কোথাও বা আছে তৃণভূমি।

(ক) **তৃণভূমিসমূহ** দুই ভাগে বিভক্ত। যেমন—

(১) ক্রান্তীয় তৃণভূমি ও (২) নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি। ইহাদের বিষয়ে পরে পশুপালন ও প্রাণিজ সম্পদ্ সম্পর্কে আলোচিত হইবে।

(খ) **বনভূমিসমূহ** তিন ভাগে বিভক্ত। যেমন—

(১) উষ্ণ মণ্ডলের চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি, (২) উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি এবং (৩) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি।

মোটামুটি হিসাবে প্রথম দুই প্রকার বনে **প্রশস্ত পত্রযুক্ত বৃক্ষ** অধিক। পৃথিবীর

প্রায় ৬৪% বন এই দুই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং ইহাদের প্রায় ৮০% উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত। বনসমূহের তৃতীয় বিভাগ **সরুপত্রযুক্ত সরলবর্গীয় বৃক্ষের** বন (মোট বনের ৩৫%)। এরূপ প্রায় সমুদয় বন নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক, যে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের **প্রাচীন বনভূমির** অবশেষ হিসাবে বর্তমানে পাহাড়, পর্বত ও মালভূমিতে বন দেখা যায়। সমভূমির বন প্রায় নিশ্চিহ্ন। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের **বর্তমান কালের** বিস্তীর্ণ বনসমূহের ও তাহাদের প্রত্যেকের বনজ সম্পদের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(১) নিরক্ষীয় অঞ্চলের চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি

দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকা, মধ্য-আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকা এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি স্থান নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। তথায় সারা বৎসরব্যাপী উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুর জন্য **প্রশস্ত পত্রযুক্ত চিরহরিৎ** বৃক্ষের (Broad leaved evergreen trees) **সবচেয়ে ঘন** ও সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত বন আছে। তাহাদের মধ্যে আমাজন ও কঙ্গো নদীর অববাহিকার কতক বন এত ঘন, এত হিংস্র জন্তুপূর্ণ, যাতায়াতের পক্ষে এত অসুবিধাজনক এবং তথায় রোগের প্রাদুর্ভাব এত বেশী যে তথা হইতে বনজ সম্পদ্ সংগ্রহ করা কষ্টকর।

কাষ্ঠ সম্পদ এই অঞ্চলে সবচেয়ে দামী কাঠ **মেহগ্যানি,** তারপর **আবলুস** (Ebony)। ব্রেজিল, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং আফ্রিকার গিনি উপকূলে মেহগ্যানি অধিক পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের **সেগুন,** গোলাপ কাঠ (Rose wood) প্রভৃতি শক্ত কাঠ এবং সিডার নামক নরম কাঠদ্বারা দামী আসবাবপত্র তৈরী হয়।

অন্যান্য উদ্ভিজ্জ সম্পদ—এই অঞ্চলে বনে প্রচুর **বাঁশ ও বেত** জন্মে। তাহা দ্বারা ঘরবাড়ী ও মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় অসংখ্য জিনিস তৈরী হয়। এখানকার বনের বিভিন্ন গাছ হইতে রবার, লাক্ষা, মোম (Wax), কর্পূর, ব্রেজিল নাট এবং চুইংগাম তৈরীর জন্য চিক্ল্ প্রভৃতি নানা জিনিস পাওয়া যায়। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতির স্বাভাবিক বনের কতক অংশ পরিষ্কার করিয়া তথায় রবার, চা, তাল, নারিকেল, কলা, আনারস প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। এগুলি উদ্ভিজ্জ সম্পদ (বনজ সম্পদ নহে)।

(২) মৌসুমী অঞ্চলের মিশ্র বনভূমি

মৌসুমী অঞ্চলে শীতকালে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের বিশেষ অভাব হয় এবং মাটি শুষ্ক থাকে। সেজন্য গাছগুলি তখন জল পায় না। কাজেই গাছের ভিতর হইতে

জলীয় বাষ্প যাহাতে তখন পাতার মধ্য দিয়া নির্গত হইতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে তথাকার অনেক গাছের পাতা শীতকালের প্রারম্ভে ঝরিয়া পড়ে। ফলে, **দক্ষিণ-পূর্ব**

এশিয়ার বিস্তীর্ণ মৌসুমী অঞ্চল, পূর্ব আফ্রিকার আবিসিনিয়া, উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো উপকূল প্রভৃতি স্থানে দেখা যায় **পর্ণমোচী** (Deciduous) গাছের বিস্তীর্ণ বনভূমি। তবে এই অঞ্চলের কতক অংশে গ্রীষ্মকালে দীর্ঘদিন ধরিয়া এত বৃষ্টি হয় এবং জমি এত ভিজা থাকে যে, শীতকালেও গাছের জল পাওয়ার পক্ষে বেশী অসুবিধা হয় না। তাই ভারতে হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চল, আসাম প্রভৃতি স্থানে **চিরহরিৎ** গাছও প্রচুর জন্মে।

কাষ্ঠ সম্পদ—এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ কাঠ **সেগুন** (Teak)। ব্রহ্মদেশের সেগুন সর্বোৎকৃষ্ট। তথাকার এবং থাইল্যাণ্ড, ভিয়েটনাম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের ও ভারতের মধ্যপ্রদেশের সেগুন (C.P. Teak) কাঠ দ্বারা উৎকৃষ্ট আসবাবপত্র তৈরী হয়। এখানকার শাল, লোহা কাঠ (Iron wood), জারা, কৌরি, পিনগাডো, বট, অশ্বত্থ, চন্দন, খদির, জারুল, হলুদ, শিশু, গর্জন, চাপলাস প্রভৃতি নানারকম গাছের কাঠ দ্বারা আসবাবপত্র, ঘরবাড়া, সেতু, নৌকা, গাড়ী প্রভৃতি তৈরী হয়। পিনগাডো, জারা ও কৌরি কাঠ দ্বারা তৈরী হয় রেলপথের স্লিপার।

অন্যান্য উদ্ভিজ্জ সম্পদ—এখানেও বনে প্রচুর বাঁশ ও বেত জন্মে। এখানে **কাগজ** তৈরার জন্য বাঁশ অধিক ব্যবহৃত হয়। লাক্ষা, মোম, মধু প্রভৃতি বনজ দ্রব্যও এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। তাছাড়া এই অঞ্চলে আম, কাঁঠাল, জাম, বেল, লিচু, কলা, আনারস, নারিকেল প্রভৃতি ফল যথেষ্ট পাওয়া যায়। এগুলি মূল্যবান্ উদ্ভিজ্জ সম্পদ (বনজ সম্পদ নহে)। ফরমোসা দ্বীপে পৃথিবীর ৭৫% স্বাভাবিক কর্পূর পাওয়া যায়।

৩) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পূর্বদিকের অংশে গ্রীষ্মকালে ও পশ্চিম অংশে শীতকালে বৃষ্টি হয়; অর্থাৎ দুই অংশেই একটি একটি শুষ্ক ঋতু আছে। তাই এই অঞ্চলের অন্তর্গত **ইউরোপের পশ্চিম** অংশে ফ্রান্স, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, **এশিয়ার পূর্ব** অংশে চীন, জাপান, **দক্ষিণ আমেরিকার** পূর্ব অংশে ব্রেজিল, পশ্চিম অংশে চিলি দেশ, এবং **উত্তর আমেরিকার** পূর্ব অংশে এপালেচিয়ান অঞ্চল ও পশ্চিম দিকে পার্বত্য অঞ্চলের **নিম্ন অংশে** পর্ণমোচী বৃক্ষের বন আছে। তথাকার বনজ সম্পদ্ নিম্নলিখিত প্রকার :—

কাষ্ঠ সম্পদ—এই অঞ্চলে ওক, ওয়াল্‌নাট, এল্‌ম, মেপল, বীচ, স্প্রুস, পপ্‌লার, চেস্টনাট, হিকোরি প্রভৃতি গাছ প্রচুর জন্মে। ইহাদের কাঠ দ্বারা আসবাবপত্র, ঘরদরজা, জাহাজ, রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী প্রভৃতি তৈরী হয়।

অন্যান্য উদ্ভিজ্জ সম্পদ—এই অঞ্চলের **মেপল** গাছের রস দ্বারা চিনি তৈরী হয়। আর কতক অংশে বাদাম, আখরোট ও লেবু প্রভৃতি ফল জন্মে। এগুলিও আমাদের দেশের আম, কাঁঠাল প্রভৃতির মত উদ্ভিজ্জ সম্পদ (বনজ সম্পদ নহে)।

(৪) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি

উত্তর গোলার্ধে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের শীতলতর অংশে (দক্ষিণে ৪৫° উঃ অঃ হইতে উত্তরে প্রায় সুমেরু বৃত্ত পর্যন্ত) সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি বিস্তৃত। এখানকার **বনভূমির** আয়তন পৃথিবীর মধ্যে **বৃহত্তম**। এরূপ বন **ক্যানাডার** পশ্চিম হইতে পূর্ব সীমা পর্যন্ত এবং **সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের** পূর্ব সীমা হইতে পশ্চিমে **ফিন্‌ল্যাণ্ড, সুইডেন** ও **নরওয়ে** পর্যন্ত বিস্তৃত।

উত্তর আমেরিকা—এই মহাদেশের সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমির বৃহত্তম অংশ **ক্যানাডাতে**। **যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম** অংশে এরূপ বন রকি পর্বত অঞ্চলের উপরিভাগে ও উপকূলে (উত্তরে আলাস্কা হইতে দক্ষিণে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত) বিস্তৃত। **পূর্বদিকে** নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলেও এরূপ বন আছে।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র—এদেশের উত্তরদিকের প্রায় অর্ধেক অংশ এরূপ বনভূমি। ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম অরণ্য এবং "**তৈগা**" নামে পরিচিত। ঐ বন এবং দক্ষিণদিকের পর্ণমোচী বৃক্ষের বন সহ এদেশে সমুদয় পৃথিবীর $\frac{১}{৫}$ অংশের অধিক বনভূমি অবস্থিত।

ইউরোপের অন্যান্য অংশ—এই মহাদেশে **ফিন্‌ল্যাণ্ডের** প্রায় ২/৩ অংশ, **সুইডেনের** প্রায় অর্ধেক এবং **নরওয়ের** সিকি ভাগ এরূপ বনভূমি। ইহা ভিন্ন ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ফ্রান্স, জার্মানী (পূঃ ও পঃ), পোল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, রোমানিয়া, ইটালি প্রভৃতি দেশে সাধারণতঃ উচ্চভূমিতে এরূপ বন আছে।

অন্যান্য স্থান—উপরিলিখিত দুই মহাদেশের বাহিরে এশিয়াতে জাপান ও চীনের উত্তর অংশে, ভারতে হিমালয় পর্বত অঞ্চলের উপরিভাগে, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতের উপরিভাগে এবং ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা ও চিলির দক্ষিণ অংশে, অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ পর্বতের উপর দিকে ও নিউ জীল্যাণ্ডের দক্ষিণ অংশে উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে এরূপ বন আছে।

সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন হইতে নিম্নলিখিতরূপ বনজ সম্পদ্ পাওয়া যায়।

কাষ্ঠ সম্পদ—পৃথিবীর **বাণিজ্যিক কাঠের** প্রায় ৮০% এই অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার পাইন, ফার, সিডার, স্প্রুস, হেমলক, লাল কাঠ (Red wood), বার্চ, দেবদারু প্রভৃতি গাছ হইতে পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম অংশের কতক **ডগলাস ফার** গাছ ৮০ মি উঁচু। এই অঞ্চলের লাল, হল্‌দে ও সাদা **পাইন,** রেড সিডার, রেড উড প্রভৃতি গাছের সুন্দর কাঠের সাহায্যে আসবাবপত্র, জাহাজ, নানারকম গাড়ী ইত্যাদি তৈরী হয়।

অন্যান্য বনজ সম্পদ্—এখানকার নরম কাঠ দ্বারা প্যাকিং বাক্স, দিয়াশলাই, খেলার সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি তৈরী হয়। কোমল **কাঠের মণ্ড** দ্বারা কাগজ, কৃত্রিম রেশম ও প্ল্যাস্টিকের জিনিসপত্র প্রভৃতি তৈরী হয়। এখান হইতে ধুনা, রজন, তার্পিন তৈল প্রভৃতিও পাওয়া যায়।

অন্যান্য অঞ্চলের বনভূমি

পৃথিবীর আরও দুইটি অঞ্চলে বনভূমি আছে। তবে সেগুলি ছোট।

(ক) **পার্বত্য অঞ্চলের বনভূমি**—পৃথিবীর সর্বত্র পর্বত অঞ্চলের পাদদেশ হইতে ক্রমশঃ উপরদিকে উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের পরিবর্তন ঘটে। তাই পর্বত অঞ্চলে নীচের দিকে চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী গাছের বনভূমি, তাহার উপর সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি এবং আরও উপরে তৃণভূমি আছে।

(খ) **বদ্বীপ অঞ্চলের বনভূমি**—উষ্ণ মণ্ডলে কতক নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে লোনা মাটিতে সোঁদরী বা সুন্দরী, গরান প্রভৃতি গাছ এবং হোগলা জাতীয় উদ্ভিদের বন আছে। এরূপ বনের মধ্যে এদেশের **'সুন্দর বন'** বিখ্যাত।

ইহাদের বাহিরে পৃথিবীর আর কোথাও বিস্তীর্ণ বনভূমি নাই। বরং মেরু অঞ্চল ও মরুভূমিসমূহ বনশূন্য (তবে উদ্ভিদহীন নহে।) **মরু অঞ্চলের উদ্ভিদ্**—কতক মরূদ্যানে খেজুর, বাবলা, ফণিমনসা, পান্থপাদপ প্রভৃতি গাছ একটু বেশী আছে। উহারা প্রায় পাতাশূন্য, তবে অনেক গাছের গায়েই আছে নানারকম কাঁটা।

বিভিন্ন অঞ্চলের বনজ সম্পদের বৈদশিক বাণিজ্য—ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রেজিল ও সুইডেন হইতে **পাইন** ও **ফার** গাছের কোমল কাঠ এবং প্রচুর **কাষ্ঠমণ্ড** রপ্তানি হয়। আর **স্প্রুস** কাঠ অধিক রপ্তানি হয় সোভিয়েট সাধরণতন্ত্র, সুইডেন, ফিন্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে। **ওক** কাঠ সাধারণতঃ ইটালি, ফ্রান্স এবং যুক্তরাষ্ট্র হইতে রপ্তানি হয়। **সেগুন** ও **শাল** কাঠ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ হইতে বেশী রপ্তানি হয়। আর **আবলুস** ও **মেহগ্যানি** কাঠ রপ্তানি হয় ইন্দোনেশিয়া, জায়েরে (কঙ্গো গণতন্ত্র) ও ভারত হইতে।

অন্যান্য **বনজ সম্পদের** মধ্যে **রবার**, নারিকেল, সিঙ্কোনা, হরীতকী, নানাপ্রকার ফল, কতক গাছের ছাল, প্রচুর ভেষজ উদ্ভিদ্ (Medical herbs) ইত্যাদি উষ্ণমণ্ডলের বিভিন্ন দেশ হইতে সরবরাহ হয়। আর রজন, ধুনা, তার্পিন তৈল, কর্ক (বোতলের ছিপি) প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল হইতে অধিক সরবরাহ হয়।

ভারতের বনজ সম্পদ

উদ্ভিদ্ অঞ্চলের (বনভূমির) বিস্তার—এদেশে প্রাচীনকালে নানা জাতীয় গাছের বিস্তীর্ণ ও গভীর বন ছিল। কিন্তু মানবসমাজের প্রয়োজনে সমভূমি অঞ্চলের অধিকাংশ বন প্রায় নিশ্চিহ্ন। বর্তমানে দেশের সিকি ভাগেরও কম বনভূমি। এখনকার বন প্রধানতঃ **উত্তর সীমার পার্বত্য অঞ্চল** এবং দক্ষিণে **মালভূমি ও দ্বীপ অঞ্চলে** সীমাবদ্ধ। জম্মু ও কাশ্মীর, সিকিম, অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরা—পার্বত্য অঞ্চলের এই কয়টি রাজ্যের ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আয়তনের ৫০-৮০% বনভূমি। হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও কেরালার ২৫-৩০% বন। বাকী রাজ্যগুলিতে বন ১০% এর কম। রাজস্থান ও দিল্লী বনশূন্য।

বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ্—এদেশের বিভিন্ন অংশে নানা (প্রায় ৩০,০০০) ধরনের গাছপালা আছে। ইহাদের মধ্যে কতক বিরাট মহীরুহ, অপর কতক অতিক্ষুদ্র গুল্ম ও তৃণ। ৯০%-এর অধিক গাছ প্রশস্ত (চওড়া) পত্রযুক্ত **চিরহরিৎ** (পাতা একসঙ্গে ঝরিয়া পড়ে না) ও **পর্ণমোচী** (পাতা শীতকালে ঝরিয়া পড়ে) জাতীয়। মোচাকৃতি **সরলবর্গীয়** গাছ (ডালা কম ও পাতা সরু) হিমালয়ের উচ্চ অংশে সীমাবদ্ধ।

এদেশের উদ্ভিদ্ অঞ্চল—জলবায়ু ও মৃত্তিকার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনুসারে এদেশে নিম্নলিখিত উদ্ভিদ্ অঞ্চল দেখা যায়।

(১) **ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য**—হিমালয় অঞ্চলের পূর্ব অংশের পাদদেশে, পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আর্দ্র (২০০ সেমির অধিক বৃষ্টি) ও উষ্ণ জলবায়ুতে আছে নানারকম চিরহরিৎ গাছের বন। এসকল স্থানে বাঁশ, বেত, ফার্ন প্রভৃতিও প্রচুর। ছোট-বড় নানারকম গাছের জন্য এরূপ বনকে **বহুতলবিশিষ্ট** (Multi-storeyed) **অরণ্য**ও বলা হয়। এখানকার আবলুস, গর্জন, শিশু, চাপলাস, তুন, পুন, রোজ উড প্রভৃতি গাছের কাঠ মূল্যবান্।

(২) **মৌসুমী (মিশ্র বৃক্ষের) অরণ্য**—হিমালয়ের নিম্ন অংশ (তরাই ও ডুয়ার্স), উত্তর ভারতের সমভূমির পূর্ব অংশ, মধ্যভারত ও দক্ষিণাত্য মালভূমির উষ্ণ ও মধ্যম আর্দ্র (১০০-২০০ সেমি বৃষ্টি) জলবায়ুতে এদেশের বন **সবচেয়ে বিস্তীর্ণ**। এখানকার অধিকাংশ গাছ **পর্ণমোচী** জাতীয়, কতক **চিরহরিৎ**। এরূপ বন **মৌসুমী অরণ্য** নামেও পরিচিত। এখানে **শাল** গাছ সবচেয়ে বেশী, তবে **সেগুন** (Teak) কাঠ অধিক মূল্যবান্। অন্যান্য গাছের মধ্যে খয়ের, হলদু, লরেল, অর্জুন, গামর, জারুল, শিরীষ, হরীতকী, কুল, পলাশ, কুসুম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(৩) **সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য**—হিমালয়ের (২০০০-৩০০০ মি) উচ্চ অংশে মৃদুশীতল জলবায়ুতে পাইন, ফার, দেবদারু, সিডার প্রভৃতি সরলবর্গীয় গাছের বনভূমি বিস্তীর্ণ। ইহাদের কাঠ কোমল কিন্তু মূল্যবান্। আরও উপরে আছে ফুলগাছ ও তৃণগুল্ম।

(৪) **উপকূলের (লবণাক্ত মৃত্তিকা অঞ্চলের) অরণ্য**—উপকূলের (প্রধানতঃ **বদ্বীপের**) লোনামাটিতে আছে সুন্দরী বা সোঁদরী, গরান, গেঁওয়া, কেয়া প্রভৃতি গাছের বন। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপের দক্ষিণ অংশের **সুন্দরবন** বিখ্যাত। এখানকার গাছের কাঠ কম মূল্যবান্; অধিকাংশ কাঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(৫) **তৃণ ও গুল্ম অঞ্চল**—উত্তরে পঞ্জাব হইতে দক্ষিণে কর্ণাটক এবং পশ্চিমে গুজরাট হইতে মধ্যভাগে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত এদেশের বিস্তীর্ণ অংশে বৃষ্টিপাত কম (১০০ সেমির কম)। সেজন্য এখানে আছে তৃণ ও গুল্ম; মাঝে মাঝে বড় গাছ। এখানকার কতক বড় ঘাস কাগজ ও বোর্ড তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়।

(৬) **মরুপ্রায় অঞ্চল**—রাজস্থানের শুষ্ক ও মরুপ্রায় অঞ্চলে বাবলা, ফণিমনসা প্রভৃতি কাঁটা গাছ ও নিকৃষ্ট তৃণ মাত্র জন্মে।

বনজ সম্পদ—এদেশের বিভিন্ন স্থানের বন হইতে ১৯৭২-৭৩ খ্রীঃ প্রায় ১২ কোটি

টাকার **মূল্যবান্ কাঠ** ও **জ্বালানি কাঠ** পাওয়া যায়। এসকল কাঠের মধ্যে **সেগুন** ব্যবহৃত হয় আসবাবপত্র, স্টীমার, জাহাজ ও গাড়ী প্রভৃতি তৈরার জন্য। সরলবর্গীয় **পাইন, ফার** প্রভৃতি গাছের কাঠ দ্বারা তৈরী হয় আসবাবপত্র, রেডিও সেট ও অন্যান্য সুন্দর বাক্স। ঐ সকল গাছের **কোমল** অংশের **মণ্ডের** সাহায্যে তৈরী হয় প্লাইউড, কাগজ ও বোর্ড প্রভৃতি। **শাল কাঠ** দ্বারা তৈরী হয় সেতু, রেলপথের তক্তা ও কিছু কিছু আসবাবপত্র। **চন্দন কাঠ** দ্বারা তৈরী হয় সুগন্ধ দ্রব্য। **আবলুস, মেহগ্যানি** প্রভৃতির কাঠদ্বারা আসবাবপত্র ও কতক মূল্যবান জিনিস এবং **শিমূল, ছাতিম** প্রভৃতির কাঠদ্বারা দিয়াশলাই তৈরী হয়।

এদেশের বিভিন্ন বন হইতে ১৯৭৩-৭৪ খ্রীঃ প্রায় ৫৭ কোটি টাকার বাঁশ, বেত, মধু, মোম, গঁদ প্রভৃতি **বনজ সম্পদ** পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে **বাঁশ** ও **বেত** দ্বারা তৈরী হয় নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় জিনিস ও কতক সুন্দর শিল্পদ্রব্য। **কেন্দুপাতা** দ্বারা তৈরী হয় বিড়ি। **হরীতকী, আমলকী, বহেড়া** প্রভৃতির ফল ও গাছের ছালের সাহায্যে তৈরা হয় রঙ ও চামড়া মজবুত (Tan) করার উপাদান। কুল পলাশ, কুসুম প্রভৃতি গাছের ডাল হইতে পাওয়া যায় **লাক্ষা**। বহু সরলবর্গীয় গাছের রস হইতে পাওয়া যায় **গঁদ, রজন, ধুনা** ও **তার্পিন তৈল**।

অনুশীলনী

১। পৃথিবীর কোন্ কোন্ অংশে বনভূমি অধিক বিস্তৃত? এসকল বনভূমিকে কোন্ কোন্ ভাগে বিভক্ত করা হয়? কেন? ২। চিরহরিৎ প্রশস্ত পত্রযুক্ত বৃক্ষের বন কোথায় অধিক বিস্তৃত? কেন? ঐ সকল বনের প্রধান গাছগুলির নাম লিখ। ঐ সকল বনের বনজ সম্পদ বেশী পাওয়া যায় না কেন? ৩। পর্ণমোচী বৃক্ষ কোন্গুলি? কেন উহারা পর্ণমোচী? এরূপ বৃক্ষের বিস্তৃত বন কোথায় কোথায় দেখা যায়? উহাদের প্রধান বনজ সম্পদ কি? ৪। সরলবর্গীয় বন কোথায় কোথায় অধিক বিস্তৃত? ঐরূপ গাছকে সরলবর্গীয় বলা হয় কেন? ঐ সকল গাছের কাঠ কোন্ কোন্ কাজে অধিক ব্যবহৃত হয়? ৫। এদেশের কোন্ কোন্ অংশ প্রায় বনশূন্য, আর কোন্ কোন্ অংশে বন সবচেয়ে বেশী? এদেশে কোন্ জাতীয় গাছের বন সবচেয়ে বেশী জায়গাতে বিস্তৃত? এরূপ কয়েকটি গাছের নাম লিখ। ৬। কোন্ গাছকে চিরহরিৎ বলে? কেন বলে? এজাতীয় কয়েকটি গাছের নাম লিখ। এদেশের কোন্ কোন্ অংশে এরূপ গাছ বেশী? ৭। এদেশের কয়েকটি সরলবর্গীয় গাছের নাম লিখ। উহাদের বৈশিষ্ট্য কি? কোন্ কোন্ জিনিস তৈরীর

জন্য এসকল গাছের চাহিদা বেশী? ৮। মরুপ্রায় অঞ্চলে কি জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়? ৯। সমুদ্রের ধারে লোনা মাটিতে কোন্ জাতীয় গাছ বেশী? ঐরূপ গাছ কোথায় বেশী দেখা যায়? ১০। চন্দন কাঠ, শাল কাঠ, লাক্ষা—ইহাদের কোন্‌টি এদেশের কোন্ কোন্ অংশে বেশী পাওয়া যায়?

(খ) খনিজ সম্পদ্ ও শক্তির উৎস

খনিজ সম্পদ্—যে সকল উপাদান দ্বারা ভূপৃষ্ঠ গঠিত, তাহাদের সাধারণ নাম **শিলা** (Rock)। এরূপ বিভিন্ন প্রকার শিলার মধ্যে আছে একই উপাদান দ্বারা অথবা সামান্য পরিবর্তিত উপাদানের সাহায্যে গঠিত কতক **যৌগিক পদার্থ** (Compound)। ইহাদিগকে বলা হয় **খনিজ পদার্থ** (Minerals)। এসকল যৌগিক পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে যৌগিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাদের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক প্রভৃতি কেবলমাত্র একটি রাসায়নিক উপাদান দ্বারা গঠিত। মাটি খুঁড়িয়া বা **খনন করিয়া** উহাদিগকে বাহির করা হয় বলিয়া উহাদের নাম খনিজ পদার্থ। উহাদের অতি সামান্য অংশ ভূত্বকের উপরিভাগেও পাওয়া যায়।

খনিজ দ্রব্য সাধারণতঃ **অজৈব** (Inorganic) পদার্থ। এগুলি উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর মত মৃত্তিকা ও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল নহে, আর এক জায়গাতে একবারের বেশী উৎপন্নও হয় না। ইহাদিগকে **সৃষ্টি** করা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে। (অবশ্য আজকাল **কৃত্রিম উপায়ে** প্রবাল, মুক্তা প্রভৃতি মূল্যবান পাথর তৈরী হইতেছে।) এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গাছের কাঠ ও প্রাণীর হাড় প্রভৃতি জৈব পদার্থ যত শক্ত হউক না কেন, তাহা খনিজ পদার্থ নহে। তবে বিস্তীর্ণ বনভূমি অতি দীর্ঘকাল মাটির নীচে চাপা পড়িয়া থাকিলে গাছের গুঁড়িগুলি কালক্রমে রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে কয়লা নামক যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়, আর জীবজন্তুর অস্থি বা হাড় দ্বারা সৃষ্টি হয় খড়ি (Chalk)। কাজেই কয়লা, খড়ি প্রভৃতি **জৈব** (Organic) **খনিজ** পদার্থ।

খনিজ সম্পদের প্রধান বৈশিষ্ট্য—খনিজ সম্পদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এসকল বৈশিষ্ট্যের সহিত খনিজ পদার্থ আহরণের সম্পর্ক গভীর।

(ক) **উৎপত্তি**—সকল খনিজ দ্রব্য ভূপৃষ্ঠের নীচে রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে উৎপন্ন হয়। ভূপৃষ্ঠের জলবায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতির সহিত ইহাদের উৎপত্তির উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক নাই। কেবল জৈব খনিজ পদার্থের মধ্যে কয়লার গুণাগুণ অনেকটা নির্ভর করে উদ্ভিদ্ কি পরিমাণ মাটির নীচে এবং কত বেশী সময় ও কত বেশী চাপে থাকে,

তাহার উপর। বিভিন্ন জাতীয় শিলাতে কতক পৃথক্ পৃথক্ খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। যেমন, **কয়লা, খনিজ তৈল** প্রভৃতি কেবলমাত্র **পাললিক শিলাতে** পাওয়া যায়, আর স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, দস্তা প্রভৃতি পাওয়া যায় রূপান্তরিত শিলাতে।

(খ) **কেন্দ্রীভবন**—কৃষিজ ও প্রাণিজ সম্পদের তুলনায় খনিজ পদার্থসমূহ পৃথিবীর খুব অল্প স্থানে কেন্দ্রীভূত বা সীমাবদ্ধ এবং উহাদের তুলনায় খুব অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। মানুষ কেবল খনিজ সম্পদের নূতন নূতন ক্ষেত্র আবিষ্কার করিতে পারে, খনিজ পদার্থ সৃষ্টি বা তৈরী করিতে পারে না।

(গ) **খনিজ সম্পদের পরিমাণ** (Reserve)—ইহাদের পরিমাণ প্রকৃতি দ্বারা নির্দিষ্ট। পৃথিবীর কোন্ দেশে কোন্ জাতীয় খনিজদ্রব্য কি পরিমাণে আছে, তাহা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত (Uncertain)। তাই বিভিন্ন দেশে ইহাদের কোন্‌টির মোট পরিমাণ (Total reserve) কত, তাহা জানিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে, নূতন নূতন খনির সন্ধানও হইতেছে। সেজন্য খনিজ পদার্থের পরিমাণ কোন সময়ই সুনির্দিষ্ট নয়। কৃষিজ ও প্রাণিজ সম্পদ্ এক বারের বেশী ব্যবহার করা যায় না, কিন্তু কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি কতকগুলি ভিন্ন বাকী খনিজ সম্পদ্ **বার বার ব্যবহার** করা যায়। সোনা, রূপার জিনিস বার বার ভাঙ্গিয়া নূতন জিনিস তৈরীর উদাহরণ অনেকেই জানেন। তাহাছাড়া বহু দেশে ইস্পাত শিল্পের জন্য প্রচুর লৌহটুকরা (Iron scrap) ব্যবহৃত হয়। কাজেই খনিজ সম্পদের মোট পরিমাণ নির্ণয়ের সময় পুরান জিনিসের সহিত নূতন উৎপাদনের পরিমাণ যোগ করা আবশ্যক।

(ঘ) **সন্ধান ও আবিষ্কার**—খনিজ পদার্থ সাধারণতঃ ভূপৃষ্ঠের নীচে থাকার ফলে ইহাদিগকে আবিষ্কার করার ও ইহাদের পরিমাণ নির্ণয় করিবার জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এরূপ কাজ যথেষ্ট ব্যয়সাধ্যও বটে। কখন কখন ইহাদের আবিষ্কার ভাগ্যের (Chance) উপর নির্ভর করে। আবার কখনও বা আবিষ্কৃত খনির আশপাশে অনুমান করিয়াও খনন কার্য করা হয়। তাহার কতক সফলও হয়।

(ঙ) **খনন** (Exploitation)—ইহাদের খনন ও উত্তোলন কার্য খুব ব্যয়সাধ্য। পৃথিবীর প্রত্যেক খনির মধ্যস্থিত খনিজ পদার্থেরই পরিমাণ সীমাবদ্ধ। কাজেই খনি যত বেশী গভীর, খনিজ পদার্থ উৎপাদনের ব্যয়ও তত অধিক।

(চ) **স্বয়ংসম্পূর্ণতা** (Self-sufficiency)—উদ্ভিদ্, জীবজন্তু প্রভৃতির মত খনিজ পদার্থ সম্পর্কেও পৃথিবীর কোন দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বাবলম্বী নহে। বিশেষতঃ দক্ষিণ গোলার্ধের মহাদেশগুলিতে কয়লা, খনিজ তৈল, লৌহ প্রভৃতির অভাব বেশী।

(ছ) **চাহিদা ও শিল্পকার্যে সদ্ব্যবহার** (Demand and industrial utilisation)—বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের ব্যবহার স্বাভাবিক অবস্থায় যেরূপ থাকে, বিশেষ বিশেষ অবস্থাতে তাহার তুলনায় ব্যবহার অনেক বেশী বা কম হয়। যেমন, যুদ্ধের সময় লৌহ, এলুমিনিয়াম প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের চাহিদা অনেক বৃদ্ধি হয়। তাহাছাড়া কোন একটি শিল্পের উন্নতির সহিতও সংশ্লিষ্ট খনিজ দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি হয়। যেমন, ইস্পাত শিল্পের ক্রমশঃ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির চাহিদা বৃদ্ধি হইতেছে। ফলে, ইহাদের জন্য অনুসন্ধান এবং উৎপাদনও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

(জ) **যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা**—খনিজ দ্রব্যসমূহ সাধারণতঃ নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। তাই শিল্পকার্যে যেগুলির চাহিদা অধিক, তাহাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ খুব বেশী। ফলে, কোন খনিজ পদার্থের দূর দেশে চাহিদা থাকিলে পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে তাহার বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধি হয়। আবার কোন খনিজ পদার্থের পরিবহন খরচ কম হইলে ইহার দাম কম হয় ও চাহিদা বাড়ে। তখন ইহার উৎপাদনের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পায়।

(ঝ) **অর্থনৈতিক অবস্থা**—বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের অনুসন্ধান, ইহাদিগকে খনি হইতে সংগ্রহ, এক স্থান হইতে অন্যত্র সরবরাহ এবং ইহাদের সাহায্যে বিভিন্ন শিল্প-দ্রব্য নির্মাণ প্রভৃতি কাজের সহিত দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সম্পর্ক খুব বেশী। দরিদ্র দেশে অর্থাভাবে অধিক খনিজ দ্রব্য ব্যবহার করা সম্ভবপর নহে।

(ঞ) **রাজনৈতিক অবস্থা**—পৃথিবীর কয়েকটি উন্নত ও শক্তিশালী জাতি বিভিন্ন দেশ ও জাতির উপর তাহাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্বের ফলে বহুকাল তথা হইতে অধিক পরিমাণে খনিজ সম্পদ্ আহরণ করিয়াছে। মধ্য আফ্রিকার কঙ্গো-অববাহিকাতে বেলজিয়ামের প্রভুত্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ওলন্দাজগণের প্রভুত্ব এবং দক্ষিণপশ্চিম এশিয়াতে ইংলণ্ডের ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ও প্রভুত্ব ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

খনিজ সম্পদসমূহের ব্যবহার এবং ইহাদের শ্রেণীবিভাগ—খনিজ পদার্থসমূহ **প্রাচীন কালে** নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, সেতু, বাঁধ, রাস্তাঘাট, বাড়ী প্রভৃতি তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হইত। **বর্তমানে** উপরিলিখিত উদ্দেশ্যগুলি অপ্রধান (Minor use)। এখন ইহাদের **প্রধান** ব্যবহার (Major use) জলপথ, স্থলপথ ও আকাশপথে যাতায়াতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন **যানবাহন** এবং নানাপ্রকার **কলকব্জা, যন্ত্রপাতি** প্রভৃতি নির্মাণ। যেমন—কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় শক্তি (Fuel or power) উৎপাদনের জন্য, লৌহ ব্যবহৃত হয় নানাপ্রকার কলকব্জা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈরীর জন্য। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি অলঙ্কার তৈরীর জন্য এবং চুনাপাথর, বেলেপাথর

প্রভৃতি ঘরবাড়ী ও পথঘাট তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়। বক্সাইট (এলুমিনিয়ামের) বাসনপত্র, গাড়ী ইত্যাদি তৈরীর জন্য এবং তাম্র বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র তৈরীর জন্য অধিক ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহারের পার্থক্য অনুযায়ী খনিজ পদার্থ দুই ভাগে বিভক্ত : (অ) ধাতব খনিজ পদার্থ (যে সকল সম্পদের মধ্যে ধাতব পদার্থ আছে) ও (আ) অধাতব খনিজ পদার্থ।

(অ) **ধাতব খনিজ পদার্থ** (Metallic minerals)

বর্তমানে সকল প্রকার ধাতুর মধ্যে **লৌহের ব্যবহার** সবচেয়ে বেশী। সেজন্য বর্তমান কালকে বলে **লৌহযুগ**। বস্তুতঃ এখন পৃথিবীর যে দেশে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, স্টীমার, জাহাজ প্রভৃতি লৌহ ও ইস্পাতের জিনিস যত বেশী তৈরী হয়, সে দেশ তত উন্নত। কাজেই ধাতব খনিজ পদার্থসমূহকে **লৌহের প্রাধান্য** অনুযায়ী নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায়—

(ক) **লৌহ জাতীয়** ধাতব খনিজ পদার্থ (Ferrous metals)—একমাত্র লৌহ এই বিভাগের অন্তর্গত।

(খ) **লৌহসঙ্কর** ধাতব খনিজ পদার্থ (Ferro-alloys)—ইহাদিগকে লৌহের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইস্পাত তৈরী করা হয়। যেমন—ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, নিকেল, টাংস্টেন, এন্টিমনি, ভ্যানাডিয়াম, মলিব্‌ডেনাম প্রভৃতি।

(গ) **অলৌহ জাতীয়** ধাতব খনিজ পদার্থ (Non-ferrous metals)—ইহারা লৌহের সহিত মিশ্রিত হয় না। এগুলি নানা ভাগে বিভক্ত :

(১) সাধারণ কাজে ব্যবহৃত ধাতু বা ধাতব খনিজ পদার্থ (Ordinary or general utility metals)—তাম্র, রাং বা টিন, সীসা, দস্তা, নিকেল ও পারদ।

(২) হাল্‌কা (Light) ধাতু—এলুমিনিয়াম, ম্যাগ্‌নেশিয়াম, টাইটেনিয়াম্‌।

(৩) মূল্যবান্‌ (Precious) ধাতু—স্বর্ণ, রৌপ্য, প্ল্যাটিনাম্‌ ও প্যালাডিয়াম্‌।

(৪) আণবিক শক্তি (Atomic power) উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বিরল ধাতু (Rare metals)—ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি।

(আ) **অধাতব খনিজ পদার্থ** (Non-metallic minerals)

বর্তমান যুগে লৌহের ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপর কয়েকটি খনিজ পদার্থেরও ব্যবহার এবং মূল্য বেশী বাড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে ইন্ধন শক্তি সর্বপ্রধান। ব্যবহারের গুরুত্ব অনুযায়ী এসকল পদার্থ নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত :—

(ক) **ইন্ধন শক্তি** (Fuels)—কয়লা, খনিজ তৈল বা পেট্রোলিয়াম, শেল (Shale) ও প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural gas) এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

(খ) অন্যান্য অধাতব খনিজ পদার্থ (Other non-metallic minerals)—এগুলি নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত :—

(১) কৃত্রিম সার (Fertilisers) উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অধাতব খনিজ পদার্থ—নাইট্রেট, ফস্‌ফেট, পটাস, লবণ প্রভৃতি।

(২) সালফিউরিক এসিড (Sulphuric acid) ও অন্যান্য রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত অধাতব খনিজ পদার্থ—সাল্‌ফার, পাইরেট।

(৩) ধাতু উদ্ধার কার্যে বা ধাতব শিল্পে খাদরূপে (Fluxes) ব্যবহৃত অধাতব খনিজ পদার্থ—ডোলোমাইট, ম্যাগ্‌নেসাইট, ক্রায়োলাইট, ফ্লুয়োর্‌স্পার প্রভৃতি।

(৪) গৃহ ও পথ নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত অধাতব খনিজ পদার্থ (Structural minerals)—চুনাপাথর, মার্বেল, বেলেপাথর, চুন, চক, ব্যাসল্ট, গ্র্যানাইট প্রভৃতি।

(৫) বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অধাতব খনিজ পদার্থ—অভ্র (Mica), এস্‌বেস্টস, গ্র্যাফাইট, জিপ্‌সাম প্রভৃতি।

(৬) অন্যান্য অধাতব খনিজ পদার্থ—ফেল্‌স্‌পার, কেওলিন, চীনামাটি প্রভৃতি।

(অ) ধাতব খনিজ পদার্থ

ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম লৌহের বিষয়, তারপর লৌহসঙ্কর ধাতব খনিজ পদার্থের বিষয় এবং ক্রমশঃ অলৌহ জাতীয় খনিজ পদার্থের বিষয় আলোচিত হইল।

(ক) আকরিক লৌহ

প্রধান ব্যবহার—বর্তমানে সাধারণ মানুষের ঘরে সামান্য সূঁচ, পেরেক, আলপিন, বঁটি, কাটারি, রান্নার কড়াই, কলাইকরা থালা, বাসন প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া চাষ-আবাদের জন্য কোদালি, শাবল, খন্তা ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় অসংখ্য জিনিস লোহার তৈরী। অনেক বাড়ীর দরজা, জানালার বিভিন্ন অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘরের ভিতরের রেডিও, টেলিফোনের যন্ত্রপাতি, সেলাইকল ইত্যাদি লোহাদ্বারা তৈরী। তারপর মানুষের যাতায়াতের ও মাল বহনের জন্য প্রয়োজনীয় মোটরগাড়ী, ট্রাক, লরি, রেলগাড়ী, স্টীমার, জাহাজ, লঞ্চ, এরোপ্লেন প্রভৃতি, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র, কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় অসংখ্য কলকব্জা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সকল কিছুই তৈরীর জন্য প্রয়োজন হয় লোহা। **লোহার জিনিসের** এরূপ **গুরুত্বের** জন্য বর্তমান কালকে **লৌহযুগ** বলা হয়। খনি হইতে যে **আকরিক লৌহ** (Iron ore) পাওয়া যায় তাহা ক্রমশঃ শোধন করিয়া ও তাহার সহিত ম্যাঙ্গানিজ,

ক্রোমিয়াম প্রভৃতি লৌহসঙ্কর ধাতব খনিজ পদার্থ মিশাইয়া তৈরী করা হয় **ইস্পাত** (Steel)। তাহা দ্বারাই তৈরী হয় অধিকাংশ মজবুত জিনিস। বর্তমানে লৌহ গলাইবার জন্য সাধারণতঃ শক্ত কোক এবং তাপ বিদ্যুৎ ও জলজ বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হইতেছে।

বিভিন্ন লৌহ আকরিক হইতে লৌহ সংগ্রহ—ভূপৃষ্ঠের সকল প্রকার শিলার মধ্যেই কিছু-না-কিছু লৌহ মিশ্রিত আছে। তবে যে সকল **শিলাতে অন্ততঃ ৩০-৩২% লৌহ** না থাকে, তাহাদের মধ্য হইতে লৌহ সংগ্রহ করা হয় না। তাহা ছাড়া লৌহ খনির নিকট প্রচুর কয়লা বা তাপ বিদ্যুৎ ও জলজ বিদ্যুৎশক্তি, চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির অবস্থিতি, তথায় **যানবাহনের** সুযোগ এবং লৌহ ব্যবহারের উপযোগী **শিল্পকেন্দ্র** আছে কিনা বা স্থাপন করা সম্ভব কিনা—ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া **লৌহ সংগ্রহ** করা হয়। [অবশ্য জাপান, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি কতক দেশে বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট লৌহ আকরিক এবং লৌহ ও ইস্পাতের টুকরা **আমদানি** করিয়াও লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।]

নিম্নলিখিত চারি প্রকার **উৎকৃষ্ট** লৌহ আকরিক হইতে লৌহ সংগ্রহ করা হয়। (১) **ম্যাগ্‌নেটাইট** (Magnetite)—ইহার রঙ্ কাল। ইহার মধ্যে ৭২% লৌহ থাকে ইহাই **সর্বোৎকৃষ্ট** লৌহ আকরিক, কিন্তু ইহার পরিমাণ খুব কম। অবশ্য উল্কাপিণ্ডের (Meteorites) মধ্যে কখন কখন প্রায় বিশুদ্ধ লৌহ পাওয়া যায়। তবে তাহা খনিজ পদার্থ নহে, আর মানুষের প্রয়োজন অনুপাতে তাহার পরিমাণ নগণ্য। (২) **হেমাটাইট** (Hematite)—ইহার রঙ লাল; মাঝে মাঝে কাল রঙও হয়। ইহার মধ্যে ৭০% লৌহ থাকে। লৌহ আকরিকের মধ্যে ইহার **পরিমাণ সবচেয়ে বেশী**। (৩) **লিমোনাইট** (Limonite)—ইহার রঙ্ বাদামী বা ধূসর। ইহার মধ্যে ৬০% লৌহ থাকে। (৪) **সিডেরাইট** (Siderite)—ইহার রঙ্ বাদামী বা ধূসর। ইহার মধ্যে ৪৮% লৌহ থাকে।

প্রধান উৎপাদন-স্থান ও উৎপাদনের পরিমাণ—পৃথিবীতে লৌহ আকরিক সর্বাপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হয় নিম্নলিখিত দেশগুলিতে। ইহাদের বর্তমান সময়ের (১৯৭৪ খ্রীঃ) উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

দেশ	পরিমাণ	দেশ	পরিমাণ
সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র	২১'৬ কোটি টন	সুইডেন	৩'৫ কোটি টন
যুক্তরাষ্ট্র	৯'১ " "	ভারত	৩'৪ " "
ফ্রান্স	৫'৪ " "	ব্রেজিল	৩'১ " "
চীন	৫ " "	ভেনিজুয়েলা	২'২ " "
ক্যানাডা	৪'৮ " "	যুক্তরাজ্য	০'৭ " "

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র—আকরিক লৌহ উৎপাদন সম্পর্কে এদেশের স্থান পৃথিবীতে **প্রথম**। (১৯৭৪ খ্রীঃ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ৩৫%।) এদেশের দক্ষিণ অংশে ইউক্রেনের **ক্রিভয়রগ** অঞ্চল ইহার উৎপাদনের সর্বপ্রধান কেন্দ্র, উরল পর্বতের **ম্যাগ্‌নেটোগর্স্ক** দ্বিতীয়। কোলা উপদ্বীপের মুরমানস্ক, উরল অঞ্চলের ওরস্ক, মস্কোর দক্ষিণে কুরস্ক, ইয়েনিসি নদীর দক্ষিণ অংশে কুজনেৎস বা কুজবাস অঞ্চল এবং বৈকাল হ্রদের নিকটও লৌহ পাওয়া যায়।
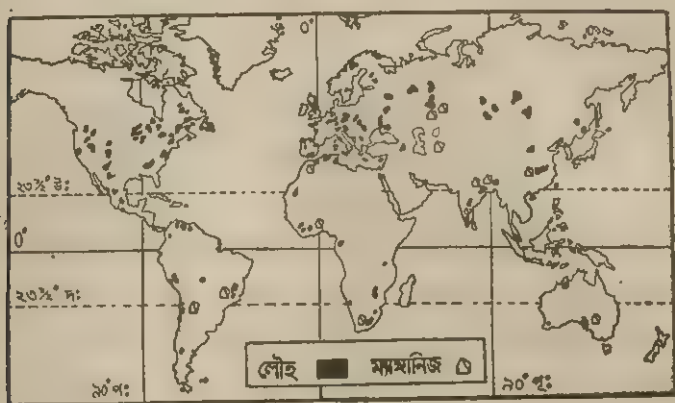
যুক্তরাষ্ট্র—এদেশের সঞ্চিত লৌহ ভাণ্ডারের (Reserve) পরিমাণ পৃথিবীতে **প্রথম** (প্রায় ১৮%), কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ বর্তমানে **দ্বিতীয়** (পূর্বে প্রথম ছিল)। এদেশের প্রায় ৮০% আকরিক লৌহ পাওয়া যায় **সুপিরিয়র হ্রদের** পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে অবস্থিত মিনেসোটা, উইকন্‌সিন ও মিচিগান রাষ্ট্রে। ইহাই সমগ্র **পৃথিবীর সর্বপ্রধান** লৌহ উৎপাদন-ক্ষেত্র। তন্মধ্যে মিনেসোটা রাষ্ট্রের **মেসাবি, ভার্মিলিয়ন** ও কুইনা পর্বত সর্বপ্রধান। এখানকার লৌহ উৎকৃষ্ট হেমাটাইট জাতীয়। এপালেচিয়ান পর্বতের দক্ষিণ অংশে **আলাবামা** রাজ্যের লৌহ ভাণ্ডারের পরিমাণ আরও বেশী, কিন্তু এখানকার আকরিক অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। এখানকার রেড পর্বত ও বার্মিংহাম অঞ্চল হইতে এদেশের মাত্র ১০% আকরিক লৌহ সংগৃহীত হয়।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কিউবাতেও যথেষ্ট লোহভাণ্ডার আছে, তবে আকরিক তেমন উৎকৃষ্ট নহে।

ফ্রান্স—এদেশের লৌহ ভাণ্ডারের ও উৎপাদনের পরিমাণ বর্তমানে (১৯৭৪ খ্রীঃ) পৃথিবীতে **তৃতীয়**। এদেশের ৯৫%-এর বেশী লৌহ পাওয়া যায় উত্তরপূর্ব অংশে

লোরেন অঞ্চলে। এদেশের উত্তরপশ্চিমে নর্মাণ্ডি এবং দক্ষিণপশ্চিমে পিরেনিজ পর্বতেও সামান্য লৌহ পাওয়া যায়।

ফ্রান্সের উত্তরপূর্বদিকের **বেলজিয়াম** ও **লুক্সেমবার্গ** সহ এই তিন দেশ মিলিয়া লোরেন অঞ্চলের ও আশপাশের লৌহ উৎপাদনের পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের হ্রদ অঞ্চলের চেয়ে সামান্য কম।

চীন—এদেশের লৌহ সম্ভারের (Reserve) পরিমাণ অনিশ্চিত। তবে বর্তমানে (১৯৭৪ খ্রীঃ) এদেশের লৌহ উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে চতুর্থ। তাহার প্রধান অঞ্চল মাঞ্চুরিয়া (মাঞ্চুকোও)। তাহাছাড়া শান্টুং উপদ্বীপ ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপত্যকার নিম্ন অংশেও লৌহ পাওয়া যায়।

ক্যানাডা—এদেশের লৌহ উৎপাদনের পরিমাণ এখন (১৯৭৪) পৃথিবীতে পঞ্চম। এদেশের পূর্ব অংশে **নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডে,** তাহার নিকট ল্যাব্রাডর ও দক্ষিণে হ্রদ অঞ্চলে অধিক লৌহ উৎপন্ন হয়। দক্ষিণপশ্চিমে ব্রিটিশ কলম্বিয়াতেও লৌহ পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ—ইউরোপের মধ্যে লৌহ উৎপাদন সম্পর্কে এদেশ তৃতীয় (রাশিয়া ও ফ্রান্সের পর)। এখানকার লৌহ ভাণ্ডারের পরিমাণ যথেষ্ট বেশী, কিন্তু আকরিক লৌহ অত্যন্ত নিকৃষ্ট (মাত্র ৩০-৪০% লৌহ)। এদেশের ক্লীভল্যাণ্ড ও মিডল্যাণ্ড **কয়লা খনি অঞ্চলের পাশে** পাওয়া যায় দেশের ৮০% লৌহ, আর কাম্বারল্যাণ্ডের কয়লা খনি অঞ্চলে পাওয়া যায় বাকী প্রায় ২০% লৌহ আকরিক।

সুইডেন—ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট **ম্যাগ্‌নেটাইট** লৌহ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এদেশে। তাহার প্রধান কেন্দ্র **কিরুনাভেরা** ও গেলিভেরা অঞ্চল। এদেশের বেশীর ভাগ লৌহ **রপ্তানি** হয়।

ভারত—এদেশের লৌহ ভাণ্ডারের পরিমাণ অধিক। বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যে উৎকৃষ্ট **হেমাটাইট** লৌহ পাওয়া যায়। এদেশের ইস্পাত শিল্পের উন্নতির সহিত লৌহ উৎপাদনের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। কিছু লৌহ রপ্তানিও হয়।

আফ্রিকা—এই মহাদেশের উত্তর অংশের টিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও মরক্কোতে এবং দক্ষিণে দক্ষিণ আফ্রিকা গণতন্ত্রে কিছু লৌহ পাওয়া যায়।

ব্রেজিল—এদেশের লৌহভাণ্ডারের পরিমাণ পৃথিবীতে সম্ভবতঃ তৃতীয়, কিন্তু লৌহ আকরিক নিকৃষ্ট বলিয়া লৌহ কম উৎপন্ন হয়। তবে দক্ষিণ গোলার্ধের মধ্যে এদেশের লৌহ উৎপাদনের পরিমাণ প্রথম।

ভেনিজুয়েলা—এদেশে লৌহ উৎপাদনের পরিমাণ দক্ষিণ গোলার্ধে দ্বিতীয়।

ওশিয়ানিয়া—অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া প্রদেশের **আয়রন নব** (Iron knob) অঞ্চলে লৌহ পাওয়া যায়।

লৌহ ও ইস্পাতের টুকরা (Scrap materials)—বর্তমানকালে লৌহ আকরিক হইতে উৎপন্ন **ঢালাই লৌহ** (Pig iron) অর্ধেক এবং লোহার পুরানো জিনিসের **ভাঙ্গা টুকরা অর্ধেক**—এরূপ ব্যবস্থা **ইস্পাত শিল্পের জন্য সর্বোত্তম** বলিয়া গণ্য। কাজেই জাহাজ, স্টীমার, রেলওয়ে ইঞ্জিনের টুকরা হইতে আরম্ভ করিয়া লোহার অতিক্ষুদ্র জিনিসের টুকরারও চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—লৌহ **রপ্তানি** করে যে সকল দেশ লৌহশিল্পে অনুন্নত অথচ প্রয়োজনাতিরিক্ত লৌহ উৎপন্ন করে। যেমন—ইউরোপের **সুইডেন ও ফ্রান্স** সবচেয়ে বেশী এবং তথাকার স্পেন, লুক্সেমবার্গ, দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলা, ব্রেজিল, চিলি, এশিয়ার মালয়েশিয়া, কোরিয়া, ফিলিপাইন, ভারত প্রভৃতি কিছু লৌহ রপ্তানি করে। লৌহ সবচেয়ে বেশী **আমদানি** করে **যুক্তরাজ্য**, পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানী, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশ।

(খ) লৌহসঙ্কর ধাতব খনিজ পদার্থ

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য নিম্নলিখিত লৌহসঙ্কর ধাতব খনিজ পদার্থ ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। এগুলি উৎকৃষ্ট **লৌহ-খাদ** (Ferro-alloy materials)। ইহাদিগকে মিশাইলে ইস্পাত অধিক মজবুত হয়। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের লৌহখাদ অধিক ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান।

(১) **ম্যাঙ্গানিজ : ব্যবহার**—বর্তমান পৃথিবীতে উৎপন্ন ম্যাঙ্গানিজের প্রায় সমুদয় (৯০—৯৫%) অংশ **ইস্পাত শিল্পে** ব্যবহৃত হয়। ম্যাঙ্গানিজ মিশ্রিত ইস্পাতে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ প্রচুর (১২—১৪%)। এরূপ ইস্পাত খুব দৃঢ় ও মজবুত। ইহার সাহায্যে মোটর গাড়ী, রেলগাড়ী, শিলা গুঁড়া করিবার ভারী যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈরী হয়। প্লাস্টিক, কাচ, মৃৎশিল্প, বার্নিশ, ব্লিচিং পাউডার তৈরী প্রভৃতি উদ্দেশ্যে সামান্য পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ ব্যবহৃত হয়।

প্রধান উৎপাদন স্থান—বর্তমানে (১৯৭৪ খ্রীঃ) পৃথিবীর নিম্নলিখিত দেশগুলিতে অধিক ম্যাঙ্গানিজ উৎপন্ন হয়।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র	—৭৭ লক্ষ টন	দক্ষিণ আফ্রিকা গণতন্ত্র	—৫ লক্ষ টন
ভারত	—১৯ লক্ষ টন	ঘানা	—৪ লক্ষ টন
ব্রেজিল	— ৭ লক্ষ টন		

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র—এদেশের ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনের পরিমাণ **পৃথিবীতে প্রথম**। (বর্তমানে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ৬০%)। তাহার অধিকাংশ (৮০—৯০%) উৎপন্ন হয় **ককেশাস** পর্বতের দক্ষিণে (চিয়াটুরা অঞ্চলে) ও **ইউক্রেনের** ক্রিভয়রাগ লৌহ অঞ্চলের পাশে। (ক্রিভয়রগে এদেশের অধিকাংশ লৌহ উৎপন্ন হয়।) উরল পর্বত, কাজাকস্থান এবং মধ্য সাইবেরিয়াতেও ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়।

ভারত—এদেশে ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **দ্বিতীয়** (১৯৭৪ খ্রীঃ সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের উৎপাদনের মাত্র সিকি ভাগ)। [পরে দ্রষ্টব্য]

ব্রেজিল—এদেশের ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। এখন এদেশের স্থান পৃথিবীতে **তৃতীয়** (১৯৭৪ খ্রীঃ ভারতের উৎপাদনের প্রায় ৩৪%)। এদেশের পূর্বদিকের মিনাস গেয়ারেস মালভূমি, পশ্চিমে ম্যাটোগ্রসো অঞ্চল ও আমাজন নদীর অববাহিকার উত্তর অংশে ইহা অধিক পাওয়া যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকা গণতন্ত্র—এদেশের ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনের পরিমাণ এখন আগেকার চেয়ে কম ; ১৯৭৪ খ্রীঃ পৃথিবীতে চতুর্থ। এদেশে ইহা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র কিম্বার্লির হীরকখনির উত্তর-পশ্চিমে পোস্টম্যানবার্গ অঞ্চল।

চীন—এদেশে ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। (এদেশের স্থান পৃথিবীতে চতুর্থ হইতে পারে।)

ঘানা—এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ উৎপন্ন হইতেছে। এখন (১৯৭৪ খ্রীঃ) উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে পঞ্চম।

আফ্রিকার জায়েরে বা কঙ্গো গণতন্ত্র, আইভরি কোস্ট প্রভৃতি দেশেও ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—ইস্পাত শিল্পে উন্নত দেশগুলি ম্যাঙ্গানিজ অধিক **আমদানি** করে। তন্মধ্যে **যুক্তরাষ্ট্রের** স্থান প্রথম (সম্ভবতঃ পৃথিবীর প্রায় ৫০%)। তারপর যুক্তরাজ্য, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ। আর ইহা অধিক **রপ্তানি** করে **ব্রেজিল,** দক্ষিণ আফ্রিকা গণতন্ত্র ও ঘানা। সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র এবং ভারতও কিছু রপ্তানি করে।

(২) **ক্রোমিয়াম : ব্যবহার**—উৎকৃষ্ট ক্রোমিয়াম ব্যবহৃত হয় ইস্পাত তৈরীর জন্য। অধিক (১২—১৫%) ক্রোমিয়ামযুক্ত উৎকৃষ্ট ইস্পাত (Stainless steel) দ্বারা সাঁজোয়া গাড়ী (Military tank), বাসনপত্র, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি তৈরী হয়। নিকেল ও ক্রোমিয়াম মিশ্রিত ইস্পাত দ্বারা বহু রকম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরী হয়। সামান্য

(১—৩%) ক্রোমিয়ামযুক্ত ইস্পাত দ্বারা ছেদনযন্ত্র, হাতুড়ি প্রভৃতি তৈরী হয়। কতক ক্রোমিয়াম রাসায়নিক শিল্পে এবং ইস্পাত তৈরীর জন্য চুল্লীতে প্রলেপ দেওয়ার জন্যও ব্যবহৃত হয়।

প্রধান উৎপাদন স্থান—ইহা সবচেয়ে বেশী উৎপন্ন হয় **সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রে**। সে দেশের **উরল পর্বতের** পূর্বদিকে ও দক্ষিণে **কাজাকস্থানে** ইহা অধিক পাওয়া যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকা গণতন্ত্রের বুশভেল্ড (তৃণভূমি) অঞ্চল এবং ইহার উত্তর পাশে **রোডেশিয়ার** মধ্য ও দক্ষিণ অংশে ইহা অধিক পাওয়া যায়।

পশ্চিম এশিয়ার **তুরস্ক** এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার **ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও** (লুজন দ্বীপ) ইহা অধিক পাওয়া যায়। তাহাছাড়া ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, কিউবা, ইরান, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশেও ইহা পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—ইহা অধিক **আমদানি** করে ইস্পাত শিল্পে উন্নত দেশগুলি। তন্মধ্যে **যুক্তরাষ্ট্র** প্রথম। তারপর যুক্তরাজ্য, পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানী প্রভৃতি দেশ। আর ইহা **রপ্তানি** করে **সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র**, রোডেশিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ।

(৩) **নিকেল: ব্যবহার**—ইহা অধিকাংশ (প্রায় ৯০%) ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন ধাতবশিল্পে। ইহা প্রধানতঃ লোহার সহিত খাদরূপে ব্যবহৃত হয়। তবে তাম্র, এলুমিনিয়াম প্রভৃতির সহিত ইহাকে মিশ্রিত করিয়াও কতক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তৈরী হয়। যেমন, ৮০% নিকেলযুক্ত ধাতব পদার্থ (Permalloy) দ্বারা ইলেকট্রো-ম্যাগনেট তৈরী হয়। ৬০% নিকেলযুক্ত পদার্থ দ্বারা রাসায়নিক গবেষণাগার, নৌবিভাগ প্রভৃতির যন্ত্রপাতি তৈরী হয়। আর ৩৫% নিকেলযুক্ত পদার্থ দ্বারা তৈরী হয় বিমানপোত, মোটরগাড়ি ও তৈল শোধনাগার প্রভৃতির যন্ত্রপাতি।

প্রধান উৎপাদন স্থান—**ক্যানাডাতে** পাওয়া যায় **পৃথিবীর অধিকাংশ** (৭৫—৮০%) নিকেল। তাহার প্রধান কেন্দ্র পূবদিকে অন্টেরিও প্রদেশের **স্যাডবেরি**। তারপর পাওয়া যায় উইনিপেগ হ্রদের নিকট ও ম্যানিটোবার উত্তরে।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের নিকেল উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **দ্বিতীয়**। এদেশের উত্তরপশ্চিম অংশে ইহা অধিক পাওয়া যায়। উরল পর্বতের নিকট, ইয়েনিসি নদীর উপত্যকা প্রভৃতি স্থানেও ইহা পাওয়া যায়।

নউ ক্যালিডোনিয়া নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে (অস্ট্রেলিয়ার পূর্বদিকে) এক কালে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী নিকেল পাওয়া যাইত। এখনও কিছু পাওয়া যায়।

অন্যান্য স্থান—দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল ও ভেনিজুয়েলা, এশিয়ার, ব্রহ্ম যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশেও কিছু নিকেল পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—ক্যানাডা ও **নিউ ক্যালিডোনিয়া** প্রায় সমুদয় নিকেল **রপ্তানি** করে। পৃথিবীর মোট রপ্তানির ৯০%-এর বেশী আসে এই দুই দেশ হইতে। ইহা অধিক **আমদানি** করে **যুক্তরাষ্ট্র**। তারপর যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশ।

(৪) **এন্টিমনি : ব্যবহার**—বিশেষ ধরনের ইস্পাত তৈরীর জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। এরূপ ইস্পাতের সাহায্যে তৈরী হয় সামরিক কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কতক যন্ত্রপাতি। তাহাছাড়া ছাপাখানার টাইপ, নানারকম পাইপ, বন্দুকের গুলি (Bullet), স্টোরেজ ব্যাটারি প্রভৃতি তৈরীর জন্যও ইহা ব্যবহৃত হয়।

প্রধান উৎপাদন স্থান—চীনদেশে হুনান ও কোয়াংসি প্রদেশে ইহা অধিক পাওয়া যায়। সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, মেক্সিকো, বলিভিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা গণতন্ত্র প্রভৃতি দেশেও ইহা পাওয়া যায়।

(৫) **মলিবডেনাম : ব্যবহার**—বিশেষ ধরনের ইস্পাত তৈরীর জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। এরূপ ইস্পাতের সাহায্যে তৈরী হয় সামরিক ট্যাঙ্ক, বিমানপোত, মোটরগাড়ি প্রভৃতির বিভিন্ন অংশ। বৈদ্যুতিক শিল্প, রাসানিক শিল্প প্রভৃতি শিল্পেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

প্রধান উৎপাদন স্থান—যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া যায় পৃথিবীর **অধিকাংশ** (৮০%) মলিবডেনাম। তাহার প্রধান কেন্দ্র **কলোরেডো** স্টেটের ক্লাইম্যাক্স খনি। উটা, এরিজোনা, ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি স্টেটেও ইহা পাওয়া যায়।

যুক্তরা ্রের বাহিরে ক্যানাডা, মেক্সিকো, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, চিলি, নরওয়ে, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে সামান্য মলিবডেনাম পাওয়া যায়।

(৬) **টাংস্টেন : ব্যবহার**—বিশেষ ধরনের ইস্পাত তৈরীর জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। এই ইস্পাত দ্বারা তৈরী হয় সামরিক নানা জিনিস, শক্ত পেষণযন্ত্র প্রভৃতি। বৈদ্যুতিক শিল্পেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

প্রধান উৎপাদন স্থান—চীনদেশে পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশী (পৃথিবীর ৩০%) টাংস্টেন। যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিতীয়, বলিভিয়ার স্থান তৃতীয়। জাপান ব্রহ্ম যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, পেরু, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, স্পেন, জায়েরে (কঙ্গো গণতন্ত্র) প্রভৃতি দেশেও কিছু টাংস্টেন পাওয়া যায়।

(৭) **ভ্যানাডিয়াম : ব্যবহার**—ইহা ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হয়। রেলগাড়ী, মোটরগাড়ীর বিভিন্ন অংশ, সামরিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈরী হয় ঐ ইস্পাত দ্বারা। চর্মশিল্প, ঔষধপত্র তৈরী প্রভৃতির জন্যও ইহা ব্যবহৃত হয়।

প্রধান উৎপাদন স্থান—যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া যায় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভ্যানাডিয়াম। পেরু, মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকা গণতন্ত্রেও ইহা পাওয়া যায়।

(গ) অলৌহ জাতীয় ধাতব খনিজ পদার্থ

তাম্র

প্রধান ব্যবহার—ইহার বিদ্যুৎ পরিচালন শক্তি খুব বেশী। তাহাছাড়া লোহার সহিত ইহাকে মিশাইলে লোহাতে মরিচা ধরে না। সেজন্য **বৈদ্যুতিক শিল্পে** ও নানারকম মোটরগাড়ী, বাস, ট্রাক, জাহাজ প্রভৃতি তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয় প্রায় ৮০% তামা। মুদ্রা (Coins), বাসনপত্র, কিছু অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র, নানারকম রঙ, কীটপতঙ্গ মারিবার ঔষধ প্রভৃতিও তামা দ্বারা তৈরী হয়। টিনের সঙ্গে তামা মিশাইয়া ব্রোঞ্জ এবং দস্তার সঙ্গে তামা মিশাইয়া পিতল তৈরী হয়। সোনার সঙ্গে সামান্য তামা মিশাইলে গিনি সোনা তরী করা হয়।

বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে **নূতন তামার** সঙ্গে **পুরাতন** তামার **জিনিসের টুকরা** (Scrap) অনবরত যুক্ত হইতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-৪৫) যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত মোট তামার প্রায় ⅓ অংশ ছিল তামার টুকরা।

উৎপাদনের ব্যবস্থা—নানাপ্রকার খনিজ পদার্থের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় তাম্র পাওয়া যায়। ইহার গুরুত্ব এত অধিক যে, যে-কোন আকরিকের মধ্যে ০.৫% **তাম্র** থাকিলেই প্রচুর **জলজ বিদ্যুৎশক্তির** সাহায্যে তাহা হইতে তাম্র সংগ্রহ করা হয়।

প্রধান উৎপাদন স্থান—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমানে (১৯৭৫ খ্রীঃ) নিম্নলিখিত পরিমাণ তাম্র পাওয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্র	প্রায় ১৬ লক্ষ টন	জায়েরে (কঙ্গো গণতন্ত্র)	৩.৫ লক্ষ টন
ক্যানাডা	৮ লক্ষ টন	রোডেশিয়া	৩ লক্ষ টন
চিলি	৭.৮ লক্ষ টন	পেরু	২.৩ লক্ষ টন
জাম্বিয়া	৭ লক্ষ টন		

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী** (প্রায় ৪০%) তাম্র পাওয়া যায়। পশ্চিমদিকে পার্বত্য অঞ্চলের **এরিজোনা** প্রদেশের তাম্র উৎপাদনের পরিমাণ

সমগ্র পৃথিবীতে প্রথম (পৃথিবীর ১৫%)। ইহার পর পাশের **উটা** এবং **মন্টানা** রাজ্যের স্থান।

ক্যানাডার তাম্র উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **দ্বিতীয়**। এদেশের পূর্বদিকের মালভূমির **স্যাড্‌বেরি** অঞ্চলে প্রচুর ও পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলে কম তাম্র পাওয়া যায়।

চিলি দেশের তাম্র উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **তৃতীয়**। আটাকামা মরুভূমিতে ও স্যান্টিয়াগোর নিকট অধিক তাম্র পাওয়া যায়। **পেরু** দেশেও তাম্র পাওয়া যায়।

আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যভাগে **জায়েরে** (**কঙ্গো গণতন্ত্র**), তাহার দক্ষিণে **জাম্বিয়া** এবং আরও দক্ষিণে **রোডেশিয়াতে** তাম্র পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে জায়েরের **কাটাঙ্গা** খনি অঞ্চল বিখ্যাত।

অন্যান্য স্থান—**সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের** অন্তর্গত উরল পর্বতে, কাজাকস্থান ও আরল সাগর অঞ্চলে, বলখাস হ্রদের তীরে, ভল্গানদীর অববাহিকাতে এবং উত্তরে কোলা উপদ্বীপে তামা পাওয়া যায়। ইউরোপের **সুইডেনে, ভারতের** বিহার রাজ্যে, এবং **জাপানের** হন্‌সু ও সিকোকু দ্বীপে এবং **অস্ট্রেলিয়ার** কুইন্সল্যাণ্ড প্রদেশে কিছু তামা পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—তাম্র **রপ্তানি** করে **ক্যানাডা, চিলি, রোডেশিয়া, জায়েরে** (**কঙ্গো গণতন্ত্র**), **জাম্বিয়া**, পেরু, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ। আর তাহা বেশী **আমদানি** করে **যুক্তরাজ্য**। তারপর পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালি, জাপান, ভারত প্রভৃতি দেশ।

এলুমিনিয়াম

প্রধান ব্যবহার—১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এলুমিনিয়ামের প্রথম প্রচলন হয়। তখন ইহার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল নগন্য। ইহার প্রায় ১০০ বৎসর পরে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি ইহার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ টন, আর এখন (১৯৭৪ খ্রীঃ) ইহার উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৮০ লক্ষ টন। তাহাছাড়া এলুমিনিয়ামের **পুরানো** জিনিসের **টুকরার** (Scrap) ব্যবহার দিন দিন বাড়িতেছে। ইহা অত্যন্ত হাল্কা (Light) ধাতু। **বিমানপোত** তৈরীর জন্যই ইহা **সবচেয়ে বেশী** ব্যবহৃত হয়। তাহাছাড়া ইহার সাহায্যে অস্ত্রশস্ত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্র, দালানের কড়ি, বরগা, রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, জাহাজ প্রভৃতির বিভিন্ন অংশ তৈরী হয়।

উৎপাদনের ব্যবস্থা—ভূপৃষ্ঠের প্রায় সকল উপাদানের সহিত ইহা মিশ্রিত থাকে। তন্মধ্যে **বক্সাইট** (Bauxite) নামক খনিজ পদার্থের মধ্যে ইহার পরিমাণ **সবচেয়ে**

বেশী। প্রথমে বক্সাইট খনির নিকটে ইহা গলাইয়া তৈরী হয় **এলুমিনা**। তারপর **জলজ বিদ্যুৎশক্তির** প্রচণ্ড তাপে তাহাকে গলাইয়া তৈরী হয় এলুমিনিয়াম। কাজেই এলুমিনিয়াম উৎপাদনকেন্দ্র সাধারণতঃ প্রচুর জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন-কেন্দ্রের নিকট স্থাপিত হয়।
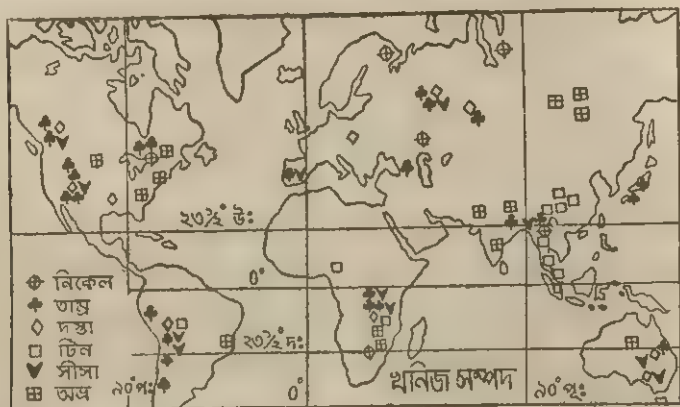
দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে পৃথিবীর **অধিকাংশ** (৬০%) **বক্সাইট উৎপন্ন** হয়। বক্সাইট উৎপাদন সম্পর্কে এখানকার **সুরিনাম** (ডাচ গায়না) দেশের স্থান **প্রথম,** উহার পাশে **ব্রিটিশ গায়নার** স্থান **তৃতীয়,** আর অল্প দূরে অবস্থিত **জ্যামাইকা** দ্বীপের স্থান **দ্বিতীয়**। কিন্তু এসকল দেশে **এলুমিনিয়াম তৈরী হয় না**।

ক্যানাডা, পশ্চিম জার্মানী, জাপান, যুক্তরাজ্য, নরওয়ে, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশ **বক্সাইট আমদানি** করিয়া জলজ বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে প্রচুর **এলুমিনিয়াম** উৎপন্ন করে।

ক্রায়োলাইট হইতেও এলুমিনিয়াম তৈরী হয়। কেবল গ্রীন্‌ল্যাণ্ডে তাহা পাওয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, ফ্রান্স, ভারত প্রভৃতি দেশে **বক্সাইট** উৎপাদন এবং **এলুমিনিয়াম** তৈরী, এই দুই ব্যবস্থাই উন্নত।

প্রধান উৎপাদন স্থান—বর্তমানে (১৯৭৫ খ্রীঃ) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিম্নলিখিত পরিমাণ এলুমিনিয়াম তৈরী হয়।

যুক্তরাষ্ট্র	প্রায় ৫০·৬ লক্ষ টন	নরওয়ে	প্রায় ৭ লক্ষ টন
জাপান	১৭·৫ লক্ষ টন	ফ্রান্স	প্রায় ৫ লক্ষ টন
ক্যানাডা	১০·৩ লক্ষ টন	যুক্তরাজ্য	৪·৭ লক্ষ টন
পশ্চিম জার্মানী	৮·৭ লক্ষ টন	ভারত	১·৭ লক্ষ টন

যুক্তরাষ্ট্র—বক্সাইট উৎপাদন সম্পর্কে এদেশের স্থান এখন (১৯৭৫ খ্রীঃ) পৃথিবীতে **চতুর্থ** (পৃথিবীর ১০%)। এদেশের প্রায় ৯৫% বক্সাইট পাওয়া যায় **আরকান্‌সাস** স্টেটে। এদেশ পৃথিবীর ৬০% **বক্সাইট আমদানি** করে। **নায়েগ্রা জলপ্রপাত** হইতে উৎপন্ন প্রচুর জলজ বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে এদেশে উৎপন্ন হয় পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী** (পৃথিবীর প্রায় ৫০%) **এলুমিনিয়াম**।

ফ্রান্স—এদেশে উৎপন্ন হয় ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বেশী (প্রায় যুক্তরাষ্ট্রের মত) বক্সাইট। কিন্তু এলুমিনিয়াম উৎপাদন সম্পর্কে এদেশের স্থান পৃথিবীতে ষষ্ঠ, আর ইউরোপের মধ্যে তৃতীয় (সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র ও পশ্চিম জার্মানীর পরে)।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র—এদেশে বক্সাইট উৎপাদনের পরিমাণ অধিক, কিন্তু এলুমিনিয়াম উৎপাদনের পরিমাণ এখনও অপেক্ষাকৃত কম।

আমাদের **ভারত** এবং ইউরোপের **যুগোশ্লোভিয়া, ইটালি** এবং **অস্ট্রিয়াতে** বক্সাইট ও এলুমিনিয়াম দুইই উৎপন্ন হয়।

কেবলমাত্র এলুমিনিয়াম উৎপাদন অঞ্চল—এখন এলুমিনিয়াম উৎপাদন সম্পর্কে **জাপানের** স্থান পৃথিবীতে **দ্বিতীয়, ক্যানাডা তৃতীয়**। ইউরোপের **পশ্চিম জার্মানী, নরওয়ে, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য** ও **সুইজারল্যাণ্ড** প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশে আমদানি করা বক্সাইট দ্বারা অধিক পরিমাণে **এলুমিনিয়াম তৈরী** করা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—দক্ষিণ আমেরিকার সুরিনাম, গায়না, ব্রিটিশ গায়না ও উহাদের নিকটবর্তী জ্যামাইকা দ্বীপ হইতে **রপ্তানি** হয় সবচেয়ে বেশী বক্সাইট। তাহা **আমদানি** করে যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, পশ্চিম জার্মানী, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যাণ্ড, জাপান, নরওয়ে প্রভৃতি দেশ।

সীসা

প্রধান ব্যবহার—সীসা অত্যন্ত নরম ধাতু ও কম উত্তাপে গলে। তাই ইহাকে সহজে বাঁকান যায়। ইহাতে মরিচাও ধরে না। দামেও খুব সস্তা। ইহার সহিত এন্টিমনি মিশাইয়া ইহাকে শক্ত করিয়া নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। সীসার **পুরানো** জিনিসের **টুকরাও** (Scrap) ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। নানা কাজে ব্যবহার সম্পর্কে **সীসার** স্থান **লোহার পরেই**। ইহা দ্বারা **সবচেয়ে বেশী** তৈরী হয় **ব্যাটারি** (Storage batteries)। তাছাড়া নর্দমার পাইপ, গ্যাস, জল প্রভৃতি সরবরাহের পাইপ, মোটরগাড়ী, বিমানপোত প্রভৃতির বিভিন্ন অংশ, বৈদ্যুতিক তারের (Electric cable) ঢাকনি, ছাপাখানার টাইপ, বন্দুকের গুলি, সঙ্গীতের যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন রঙ প্রভৃতি সীসাদ্বারা তৈরী হয়।

সীসা সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় **গ্যালেনা** (Galena) নামক খনিজ পদার্থের মধ্যে। ঐ আকরিক গলাইয়া সীসা (Lead) উৎপন্ন করা হয়।

প্রধান উৎপাদন স্থান—এখন (১৯৭৫ খ্রীঃ) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিম্নলিখিত পরিমাণ সীসা পাওয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্র—	প্রায় ৫·৫ লক্ষ টন	যুগোশ্লাভিয়া	প্রায় ১·৩ লক্ষ টন
অস্ট্রেলিয়া	„ ৫ „ „	বুলগেরিয়া	„ ১ „ „
মেক্সিকো	„ ২ „ „	ক্যানাডা	„ ১ „ „

যুক্তরাষ্ট্র—পৃথিবীতে **সবচেয়ে বেশী** (পৃথিবীর প্রায় ২১%) সীসা এদেশে পাওয়া যায়। এদেশের মধ্যে **মিসৌরি** স্টেটের স্থান প্রথম।

অস্ট্রেলিয়া—সীসা উৎপাদন সম্পর্কে এদেশের স্থান পৃথিবীতে **দ্বিতীয়** (প্রায় ১৮%)। এখানকার নিউ সাউথ ওয়েলস প্রদেশের **ব্রোকেন হিল** খনি সর্বপ্রধান।

সীসা উৎপাদন সম্পর্কে **মেক্সিকো** দেশের স্থান পৃথিবীতে **তৃতীয়, ক্যানাডা** ষষ্ঠ। মেক্সিকোর চিহুয়াহুয়া ও সান লুই পটোসি খনি এবং ক্যানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সীসার খনি বিখ্যাত।

ইউরোপের **যুগোশ্লাভিয়া** দেশের স্থান পৃথিবীতে চতুর্থ ও **বুলগেরিয়া** দেশের স্থান পঞ্চম।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের ককেশাস পর্বত অঞ্চলে, কাজাকস্থানে ও সাইবেরিয়ার পূর্ব অংশে সীসা পাওয়া যায়।

যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইডেন, স্পেন এবং ইটালি দেশেও সীসা পাওয়া যায়। তবে পরিমাণ কম।

ব্রহ্মদেশে সান মালভূমির **বত্নুইন** খনিতে এবং জাপান, ভারত, দক্ষিণ আমেরিকার পেরু, আফ্রিকার মরক্কো প্রভৃতি দেশেও সীসা পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—সীসা সবচেয়ে বেশী **রপ্তানি** করে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিয়া। ইহা সবচেয়ে বেশী **আমদানি** করে যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশ। জাপান, ভারত প্রভৃতিও সীসা আমদানি করে।

রাং

প্রধান ব্যবহার—প্রাকৃতিক আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং তরকারি ও ফলের টক রস প্রভৃতির প্রভাবে রাং-এর কোন পরিবর্তন হয় না। তাই বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ ও দূরদেশে প্রেরণের উদ্দেশ্যে লোহা, কাঠ প্রভৃতির যে সকল প্যাকিং বাক্স

ব্যবহার করা হয়, তাহাদের মধ্যে রাং (Tin) এর প্রলেপ দেওয়া হয়। সীসার অত্যন্ত পাতলা পাতের উপর রাং-এর প্রলেপ দিয়া তৈরী হয় চকোলেট, সিগারেট প্রভৃতি মুড়িবার রূপালী কাগজ। লোহার পাতের উপর রাং-এর প্রলেপ দিয়া ঘরের চাল তৈরী করিবার "ঢেউ টিন" (Corrugated iron sheet) তৈরী হয়। ইহা ভিন্ন পিতল ও রাং মিশাইয়া তৈরী হয় কাঁসা। ইহাদ্বারা তৈরী হয় থালা, বাটি, গ্লাস প্রভৃতি জিনিস। তাহাছাড়া রাং ও তামা মিশাইয়া তৈরী হয় ব্রোঞ্জ।

উৎপাদনের ব্যবস্থা—বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় রাং পাওয়া যায়। নদীর তীরে নুড়ি ও বালুকার সহিত মিশ্রিত অবস্থায়ও রাং-এর রেণু পাওয়া যায়। এসকল জিনিস গলাইয়া রাং উৎপন্ন করা হয়।

প্রধান উৎপাদন স্থান—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এখন (১৯৭৫ খ্রীঃ) নিম্নলিখিত পরিমাণ রাং পাওয়া যায়।

মালয়েশিয়া	৮৩	হাজার টন	ইন্দোনেশিয়া	২০	হাজার টন
বলিভিয়া	৩৩	" "	জায়েরে	১১	" "
থাইল্যাণ্ড	২৩	" "	নাইজেরিয়া	১০	" "

মালয়েশিয়া—এদেশে পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী** (প্রায় ৪০%) রাং উৎপন্ন হয়। এখানকার **সেলাঙ্গোর**, পেরাক, পাহাঙ্গ, জোহোর প্রভৃতি অঞ্চলের খনিগুলি প্রধান। এখানে রাং-এর অনেক বড় ও গভীর খনি আছে, আবার নদীতটে নুড়ি এবং বালুকার মধ্যেও কিছু রাং পাওয়া যায়।

বলিভিয়া দেশের রাং উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে এখন **দ্বিতীয়** (প্রায় ২৬%)। এখানে আন্দিজ পর্বতে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৪,৮৮০ মি উচ্চ **পটোসি-অরুরো** অঞ্চলে ইহা সবচেয়ে বেশী উৎপন্ন হয়।

থাইল্যাণ্ডের রাং উৎপাদনের পরিমাণ এখন পৃথিবীতে **তৃতীয়** (১১%)। তাহা অধিক পাওয়া যায় দেশের দক্ষিণ অংশে ক্রা যোজকের পাশে পাকেট দ্বীপে।

ইন্দোনেশিয়া—এদেশের রাং উৎপাদনের পরিমাণ এশিয়াতে দ্বিতীয়, পৃথিবীতে চতুর্থ। এখানকার **বাঁকা, বিলিটন** ও সিঙ্কেপ দ্বীপে পাওয়া যায় পৃথিবীর ১০% রাং। সুমাত্রা দ্বীপেও রাং পাওয়া যায়।

আফ্রিকার **জায়েরে** দেশের (কঙ্গো গণতন্ত্রের) কাটাঙ্গার তাম্রখনি অঞ্চলে ও **নাইজেরিয়াতে** প্রচুর রাং পাওয়া যায়।

চীন দেশের দক্ষিণ অংশে ইউনান ও কোয়াংসি অঞ্চলে, **ব্রহ্মদেশে** মাওচি কারাথুরি ও ট্যাভয় অঞ্চলে, **সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের** কারাগাণ্ডাতে ও আলতাই

পর্বতে, যুক্তরাজ্যের কর্নোয়াল অঞ্চলে, পশ্চিম জার্মানী, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশে এবং **অস্ট্রেলিয়া** দেশের নিউ সাউথ ওয়েলস প্রদেশে সামান্য রাং পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—পৃথিবীর বেশীর ভাগ (প্রায় ⅘ অংশ) রাং উৎপন্ন হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে, অথচ সবচেয়ে বেশী (পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক) টিন ব্যবহৃত হয় যুক্তরাষ্ট্রে। **মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বলিভিয়া, থাইল্যাণ্ড,** নাইজেরিয়া, জায়েরে (কঙ্গো গণতন্ত্র), ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি রাং **রপ্তানি** করে। তাহা সবচেয়ে বেশী **আমদানি** করে **যুক্তরাষ্ট্র**। সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ডস্, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশও তাহা আমদানি করে।

অধাতব খনিজ পদার্থ

অধাতব খনিজ পদার্থ সমূহের দুইভাগ :—(১) শক্তির উৎস ও (২) অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত অধাতব খনিজ পদার্থ। ইহাদের মধ্যে কয়লা, খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস বিভিন্ন শক্তির উৎস। ইহাদের বিষয় পরে শক্তি ও শক্তির উৎস সম্পর্কে আলোচিত হইবে। অন্যান্য অধাতব খনিজ পদার্থের সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হইল।

অন্যান্য অধাতব খনিজ পদার্থ

লবণ : উৎপাদন ও প্রধান ব্যবহার—লবণের মধ্যে কতক সাধারণ লবণ ও কতক রাসায়নিক পদার্থ। তরল ও কঠিন দুই প্রকার জিনিস হইতেই লবণ পাওয়া যায়। সাধারণ লবণ প্রধানতঃ খাওয়ার জন্য এবং রাসায়নিক লবণ ঔষধ, জমির সার, সাবান, কাগজ, কাচ, বিস্ফোরক পদার্থ প্রভৃতি তৈরীর জন্য এবং চর্মশিল্পে অধিক ব্যবহৃত হয়।

(১) **সাধারণ লবণ**—তিনটি প্রধান ক্ষেত্র হইতে সাধারণ লবণ বা খাওয়ার লবণ (Soduim chloride) পাওয়া যায়। তদনুসারে ইহা তিন ভাগে বিভক্ত :

(ক) **সামুদ্রিক লবণ** (Sea salt)—বিভিন্ন সমুদ্রের লোনা জল (Brine) সূর্যের তাপে শুকাইয়া বা তাহার জলীয় অংশকে বাষ্পে পরিণত করিয়া সাধারণ লবণ (Common salt) বা করকচ পাওয়া যায়। **যুক্তরাষ্ট্রে** পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী** সাধারণ লবণ পাওয়া যায়। ক্যানাডা, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানী, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র এবং ভারত, চীন, জাপান, প্রভৃতি বহু দেশ প্রচুর সামুদ্রিক লবণ তৈরী করে। (খ) **হ্রদ অঞ্চলের লবণ** (Lake salt)—ভারতের রাজস্থানের **সম্বর হ্রদ,** পশ্চিম এশিয়ার **মরু সাগর** (Dead sea), আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলের **চাদ হ্রদ,** যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেট সল্ট লেক প্রভৃতির লোনা জল তাহাদের পাশের নীচু জায়গাতে সঞ্চিত করিয়া তথাকার মাটির উপর হইতে লোনা কাদা মাটি ও লোনা

জল তুলিয়া নিয়া পরে তাহা শুকাইয়া লবণ তৈরী করা হয়। (গ) **খনিজ লবণ** (Rock salt)—পশ্চিম পাকিস্তানে **লবণ পর্বতের** (Salt Range) খেওড়া খনি এবং পৃথিবীর আরও নানা স্থানের এরূপ **খনি** হইতে পাথরের মত শক্ত লবণ (Solid salt) বা সৈন্ধব লবণ পাওয়া যায়।

(২) **রাসায়নিক লবণ** (Chemical salts)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রচুর রাসায়নিক লবণ পাওয়া যায়। ইহা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ঃ—

(ক) **পটাস** (Potash)—প্রধানতঃ জমির উৎকৃষ্ট **সার** এবং তাহাছাড়া সাবান, কাগজ, কাচ, রঙ, বিস্ফোরক পদার্থ (Explosives), ফটোগ্রাফ তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান প্রভৃতি তৈরীর উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন পাললিক শিলা ও সমুদ্র বা হ্রদের লোনা জল হইতে ইহা পাওয়া যায়। (খ) **নাইট্রেট** (Nitrate)—নাইট্রোজেন-ঘটিত লবণ দ্বারা জমির উৎকৃষ্ট সার (Nitrogen fertilizer) তৈরী হয়। চিলি দেশের মরুভূমিতে প্রচুর খনিজ নাইট্রেট পাওয়া যায়। তাহাছাড়া ঐ দেশে পাখীর মলের (Guano) মধ্যে এবং পৃথিবীর সর্বত্র গরু ও অন্যান্য প্রাণীর মলমূত্রের মধ্যে প্রচুর নাইট্রেট পাওয়া যায়। পশ্চিম জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র প্রভৃতি দেশে কোক কয়লার উপজাত-দ্রব্য হইতে এবং বায়ুমণ্ডল হইতেও প্রচুর নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। (গ) **ফস্ফেট** (Phosphate)—যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, আফ্রিকার মরক্কো, টিউনিশিয়া, আলজেরিয়া প্রভৃতি দেশে ফস্ফরাস-ঘটিত লবণের সাহায্যে প্রচুর সার তৈরী করা হয়। (ঘ) **গন্ধক** (Sulphur)—কার্পাস, কাগজ, রবার প্রভৃতি শিল্প এবং সার তৈরীর উপযুক্ত **সালফিউরিক এসিড** তৈরীর জন্য প্রচুর গন্ধক ব্যবহার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশী এবং জাপানেও ইহা যথেষ্ট পাওয়া যায়। (ঙ) **জিপ্‌সাম**—ইহার সাহায্যেও প্রচুর সার তৈরী হয়। বিহারের সিন্ধ্রি এরূপ সার তৈরী করিবার একটি প্রধান কেন্দ্র। তথায় রাজস্থানের জিপ্‌সাম ব্যবহৃত হয়।

অভ্র

উৎপাদন ও প্রধান ব্যবহার—বিভিন্ন খনির মধ্যে অভ্র যেন স্তরে স্তরে সাজান থাকে। তথা হইতে এক একটি অংশ কাটিয়া স্তরগুলিকে (Mica sheets) পৃথক্ করা হয়। বৈদ্যুতিক শিল্পে (Non-conductor of heat and electricity বলিয়া) ইহা সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। তাহাছাড়া বিমানপোত, মোটরগাড়ী প্রভৃতির

বিভিন্ন অংশ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, রঙ, ঔষধ, প্রতিমার সাজসজ্জা প্রভৃতি তৈরীর এবং প্রচণ্ড তাপের চুল্লীতে প্রলেপ দেওয়ার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। অভ্রের পাতের উপর ছবি আঁকা হয়। দেওয়াল কাগজকে (Wall paper) উজ্জ্বল করার এবং ঘরের ছাদ তৈরীর জন্যও ইহা ব্যবহৃত হয়। অভ্রের গুঁড়ার সাহায্যে কৃত্রিম অভ্র খণ্ড ("সামিকা") তৈরী হয়।

প্রধান উৎপাদন-স্থান—পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী** অভ্র পাওয়া যায় **ভারতে**। তাহাছাড়া ব্রেজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা গণতন্ত্র, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে কিছু অভ্র পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—সবচেয়ে বেশী অভ্র **রপ্তানি** করে **ভারত**। তাহা **আমদানি** করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র প্রভৃতি দেশ।

গৃহ, পথ প্রভৃতি নির্মাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বহুশত সহস্র বৎসরের প্রাচীন মাটির ঘর, পাকাবাড়ী বা ইটের দালান, পাথরের দালান, দুর্গ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। মাটি, ইট, পাথর প্রভৃতি দ্বারা নানাপ্রকার গৃহ নির্মাণ ভিন্ন পথও তৈরী হয়। ইহাদের বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হইল :—

(১) **মাটি ও ইট**—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে মাটি দ্বারা প্রচুর ঘরবাড়ী তৈরী হয়। এরূপ কতক ঘরের উপরে খড়, টিন প্রভৃতির ছাউনি থাকে। তারপর নদীর ধারের বা খাল, বিল প্রভৃতি জলা জায়গার পাশের এঁটেল মাটি দিয়া ইট তৈরী করিয়া তাহার সাহায্যে তৈরী হয় পাকা বাড়ী বা দালান। তাহাছাড়া কতক স্থানে মাটির তৈরী টালি (Tile), খোলা প্রভৃতির ছাউনি দিয়াও বহু ঘর তৈরী হয়। কতক মাটি (Kaolin or China clay) দ্বারা নানারকম বাসনপত্রও তৈরী হয়।

(২) **পাথর**—পাহাড়, পর্বতের গায়ে ও তাহাদের আশপাশে বহু সুন্দর ও মজবুত পাথরের বাড়ী আছে। আজকাল কতক ইটের বাড়ীর উপর পাথরের হাল্কা টুকরা (Stone slabs) মাত্র বসাইয়া দেওয়া হয়। পাহাড়, পর্বতের আশপাশে পাথর দিয়া পথঘাটও তৈরী হয়। এসকল কাজে নিম্নলিখিত পাথর বেশী ব্যবহৃত হয়।

(ক) **চুনাপাথর** (Limestone) **ও মর্মর প্রস্তর** (Marble)—পৃথিবীর সর্বত্র চুনাপাথর সহজলভ্য। সেজন্য ইহা দ্বারা বহু বাড়ী এবং প্রশস্ত পথ তৈরী হয়।

পাথরের টুকরা দ্বারা সিমেন্ট কংক্রীট তৈরী হয়। সাদা ও ধূসর রংএর মর্মর প্রস্তর বা মার্বেল পাথরের বাড়ী খুব সুন্দর। যেমন, আগ্রার **তাজমহল,** কলিকাতার **ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল হল,** আগ্রার **মতি মসজিদ** প্রভৃতি। **যুক্তরাষ্ট্রে** পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী চুনাপাথর পাওয়া যায় ও ব্যবহৃত হয়। তারপর সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, স্পেন, জাপান প্রভৃতি দেশের স্থান। **ইটালি** দেশের **মার্বেল পাথর** প্রসিদ্ধ। রাজপুতনার নানাস্থানের ও মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুরের নর্মদা নদীর জলপ্রপাতের পাশের মার্বেল পাথরও সুন্দর।

(খ) **বেলেপাথর** (Sandstone)—ইহাও সহজলভ্য। তবে **যুক্তরাষ্ট্রেই** সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় ও ব্যবহৃত হয়। ইহা মার্বেল ও চুনাপাথরের মত মসৃণ বা সুন্দর নয়, কিন্তু অধিক (লৌহের অংশ বেশী থাকাতে) শক্ত। লাল রঙ-এর শক্ত পাথর দ্বারা **আগ্রার দুর্গ,** দিল্লীর বিখ্যাত **লালকেল্লা** (Red Fort) প্রভৃতি তৈরী হইয়াছে। হলদে, ধূসর, সবুজ প্রভৃতি রঙের বেলেপাথরও আছে।

(গ) **শ্লেট** (Slate)—পাললিক শেল শিলা রূপান্তরিত হইয়া ইহার সৃষ্টি হয়। ইহার রঙ নানা প্রকার—নীল ও কাল রঙের মিশ্রণ (শ্লেট রঙ), লাল, সবুজ, কাল, ধূসর প্রভৃতি। এই পাথর দ্বারা লেখার জন্য বোর্ড ও শ্লেট, বাড়ীর ছাদ ও মেঝের টালি প্রভৃতি তৈরী হয়। ইহা **যুক্তরাষ্ট্রে** অধিক পাওয়া যায়।

(ঘ) **গ্রেনাইট** (Granite)—ইহা একপ্রকার **আগ্নেয়** শিলা। লাল, গোলাপী, সবুজ, কাল প্রভৃতি নানা রঙের গ্রেনাইট আছে। ইহা বেশ শক্ত। তবে ইহাকে প্রয়োজনমত কাটা ও পালিশ করা চলে। যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যাণ্ডে গ্রেনাইট পাথরের তৈরী বাড়ী, গীর্জা প্রভৃতি দেখা যায়।

(চ) **ব্যাসল্ট** (Basalt)—ইহা একপ্রকার **আগ্নেয়** শিলা। ইহার রঙ কাল। ইহাদ্বারা রাস্তা তৈরী হয়। মহারাষ্ট্রে ও মধ্যপ্রদেশে অধিক ব্যাসল্ট পাওয়া যায়।

(৩) **সিমেণ্ট**—পূর্বকালে ইটের গায়ে চুন এবং সুরকি (ইটের গুঁড়া) মিশাইয়া দালান তৈরী হইত। আর আজকাল ইট, পাথর প্রভৃতিকে পরস্পরের সহিত শক্তভাবে গাঁথিয়া খুব বড় ও মজবুত দালান, সেতু, বাঁধ প্রভৃতি তৈরীর জন্য সধোরণতঃ সিমেণ্ট ব্যবহৃত হয়। ইহা তৈরীর জন্য ৭৫-৮০% জিপসাম ও চুনাপাথর এবং ২০-২৫% কয়লা ও কর্দম (Shale) আবশ্যক। **যুক্তরাষ্ট্রে** ইহা সবচেয়ে বেশী তৈরী হয়। ঐ দেশ ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তৈরী হয় পৃথিবীর ৭০% সিমেণ্ট।

এস্‌বেস্টস—বর্তমানে সিমেণ্টের সহিত এস্‌বেস্টস বা জমাট আঁশের গুচ্ছের মত এক জাতীয় খনিজ পদার্থ মিশাইয়া এস্‌বেস্টসের নানারকম চাদর (Asbestos

sheet) তৈরী করা হয়। ইহাদের সাহায্যে অনেক ঘরবাড়ীর ছাউনি দেওয়া হয়। আগুন ও এসিডে ইহার বিশেষ ক্ষতি হয় না, আর ইহা উত্তাপ ও বৈদ্যুতিক শক্তি রোধ করিতে পারে। খনিজ এসবেস্টস পদার্থের ৬০% **ক্যানাডাতে** এবং ২০% দক্ষিণ আমেরিকাতে পওয়া যায়।

(৪) **বালি, চুন** প্রভৃতি—পাকা বাড়ী, সেতু প্রভৃতি তৈরীর জন্য এসকল জিনিস খুব বেশী প্রয়োজন। বিভিন্ন নদীর উপত্যকাতে প্রচুর বালি পাওয়া যায়, আর চুনাপাথরের গুঁড়া হইতে পাওয়া যায় এসকল কাজের উপযুক্ত চুন। **কাঁচ** তৈরীরও একটি প্রধান উপকরণ বালি। আজকাল এদেশে নানাস্থানে প্রচুর কাঁচের চাদর (Glass sheet), কাঁচের চুড়ি, শিশি, বোতল প্রভৃতি তৈরী হয়।

ভারতের খনিজ সম্পদ্

ভারতভূমি কেবল মাত্র কৃষিজসম্পদে সমৃদ্ধ নহে, এদেশে নানাপ্রকার খনিজসম্পদ্ও আছে। তাহা পাওয়া যায় প্রধানতঃ **ছোটনাগপুর মালভূমিতে**। তাহাছাড়া মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্য মালভূমির বিভিন্ন অংশে, উত্তরপূর্বে আসামে এবং পশ্চিমে সমুদ্র উপকূলেও প্রচুর পাওয়া যায়। এদেশে লৌহ, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, মোনাজাইট, ইল্‌মেনাইট প্রভৃতি রপ্তানি করিবার মত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। কয়লা, তাম্র, চুনাপাথর এবং (এলুমিনিয়াম তৈরীর জন্য) বক্সাইট প্রভৃতি এদেশের প্রায় প্রয়োজনমত পাওয়া যায়। এদেশে খনিজ তৈলের উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে।

(১) **লৌহ আকরিক ও ইহার ব্যবহার**—লৌহ এদেশের **দ্বিতীয়** (কয়লার পরে) খনিজ সম্পদ। গত ২৫।৩০ বৎসরে এদেশে লৌহের ব্যবহার অসামান্য পরিমাণে বাড়িয়াছে। এখন এদেশে লোহার সাহায্যে তৈরী হইতেছে **জাহাজ, স্টীমার, গাড়ি, সেতু, ঘরবাড়ির** অংশ প্রভৃতি বড় জিনিস, অসংখ্য **নিত্য ব্যবহার্য** জিনিস, আর **যন্ত্রপাতি, কলকব্জা** প্রভৃতি সূক্ষ্ম জিনিস। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি এত উৎকৃষ্ট যে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র প্রভৃতি দেশেও যথেষ্ট **রপ্তানি** হয়।

লৌহখনি অঞ্চল ও উৎপাদন—১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে উৎপন্ন হইত ৩০ লক্ষ টন লৌহ আকরিক ; আর চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক প্রকল্পের শেষে (১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ) উৎপন্ন হইয়াছে তাহার প্রায় ১২ গুণ (৩½ কোটি টন)। এখন ইহা বেশী পাওয়া যায় **মধ্যপ্রদেশের** ডায়লাদিলা, দ্রুগ, বাস্তার, ডালি, রাজহারা এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের মিলনস্থল **গোয়াতে**। তারপর **উড়িষ্যার** গুরুমহিষানী, সলাইপত, বাদামপাহাড়, বাগিয়াবুরু ; **বিহারের** নোয়ামুণ্ডি, গুয়া, বুদাবুরু, পানসিরাবুরু এবং এই দুই রাজ্যে

বিস্তৃত কিরিবুরু খনিতে। বিহারের মনোহরগড় জেলার **চিরিয়াতে** ভারতে **বৃহত্তম** এবং পৃথিবীতে অন্যতম বৃহৎ লৌহভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। **অন্ধ্রপ্রদেশের** নেলোর, কুড্ডাপা, কুর্নুল; **তামিলনাড়ুর** সালেম, তিরুচিরাপল্লী; **মহারাষ্ট্রের** চাঁদা, রত্নগিরি; **কর্ণাটকের** বাবাবুদান, দোনিমালাই, সন্ধুর, বেলারি প্রভৃতি স্থানেও লৌহ পাওয়া যায়।

(২) **ম্যাঙ্গানিজ**—ইহা ভারতের একটি প্রধান খনিজ সম্পদ; ইস্পাত ও কাচ শিল্পে ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়। এদেশে ইহার উৎপাদনের পরিমাণ (১৯৭৫ খ্রীঃ) প্রায় ১০ লক্ষ টন। ইহা অধিক পাওয়া যায় **মধ্যপ্রদেশের** বালাঘাট, ছিন্দোয়ারা ও জব্বলপুরে। তারপর পাওয়া যায় **মহারাষ্ট্রের**: ভাণ্ডারা, নাগপুর, মনস্থর, রত্নগিরি, পাচমহল; **উড়িষ্যার** গাঙ্গপুর, বোনাই, কেওঞ্ঝড় ও গঞ্জাম এবং **কর্ণাটকের** চিতলড্রুগ, কাদুর, সিমোগা ও তমকুরে। বিহারের কালহান, অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম, বিশাখাপটনম প্রভৃতি স্থানেও ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়।
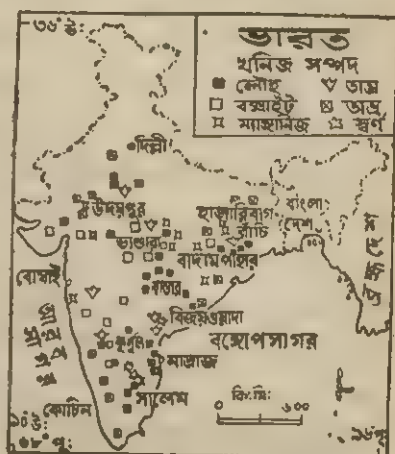
(৩) **অভ্র**—বিমানপোত ও মোটরগাড়ীর বিভিন্ন অংশ, বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, আলোর চিমনি, ছবি আঁকার পাত, ঔষধ, রঙ প্রভৃতি তৈরীর জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। এদেশে **সাদা ও কাল** অভ্র পাওয়া যায়। এদেশে বাৎসরিক মোট অভ্র উৎপাদনের পরিমাণ **পৃথিবীতে প্রথম** (১৮ হইতে ২২ হাজার টন); সমগ্র পৃথিবীর মোট অভ্র উৎপাদনের প্রায় ৭৫%। **বিহারের** গয়া, হাজারিবাগ, মুঙ্গের ও মানভূমে পাওয়া যায় দেশের **অধিকাংশ** (প্রায় ৮০%) অভ্র। **রাজস্থানের** জয়পুর, আজমীর, কর্ণাটকের হাসান, অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর, তামিলনাড়ুতে নীলগিরি অঞ্চলে এবং কেরালা রাজ্যেও অভ্র পাওয়া যায়।

(৪) **তাম্র**—বৈদ্যুতিক শিল্পে ইহার চাহিদা অধিক। এদেশে ইহার উৎপাদন (১৯৭৫ খ্রীঃ) ১৪ লক্ষ টন আকরিক তাম্র। এদেশের অধিকাংশ তামা পাওয়া যায় **বিহারের** সিংভূম ও **রাজস্থানের** ক্ষেত্রি ও দারিবাতে। **মধ্যপ্রদেশের** বালাঘাট, **অন্ধ্রপ্রদেশের** অগ্নিগুণ্ডালা, কর্ণাটকের চিত্রদুর্গ প্রভৃতি স্থানেও পাওয়া যায়।

(৫) **বক্সাইট**—প্রচণ্ড উত্তাপে বক্সাইট গলাইয়া তৈরী হয় **এলুমিনিয়াম**। তাহা দ্বারা তৈরী হয় বিমানপোত ও গৃহস্থালার বহু জিনিস। এদেশে বক্সাইটের উৎপাদন (১৯৭৫ খ্রীঃ) ১১ লক্ষ টন। তাহা অধিক পাওয়া যায় **মধ্যপ্রদেশে**। তারপর **মহারাষ্ট্র, গুজরাট** ও **বিহারে**। উত্তর প্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের উৎপাদন কম।

(৬) **মোনাজাইট ও ইল্‌মেনাইট**—মোনাজাইটের কতক উপাদান (ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম) এবং ইল্‌মেনাইট ব্যবহৃত হয় **আণবিক শক্তি** উৎপাদনের উদ্দেশ্যে। কেরালাতে সমুদ্রতীরে মোনাজাইট এবং বিহারের মহুগোড়াতে ও তামিলনাড়ুর সমুদ্রতীরে পাওয়া যায় ইল্‌মেনাইট।

(৭) **স্বর্ণ ও রৌপ্য**—এদেশে ইহাদের উৎপাদন কম। কর্ণাটকের কোলার খনিতে মাত্র এগুলি পাওয়া যায়। তথাকার কতক খনি প্রায় ৯০০ মি গভীর।

(৮) **বিবিধ খনিজ দ্রব্য**—এদেশে **হীরক** পাওয়া যায় কর্ণাটকের গোলকুণ্ডাতে। **ক্রোমাইট** পাওয়া যায় প্রধানতঃ **উড়িষ্যাতে**। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে উৎপাদন কম। ইহা দ্বারা তৈরী হয় ইস্পাত, রঙ ও বৈদ্যুতিক চুল্লী তৈরীর তাপসহ ইট। এরূপ ইট তৈরীর অন্য উপাদান **ম্যাগনেসাইট, সিলিম্যানাইট, কায়ানাইট** ও **ফায়ারক্লে** পাওয়া যায় উত্তরপ্রদেশ, বিহার, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে। ফায়ারক্লে ও **কেওলিন** দ্বারা চীনামাটির বাসন তৈরী হয়। কেওলীন পাওয়া যায় বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশে। **জিপসাম** দ্বারা তৈরী হয় সিমেন্ট ও কৃত্রিম সার। ইহা পাওয়া যায় হিমাচলপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুতে। **সীসা** পাওয়া যায় রাজস্থান, গুজরাট ও উড়িষ্যাতে। সামান্য **নিকেল** পাওয়া যায় উড়িষ্যাতে। অরুণাচল, মেঘালয় প্রভৃতি রাজ্যে কয়লা, লৌহ, সীসা প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

এদেশের নানারকম **পাথর** মূল্যবান। কতক বিখ্যাত বাড়ি (কলিকাতা হাইকোর্ট, দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবন, সুপ্রীমকোর্ট প্রভৃতি) তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে সুন্দর **বেলেপাথর**। কতক বাসন, মূর্তি প্রভৃতি তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয় বেলেপাথর, **চুনাপাথর** ও **মর্মর পাথর** (মার্বেল)। রেলপথ তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয় **ব্যাসল্ট** জাতীয় শিলা। এগুলি এদেশের নানাস্থানে পাওয়া যায়।

শক্তি ও শক্তির উৎস

শক্তির ব্যবহার—প্রকৃতির একটি দিক্ খাদ্য, জল, কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি পদার্থ সরবরাহ, অপর দিক্ জীবদেহের তাপ, ক্ষমতা প্রভৃতি শক্তি উৎপাদন। কারণ,

পদার্থই শক্তিতে পরিণত হয় (Matter is converted into energy)। এজন্য শক্তি **দুইটি প্রধান ভাগে** বিভক্ত—(১) চেতন (Animate) শক্তি ও (২) জড় (Inanimate) শক্তি।

চেতন শক্তি—ইহা উদ্ভিদ্, প্রাণী প্রভৃতি বিভিন্ন চেতন বা সজীব পদার্থের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করে (functions)। এই চেতন শক্তি **বিভিন্ন ভাগে** বিভক্ত। যেমন, (ক) বিভিন্ন প্রাণী যে সকল খাদ্য গ্রহণ করে তাহা দ্বারা **জীবদেহে শক্তি** (Biotic energy) উৎপন্ন হয়। (খ) তারপর মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী তাহাদের দেহের বিভিন্ন **মাংসপেশী** দ্বারা **শক্তি** (Muscular energy) প্রয়োগ করে। (গ) সর্বোপরি মানুষ তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি বা **মানসিক শক্তি** (সর্বাপেক্ষা উন্নত ধরনের শক্তি) দ্বারা জড়শক্তি সৃষ্টি করে।

জড়শক্তি—মানুষ তাহার **উন্নত মানসিক শক্তি** দ্বারা কয়লা, খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি জড় পদার্থের মাধ্যমে প্রচুর **জড় শক্তি উৎপন্ন করে** এবং তাহাই সাধারণ শক্তির **সর্ব প্রধান উৎস**। এরূপ বিভিন্ন প্রকার শক্তিদ্বারা রেলগাড়ী, জাহাজ, বিরাট কারখানা পরিচালনা প্রভৃতি যাবতীয় বৃহৎ কাজ সম্পন্ন হয়। সামান্য কয়েক কুইন্টেল (১ কুইন্টেল = ৩৭ কিলোগ্রাম, জিনিস টানিয়া নেওয়ার জন্য দুইটি বলদের পক্ষে কতই না কষ্ট হয়। অথচ মাত্র ২।৩ জন লোক বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক শক্তির মাধ্যমে একটি মালগাড়ীর সাহায্যে বহু হাজার কুইন্টেল মাল অনায়াসে এক স্থান হইতে অন্যত্র বহন করিয়া নেওয়ার ব্যবস্থা করে।

শক্তির উৎস জড় শক্তি যে সকল **উৎস** হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা **দুইটি** প্রধান **ভাগে** বিভক্ত। যথা—(১) ক্ষয়শীল (Exhaustible or un-renewable source) উৎস বা সূত্র ও (২) প্রবহমান (Continuous or renewable source) সূত্র। কয়লা, খনিজ তৈল, গ্যাস প্রভৃতি **ক্ষয়শীল উৎস**। কারণ, ইহাদের সাহায্যে একবার মাত্র শক্তি উৎপন্ন করিলেই এরূপ প্রত্যেকটি পদার্থ নষ্ট বা নিঃশেষ হইয়া যায়। যেমন, কয়লা একবার জ্বালাইলে ছাই বা ভস্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে। খনিজ তৈল, গ্যাস প্রভৃতিও একবার মাত্র ব্যবহার করিলেই পুড়িয়া যায়। কোন অবশিষ্ট থাকে না। তবে এখন পর্যন্ত এগুলিই শক্তি উৎপাদনের **সর্বপ্রধান উৎস**। ইহাদের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

অপরদিকে **প্রবহমান সূত্রের** শক্তির শেষ নাই। যেমন, সৌর তাপ (Solar radiation)। এরূপ শক্তি নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত: (১) সাক্ষাৎভাবে (Directly), লেন্স (Lenses), প্রতিবিম্ব, প্রতিফলন (Reflection), ফটো কেমিস্ট্রি (Photo-

chemistry), ফটো ইলেকট্রিসিটি (Photo-electricity), থার্মো-ইলেকট্রিসিটি (Thermo electricity) প্রভৃতির মাধ্যমে সৌরতাপ হইতে অনবরত শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। (২) গৌণভাবে সৌরতাপ কাঠ, রবার, উদ্ভিজ্জ সুরাসার, গ্যাসোলিন প্রভৃতির মাধ্যমে শক্তি উৎপন্ন করে। তাহাছাড়া জলপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ এবং জল, স্থল ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে উষ্ণতার পার্থক্যের ফলেও শক্তি উৎপন্ন হয়। শক্তির কয়েকটি প্রধান উৎসের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

কয়লা

কয়লার উৎপাদন—অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীতে যে সকল বন ছিল তাহাদের কতক অংশ প্রবল ভূআন্দোলন, ভূমিকম্প, ধস প্রভৃতি নানা কারণে উহাদের উৎপত্তিস্থানেই ভূপতিত হইয়াছিল। আর কতক গাছ হয়ত নদীর প্রবল জলস্রোতের বা বন্যার সাহায্যে প্রবাহিত হইয়া আশপাশের কোন নীচু জায়গাতে গিয়া জমিয়াছিল। তারপর যুগ যুগ ধরিয়া জল ও কাদার মধ্যে থাকাতে এবং তাহাদের উপরিভাগে সঞ্চিত বালুকা, কাঁকর, কর্দম প্রভৃতির চাপে নানাপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে ঐসকল **উদ্ভিদ্ই** কালক্রমে **কয়লাতে পরিণত হয়।** উদ্ভিদ্সমূহ বিভিন্ন স্তরে স্তরে শুইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাদের উপর বালুকা, কর্দম প্রভৃতিও স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়। তাই কয়লা **স্তরে স্তরে** (Different seams) সৃষ্ট হয়। এভাবে উৎপন্ন হওয়ার জন্যই কয়লা **পাললিক শিলা অঞ্চলে** পাওয়া যায়।

কয়লার শ্রেণীবিভাগ ও ব্যবহার—কয়লা যত বেশী **রূপান্তরিত** হয়, উহার গুণ বা **কার্যকারিতা** ও **মূল্য** তত বেশী। তাই পরিবর্তনের এবং ব্যবহারের পার্থক্য অনুসারে কয়লা নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত—

(ক) **পীট** (Peat)—উদ্ভিদ হইতে কয়লা সৃষ্টির অবস্থায় সকলের উপরের স্তরের, অর্থাৎ **সবচেয়ে কম পরিবর্তিত** অবস্থার জিনিসকে বলে পীট। ইহা উদ্ভিদ্ ও কয়লার মাঝামাঝি অবস্থা (প্রকৃতপক্ষে কয়লা নহে)। এই অবস্থাতে গাছের ডালপালার চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়, আর রঙও থাকে বাদামী (অনেকটা গাছের রঙ-এর মত)। ইহা গাছের মতই জ্বলে এবং তাহাতে খুব ধোঁয়া হয়। ইহার তাপ নিতান্তই কম। ভাল কয়লার একান্ত অভাব ঘটিলে গৃহস্থালীর কাজে পীট ব্যবহৃত হয়।

(খ) **লিগ্নাইট** (Lignite)—ইহা নিকৃষ্ট কয়লা। পীটের চেয়ে বেশী পরিবর্তিত অবস্থার জিনিসকে অর্থাৎ অল্প পরিবর্তিত কয়লাকে বলে লিগ্নাইট। পৃথিবীর মাত্র ১০% কয়লা এই জাতীয়। এই অবস্থাতেও গাছপালার কতক অংশ চেনা যায়।

উহার রঙ বাদামী ও কাল-এর মাঝামাঝি। তাই ইহাকে বলে **বাদামী কয়লা** (Brown Coal)। ইহা **নিকৃষ্ট কয়লা**। ইহাতে জল ও গ্যাস খুব বেশী থাকে। তাই ইহার তাপশক্তি কম (বিটুমিনাস কয়লার মাত্র ২০-২২%)। ইহা জ্বালালেই খুব ধোঁয়া হয়। ইহাদ্বারা ইট পোড়ান, **কৃত্রিম পেট্রোল** (Synthetic liquid fuel) তৈরী, **তাপবিদ্যুৎশক্তি** (Thermal power) ও গ্যাস উৎপাদন এবং শীতল অঞ্চলে ঘরের উষ্ণতা বৃদ্ধি করা হয়। গৃহস্থালীর কাজে ইহা কম ব্যবহৃত হয়।

(গ) **বিটুমিনাস** (Bituminous) কয়লা—পৃথিবীর **অধিকাংশ** (৮০%) কয়লা এই জাতীয়। ইহা কঠিন শিলার মত শক্ত, কিন্তু আঘাতের ফলে ভাঙিয়া যায়। ইহার রঙ কাল। ইহাই **সাধারণ কয়লা**। ইহার মধ্যেও যথেষ্ট জলীয় বাষ্প থাকে ; তাই ইহাও পোড়াইলে প্রচুর ধোঁয়া হয়। ইহা হইতে প্রচুর তাপ ও বাষ্প (Steam) পাওয়া যায়। তাই গৃহস্থালীর কাজে, বিভিন্ন **কারখানা, স্টীমার** ও **রেলওয়েতে** এই কয়লা অধিক ব্যবহৃত হয়। এরূপ কয়লার গুঁড়ার সাহায্যে তৈরী ব্রিকেটও (Briquet) রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। আজকাল বিভিন্ন দেশে বিটুমিনাস কয়লাকে কোক চুল্লীতে (Coke Oven) পোড়াইয়া **কোক কয়লা** তৈরী করা হয়। **নরম কোক** কয়লা বাড়ীতে গৃহস্থালীর কাজে, আর **কঠিন কোক** (Hard coke) লৌহ ও ইস্পাত এবং অন্যান্য শিল্পের কারখানাতে ব্যবহৃত হয়। সর্বাপেক্ষা কঠিন কয়লা ধাতব শিল্পের পক্ষে সর্বোত্তম। ইহাকে **ধাতব শিল্পের উপযোগী কয়লা** (Metallurgical coal) বলা হয়।

কয়লার সাহায্যে কোক তৈরীর সময় প্রচুর গ্যাস এবং অন্য বহু প্রকার **উপজাত দ্রব্য** (Bi-products) উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে কয়লার **গ্যাস** দ্বারা বাড়ীতে রান্না ও পথ-ঘাট আলোকিত করা হয়। **আলকাতরা** ঘরবাড়ী তৈরীর কাজে, আর **পীচ** পথঘাট তৈরার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। **ন্যাপথালিন** কীট ও পোকা নাশ করে। **এমোনিয়াক্যাল লিকরের** সাহায্যে বহু রাসায়নিক জিনিস এবং **ক্রিয়োসোটের** সাহায্যে কতক ঔষধ তৈরী হয়। **স্যাকারিণ** অনেক ক্ষেত্রে চিনির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। কয়লার উপজাত দ্রব্যের সাহায্যে নানারকম গন্ধদ্রব্য, **রঙ** এবং **বিস্ফোরক** পদার্থও (Explosive materials) তৈরী হয়।

কয়লা **ক্রমশঃ** অধিক ব্যবহারের ফলে দ্রুত নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। তাছাড়া ইহা একাধিক বার ব্যবহার করা যায় না। তাই অনেক শিল্পকেন্দ্রে খনিজ পদার্থের চেয়ে **টুকরার** (Scarp) **ব্যবহারের** উপরে বেশী জোর দেওয়া হয়। ইহাতে কয়লার খরচ কমে। তাহাছাড়া বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রে কয়লার পরিবর্তে তাপবিদ্যুৎ ও জলজ বিদ্যুৎ-

শক্তি ব্যবহার করিলে শিল্পদ্রব্য তৈরীর খরচ কমে, কয়লার অনেক অপচয়ও বন্ধ হয়। অপর দিকে কয়লার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস, জলজ বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতির গুরুত্ব দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

(ঘ) **এন্থ্রাসাইট** (Anthracite) কয়লা—ইহা **সর্বোৎকৃষ্ট** কয়লা, কিন্তু ইহা প্রায় দুষ্প্রাপ্য। ইহাতে জলীয় বাষ্প এত কম থাকে যে ইহা জ্বালাইলে ধোঁয়া হয় না। তবে ইহা অতিরিক্ত শক্ত ও জ্বালাইবার পক্ষে অসুবিধাজনক, কিন্তু একবার জ্বলিলে ইহা প্রচণ্ড তাপ দেয় এবং সহজে নিভিয়া যায় না। তাই বড় বড় কারখানার প্রকাণ্ড চুল্লীতে ইহা ব্যবহৃত হয়। তবে ইহা হইতে কোন উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায় না। তাহাছাড়া শিল্পকেন্দ্রে খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী।

কয়লার উপযুক্ত ব্যবহার এবং খনির যত্ন—কয়লা প্রধানতঃ **শক্তি উৎপাদনের** জন্য ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন কলকারখানার **যন্ত্রপাতি** চালাইবার জন্য কোক কয়লা ব্যবহৃত হয়, জাহাজ চালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় বাঙ্কার কোল। এবং স্থলপথে **রেলগাড়ী** চালাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় বিটুমিনাস কয়লা। এরূপ অনেক ক্ষেত্রে খনিজ তৈল তাপ বিদ্যুৎ, জলজ বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হইতেছে।

বিভিন্ন **শিল্পের উপাদান** হিসাবেও প্রচুর কয়লা ব্যবহৃত হয়। কারণ, ইহার সাহায্যে তৈরী হয় রাসায়নিক ও খনিজ (Metallurgy) শিল্পের বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য। ইহা ভিন্ন নিকৃষ্ট ও মধ্যম কয়লার সাহায্যে তৈরী হয় প্রচুর তাপ বিদ্যুৎশক্তি। ইহা ব্যবহার করিলে ঠিক প্রয়োজনের সময় উপযুক্ত শক্তি লাভ করা যায় এবং অপচয় বন্ধ করা যায়। তাহাছাড়া এক্ষেত্রে শিল্পকেন্দ্রে ধোঁয়া হয় না। এরূপ তাপবিদ্যুৎ শক্তি তাহার উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে যথেষ্ট দূর পর্যন্ত সরবরাহ করা যায়। কয়লার গুঁড়ার সাহায্যে তৈরী ব্রিকেট এবং কয়লার গ্যাস বাড়ীতে রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। এই গ্যাস রাস্তায়, আলো জ্বালানো এবং অন্যান্য কাজেও ব্যবহৃত হয়।

ভূতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন যে, যে হারে কয়লা উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে ২০০০ বৎসরের মধ্যেই হয়ত বর্তমানে **পরিচিত** কয়লা **সম্পদ্** (Known reserve) শেষ হইয়া যাইবে। তাই নূতন নূতন কয়লার **খনি আবিষ্কারের** চেষ্টা হইতেছে এবং খনি হইতে কয়লা **যত্নের সহিত উৎপাদন** ও সংরক্ষণ, খনি হইতে কয়লা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইহাকে ঠিকমত প্রেরণ, ইহার **উপযুক্ত** ও পরিমিত **ব্যবহার,** বিশেষতঃ ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র ও অন্য কলকারখানাতে ব্যবহারের উপযোগী কয়লা (Metallurgical coal) যাহাতে অন্য কাজে ব্যবহৃত না হয় ইত্যাদি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। ধস বা অন্য ভাবে দুর্ঘটনা নিবারণের উদ্দেশ্যে খনির

ভিতর শক্ত থাম (Pillar) তৈরী করিয়া ও কোন অংশের কয়লা কাটিয়া নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা বালুকা দ্বারা ভরিয়া ফেলার (Stowing) ব্যবস্থা হইতেছে। ভিতরে উপযুক্ত আলোক ও বায়ু সরবরাহ ইত্যাদি নানা বিষয়ে সুব্যবস্থা করিয়া খনি হইতে কয়লা উত্তোলন সম্পর্কে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং খনির কয়লা উৎপাদন সম্পর্কে উন্নতিবিধান হইতেছে।

প্রধান উৎপাদন অঞ্চল ও উৎপাদনের পরিমাণ—বর্তমানে (১৯৭৫ খ্রীঃ) পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নিম্নলিখিত পরিমাণ কয়লা উৎপন্ন হইতেছে।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র	৭২ কোটি টন	যুক্তরাজ্য	১৩·৩ কোটি টন
যুক্তরাষ্ট্র	৫৩ কোটি টন	পশ্চিম জার্মানী	১০ কোটি টন
চীন	৪২·৫ কোটি টন	ভারত	৮ কোটি টন
পোল্যাণ্ড	১৬ কোটি টন	দক্ষিণ আফ্রিকা গণতন্ত্র	৬ কোটি টন

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র—এদেশের কয়লা **সম্পদ** (Reserve) পৃথিবীতে **দ্বিতীয়** (২৩%), কিন্তু বর্তমানে কয়লা **উৎপাদন** সম্পর্কে এদেশের স্থান **প্রথম** (১৯৭৫ খ্রীঃ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ৩২%)। এদেশের বেশীর ভাগ কয়লা **বিটুমিনাস** জাতীয়। প্রচুর লিগ্‌নাইটও আছে। এদেশে ক্রমশঃ নূতন খনি আবিষ্কার এবং আধুনিক যন্ত্রাদি ব্যবহারের ফলে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। (১) এদেশের **সবচেয়ে বেশী** (প্রায় ৬০%) কয়লা পাওয়া যায় কৃষ্ণ সাগরের উত্তরদিকে অবস্থিত ইউক্রেনের **ডোনেৎস উপত্যকাতে** (Donbas)। (২) মস্কোর অনেকটা পূর্বদিকে অর্থাৎ পশ্চিম সাইবেরিয়ার **কুজনেৎস** উপত্যকার (Kuzbas) অঞ্চলের কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ এদেশের মধ্যে দ্বিতীয়। (৩) তাহাছাড়া মস্কো অঞ্চল, উত্তরে পেচোরা অঞ্চল, কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরদিকে কাজাকস্থানের কারাগাণ্ডা অঞ্চল, মধ্যভাগে উরল অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বে বৈকাল হ্রদের নিকট ইর্খুটস্ক অঞ্চল এবং পূর্ব সীমাতে ব্লাডিভস্টক অঞ্চলে যথেষ্ট কয়লা পাওয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্র—এদেশের কয়লা **ভাণ্ডারের** (Reserve) পরিমাণ পৃথিবীতে **প্রথম** (৩৫%), কিন্তু কয়লা **উৎপাদনের** পরিমাণ **দ্বিতীয়** (১৯৭৫ খ্রীঃ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ২৩%)। এদেশের খনিসমূহ ক্রমশঃ পূর্ব হইতে পশ্চিমে চারিটি অঞ্চলে বিস্তৃত। পূর্বদিকের খনিগুলির তুলনায় ক্রমশঃ পশ্চিমের খনিগুলির কয়লা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট এবং তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণও কম। (ক) **এপালেচিয়ান খনি অঞ্চল**—যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব অংশে এপালেচিয়ান পর্বতের পাশে উত্তরে **পেন্‌সিল্‌-ভেনিয়া** হইতে দক্ষিণে **আলাবামা** পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। এখানকার কয়লা

উৎপাদনের পরিমাণ **পৃথিবীতে প্রথম** (এদেশের ৬০-৭০% কয়লা), গুণ হিসাবেও ইহা পৃথিবীতে **সর্বোৎকৃষ্ট**। এখানকার পূর্ব অংশে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ **এন্থ্রাসাইট** কয়লা এবং অন্যান্য অংশে শ্রেষ্ঠ **বিটুমিনাস** কয়লা পাওয়া যায়। উত্তর অংশে কতক কয়লার স্তর স্পষ্ট দেখা যায়। (খ) **মধ্যভাগের খনি অঞ্চল**—এদেশের মধ্যভাগের সমভূমি অঞ্চলেও যথেষ্ট কয়লা পাওয়া যায়। মিসিসিপি নদাদ্বারা এই অঞ্চল দুইভাগে বিভক্ত— **পূর্বদিকের অংশ** (Eastern interior fields) ওহায়ো, ইণ্ডিয়ানা, ইলিনয় ও কেণ্টুকি স্টেটে বিস্তৃত, আর **পশ্চিমদিকের অংশ** (Western interior fields) আইওয়া, ওকলাহোমা, কান্সাস ও টেক্সাস স্টেটে বিস্তৃত। (গ) **রকি অঞ্চল**—এদেশের পশ্চিম অংশে রকি পর্বত অঞ্চলে বহু স্থানে কয়লা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কলোরেডো স্টেটের স্থান প্রথম। (ঘ) **প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল অঞ্চল**—এদেশের পশ্চিম সীমান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল অঞ্চলে কিছু লিগ্‌নাইট পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিমে **আলাস্কা** স্টেটে প্রচুর কয়লা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

চীন—এদেশের সর্বপ্রধান খনিজ সম্পদ কয়লা। এদেশের কয়লা **সম্পদ** সম্ভবতঃ পৃথিবীতে **তৃতীয়** (১৯%) এবং বর্তমানে (১৯৭৫ খ্রীঃ) **উৎপাদনের** পরিমাণও পৃথিবীতে **তৃতীয়**। (ঐ বৎসর পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ১৬%।) এদেশের কয়লাখনির বেশীর ভাগ (৮৫-৯০%) উত্তর-পূর্ব অংশে লোয়েস মালভূমিতে অবস্থিত; তাহার প্রধান কেন্দ্র হোয়াংহো নদীর অববাহিকার **সান্সি** ও **সেন্সি** প্রদেশ। উত্তর পূর্বে চিহিলি উপসাগরের পাশে সাণ্টুং, হোপেই এবং লিয়াওনিং প্রদেশ, সাণ্টুং-এর পশ্চিমে হোনান, আরও পশ্চিমে কান্‌সু, মাঞ্চুরিয়ার ফুশুন, মধ্য চীনের জেকোয়ান অঞ্চল বা Red Basin প্রভৃতি স্থানে কয়লা আছে। দক্ষিণে ইউনান মালভূমিতে পাওয়া যায় লিগ্‌নাইট।

পোল্যাণ্ড—এই দেশের দক্ষিণ অংশে প্রচুর (দেশের ৯০%) কয়লা পাওয়া যায়। এখন এদেশের উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **চতুর্থ** (১৯৭৫ খ্রীঃ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৭%)। এখানকার সাইলেসিয়া খনি পূর্ব জার্মানীর কয়লা খনির সহিত যুক্ত।

যুক্তরাজ্য—কয়লা উৎপাদন সম্পর্কে এদেশের স্থান এখন পৃথিবীতে **পঞ্চম** (১৯৭৫ খ্রীঃ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৬%)। এদেশের খনিসমূহ তিনটি অঞ্চলে অবস্থিত। (ক) **স্কট্‌ল্যাণ্ডের মধ্য উপত্যকা** (Midland valley) অঞ্চল— স্কট্‌ল্যাণ্ডের মধ্যভাগের উপত্যকাতে **ল্যানার্ক**, আয়ারশায়ার, ফাইফ্‌শায়ার ও

মিড্‌লোথিয়ান খনিতে কয়লা পাওয়া যায়। (খ) **ইংলণ্ডের পেনাইন অঞ্চলের পার্শ্বদেশ**—ইংলণ্ডের মধ্যভাগ দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পেনাইন পর্বতের আশপাশে
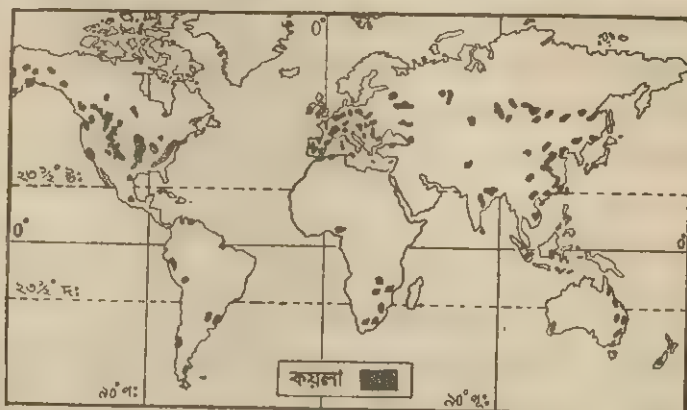
এদেশের **বেশীর ভাগ** (প্রায় ৬০%) কয়লা পাওয়া যায়। পর্বতের পশ্চিমদিকে ক্যাম্বারল্যাণ্ড ও **ল্যাঙ্কাশায়ারে,** পূর্বদিকে নর্দাম্বারল্যাণ্ড, ডারহাম, **ইয়র্কশায়ার, ডার্বিশায়ার** ও **নটিংহামশায়ারে** এবং দক্ষিণে স্ট্যাফোর্ডশায়ার, ওয়ারউইকশায়ার ও লিস্টারশায়ারে কয়লা খনি আছে। (গ) **ওয়েলস্ অঞ্চল**—ওয়েলস্ প্রদেশের দক্ষিণ অংশে প্রচুর ও উত্তর অংশে কিছু কম কয়লা পাওয়া যায়। এখানকার দক্ষিণ-পশ্চিমে এন্‌থ্রাসাইট কয়লা পাওয়া যায়।

পশ্চিম জার্মানী—কয়লা উৎপাদন সম্পর্কে এদেশের স্থান পৃথিবীতে **ষষ্ঠ** (১৯৭৫ খ্রীঃ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৫%)। এদেশের সবচেয়ে বেশী (৮০%) কয়লা পাওয়া যায় **রুড়** (Ruhr) অঞ্চলে। ওয়েস্টফ্যালিয়া, সার এবং ব্যাভেরিয়া অঞ্চলেও কয়লা পাওয়া যায়।

ভারত—এদেশের সর্বপ্রধান খনিজ সম্পদ্ কয়লা। বর্তমানে (১৯৭৫ খ্রীঃ) কয়লা উৎপাদন সম্পর্কে এদেশের স্থান পৃথিবীতে **সপ্তম**। (পরে আলোচনা করা হইবে)।

দক্ষিণ আফ্রিকা গণতন্ত্র—বর্তমানে (১৯৭৫ খ্রীঃ) কয়লা উৎপাদন সম্পর্কে এদেশের স্থান পৃথিবীতে **অষ্টম**। এদেশের কয়লা পাওয়া যায় প্রধানতঃ ট্রান্সভাল, অন্তরীপ প্রদেশ (Cape Province) ও নাটালে।

অন্যান্য দেশ

পূর্ব জার্মানী—এদেশের পূর্ব অংশে উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস কয়লা, আর দক্ষিণ-পূর্বে স্যাক্সনি অঞ্চলে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী (৪০%) লিগ্‌নাইট পাওয়া যায়।

বেলজিয়াম—এই দেশটি আয়তনে ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহার কয়লা সম্পদ্ প্রচুর। আর্ডেন মালভূমি অঞ্চলে তাহা অধিক উৎপন্ন হয়।

ফ্রান্স—এদেশের কয়লার পরিমাণ খুব কম। দেশের উত্তর-পূর্ব অংশে লোরেন অঞ্চলে অধিক এবং দেশের মধ্যভাগের মালভূমিতে (Central Massif) ও দক্ষিণে রোন নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে কিছু কয়লা পাওয়া যায়।

মধ্য ইউরোপের চেকোশ্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, দক্ষিণে স্পেন প্রভৃতি দেশেও কিছু কয়লা পাওয়া যায়।

ক্যানাডার পশ্চিম অংশে রকি পর্বত অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায়। তবে নানা অসুবিধার জন্য তথায় কয়লা খনির কাজ সন্তোষজনক নহে। পূর্বদিকে নোভাস্কোসিয়া এবং নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড অঞ্চলেও কিছু কয়লা পাওয়া যায়।

ওশিয়ানিয়া—এখানকার অন্তর্গত অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জীল্যাণ্ডের নানা স্থানে দক্ষিণ গোলার্ধের অন্য দুই মহাদেশের (দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা) তুলনায় বেশী কয়লা পাওয়া যায়। **অস্ট্রেলিয়ার** নিউ সাউথ্ ওয়েলস্ প্রদেশের **নিউ ক্যাস্‌ল** কয়লা খনির প্রধান কেন্দ্র।

দক্ষিণ আমেরিকা—এখানকার কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ সকল মহাদেশের নীচে। চিলি ও ব্রেজিল দেশে অতি সামান্য কয়লা পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—কয়লা যে সকল দেশে অধিক উৎপন্ন হয় তাহারা শিল্পেও উন্নত। তাই তাহাদের বেশীর ভাগ কয়লা দেশের চাহিদা মিটাইবার জন্য ব্যয় হয়। তবু কয়লা অধিক **রপ্তানি** করে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। তাছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা গণতন্ত্র, অস্ট্রেলিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশও কয়লা রপ্তানি করে। যে সকল দেশে বিভিন্ন শিল্পের উপযোগী নানাপ্রকার উপাদান ও অন্যান্য বিষয়ে সুযোগ যথেষ্ট পাওয়া যায় অথচ কয়লার অভাব, তাহারা কয়লা **আমদানি** করে। যেমন—জাপান, ফ্রান্স, ইটালি, সুইডেন, ক্যানাডা, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ।

খনিজ তৈল

উৎপাদন ব্যবস্থা—কয়লার মত খনিজ তৈলও **পাললিক শিলা** অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। সুদূর অতীত কালে অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণীর (Forra meniferra) দেহ ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন নিম্ন অংশে চুনাপাথর, বেলেপাথর প্রভৃতি পাললিক শিলার মধ্যে সঞ্চিত ছিল। এসকল জিনিস দীর্ঘকাল যাবৎ চারিদিকের শিলার চাপে থাকাতে রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হওয়ার ফলে কালক্রমে তাহা হইতে

তৈলাক্ত পদার্থের সৃষ্টি হয়। (কতক উদ্ভিদ্ হইতেও এরূপ তৈল উৎপন্ন হইয়া থাকিতে পারে।) ভূগর্ভে এই তৈলের সহিত জল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসও থাকে। তন্মধ্যে তৈলের চেয়ে জল ভারী বলিয়া তাহা তৈলের নীচে থাকে, আর গ্যাস হাল্কা বলিয়া তৈলের উপরে থাকে। বিভিন্ন প্রবেশ্য শিলার মধ্য দিয়া এসকল জিনিস প্রবাহিত হইতে হইতে যখন কোন **অপ্রবেশ্য শিলার উপর** গিয়া **সঞ্চিত** হয়, তখন জল ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে জমিতে জমিতে পেট্রোলিয়ামকে শিলাস্তরের ঊর্ধ্বভঙ্গের বা উপরদিকের ভাঁজের (Anticline) উপরে ঠেলিয়া তুলিয়া দেয়। তাহার উপরদিকের প্রাকৃতিক গ্যাসও সুবিধা পাইলেই বাহিরে আসিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সকলের উপরের স্তরের কর্দম, শেল প্রভৃতি **অপ্রবেশ্য** শিলার বাধার ফলে তাহা বাহিরে আসিতে পারে না। একারণেই গভীর তৈলকূপ খনন করিয়া প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তৈল উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়। শিলা হইতে এই তেল পাওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম **শিলা তৈল** (Petroleum অথবা Rock oil ; Petros = rock)। আবার কূপ খনন করিয়া পাওয়া যায় বলিয়া উহাকে বলে **খনিজ তৈল** (Mineral oil)।

প্রধান ব্যবহার—খনি হইতে তুলিবার সময় এই তৈল (Crude oil) থাকে **পাঁকের মত** আংশিক তরল। তখন উহার রঙ থাকে কাল, অথবা গাঢ় সবুজের সহিত মিশ্রিত ধূসর। তারপর **শোধনাগারে** (Oil refinery) আধুনিক পদ্ধতিতে শোধন করিয়া নিম্নলিখিত **উপজাত দ্রব্য** (Bi-product) পাওয়া যায়—

(১) **প্রাকৃতিক গ্যাস**—খনিজ তৈল শোধনের কালে সর্বপ্রথম পাওয়া যায় সবচেয়ে হাল্কা জিনিস প্রাকৃতিক গ্যাস। ইহা বাড়াতে রান্না, রাস্তার আলো জ্বালানো এবং কার্বন, সিমেন্ট প্রভৃতি তৈরীর কলকারখানাতে ব্যবহার করা হয়। গ্যাসের সাহায্যে গ্যাসোলিন তৈরীরও চেষ্টা হইতেছে। (২) **ন্যাপ্‌থা**—প্রাকৃতিক গ্যাসের পর পাওয়া যায় ক্রমশঃ অধিক ভারী জিনিস ; তন্মধ্যে ন্যাপথা প্রথম। (৩) **গ্যাসোলিন বা পেট্রোল** এবং **ডিজেল তৈল**- তারপর পাওয়া যায় **সর্বপ্রধান** উপজাত দ্রব্য গ্যাসোলিন বা পেট্রোল। বর্তমানে ইহার **পরিমাণ** খনিজ তৈলের সমুদয় উপজাত-দ্রব্যের প্রায় অর্ধেক। ইহা খুব সহজে **জ্বলে** ইহা কয়লার চেয়ে অনেক পরিষ্কার এবং শক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে **কয়লার তুলনায় অনেক কম** (মাত্র ⅓ অংশ) **দরকার** হয়। বিমানপোতের জন্য ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট গ্যাসোলিনকে Aviation spirit বলা হয়। আর বাস, লরি, ট্রাক, রেলওয়ে ইঞ্জিন প্রভৃতি চালাইবার এবং বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট) **ডিজেল তৈল**। (৪) **কেরোসিন**—পেট্রোলের পর পাওয়া যায় কেরোসিন। গ্রাম অঞ্চলে আলো জ্বালান, রান্না, ট্র্যাক্টর

চালনা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহৃত হয়। (৫) **পিচ্ছিলকারী তৈল** (Lubricating oil)—গুরুত্ব হিসাবে গ্যাসোলিন ও ডিজেল তৈলের পরেই ইহার স্থান। বর্তমান যন্ত্রযুগে কলকারখানা, গাড়ী, জাহাজ, বিমানপোত প্রভৃতির যন্ত্রপাতি, কলকব্জা প্রভৃতিকে ঠিকমত চালু রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়ত ইহা ব্যবহৃত হয়। (৬) **এ্যাস্ফ্যাল্ট ও প্যারাফিন**—কতক আকরিক তৈল হইতে **এ্যাস্ফ্যাল্ট** বা **পীচ** পাওয়া যায়। ইহার সাহায্যে বাড়ীর ছাদ, রাস্তা প্রভৃতি মেরামত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্বদিকের ত্রিনিদাদ দ্বীপের হ্রদ হইতে সোজাসুজি পিচ বা এ্যাস্ফ্যাল্ট পাওয়া যায়। আর কতক খনিজ তৈল হইতে পাওয়া যায় **মোম** (Wax) ও **প্যারাফিন**। (৭) **অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি**—আজকাল খনিজ তৈল হইতে শীতল ক্রীম (Cold cream), ভ্যাসেলিন, সুগন্ধ তৈল, তৈলাক্ত বস্ত্র (Linoleum), পশম, চর্ম প্রভৃতির বার্নিশ, কালী, রঙ, প্ল্যাস্টিক, পোকা মারিবার ঔষধ (Sprays) ও বস্ত্র পরিষ্কার করিবার উপকরণ প্রভৃতি বহু জিনিষ তৈরী হইতেছে।

খনিজ তৈলের গুরুত্ব—তৈলের কূপগুলি খুব সহজে **নিঃশেষ** হইয়া যায়। তাই কেবলমাত্র খনিজ তৈলের সাহায্যে বৃহৎ শিল্প পরিচালনা করা সমীচীন নহে রেলগাড়ী, জাহাজ প্রভৃতিও পেট্রোলের পরিবর্তে অন্য জিনিস দ্বারা চালানো প্রয়োজন। কারণ, বিমানপোত, মোটর গাড়ী প্রভৃতি পেট্রোল ভিন্ন অন্য শক্তিতে চলিবে না। **যুদ্ধের সময়** খনিজ তৈলের গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি হয়। যেহেতু, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ট্যাঙ্ক, জিপ, লরী, বাস, সাব্‌মেরিন, বিভিন্ন রণতরী এবং বিমানপোত প্রভৃতি খনিজ তৈলের দ্বারাই চলে। এই তৈল অত্যন্ত সহজে জ্বলিয়া যায় বলিয়া ইহা সরবরাহের ও ব্যবহারের সময় বিশেষ **সতর্কতা** প্রয়োজন।

ইহার বিকল্প পদার্থসমূহ—পেট্রোলের পরিবর্তে **শেল তৈল** (Shale oil) যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি দেশে এবং লিগ্‌নাইট ও অন্যান্য বহু জিনিসের সাহায্যে তৈরী **কৃত্রিম পেট্রোল** (Synthetic oil) পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে অধিক ব্যবহৃত হয়। আলু, আখের গুড়, নানাপ্রকার শস্য প্রভৃতির সাহায্যে তৈরী **এল্‌কহল**, আর কয়লার সাহায্যে তৈরী হয় **বেঞ্জল** ভারতেও তৈরী হইতেছে। তাহাছাড়া তাপবিদ্যুৎ ও জলজ বিদ্যুৎশক্তি এবং আণবিক শক্তি (Atomic power) ক্রমশঃ অধিক ব্যবহৃত হইতেছে। সৌরতাপ (Solar rays), বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত প্রভৃতির সাহায্যেও শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে।

তৈল সরবরাহের পদ্ধতি—তৈলবাহী জাহাজের (Oil tankers) সাহায্যে সবচেয়ে কম ব্যয়ে তৈল সরবরাহ করা হয়। তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যয়ে পাইপ

লাইনের সাহায্যে প্রাকৃতিক গ্যাস ও আকরিক তৈল ক্রমশঃ অধিক সরবরাহ হইতেছে। এ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাঙ্ক লাইনের (Trunk line) গুরুত্ব খুব বেশী। তথাকার অনেক পাইপের ব্যাস (Diameter) ৬-৭ মিঃ। পাইপ লাইনের তুলনায় তিনগুণ বেশী ব্যয়ে রেলপথের মাধ্যমে, আর রেলপথের তুলনায় তিনগুণ বেশী ব্যয়ে ট্রাকের মাধ্যমে তৈল সরবরাহ করা হয়।

উৎপাদনের পরিমাণ—বর্তমানে (১৯৭৫ খ্রীঃ) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিম্নলিখিত পরিমাণ খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপন্ন হয়।

খনিজ তৈল

যুক্তরাষ্ট্র	৪৬ কোটি টন	সৌদি আরব	২১.৫ কোটি টন
সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র	৪৩ " "	কুওয়েট	১৪ " "
ভেনিজুয়েলা	২২ " "	লিবিয়া	১১ " "
ইরান	২২ " "	ইরাক	১০ " "

প্রাকৃতিক গ্যাস

যুক্তরাষ্ট্র	৬৪ হাজার কোটি ঘন মি	মেক্সিকো	২ হাজার কোটি ঘন মি
সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র	২১.৬ " "	ইটালি	১.৫ " " "
ক্যানাডা	৮ " "	ভেনিজুয়েলা	১ " " "
রোমানিয়া	৩ " "	ফ্রান্স	১ " " "

প্রধান উৎপাদন অঞ্চল—পৃথিবীর দুইটি অঞ্চলে খনিজ তৈল অধিক পাওয়া যায়। ইহাদিগকে **পৃথিবীর তৈল কেন্দ্র** (Oil axis) বলা যায়।

(১) **পশ্চিম গোলার্ধ**—পৃথিবীর প্রায় $\frac{১}{৩}$ অংশ খনিজ তৈল উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো উপসাগরের ও ক্যারিবিয়ান সাগরের চারিপাশের স্থানসমূহে পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অংশ, মেক্সিকো, দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া প্রভৃতি দেশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

(২) **পূর্ব্ব গোলার্ধের মধ্য অংশ**—ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যভাগে অবস্থিত ভূমধ্যসাগরের আশপাশের স্থানসমূহে পৃথিবীর প্রায় $\frac{১}{২}$ অংশ খনিজ তৈল পাওয়া যায়। সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের দক্ষিণ অংশ, রোমানিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল (ইরান, ইরাক, আরব, মিশর প্রভৃতি দেশের খনিসমূহ) এখানে অবস্থিত।

নিম্নে বিভিন্ন অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল :

যুক্তরাষ্ট্র—এদেশের নিম্নলিখিত স্থানে বর্তমানে (১৯৭৫ খ্রীঃ) পৃথিবীর মধ্যে

সবচেয়ে বেশী (২০%) খনিজ তৈল উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয়। [পূর্বে এদেশে পৃথিবীর ৪০% খনিজ তৈল উৎপন্ন হইত।]

(ক) **এপালেচিয়ান অঞ্চল**—উত্তরে নিউ ইয়র্ক স্টেট হইতে দক্ষিণে আলাবামা পর্যন্ত এদেশের **পূর্বদিকের** তৈলখনি অঞ্চল বিস্তৃত। ইহা এদেশের প্রাচীনতম খনি অঞ্চল। এখন এখানে অতি সামান্য তৈল উৎপন্ন হয়। তবে আট্‌লাণ্টিক উপকূলে পেনসিলভেনিয়া, কেণ্টাকি প্রভৃতি কেন্দ্রে এখনও প্রচুর তৈল শোধন করা হয়। (খ) **ওহায়ো-ইণ্ডিয়ানা অঞ্চল**—হ্রদ অঞ্চলের দক্ষিণে ওহায়ো এবং ইণ্ডিয়ানা স্টেটের উত্তর-পূর্ব অংশের তৈল খনিও এখন প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। (গ) **ইলিনয় ইণ্ডিয়ানা অঞ্চল**—ইণ্ডিয়ানা স্টেটের দক্ষিণ পশ্চিম অংশ ও ইলিনয় স্টেটে অল্প পরিমাণ তৈল পাওয়া যায়। (ঘ) **মধ্যভাগের** বা **মধ্য-মহাদেশীয় খনি অঞ্চল** (Interior or Mid-continent field) আর্‌কান্‌সাস, ওক্‌লাহোমা, কান্‌সাস ও টেক্সাস স্টেটের উত্তর অংশে এদেশের অর্ধেকের বেশী তৈল সম্পদ আছে। এখান হইতে এদেশের অর্ধেক তৈল পাওয়া যায় এবং ইহাই এখন **পৃথিবীর সর্বপ্রধান** তৈল উৎপাদন-অঞ্চল। (ঙ) **উপসাগরীয় অঞ্চল**—মেক্সিকো উপসাগরের তীরে লুইসিয়ানা ও টেক্সাস রাজ্যের দক্ষিণ অংশ বর্তমানে এদেশের **তৃতীয়** তৈল উৎপাদন-অঞ্চল। **টেক্সাস** রাজ্যে সবচেয়ে বেশী তৈল উৎপন্ন ও পরিশোধন হয়। এখানকার তৈলের
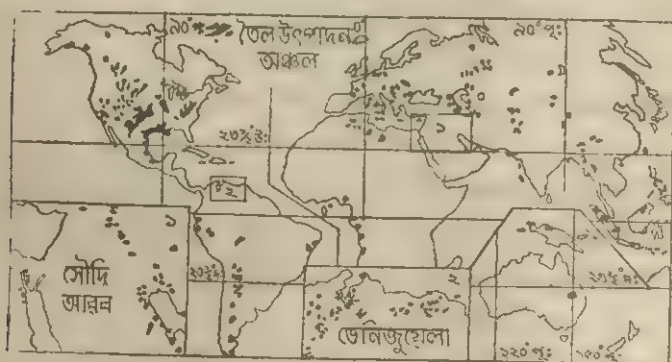
সহিত প্রচুর গন্ধক মিশ্রিত থাকে। (চ) **রকি পর্বত অঞ্চল**—এখানে প্রধানতঃ ইয়োমিং ও নিউ মেক্সিকো স্টেটে প্রচুর তৈল সম্পদ্ আছে, কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ কম। (ছ) **ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চল**—লস্ এঞ্জেলস হইতে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত অঞ্চলের তৈল উৎপাদনের ও পরিশোধনের পরিমাণ এদেশের মধ্যে **দ্বিতীয়**। এখানকার প্রধান কেন্দ্র সান্‌ফ্রান্সিস্কো।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র—এখন (১৯৭৫ খ্রীঃ) এদেশের খনিজ তৈল উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **দ্বিতীয়** (পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ১৯%)। এদেশের বেশীর ভাগ তৈল পাওয়া যায় **ট্রান্স-ককেশাস** অঞ্চলে। এখানকার প্রধান কেন্দ্র কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত **বাকু** অঞ্চল। উরল অঞ্চলের **উফা** কেন্দ্রের তৈল উৎপাদনের পরিমাণ বাকুর পরে (Second Baku); কখন কখন তাহা অপেক্ষা বেশী। তাহাছাড়া কারাকস্থানে, কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব ও উত্তর তীরে এবং পূর্বদিকে সাখালিন দ্বীপে খনিজ তৈল পাওয়া যায়।

ভেনিজুয়েলা—এখন (১৯৭৫ খ্রীঃ) এদেশের তৈল উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **তৃতীয়** (পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ১০%)। এদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তৈল **ম্যারাকাইবো হ্রদের** নিকট এবং কিছু কম ওরিনকো নদীর উপত্যকাতে পাওয়া যায়।

মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল—এশিয়ার পশ্চিম অংশে **পারস্য উপসাগরের** আশপাশে ইরান, ইরাক, ইস্রায়েল সিরিয়া, সৌদি আরব, কুওয়েত, বাহ্‌রিন দ্বীপ এবং ইহাদের পাশে উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার মিশর ও সুয়েজ অঞ্চলের তৈলখনিসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এসকল স্থানে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব অধিক এবং তাহাদের চেষ্টাতে এখানে **বড় তৈল শোধানাগার** স্থাপিত হইয়াছে। এসকল স্থান হইতে প্রচুর তৈল পাইপযোগে ভূমধ্যসাগরের তীরে প্রেরিত হয়।

(ক) **ইরান**—এদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে পারস্য উপসাগরের ধারে প্রচুর খনিজ তৈল পাওয়া যায়। বর্তমানে (১৯৭৫ খ্রীঃ) এদেশের উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **চতুর্থ**. এখানকার সর্বপ্রধান কেন্দ্র **আবাদান**। পৃথিবীর বৃহত্তম তৈল শোধনাগারসমূহের একটি এখানে অবস্থিত। (খ) **সৌদি আরব**—এদেশের পূর্বদিকে পারস্য উপসাগরের নিকট অবস্থিত কোয়াটার উপদ্বীপের তৈল উৎপাদনের পরিমাণ এখন পৃথিবীতে **পঞ্চম** এবং মধ্যপ্রাচ্যে দ্বিতীয়। এখানকার একটি বড় শোধনাগার **দাহ্‌রান**-এ অবস্থিত। (গ) **কুওয়েট**—আরব দেশের পূর্বদিকে এবং পারস্য উপসাগরের উত্তর-পশ্চিম অংশে কুওয়েট একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। এখানকার তৈল উৎপাদনের পরিমাণ এখন পৃথিবীতে **ষষ্ঠ**, মধ্য-প্রাচ্যে তৃতীয়। (ঘ) **ইরাক**—এদেশের পশ্চিম অংশে প্রচুর খনিজ তৈল পাওয়া যায়। বর্তমানে (১৯৭৫ খ্রীঃ) এদেশের উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **অষ্টম**। এখানকার প্রধান কেন্দ্র মোসুল, কিরকুক ও খানাকিন। (ঙ) **বাহ্‌রিন**—আরব দেশের পূর্ব উপকূলের ধারে বাহ্‌রিন দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। এখানে প্রচুর খনিজ তৈল পাওয়া যায় ও একটি বড় তৈল শোধনাগার আছে।

লিবিয়া—আফ্রিকার উত্তর অংশের লিবিয়াতে এখন প্রচুর খনিজ তৈল পাওয়া যায়। বর্তমানে (১৯৭৫ খ্রীঃ) এদেশের তৈল উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **সপ্তম**।

অন্যান্য স্থান

ক্যানাডা—এদেশে এলবার্টা ও অন্টেরিও প্রদেশে খনিজ তৈল পাওয়া যায়।

মেক্সিকো—এদেশের পূর্ব অংশে মেক্সিকো উপসাগরের উপকূল অঞ্চলে প্রচুর তৈল পাওয়া যায়। এখানকার তৈল শোধন ও রপ্তানির প্রধান কেন্দ্র ট্যাম্পিকো বন্দর।

কলম্বিয়া-ভেনিজুয়েলার পশ্চিমে অবস্থিত এই দেশে কিছু খনিজ তৈল পাওয়া যায়।

আর্জেন্টিনা—এদেশের প্যাটাগনিয়া অঞ্চলে ও আন্দিজ পর্বতের পূর্বদিকে খনিজ তৈল পাওয়া যায়. ইহা ভিন্ন পেরু, চিলি, ব্রেজিল, বলিভিয়া প্রভৃতি দেশেও কিছু খনিজ তৈল পাওয়া যায়।

ত্রিনিদাদ—ভেনিজুয়েলার অল্প দূরে ত্রিনিদাদ দ্বীপ অবস্থিত। এখানে প্রচুর খনিজ তৈল পাওয়া যায়। এখান হইতে যুক্তরাজ্যে তৈল সরবরাহ হয়। পাশে কিউরাকাও এবং আরুবা দ্বীপেও কিছু তৈল শোধন হয়।

রোমানিয়া—এদেশে ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খনিজ তৈল পাওয়া যায়। এদেশের উত্তর-পশ্চিমে **পোল্যাণ্ড** এবং **পশ্চিম জার্মানীতেও** কিছু খনিজ তৈল পাওয়া যায়।

মিশর—এদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে সুয়েজ খালের পাশে সিনাই উপদ্বীপে কিছু খনিজ তৈল পাওয়া যায়। আফ্রিকার পশ্চিম অংশের ঘানা ও নাইজেরিয়াতে সামান্য তৈল উৎপন্ন হয়। আর পূর্ব অংশে কেনিয়াতে আছে তৈল শোধনাগার।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চল—এই অঞ্চল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ. তদুপরি পাকিস্তান ও ভারত হইতে পূর্বদিকে মালয়েশিয়া পর্যন্ত অঞ্চলে খনিজ তৈল পাওয়া যায়।

(ক) **পাকিস্তান**—এদেশের পশ্চিম অংশে লবণ পর্বতের (Salt Range) পাশে আটক ও রাওলপিণ্ডির আশপাশে কিছু খনিজ তৈল পাওয়া যায়। (খ) **ভারত**—এদেশে খনিজ তৈলের উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এবিষয়ে পরে আলোচিত হইবে। (গ) **ব্রহ্মদেশ**—এদেশের মধ্যভাগে ইরাবতী ও চিন্দুইন নদীর উপত্যকায় কিছু খনিজ তৈল পাওয়া যায়। (ঘ) **ইন্দোনেশিয়া**—এদেশের অন্তর্গত সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপে খনিজ তৈল পাওয়া যায়। সুমাত্রা দ্বীপের পালেম্বাং কেন্দ্র বিখ্যাত।

(ঙ) **মালয়েশিয়া**—এদেশের অন্তর্ভুক্ত সাবাহ্ বা উত্তর বোর্নিওতে খনিজ তৈল পাওয়া যায়। তাহার কেন্দ্র বালিকপাপান ও তারাকান। (চ) **ব্রুনি**—বোর্নিও দ্বীপের পশ্চিম অংশের স্বাধীন ব্রুনি রাজ্যেও খনিজ তৈল পাওয়া যায়।

জাপান—এদেশের হন্‌শু দ্বীপে কিছু খনিজ তৈল পাওয়া যায়।

চীন—এদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে লিয়াওনিং প্রদেশে এবং উত্তর-পশ্চিমে অন্তর্মঙ্গোলিয়ার দক্ষিণে কান্‌সু অঞ্চলে সামান্য খনিজ তৈল পাওয়া যায়।

ওশিয়ানিয়া—নিউ জীল্যাণ্ডে সামান্য খনিজ তৈল পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অন্ততঃ ২০% তৈল উৎপন্ন করিয়াও প্রচুর আকরিক তৈল আমদানি করে। তারপর তাহা শোধন করিয়া রপ্তানি করে। কাজেই খনিজ তৈলের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দুই ভাগে বিভক্ত।

(ক) **আকরিক খনিজ তৈল** (Crude oil) **রপ্তানি**—ভেনিজুয়েলা, কুওয়েট, সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, মেক্সিকো, কলম্বিয়া প্রভৃতি দেশ অধিক আকরিক তৈল **রপ্তানি** করে। আর তাহা অধিক **আমদানি** করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশ। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, কেনিয়া প্রভৃতিও পরিশোধনের উদ্দেশ্যে আকরিক তৈল আমদানি করে।

(খ) **পরিশুদ্ধ তৈল** (Refined oil) **রপ্তানি**—যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ত্রিনিদাদ, রোমানিয়া, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশ এই জাতীয় তৈল রপ্তানি করে। উন্নত দেশসমূহ গ্যাসোলিন, ডিজেল তৈল প্রভৃতি আমদানি করে। কেরোসিন অধিক **আমদানি** করে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহ।

ভারতে শক্তির উৎস
(খনিজ সম্পদ)

(১) **কয়লা খনি অঞ্চল ও উৎপাদন**—এদেশের অধিকাংশ (প্রায় ৯৫%) কয়লার খনি পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অংশ হইতে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে আট শতের অধিক কয়লার খনি আছে। তন্মধ্যে মাত্র ২০০ খনিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। ইহাদের বেশীর ভাগ সরকারের পরিচালিত। ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে মাত্র ৩ কোটি টন কয়লা পাওয়া যাইত, এখন (১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ) পাওয়া যায় তাহার প্রায় তিন গুণ (৮·৩ কোটি টন) উৎকৃষ্ট কয়লা এবং ৩৩ লক্ষ টন লিগনাইট।

প্রসিদ্ধ কয়লাখনি—বিহারে পাওয়া যায় এদেশের প্রায় অর্ধেক কয়লা। তাহার প্রধান কেন্দ্র ছোটনাগপুরের **ঝরিয়া** অঞ্চল। তাহার পশ্চিমে বোকারো,

ডল্টনগঞ্জ, উত্তরে গিরিডি, রাজমহল প্রভৃতি খনিও প্রসিদ্ধ। **পশ্চিমবঙ্গে** পাওয়া যায় এদেশের ২৫-৩০% কয়লা। তাহার প্রধান কেন্দ্র **রাণীগঞ্জ**। ঝরিয়া-রাণীগঞ্জ পাশাপাশি
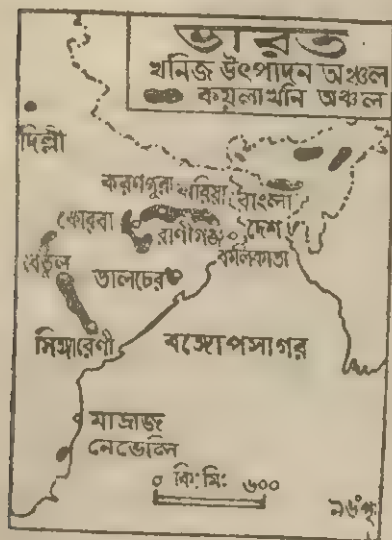
(২৫ কিমির মধ্যে) জায়গা। উড়িষ্যার তালচের, করনপুরা, রামগড়, রামপুর; মধ্যপ্রদেশের সোহাগপুর, পেঞ্চ উপত্যকা, উমারিয়া, কোরবা, সিঙ্গরাউলি, মহারাষ্ট্রের ওয়ারোরা, বল্লালপুর, ওয়ার্ধা, অন্ধ্রপ্রদেশের সিঙ্গারেনি, তেন্দুর প্রভৃতি অন্যান্য কেন্দ্র। **লিগনাইট** অধিক পাওয়া যায় তামিলনাড়ুর নেভেলিতে।

(২) **খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস**—খনিজ তৈল এদেশের মূল্যবান্ খনিজ সম্পদ্। গভীর কূপ হইতে আকরিক খনিজ তৈল সংগ্রহের সময় ও ঐ তৈল শোধনকালে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। কতক পৃথক কূপ হইতেও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়।

ব্যবহার—প্রধানতঃ **যানবাহন** (স্থলপথে মোটর গাড়ী, বাস, ট্রাক, আকাশপথে বিমানপোত, সমুদ্রপথে কতক জাহাজ, স্টীমবোট প্রভৃতি) **চালানোর** জন্য খনিজ তৈলের প্রধান উপজাতদ্রব্য পেট্রোল ব্যবহৃত হয়। রাস্তার **আলো জ্বালানো, বাড়িতে রান্না** প্রভৃতি **কাজে** প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। খনিজ তৈল শোধনের সময় প্রাকৃতিক গ্যাস ভিন্ন আরও কতক **উপজাতদ্রব্য** পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ডিজেল তৈল যানবাহন চালানোর জন্য, লুব্রিকেটিং তৈল কলকজা ও যন্ত্রপাতি চালু রাখার জন্য, কেরোসিন আলো জ্বালিবার জন্য, এসফাল্ট পথ পাকা করিবার জন্য এবং ন্যাপথল কীটনাশকরূপে ব্যবহৃত হয়। কতক তেলের গাদ ব্যবহৃত হয় সিমেন্ট তৈরীর জন্য।

তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন অঞ্চল—স্বাধীনতালাভের সময় এদেশে একমাত্র আসামে খনিজ তৈল পাওয়া যাইত। (পশ্চিম পঞ্জাব অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়)। স্বাধীনতালাভের পর হইতে ক্রমশঃ অনুসন্ধানের ফলে এখন এদেশে নিম্নলিখিত অঞ্চলে **খনিজ তৈল** পাওয়া যায়—(ক) **আসামের** উত্তরপূর্ব অংশে বাপাপুঙ্গ, হানসাপুঙ্গ, নাহারকাটিয়া, হুগরিজান, মোরান, বদরপুর; (খ) **গুজরাটে**

কাম্বে উপসাগরের ধারে কাম্বে, এঙ্কলেশ্বর, ওলপাদ, সনদ প্রভৃতি এবং (গ) **মহারাষ্ট্রে** বোম্বাইয়ের পাশে অগভীর সমুদ্রতলে। (ঘ) **পশ্চিমবঙ্গের** দক্ষিণ অংশে সুন্দরবন অঞ্চলে এবং সাগরদ্বীপের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তলদেশে সন্ধানকার্য চলিতেছে।

এদেশে কেবলমাত্র **প্রাকৃতিক গ্যাস** পাওয়া যায় আসামের বোগপানি, হিমাচল প্রদেশের জ্বালামুখী, গুজরাটের লুনেজ, বাদসের প্রভৃতি স্থানে। এখন (১৯৭৪-৭৫ খ্রী:) প্রায় ৫৫০টি কূপ হইতে তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস এবং প্রায় ৮০টি কূপ হইতে কেবলমাত্র গ্যাস পাওয়া যায়। ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে খনিজ তৈলের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ টন, ২৪ বৎসর পরে (১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ) পাওয়া যায় তাহার ৩৭ গুণ (৭৫ লক্ষ টন)।
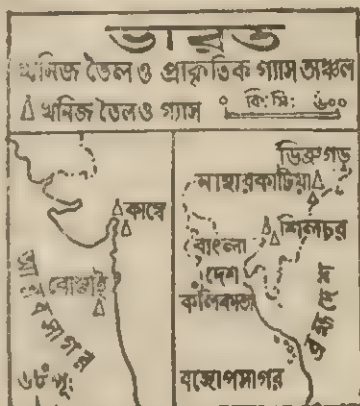
তৈল শোধন ও সরবরাহ—আসামের খনিজ তৈল **পাইপযোগে সরবরাহ** হয় গৌহাটি, শিলিগুড়ি, বারাউনি, কানপুর, হলদিয়া ও মৌরিগ্রাম প্রভৃতি স্থানে। **গুজরাট** হইতে এভাবে তৈল সরবরাহ হয় কয়ালি, আহ্মদাবাদ প্রভৃতি স্থানে। বিভিন্ন বন্দরের মারফত বিদেশ হইতে ১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ ১'৩ কোটি টন আকরিক খনিজ তৈল এদেশে **আমদানি** করা হয়। তারপর তাহা এবং এদেশে উৎপন্ন তৈল মিলিয়া প্রায় ২ কোটি টন তৈল শোধন করা হয় বড় বড় **শোধনাগারে**। তাহাদের মধ্যে আসামের ডিগবয়, গৌহাটি, বিহারের বারাউনি, অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপটনম, তামিলনাড়ুর মাদ্রাজ, গুজরাটের কয়ালি, মহারাষ্ট্রের ট্রম্বে, কেরালার কোচিন প্রভৃতি শোধনাগার প্রধান। আসামের বঙ্গাইগাঁও, উত্তর প্রদেশের মথুরা ও পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়াতে বড় তৈল শোধনাগার তৈরী হইতেছে।

জলজ বিদ্যুৎশক্তি

পৃথিবীর যে সকল দেশে কয়লা ও তাপবিদ্যুৎ শক্তির অভাব অথচ জলজ বিদ্যুৎশক্তির **চাহিদা ও উৎপাদনের** সুযোগ অধিক, তথায় ইহা স্বভাবতঃ অধিক উৎপন্ন হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, যে সকল দেশে এই শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা অধিক তাহাদের অনেকেরই শক্তির চাহিদা কম। অপরদিকে অনেক দেশে এই শক্তির চাহিদা অধিক,

অথচ অধিক শক্তি উৎপাদনের সুযোগ বা সম্ভাবনা নাই। এবিষয়ে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

আফ্রিকা মহাদেশে নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমস্ত বৎসর প্রচুর **বৃষ্টি** হয়। তথাকার প্রায় সমুদয় অংশের ভূপ্রকৃতি বন্ধুর (**মালভূমি**)। সেজন্য কঙ্গো নদী ও উহার বিভিন্ন উপনদীর গতিপথে বহু **খরস্রোত** সৃষ্টি হইয়াছে। একারণে ঐ অঞ্চলের **জায়েরে** দেশে জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের **সম্ভাবনা** সমগ্র **পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী।** তথায় ও পাশের **কঙ্গো গণতন্ত্রে** (দুই দেশে) এই শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা ১৪০০ লক্ষ কিলোওয়াট, অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীতে যত জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন সম্ভব তাহার প্রায় ২৮%। তারপর নীলনদের উপরদিকের অংশ, নাইজার, সেনিগাল, জাম্বিয়া প্রভৃতি বড় নদী এবং বিভিন্ন ছোট নদী, অসংখ্য জলপ্রপাত, খরস্রোত প্রভৃতির সাহায্যে পশ্চিম আফ্রিকার ক্যামারুন, নাইজেরিয়া প্রভৃতি, পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঞ্জানিয়া, জাম্বিয়া প্রভৃতি রাজ্যে এবং দক্ষিণপূর্বদিকের মালাগাসি গণতন্ত্রেও জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা অধিক। ফলে, এই মহাদেশে জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা **সমগ্র পৃথিবীর** সমুদয় মহাদেশে মোট জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের **সম্ভাবনার প্রায়** ৪০%। অথচ এই মহাদেশের অধিকাংশ দেশ এতকাল ছিল পরাধীন এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে অত্যন্ত অনুন্নত। প্রায় কোন উল্লেখযোগ্য বৃহৎ শিল্পই এখানে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ ছিল না এতকাল। ফলে, এই মহাদেশে জলজ বিদ্যুৎশক্তি **অতি সামান্যই উৎপন্ন** হইতেছে।

এশিয়া মহাদেশের অতি সামান্য অংশ (দক্ষিণপূর্ব সীমা) নিরক্ষীয় অঞ্চলের এবং বিস্তীর্ণ অংশ মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এসকল স্থানে **বৃষ্টি অধিক।** তারপর এই মহাদেশের উত্তরদিকের বিস্তীর্ণ অংশে প্রচুর বরফগলা জল পাওয়া যায়। যথেষ্ট বৃষ্টিও হয়। তার উপর এই মহাদেশে বৃহৎ **নদ-নদী** অনেক এবং ইহাদের গতিপথের অনেক অংশ **পাহাড়, পর্বত** ও **মালভূমির** উপর দিয়া প্রবাহিত। ফলে, এই মহাদেশে জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের **সুযোগ** আফ্রিকার পরেই, অর্থাৎ **পৃথিবীতে দ্বিতীয়।** সমগ্র পৃথিবীতে যত জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন সম্ভব, এই মহাদেশে তাহার প্রায় ২৩% উৎপন্ন হইতে পারে। অথচ এই মহাদেশেও এতকাল অতি সামান্যই এই শক্তির সদ্ব্যবহার হইয়াছে। একমাত্র **জাপানে** যথেষ্ট পরিমাণে জলজ বিদ্যুৎশক্তি বহুদিন যাবৎ উৎপন্ন হইতেছে। তবে সেদেশে এই শক্তি উৎপাদনের সুযোগ চীন ও ভারতের তুলনায় অনেক কম। গত ২৫।৩০ বৎসর যাবৎ **ভারত ও চীনে** এবিষয়ে **বিশেষ উন্নতি** হইতেছে। ভারতে তৈরী হইয়াছে **পৃথিবীর উচ্চতম নদীবাঁধ (ভাকরা**

বাঁধ)। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশেও এই শক্তি ক্রমশঃ অধিক উৎপাদনের জন্য চেষ্টা হইতেছে।
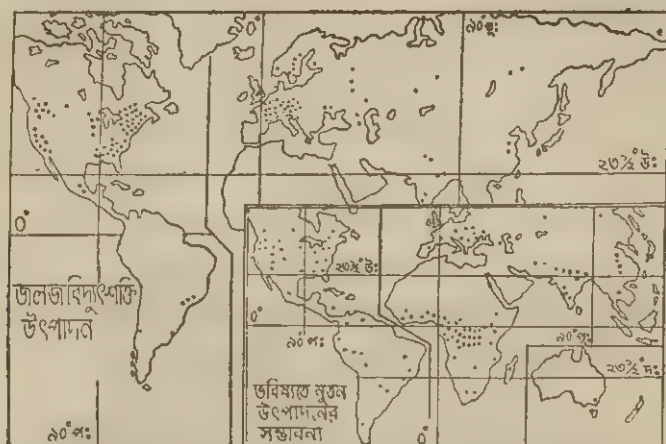
সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের অধিকাংশ (৭৫%) এশিয়ার অন্তর্গত এবং বাকী অংশ ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত। এশিয়ার অংশের **নদীগুলি** আয়তনে **বিরাট**, কিন্তু শীতল অঞ্চলের উপর দিয়া উত্তরবাহিনী। একমাত্র আমুর নদী পূর্ববাহিনী। এদেশের ইউরোপের অন্তর্গত অংশে **নদী অনেক** এবং সেগুলি বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত। ইহাদের সাহায্যে এদেশে জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের **সম্ভাবনা** পৃথিবীর **দেশসমূহের মধ্যে দ্বিতীয়।** (আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলের জায়েরে দেশের পরে।) এদেশেও ৫০ বৎসর পূর্বে অতি সামান্যই জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইত। তখন এখানে অর্থনৈতিক উন্নতিও ছিল খুব কম। তারপর হইতে নানা বিষয়ে অতি দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এবিষয়েও **উন্নতি** হইতেছে অসামান্য।

উত্তর আমেরিকার দুই বৃহৎ দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডাতে জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা প্রচুর। **যুক্তরাষ্ট্রে** নদীর সংখ্যা কম, কিন্তু এখানকার **মিসৌরি-মিসিসিপি** পৃথিবীর **দীর্ঘতম নদী**। ইহার উপনদী অনেক। সেন্ট লরেন্স, কলোরেডো প্রভৃতি নদীও জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী। বস্তুতঃ এদেশেই তৈরী হইয়াছে পৃথিবীর কয়েকটি **উচ্চতম নদী-বাঁধ**। এদেশ বহুদিন যাবৎ **অর্থনৈতিক** ক্ষেত্রে **অগ্রণী**। ফলে, এদেশেই উৎপন্ন হয় পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী জলজ বিদ্যুৎশক্তি**। এদেশের সেন্ট লরেন্স নদীর গতিপথে (ইরি ও অন্টেরিও হ্রদের মধ্যবর্তী অংশে) অবস্থিত **নায়গ্রা জলপ্রপাতের** উদাহরণ সমগ্র পৃথিবীতে

সুপরিচিত। **ক্যানাডা** দেশের নদীর সংখ্যা অনেক এবং তাহাদের সাহায্যে জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের সুযোগও অধিক। তবে সে দেশে এখন পর্যন্ত এবিষয়ে আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই।

ইউরোপের আয়তনের তুলনায় নদ-নদীর সংখ্যা অনেক। তারপর এখানকার অনেক স্থানেই **বৃষ্টিপাত** প্রচুর, বরফগলা জলও পাওয়া যায় যথেষ্ট। তাহাছাড়া অনেক নদীই **পার্বত্য অঞ্চলের** উপর দিয়া প্রবাহিত। ফলে, জলজ বিদ্যুৎশক্তি **উৎপাদনের সুযোগ** মহাদেশসমূহের **আয়তনের তুলনায়** এখানে সবচেয়ে **বেশী**। এই মহাদেশের যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশ বহুকাল যাবৎ **অর্থনৈতিক** বিষয়ে **উন্নত**। এসকল কারণে এই মহাদেশে জলজ বিদ্যুৎশক্তি **উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী**। এই মহাদেশের উত্তরপশ্চিম অংশের নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশ শিল্পে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত হইলেও তথায় এই শক্তি প্রচুর উৎপন্ন হইতেছে।

দক্ষিণ আমেরিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত **আমাজন** পৃথিবীর **বৃহত্তম নদী**। (ইহার মধ্য দিয়া সবচেয়ে বেশী জল প্রবাহিত হয়।) কিন্তু এই নদী এমন **ঢালু ভূপ্রকৃতির** (অনেক ক্ষেত্রে নিম্নভূমির) উপর দিয়া প্রবাহিত যে এখানে ইহার সাহায্যে জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের **সম্ভাবনা** ইহার দৈর্ঘ্যের ও জলপ্রবাহের তুলনায় **কম**। তারপর এই মহাদেশের অধিকাংশ দেশ অর্থনৈতিক বিষয়ে এখনও আশানুরূপ উন্নত নহে। ফলে, এখানে জলজ বিদ্যুৎশক্তি **উৎপাদনের পরিমাণ কম**। তবে কিছুকাল যাবৎ এখানকার বিভিন্ন দেশে নানাপ্রকার শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পরিমাণও বাড়িতেছে।

ওশিয়ানিয়ার অন্তর্গত **অস্ট্রেলিয়াতে মারে-ডার্লিং** একমাত্র বড় নদী। অন্যান্য নদীগুলি ছোট। এখানকার বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা এজন্য অনেকাংশে দায়ী। জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পক্ষে ইহাও একটি বড় বাধা। ফলে, এখানে এই শক্তি **উৎপাদনের** পরিমাণ **কম**। **নিউ জীল্যাণ্ডে** নদ নদী ছোট, কিন্তু সংখ্যায় কম নহে। এখানকার **বন্ধুর ভূ প্রকৃতিও** জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পক্ষে সহায়ক। ফলে এখানে এই শক্তি উৎপাদনের **পরিমাণ** অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে **বেশী**।

আণবিক শক্তি

যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, চীন, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি। শিল্প, বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নত দেশে এই শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। আমাদের ভারতেও এই শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। বৈজ্ঞানিকগণের মতে পৃথিবীতে

কয়লা ও খনিজ তৈলের সাহায্যে যে পরিমাণ তাপবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব, আণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের (থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতির) সাহায্যে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে তাপ বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব। তাহার উপর এই শক্তি শান্তিপূর্ণ কাজে অনেক বেশী কার্যকরী। তাহাছাড়া কয়লা ও খনিজ তৈলের তুলনায় অনেক কম থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতির সাহায্যে এই শক্তি উৎপন্ন করা যায়। অবশ্য এই উপাদানগুলি দুর্লভ।

ভারতে শক্তির উৎস

আমাদের দেশে শক্তির উৎস ও তাহাদের ব্যবহার নিম্নরূপ :—

(১) **মানবিক শক্তি ও তাহার ব্যবহার** -আমাদের দেশে বর্তমানে (১৯৭১ খ্রীঃ সেন্সাস অনুসারে) প্রায় ৫৫ কোটি লোকের বাস। ইহাদের অধিকাংশ (প্রায় ৭০%) **চাষের** কাজ করেন। তাহাছাড়া কলকারখানা, যানবাহন, অফিস, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি সংক্রান্ত নানা রকমের **শ্রমের কাজ** করেন এদেশের বহু মানুষ। এরূপ সকল কাজের জন্যই দরকার অল্পবিস্তর **শারীরিক শক্তি**। কাঠের লাঙ্গলের সাহায্যে জমি চাষ, মাল বহনের জন্য ঠেলাগাড়ি, নৌকা প্রভৃতি চালানো, মুটের কাজ প্রভৃতির জন্য শারীরিক শক্তির প্রয়োজন বেশী। তবে শারীরিক শক্তির তুলনায় অধিক কার্যকরী **মানসিক শক্তি**। অন্যান্য প্রকার শক্তির উদ্ভাবন ও আবিষ্কার এবং সকল প্রকার শক্তির পরিচালনা এবং দেশ ও জাতির উন্নতি নির্ভর করে ইহার উপর। এখনও আমাদের দেশে **সকল সক্ষম লোকের উপযুক্ত কাজের** ব্যবস্থা নাই; অর্থাৎ ইহাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির ব্যবহারের উপযুক্ত সুযোগ নাই। সমগ্র দেশ ও জাতির স্বার্থে সকল মানুষের উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

(২) **পশুশক্তি ও তাহার ব্যবহার**—আমাদের দেশে গরু, মহিষ ও তাহাদের বাছুরের (বাচ্চা) সংখ্যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। এদেশের **চাষ-আবাদ, গাড়ি টানা,** কূপ হইতে জল তোলা প্রভৃতি কাজে কতক গরু, মহিষ ব্যবহৃত হয়। উট, টাট্টু ঘোড়া, গাধা প্রভৃতিকেও মালপত্র বহনের কাজে ব্যবহার করা হয়।

(৩) **খনিজ শক্তি ও তাহার ব্যবহার**—বিভিন্ন প্রকার খনিজ সম্পদের মধ্যে শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয় কয়লা, খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস। ইহাদের বিষয় পূর্বে এই অধ্যায়েই আলোচিত হইয়াছে।

বিদ্যুৎশক্তি—স্বাধীনতালাভের পূর্বে এদেশে খুব কম (মাত্র ১৯ লক্ষ কিলোওয়াট) বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল। এখন (১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ) তাহার

প্রায় ১০ গুণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক প্রকল্পে আরও ১৬৫ লক্ষ কিলোওয়াট, অর্থাৎ সর্বমোট ৩৫০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইবে।

তাপবিদ্যুৎশক্তি—১৯৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত এদেশে তাপবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ও ব্যবহারের প্রধান কেন্দ্র ছিল **কলিকাতা ও আশপাশে** এবং উৎপাদনের প্রায় একমাত্র উপাদান ছিল কয়লা। **স্বাধীনতালাভের পর** হইতে এদেশে নানাপ্রকার শিল্পের ও অন্যান্য বিষয়ে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎশক্তির **চাহিদা** ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং তাহা পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে তাপবিদ্যুৎ, জলজ বিদ্যুৎ এবং আণবিক শক্তি **উৎপাদনের** জন্য **চেষ্টা** হইতেছে। জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কেন্দ্রে শীত ও গ্রীষ্মকালে বৃষ্টির স্বল্পতার জন্য ঐ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কমিয়া যায়। তাই আশপাশে অনেক স্থানে তাপবিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইতেছে এবং উভয় প্রকার বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের উদ্দেশ্যে **গ্রীডপ্রথা** ক্রমশঃ অধিক প্রচলিত হইতেছে। তাপ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য এখন এদেশে কয়লা, খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। **বর্তমানে** (১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ) এদেশের প্রায় ৭০টি প্রধান কেন্দ্রে প্রায় **১০৮ লক্ষ কিলোওয়াট** তাপ বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইতেছে। **পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক প্রকল্পে** (১৯৭৪-৭৯ খ্রীঃ) আরও ৯৪ লক্ষ কিলোওয়াট অর্থাৎ **মোট ২০০ কিলোওয়াটের অধিক** তাপ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবস্থা হইবে।

কয়লার সাহায্যে তাপবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন—এদেশে এই প্রকার বিদ্যুৎ-শক্তির পরিমাণ **জলজ বিদ্যুৎশক্তির চেয়ে বেশী** এবং অধিকাংশ উৎপাদনকেন্দ্র **কয়লা খনি অঞ্চলে** বা তাহাদের **নিকটে** অবস্থিত। যেমন, **পশ্চিমবঙ্গে** তাপবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র **দুর্গাপুর, ব্যাণ্ডেল, সান্তালদি** ও **কলিকাতা শিল্পাঞ্চল**। এসকল স্থানে একাজে রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লা অধিক ব্যবহৃত হয়। দুর্গাপুর, ব্যাণ্ডেল প্রভৃতি কেন্দ্রের বিদ্যুৎশক্তি নিয়মিতভাবে সরবরাহ হয় কলিকাতা শিল্পাঞ্চলে। **বিহারে** তাপবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র **বোকারো, চন্দ্রপুরা** ও **পাথরাতু**। এসকল স্থানে ঝরিয়া ও বোকোরো অঞ্চলের কয়লা অধিক ব্যবহৃত হয়। তথায় উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ হয় ঐ রাজ্যের প্রধান শিল্পাঞ্চলে (জামসেদপুর, ধানবাদ) ও অন্যান্য অংশে। **মধ্যপ্রদেশের কোরবা,**

বোকারো তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

মহারাষ্ট্রের কোরাদি (নাগপুরের ধারে) প্রভৃতি কেন্দ্রে আশপাশের কয়লার সাহায্যে এবং **উড়িষ্যার** তালচেরে স্থানীয় কয়লার সাহায্যে তাপবিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়। **তামিলনাড়ুর নেভেলি** কেন্দ্রে উৎপন্ন হয় দাক্ষিণাত্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তাপবিদ্যুৎশক্তি। এজন্য ব্যবহৃত হয় তথাকার খনির নিকৃষ্ট কয়লা (লিগনাইট)।

কয়লার **খনিসমূহ** হইতে যথেষ্ট **দূরেও** কয়লার সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে তাপবিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইতেছে। এজাতীয় কেন্দ্রসমূহের মধ্যে **উত্তরপ্রদেশের ওবরা** বৃহত্তম। উত্তর ভারতের অন্যান্য কেন্দ্রের মধ্যে ঐ রাজ্যের হার্দুয়াগঞ্জ, পাঙ্কি, **দিল্লী** রাজ্যের রাজঘাট, বদরপুর, **পঞ্জাবের** গুরুনানক কেন্দ্র (ভাতিন্দার পাশে) প্রভৃতি বিখ্যাত। পশ্চিমে গুজরাটের উকাই, দক্ষিণে **অন্ধ্রপ্রদেশের** কোথাগুডম্, **তামিলনাড়ুর** এনোর, মহারাষ্ট্রের নাসিক প্রভৃতি কেন্দ্রও উল্লেখযোগ্য।

খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সাহায্যে তাপবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন—স্বাধীনতালাভের পর হইতে এদেশে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে **খনিজতৈল** ও **প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপন্ন** হইতেছে। বিদেশ হইতেও প্রচুর আকরিক খনিজ তৈল এদেশে **আমদানি** করা হইতেছে। এই সমুদয় তৈলের শোধনের জন্য এদেশে **তৈল শোধনাগারের** সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এই সকল কেন্দ্রে এবং প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকেন্দ্রেও ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে তাপবিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইতেছে। এসকল কেন্দ্রের মধ্যে **আসামের** নাহারকাটিয়া, **বিহারের** বারাউনি, **গুজরাটের** ধুবারন, **মহারাষ্ট্রের** ট্রম্বে প্রভৃতি বিখ্যাত।

(৫). **জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন—স্বাধীনতালাভের পূর্বে** এদেশে অতি সামান্য জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইত। বোম্বাইয়ের পাশে পশ্চিমঘাটের **খোপলি, লোনাভালা, ভিবপুরী** (অন্ধ উপত্যকা) প্রভৃতি ছিল তখনকার জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র। আর তখন ঐ শক্তি ব্যবহৃত হইত প্রধানতঃ বোম্বাই ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে। **স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে** এদেশের আগেকার জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন-কেন্দ্রগুলিতে আরও বেশী বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়। তাহাছাড়া **বহুমুখী নদী-উপত্যকা প্রকল্প** অনুসারে অনেক নদীতে বড় বড় বাঁধ ও পাশে বিরাট জলাশয় তৈরী করা হয়। তারপর **কৃত্রিম জলপ্রপাতের** মাধ্যমে জলরাশিকে প্রবলবেগে প্রবাহিত করাইয়া তাহার স্রোতের সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা হয়। এরূপ ব্যবস্থার ফলে **এখন** (১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ) এদেশে প্রায় ৮০টি প্রধান কেন্দ্রে প্রায় **৭০ লক্ষ কিলোওয়াট** জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইতেছে। ইহার পরিমাণ এখন এদেশে উৎপন্ন তাপবিদ্যুৎশক্তির ⅔ অংশের কিছু কম। **পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক প্রকল্পে**

ব্যবস্থা হইতেছে গঙ্গার **মানেরিভ্যালি প্রকল্প** ও রামগঙ্গার (গঙ্গার উপনদী) **রামগঙ্গা প্রকল্প** অনুসারে। ঐ রাজ্যের পশ্চিম অংশে জলজ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ হয় **যমুনা ও টনস্ প্রকল্প** (টনস্ যমুনার উপনদী) অনুসারে। আর রাজ্যের দক্ষিণ অংশে জলজ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ হয় **রিহান্দ প্রকল্প** অনুসারে। (গঙ্গার উপনদী শোন, ইহার উপনদী রিহান্দ)।

ভাকরা-নাঙ্গল প্রকল্প অনুসারে শতদ্রুর (সিন্ধুর উপনদী) উপর **ভাকরাতে** তৈরী হইয়াছে **পৃথিবীর সর্বোচ্চ নদী বাঁধ**। ইহার সামান্য দক্ষিণে এই নদীর উপর তৈরী হইয়াছে **নাঙ্গল** বাঁধ। আর উভয় স্থানে তৈরী হইয়াছে জলজ বিদ্যুৎশক্তি

ভাকরা বাঁধের একটি অংশ
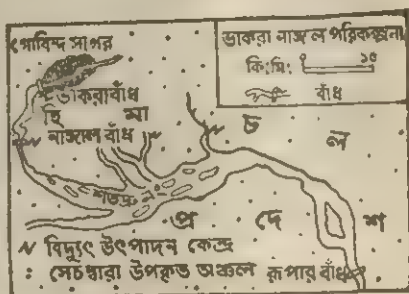
উৎপাদন-কেন্দ্র। **বিপাসা প্রকল্প** অনুসারে বিপাসার (সিন্ধুর একটি উপনদী) উপর পঙ ও পাণ্ডোতে তৈরী হইয়াছে দুইটি বাঁধ। এসকল প্রকল্পের ফলে **হরিয়ানা, পঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশে** জলজ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের সুবিধা হইতেছে।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে জলজ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ হয় সিন্ধুনদের **বুনিয়ার** (বড়মূলা) ও **গন্দরবল প্রকল্প** অনুসারে। চন্দ্রভাগার (সিন্ধুর উপনদী) **সালাল প্রকল্প** অনুসারেও প্রচুর জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতেছে।

চম্বল নদীর **গান্ধী সাগর, রাণাপ্রতাপ সাগর ও জওহর সাগর প্রকল্প** অনুসারে জলজ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ হয় **মধ্যপ্রদেশ** ও **রাজস্থানে**। (গঙ্গার উপনদী যমুনা ; ইহার উপনদী চম্বল)। তাপ্তী নদীর **উকাই প্রকল্প** অনুসারে জলজ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা হইতেছে **গুজরাটে**।

দাক্ষিণাত্য মালভূমির পশ্চিম অংশে পশ্চিমঘাটের **কয়না** নদীর **প্রকল্প** অনুসারে **মহারাষ্ট্রে** প্রচুর জলজ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ হয়। **কর্ণাটক** রাজ্যে জলজ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ হয় **সরাবতী** (যোগপ্রপাত) **প্রকল্প** অনুসারে। তথায় আরও বিদ্যুৎশক্তি

সরবরাহের ব্যবস্থা হইতেছে **তুঙ্গভদ্রা, ভদ্রা ও কালীনদী প্রকল্প** অনুসারে। (ভদ্রা তুঙ্গভদ্রার উপনদী, তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণার উপনদী এবং কালীনদী একটি পশ্চিমবাহিনী নদী।) কর্ণাটক রাজ্যের দক্ষিণ অংশ ও **তামিলনাড়ুতে** বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ হয় **কুণ্ডা প্রকল্প** অনুসারে। (কাবেরীর উপনদী ভবানী; ইহার উপনদী কুণ্ডা।)

মালভূমি অঞ্চলের পূর্ব অংশে **উড়িষ্যাতে** জলজ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ হয় মহানদীর **হীরাকুন্দ প্রকল্প** ও **মাচকুন্দ** নদীর **প্রকল্প** অনুসারে। সিলেরু নদীর **বালিমেলা প্রকল্প** অনুসারেও জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবস্থা হইতেছে। (গোদাবরীর উপনদী শবরী; ইহার উপনদী সিলেরু ও মাচকুন্দ।) **অন্ধ্রপ্রদেশেও** জলজ বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ হয় এই মাচকুন্দ প্রকল্প অনুসারে। তাহাছাড়া **সিলেরু** নদীর উচ্চ ও নিম্ন সিলেরু **প্রকল্প**, বালিমেলা প্রকল্প, কৃষ্ণা নদীর **শ্রীশৈলম্ প্রকল্প** ও **তুঙ্গভদ্রার প্রকল্প** অনুসারেও এই রাজ্যে জলজ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা হইতেছে। **তামিলনাড়ুতে** কুণ্ডা প্রকল্প ছাড়া কাবেরীর **মেট্টুর বাঁধ প্রকল্প** অনুসারেও জলজ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ হয়। এই রাজ্যে পেরাম্বিকুলম্ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র নদীর **পেরাম্বিকুলম্-আলিয়ার প্রকল্প** অনুসারেও বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা হইতেছে। **কেরালাতে** জলজ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ হয় পেরাম্বিকুলম্-আলিয়ার প্রকল্প এবং পাম্বা ও কাক্কী নদীর **সবরিগিরি প্রকল্প** অনুসারে। পেরিয়ার নদীর **ইডিকি প্রকল্প** অনুসারেও এই রাজ্যে জলজ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের জন্য ব্যবস্থা হইতেছে।

বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার—আগে এদেশের কেবল মাত্র প্রধান শহর, নগরে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হইত। এখন প্রত্যেক **বড় শহর, নগর** (১০,০০০-এর অধিক লোকের বাসভূমি) এবং অধিকাংশ (৭০%) **ক্ষুদ্র শহরে** (৫,০০০-এর অধিক লোকের বাসভূমি) বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয়। ১৯৫১ খ্রীঃ এদেশের মাত্র ৩,০০০ গ্রামে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হইত, এখন (১৯৭৫ খ্রীঃ) বিদুৎশক্তি ব্যবহৃত হয় এদেশের **দেড় লক্ষের অধিক গ্রামে**।

এখন এদেশের **অধিকাংশ** (গড়ে ৭০%) বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয় **কলকারখানার** কাজে। বাকী অংশ যাতায়াত ও পরিবহন (রেল ও ট্রামগাড়ি চালানো),

সেচ (নলকূপ ও পাম্প চালানো), নানাপ্রকার অফিস ও সংস্থাগত কাজ এবং মানুষের ব্যক্তিগত ও পরিবার সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন রাজ্যে মোট বিদ্যুৎশক্তির ৩০% কৃষির উন্নতির জন্য সেচ ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়।

আণবিক শক্তি ও ইহার ব্যবহার—এদেশের সর্বতোমুখী উন্নতির জন্য তাপবিদ্যুৎশক্তি এবং জলজ বিদ্যুৎশক্তি ভিন্ন অন্য প্রকার শক্তিও সাধ্যানুসারে উৎপন্ন করা প্রয়োজন। এজন্য সর্বপ্রথম মহারাষ্ট্রের **তারাপুর** এবং ক্রমশঃ রাজস্থানের **কোটা** এবং তামিলনাড়ুর **কালপক্কমে** আণবিক বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ প্রথম দুইটি কেন্দ্রে ৬ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইয়াছে।
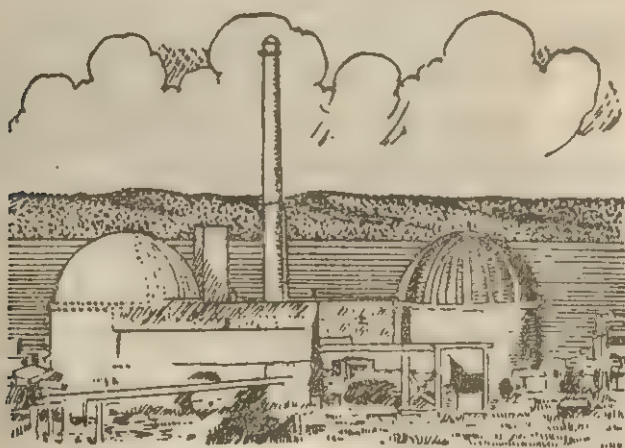
তারাপুর আণবিকশক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের একটি অংশ

উত্তর প্রদেশের নারোরাত নূতন কেন্দ্র তৈরী হইবে। **পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক প্রকল্পে** (১৯৭৪-৭৯) এদেশে আরও ৭ লক্ষ, অর্থাৎ মোট ১৩ লক্ষ কিলোওয়াট আণবিকশক্তি উৎপন্ন করার ব্যবস্থা হইতেছে। এদেশের জনগণের অন্য প্রয়োজনীয় **খাদ্যশস্য উৎপাদন** এবং ঐ সংক্রান্ত অন্যান্য কতক কাজে আণবিক শক্তি দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে। যেমন, উচ্চ-গঙ্গা সমভূমি ও তাহার পশ্চিমদিকের **শুষ্ক অঞ্চলে সেচের** পক্ষে ইহার ব্যবহার অত্যন্ত লাভজনক হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণের অভিমত। এসকল কারণে ভারত সরকার স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন, কেবলমাত্র **শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে** এদেশে আণবিক শক্তি ব্যবহৃত হইবে।

অনুশীলনী

(ক) ১। স্বাভাবিক উদ্ভিদের সহিত জলবায়ুর সম্পর্ক কিরূপ? সরলবর্গীয় গাছের ও প্রশস্ত পত্রযুক্ত চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী গাছের উদাহরণ উল্লেখ করিয়া বিষয়টি বুঝাইয়া লিখ। ২। পৃথিবীতে কয়টি প্রধান অরণ্য অঞ্চল আছে? ইহাদের কোন্‌টি পৃথিবীর কোন্ অংশে? ৩। প্রশস্ত পত্রযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ্ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ উল্লেখ কর। তথাকার বনজ সম্পদ সংগ্রহের পক্ষে প্রধান অসুবিধাগুলি উল্লেখ কর। ৪। মিশ্র বৃক্ষের বনভূমি পৃথিবীর কোন্ অংশে অধিক বিস্তৃত? এরূপ বনকে মিশ্র বনভূমি বলে কেন? এখানকার বনের প্রধান সম্পদগুলি উল্লেখ কর। ৫। সরলবর্গীয় বৃক্ষের বৃহত্তম বনভূমি কোথায়? ইহার নাম কি? আর কোন্ কোন্ অংশে এরূপ গাছের বন অধিক বিস্তৃত? এসকল বনের প্রধান বনজ সম্পদগুলি উল্লেখ কর। ৬। মরুভূমিসমূহ প্রায় উদ্ভিদহীন কেন? তুন্দ্রা অঞ্চলেও উদ্ভিদের অভাব কেন? উদ্ভিদ সম্পর্কে এই দুই অঞ্চলের অবস্থার তুলনা কর। ভারতের কোন্ কোন্ অংশে বন অধিক? এদেশে কোন্ জাতীয় গাছ অধিক? ৭। কেন? ৮। এদেশের বনের কয়েকটি প্রধান গাছের নাম লিখ। এসকল গাছের কাঠ কোন্ কোন্ জিনিস তৈরীর জন্য অধিক ব্যবহৃত হয়? ৯। সমুদ্রের ধারে কোন্ জাতীয় গাছ অধিক জন্মে? ভারতের কোন্ অংশে এরূপ গাছের বন অধিক? ১০। চন্দন কাঠ, শাল কাঠ ও লাক্ষা এদেশের কোন্ কোন্ অংশে বেশী পাওয়া যায়?

(খ) ১১। পৃথিবীর প্রধান খনিজ সম্পদগুলি কয় ভাগে বিভক্ত? ভাগগুলির নাম কি? প্রত্যেক ভাগের কয়েকটি প্রধান খনিজ সম্পদের নাম লিখ। ১২। লৌহ সঙ্কর খনিজ পদার্থগুলির ঐরূপ নাম হওয়ার কারণ কি? ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম ও ক্রোমিয়ামের ব্যবহার এবং প্রধান উৎপাদন অঞ্চলের নাম লিখ। ১৩। বর্তমান কালকে লৌহযুগ বলা হয় কেন? পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে অধিক লৌহ আকরিক পাওয়া যায়? যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের কোন্ কোন্ অংশে অধিক লৌহ আকরিক পাওয়া যায়? ১৪। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে অধিক লৌহের টুকরা ব্যবহার করার কারণ কি? ১৫। এদেশে কোথায় কোথায় লৌহ আকরিক পাওয়া যায়? তাহা কি ধরনের আকরিক? ১৬। এদেশে ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র ও বক্সাইটের মধ্যে কোন্‌টি কোথায় অধিক পাওয়া যায়? কোন্‌টি কোন্ কাজে বেশী ব্যবহৃত হয়? ১৭। এদেশের কোন্ অংশে খনিজ সম্পদের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী? তথায় কোন্ কোন্ খনিজ সম্পদ অধিক পাওয়া যায়?

(গ) ১৮। শক্তির প্রধান উৎসগুলি কি? খনিজ সম্পদের মধ্যে কোন্ কোন্‌টি শক্তির উৎস? ১৯। কয়লা কিভাবে সৃষ্টি হয়? পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে কয়লা অধিক পাওয়া যায়? যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র ও যুক্তরাজ্যের কোথায় কোথায় ইহা অধিক পাওয়া যায় তাহা লিখ। ২০। ভারতের সর্বপ্রধান খনিজ সম্পদ কি? ইহা কোথায় কোথায় অধিক পাওয়া যায়? ইহা কোন্ কোন্ কাজে অধিক ব্যবহৃত হয়? পশ্চিমবঙ্গের কোথায় ইহা পাওয়া যায়? ২১। পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে খনিজ তৈল অধিক পাওয়া যায়? ইহার প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে অঞ্চল বিভাগ করা হয় কেন? এশিয়ার কোন্ অংশ ইহার প্রধান অঞ্চলের অন্তর্গত? ২২। ভারতে কোথায় কোথায় খনিজ তৈল পাওয়া যায়? ইহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ অংশে সম্প্রতি তৈল উৎপন্ন হইতেছে? ২৩। আকরিক তৈল হইতে কোন্ কোন্ জিনিস উৎপন্ন হয়? এদেশের কোন্ কোন্ স্থানে আকরিক তৈল শোধনের প্রধান কেন্দ্র আছে? ২৪। এদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? ইহা কি কাজে ব্যবহৃত হয়? ২৫। এদেশে আণবিক শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র কোথায় কোথায় স্থাপিত হইয়াছে? ২৬। এদেশে তাপবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কয়েকটি প্রধান কেন্দ্রের নাম লিখ। ইহাদের কোন্‌টিতে কোন্ উপাদানের সাহায্যে ঐ শক্তি উৎপন্ন হয়? ২৭। জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পক্ষে কোন্ কোন্ অবস্থা উপযোগী? এদেশে এরূপ শক্তি উৎপাদনের ৫টি প্রধান কেন্দ্রের নাম লিখ। এরূপ কোন্ কোন্ কেন্দ্রের নিকট তাপ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র স্থাপনের কারণ কি? ২৮। এদেশের কোন্ কোন্ অংশে তাপবিদ্যুৎশক্তি অধিক ব্যবহৃত হয়, আর কোন কোন অংশে জলজ বিদ্যুৎশক্তি অধিক ব্যবহৃত হয়? কেন? ২৯। নিম্নলিখিত স্থানগুলির কোন্‌টি কোন্ খনিজ সম্পদ বা কোন্ জাতীয় শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ? রাণীগঞ্জ, এঙ্কলেশ্বর, ভাকরা, ঝরিয়া, কোরবা, নেভেলি, শিবসমুদ্রম্। ৩০। পৃথিবীর কোন্ মহাদেশে জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন সবচেয়ে বেশী? তথায় ইহার চাহিদা কিরূপ? কোন্ মহাদেশে আয়তনের তুলনায় জলজ বিদ্যুৎশক্তি সবচেয়ে বেশী উৎপন্ন হয়? কেন? উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও এশিয়াতে জলজ বিদ্যুশক্তি উৎপাদনের সুযোগ ও সম্ভাবনা তুলনা কর। ওশিয়ানিয়াতে এই শক্তি উৎপাদনের সুযোগ কিরূপ? কেন?

অষ্টম অধ্যায়

কৃষিজ ও প্রাণিজ সম্পদ

আদি মানুষের জীবন ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। তখন তাহাদের চাহিদা বা প্রয়োজনও ছিল কম। ক্রমশঃ মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চাহিদার মাত্রা বাড়িতে লাগিল, আর চাহিদা পূরণের ব্যবস্থারও উন্নতি সুরু হইল। এসকল ব্যবস্থার মধ্যে পশুপালন ও চাষ-আবাদ অন্যতম। এই সকল বিষয়ে ক্রমশঃ উন্নতির ফলে বর্তমানে **কৃষিজ সম্পদ** ও **প্রাণিজ সম্পদ মানবসভ্যতার দুই প্রধান স্তম্ভ**।

(ক) কৃষিজ সম্পদ

চাষ-আবাদের সূচনা ও ক্রমোন্নতি—প্রথমদিকে মানুষ কোন প্রকারে মাটিতে সামান্য গর্ত খুঁড়িয়া বিভিন্ন ফসলের বীজ বুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তারপর বনের কতক অংশের গাছপালা পুড়াইয়া আরম্ভ করিল **জুম চাষ**। আজও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে, উত্তর অস্ট্রেলিয়াতে এবং দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে কতক দুর্গম পাহাড়ের গায়ে এরূপ ব্যবস্থা আছে। ক্রমশঃ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ফসলের চাহিদা বাড়িতে লাগিল। ফলে, চাষের জমির পরিমাণ বাড়িতে লাগিল। আর চাষের কাজে ব্যবহৃত হইতে লাগিল লাঙ্গল, মই, কোদালি প্রভৃতি যন্ত্রপাতি এবং গরু, মহিষ, ঘোড়া, উট প্রভৃতি জন্তু। ক্রমে ক্রমে এসকল বিষয়ে আরও উন্নতির ফলে বর্তমানে বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশে চাষের কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হইতেছে। ফলে, ঐসকল দেশে **কৃষিকার্য এখন** একটি **উন্নত শিল্প**।

চাষের **জমি বৃদ্ধি** ও কৃষিকার্যের **পদ্ধতির পরিবর্তনের** সঙ্গে সঙ্গে **চাষের উদ্দেশ্য** সম্পর্কেও পরিবর্তন ঘটিতেছে। এখন স্থানীয় লোকের চাহিদা পূরণ ভিন্ন সমগ্র বিশ্বের চাহিদা পূরণের কথা মনে রাখিয়াও অনেক ফসলের চাষ হয়। যেমন, ইউরোপ ও আমেরিকার লোকের চাহিদা পূরণের জন্য চায়ের চাষ হয় ভারতে, রবারের চাষ হয় মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতে। বিভিন্ন কৃষিজ সম্পদের ক্রমাগত চাহিদা বৃদ্ধির ফলে এখন বহু আপাতঃ অসুবিধাজনক স্থানে কৃত্রিম উপায়ে নানারকম ব্যবস্থা করিয়াও চাষ-আবাদ হয়। যেমন, **জলসেচের** সাহায্যে বহু শুষ্ক, এমন কি মরুপ্রায় ভূমিতে চাষ হয়। আবার **কৃত্রিম** উপায়ে **উষ্ণতার** ব্যবস্থা করিয়া তুন্দ্রা অঞ্চলেও চাষ-আবাদের চেষ্টা চলিতেছে। এভাবে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র চাষ-আবাদের চেষ্টার ফলে **কৃষিকার্য**

এখন **বিশ্বকার্য** (Universal or global activity)। অর্থাৎ পৃথিবীর বেশীর ভাগ স্থানে **অধিকাংশ লোক** এই কাজ করেন। অন্যান্য অংশেরও কিছু-না-কিছু লোক কৃষিকার্য করেন।

কৃষিকার্যের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য—কৃষিকার্যের সফলতার জন্য কয়েকটি উপাদান বা বিষয় একান্ত আবশ্যক। ইহাদের মধ্যে কতক প্রাকৃতিক, কতক মানবিক ও সাংস্কৃতিক। **প্রাকৃতিক বিষয়সমূহের** মধ্যে ভূপ্রকৃতি ও মৃত্তিকা এবং বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ও আর্দ্রতা—এই চারিটি বিষয় এতই **গুরুত্বপূর্ণ** যে ইহাদের মধ্যে যে-কোন একটি ঠিক উপযুক্ত না হইলে কৃষিকার্য সফল হয় না। ইহাদের এরূপ গুরুত্বের জন্য ইহাদিগকে **কৃষিকার্যের** চারিটি **প্রাকৃতিক সীমা** (Physical frontiers of agriculture) বলা হয়। অপরদিকে **মানবিক** ও **সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহ** (উপযুক্ত সংখ্যক কৃষক ও শ্রমিক তাহাদের শ্রম, বিদ্যা, বুদ্ধি, যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রভৃতি) ক্রমশঃ এত বেশী **প্রাধান্য** লাভ করিতেছে যে উপরিলিখিত প্রাকৃতিক সীমার বাধা এখন আর আগেকার মত কার্যকরী নহে। অর্থাৎ এখন মানুষ প্রাকৃতিক বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন অসুবিধা বা ত্রুটি নানাভাবে দূর করিয়া কৃষিকার্যে সাফল্য লাভ করিতেছে। উপরিলিখিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(ক) **ভূপ্রকৃতি**—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের **স্থলভাগ** হইতে মানবসমাজের **খাদ্যদ্রব্যসমূহের** ৯৮%* উপাদান (ধান, গম, ডাল, তরকারি, চা, চিনি, মাংস, ডিম প্রভৃতি) এবং **বেশভূষার** (কার্পাস, পশম, রেশম, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি) প্রায় সমুদয় উপাদান পাওয়া যায়। ইহাদের অধিকাংশ কৃষিকার্য দ্বারা উৎপন্ন করা হয়। এরূপ বিভিন্ন প্রকার জিনিস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যত রকমের কৃষিকার্য করা হয়, তাহাদের অধিকাংশের জন্য **সমভূমি** সবচেয়ে বেশী উপযোগী। তবে ভূ-প্রকৃতির প্রাকৃতিক সীমা বা বাধাকে অতিক্রম করিয়া কোথাও কোথাও পাহাড়ের ঢালু ভূমিতে ধাপ বা সিঁড়ি তৈরী করিয়া চাষ করা হয়।

(খ) **মৃত্তিকা**—চাষ আবাদের পক্ষে ইহার গুরুত্ব খুব বেশী। কারণ, ভূপ্রকৃতি চাষের পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও তথাকার মৃত্তিকা উর্বর না হইলে কৃষিকার্য সফল হয় না। নদীর উপত্যকা ও বদ্বীপের উর্বর **পলি** মৃত্তিকা ও **দো-আঁশ** মৃত্তিকাতে পাট, গম, আখ প্রভৃতি ফসলের চাষ হয় সবচেয়ে বেশী। **এঁটেল** মৃত্তিকাতে ধান ভাল জন্মে। লাভা হইতে উৎপন্ন **কৃষ্ণ মৃত্তিকাতে** কার্পাস এবং শীতলঅঞ্চলের **হিমবাহ মৃত্তিকাতে** (Glacial soil) গম ভাল জন্মে।

* সাগর, উপসাগর ও অভ্যন্তরীণ জলাশয় হইতে পাওয়া যায় মাছ ও কতক জলজন্তু।

কৃষিকার্য সম্বন্ধে মৃত্তিকার প্রাকৃতিক সীমা বা বাধাকে মানুষ নানাভাবে অতিক্রম করিতেছে। যেমন, মিশরে নীল নদের বন্যার জল বিভিন্ন জমিতে নিয়া আটকাইয়া রাখা হয়। ফলে, ঐরূপ জমিতে **নূতন পলি** সঞ্চিত হইয়া জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হয়। যুক্তরাজ্যে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য কোন জমিতে একবার একজাতীয় ফসল চাষের পর দু'এক বৎসর অন্য রকম ফসলের চাষ করা হয়। কোথাও বা মাঝে মাঝে জমিকে বিশ্রাম দেওয়া হয় (চাষ করা হয় না, পশুপালন করা হয়)। তাহাছাড়া জাপান ও চীনদেশে কম্পোস্ট সার, বহু দেশে বিভিন্ন রকম রাসায়নিক সার (Chemical fertiliser), গাছের পচা লতাপাতা এবং জীবজন্তুর মলমূত্র দ্বারা উৎপন্ন উৎকৃষ্ট জৈব সার (Organic manure) প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। ইহা ভিন্ন চাষ-আবাদের ফাঁকে ফাঁকে জমিতে পশুপালন করিলে বা সার তৈরীর উপযোগী আগাছা জন্মিতে দিলেও জমির উর্বরতা বৃদ্ধি হয়।

(গ) **উষ্ণতা**—উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধির জন্য গ্রীষ্মকালে কম পক্ষে ১০-১১° সে উষ্ণতা প্রয়োজন। তবে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ঐ সময়ের উষ্ণতার পরিমাণ কিছু কম হইলেও তথায় গ্রীষ্মকালে দিবামান বড় বলিয়া অপেক্ষাকৃত কম সময়ে ফসল ফলে। বিভিন্ন প্রকার ফসলের সহিত উষ্ণতার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। যেমন, **উষ্ণমণ্ডলে** ধান, পাট, চা, কফি, কোকো, আখ প্রভৃতি জন্মে. **মৃদুশীতল অঞ্চলে** জন্মে গম, যব, রাই, বীট প্রভৃতি ফসল। তবে উষ্ণতার প্রাকৃতিক সীমা বা বাধাও মানুষ কিছুটা অতিক্রম করিতেছে। ফলে, **তুন্দ্রা** অঞ্চলেও ভূগর্ভস্থ Hot House-এর সাহায্যে **কৃত্রিম** উপায়ে বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি করিয়া সামান্য চাষ-আবাদ হইতেছে।

(ঘ) **বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা**—বিভিন্ন স্থানে **মৃত্তিকার প্রকৃতি** এবং নানা জাতীয় **উদ্ভিদের প্রয়োজন** অনুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ পরিমাণ আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত আবশ্যক। যেমন, লাভা হইতে উৎপন্ন কৃষ্ণ মৃত্তিকাতে এবং বিভিন্ন নদী-উপত্যকার **এঁটেল মাটিতে** (Clay or clayey soil) সহজেই জল জমিয়া থাকে। তাই তথায় অল্প জলেই চাষ-আবাদ হয়। তারপর বিভিন্ন ফসলের মধ্যে **ধান, পাট, চা,** প্রভৃতির জন্য প্রয়োজন প্রচুর বৃষ্টিপাত। **ভুট্টার** জন্য দরকার মধ্যম রকম বৃষ্টি। **কার্পাস** ও **গমের** জন্য আবশ্যক আরও কম বৃষ্টি। আর নামমাত্র বৃষ্টিতেই জন্মে জোয়ার, রাগি ও বাজরা। তবে মানুষ কৃত্রিম উপায়ে **জলসেচের** ব্যবস্থা করিয়া বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতার প্রাকৃতিক বাধাকে অতিক্রম করিতেছে।

কৃষিকার্যের অন্যান্য উপাদান—চাষ-আবাদের জন্য নিম্নলিখিত আরও নানারকম উপাদান বা নানা বিষয়ের সাহায্য প্রয়োজন।

(ঙ) **বীজ**—প্রত্যেক প্রকার ফসল সংগ্রহ করার পর তাহার মধ্য হইতে সম্পূর্ণ নীরোগ ও **শ্রেষ্ঠ ফসলকে** পরের চাষের সাফল্যের জন্য বীজ হিসাবে আলাদা করিয়া রাখা উচিত। এই বীজ যাহাতে সহজে অঙ্কুরিত হয় ও ভাল ফসল দান করে সেজন্য **বৈজ্ঞানিক উপায়ে** কতক প্রয়োজনীয় **ব্যবস্থা** অবলম্বন করা আবশ্যক। এদেশে সরকার অনেক ক্ষেত্রে কৃষকগণকে এরূপ উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহ করিয়া থাকে।

(চ) **কৃষক**—কৃষক ও শ্রমিকের স্বাস্থ্য, কাজ করার যোগ্যতা ও সুযোগ, কৃষকের উপযুক্ত শিক্ষা এবং তাহা কাজে পরিণত করার উদ্দেশ্যে আগ্রহ ও চেষ্টার উপর চাষ-আবাদের সাফল্য অনেক পরিমাণ নির্ভর করে। সাধারণতঃ কোন্ ফসলের জন্য কিভাবে জমি চাষ করা দরকার, কোন্ সময়ে চাষ করা উচিত, কখন বীজ বপন বা চারা রোপন করা উচিত, কিভাবে গাছের যত্ন নেওয়া দরকার ইত্যাদি বিষয়ে হাতেকলমে শিক্ষা বা প্রত্যক্ষ **অভিজ্ঞতা** কৃষকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। আমাদের দেশ, ডেনমার্ক, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র প্রভৃতি দেশে **সমবায় প্রথায়** (Co-operative system) চাষের সুফল দেখিতে পাওয়া যায়।

(ছ) **কৃষির উপযোগী যন্ত্রপাতি** (Equipment and Appliances)—পূর্বকালে চাষের জন্য সামান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বর্তমানে ফসলের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে অধিক পরিমাণে ফসল যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি ও অধিক পরিমাণে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সর্বত্র চাষের কাজে ক্রমশঃ অধিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতেছে। বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, প্রভৃতি যে সকল দেশে জমি বেশী অথচ লোক কম এবং শ্রমিকের মজুরী অধিক, তথায় নূতন জমি আবাদ করা, জমি চাষ, আগাছা নিড়ান, ফসল কাটা প্রভৃতি নানা কাজের জন্য **বিস্তর আধুনিক যন্ত্রপাতি** ব্যবহার করা হয়। তবে গরীব দেশে, বিশেষতঃ যেখানে জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত, চাষের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ কম। অবশ্য আমাদের দেশেও কতক বড় বড় সরকারী **খামারে** চাষের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতেছে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ-আবাদের (Mechanised farming) ফলে নিম্নলিখিত বিষয়ে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

লোহার লাঙ্গলের সাহায্যে জমি চাষ

কৃষিসংক্রান্ত কার্য ও ফসলের উৎপাদন—(১) কৃষিকার্যে নিযুক্ত লোকের

জনপ্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। কম শ্রমিক নিয়োগের ফলে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস হয়। (৩) যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ে অধিক জমি চাষ করা হয়। (৪) জমিতে জলসেচ ও

যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বপন
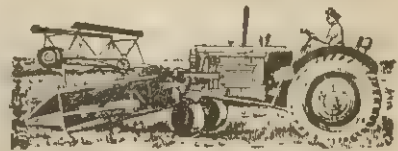
যন্ত্রের সাহায্যে ফসল সংগ্রহ

জমি হইতে জলনিকাশ প্রভৃতি বিষয়ে সুবিধা হয়। (৫) ফসলের রোগ চিকিৎসা ও জমি হইতে পোকা, কীট প্রভৃতি দূর করার পক্ষে সুবিধা হয়।

উৎপন্ন শস্যের বিতরণ ও ব্যবহার—(১) জমিতে উৎপন্ন ফসল দ্রুত সংগ্রহের পক্ষে সুবিধা হয়। (২) সংগৃহীত ফসল নির্দিষ্ট গোলাঘর ও হিমায়ন কক্ষে সংরক্ষণের পক্ষে সুবিধা হয়। (৩) জমি বা গোলাঘর হইতে ফসল বাজার, শিল্পকেন্দ্র প্রভৃতি স্থানে তাড়াতাড়ি সরবরাহের পক্ষে সুবিধা হয়। (৪) ফসল লোক মারফত পরিবহনের তুলনায় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিবহনে সময় ও খরচ কম।

কৃষিবিদ্যা—(১) চাষের কাজে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মৃত্তিকা, বীজ প্রভৃতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় গবেষণা করা হয়। (২) কি ভাবে ফসলের উৎপাদন ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি এবং অধিকতর লাভজনক করা যায় সে বিষয়েও গবেষণা হয়। (৩) কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন পশু পালন ও ইহাদের উন্নতি বিধান সম্পর্কেও গবেষণা হয়। উপরিলিখিত বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতির ফলে কৃষিকার্যের উৎপাদন বৃদ্ধি হয় এবং কৃষিকার্য অধিকতর লাভজনক হয়।

(জ) **ফসলের চাহিদা**—পূর্বকালে সাধারণতঃ প্রত্যেক অঞ্চলের স্থানীয় লোকের চাহিদা অনুসারে ফসলের চাষ হইত। কিন্তু ক্রমশঃ দ্রুত **পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি** এবং কৃষিজ সম্পদ্ **সরবরাহ** সম্পর্কে উন্নত ব্যবস্থা (Bulk handling of goods) প্রভৃতির ফলে এখন অনেক ফসলেরই চাহিদা ব্যাপক, এমন কি পৃথিবীব্যাপী। ফলে, ইহাদের চাষ-আবাদের পরিমাণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। যেমন, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশের গমের চাষ, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, ভারত, মিশর প্রভৃতি দেশের কার্পাসের চাষ, ভারত, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি

দেশের চায়ের চাষ এবং মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার রবারের চাষ এখন আগেকার তুলনায় অনেক বেশী।

(ঝ) **মূলধন সরবরাহ এবং উৎকৃষ্ট সার, জলসেচ প্রভৃতির ব্যবস্থা**—বর্তমানে বহু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, কৃষি সমবায় সমিতি (Agricultural Co-operatives) প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থ সাহায্য ও কৃষিঋণ গ্রহণের সুযোগ লাভ করে। ফলে, বিভিন্ন দেশের জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ সার ব্যবহার, জলসেচ, কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার ও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করার সুবিধা হইতেছে। ফলে, চাষ-আবাদের অনেক উন্নতি হইতেছে।

(ঞ) **কৃষি সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা**—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের **বৈজ্ঞানিকগণ** ও সরকার, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (U. N. O.) তত্বাবধানে **খাদ্য ও কৃষিসংস্থা** (F. A. O.) প্রভৃতি কৃষিকার্যের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন **গবেষণাগারে** বীজের উন্নতিবিধান, জমি ও ফসলের উপযুক্ত সার তৈরী ও তাহার ব্যবহার, জলসেচের ব্যবস্থা, পোকা নষ্ট করা ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণাদ্বারা বহু নূতন বিষয় আবিষ্কার করিতেছেন। কৃষককুল তাহা জমি চাষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া নিজেরা উপকৃত হইতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নিজ নিজ দেশ এবং সমগ্র পৃথিবীও উপকৃত হইতেছে।

চাষ-আবাদের বিভিন্ন প্রণালী

কৃষিকার্যের বিভাগ—কৃষিকার্যের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদান, চাষ-আবাদের পদ্ধতি, জমিতে উৎপন্ন ফসলসমূহের উৎপাদনের পরিমাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে পার্থক্য বিস্তর। ফলে, কৃষিকার্য বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। যথা :—

(১) **জমি সম্পর্কে কৃষকের মনোভাব অনুযায়ী কৃষির পার্থক্য**—জমি সম্পর্কে কৃষকগণের মনোভাবের পার্থক্য অনুসারে কৃষিকার্য দুই ভাগে বিভক্ত :—

(ক) **খাঁটি চাষ**—যেক্ষেত্রে কৃষকগণ নিজ নিজ জমি চাষ করেন এবং জমির জন্য তাহাদের দরদ বা ভালবাসা থাকে, তথায় জমির যাহাতে কোনরূপ ক্ষতি বা অনিষ্ট না হয় তাহা মনে রাখিয়া চাষ-আবাদ করা হয়।

(খ) **মিথ্যা চাষ** (Spurious cultivation)—যেক্ষেত্রে কৃষকগণ অন্যের জমি চাষ করেন, তথায় সাধারণতঃ জমির ক্ষতিবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কোন রকমে ফসল উৎপন্ন করাই কৃষির উদ্দেশ্য। এরূপ ক্ষেত্রে পরিণামে জমির ক্ষতি হয়।

(২) **বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে চাষ-আবাদের পার্থক্য**—পৃথিবীর

বিভিন্ন অংশে বৃষ্টিপাতের পার্থক্য অনুসারে চাষ-আবাদ পদ্ধতি এবং ফসল-ইত্যাদি সম্বন্ধে পার্থক্য যথেষ্ট। তদনুসারে কৃষিকার্য তিন ভাগে বিভক্ত :

(ক) **আর্দ্র কৃষি** (Humid farming)—স্বাভাবিক ভাবে প্রচুর পরিমাণ প্রয়োজন মত বৃষ্টিপাতের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার **মৌসুমী অঞ্চলে** ধান, পাট, আখ, চা প্রভৃতি এবং নাতিশীতোষ্ণ সামুদ্রিক অঞ্চলে গম, যব, আলু প্রভৃতি জন্মে। কাজেই এই সকল অঞ্চল আর্দ্র কৃষির জন্য বিখ্যাত। তবে হঠাৎ কোন বৎসর অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইলে ফসলের ক্ষতি হয়।

(খ) **সেচন কৃষি** (Irrigated farming)—পৃথিবীর বহু স্থানের মৃত্তিকা উর্বর, বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতাও কৃষিকার্যের উপযোগী, কিন্তু তথায় চাষ-আবাদের উপযুক্ত বৃষ্টি হয় না। এরূপ স্থানে কৃত্রিম উপায়ে **জলসেচের** ব্যবস্থা করিয়া কৃষিকার্য করা হয়। আর্দ্র কৃষির তুলনায় সেচকৃষি অধিক নির্ভরযোগ্য। এরূপ কৃষিতে অধিক ফসল পাওয়া যায়। ভারতের **পঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশে** গম, কার্পাস, আখ, তৈলবীজ প্রভৃতির চাষ সেচকৃষির উদাহরণ।

(গ) **শুষ্ক কৃষি** (Dry farming)—উত্তর আমেরিকার পশ্চিমদিকের পার্বত্য অঞ্চলের **মরুপ্রায় অংশের** মত কতক স্থানে নামমাত্র বৃষ্টি হয়। ফলে, ঐ সকল স্থানে কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে সেচ ব্যবস্থারও সুযোগ নাই। অপর দিকে যাতায়াত ও পরিবহনের অসুবিধা ও অন্যান্য কারণে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ফসল তথায় আমদানি করাও কষ্টকর। এজন্য তথায় জমি খুব গভীরভাবে চাষ করিয়া মাটি সম্পূর্ণ গুঁড়া করিয়া বীজ বপন করা হয়। তারপর উপরে খড়, শুকনা লতা, পাতা প্রভৃতি দিয়া ঐ জমি খুব ভাল ভাবে ঢাকিয়া রাখা হয়। ফলে, তথায় যে সামান্য বৃষ্টি ও তুষারগলা জল পাওয়া যায় তাহার কিছুমাত্র অংশ বাষ্পে পরিণত হয় না। এরূপ চাষ খুব কষ্টকর এবং ইহাতে ফসলও ফলে কম।

(৩) **বীজ বপনের পদ্ধতি অনুযায়ী কৃষির পার্থক্য**—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নানাপ্রকার ফসল উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে বীজ বপন করা হয়। যেমন—

(ক) **বপন কৃষি** (Broadcast farming)—আশু বা আউস ধান, গম, পাট, ভুট্টা, যব প্রভৃতি নানা রকম ফসল উৎপন্ন করিবার জন্য জমি ঠিকমত চাষ করিয়া তথায় **বীজ ছড়াইয়া** দেওয়া হয়। ইহাকে **বীজ বপন** পদ্ধতি বলে। সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশের বিস্তৃত অঞ্চলের জমি কলের লাঙ্গলের (Tractor) সাহায্যে চাষ করিয়া তথায় কখন কখন **বিমানপোতের সাহায্যে** বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

(খ) **রোপন কৃষি** (Transplantation farming)—আমন ধান, আখ, চা, রবার প্রভৃতির চাষের জন্য এবং নারিকেল ও সুপারীর বড় বড় বাগান তৈরীর উদ্দেশ্যে প্রথমে কতকটা জমিতে চারা তৈরী করা হয়। তারপর চারা তৈরীর জমি (Seed bed) হইতে নির্দিষ্ট মাপের চারা তুলিয়া নিয়া অন্যত্র চাষ-করা জমিতে বিভিন্ন সারিতে যথেষ্ট পরিমাণ ফাঁক দিয়া ঐ সকল চারা **রোপন** করা হয়। এ সম্পর্কে ধান চাষের জাপানী পদ্ধতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৪) **জমির আয়তন ও ফসলের চাহিদা অনুযায়ী কৃষির পার্থক্য**—বিভিন্ন দেশের লোকসংখ্যার সহিত চাষের জমির পরিমাণ, ফসলের চাহিদা প্রভৃতি বিষয়ের পার্থক্য অনুসারে চাষ-আবাদের পদ্ধতির পার্থক্য হয়। যেমন—

(ক) **ব্যাপক কৃষি** (Extensive agriculture)—কতক দেশে **বিস্তৃত চাষের জমি** আছে, অথচ লোকসংখ্যা কম, **ফসলের চাহিদাও কম**। এসকল দেশে সাধারণতঃ সুবিধাজনক জমিতে সামান্য মূলধনে ও কমসংখ্যক কৃষকের সাহায্যে চাষ করা হয়। তাই ইহাকে ব্যাপক চাষ বা **অযত্নের চাষ** বলে। **ক্যানাডা, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া** প্রভৃতি দেশে এরূপ চাষের জন্যও যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়।

(খ) **প্রগাঢ় কৃষি** (Intensive agriculture)—পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশে আবাদী জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট এবং জমির দাম অধিক, পতিত বা অনাবাদী জমি নূতন আবাদ করার সুযোগও কম, অথচ **লোকসংখ্যা** প্রতিদিনই **বৃদ্ধি** পাইতেছে। কাজেই তথায় লোকের চাহিদা পূরণের জন্য দরকার মত সার ব্যবহার করিয়া, জলসেচ ও অন্যান্য বিষয়ে সুব্যবস্থা করিয়া, অর্থাৎ চাষ আবাদের উন্নতির উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা সাধ্যমত অবলম্বন করিয়া ফসল বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হয়। তাই এরূপ চাষকে বলা হয় প্রগাঢ় কৃষি বা **নিবিড় চাষ** অথবা **যত্নের চাষ**। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার **ইন্দোনেশিয়া** হইতে **জাপান,** দক্ষিণে **ভারতের** কতক অংশ এবং ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম অংশের **ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, নেদারল্যাণ্ডস্, বেলজিয়াম** প্রভৃতি দেশে এরূপ চাষের ব্যবস্থা দেখা যায়।

(৫) **চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষির পার্থক্য**—বিভিন্ন দেশে লোকের আর্থিক অবস্থা ও শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক পরিবেশের পার্থক্যের ফলে চাষ-আবাদের পদ্ধতি সম্বন্ধেও পার্থক্য বিস্তর। যেমন—

(ক) **প্রাচীন কৃষি পদ্ধতি** (Traditional cultivation)—মধ্য আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মৌসুমী অঞ্চলের কতক অংশে লোকের শিক্ষা, দীক্ষা, আর্থিক অবস্থা, যাতায়াত ব্যবস্থা প্রভৃতি উন্নত নহে,

তথায় জমির দামও নিতান্ত কম। এরূপ অনেক দেশে লোকের অভাব, অভিযোগ এবং চাহিদাও কম। এপ্রকার কতক স্থানে দেখা যায় জুম চাষ এবং কোথাও বা সামান্য লাঙ্গল, কোদালি প্রভৃতির সাহায্যে অতি প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষ হয়। ইহাকে আদি বা অকৃত্রিম চাষও বলা যায়।

(খ) **আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতি**—যেখানে লোকসংখ্যার তুলনায় চাষের জমি কম, অথচ ফসলের চাহিদা বেশী, তথায় **কৃত্রিম সার** ব্যবহার করিয়া, **জলসেচের** ব্যবস্থা করিয়া এবং জমি চাষ, নিড়ান, ফসলের যত্ন, পোকা নিবারণ, ফসল কাটা, ফসল গোলাজাত করা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নানা প্রকার যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য চেষ্টা করা হয়। এরূপ চাষকে প্রগাঢ় চাষ বা **সঙ্কর** কৃষিও (Hybrid agriculture) বলা হয়। **পাশ্চাত্য দেশসমূহে** এবং পূর্ব গোলার্ধে **নিউজীল্যাণ্ড**, জাপান প্রভৃতি দেশে এরূপ ব্যবস্থা অধিক দেখা যায়।

(গ) **পর্যায়ক্রমে** জমি **চাষ** বা **শস্যাবর্তন প্রথা** (Crop rotation)—কতক জমিতে প্রতি বৎসর একই ফসল উৎপন্ন করার পরিবর্তে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন বৎসর ভিন্ন ভিন্ন ফসলের চাষ করা হয়। ইহাতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি হয় এবং ফাঁকে ফাঁকে পশুপালনের সুবিধা হয়। যুক্তরাজ্যে এই ব্যবস্থার প্রচলন অধিক।

(৬) **চাষের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পার্থক্য অনুযায়ী কৃষির পার্থক্য**—চাষ-আবাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পার্থক্য অনুসারে কৃষিকার্য নানাভাবে বিভক্ত। যেমন—

(ক) **স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি** (Self-sufficient agriculture)—কতক স্থানে পাহাড়, পর্বত প্রভৃতির প্রাকৃতিক বাধার ফলে অথবা যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা অনুন্নত বলিয়া অন্য স্থান হইতে ফসল আমদানি করা যায় না বা দেশের উৎপন্ন ফসলাদি অন্যত্র রপ্তানি করা যায় না। তাহাছাড়া কতক স্থানে চাষ-আবাদের দ্বারা কেবল **দেশের চাহিদাই মিটান** সম্ভবপর, তাহার বেশী উৎপন্ন করা যায় না। এই জাতীয় চাষকে বলা হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি। আফ্রিকার ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যভাগে ও অন্য কতক জায়গাতে এরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়।

(খ) **বাণিজ্যিক কৃষি** (Commercial agriculture)—আজকাল পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হইতেছে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি হইতেছে। ফলে, চাষ-আবাদের সময় উৎপন্ন ফসল বহু দূর দেশ, এমনকি **সমগ্র পৃথিবীতে বিক্রয়** করার কথা চিন্তা করিয়া অনেক দেশে প্রগাঢ় চাষ বা বৈজ্ঞানিক চাষের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। তাই এরূপ ফসলকে **অর্থকরী** বা **অর্থপ্রসূ**

ফসলও (Cash crop or Money crop) বলা হয়। ভারত ও বাংলাদেশের **পাট**, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও সিংহলের **চা**, ঘানার **কোকো**, ব্রেজিলের **কফি** প্রভৃতি এই জাতীয় ফসল।

(৭) **উদ্ভিদের আয়ুষ্কাল অনুযায়ী কৃষির পার্থক্য**—কৃষিকার্যের বা মানুষের উৎপন্ন উদ্ভিদের মধ্যে কতক দীর্ঘস্থায়ী, আর কতক স্বল্পস্থায়ী।

(ক) **স্বল্পস্থায়ী উদ্ভিদ্**—মানুষ নিজ প্রয়োজন অনুসারে কতক স্বল্পস্থায়ী উদ্ভিদ্ উৎপন্ন করে। অনেক ক্ষেত্রেই ইহাদের চাষের আরম্ভ হইতে ফসল সংগ্রহ শেষ হয় মাত্র ৩ হইতে ৬ মাসের মধ্যে। আমাদের বেশীর ভাগ খাদ্যদ্রব্য—গম, ধান, ভুট্টা, যব, রাই, বাজরা ইত্যাদি এবং বস্ত্রের সর্বপ্রধান উপাদান কার্পাস (তুলা) এই শ্রেণীর উদ্ভিদ হইতে পাওয়া যায়।

(খ) **দীর্ঘস্থায়ী উদ্ভিদ্** (Perennials)—আঙ্গুর, আপেল, আম, জাম, কাঁটাল, নারিকেল প্রভৃতি ফল; চা, কফি, কোকো প্রভৃতি পানীয়; ম্যাপল, খেজুর ও তাল গাছের রস হইতে উৎপন্ন গুড়, চিনি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য, আর বিভিন্ন শিল্পের উপাদান (রবার, সিঙ্কোনা, শিশাল শণ প্রভৃতি) যে সকল উদ্ভিদ্ হইতে পাওয়া যায় সেগুলি বহুদিন বাঁচে। ইহাদের মধ্যে কতক গাছের ফল (আপেল, আঙ্গুর, আম প্রভৃতি) স্বাভাবিক ভাবে পাকার পর বা তাহার সামান্য পূর্বে আমরা সংগ্রহ করি। অপরদিকে খেজুর, মেপল, রবার গাছ প্রভৃতির ছাল যন্ত্রের সহিত কাটিয়া আমরা তাহাদের রস সংগ্রহ করি। পাইন জাতীয় গাছের রস হইতে আমরা পাই তার্পিন, রজন প্রভৃতি জিনিস। আর চা গাছের কচি কুঁড়ি এবং কফি ও কোকোর বীজ সংগ্রহ করিয়া যন্ত্রের সহিত তৈরী করা হয় কতক পানীয় ও অন্যান্য জিনিস।

(৮) **ফসল উৎপাদন সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ের পার্থক্য অনুযায়ী চাষের পার্থক্য**—কোন্ জমি হইতে প্রতি বৎসর কত বার ফসল উৎপন্ন করা হয় তাহার ভিত্তিতে কৃষিকার্য নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত। যেমন—

(ক) **এক ফসলী** (Single crop) **কৃষি**—কতক স্থানের **মৃত্তিকা** ও **জলবায়ু** প্রতি বৎসর কেবলমাত্র একটি ফসল চাষের উপযুক্ত, আবার কোথাও মানুষ ইচ্ছা করিয়াই জমিতে প্রতি বৎসর একটি মাত্র ফসল উৎপন্ন করে। **যুক্তরাষ্ট্রে** এরূপ ব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন **কৃষিবলয়** সৃষ্টি হইয়াছে। তথায় দেশের দক্ষিণ অংশে (উষ্ণতর অংশে) ধান, আখ প্রভৃতি ফসলের, তাহার উত্তরে কার্পাস, ভুট্টা প্রভৃতির এবং আরও উত্তরে (নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে) গমের চাষ হয়। এরূপ প্রত্যেক অংশ **ইক্ষু বলয়, কার্পাস বলয়, ভুট্টা বলয়, গম বলয়** প্রভৃতি নামে পরিচিত।

আবার জলবায়ু ও উর্বর মৃত্তিকার সুযোগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কয়েকটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এক একটি ফসলের **আবাদ** (Plantation) করা হইতেছে। এরূপ কোন কোন স্থানে **একচেটিয়া** (Monopoly) চাষের সুযোগ পাওয়া যাইতেছে। এজন্য কোথাও কোথাও সৃষ্টি হইয়াছে বিস্তীর্ণ **কৃষি উপনিবেশ** বা **আবাদী ফসলের উপনিবেশ**। যেমন, এশিয়ার দক্ষিণপূর্ব অংশে **ইন্দোনেশিয়ার** জাভাতে দেখা যায় আখ ও চায়ের আবাদ, তথায় এবং **মালয়ে** আছে রবারের আবাদ, ইন্দোনেশিয়া, **ভারত** ও **সিংহলে** আছে চায়ের আবাদ, দক্ষিণ আমেরিকার **ব্রেজিলে** আছে কফির আবাদ, আফ্রিকার **ঘানাতে** আছে কোকোর আবাদ।

এরূপ চাষের সুযোগে কৃষি অঞ্চলের আপশাশে কতক **শিল্পও উন্নতি** লাভ করে। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের ও ভারতের **কার্পাস** শিল্প, ভারত, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়ার **চা** শিল্প, চিনি শিল্প প্রভৃতির উন্নতি এই সকল স্থানে উৎপন্ন ফসলের জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে। অপরদিকে কতক দেশ অপর দেশের একচেটিয়া ফসল আমদানি করিয়া ব্যবহারের পরিবর্তে দেশেই **বিকল্প** বা **পরিবর্ত ফসল** (Substitute crop) উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করে। তাহাছাড়া এক ফসলী কৃষির অন্য অসুবিধাও আছে। বাজারে ঐ ফসলের চাহিদা কমিয়া গেলে অর্থাৎ **মন্দা** (Slump or trade depression) দেখা দিলে অথবা কোন কারণে ইহার **উৎপাদন কমিয়া** গেলে, অথবা ফসল এক বৎসরও নষ্ট হইয়া গেলে ঐ দেশের ভয়ানক **বিপদ** হইতে পারে। এ অবস্থাতে অন্য যে সকল দেশ ঐ ফসলের উপর নির্ভরশীল, তাহাদেরও যথেষ্ট অসুবিধা হইতে পারে।

(খ) **বহু-ফসলী** (Multiple-crop) **কৃষি**—আজকাল সর্বত্র জমিতে উপযুক্ত সার ব্যবহার করিয়া, জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া ও অন্যান্য **বৈজ্ঞানিক প্রণালী** অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক জমিতে প্রতি বৎসর **একাধিক** ফসলের চাষ করা হয়। তাহাছাড়া প্রত্যেকটি ফসলও ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। যেমন, **ভারতে** গ্রীষ্মকালে যে জমিতে আশু বা আউস ধান অথবা পাটের চাষ হয়, বর্ষাকালে সেই জমিতে আমন ধানের চাষ হয়। আবার শীতকালে ঐরূপ কতক জমিতে ডাল বা তৈলবীজ জন্মে। **জাপানে** একই জমি হইতে বহু ফসল উৎপাদনের উদ্দেশ্যে জমিতে কিছু সময় পর পর বিভিন্ন সারিতে ২।৩টি ফসলের বীজ লাগান হয় এবং একটির পর আর একটি ফসল পাওয়া যায়।

(গ) **মিশ্র-কৃষি** (Mixed or diversified farming)—বর্তমানে অনেক জমি হইতেই **একাধিক ফসল** উৎপন্ন করিবার জন্য চেষ্টা এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু **পশুপালনও** করা হয়। যেমন, **যুক্তরাষ্ট্রের কার্পাস** বলয়ে অতিরিক্ত ফসল হিসাবে

তামাক ও ভুট্টার চাষ হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে হাঁস, মুরগী, শূকর প্রভৃতি পালন করা হয়। জাপান, আমাদের ভারত এবং উত্তরপশ্চিম ইউরোপের বহু দেশেও এইরূপ মিশ্র-কৃষির (ফসল উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে পশু পালন) ব্যবস্থা আছে।

পৃথিবীর কৃষি অঞ্চল

উদ্ভিদের সহিত ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা ও জলবায়ুর (বিশেষতঃ বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত) সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ। ফলে, কৃষিকার্যের সহিতও ইহাদের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ইহারা কৃষির প্রাকৃতিক সীমারূপে স্বীকৃত। এসকল বিষয়ের প্রভাবে অতি উচ্চ পর্বত ও মালভূমি, অতি শীতল তুন্দ্রা অঞ্চল, বৃষ্টিহীন মরু অঞ্চল এবং বৃষ্টিবহুল অরণ্য অঞ্চল কৃষির পক্ষে অযোগ্য।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষ এসকল প্রাকৃতিক বিষয়ের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের নানা বিষয়ে প্রয়োজন বা চাহিদা অনুসারে কৃষিকার্যের প্রসার ও আর্থিক বিষয়ে উন্নতি বিধান করিতেছে। ফলে, কোথাও দেখা যায় বিরাট জমিতে চাষাবাদের ব্যবস্থা, আবার কোথাও দেখা যায় অতিশয় ছোট ছোট জমিতে, এমন কি কৃষকের বাড়ির আশপাশের ক্ষুদ্রতম জমিতেও চাষের ব্যবস্থা। জমির মালিকানা, কৃষকের আর্থিক অবস্থা, বিভিন্ন দেশের জমির উত্তরাধিকার সম্পর্কে দেশ বা রাজ্যের নিয়ম প্রভৃতি নানা কারণের উপর চাষের জমির আয়তন (ছোট বা বড়) নির্ভর করে। তবে চাষের অবস্থা বা সুযোগ নির্ভর করে মৃত্তিকা, জলবায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও কতক মানবিক বিষয়ের উপর। বস্তুতঃ এসকল বিষয়ের প্রাধান্য অনুসারে পৃথিবীর কতক অংশে দেখিতে পাওয়া যায় **বিস্তীর্ণ কৃষি অঞ্চল**। ইহাদের বিষয়ে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

উত্তর গোলার্ধের মহাদেশ—এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এই তিন মহাদেশে বাস করেন। সুতরাং এখানে **খাদ্য, বস্ত্র** প্রভৃতির **চাহিদাও অধিক**। সৌভাগ্য বশতঃ এই তিন মহাদেশেই **কৃষি অঞ্চল সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত** (পৃথিবীর মোট কৃষি অঞ্চলের প্রায় ৭০-৭৫%)।

এশিয়া—এই মহাদেশের সর্বপ্রধান কৃষি অঞ্চল **দক্ষিণ** ও **দক্ষিণপূর্ব** অংশে অধিক বিস্তৃত। এই মহাদেশের দক্ষিণ অংশের সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সমভূমি, দক্ষিণপূর্বে ইরাবতী, সালুয়েন, মেকং ও মেনামের সমভূমি এবং পূর্ব অংশে সিকিয়াং, ইয়াংসি কিয়াং ও হোয়াংহোর সমভূমি কেবল এই মহাদেশ নহে, সমগ্র পৃথিবীর অন্যতম প্রধান কৃষি

অঞ্চল। এখানকার **ভূমির উর্বরতা** ও **মৌসুমী জলবায়ু** এখানকার কৃষিকার্যের সাফল্যের দুইটি প্রধান কারণ। আর্থিক অসুবিধা ও অন্যান্য কারণে এখানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ সম্ভব না হইলেও এখানকার **কৃষককুলের কঠোর পরিশ্রম** ও কৃষিকার্যের নৈপুণ্য বা **দক্ষতাও** এ সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানকার জমিতে হাজার হাজার বৎসর যাবৎ চাষ হইতেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে **প্রাচীন পদ্ধতি** আজও প্রচলিত। এখানকার ফসলসমূহের মধ্যে **ধান, পাট, আখ, তৈলবীজ, চা** প্রভৃতি উৎপাদনের পরিমাণ **পৃথিবীতে প্রথম**। গম, ভুট্টা, রাগি, বাজরা, কার্পাস, তামাক প্রভৃতির উৎপাদনও অধিক।

ইউরোপ—এই মহাদেশের কৃষি অঞ্চল **উত্তরপশ্চিম ও মধ্যভাগের** সমভূমিতে বিস্তৃত। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জও এই অঞ্চলের অন্তর্গত। গ্যারোন, লয়ের, সীন, রাইন,

এলব, ভিশ্চুলা প্রভৃতি পশ্চিমবাহিনী নদী এই মহাদেশের উত্তরপশ্চিম অংশের উপর দিয়া প্রবাহিত। আর মধ্য ভাগের নদীসমূহের মধ্যে ড্যানিয়ুব সর্বপ্রধান। ইহাদের উপত্যকার **উর্বর সমভূমি** ও এখানকার **নাতিশীতোষ্ণ সামুদ্রিক জলবায়ু** কৃষিকার্যের উন্নতির পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক। তাহাছাড়া এখানে চাষের উন্নতির জন্য বিভিন্ন **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি** (সেচ ব্যবস্থা, কৃষি-যন্ত্রপাতি ও সারের ব্যবহার প্রভৃতি) বহু দিন যাবৎ প্রচলিত। এখানকার কৃষক ও শ্রমিকগণ আধুনিক পদ্ধতিতে চাষের কাজে দক্ষ। ফলে, এখানকার কৃষিকার্যের **সাফল্য সুনিশ্চিত** এবং উৎপাদনের পরিমাণও স্বভাবতঃ অধিক। **গম, যব, বীট** প্রভৃতি এখানকার প্রধান ফসল।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র –এই দেশের **দক্ষিণ অংশ** পৃথিবীর একটি প্রধান কৃষি অঞ্চল। ইহার প্রধান অংশ উরল পর্বতের পশ্চিমে অর্থাৎ ইউরোপীয় অংশের **ইউক্রেন**। ইহা পৃথিবীর **প্রধান শস্যভাণ্ডার** রূপে গণ্য। তবে এই পর্বতের পূর্বদিকেও কৃষিকার্য অত্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। পশ্চিম অংশে ভল্গা, ডন, নীপার, নীস্টার প্রভৃতি নদীর সমভূমি অঞ্চলে এবং পূর্বদিকে সির দরিয়া ও আমু দরিয়া নদীর সমভূমিতে

আধুনিক **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে** কৃষিকার্য ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে। **গম** ও **পাট** উৎপাদন সম্পর্কে এদেশের স্থান **পৃথিবীতে প্রথম, কার্পাস** উৎপাদনে **দ্বিতীয়**।

উত্তর আমেরিকা—এই মহাদেশের প্রধান কৃষি অঞ্চল **যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য ও পূর্বদিকের অংশ**। ইহা উত্তরে ক্যানাডার দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। মিসৌরি-মিসিসিপি নদীর উপত্যকার উর্বর **সমভূমি** এবং **নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু** এখানকার কৃষির পক্ষে সহায়ক। এখানেও ইউরোপের উন্নত দেশসমূহ ও সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের মত আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্পন্ন হয়। বস্তুতঃ এখানে কৃষির উপযোগী ভূমি অতিশয় বিস্তীর্ণ এবং জলবায়ু সম্পর্কে বিভিন্ন অংশের মধ্যে পার্থক্য অধিক। ফলে, এখানে বিভিন্ন ফসল চাষের জমি অনুসারে কয়েকটি **কৃষি বলয়** সৃষ্টি হইয়াছে। দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগরের উপকূল হইতে ক্রমশঃ উত্তরদিকে প্রধানতঃ জলবায়ুর পার্থক্য অনুসারে ফসলের পার্থক্যের ফলে দেখিতে পাওয়া যায় **ইক্ষু বলয়, কার্পাস বলয়, ভুট্টা বলয়, গম বলয়,** ইত্যাদি বলয়। এই মহাদেশে **কার্পাস** উৎপাদন **পৃথিবীতে প্রথম,** গম, পাট, তামাক প্রভৃতির উৎপাদন পৃথিবীতে দ্বিতীয়।

দক্ষিণ গোলার্ধের মহাদেশ—আফ্রিকার দক্ষিণ অর্ধাংশ, দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ এবং ওশিয়ানিয়া সম্পূর্ণ ভাবে দক্ষিণ গোলার্ধের অন্তর্গত। এই তিন মহাদেশে লোকসংখ্যা কম। ফলে, এখানে **খাদ্য, বস্ত্র** প্রভৃতির স্থানীয় **চাহিদাও** উত্তর গোলার্ধের মহাদেশগুলির তুলনায় **কম**। প্রাকৃতিক অসুবিধার জন্য এই তিন মহাদেশে কৃষি অঞ্চলও উত্তর গোলার্ধের মহাদেশগুলির তুলনায় কম বিস্তৃত। তবে এসকল মহাদেশে কেবলমাত্র স্থানীয় চাহিদার বিষয় বিবেচনা করিয়া চাষাবাদ করা হয় না। বরং **উত্তর গোলার্ধের চাহিদা** আংশিকভাবে মিটাইবার সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য এখানে **চাষের অঞ্চল** ক্রমশঃ **বিস্তৃত** হইতেছে। এ বিষয়ে কতকগুলি **সুবিধা** বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উত্তর গোলার্ধের এশিয়া ও ইউরোপের অনেক জমিতে বহু সহস্র বৎসর যাবৎ চাষ হইতেছে। তার উপর এশিয়ার দেশগুলিতে এখনও উপযুক্ত সার ব্যবহার করা ও আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব হইতেছে না। অপরদিকে এখানকার জমিতে (Virgin soil) **নূতন আবাদ** করা হইতেছে। তার উপর উত্তর গোলার্ধের অভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া এখানে চাষের কাজে **আধুনিক বৈজ্ঞানিক** পদ্ধতি অবলম্বন করা হইতেছে। ফলে, এখানকার কৃষিজ সম্পদ উৎপাদনের হার অধিক। তারপর আধুনিক **যানবাহনের উন্নতির** ফলে দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলি হইতে বিভিন্ন জিনিস অনায়াসে উত্তর গোলার্ধে রপ্তানি করা যাইতেছে। তাহাছাড়া উত্তর গোলার্ধে

যখন শীতকাল, তখন দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। আর উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীতকাল। এই প্রাকৃতিক অবস্থার সুযোগে দক্ষিণ গোলার্ধের মহাদেশগুলির গম, বীট, আপেল, কমলালেবু প্রভৃতি **উত্তর গোলার্ধে পৌঁছে** এমন সময়ে যখন **উত্তর গোলার্ধের ফসল প্রায় শেষ** হইয়া গিয়াছে। কাজেই তথায় ইহাদের চাহিদা প্রচুর।

দক্ষিণ আমেরিকা—এই মহাদেশের কৃষি অঞ্চল মধ্যভাগের নিরক্ষীয় অরণ্য অঞ্চলের দক্ষিণে। **প্যারানা, প্যারাগুয়ে** ও **উরুগুয়ে** নদীর **উপত্যকার** উর্বর সমভূমি ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু এখানে কৃষির পক্ষে সুবিধাজনক। এখানে আগেকার **তৃণভূমি** পরিষ্কার করিয়া **চাষের জমির** পরিমাণ ক্রমশঃ **বৃদ্ধি** হইতেছে এবং আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ হইতেছে। এখানকার ফসলের মধ্যে **গম ও বীট** প্রধান। মালভূমি অংশের ঢালু জমিতে কোকো, কফি প্রভৃতির ও অন্যত্র কার্পাস, তামাক প্রভৃতির চাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। **কফি** উৎপাদন সম্পর্কে এই মহাদেশের স্থান **পৃথিবীতে প্রথম**। আপেল, কমলালেবু প্রভৃতি ফলের চাষও এখানে দ্রুত বৃদ্ধি হইতেছে।

আফ্রিকা—এই মহাদেশে কোন বিস্তীর্ণ কৃষি অঞ্চল নাই। এখানকার প্রায় সমুদয় অংশ (উপকূল ও নদী উপত্যকার সামান্য অংশ ভিন্ন) মালভূমি। তার উপর মধ্যভাগে আছে নিরক্ষীয় বনভূমি, তাহার উত্তরে পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি (সাহারা) এবং আশপাশে ক্রান্তীয় তৃণভূমি (বড় বড় ঘাস ও মাঝে মাঝে গাছ)। এগুলি চাষাবাদের পক্ষে বড় বাধা। তাই এই মহাদেশের বিভিন্ন অংশের কয়েকটি সুবিধাজনক স্থানে **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি অঞ্চল** দেখা যায়। উত্তরপূর্বে মিশরে **নীলনদের উপত্যকার** অতি সঙ্কীর্ণ অংশ এবিষয়ে অত্যন্ত সুবিধাজনক। ইহা পৃথিবীর প্রাচীনতম কৃষি অঞ্চলের অন্তর্গত। ভারতের সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি ও চীনের ইয়াংসি কিয়াং-হোয়াংহো নদীর সমভূমির প্রায় সমকালে এখানে চাষাবাদ আরম্ভ হইয়াছে এবং আজও এসকল স্থানে চাষের কাজ সমানভাবে চলিতেছে। তবে আফ্রিকার এই অংশের আয়তন অতি সামান্য। তাহার দক্ষিণে সুদানে তৃণভূমি পরিষ্কার করিয়া **কার্পাস, ভুট্টা, তামাক** প্রভৃতির চাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে **গমের** চাষ দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে।

ওশিয়ানিয়া—মহাদেশসমূহের মধ্যে এখানকার আয়তন ক্ষুদ্রতম। এখানকার **অস্ট্রেলিয়ার** আয়তন **নিউ জীল্যাণ্ডের** তুলনায় অনেক বেশী, অথচ দেশের অধিকাংশ মালভূমি ও মরুভূমি বলিয়া জমি চাষের পক্ষে অসুবিধাজনক। ফলে, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম, দক্ষিণপূর্ব ও উত্তর উপকূলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে মাত্র **ছোট ছোট কৃষি অঞ্চল**

দেখা যায়। নিউ জীল্যাণ্ডের অধিকাংশ স্থানের ভূপ্রকৃতি (পার্বত্য ভূমি) চাষের পক্ষে অসুবিধাজনক। তবে এখানকার নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু চাষের পক্ষে উপযোগী। এই দুই দেশের সুবিধাজনক স্থানগুলিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ হয়। ফসলের মধ্যে **গম, বীট,** আঙ্গুর, আপেল, কমলালেবু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কৃষিকার্যের সহিত মৃত্তিকা ও জলসেচের সম্পর্ক

কৃষিকার্যের সফলতা সম্পর্কে উর্বর মৃত্তিকা এবং উপযুক্ত জলবায়ুর গুরুত্ব খুব বেশী। এসম্পর্কে উপযুক্ত কৃষক, ভাল বীজ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রভৃতিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(ক) **ভূপ্রকৃতি ও মৃত্তিকা**—নদ-নদীসমূহের উপত্যকা ও বদ্বীপের **সমভূমির** উর্বর **দো-আঁশ** মৃত্তিকা কৃষিকার্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক। তাই পৃথিবীর সর্বত্র এরূপ স্থানেই হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া চাষ-আবাদ চলিয়া আসিতেছে। ফলে, এরূপ জমির উৎপাদনের হার ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। বেলে মাটি, এঁটেল মাটি, লোনা মাটি প্রভৃতি কৃষিকার্যের পক্ষে সাধারণতঃ অসুবিধাজনক। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতক ফসল জন্মে। মৃত্তিকার সহিত কৃষিকার্যের এপ্রকার সম্পর্কের বিষয় **ভারতের উদাহরণ** উল্লেখ করিয়া আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) **উত্তরদিকের পর্বত অঞ্চল**—এদেশের উত্তরদিকের পর্বত অঞ্চলের মৃত্তিকা সাধারণতঃ অনুর্বর ও কৃষিকার্যের পক্ষে অনুপযুক্ত। কারণ, এখানকার মাটি প্রধানতঃ বড়-ছোট নানারকম **কাঁকর-মিশ্রিত** বা **পডসল** জাতীয়। তবে হিমালয় পর্বতের কতক ঢালু অংশে ও নদী-উপত্যকাতে হিমবাহের (Glacier) সহিত প্রবাহিত **গ্রাবরেখা** (Moraine)-**মিশ্রিত** উর্বর **মৃত্তিকা** আছে। কতক উপত্যকাতে উর্বর **পলিমাটিও** আছে। এসকল অংশে, কখন কখন ধাপে ধাপে (Terrace) ধান, গম, আলু, নানারকম ফল প্রভৃতি জন্মে। এদেশের উত্তরপূর্ব অংশে পাহাড়ের গায়ে লৌহমিশ্রিত উর্বর **হিউমাস সারযুক্ত মৃত্তিকা** অঞ্চলে **চায়ের** চাষ হয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। আবার কতক দুর্গম পার্বত্য অংশে এখনও জুম চাষ প্রচলিত।

(২) **সমভূমি অঞ্চল**—উত্তর ভারতের পলিগঠিত বিস্তীর্ণ সমভূমি ও দক্ষিণ ভারতে উপকূলের সমভূমি অতিশয় উর্বর এবং চাষ-আবাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। উত্তরপ্রদেশ হইতে আসাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ **গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা** ও **বদ্বীপের** যে অংশে প্রায় প্রতি বৎসর **নূতন পলি** (New alluvium) সঞ্চিত হয় তথাকার মৃত্তিকা ধান, গম, আখ, পাট, কার্পাস প্রভৃতি চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এখানকার বদ্বীপের যে সকল অংশে **এঁটেল মাটি** (Clay or clayey soil) অধিক

তথায় মৃত্তিকা **ধান** ও **পাট** চাষের পক্ষে খুব ভাল। পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যের যে বিস্তৃত অংশে প্রচুর **দো-আঁশ মাটি** আছে, তথায় **গম, আখ, কার্পাস** প্রভৃতি নানারকম ফসলের চাষ হয় এদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। এই অঞ্চলের উত্তর অংশে প্রাচীন পলি-গঠিত ভূমিতে মৃত্তিকার উর্বরতা কম এবং তথায় ফসলের চাষ ভাল হয় না। তবে উত্তরদিকের পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশের **বেলেমাটিতে** আলুর চাষ হয়। অবশ্য জমিতে সার ব্যবহার ও জলসেচের সাহায্যে সকল অংশেই কৃষির পক্ষে সাহায্য হয়। তাই পশ্চিম ভারতের রাজস্থানের মরু অঞ্চলের কতক সুবিধাজনক অংশেও ভুট্টা, রাগি, বাজরা ইত্যাদি জন্মে।

(৩) **মালভূমি অঞ্চল**—ভারতের মালভূমি অঞ্চল বহুদূর বিস্তৃত এবং তাহার বিভিন্ন অংশে দেখা যায় নানা প্রকার মৃত্তিকা। যেমন, দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর-পশ্চিম অংশে গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও মধ্য প্রদেশের উত্তর অংশে আছে লাভা হইতে উৎপন্ন উর্বর কাল মাটি। এখানে কার্পাস অধিক জন্মে। তাই ইহা **কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকা** (Black cotton soil) নামে পরিচিত। এখানে যথেষ্ট **গম**ও জন্মে। এখানকার দক্ষিণ ও পূর্বে কর্ণাটক, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু ও কেরালা রাজ্যে আছে **লাল মাটি**। আর দক্ষিণে নীলগিরির আশপাশে এবং উত্তর-পূর্বদিকে বিহারের ছোটনাগপুরে আছে **ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা**। ইহার রং পোড়ান ইটের মত। ইহাদের জল ধারণের ক্ষমতা কম। তাই অনুর্বর। তবে সার ব্যবহার করিয়া ও জলসেচের সাহায্যে এসকল স্থানে চাষ-আবাদ হয়। মালভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত নদ-নদীসমূহের **উপত্যকার উর্বর পলিমাটিতে** যথেষ্ট কৃষিকার্য হয়।

(৪) **উপকূল অঞ্চল**—এদেশের পূর্ব ও পশ্চিম উভয়দিকের উপকূলে কতক সমভূমি আছে। তবে এখানকার বিভিন্ন অংশের মৃত্তিকার মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। যেমন, উভয় উপকূলের বিস্তীর্ণ অংশে, বিশেষতঃ নদীসমূহের বদ্বীপে ও আশপাশে প্রচুর উর্বর পলিমাটি আছে। তথায় যথেষ্ট চাষ-আবাদ হয়। কিন্তু উপকূলের **বালুকা** এবং **লোনামাটি** দ্বারা গঠিত অংশে চাষ আবাদ অসুবিধাজনক। এরূপ কতক অংশে আছে সুন্দরী জাতীয় লোনা জলের গাছ, আর আছে নারিকেল বাগান।

মৃত্তিকার ক্ষয়ীভবন ও সংরক্ষণ—সাধারণতঃ কৃষিকার্যের গুরুত্ব অনুসারে ভূমির মূল্য স্থির হয়। তাই ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে জমির মূল্য খুব বেশী। অথচ এদেশে নানা কারণে ভূমির উবরতা নষ্ট হয়। যেমন, বর্ষাকালে **অতিবৃষ্টির** জন্য অথবা **বন্যার** ফলে ভূমির উপরিভাগের মৃত্তিকা ধুইয়া **ভূমিক্ষয়** (Soil erosion) হয়। ভূমির উপরিভাগের হিউমাস ও অন্যান্য সারযুক্ত উর্বর মৃত্তিকা ক্ষয় হইয়া গেলে

চাষ-আবাদের ক্ষতি হয়। তারপর বন অঞ্চলের **গাছপালা নির্বিচারে কাটিয়া** ফেলিলে গাছের শিকড় মাটিকে শক্তভাবে আঁকড়াইয়া রাখিতে পারে না। তখন মৃত্তিকা শিথিল হইয়া পড়ে। সামান্য বৃষ্টি বা প্লাবনের ফলেই এরূপ মৃত্তিকার বিস্তর ক্ষয় হয়। পার্বত্য অঞ্চলে ২।১ বৎসর **জুম চাষের** পর ঐ জমির আর কোনরূপ যত্ন না নেওয়ার ফলেও ভূমির ক্ষয় হয়। অবাধে **পশুপালন** বা চারণের ফলেও ভূমির ক্ষয় হয়। কারণ, পশুর দল ঘাসের শিকড় পর্যন্ত খাইয়া ফেলিলে জমির সাধারণ বাঁধন নষ্ট হয় ও মাটি শিথিল হইয়া পড়ে। ইহা ভিন্ন মানুষ রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ী প্রভৃতি তৈরীর জন্য **মাটি কাটিয়াও** ভূমি ক্ষয়ের পক্ষে সাহায্য করে। তাহাছাড়া উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবল **ধূলিঝড়ের** ফলেও মাটির উপরদিকের অত্যন্ত গুঁড়া বা ধূলার মত অংশ সহজেই উড়িয়া যায়। ইহাতেও জমির উর্বরতা হ্রাস পায়।

সুতরাং চাষ-আবাদ ও অন্যান্য বিষয়ে দেশের মঙ্গল চিন্তা করিয়া **ভূমির ক্ষয় বন্ধ** করা কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে **বন্যা নিরোধ** এবং **নদীর গতি নিয়ন্ত্রণ** একান্ত আবশ্যক। বনের গাছ কাটা, জুম চাষ, পশুপালন প্রভৃতি বিষয়েও বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। তাহাছাড়া বন মহোৎসবের মাধ্যমে এবং অন্য নানাভাবে উৎসাহ দিয়া দেশে নূতন গাছ এবং **বন সৃষ্টির** ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও উপযুক্ত সার ব্যবহার—ভূমির ক্ষয় বন্ধ করা ভিন্ন জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যও প্রত্যক্ষভাবে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে প্রতি বৎসর বর্ষাকালে নদীর জলের সহিত বা বন্যার ফলে যে **নূতন পলি** জমে তাহাতে স্বাভাবিকভাবে ভূমির উর্বরতা কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। তাহাছাড়া জমিতে নানারকম **সার** (Manure) দিয়া জমির উর্বরতা কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি করা হয়। এতকাল কেবল **গোময়, কম্পোস্ট** এবং অন্যান্য **জৈব সারের** ব্যবহার ছিল। এখন এগুলি ভিন্ন কৃত্রিম বা **রাসায়নিক সার** ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। কোন্ জমির কি অবস্থা, কোন্ জমিতে কোন্ **ফসল** উৎপন্ন করা হইবে, তাহার **চাহিদা** কিরূপ এবং ঐ ফসল উত্তমরূপে উৎপাদনের জন্য কোন্ সার কি পরিমাণে প্রয়োজন ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও **গবেষণাদি** চলিতেছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন নদী প্রকল্প অনুসারে তৈরী বড় বড় বাঁধের (Dam) পাশে এবং সিন্ধ্রি, নেভেলি প্রভৃতি নানাস্থানে বিরাট কারখানাতে কয়লা, খনিজ তৈল, লবণ প্রভৃতির সাহায্যে সার তৈরী হইতেছে। উপরিলিখিত ব্যবস্থা ভিন্ন জমিতে একবার ফসল উৎপন্ন করিয়া কিছু দিন তাহা তৃণভূমি বা পতিত জমি হিসাবে ফেলিয়া রাখিলে এবং তথায় গো-মহিষ প্রভৃতি পশু পালন করিলেও তাহাদের মলমূত্র প্রভৃতি স্বাভাবিক সারদ্বারা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি হয়।

(খ) **কৃষিকার্য ও জলবায়ু**—কৃষিকার্যের সাফল্যের সহিত জলবায়ুর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রধানতঃ জলবায়ুর পার্থক্য অনুসারে পৃথিবীর প্রধান কৃষিফসলগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে অধিক পরিমাণে জন্মে। যেমন, ধান, পাট, আখ, চা প্রভৃতি উষ্ণ মণ্ডলের মৌসুমী জলবায়ুতে এবং গম, বীট, কার্পাস প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অধিক উৎপন্ন হয়। কৃষিকার্যে **জলবায়ুর প্রভাব** সম্পর্কে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, মৌসুমী অঞ্চল প্রভৃতির উদাহরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। **ভারতের উদাহরণ** সহ এবিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

হিমালয় অঞ্চলের উপরিভাগ ভিন্ন এদেশের প্রায় সর্বত্র বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ উষ্ণতা পাওয়া যায় তাহা বিভিন্ন প্রকার স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ ও ধান, পাট, আখ প্রভৃতি উষ্ণ অঞ্চলের ফসলের চাষের পক্ষে সুবিধাজনক। কিন্তু **গ্রীষ্ম-কালের মৌসুমী** বায়ুদ্বারা কেবলমাত্র উপকূল, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের কতক অংশে কৃষির পক্ষে **উপযুক্ত** ও **নির্ভরযোগ্য** পরিমাণে **বৃষ্টিপাত** হয়। অন্যান্য স্থানে অতিবৃষ্টি, অথবা অনাবৃষ্টি বা অসময়ে বৃষ্টি, কিংবা সময়োপযোগী বৃষ্টির অভাব—ইহার কোন-না-কোন কারণ বশতঃ বৃষ্টিপাত কৃষির পক্ষে উপযুক্ত নহে, অথবা নির্ভরযোগ্য নহে। তাহাছাড়া শীতকালে এদেশের বেশীর ভাগ জায়গাতে বৃষ্টি প্রায় হয় না। তাই একমাত্র স্বাভাবিক মৌসুমী বৃষ্টির খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া চাষ-আবাদ অত্যন্ত বিপজ্জনক—"Agriculture in India is a gamble in monsoon"।

মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাবে এদেশের **অধিকাংশ ফসল** জন্মে **বর্ষাকালে**। ধান, পাট, ভুট্টা, আখ প্রভৃতি ফসল তন্মধ্যে প্রধান। এগুলিকে বলা হয় **খারিফ** ফসল। **শীতকালে** জন্মে অনেক কম ফসল (প্রধানতঃ বৃষ্টি কম বলিয়া)। তাহাদের মধ্যে গম, ডাল, আলু, তৈলবীজ প্রভৃতি প্রধান। এগুলিকে বলা হয় **রবিশস্য**। এদেশের উত্তরদিকের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল ভিন্ন সর্বত্র **সমস্ত বৎসর** চাষের **উপযুক্ত উষ্ণতা** বর্তমান। তবে এদেশে **বৃষ্টিপাতের সমস্যা** প্রচুর। ইদানীং **বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচব্যবস্থা** দ্বারা তাহা সমাধানের জন্য চেষ্টা হইতেছে। এদেশের সেচব্যবস্থার বিষয় পরে আলোচিত হইবে। এদেশের কৃষি সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল।

(গ) **কৃষক ও শ্রমিক**—অনাবাদী জমিকে চাষের জন্য তৈরী করা (জমি আবাদ করা), তথায় সময়মত বীজ বপন, তারপর গাছের যত্ন, ফসল সংগ্রহ প্রভৃতি সকল কাজে অর্থাৎ চাষের সকল অবস্থায় প্রয়োজন উপযুক্ত সংখ্যক দক্ষ কৃষক ও শ্রমিকের। এদেশে কৃষক ও শ্রমিকের অভাব নাই। তবে তাঁহারা প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষের কাজে অভ্যস্ত।

সারা বৎসর চাষের কাজও থাকে না অনেকের। ফলে, ইঁহাদের **আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ**। অথচ আধুনিক **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে** চাষের **সুযোগ** পাইলে ইঁহারা অনেক **বেশী ফসল** উৎপন্ন করিতে পারেন। তবে এবিষয়ে কতক **গুরুতর সমস্যাও** আছে। দেশের সর্বত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য হইলে বেকার লোকের সংখ্যা আরও বাড়িবে। অথচ বেকারগণের উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা প্রায় অসম্ভব।

(ঘ) **কৃষি-যন্ত্রপাতি**—এদেশের বেশীর ভাগ জমি চাষের জন্য ব্যবহৃত হয় পুরানো ধরনের কাঠের লাঙ্গল (লোহার ফলাযুক্ত) ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। এদেশে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ আরম্ভ হওয়ার ফলে গত ২৫ বৎসরে (১৯৫১-৭৫ খ্রীঃ) লোহার লাঙ্গল, ট্র্যাক্টর (চাষের বৃহৎ যন্ত্র) প্রভৃতির সংখ্যা অন্ততঃ ২½ গুণ বাড়িয়াছে।

(ঙ) **কৃষিসার**—আগে এদেশে চাষের কাজে সামান্য পরিমাণ **জৈবসার** (কম্পোস্ট, গোময়, গোমূত্র, লতাপাতা পচান হিউমাস সার ও অন্যান্য সবুজ সার) ব্যবহৃত হইত। গত ২৫ বৎসরে জৈব সার ব্যবহার সত্ত্বেও **রাসায়নিক** বা **কৃত্রিম সারের** ব্যবহার বাড়িয়াছে অন্ততঃ দশ গুণ। প্রথম অবস্থায় বিদেশ হইতে রাসায়নিক সার আমদানি করা হইত। এখন দেশের প্রায় সর্বত্র এদেশে তৈরী সার ব্যবহৃত হইতেছে। এদেশে সার তৈরীর প্রধান কেন্দ্র সিন্দ্রি, নুনমাটি প্রভৃতি।

(চ) **কৃষি সম্পর্কে গবেষণা ও তাহার ফল**—কৃষির উন্নতি সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্যে গত ২৫ বৎসরে (১৯৫১-৭৫ খ্রীঃ) এদেশে কয়েকটি **কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়**, বহু **গবেষণাগার** [দিল্লীর (পুসা) এগ্রিকালচারেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কটকের রাইস রিসার্চ ইঃ, সিমলার পটেটো রিসার্চ ইঃ প্রভৃতি] স্থাপিত হইয়াছে। তাহাছাড়া আছে গম, কার্পাস, পাট, আখ প্রভৃতি সম্পর্কে **কেন্দ্রীয় কমিটি** ও কয়েকটি **কর্পোরেশন**। ইহাদের মারফত **উৎকৃষ্ট বীজ** সরবরাহ, **কীটনাশক ঔষধের** ব্যবহার ও উন্নত ধরনের **চাষের কাজ** হাতে-কলমে **শিক্ষা** দেওয়া হইতেছে।

(ছ) **প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা**—বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক প্রকল্পের ২৫-৩১% টাকা **সেচসমেত কৃষিব্যবস্থার** জন্য **ব্যয়** করা হইতেছে। ইহার ফলে দেশে কৃষিসার, উৎকৃষ্ট বীজ, কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতির উৎপাদন ও ব্যবহার, কৃষিগবেষণাগার ও অন্যান্য সংস্থার উন্নতি, সেচব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতি সম্ভবপর হইতেছে। **কৃষকগণকেও** ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতির মাধ্যমে **অর্থ সাহায্যের** (ঋণদান) ব্যবস্থা হইতেছে।

(জ) **ফসল সংরক্ষণ, বিক্রয় প্রভৃতির ব্যবস্থা**—এদেশে অনেক ফসল বন্যা, পঙ্গপাল প্রভৃতির উৎপাতে নষ্ট হয়। তাহাছাড়া বহু কৃষকের পক্ষে ফসল উপযুক্তভাবে রক্ষা করা ও ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব হয় না। গত ২৫ বৎসর যাবৎ সরকারী ও

বেসরকারী গোলাঘরে ফসল সংরক্ষণ, সমবায় সমিতি, ফুড কর্পোরেশন ও অন্যান্য সংস্থার মারফৎ ফসল বিক্রয় ইত্যাদি বিষয়ে ক্রমশঃ অধিক ব্যবস্থা হইতেছে।

সেচব্যবস্থা ও কৃষিজ সম্পদ

সেচের প্রয়োজনীয়তা—মিশর, চীন ও ভারতে **প্রাচীনতম কালে** সেচ-ব্যবস্থা আরম্ভ হয়। তাহার পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সেচের প্রচলন হয়। ক্রমশঃ সকল দেশেই উন্নতি হইতেছে, কিন্তু বহুদিন এদেশে এবিষয়ে বিশেষ উন্নতি হয় নাই। গত ২৫ বৎসর যাবৎ ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। তবে এখনও দেশের মাত্র ২৫% **চাষের জমিতে** সেচকার্য হয়। বাকী জমিতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেচের ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক।

সেচের প্রাচীন পদ্ধতি—এদেশে পুকুর, খাল, কূপ প্রভৃতির সাহায্যে সেচব্যবস্থা বহু পূর্ব হইতে প্রচলিত। বর্তমানে এগুলি **ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা** রূপে পরিচিত। এখানে নদীর খালের সাহায্যে সেচকার্য আরম্ভ হয় ১০০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে। কাবেরী নদীর বদ্বীপ খাল এদেশের **প্রাচীনতম সেচখাল**। তাহা কাটা হয় ঐ সময়। এরূপ নদনদীর সাহায্যে বেশী পরিমাণে জমিতে সেচকার্য **বৃহৎ সেচব্যবস্থা** রূপে গণ্য।

স্বাধীনতা লাভের (১৯৪৭ খ্রীঃ) পূর্বে সেচব্যবস্থা—ঐ সময়ের পূর্বে এদেশে নিম্নলিখিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে সেচকার্য হইত

(১) **কূপ**—আগে কাঁচা কুয়ো বা ইঁদারার সাহায্যে তাহাদের আশপাশে সেচকার্য হইত। ক্রমশঃ পাকা (বাঁধান) কূপ, নলকূপ প্রভৃতির ব্যবহার আরম্ভ হয়। বহুস্থানে **নলকূপের** জল তোলা হয় **বৈদ্যুতিক শক্তির** সাহায্যে। এ বিষয়ে উত্তরপ্রদেশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর গভীর **কূপ** হইতে জল তোলা হয় কোথাও কোথাও **কপিকল** ও বালতির সাহায্যে, কোথাও **পারসিক জলচক্রের** সাহায্যে। (পারসিক জলচক্রের ব্যবস্থা অনুসারে একটি বড় চাকার গায়ে কতক পাত্র পর পর এমনভাবে বাঁধা থাকে যে জলাশয়ের মধ্যে চাকা ঘুরিবার সময় একটির পর একটি পাত্রে জল উঠে।) গভীর কূপ হইতে কপিকলের সাহায্যে জল তুলিবার কাজে গরু, উট প্রভৃতি প্রাণীও ব্যবহৃত হয়। পঞ্জাব হইতে পূর্বদিকে বিহার ও দক্ষিণে তামিলনাড়ু পর্যন্ত এই ব্যবস্থা প্রচলিত। তবে **উত্তরপ্রদেশে** কূপের সাহায্যে সেচকার্য হয় এদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দেশের প্রায় ২০% সেচের জমিতে কূপের সাহায্যে সেচকার্য হয়।

(২) **জলাশয়**—বিভিন্ন স্থানে হ্রদ, খাল, বিল প্রভৃতি স্বাভাবিক জলাশয়ে এবং পুকুর, দীঘি প্রভৃতি কৃত্রিম জলাশয়ে বর্ষাকালে প্রচুর জল সঞ্চিত হয়। এসকল জলাশয়ের জলের সাহায্যে দেশের প্রায় ১০% সেচের জমিতে সেচকার্য হয়। এই

পদ্ধতিতে অধিক সেচকার্য হয় **অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে।** কতক বিরাট জলাশয় **সাগর** নামে পরিচিত। যেমন, কর্ণাটকে কৃষ্ণরাজা সাগর, বনবিলাস সাগর, অন্ধ্রপ্রদেশে নাগার্জুন সাগর প্রভৃতি।
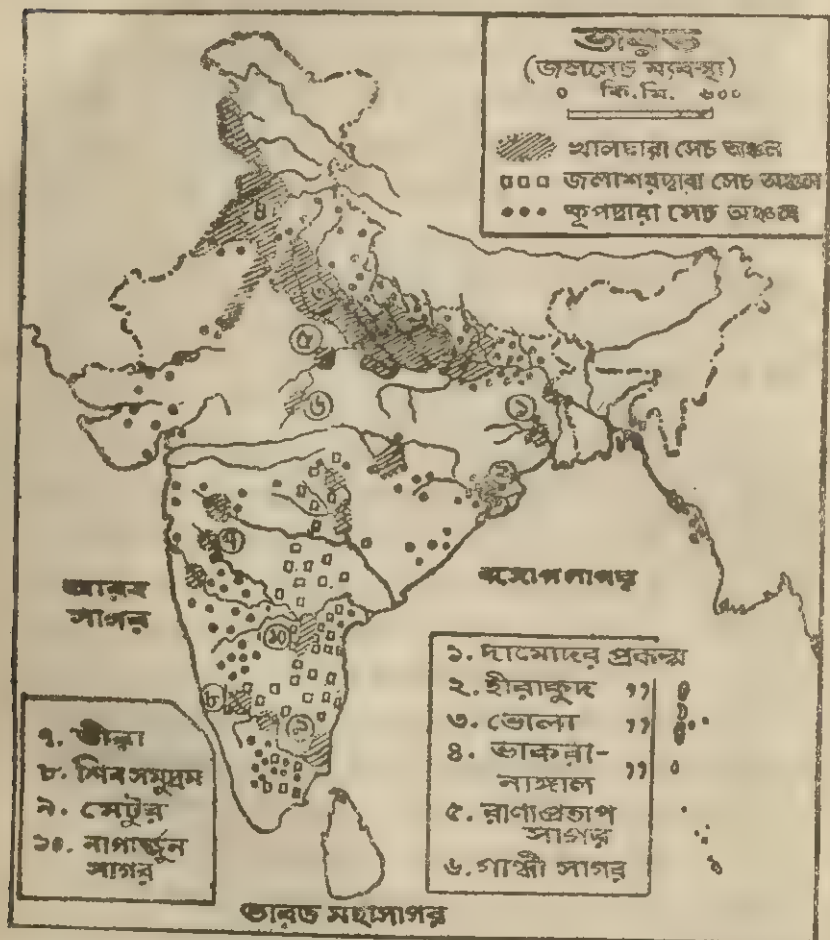
(৩) **সেচখাল**—নদীর সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে সেচব্যবস্থা সম্বন্ধে ১৯৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত এদেশের নিম্নলিখিত সেচখালগুলি ছিল প্রসিদ্ধ। **পাঞ্জাবের** ভারতীয় অংশে উচ্চ চন্দ্রভাগা খাল (চন্দ্রভাগা নদীর সহিত যুক্ত), উচ্চ বারিদোয়াব খাল (ইরাবতী নদীর সহিত যুক্ত), শতদ্রু খাল; **হরিয়ানার** অংশে পূর্ব ও পশ্চিম যমুনা খাল, সিরহিন্দ খাল (শতদ্রু নদীর সহিত যুক্ত); **উত্তর প্রদেশের** পশ্চিম অংশে পূর্ব যমুনা খাল,

আগ্রা খাল (যমুনার সহিত যুক্ত), উচ্চ ও নিম্ন গঙ্গা খাল, মধ্য অংশে সারদা খাল ও দক্ষিণ অংশে শোন, বেতোয়া, দশন, কেন প্রভৃতি নদীর খাল। **বিহারে** শোন নদের খাল; **পশ্চিমবঙ্গের** অংশে দামোদর খাল; **উড়িষ্যাতে** মহানদী খাল; **অন্ধ্রপ্রদেশের** অংশে গোদাবরীর বদ্বীপ খাল, কৃষ্ণার বাকিংহাম ও বদ্বীপ খাল, তুঙ্গভদ্রার কুড্ডাপা-কুর্ন্ল খাল (তুঙ্গভদ্রা ও পেন্নারকে যুক্ত করে); **তামিলনাড়ুর** অংশে কাবেরী নদীর বদ্বীপ খাল, মেট্টুর খাল; **মহারাষ্ট্রের** অংশে গোদাবরী ও কৃষ্ণার খাল; **কর্ণাটকের** অংশে কৃষ্ণা ও কাবেরীর খাল।

আধুনিক সেচব্যবস্থা—বর্তমানে বহু উদ্দেশ্যমূলক নদীপ্রকল্প অনুসারে দেশের প্রায় অর্ধেক কৃষিজমিতে সেচকার্য হয়। আর নদনদীসমূহের ছোট প্রকল্প, কূপ, ছোট খাল, জলাশয় প্রভৃতির সাহায্যে বাকী অর্ধেক কৃষিজমিতে সেচকার্য হয়।

বহু উদ্দেশ্যমূলক নদীপ্রকল্প—এদেশের নদ-নদীসমূহের প্রবল জলশক্তি দ্বারা আগে নানাভাবে অপকার ও ক্ষতি হইত। ঐ সকল **অপকারিতা দূর** করা ও নদীর **উপকারিতা বৃদ্ধির** উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক প্রকল্প অনুসারে ব্যবস্থা হইতেছে। এসকল প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনেক বলিয়া ইহাদিগকে বহুউদ্দেশ্যমূলক নদীপ্রকল্প বলা হয়। সাধারণতঃ **উদ্দেশ্যগুলি** নিম্নরূপ:—নদীর এপার-ওপার আড়াআড়িভাবে প্রকাণ্ড ও খুব মজবুত **বাঁধ** তৈরী এবং জল সঞ্চয়ের জন্য তাহার পাশে বিরাট **জলাশয়** তৈরী। ইহার ফলে **বন্যা নিয়ন্ত্রণ** ও **ভূমিক্ষয় বন্ধ** হয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণের ফলে শহর, গ্রাম, ক্ষেত-খামার, পথঘাট প্রভৃতির ক্ষয়ক্ষতি বন্ধ হয় এবং কোথাও বিরাট জলাভূমি সৃষ্টি হয় না। তাই ম্যালেরিয়া রোগ নিবারণ হয়। এভাবে নদীর **অপকারিতা দূর** হয়। তারপর জলাশয়ের জলরাশি এত বেগে নীচের দিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় যে কৃত্রিম জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়। এই জলপ্রবাহের প্রবল স্রোতের সাহায্যে বাঁধগুলির পাশে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রে উৎপন্ন হয় **জলজ বিদ্যুৎশক্তি**। ইহা নানাপ্রকার শিল্প, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা, শহর, গ্রাম প্রভৃতি আলোকিত করা ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুৎশক্তি তৈরীর পর জলরাশিকে বিভিন্ন খালের মধ্য দিয়া চাষের জমিতে নিয়া **সেচকার্য** করা হয়। ইহার ফলে কৃষিজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। ইহাদের কতক শিল্পের উপাদান ও কতক খাদ্যদ্রব্য। শিল্পের উপাদানগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে শিল্পের উন্নতি হয়। আর খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দেশ ক্রমশঃ খাদ্য সম্বন্ধে আত্মনির্ভর হইতেছে। তাহাছাড়া জলাশয় ও খালগুলিতে প্রচুর **মাছের চাষ** হইতেছে। ইহাতেও খাদ্য সম্পর্কে উপকার হইতেছে। কতক বড় খাল **যাতায়াত ও পরিবহনের** কাজেও ব্যবহৃত হইতেছে। তাহাছাড়া প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন

স্থানে নূতন নূতন রাস্তা, লোকালয়, উদ্যান, কলকারখানা প্রভৃতি সৃষ্টির ফলে **সমগ্র অঞ্চলের রূপ পরিবর্তিত** হইতেছে। এভাবে নদীর **উপকারিতা বৃদ্ধি** হইতেছে। কতক প্রকল্প দ্বারা একাধিক রাজ্যেরও উপকার হইতেছে। কয়েকটি প্রধান নদীপ্রকল্পের সাহায্যে সেচব্যবস্থা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

দামোদর উপত্যকা প্রকল্প—ছোটনাগপুর মালভূমির পালামৌ জেলার খামারপত শৃঙ্গ (১০৫০মি উচ্চ) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে দামোদর নদ। সেখান হইতে ইহা দক্ষিণপূর্ব ও পূর্বদিকে আসিয়াছে বর্ধমানের নিকট পর্যন্ত। তারপর দক্ষিণে বাঁকিয়া কলিকাতার দক্ষিণে ইহা পতিত হইয়াছে ভাগীরথী-হুগলি নদীতে। ইহার প্রবল **বন্যার**
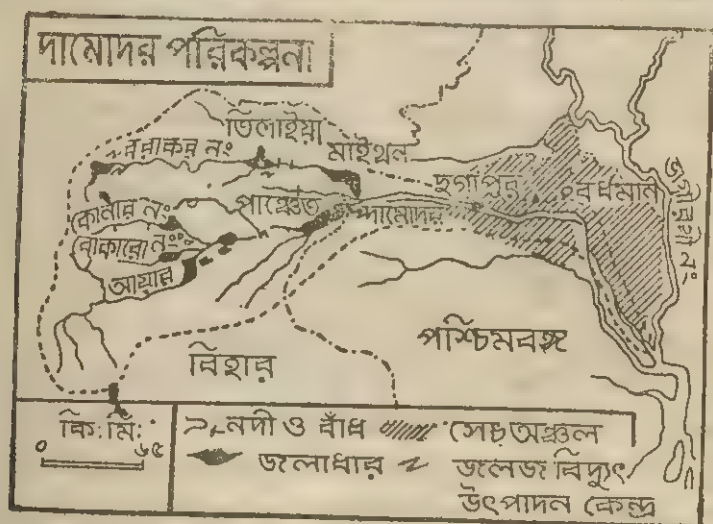
ফলে আগে বিস্তর ক্ষতি হইত। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নানা বিষয়ে উন্নতির জন্য এই নদীতে **স্বাধীন ভারতের প্রথম** বহুমুখী নদী প্রকল্প তৈরী হইয়াছে। এই প্রকল্প অনুসারে এই নদী ও ইহার বিভিন্ন উপনদীতে নিম্নরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। দামোদরের উপনদী বরাকরের উপর হাজারিবাগ জেলাতে (প্রায় ৩৭০ মি দীর্ঘ) **তিলাইয়া** বাঁধ ও (৩৬০০ মি দীর্ঘ) **মাইথন** বাঁধ, অপর উপনদী কোনারের উপর (প্রায় ৩৯২০ মি দীর্ঘ) **কোনার** বাঁধ, আয়ারের উপর **তেনুঘাট** বাঁধ এবং মূল নদীর উপর **পাঞ্চেৎ** বাঁধ ও দুর্গাপুরের নিকট (প্রায় ৭০০ মি দীর্ঘ) ব্যারেজ বা সেচবাঁধ তৈরী হইয়াছে। **দুর্গাপুর ব্যারেজের** সহিত যুক্ত বিভিন্ন খালের সাহায্যে বর্ধমান হইতে হাওড়া পর্যন্ত নদীর দুই পাশের জেলাগুলির বিস্তীর্ণ (প্রায় ৩½ লক্ষ হেক্টর; এক হেক্টর = ১০,০০০ বর্গ মিটার) জমিতে সেচকার্য হয়। ভবিষ্যতে আরও বেশী জমিতে জলসেচ হইবে।

ময়ূরাক্ষী প্রকল্প- ছোটনাগপুরের উত্তরপূর্বে সাঁওতাল পরগনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ময়ূরাক্ষী নদী। সেখান হইতে পূর্বদিকে আসিয়া পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুরের নিকট ইহা পতিত হইয়াছে ভাগীরথী নদীতে। ইহার উপর বিহারে দুমকার পাশে **মেসাঞ্জোরে** তৈরী হইয়াছে (প্রায় ৬৪০ মি দীর্ঘ) **ক্যানাডা বাঁধ** ও বীরভূম জেলার সিউড়ির পাশে **তিলপাড়া ব্যারেজ**। এই ব্যারেজের সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলাতে (প্রায় ২½ লক্ষ হেক্টর জমিতে) সেচকার্য হয়।

কংসাবতী প্রকল্প—পুরুলিয়া জেলার পশ্চিম অংশ হইতে কংসাবতী বা কাঁসাই নদী উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণপূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। পথে ইহা **কেলেঘাই** বা কালীঘাই নদীর সহিত মিশিয়াছে। তারপর এই মিলিত নদী **হলদি** নদীর সহিত মিশিয়া সাগরদ্বীপের উত্তরে ভাগীরথী-হুগলি নদীতে পড়িয়াছে। **কাঁসাই** ও ইহার উপনদী **কুমারী** নদীতে বাঁধ দিয়া মেদিনীপুর জেলাতে (প্রায় ২½ লক্ষ হেক্টর জমিতে) সেচকার্য হইতেছে। (ভবিষ্যতে ৪ লক্ষ হেঃ জমিতে সেচকার্য হইবে)।

গঙ্গা (ফরাক্কা ব্যারেজ) প্রকল্প—গঙ্গানদী রাজমহল পাহাড়ের পাশ দিয়া মালদহ জেলার পশ্চিম অংশে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার সামান্য দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর সীমাতে **ফরাক্কাতে** এই নদীর উপর তৈরী হইয়াছে **পৃথিবীর দীর্ঘতম** (প্রায় ২২৪০ মি দীর্ঘ) **ব্যারেজ**। এই প্রকল্পের অংশ হিসাবে মুর্শিদাবাদ জেলার **জঙ্গীপুরে** ভাগীরথীর উপর একটি **ব্যারেজ** তৈরী হইয়াছে এবং ফরাক্কা ব্যারেজ হইতে এই ব্যারেজ পর্যন্ত একটি **বড় খাল** তৈরী হইতেছে। এই খালের মাধ্যমে যাতায়াত ও সেচকার্যের সুবিধা হইবে। ভাগীরথী নদীর দক্ষিণ অংশের তীরে কলিকাতা বন্দরেরও উপকার হইবে।

কোশী প্রকল্প—কোশী গঙ্গার উপনদী। ইহার বন্যা ভয়ঙ্কর। বিহার ও নেপালের সীমাতে এই নদীতে **হনুমাননগর ব্যারেজ** তৈরী হইয়াছে। ইহার সহিত যুক্ত **খালের** সাহায্যে বিহারে (৩ লক্ষ হেঃ জমিতে) সেচকার্য হইতেছে। (ভবিষ্যতে ৭'৫ লক্ষ হেঃ জমিতে সেচকার্য হইবে।)

সারদা-সহায়ক প্রকল্প—গঙ্গার উপনদী ঘাঘরা। ইহার উপনদী সারদা। এই নদীতে **বনবাসার** পাশে **বাঁধ** দিয়া উত্তরপ্রদেশে (এক লক্ষ হেঃ জমিতে) সেচকার্য হইতেছে। (ভবিষ্যতে ১৬ লক্ষ হেঃ জমিতে সেচকার্য হইবে।)

গণ্ডক প্রকল্প—গঙ্গার উপনদী গণ্ডক। বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও নেপালের সীমাতে এই নদীর উপর **বাল্মীকিনগরে** (প্রায় ৭৪০ মি দীর্ঘ) **ব্যারেজ** তৈরী হইয়াছে।

ইহার সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে এদেশে সেচকার্য আরম্ভ হইয়াছে। (ভবিষ্যতে ১৫ লক্ষ হেঃ জমিতে সেচকার্য হইবে।)

হীরাকুন্দ বাঁধ ও মহানদী বদ্বীপ প্রকল্প—উড়িষ্যার **হীরাকুন্দে** মহানদীর উপর (৪৮০০ মি দীর্ঘ) বাঁধ তৈরী হইয়াছে। এই নদীর উপর কটকের নিকট **নারাজ** ও **টিকারপাড়া বাঁধ** এবং বদ্বীপে শাখানদী **মুণ্ডালি** ও **বিরূপা** নদীতে **ব্যারেজ** তৈরী হইয়াছে। এসকল বাঁধ ও ব্যারেজের সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে (৭ লক্ষ হেঃ জমিতে) সেচকার্য হইতেছে। (ভবিষ্যতে ১০ লক্ষ হেঃ জমিতে সেচকার্য হইবে।)

রিহান্দ প্রকল্প—গঙ্গার উপনদী শোন। ইহার উপনদী রিহান্দ। উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণ অংশে এই নদীতে **বাঁধ** দিয়া সেচের ব্যবস্থা হইতেছে।

রামগঙ্গা প্রকল্প—গঙ্গার উপনদী রামগঙ্গা। উত্তরপ্রদেশে গাড়োয়াল অঞ্চলে এই নদীতে (১২৫ মিঃ দীর্ঘ) বাঁধ দিয়া এই রাজ্যে (২ লক্ষ হেঃ জমিতে) সেচকার্য হইতেছে। (ভবিষ্যতে ৬ লক্ষ হেঃ জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইবে।)

ভাকরা-নাঙ্গল প্রকল্প—সিন্ধুর উপনদী শতদ্রু। পঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের সীমাতে এই নদীর উপর **ভাকরাতে পৃথিবীর সর্বোচ্চ** (প্রায় ২২৫ মি উচ্চ) **বাঁধ** তৈরী হইয়াছে। ইহার সামান্য দক্ষিণে এই নদীর উপর তৈরী হইয়াছে **নাঙ্গল বাঁধ**। ইহাদের সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে হিমাচলপ্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লী ও রাজস্থানে এদেশের **সবচেয়ে বেশী** (১৪½ লক্ষ হেঃ) **জমিতে** সেচকার্য হয়।

হারিকা ব্যারেজ প্রকল্প—শতদ্রু নদীর উপর পঞ্জাবে হারিকা ব্যারেজ তৈরী হইয়াছে। ইহার সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে পঞ্জাবে ইরাবতী ও বিপাসা নদীর সাহায্যে সেচব্যবস্থার এবং দক্ষিণে রাজস্থানে সেচের সুবিধা হইতেছে।

বিপাসা প্রকল্প—সিন্ধুর উপনদী বিপাসা। পঞ্জাবের **পাণ্ডোতে** এই নদীতে বাঁধ দিয়া খালের সাহায্যে ইহাকে শতদ্রুর সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। এই নদীতে **পঙ্গ** নামক স্থানেও বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। এই নদীর বিভিন্ন খালের সাহায্যে পঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানে সেচের সুবিধা হইবে।

রাজস্থান ক্যানেল প্রকল্প—**হারিকা ব্যারেজ** প্রকল্প ও **বিপাসা নদীর পঙ্গ প্রকল্প** হইতে জল লইয়া রাজস্থানের গঙ্গা নগর অঞ্চলে (২½ লক্ষ হেঃ জমিতে) সেচকার্য হইতেছে। সমুদয় কাজ শেষ হইলে রাজস্থান ক্যানেল হইবে পৃথিবীর দীর্ঘতম (প্রায় ৭০০ কিমি দীর্ঘ) সেচখাল। ইহার সাহায্যে ভবিষ্যতে ৬ গুণ জমিতে সেচকার্য হইবে। তাহার ফলে রাজস্থানের মরু অঞ্চল শস্যশ্যামল হইবে।

তাপ্তী প্রকল্প—তাপ্তী নদীতে সুরাটের দক্ষিণে (প্রায় ৬২০ কিমি দীর্ঘ) **কাকরা-পাড়া বাঁধ** ও উকাইতে (প্রায় ৪৯৩০ মি দীর্ঘ) **উকাই বাঁধ** তৈরী হইয়াছে। ইহাদের সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে গুজরাটে (৩ লক্ষ হেঃ জমিতে) সেচকার্য হইতেছে। (ভবিষ্যতে ৪ লক্ষ হেঃ জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইবে।)

চম্বল প্রকল্প—গঙ্গার উপনদী যমুনা। ইহার উপনদী চম্বল। এই নদীতে বাঁধ দিয়া **গান্ধীসাগর, রাণাপ্রতাপ সাগর, জওহর সাগর** প্রভৃতি বিরাট জলাশয় এবং **কোটা ব্যারেজ** তৈরী হইয়াছে। ইহাদের সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে (৪১/২ লক্ষ হেঃ জমিতে) সেচকার্য হইতেছে।

তাওয়া প্রকল্প—নর্মদার উপনদী তাওয়া। এই নদীতে (১৬৩০ মি দীর্ঘ) বাঁধ দিয়া মধ্যপ্রদেশে সেচকার্য আরম্ভ হইয়াছে। ভবিষ্যতে অনেক বেশী (৩ লক্ষ হেঃ জমিতে) সেচের ব্যবস্থা হইবে।

উচ্চ কৃষ্ণা প্রকল্প—কর্ণাটক রাজ্যে কৃষ্ণা নদীর উপর **নারায়ণপুরে** দীর্ঘ বাঁধ তৈরী হইয়াছে। ইহার সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে এই রাজ্যে (৮ লক্ষ হেঃ জমিতে) সেচকার্য হইবে। আলমাটিতেও বাঁধ তৈরীর ব্যবস্থা হইতেছে।

তুঙ্গভদ্রা প্রকল্প—কৃষ্ণার উপনদী তুঙ্গভদ্রা। কর্ণাটক রাজ্যে এই নদীর উপর হসপেটের পাশে (প্রায় ২৪৪০ মি দীর্ঘ) বাঁধ তৈরী হইয়াছে। ইহার সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে অন্ধ্র ও কর্ণাটক রাজ্যে (৩১/২ লক্ষ হেঃ জমিতে) সেচকার্য হইতেছে।

কৃষ্ণা (নাগার্জুন সাগর) প্রকল্প—কৃষ্ণা নদীর উপর অন্ধ্রপ্রদেশে নন্দীকোণ্ডার পাশে (প্রায় ১৬৭০ মি দীর্ঘ) বাঁধ দিয়া নাগার্জুন সাগর তৈরী হইয়াছে। ইহার সহিত যুক্ত (দীর্ঘ প্রায় ৪০০ কিমি) খালের সাহায্যে অন্ধ্র ও কর্ণাটক রাজ্যে (৫১/২ লক্ষ হেঃ জমিতে) সেচকার্য হইতেছে। সেচকার্য ভবিষ্যতে (৮১/২ লক্ষ হেঃ জমিতে হইবে।)

কৃষ্ণার অন্যান্য প্রকল্প—কৃষ্ণা নদীর **শ্রীশৈলম্** ও **সঙ্গমেশ্বরম্** প্রকল্প এবং কৃষ্ণার উপনদী **মালপ্রভার** প্রকল্প অনুসারে সেচকার্যের জন্য ব্যবস্থা হইতেছে।

গোদাবরী প্রকল্প—অন্ধ্রপ্রদেশে গোদাবরী নদীতে বাঁধ দিয়া **রামপদসাগর** প্রকল্প অনুসারে (৭ লক্ষ হেঃ জমিতে) সেচকার্যের ব্যবস্থা হইতেছে। মহারাষ্ট্রে এই নদীর উপর **জয়াকোয়াদি প্রকল্প** অনুসারে বাঁধ দিয়া (১১/২ লক্ষ হেঃ জমিতে) সেচকার্যের ব্যবস্থা হইতেছে।

পোচাম্পদ প্রকল্প—অন্ধ্রপ্রদেশে গোদাবরী নদীর উপর (৮১২ মি) বাঁধ তৈরী করিয়া (২ লক্ষ হেঃ জমিতে) সেচকার্য করা হইবে। (এখন ⅓ অংশে সেচকার্য হইতেছে।)

মাহী প্রকল্প—গুজরাটে মাহী নদীর উপর ওয়ানকবড়ি গ্রামের পাশে (প্রায় ৮০০ মিঃ দীর্ঘ) বাঁধ দিয়া (১½ লক্ষ হেঃ জমিতে) সেচকার্য হইতেছে। এই নদীতে কাদানার পাশে (১৩৩০ মি দীর্ঘ) বাঁধ তৈরী করিয়া আরও (এক লক্ষ হেঃ জমিতে) সেচকার্য হইবে।

ভাগুরা প্রকল্প—কর্ণাটক রাজ্যে ভাগুরা নদীর উপর বাঁধ দিয়া (এক লক্ষ হেঃ জমিতে) সেচকার্য হইতেছে।

ঘাটপ্রভা প্রকল্প—কর্ণাটক রাজ্যে ঘাটপ্রভা নদীর উপর ধূপতালে (২০০ মি দীর্ঘ) বাঁধের নির্মাণকার্য প্রায় শেষ। হিডকালে (৫২৭৫ মিঃ দীর্ঘ) বাঁধ তৈরী হইতেছে। এসকল বাঁধের সাহায্যে (এক লক্ষ হেঃ জমিতে) সেচকার্য হইবে।

পারাম্বিকুলম্-আলিয়ার প্রকল্প—আন্নামালাই পাহাড়ের **পারাম্বিকুলম্, নিরার** প্রভৃতি নদীতে এবং পাশের সমভূমির **আলিয়ার ও পালার** নদীতে বাঁধ দিয়া বিভিন্ন খালের সাহায্যে এখানকার ৮টি নদীকে যুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে তামিলনাড়ু ও কেরালা রাজ্যে সেচকার্য হইতেছে।

কুণ্ডা প্রকল্প—কাবেরীর উপনদী ভবানী। ইহার উপনদী কুণ্ডা। এই নদীতে নীলগিরি অঞ্চলে **এভালেন্স ও ইমারেল্ড** বাঁধ তৈরী করিয়া তামিলনাড়ুতে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হইতেছে।

পেরিয়ার প্রকল্প—কেরালাতে পেরিয়ার নদীর উপর আলোয়ের উত্তরে বাঁধ তৈরী করিয়া এই রাজ্যে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে।

মধ্যম ও ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থা—এদেশের বিভিন্ন অংশে বহু নদীতে ছোট ছোট বাঁধ দিয়া, কতক পুরানো খালের উন্নতিবিধান করিয়া এবং অসংখ্য পুকুর, খাল, বিল, কূপ প্রভৃতির সাহায্যে এদেশের প্রায় **অর্ধেক সেচজমিতে** জলসেচের ব্যবস্থা হয়। কাজেই সেচের মাধ্যমে কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে ইহাদের গুরুত্ব খুব বেশী। এসম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশে তিস্তা, মহানন্দা ও জলঢাকা প্রকল্প, দক্ষিণ অংশে নিম্ন দামোদর প্রকল্প, উত্তরপ্রদেশে স্টেট টিউবওয়েল ও হাইড্রোইলেকট্রিক গ্রিড স্কীম প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রধান কৃষিজ সম্পদ

কৃষিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কৃষিকার্য দ্বারা যে সকল ফসল উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে মানুষ নানা ভাবে ও নানা কাজে ব্যবহার করে। ইহাদের ব্যবহার সম্পর্কিত বিভাগগুলি নিম্নরূপ :—
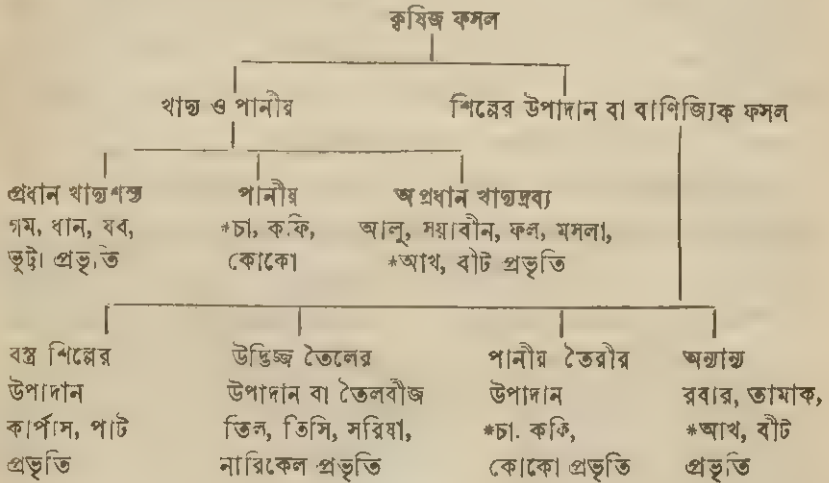
খাদ্যশস্য

মানুষের খাদ্যদ্রব্যসমূহ তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যসমূহ আমিষ জাতীয় (Proteins) খাদ্য। এগুলি মানুষের দেহ গঠনের ও পুষ্টিবিধানের জন্য প্রয়োজন। ধান, গম প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় (Carbo-hydrates) খাদ্য। আর ঘৃত, মাখন, চর্বি প্রভৃতি স্নেহজাতীয় (Fats) খাদ্য। শ্বেতসার ও স্নেহজাতীয় খাদ্য মানুষের কর্মশক্তির জন্য আবশ্যক। সুদূর অতীত হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানবসমাজের কর্মশক্তির প্রধান উৎস ধান, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য। সেজন্য ইহাদের গুরুত্ব অপরিসীম।

গম

ব্যবহার—প্রাগৈতিহাসিক কাল (প্রস্তরযুগ) হইতে মানুষ গমের চাষ করিয়া আসিতেছে। বর্তমানে এফ্রো-এশিয়ার বাহিরে ইহাই মানুষের প্রধান এবং এফ্রো-এশিয়াতে দ্বিতীয় খাদ্যশস্য। কতক গমের (Bread wheat) গুঁড়া (আটা, ময়দা, সুজি) দ্বারা পাউরুটি, বিস্কুট প্রভৃতি তৈরী হয়। অপর কতক গমের (Macaroni wheat) গুঁড়ার সহিত ডিম, চিনি প্রভৃতি মিশাইয়া তৈরী করা হয় ম্যাকারনি ও

* এগুলি খাদ্যদ্রব্য ও শিল্পের উপাদান—উভয় বিভাগের অন্তর্গত।

ভার্মিসেলি। গমের শ্বেতসার (Starch) দ্বারা তৈরী করা হয় গ্লুকোজ ও নানারকম আঠা। যুক্তরাষ্ট্র ও অপর কতক দেশে নিকৃষ্ট গম গৌণ খাদ্যদ্রব্য (Secondary food) বা পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গমের খড় দ্বারা টুপি, বসিবার আসন, কাগজ প্রভৃতি তৈরী হয়। কতক খড় পশুর খাদ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়।

চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা (Wheat Geography—natural and cultural)—গম চাষের উপযোগী প্রধান অবস্থাসমূহ প্রাকৃতিক (মৃত্তিকা ও জলবায়ু)। তবে এ সম্পর্কে মানবিক (অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক) বিষয়সমূহও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে ইহাদের বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

প্রাকৃতিক অবস্থা—(ক) **জলবায়ু**—গম প্রধানতঃ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল। ইহার চাষের সহিত জলবায়ুর সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। উত্তম ফসলের জন্য চাষের প্রথম অবস্থায় ১৩-১৫° সে এবং ফসল পাকিবার সময় ২১-২২° সে **উষ্ণতা** আবশ্যক। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের উষ্ণতর অংশে এবং উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে শরৎকালে বা শীতের প্রারম্ভে গমের বীজ বপন করা হয়। এরূপ গমকে **শরৎকালীন** বা **শীতকালীন গম** (Autumnal or Winter wheat) বলা হয়। পৃথিবীর ৭৫% গম এই জাতীয়। গ্রীষ্মকালের প্রথম ও মধ্য অংশে এই ফসল সংগ্রহ করা হয়। উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশে ফসল কাটা হয় জুন-আগস্ট মাসে, নেদারল্যাণ্ডস্ ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে কাটা হয় আগস্ট অক্টোবরে, দক্ষিণ গোলার্ধে নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী মাসে। আর ভারত ও মিশরে ফসল কাটা হয় মার্চ-মে মাসে। খাদ্য হিসাবে এরূপ শরৎকালীন গমই ভাল।

গম চাষের পক্ষে অধিক তুষারপাত অনিষ্টকর। সেজন্য নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের শীতলতর অংশে শীতকালীন গমের চাষ সম্ভবপর নহে। তাই তথায় বসন্তকালে বরফ গলিবার সঙ্গে সঙ্গে গমের চাষ হয়। ইহাকে **বসন্তকালীন গম** (Spring wheat) বলে। গ্রীষ্মকালের শেষভাগে এই ফসল কাটা হয়। গম চাষের জন্য প্রায় ৪ মাস (১১০ দিন) তুষারমুক্ত দিবস প্রয়োজন। সুমেরু বৃত্তের নিকটবর্তী অংশে (ক্যানাডা, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র প্রভৃতির উত্তর অংশে) গ্রীষ্মকালে দিবামান অনেক বড় থাকে বলিয়া তিন মাসেই (৯০ দিনে) গম পাকে।

গম চাষের জন্য ৫০-১০০ সে. মি. **বৃষ্টি** দরকার। প্রথম অবস্থায় উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টি হইলে এক-একটি বীজ হইতে বহু চারা জন্মে এবং ফসলের পরিমাণও বাড়ে। ইহার পর গমের শীষ বাহির হওয়ার সময় শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়া প্রয়োজন। পরে গমের দানার উপযুক্ত পুষ্টির জন্য কিছু বৃষ্টি এবং সর্বশেষে ফসল পাকিবার জন্য উজ্জ্বল সূর্যকিরণ

ও যথেষ্ট উষ্ণতা আবশ্যক। **নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি ও ভূমধ্যসাগরীয়** অঞ্চলের **জলবায়ু** গমের চাষের পক্ষে অনুকূল। সেজন্য এসকল স্থানে গম অধিক জন্মে।

(খ) **মৃত্তিকা**—গম চাষের পক্ষে সমভূমি ও সামান্য ঢালু অঞ্চল খুব সুবিধাজনক। স্টেপ অঞ্চলের উর্বর কৃষ্ণমৃত্তিকা (চার্নোজেম), হিউমাস সারমিশ্রিত দো-আঁশ মাটি ও হাল্কা কাদামাটি ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী।

(গ) **বীজ**—গমের বীজ সম্পর্কে গত কয়েক বৎসরের গবেষণার ফলে এত উন্নতি হইয়াছে যে এখন অনেক গমের বীজ হইতে আগেকার তুলনায় ৩।৪ গুণ চারা উৎপন্ন হয়। ফলে, ফসলও আগেকার তুলনায় অনেক বেশী জন্মে।

মানবিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা—গম চাষের জমি উত্তমরূপে কর্ষণ (চাষ), তথায় বীজ বপন, আগাছা নিড়ানো, ফসল কাটা প্রভৃতি কাজের জন্য প্রচুর দক্ষ কৃষক ও শ্রমিক প্রয়োজন। তবে আজকাল কৃষিকার্যে অধিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অতি দ্রুত চাষের কাজ সম্ভব। অথচ শ্রমিকের প্রয়োজন কম।

মানবসমাজের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতির ফলে গম চাষ সম্পর্কে আধুনিক **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি** অবলম্বন করাতে আগেকার তুলনায় অনেক পরিবর্তন ও উন্নতি হইতেছে। যেমন, অনেক জমিতে পটাস, ফস্‌ফেট এবং স্বাভাবিক ও কৃত্রিম নাইট্রোজেন-ঘটিত সার ব্যবহৃত হয়। কোথাও কোথাও (বিশেষতঃ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে) শস্যাবর্তন প্রথার প্রচলন আছে। তারপর স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হইলে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে ফসলের **উৎপাদন বৃদ্ধি** হয়। যেমন, ইটালিতে ভারতের দ্বিগুণ হারে, জাপানে তিন গুণ এবং উত্তরপশ্চিম ইউরোপ ও নিউ জীল্যাণ্ডে ৪-৫ গুণ হারে গম উৎপন্ন হয়। তাহাছাড়া তুষারপাত, জলাভাব, রোগ ও কীটের উপদ্রব-সহনশীল নানাপ্রকার গমেরও চাষ হইতেছে।

প্রধান উৎপাদন অঞ্চল—পৃথিবীর ৯০%-এর অধিক গম (Major belt) উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে (৩০-৫৫´ উঃ অঃ মধ্যে) জন্মে। মাত্র ২০% (Minor belt) উত্তর গোলার্ধের উপক্রান্তীয় অঞ্চলে ও দক্ষিণ গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে (২০-৪০° দঃ অঃ মধ্যে) উৎপন্ন হয়। নিম্নলিখিত স্থানগুলি গম চাষের প্রধান ক্ষেত্র। বর্তমানে (১৯৭৫ খ্রীঃ) ইহাদের গম উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরূপ :

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র	৭·৫ কোটি টন	ক্যানাডা	১·৭ কোটি টন
যুক্তরাষ্ট্র	৫·৮ „ „	ফ্রান্স	১·৫ „ „
চীন	৪·১ „ „	তুরস্ক	১·৫ „ „
ভারত	২·৮ „ „	অস্ট্রেলিয়া	১·১ „ „

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র—গম উৎপাদন সম্পর্কে এদেশের স্থান পৃথিবীতে **প্রথম**। ১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ এদেশে ৯·৫ কোটি টন গম (পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ২৭%) এবং ১৯৭৫ খ্রীঃ ৭·৫ কোটি টন (২২%) উৎপন্ন হইয়াছে। এদেশের অধিকাংশ গম জন্মে দেশের দক্ষিণ অংশে। তাহার প্রধান কেন্দ্র **ইউক্রেনের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল**; ইহা "ইউরোপের শস্য ভাণ্ডার"। এখানে **শীতকালীন গম** অধিক জন্মে। আর ডন নদীর পূর্বদিক হইতে উত্তর ও উত্তরপূর্বে **সাইবেরিয়ার** বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জন্মে **বসন্তকালীন গম**। এদেশের মোট গম উৎপাদনের অঞ্চল পৃথিবীতে বৃহত্তম। তাহা পূর্ব-পশ্চিমে ৪,৮০০ কি. মি. ও উত্তর-দক্ষিণে ৬৪০ কি. মি. বিস্তৃত। এদেশ হইতে যথেষ্ট গম কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী ওডেসা, খারসন প্রভৃতি বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি হয়।

যুক্তরাষ্ট্র—এদেশের গম উৎপাদনের পরিমাণ বর্তমানে (১৯৭৫ খ্রীঃ) পৃথিবীতে **দ্বিতীয়** (৫·৮ কোটি টন—পৃথিবীর ১৬·৫%)। পূর্বে এদেশের স্থান ছিল পৃথিবীতে **প্রথম**। এদেশের **গম বলয়** দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ হইতে উত্তরপশ্চিমে বিস্তৃত। **মধ্যভাগের** বিস্তীর্ণ অংশে নেব্রাস্কা, কান্সাস, ওক্লাহোমা, ইলিয়ন, টেক্সাস, ওহায়ো, ইণ্ডিয়ানা প্রভৃতি স্টেটে **শীতকালীন গম** এবং **উত্তরপশ্চিম অংশে** উত্তর ও দক্ষিণ

ড্যাকোটা, মিনেসোটা ও মণ্টানা স্টেটে **বসন্তকালীন গম** জন্মে। রেড নদীর অববাহিকাতে গম উৎপাদনের পরিমাণ এত অধিক যে এই অঞ্চলকে "পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি" (Bread basket of the world) বলা হয়। মিনিয়াপলিস, ডুলুথ, শিকাগো ও বাফেলো এদেশের গম সংগ্রহ ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। বর্তমানে (১৯৭৫ খ্রীঃ) এদেশের গম **রপ্তানির** পরিমাণ পৃথিবীতে **প্রথম** (এখানকার মোট উৎপাদনের ৩৩%)। তাহা প্রধানতঃ নিউ ইয়র্ক বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি হয়।

চীন—গম উৎপাদন সম্পর্কে এদেশের স্থান পৃথিবীতে **তৃতীয়**, এশিয়াতে প্রথম। (১৯৭৫ খ্রীঃ ৪·১ কোটি টন, অর্থাৎ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ১১%।) এদেশের **উত্তর অংশে** হোয়াংহো-অববাহিকার বিস্তীর্ণ সমভূমি, পাশে লোয়েস মালভূমি ও মাঞ্চুরিয়াতে **বসন্তকালীন গম** এবং দেশের **মধ্যভাগে** ইয়াংসি কিয়াং-অববাহিকা ও জেকোয়ানের রেড্ বেসিন অঞ্চলে **শীতকালীন গম** জন্মে।

ভারত—গম উৎপাদন সম্পর্কে এদেশের স্থান পৃথিবীতে **চতুর্থ**, এশিয়াতে দ্বিতীয়। (১৯৭৫ খ্রীঃ ২·৮ কোটি টন, অর্থাৎ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৮%।) এদেশে সেচ ব্যবস্থার ও চাষের পদ্ধতির ক্রমশঃ উন্নতির ফলে গমের চাষ ও **উৎপাদন** ক্রমে ক্রমে **বৃদ্ধি** হইতেছে। উত্তর ভারতে পঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিমে গুজরাট হইতে পূর্ব দিকে বিহার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অংশে এদেশের অধিকাংশ গম জন্মে। এসকল স্থানে শরৎ বা **শীতকালীন গমের** চাষ হয়।

ক্যানাডা—এদেশের গম উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **পঞ্চম** (১৯৭৫ খ্রীঃ ১·৭ কোটি টন—পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৫%)। এখানকার অন্টেরিও, ম্যানিটোবা, সাস্কাচুয়ান ও এলবার্টা প্রদেশে **বসন্তকালীন** গম জন্মে। এদেশের গম **রপ্তানির** পরিমাণ এখন (১৯৭৫ খ্রীঃ) পৃথিবীতে **দ্বিতীয়**। এদেশে উৎপন্ন গমের **অধিকাংশ** (৬৬%) **রপ্তানি** হয়। উইনিপেগ কেন্দ্র হইতে মন্টিল, হ্যালিফ্যাক্স, ভ্যাঙ্কুবার প্রভৃতি বন্দরের মাধ্যমে গম অধিক রপ্তানি হয়।

ফ্রান্স—পৃথিবীর দেশসমূহের মধ্যে এখানকার গম উৎপাদনের পরিমাণ এখন **ষষ্ঠ**। (১৯৭৫ খ্রীঃ এদেশে ১·৫ কোটি টন গম উৎপন্ন হইয়াছে।) ইউরোপের মধ্যে এদেশের স্থান **দ্বিতীয়** (সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের পরে)। এখানে একর প্রতি গম উৎপাদনের হার পৃথিবীতে **তৃতীয়**। এদেশে **শীতকালীন গমের** চাষ হয়। এদেশের পশ্চিম অংশে, মধ্যভাগে প্যারিস্ অববাহিকাতে ও উত্তরপূর্ব অংশে অধিক গম জন্মে।

ইউরোপের অন্যান্য দেশ—এখানকার দেশসমূহের মধ্যে ইটালির স্থান তৃতীয়। এখানে পো নদীর অববাহিকাতে গম অধিক জন্মে। তাহাছাড়া রোমানিয়া, পশ্চিম জার্মানী, স্পেন, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশেও যথেষ্ট গমের চাষ হয়। ইহাদের মধ্যে একর প্রতি **উৎপাদনের হার** হিসাবে **ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ** পৃথিবীতে **প্রথম, পশ্চিম জার্মানী দ্বিতীয়**। অন্যান্য দেশেও গম উৎপাদনের হার খুব উঁচু।

তুরস্ক—এদেশে এখন (১৯৭৫ খ্রীঃ) গম উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ফ্রান্সের সমান (১·৫ কোটি টন)। এখানকার ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু এরূপ গম চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

অস্ট্রেলিয়া—গম উৎপাদন সম্পর্কে এদেশের স্থান পৃথিবীতে **অষ্টম** (১৯৭৫ খ্রীঃ ১'১ কোটি টন), **দক্ষিণ গোলার্ধে প্রথম**। এখানে গম উৎপাদনের হারও অধিক। এদেশের পূর্ব অংশে ভিক্টোরিয়া ও নিউ সাউথ ওয়েলস্ প্রদেশে মারে-ডার্লিং নদীর অববাহিকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার **ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে** গমের চাষ ক্রমশঃ **বাড়িতেছে**। দক্ষিণ ও উত্তর অংশে এবং মধ্যভাগে গম উৎপাদনের পরিমাণ কম। এখানে গমের স্থানীয় চাহিদা কম, কিন্তু এখানে গম উৎপন্ন হয় **উত্তর গোলার্ধে** গম চাষের **ছয় মাস পরে**। তাই উত্তর গোলার্ধে এখানকার গমের চাহিদা প্রচুর এবং ইহা সিড্‌নি ও পার্থের মারফৎ অধিক রপ্তানি হয়। এদেশে উৎপন্ন গমের **অধিকাংশই রপ্তানি** হয়। এদেশের গম রপ্তানির পরিমাণ পৃথিবীতে **তৃতীয়** (১৯৭৫ খ্রীঃ ১'১ কোটি টন।)

দক্ষিণ আমেরিকা—এই মহাদেশে পৃথিবীর মাত্র ৫-৭% গম জন্মে। তন্মধ্যে **আর্জেন্টিনা** ও উরুগুয়ের নাতিশীতোষ্ণ পাম্পাস তৃণভূমি এবং চিলির মধ্যভাগে ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে প্রচুর গম জন্মে। আর্জেন্টিনার গম উৎপাদনের পরিমাণ এই মহাদেশে **প্রথম** এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দ্বিতীয় (অস্ট্রেলিয়ার পরে)। অস্ট্রেলিয়ার মত এখানকার দেশসমূহের গমেরও উত্তর গোলার্ধে চাহিদা প্রচুর। গম **রপ্তানি** সম্পর্কে এদেশের স্থান পৃথিবীতে পঞ্চম। বুয়েনস্ আইরেসের মাধ্যমে অধিকাংশ গম রপ্তানি হয়।

আফ্রিকা—দক্ষিণ আফ্রিকা গণতন্ত্র ও উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গম জন্মে। মিশর দেশেও কিছু গম জন্মে। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র এই মহাদেশে **বৎসরে দুই বার** (মিশরে গম চাষের ছয় মাস পরে দক্ষিণ আফ্রিকাতে) বাজারে **নূতন** ফসলের **গম** পাওয়া যায়। তবে তাহার পরিমাণ বেশী নহে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—গমের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের **পরিমাণ** খুব **বেশী** এবং **বাণিজ্যের অঞ্চল বহুদূর বিস্তৃত**। যুক্তরাষ্ট্র হইতে গম রপ্তানি হয় ইউরোপ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে, আর আর্জেন্টিনা এবং অস্ট্রেলিয়া হইতে গম রপ্তানি হয় ইউরোপে। গম রপ্তানি সম্পর্কে **যুক্তরাষ্ট্রের** স্থান পৃথিবীতে **প্রথম** (১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে ২'৬ কোটি টন ; ১৯৭৪ খ্রীঃ ৩'৭ কোটি টন)। এদেশের **নিউইয়র্ক** সমগ্র পৃথিবীর **সর্বপ্রধান গম রপ্তানি বন্দর**। শিকাগো, বোস্টন প্রভৃতি বন্দর হইতেও প্রচুর গম রপ্তানি হয়। **ক্যানাডা** গম রপ্তানিতে **দ্বিতীয়** (১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ১'১ কোটি টন)। দেশের উৎপন্ন গমের প্রায় ৬৬% রপ্তানি হয়। এদেশের প্রধান রপ্তানি বন্দর মন্ট্রিল, হ্যালিফ্যাক্স ও ভ্যাঙ্কুবর। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের গম রপ্তানি হিসাবে **অস্ট্রেলিয়া তৃতীয়** (ক্যানাডার প্রায় সমান)। তারপর ফ্রান্সের স্থান। ইহার পর আর্জেন্টিনা। ইহাদের

মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ও আর্জেন্টিনার উৎপন্ন গমের বেশীর ভাগই রপ্তানি হয়। আর্জেন্টিনার বুয়েনস্ আইরেস ও অস্ট্রেলিয়ার সিড্‌নি, পার্থ প্রভৃতি প্রধান রপ্তানি-বন্দর। এই কয় দেশেরই লোকবসতি কম। গম সর্বাপেক্ষা অধিক আমদানি করে ইউরোপ, তারপর এশিয়ার বিভিন্ন দেশ। দেশ হিসাবে ইউরোপের ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, এশিয়ার জাপান, বাংলাদেশ, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ধান ও চাল

প্রধান ব্যবহার—ধান পৃথিবীর প্রাচীনতম কৃষিজ সম্পদের মধ্যে অন্যতম। খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দেও ইহার চাষ হইত এবং সম্ভবতঃ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মৌসুমী অঞ্চলই ইহার আদি উৎপাদন ভূমি। বর্তমানে ইহা পৃথিবীর অর্ধেকের অধিক লোকের প্রধান খাদ্যশস্য। সমপরিমাণ জমিতে অপর যে কোন খাদ্যশস্যের তুলনায় ধান অধিক জন্মে। তাহাছাড়া ধান (Paddy) হইতে উৎপন্ন চাল (Rice) সুস্বাদু ও উপকারী (Palatable and nutritious)। সমপরিমাণ গমের তুলনায় চালের ক্যালোরির পরিমাণ বেশী এবং গমের রুটির চেয়ে ভাত অধিক সহজপাচ্য। ধান দিয়া সিদ্ধ ও আতপ—এই দুই রকম চাল এবং খই, চিড়া, দোভাজা প্রভৃতি তৈরী হয়। আর চাল দিয়া ভাত, মুড়ি, মুড়কি প্রভৃতি তৈরী হয়। পাশ্চাত্য দেশেও উৎকৃষ্ট খাদ্য হিসাবে (Delicious dishes) এবং উৎকৃষ্ট মদ, পুডিং প্রভৃতি তৈরীর জন্য চাল ব্যবহৃত হয়। ধান হইতে উৎপন্ন শ্বেতসার (Starch) কাপড় ধোলাই ও অন্যান্য নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। উষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলের জলবায়ু ও অনেকপ্রকার অসংখ্য কীটের উৎপাত হইতে ধানের ভিতরের সার পদার্থ বা চালকে রক্ষা করার জন্য ইহার উপরে একটি শক্ত খোসা আছে। চাল তৈরীর পর ধানের এই খোসা অবশিষ্ট থাকে। তাহা দ্বারা বিছানার গদি তৈরী হয়। তাহাছাড়া খোসাকে সিমেন্টের সহিত মিশাইয়া মিলেনা ঘরের দেওয়ালে পুরু প্রলেপ দিলে শব্দ নিয়ন্ত্রণের সুবিধা হয়। ধানের খড় বা বিচালি গরু, মহিষের প্রধান খাদ্য। ইহা দ্বারা জুতার সোল, মাথার টুপি প্রভৃতিও তৈরী হয়। কুঁড়ে ঘরের ছাউনির জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

ধানের শ্রেণীবিভাগ (Classification)—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অন্ততঃ ৪০০-৫০০ প্রকার ধান জন্মে। তন্মধ্যে কতকের চাল অত্যন্ত সরু ও সুগন্ধযুক্ত, কতকের চাল মাঝারি রকমের এবং কতকের চাল মোটা। ধানের উৎপাদন অঞ্চল, চাষের সময় প্রভৃতি বিষয়েও পার্থক্য বিস্তর। এরূপ নানা বিষয়ের পার্থক্য অনুসারে ধান বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত।

অস্ট্রেলিয়া—গম উৎপাদন সম্পর্কে এদেশের স্থান পৃথিবীতে **অষ্টম** (১৯৭৫ খ্রীঃ ১'১ কোটি টন), **দক্ষিণ গোলার্ধে প্রথম**। এখানে গম উৎপাদনের হারও অধিক। এদেশের পূর্ব অংশে ভিক্টোরিয়া ও নিউ সাউথ ওয়েলস্ প্রদেশে মারে-ডার্লিং নদীর অববাহিকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার **ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে** গমের চাষ ক্রমশঃ **বাড়িতেছে**। দক্ষিণ ও উত্তর অংশে এবং মধ্যভাগে গম উৎপাদনের পরিমাণ কম। এখানে গমের স্থানীয় চাহিদা কম, কিন্তু এখানে গম উৎপন্ন হয় **উত্তর গোলার্ধে** গম চাষের **ছয় মাস পরে**। তাই উত্তর গোলার্ধে এখানকার গমের চাহিদা প্রচুর এবং ইহা সিড্‌নি ও পার্থের মারফৎ অধিক রপ্তানি হয়। এদেশে উৎপন্ন গমের **অধিকাংশই রপ্তানি** হয়। এদেশের গম রপ্তানির পরিমাণ পৃথিবীতে **তৃতীয়** (১৯৭৫ খ্রীঃ ১'১ কোটি টন।)

দক্ষিণ আমেরিকা—এই মহাদেশে পৃথিবীর মাত্র ৫-৭% গম জন্মে। তন্মধ্যে **আর্জেন্টিনা** ও উরুগুয়ের নাতিশীতোষ্ণ পাম্পাস তৃণভূমি এবং চিলির মধ্যভাগে ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে প্রচুর গম জন্মে। আর্জেন্টিনার গম উৎপাদনের পরিমাণ এই মহাদেশে **প্রথম** এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দ্বিতীয় (অস্ট্রেলিয়ার পরে)। অস্ট্রেলিয়ার মত এখানকার দেশসমূহের গমেরও উত্তর গোলার্ধে চাহিদা প্রচুর। গম **রপ্তানি** সম্পর্কে এদেশের স্থান পৃথিবীতে পঞ্চম। বুয়েনস্ আইরেসের মাধ্যমে অধিকাংশ গম রপ্তানি হয়।

আফ্রিকা—দক্ষিণ আফ্রিকা গণতন্ত্র ও উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গম জন্মে। মিশর দেশেও কিছু গম জন্মে। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র এই মহাদেশে **বৎসরে দুই বার** (মিশরে গম চাষের ছয় মাস পরে দক্ষিণ আফ্রিকাতে) বাজারে **নূতন** স্থানীয় **গম** পাওয়া যায়। তবে তাহার পরিমাণ বেশী নহে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—গমের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের **পরিমাণ** খুব **বেশী** এবং **বাণিজ্যের অঞ্চল বহুদূর বিস্তৃত**। যুক্তরাষ্ট্র হইতে গম রপ্তানি হয় ইউরোপ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে, আর আর্জেন্টিনা এবং অস্ট্রেলিয়া হইতে গম রপ্তানি হয় ইউরোপে। গম রপ্তানি সম্পর্কে **যুক্তরাষ্ট্রের** স্থান পৃথিবীতে **প্রথম** (১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে ২'৬ কোটি টন ; ১৯৭৪ খ্রীঃ ৩'৭ কোটি টন)। এদেশের **নিউইয়র্ক** সমগ্র পৃথিবীর **সর্বপ্রধান গম রপ্তানি বন্দর**। শিকাগো, বোস্টন প্রভৃতি বন্দর হইতেও প্রচুর গম রপ্তানি হয়। **ক্যানাডা** গম রপ্তানিতে **দ্বিতীয়** (১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ১'১ কোটি টন)। দেশের উৎপন্ন গমের প্রায় ৬৬% রপ্তানি হয়। এদেশের প্রধান রপ্তানি বন্দর মন্ট্রিল, হ্যালিফ্যাক্স ও ভ্যাঙ্কুবর। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের গম রপ্তানি হিসাবে **অস্ট্রেলিয়া তৃতীয়** (ক্যানাডার প্রায় সমান)। তারপর ফ্রান্সের স্থান। ইহার পর আর্জেন্টিনা। ইহাদের

মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ও আর্জেন্টিনার উৎপন্ন গমের বেশীর ভাগই রপ্তানি হয়। আর্জেন্টিনার বুয়েনস্ আইরেস ও অস্ট্রেলিয়ার সিড্‌নি, পার্থ প্রভৃতি প্রধান রপ্তানি-বন্দর। এই কয় দেশেরই লোকবসতি কম। গম সর্বাপেক্ষা অধিক **আমদানি** করে ইউরোপ, তারপর এশিয়ার বিভিন্ন দেশ। দেশ হিসাবে ইউরোপের ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, পোল্যাণ্ড, চেকো-শ্লো'ভাকিয়া, এশিয়ার জাপান, বাংলাদেশ, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ধান ও চাল

প্রধান ব্যবহার—ধান পৃথিবীর প্রাচীনতম কৃষিজ সম্পদের মধ্যে অন্যতম। খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দেও ইহার চাষ হইত এবং সম্ভবতঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মৌসুমী অঞ্চলই ইহার আদি উৎপাদন ভূমি। বর্তমানে ইহা পৃথিবীর অর্ধেকের অধিক লোকের প্রধান খাদ্যশস্য। সমপরিমাণ জমিতে অপর যে-কোন খাদ্যশস্যের তুলনায় ধান অধিক জন্মে। তাহাছাড়া ধান (Paddy) হইতে উৎপন্ন চাল (Rice) সুখাদ্য ও উপকারী (Palatable and nutritious)। সমপরিমাণ গমের তুলনায় চালের ক্যালোরির পরিমাণ বেশী এবং গমের রুটির চেয়ে ভাত অধিক সহজপাচ্য। ধান দিয়া সিদ্ধ ও আতপ—এই দুই রকম চাল এবং খই, চিড়া, দোভাজা প্রভৃতি তৈরী হয়। আর চাল দিয়া ভাত, মুড়ি, মুড়কি প্রভৃতি তৈরী হয়। পাশ্চাত্য দেশেও উৎকৃষ্ট খাদ্য হিসাবে (Delicious dishes) এবং উৎকৃষ্ট মদ, পুডিং প্রভৃতি তৈরীর জন্য চাল ব্যবহৃত হয়। ধান হইতে উৎপন্ন শ্বেতসার (Starch) কাপড় ধোলাই ও অন্যান্য নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। উষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলের জলবায়ু ও এখানকার অসংখ্য কীটের উৎপাত হইতে ধানের ভিতরের সার পদার্থ বা চালকে রক্ষা করার জন্য ইহার উপরে একটি শক্ত খোসা আছে। চাল তৈরীর পর ধানের এই খোসা অবশিষ্ট থাকে। তাহা দ্বারা বিছানার গদি তৈরী হয়। তাহাছাড়া খোসাকে সিমেন্টের সহিত মিশাইয়া সিনেমা ঘরের দেওয়ালে পুরু প্রলেপ দিলে শব্দ নিয়ন্ত্রণের সুবিধা হয়। ধানের খড় বা বিচালি গরু, মহিষের প্রধান খাদ্য। ইহা দ্বারা জুতার সোল, মাথার টুপি প্রভৃতিও তৈরী হয়। কুঁড়ে ঘরের ছাউনির জন্যও ইহা ব্যবহৃত হয়।

ধানের শ্রেণীবিভাগ (Classification)—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অন্ততঃ ৪০০-৫০০ প্রকার ধান জন্মে। তন্মধ্যে কতকের চাল অত্যন্ত সরু ও সুগন্ধযুক্ত, কতকের চাল মাঝারি রকমের এবং কতকের চাল মোটা। ধানের উৎপাদন অঞ্চল, চাষের সময় প্রভৃতি বিষয়েও পার্থক্য বিস্তর। এরূপ নানা বিষয়ের পার্থক্য অনুসারে ধান বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত।

(ক) **উৎপাদন-অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির পার্থক্য** অনুসারে ধান দুই ভাগে বিভক্ত :—(১) **নিম্নভূমি বা জলাভূমির ধান** (Low land or swamp rice)—**পৃথিবীর ৯৬% ধান** এই শ্রেণীর অন্তর্গত, অর্থাৎ নিম্নভূমিতে জন্মে। এরূপ জমিতে ধান চাষের জন্য প্রচুর জল প্রয়োজন। সেজন্য অনেক ক্ষেত্রে জমির চারি পাশে উঁচু আল তৈরী করিয়া মধ্যভাগে বৃষ্টির জল আটকাইয়া রাখা হয়। বৃষ্টি কম হইলে সেচকার্যের ব্যবস্থা করা হয়। (২) **পার্বত্য বা উচ্চভূমির ধান** (Upland or hill rice)—অতি সামান্য ধান উচ্চভূমিতে জন্মে। সাধারণতঃ মৌসুমী অঞ্চলের বিভিন্ন পাহাড়, পর্বতের গায়ে সরু সরু ধাপে এজাতীয় ধানের চাষ (Terrace cultivation) হয়। এক্ষেত্রেও জমিতে জল সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ধাপের পাশে উঁচু আল তৈরী করা হয়। পাহাড়ের কতক অংশে জুম চাষের পদ্ধতি প্রচলিত। এখানেও কিছু ধান জন্মে।

(খ) **উৎপাদন অঞ্চলের অবস্থিতি সম্পর্কে পার্থক্য** অনুসারে ধান দুই ভাগে বিভক্ত : -(১) পূর্ব এশিয়ার অপেক্ষাকৃত **উচ্চ অক্ষাংশে** (High latitudes) অবস্থিত জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান (ফরমোসা) প্রভৃতি দেশে জাপোনিকা (Japonica type) ধানের চাষ হয়। আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার **নিম্ন অক্ষাংশে** (Low latitudes) অবস্থিত ভারত, ব্রহ্মদেশ, থাইলাণ্ড, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে ইণ্ডিকা (Indica type) ধানের চাষ হয়।

(গ) **ধান চাষের সময়ের পার্থক্য** অনুসারে ধান তিন ভাগে বিভক্ত :—(১) **আমন বা হৈমন্তিক ধান**—সাধারণতঃ বর্ষাকালে এরূপ ধানের চাষ হয় এবং হেমন্তকালে বা কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ফসল পাকে। তাই ইহাকে অঘ্রানী বা আঘনী ফসল, আসামে বাও বা সালি ধান এবং মহীশূরে খারিফ বা কার্তিকী ধান বলে। এরূপ ধানের **পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক**। (২) **আশু বা আউস ধান**—চৈত্র-বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ধানের চাষ হয় এবং বর্ষার শেষে ভাদ্র মাসে ফসল পাকে। ইহা আমন ধানের তুলনায় অল্প সময়ে জন্মে। সেজন্য ইহা আশু (তাড়াতাড়ি জন্মে) ধান। ধান পাকার সময় (ভাদ্র মাস) অনুসারে ইহাকে ভাদুই ধান, আসামে আহু ধান বলে। (৩) **বোরো ধান**—নীচু ও সামান্য জলমগ্ন জমিতে শীতকালের শেষে এরূপ ধানের চাষ হয়, আর গ্রীষ্মকালের শেষভাগে (অধিক বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার পূর্বে) ফসল কাটা হয়।

(ঘ) **ধান চাষের পদ্ধতি অনুসারে পার্থক্য**—নিম্নলিখিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে নানা স্থানে ধানের চাষ হয়। (১) **রোপন পদ্ধতিতে** (Plantation method) **চাষ**—এই পদ্ধতিতে সাধারণতঃ **আমন ধানের** চাষ হয়। এরূপ চাষের জন্য

প্রথমে কতক ছোট জমিতে (Nursery) প্রচুর ধানের বীজ ছড়াইয়া দিয়া চারা তৈরী করা হয়। এদিকে অন্যান্য জমি ধীরে ধীরে কর্ষণ (চাষ) করিয়া ধানের চারা পুতিবার জন্য প্রস্তুত করা হয়। তারপর চারাগুলি কয়েক সেন্টিমিটার পরিমাণ লম্বা হইলে এবং ধান চাষের জমিগুলিতে প্রয়োজন মত জল জমিলে চারাগুলিকে আগেকার জমি হইতে তুলিয়া নূতন জমিতে সারি করিয়া **রোপন** করা হয়। জাপানে ধান চাষের জমিতে চারা রোপন করিবার আগে প্রচুর পরিমাণে কৃষি-সার দিয়া চারাগুলিকে নির্দিষ্ট মাপের ফাঁক দিয়া রোপন করা হয়। ইহাই **জাপানী পদ্ধতির** অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রোপন পদ্ধতিতে ধান চাষের জন্য প্রচুর কৃষক ও শ্রমিক প্রয়োজন। মৌসুমী অঞ্চলে এ বিষয়ে কোন অসুবিধা হয় না। বস্তুতঃ এরূপ চাষের সময় কিছু লোক অন্যান্য কাজ হইতে ছুটি নিয়াও সাময়িকভাবে চারা রোপনের কাজ করেন। (২) **বপন পদ্ধতিতে** (Broadcast method) **চাষ**—এই পদ্ধতিতে সাধারণতঃ **আউস ধানের** চাষ হয়। এই রূপ চাষের জন্য জমি কর্ষণ (চাষ) করিবার পর তথায় যাহাতে একটু ফাঁকে ফাঁকে ধানের বীজ পড়ে সেইভাবে হিসাব করিয়া বীজ সাবধানে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। এই জমিতেই বীজ হইতে চারা হয় এবং এখানে গাছ বড় হইয়া ধান পাকে। কাজেই বীজ ছড়ানোর কাজটি যত্নেরসহিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে রোপন পদ্ধতির তুলনায় অনেক কম শ্রমিক প্রয়োজন। (৩) **বীজ পুতিবার পদ্ধতিতে** (Drilling method) **চাষ**—কতক স্থানে (প্রধানতঃ এদেশের তামিলনাড়ু অঞ্চলে) ধান চাষের জমিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফাঁক দিয়া একটি একটি করিয়া বীজ পুতিয়া ধান চাষ করা হয়। ইহা কতক পরিমাণে রোপন পদ্ধতির অনুরূপ। (৪) **জুম** (Jhooming method) **চাষ**—পাহাড় পর্বতের গায়ে কতক অংশের বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তথাকার মাটি একটু গভীর ভাবে খুঁড়িয়া তথায় ধান ও অন্যান্য কতক ফসলের বীজ একসঙ্গে বপন করা হয়। এই জমিতে দুই একবার চাষের পর কয়েক বৎসর জমির আর কোন যত্ন করা হয় না বা তথায় চাষ করা হয় না। তাই এপ্রকার চাষ সন্তোষজনক নহে। তাহা অপেক্ষা পাহাড়ের গায়ে ধাপ তৈরী করিয়া **ধাপে ধাপে চাষের** ব্যবস্থা করিলে (Terrace cultivation) তাহা অনেক বেশী লাভজনক হয়।

ধান চাষের ভৌগোলিক অবস্থা—ধান চাষের সাফল্যের সহিত প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তন্মধ্যে প্রাকৃতিক বিষয়ের (মৃত্তিকা ও জলবায়ুর) গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক।

প্রাকৃতিক অবস্থা—(ক) **মৃত্তিকা**—যে জায়গার মৃত্তিকার উপরের স্তরে উর্বর পলিমাটি ও তাহার নীচে জল ধরিয়া রাখার উপযোগী এঁটেল বা কাদা মাটি (Clay or

clayey soil) থাকে, তাহা ধান চাষের পক্ষে সর্বোত্তম। এই জন্য **নদ-নদীর উপত্যকা ও বদ্বীপ অঞ্চল** ধান চাষের পক্ষে প্রশস্ত। তাহাছাড়া পাহাড়ের গায়ে যেখানে ধাপে ধাপে ধান চাষ হয়, তাহাদের অনেক অংশের মৃত্তিকা দো-আঁশ জাতীয়। বোরো ধান চাষের নীচু জমিতে কাদার পরিমাণ বেশী।

(খ) **জলবায়ু**—ধান চাষের জন্য বীজ বোনা হইতে ফসল কাটা পর্যন্ত সকল অবস্থাতেই ২৫ ২৭° সে উষ্ণতা প্রয়োজন। ২০° সে এর কম উষ্ণতাতে ধানের শীষ বাহির হয় না। তাই **উষ্ণ ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের** বাহিরে ধান প্রায় জন্মে না। ২০০ সেমি বৃষ্টি ধান চাষের পক্ষে খুব উপকারী। তবে ১০০-১২৫ সেমি বৃষ্টিতেও জলসেচের সাহায্যে ধান চাষ করা হয়। তাহাছাড়া বীজ বপন বা চারা রোপনের সময় হইতে ধানের শীষ বাহির হওয়ার সময় পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টি এবং জমিতে চাষের প্রয়োজনমত জল জমিয়া থাকা আবশ্যক। আর ধান পাকিবার ও ফসল কাটার সময় দরকার শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়া।

(গ) **বীজ**—ধান চাষের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বহুদিন যাবৎ আমাদের দেশে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশে ধানের বীজের উন্নতির জন্য গবেষণা হইতেছে। ইহার ফলে তাইচুং, ইরি (IRRI) প্রভৃতি নূতন ধরনের বীজ (HYV or High yielding variety) আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের সাহায্যে মিনিকিট প্রোগ্রাম অনুসারে বীজ কিছু আগে বপন করিয়া চাষের ফলে অধিক ধান উৎপন্ন হয়।

অন্যান্য অবস্থা -ধান চাষের উদ্দেশ্যে জমি উত্তমরূপে চাষ করা, তথায় বীজ বপন বা চারা রোপন, পরে আগাছা নিড়ানো, ফসল কাটা প্রভৃতি কাজে প্রচুর **দক্ষ শ্রমিক** প্রয়োজন। মৌসুমী অঞ্চলে শ্রমিক সুলভ এবং তাহারা এই কাজে যথেষ্ট পটু। এখানে ধান চাষের উন্নতির ইহাও একটি প্রধান কারণ। তাহাছাড়া নিজ নিজ দেশকে খাদ্যদ্রব্যে স্বাবলম্বী বা স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যেও বিভিন্ন দেশের সরকার ধানের চাষ বৃদ্ধির জন্য নানা ভাবে সাহায্য করে। তারপর উৎপাদনের হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জমিতে কৃষিসার ব্যবহার এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের ফলেও যথেষ্ট উপকার হয়। উপরিলিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বনের ফলে **জাপানে ধান উৎপাদনের হার পৃথিবীতে প্রথম**।

প্রধান উৎপাদন অঞ্চল—নিম্নলিখিত দেশগুলিতে পৃথিবীর অধিকাংশ ধান জন্মে। ইহাদের বর্তমান (১৯৭৫) উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরূপ:

চীন	১১·৯ কোটি টন	থাইল্যাণ্ড	১·৫ কোটি টন
ভারত	৭·[illegible] ” ”	ব্রহ্মদেশ	০·৯ ” ”

ইন্দোনেশিয়া	২·৩ কোটি টন	ব্রেজিল	০·৮ কোটি টন
বাংলাদেশ	১·৯ " "	ভিয়েটনাম	০·৭ " "
জাপান	১·৭ " "	যুক্তরাষ্ট্র	০·৬ " "

এশিয়া মহাদেশের মৌসুমী অঞ্চলে **পৃথিবীর অধিকাংশ** (৯০-৯৫%) ধান জন্মে। তন্মধ্যে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, জাপান, থাইল্যাণ্ড ও ব্রহ্মদেশ—এই সাতটি দেশে জন্মে ৮৫-৯০%।
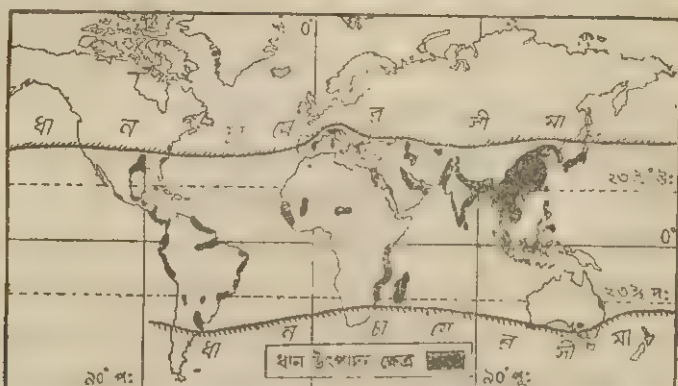
চীন—ধান চাষ সম্পর্কে এদেশের স্থান **পৃথিবীতে প্রথম** (১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ১২ কোটি টন—পৃথিবীর ৩৫%)। এদেশের মধ্যভাগে **ইয়াংসি কিয়াং** উপত্যকায় ও দক্ষিণে **সিকিয়াং উপত্যকার** জলবায়ু ও মৃত্তিকা ধান চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এখানে শ্রমিকও সুলভ। এদেশে বিভিন্ন পাহাড়ের গায়েও ধাপে ধাপে প্রচুর ধান চাষ হয়।

ভারত—ধান চাষ সম্পর্কে এদেশের স্থান পৃথিবীতে **দ্বিতীয়** (১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ৭ কোটি টন—পৃথিবীর ২০% এর বেশী)। এদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে আসাম, নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুর হইতে উত্তর-পশ্চিমে জম্মু ও কাশ্মীর পর্যন্ত ও দক্ষিণে কেরালা পর্যন্ত সমুদয় রাজ্যে (রাজস্থানের মরু অঞ্চল ব্যতীত) প্রচুর ধান জন্মে। তবে উত্তর-পূর্ব অংশেই বেশী।

ইন্দোনেশিয়া—এদেশে ধান উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **তৃতীয়** (১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ২·৩ কোটি টন—পৃথিবীর ৭%)। এদেশের অধিকাংশ ধান জন্মে জাভা বা যবদ্বীপে।

বাংলাদেশ—এদেশের ধান চাষের পরিমাণ পৃথিবীতে **চতুর্থ** (১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ২ কোটি টন—পৃথিবীর ৬%)। এদেশের উর্বর পলিগঠিত সমভূমি ও মৌসুমী জলবায়ু ইহার চাষের পক্ষে অনুকূল। এদেশের প্রায় সর্বত্র ধান জন্মে।

জাপান—ধান উৎপাদন সম্পর্কে বর্তমানে (১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) এদেশের স্থান পৃথিবীতে **পঞ্চম** (১৭ কোটি টন—পৃথিবীর ৫%)। এদেশের মাত্র ১৫% ভূমি সমতল। তথাপি এখানে প্রচুর রাসায়নিক সার ব্যবহার ও চাষের উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে এদেশে ধান **উৎপাদনের হার** পৃথিবীতে **প্রথম**। দেশের দক্ষিণ অর্ধাংশে বিভিন্ন **নদীর উপত্যকা** ও পাহাড়ের গায়ে **ধাপে ধাপে** দেশের অধিকাংশ ধান জন্মে।

থাইল্যাণ্ডে মেনাম নদীর উপত্যকা ও বদ্বীপ, **ব্রহ্মদেশে** ইরাবতী, সালুয়েন প্রভৃতি নদীর উপত্যকা ও বদ্বীপ এবং **ভিয়েটনাম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে** প্রচুর ধান জন্মে। কোরিয়া, নেপাল, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশেও যথেষ্ট ধান জন্মে।

অন্যান্য মহাদেশ—দক্ষিণ আমেরিকাতে **ব্রেজিলের** উপকূলে পৃথিবীর প্রায় ২·৫% ধান চাষ হয়। **দক্ষিণ গোলার্ধের** দেশসমূহের মধ্যে এদেশে ধান উৎপাদনের পরিমাণ **প্রথম**। ব্রিটিশ গায়না ও উহার নিকটবর্তী ত্রিনিদাদ দ্বীপেও ধান জন্মে। উত্তর আমেরিকার **যুক্তরাষ্ট্রে** মিসিসিপি নদীর বদ্বীপ ও মেক্সিকো উপসাগরের উপকূলে পৃথিবীর প্রায় ২% ধান জন্মে। আফ্রিকার উত্তরপূর্ব অংশে **মিশর** ও আবিসিনিয়া হইতে পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ হইয়া দক্ষিণে নাটাল ও মালাগাসি পর্যন্ত অল্প ধান চাষ হয়। এসকল দেশ ভিন্ন ইউরোপের ইটালিতে পো নদীর উপত্যকা ও স্পেনের উপকূলভাগে এবং সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের দক্ষিণ অংশে কৃষ্ণসাগরের তীরে, অস্ট্রেলিয়াতে মারে-ডার্লিং নদীর উপত্যকায় জলসেচের সাহায্যে কিছু কিছু ধান চাষ হয়। প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের বহু ক্ষুদ্র দ্বীপেও ধান জন্মে।

ধান চাষের কতক বৈশিষ্ট্য—পৃথিবীর অধিকাংশ ধান **মৌসুমী অঞ্চলে** জন্মে এবং এই অঞ্চলেই ব্যবহৃত হয়। **স্থানীয় চাহিদা** মিটাইবার জন্যই ইহার অধিক চাষ হয় এবং সে হিসাবে ইহা **স্বয়ংসম্পূর্ণ চাষের** (Subsistence agriculture) প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে ইহা অত্যন্ত ছোট ছোট জমিতে এবং **প্রাচীন পদ্ধতিতে** উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলে ইহার চাষের সাফল্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভরশীল। অথচ প্রায় প্রতি বৎসরই অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি বা হঠাৎ বৃষ্টিপাত বন্ধ প্রভৃতি কোন-না-কোন কারণে এখানকার বিভিন্ন অংশে শস্যহানি হয়, অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য উত্তম **সেচ ব্যবস্থা** একান্ত আবশ্যক। এখানকার জমিগুলি যাহাতে **আর ক্ষুদ্র ভাগে** বিভক্ত না হয় সেজন্য ভূমি সংস্কার ও উত্তরাধিকার আইনের প্রয়োজনমত পরিবর্তন করা প্রয়োজন। তারপর ছোট ছোট জমির মালিকগণের **সমবায়ের** (Co-opertave) **ভিত্তিতে** চাষের কাজে যন্ত্রপাতি

ব্যবহার করা আবশ্যক। ধানের উৎপাদনের হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জমিতে প্রয়োজনমত কৃষিসার ব্যবহারের ব্যবস্থা করা উচিত। কৃষকগণকে চাষের উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট বীজধান সরবরাহ করা উচিত এবং তাহাদিগকে আধুনিক **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে** চাষ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া উচিত।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—ধানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ **অত্যন্ত কম**; পৃথিবীর মোট উৎপন্ন ধানের মাত্র ৩-৩% বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আমদানি রপ্তানি হয়। এরূপ আমদানি-রপ্তানির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ ও জাপান পৃথিবীর ৭০-৭৫% ধান উৎপন্ন করে, অথচ এসকল দেশ কিছুমাত্র ধান রপ্তানি করে না। সুতরাং যে সকল দেশ ইহাদের তুলনায় কম ধান উৎপন্ন করে, সেগুলিই ধান **রপ্তানি** করে। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার **থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ** প্রভৃতির লোকবসতি অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া ইহারা কিছু কিছু ধান রপ্তানি করে। আর ব্রেজিল, যুক্তরাষ্ট্র, মিশর প্রভৃতি দেশে ধান কম উৎপন্ন হইলেও ঐ সকল দেশে ভাত খাওয়ার রীতি নাই বলিয়া তাহারা ধান রপ্তানি করে। থাইল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কক, যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক, ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন প্রভৃতি বন্দরের মধ্য দিয়া অধিকাংশ ধান রপ্তানি হয়। ধান অধিক **আমদানি** করে **জাপান** ও **ইন্দোনেশিয়া**। তারপর বাংলাদেশ, চীন, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও ফ্রান্সও (প্রধানতঃ মদ, পুডিং, শ্বেতসার প্রভৃতি তৈরার জন্য) কিছু ধান আমদানি করে।

যব

যবের (Barley) গুঁড়া পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য খাদ্য। ইহা রোগীরও পথ্য। ইহাদ্বারা যথেষ্ট রুটি, বিস্কুট প্রভৃতিও তৈরী হয়। তাহাছাড়া কতক মদ (Beer, Whisky) তৈরীর জন্য ইহার চাহিদা অধিক।

ইহার চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক অবস্থা, বিশেষতঃ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু, গম চাষের অনুরূপ। তবে গম চাষের সময় অপেক্ষা কম সময়ে ইহা জন্মে। সেজন্য ইহা গম চাষের অঞ্চল অপেক্ষা শীতলতর অংশে (ইউরোপের উত্তরে ফিন্‌ল্যাণ্ড এবং এশিয়াতে তিব্বত ও হিমালয়ের উচ্চ অংশে) জন্মে। আবার উষ্ণতর অংশেও (সাহারা মরুভূমির আশপাশেও) যব জন্মে।

পৃথিবীর মোট যব চাষের জমির পরিমাণ গম চাষের মোট জমির প্রায় ৩০%, বিভিন্ন জমিতে গম অপেক্ষা যব উৎপাদনের হারও কিছু বেশী। কিন্তু যব অপেক্ষা গম খাদ্য হিসাবে অধিক প্রিয়। যবের চাষ কম হওয়ার ইহা একটি প্রধান কারণ।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রে জন্মে পৃথিবীর প্রায় ২১% যব। যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে দ্বিতীয়, ক্ষুদ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ তৃতীয়। তারপর ফ্রান্স, ক্যানাডা, ভারত, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের স্থান। অধিকাংশ উৎপাদনকারী দেশই যব **রপ্তানি** করে, আর তাহা অধিক **আমদানি** করে পশ্চিম ইউরোপের পশ্চিম জার্মানী, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, নেদারল্যাণ্ডস্ প্রভৃতি দেশ ও জাপান

ভুট্টা

ইহা (Maize) খুব পুষ্টিকর খাদ্য এবং ইহার উৎপাদনের হারও বেশী। ইহার সাহায্যে মেইজেনা (Maizena), কর্ন ফ্লাওয়ার (Corn flour) প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য, শ্বেতসার, গ্লুকোজ এবং মদ প্রভৃতি তৈরী হয়। দরিদ্র দেশের লোকেরা প্রচুর ভুট্টা খান। খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষের সময় অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরাও ভুট্টা খাইয়া থাকেন। ইউরোপ ও আমেরিকাতে পশুর খাদ্য হিসাবে প্রচুর ভুট্টা ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ যুক্তরাষ্ট্রে মাংসের জন্য পালিত গরুগুলিকে কাঁচা ভুট্টার ক্ষেতে (Ranch or ranching ground) অবাধে বিচরণ করিতে দেওয়া হয়। কখন কখন শূকরের পালকেও কচি ভুট্টার ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। দক্ষিণ আমেরিকা ভুট্টার আদি উৎপাদন স্থান। উভয় আমেরিকাতে ইহা কর্ন নামে পরিচিত। ইউরোপে ইহাকে বলে ইণ্ডিয়ান কর্ন (Indian corn)।

ইহার **চাষের** উপযোগী **ভৌগোলিক অবস্থা** গম ও ধান চাষের অবস্থার মাঝামাঝি। সেজন্য ধান ও গম অঞ্চলের মধ্যভাগে উপক্রান্তীয় অঞ্চলে ইহা অধিক জন্মে।

ভুট্টা উৎপাদন সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান **পৃথিবীতে প্রথম** (পৃথিবীর ৪০%)। তারপর ব্রেজিল ও মেক্সিকোর স্থান। তাহছাড়া সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, রোমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশেও প্রচুর ভুট্টা জন্মে। ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে **রপ্তানি** করে যুক্তরাষ্ট্র। তারপর আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, রোমানিয়া, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ। ইহা সবচেয়ে বেশী **আমদানি** করে ইটালি। তারপর জাপান, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশ।

আখ

আখের ব্যবহার—আখ গাছের বাহির দিকে একটি শক্ত খোসা থাকে। শিয়াল ও অন্যান্য প্রাণীর উৎপাত হইতে আখকে (Sugar cane) রক্ষার জন্য এই খোসার সার্থকতা আছে। আখের খোসার ভিতরের সার পদার্থ মাঝামাঝি রকমের শক্ত, কিন্তু ইহার রস খুব মিষ্টি। এই রস দ্বারা পৃথিবীর প্রায় ⅔ অংশ **চিনি**, প্রচুর **মিছরি** ও গুড় তৈরী হয়। এই রসের সাহায্যে কতক মদ্য, সুরাসার (Alcohol), কৃত্রিম রবার

(Synthetic rubber) প্রভৃতিও তৈরী হয়। রস বাহির করিবার পর অবশিষ্ট **ছিবড়া** (Bagasse) দ্বারা তৈরী হয় কিছু কাগজ ও শক্ত কার্ডবোর্ড। এই ছিবড়ার শব্দ রোধ করার ক্ষমতার জন্য সিনেমা গৃহেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ছিবড়া পোড়ান ছাই জমির সার রূপে ও কাচ তৈরীর উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আখের পাতা দ্বারা জিনিসপত্র প্যাক করার শক্ত কাগজ তৈরী হয়।

আখ চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা—(ক) **মৃত্তিকা**—নদ, নদী ও অন্যান্য জলাভূমির পাশের আর্দ্র উর্বর **দো-আঁশ মৃত্তিকাতে** আখ ভাল জন্মে। সমুদ্র উপকূলের বা দ্বীপ অঞ্চলের **চুন ও লবণ** মিশ্রিত জমি ও সমুদ্রের লোনা হাওয়ার জন্য আখের মিষ্টত্ব বাড়ে। তবে প্রতিবার আখ চাষের পূর্বে জমিতে যথেষ্ট সার দেওয়া দরকার।

(খ) **জলবায়ু**—আখের চারা লাগাইবার কম পক্ষে এক বৎসর (কিউবাতে ১৮ মাস ও হাওয়াইতে দুই বৎসর) পর আখ কাটা হয়। ইহার চাষের জন্য ২১-২৩° সে উষ্ণতা এবং ১০০-১৫০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। কাজেই ইহা **উষ্ণ মণ্ডলের** অন্তর্গত সাভানা অঞ্চলে (৩২° উঃ অঃ হইতে ৩২° দঃ অঃ এর মধ্যে) অধিক জন্মে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে ও মৌসুমী অঞ্চলের যে অংশে বৃষ্টি বেশী, তথায় আখের চাষ ভাল হয় না। কোন স্থানে ১০০ সেঃ মিঃর কম বৃষ্টি হইলে ইহার চাষের জন্য **জলসেচের** দরকার।

(গ) **কৃষক**—আখ চাষের উদ্দেশ্যে জমি চাষ করা, চারা লাগানো, গাছের যত্ন করা, ফসল কাটা প্রভৃতি সকল কাজের জন্য দক্ষ অথচ সস্তা কৃষক ও শ্রমিক আবশ্যক।

প্রধান আখ উৎপাদন অঞ্চল—নিম্নলিখিত দেশগুলিতে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী আখ জন্মে। ইহাদের বর্তমান (১৯৭৫) উৎপাদন নিম্নরূপ।

ভারত	১২ কোটি টন	পাকিস্তান	২'২ কোটি টন
কিউবা	৫'৯ ,,	ফিলিপাইন	২ ,,
ব্রেজিল	৫'৯ ,,	ইন্দোনেশিয়া	১'৩ ,,
যুক্তরাষ্ট্র	২'৪ ,,	হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ	১'১ ,,

আখ উৎপাদন সম্পর্কে **এশিয়ার** স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশ হিসাবে **ভারতের** স্থান **প্রথম** (পৃথিবীর প্রায় ২২% আখ জন্মে)।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত **কিউবার** স্থান **দ্বিতীয়** (পৃথিবীর প্রায় ১০% আখ জন্মে)।

আখ উৎপাদন সম্বন্ধে **ব্রেজিলের** স্থান পৃথিবীতে **তৃতীয়** (প্রায় ১০% আখ)।

আখ উৎপাদনে **যুক্তরাষ্ট্রের** স্থান চতুর্থ। এদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে আখ জন্মে।

চীন, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত জাভা দ্বীপ, **ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মেক্সিকোর** উপকূল ভাগ, মধ্য আমেরিকা, **হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ,** দক্ষিণ আমেরিকার **ব্রেজিল,** আর্জেন্টিনা ও গিয়ানা, ওশিয়ানিয়ার অন্তর্গত
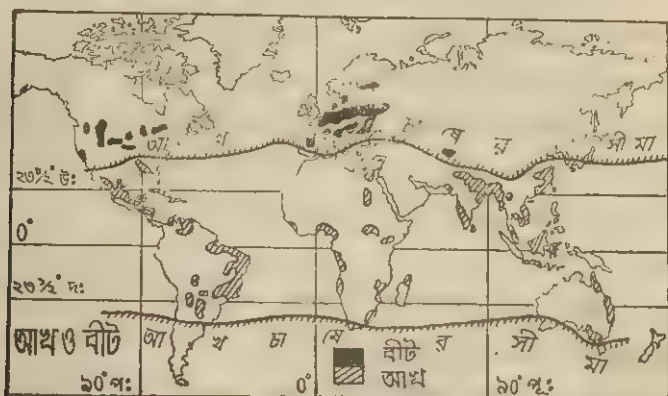
অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ, নিউ জীল্যাণ্ডের উপকূলভাগ, দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল এবং ভারত মহাসাগরের মরিসাস দ্বীপে যথেষ্ট আখ জন্মে। ইউরোপের মধ্যে ইটালি ও স্পেনের দক্ষিণ অংশে সামান্য আখের চাষ হয়।

চিনি উৎপাদন—নিম্নলিখিত দেশগুলিতে আখের সাহায্যে অধিক চিনি তৈরী হয়। ইহাদের বর্তমান (১৯৭৫) উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরূপ।

ব্রেজিল	৭৫ লক্ষ টন	অস্ট্রেলিয়া	২৮'৫ লক্ষ টন
কিউবা	৫৯'৫ „	মেক্সিকো	২৮'৫ „
ভারত	৪৩'৫ „*	ফিলিপাইন	
চীন	৪৩ „	দ্বীপপুঞ্জ	২৪'৬ „

বাণিজ্য—অধিকাংশ চিনির কল আখ চাষের অঞ্চলে বা আশপাশে সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত। কারণ, আখ চাষের জমি হইতে চিনির কলে আখ পৌঁছিতে দেরী হইলে, অথবা আখ পিষিয়া রস বাহির করিতে দেরী হইলে বা রস জ্বাল দিতে দেরী হইলে রসের স্বাদ নষ্ট হয়। কাজেই **আখ** চাষের জমি হইতে অধিক দূরে আখ **রপ্তানি** হয় না।

চিনি আমদানি-রপ্তানি—চিনির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত এবং পরিমাণও অধিক। বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্যের ক্যালোরির পরিমাণ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র

* এদেশের অধিকাংশ আখের সাহায্যে গুড় তৈরী হয়।

এবং ইউরোপের বহু দেশের লোকের মোট খাদ্যসমূহের ২০% চিনি। অপরদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বহু দরিদ্র দেশের লোকের মোট খাদ্যের মধ্যে চিনির পরিমাণ ৫%-এর কম। কাজেই চিনি আমদানির সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

আখের চিনি **রপ্তানি** সম্পর্কে **কিউবা** পৃথিবীতে **প্রথম**। ইহাই সে দেশের সর্বপ্রধান বাণিজ্য সম্পদ্। ব্রেজিল, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, মেক্সিকো, হাওয়াই ও মরিসাস দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোনেশিয়া (জাভা), পোর্টোরিকো, ফরমোসা, ডোমিনিকান্ রিপাবলিক প্রভৃতিও যথেষ্ট চিনি রপ্তানি করে। ভারতে **গুড় ও চিনি** মিলিয়া **সবচেয়ে বেশী** পরিমাণে তৈরী হইলেও এখানকার স্থানীয় চাহিদা এত বেশী যে এদেশের চিনি রপ্তানির পরিমাণ কম। চিনি সবচেয়ে বেশী **আমদানি** করে **যুক্তরাষ্ট্র** ও **যুক্তরাজ্য**। তারপর জাপান, পশ্চিম ইউরোপের ও দক্ষিণপশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশ।

বীট

বীটের ব্যবহার—পৃথিবীর প্রায় ১/৩ অংশ চিনি বীটের রস দ্বারা তৈরী হয়। বীটের ছিবড়া এবং গাছের পাতা গরুর খাদ্য। তাহাছাড়া বীটের ছিবড়া জমির উৎকৃষ্ট সার। এই ছিবড়া এবং রসদ্বারা রাসায়নিক উপায়ে বহু জিনিস তৈরী হয়।

বীট চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা—(ক) **মৃত্তিকা**—চুনমিশ্রিত উর্বর দো-আঁশ মৃত্তিকা বীট চাষের পক্ষে উপযোগী। প্রত্যেক বার বীট চাষের পূর্বে জমিতে প্রচুর সার দেওয়া দরকার। বীট মাটির নীচে জন্মে। ইহা প্রকৃত পক্ষে বীট গাছের মূল। তাই বীট যাহাতে খুব বড় হইতে পারে সেজন্য মাটি গভীর ভাবে চাষ করিয়া কাঁকর, গাছের শিকড় ইত্যাদি বাছিয়া ফেলা আবশ্যক।

(খ) **জলবায়ু**—বীট **নাতিশীতোষ্ণ** অঞ্চলের ফসল। ইহার জন্য ২০-২৩° সেঃ উষ্ণতা প্রয়োজন। বীট চাষের সময় বায়ুমণ্ডলে উষ্ণতার পরিমাণ কম হইলে বীটের মধ্যে মিষ্টত্ব কমিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে ইহার চাষ করা হয় এবং শীতকালে তুষারপাতের পূর্বে ফসল তোলা হয়। কাজেই মাত্র ৫-৫½ মাসে এই ফসল ফলে। ইহার চাষের জন্য ৫০-১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টি প্রয়োজন। ইহার বৃষ্টি কম হইলে **জলসেচের** দরকার।

(গ) **কৃষক**—জমি চাষ করা, জমি হইতে কাঁকর বাছা, জমিতে সার দেওয়া, আগাছা নিড়ানো, ফসল তোলা প্রভৃতি কাজে দক্ষ অথচ সস্তা কৃষক ও শ্রমিক আবশ্যক।

নিম্নলিখিত দেশগুলিতে পৃথিবীর অধিকাংশ বীট জন্মে। ইহাদের বর্তমান (১৯৭৫) উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র	১৩·৮	কোটি টন	পশ্চিম জার্মানী	১·৬	কোটি টন
যুক্তরাষ্ট্র	৩	„	পোল্যাণ্ড	১·৫	„
ফ্রান্স	২	„	ইটালি	১	„

চীন, **পাকিস্তান**, **ইন্দোনেশিয়ার** অন্তর্গত জাভা দ্বীপ, **ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ**, **মেক্সিকোর** উপকূল ভাগ, মধ্য আমেরিকা, **হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ**, দক্ষিণ আমেরিকার **ব্রেজিল**, আর্জেন্টিনা ও গিয়ানা, ওশিয়ানিয়ার অন্তর্গত

অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ, নিউ জাল্যাণ্ডের উপকূলভাগ, দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল এবং ভারত মহাসাগরের মরিসাস দ্বীপে যথেষ্ট আখ জন্মে। ইউরোপের মধ্যে ইটালি ও স্পেনের দক্ষিণ অংশে সামান্য আখের চাষ হয়।

চিনি উৎপাদন—নিম্নলিখিত দেশগুলিতে আখের সাহায্যে অধিক চিনি তৈরী হয়। ইহাদের বর্তমান (১৯৭৫) উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরূপ।

ব্রেজিল	৭৫ লক্ষ টন	অস্ট্রেলিয়া	২৮.৫ লক্ষ টন
কিউবা	৫৯.৫ "	মেক্সিকো	২৮.৫ "
ভারত	৪৩.৫ "*	ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ	২৪.৬ "
চীন	৪৩ "		

বাণিজ্য—অধিকাংশ চিনির কল আখ চাষের অঞ্চলে বা আশপাশে সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত। কারণ, আখ চাষের জমি হইতে চিনির কলে আখ পৌছিতে দেরী হইলে, অথবা আখ পিষিয়া রস বাহির করিতে দেরী হইলে বা রস জ্বাল দিতে দেরী হইলে রসের স্বাদ নষ্ট হয়। কাজেই **আখ** চাষের জমি হইতে অধিক দূরে আখ **রপ্তানি** হয় না।

চিনি আমদানি-রপ্তানি—চিনির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত এবং পরিমাণও অধিক। বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্যের ক্যালোরির পরিমাণ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র

* এদেশের অধিকাংশ আখের সাহায্যে গুড় তৈরী হয়।

এবং ইউরোপের বহু দেশের লোকের মোট খাদ্যসমূহের ২০% চিনি। অপরদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বহু দরিদ্র দেশের লোকের মোট খাদ্যের মধ্যে চিনির পরিমাণ ৫%-এর কম। কাজেই চিনি আমদানির সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

আখের চিনি **রপ্তানি** সম্পর্কে **কিউবা** পৃথিবীতে **প্রথম**। ইহাই সে দেশের সর্বপ্রধান বাণিজ্য সম্পদ্। ব্রেজিল, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, মেক্সিকো, হাওয়াই ও মরিসাস দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোনেশিয়া (জাভা), পোর্টোরিকো, ফরমোসা, ডোমিনিকান্ রিপাবলিক প্রভৃতিও যথেষ্ট চিনি রপ্তানি করে। ভারতে **গুড়** ও **চিনি** মিলিয়া **সবচেয়ে বেশী** পরিমাণে তৈরী হইলেও এখানকার স্থানীয় চাহিদা এত বেশী যে এদেশের চিনি রপ্তানির পরিমাণ কম। চিনি সবচেয়ে বেশী **আমদানি** করে **যুক্তরাষ্ট্র** ও **যুক্তরাজ্য**। তারপর জাপান, পশ্চিম ইউরোপের ও দক্ষিণপশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশ।

বীট

বীটের ব্যবহার—পৃথিবীর প্রায় ⅓ অংশ চিনি বীটের রস দ্বারা তৈরী হয়। বীটের ছিবড়া এবং গাছের পাতা গরুর খাদ্য। তাহাছাড়া বীটের ছিবড়া জমির উৎকৃষ্ট সার। এই ছিবড়া এবং রসদ্বারা রাসায়নিক উপায়ে বহু জিনিস তৈরী হয়।

বীট চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা—(ক) **মৃত্তিকা**—চুনমিশ্রিত উর্বর দো-আঁশ মৃত্তিকা বীট চাষের পক্ষে উপযোগী। প্রত্যেক বার বীট চাষের পূর্বে জমিতে প্রচুর সার দেওয়া দরকার। বীট মাটির নীচে জন্মে। ইহা প্রকৃত পক্ষে বীট গাছের মূল। তাই বীট যাহাতে খুব বড় হইতে পারে সেজন্য মাটি গভীর ভাবে চাষ করিয়া কাঁকর, গাছের শিকড় ইত্যাদি বাছিয়া ফেলা আবশ্যক।

(খ) **জলবায়ু** -বীট **নাতিশীতোষ্ণ** অঞ্চলের ফসল। ইহার জন্য ২০-২৩° সেঃ উষ্ণতা প্রয়োজন। বীট চাষের সময় বায়ুমণ্ডলে উষ্ণতার পরিমাণ কম হইলে বীটের মধ্যে মিষ্টত্ব কমিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে ইহার চাষ করা হয় এবং শীতকালে তুষারপাতের পূর্বে ফসল তোলা হয়। কাজেই মাত্র ৫-৫½ মাসে এই ফসল ফলে। ইহার চাষের জন্য ৫০-১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টি প্রয়োজন। ইহার বৃষ্টি কম হইলে **জলসেচের** দরকার।

(গ) **কৃষক**—জমি চাষ করা, জমি হইতে কাঁকর বাছা, জমিতে সার দেওয়া, আগাছা নিড়ানো, ফসল তোলা প্রভৃতি কাজে দক্ষ অথচ সস্তা কৃষক ও শ্রমিক আবশ্যক।

নিম্নলিখিত দেশগুলিতে পৃথিবীর অধিকাংশ বীট জন্মে। ইহাদের বর্তমান (১৯৭৫) উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ—

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র	১৩·৮	কোটি টন	পশ্চিম জার্মানী	১·৬	কোটি টন
যুক্তরাষ্ট্র	৩	„	পোল্যাণ্ড	১·৫	„
ফ্রান্স	২	„	ইটালি	·১	„

প্রধান বীট উৎপাদন অঞ্চল—পৃথিবীর বেশীর ভাগ বীট জন্মে **ইউরোপে**—পশ্চিমে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ হইতে পূর্বদিকে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র পর্যন্ত। **সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের** উৎপাদনের পরিমাণ **প্রথম**, পৃথিবীর **অর্ধেকের বেশী**। এদেশে দক্ষিণ-পশ্চিমে কীভ ও কুরস্ক-এর মধ্যভাগের স্থানসমূহ, ককেশাস পর্বতের নিকটবর্তী অঞ্চল, সাইবেরিয়ার দক্ষিণ ও পূর্ব অংশ (বৈকাল হ্রদ অঞ্চল) ইহার চাষের জন্য প্রসিদ্ধ।

যুক্তরাষ্ট্রে বীট উৎপাদনের পরিমাণ এখন পৃথিবীতে **দ্বিতীয়, ফ্রান্সের** স্থান **তৃতীয়। পশ্চিম জার্মানী, পোল্যাণ্ড, ইটালি, নেদারল্যাণ্ডস্, যুক্তরাজ্য,** ডেনমার্ক, সুইডেন, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রোমানিয়া প্রভৃতি দেশেও প্রচুর বীট জন্মে। দক্ষিণে স্পেন দেশে সামান্য বীট জন্মে। ক্যানাডার প্রেইরী অঞ্চলেও বীট জন্মে।

বীট চিনি উৎপাদন—নিম্নলিখিত দেশগুলিতে বীট চিনি অধিক তৈরী হয়। ইহাদের বর্তমান (১৯৭৫) উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র	৮৪	লক্ষ টন	পোল্যাণ্ড	১৫'৯	লক্ষ টন
যুক্তরাষ্ট্র	৫০'৫	„	ইটালি	১১'৪	„
ফ্রান্স	৩০'২	„	যুক্তরাজ্য	১০'৫	„
পশ্চিম জার্মানী	২৪'৪	„			

আখ ও বীট চাষের তুলনা—আখ চাষ যেখানে শেষ হয়, তাহার পর হইতেই সুরু হয় **বীট** চাষ। কারণ, আখের জন্য প্রয়োজন ক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলের (Savannah) জলবায়ু, আর বীটের জন্য আবশ্যক নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলের (Steppe) জলবায়ু। বীট চাষের জমিতে বৎসরের অন্য সময়ে অপর ফসল জন্মে। কতক দেশে জমিতে বিভিন্ন ফসল চাষের ফাঁকে ফাঁকে শস্যাবর্তন (Crop rotation) প্রথা অনুসারে বীটের চাষ হয়। অথচ আখের ফসল হয় সারা বৎসরে (কখনও ১½-২ বৎসরে) একবার। আখ চাষের ব্যয়ের চেয়ে বীট চাষের ব্যয় বেশী। তবু ইউরোপের বহু দেশ নিজ নিজ দেশের লোকের চাহিদামত চিনি তৈরীর উদ্দেশ্যে বীটের চাষ করে।

পৃথিবীর মধ্যে **যুক্তরাষ্ট্র**, স্পেন, ইটালি, জাপান ও আর্জেন্টিনাতে বীট এবং আখ—উভয় ফসল জন্মে। তবে কোনটিই বেশী হয় না। ইহাদের প্রত্যেকটির উৎপাদনের জমি আলাদা। যুক্তরাষ্ট্রে **আখ** জন্মে দক্ষিণ-পূর্ব অংশে **মেক্সিকো** উপসাগরের **উপকূলে,** আর **বীট** জন্মে দেশের মধ্য অংশে **প্রেইরি তৃণভূমিতে** ও রকির পার্বত্য অঞ্চলের পশ্চিমে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—আখের মত বীটও সহজে টক হইয়া যায়। কাজেই প্রায় একই কারণে বীট চাষের জমি হইতে দূরে রপ্তানি করা সম্ভবপর নহে। বীট চিনি **রপ্তানি** করে, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশ। তাহা অধিক **আমদানি** করে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ।

চা

চা-এর ব্যবহার—উষ্ণমণ্ডলের কতক চিরহরিৎ গাছের কুঁড়ি ও কচি পাতা সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া পাতা ও গুঁড়া **চা** তৈরী করা হয়। তাহা গরম জলে ভিজাইয়া যে পানীয় তৈরী হয় তাহাকেও বলে চা। ইহাই বর্তমানে পৃথিবীর **সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পানীয়**। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, নেদারল্যাণ্ডস প্রভৃতি দেশে ইহার প্রচলন খুব বেশী। ভারতে উৎপন্ন চায়ের বেশীর ভাগ **কাল** রং এর **চা** (Black Tea)। ইহার চাহিদা সবচেয়ে বেশী. তাহাছাড়া ভারতে ও জাপানে কিছু সবুজ চা (Green Tea), অন্যান্য কয়েক দেশে ব্রিক টি (Brick Tea) এবং আরও ২-৩ রকমের চা তৈরী হয়। চা হইতে ক্যাফিন (Caffeine) নামে ক্ষার বা লবণ জাতীয় জিনিস (Alkali or salt) এবং চা গাছের বীজ হইতে সাবান তৈরীর উপযোগী তৈল তৈরী হয়।

চা গাছ চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা—(ক) **মৃত্তিকা**—ইহার চাষের জন্য লৌহ-মিশ্রিত এবং হিউমাস সারযুক্ত উর্বর **দো-আঁশ** মাটি বিশেষ উপযোগী। জমিতে পটাস ও ফসফেট থাকিলে চা সুস্বাদু হয়। চা গাছ বহু বৎসর বাঁচে ইহার চাষের জন্য বা আবাদের আগে জমি পরিষ্কার করিয়া বিভিন্ন সারিতে চারাগাছ রোপন করা হয়। তারপর প্রতি বৎসর জমিতে সার দেওয়া প্রয়োজন। চা গাছের গোড়ায় জল জমিলে গাছ মরিয়া যায়। তাই **পাহাড়ের ঢালুতে** চা গাছ সবচেয়ে বেশী জন্মে জল নিকাশের সুব্যবস্থা করিয়া সমভূমির কতক অংশেও চা গাছের চাষ হয়।

(খ) **জলবায়ু**—চা গাছ চাষের জন্য ২৪-২৬ সেঃ **উষ্ণতা** প্রয়োজন। তাই ইহা **উষ্ণ মণ্ডলের** বাহিরে জন্মে না। অথচ গাছের চারা অবস্থায় প্রখর রোদে ক্ষতি হয়। তাই আবাদকরার সময় জমিতে মাঝে মাঝে বড় চা গাছ ও কতক লতা জাতীয় গাছ রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়। চা গাছের চাষের জন্য ২০০-২৫০ সেঃ মিঃ **বৃষ্টি** আবশ্যক। সারা বৎসর ব্যাপী বৃষ্টি চা গাছের পক্ষে খুব ভাল। এরূপ অবস্থার ফলে নিরক্ষীয় জলবায়ুতে প্রতি বৎসর যত বেশী বার কুঁড়ি ও কচি পাতা সংগ্রহ করা যায়, মৌসুমী জলবায়ুতে তত বার করা যায় না। ভারতে

হিমালয় পর্বতের ঢালুতে ২,১৩৫ মি পর্যন্ত উচ্চভূমিতে চা গাছের চাষ হয়। কারণ, শীতকালে সামান্য তুষারপাতে এই গাছ মরে না।

(গ) **কৃষক ও শ্রমিক**—জমি উত্তমরূপে চাষ করা এবং চা গাছের চারা রোপণ করা, আগাছা নিড়ানো, চা গাছের যত্ন নেওয়া প্রভৃতি কাজের জন্য প্রচুর শ্রমিক দরকার। চা পাতা সহজে সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চা গাছের ডাল অনবরত ছাটিয়া

(Pruning) ইহাদের উচ্চতা ১½-২ মিটারের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়। মেয়েরা ও অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েরা **কুঁড়ি সংগ্রহের** কাজে খুব পটু। একটি কচি পাতা সহ একটি কুঁড়ি তোলার কাজকে সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রহ (Very fine plucking) বলে। তারপর হইল দুইটি কচি পাতা সহ একটি কুঁড়ি সংগ্রহ (Full plucking)। তাহার বেশী কচি পাতা সহ একটি কুঁড়ি তোলার কাজকে বলা হয় নিকৃষ্ট চা সংগ্রহ (Coarse plucking)। শ্রমিক পরিবারের পুরুষ, মহিলা এবং ছেলে বা মেয়ে সকলেই চা বাগানের বিভিন্ন কাজ করেন বলিয়া এখানকার শ্রমিকের মজুরী কম। উষ্ণ মণ্ডলের বাহিরে এত কম মজুরীতে শ্রমিক পাওয়া যায় না। উষ্ণ মণ্ডলে চা চাষের সফলতার ইহাও একটি প্রধান কারণ।

প্রধান উপাদন অঞ্চল—১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীতে প্রায় ১৬ লক্ষ টন চা জন্মে। ঐ বৎসর চায়ের প্রধান উৎপাদন অঞ্চলে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ :

ভারত	৪·৮	লক্ষ টন	জাপান	১	লক্ষ টন
চীন	৩·৮	,,	সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র	০·৮	,,
শ্রীলঙ্কা	২	,,	ইন্দোনেশিয়া	০·৭	,,

এশিয়াতে পৃথিবীর ৯০% চা জন্মে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী চা জন্মে **ভারতে** (পৃথিবীর প্রায় ⅓ অংশ)।

চীনের চা উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **দ্বিতীয়** (পৃথিবীর প্রায় ২৪%)। এদেশের মধ্য অংশে ইয়াংসি কিয়াং ও দক্ষিণ অংশে সিকিয়াং নদীর উপত্যকায় উচ্চভূমির ঢালে চা অধিক জন্মে।

শ্রীলঙ্কাতে চা উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **তৃতীয়** (পৃথিবীর ১২·৫%)। এদেশের মধ্যভাগের উচ্চভূমির দক্ষিণ ঢালে অধিক চা জন্মে।

জাপানে বিভিন্ন পাহাড়ের গায়ে চা উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **চতুর্থ** (পৃথিবীর ৬%)। **সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের** চা উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **পঞ্চম**। এদেশে চা জন্মে দেশের দক্ষিণ অংশে ককেশাস অঞ্চলে। **ইন্দোশিয়াতে** চা জন্মে প্রধানতঃ জাভাতে। আফ্রিকার পূর্ব অংশে কেনিয়া ও মালাওয়ি রাষ্ট্রে (ন্যাসাল্যাণ্ড), দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে, উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের ফিজি দ্বীপে সামান্য চা উৎপন্ন হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য -চা রপ্তানি সম্পর্কে **ভারতের** স্থান **প্রথম, শ্রীলঙ্কার** স্থান **দ্বিতীয়, ইন্দোনেশিয়া তৃতীয়**। জাপান, চীন, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশও চা রপ্তানি করে। চা রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য International Tea Market Expansion Board বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। **যুক্তরাজ্য** পৃথিবীর অর্ধেক চা **আমদানি** করে। ইহার মধ্যে ভারতীয় চায়ের পরিমাণ অধিক। **যুক্তরাজ্য** চা আমদানি করিয়া তাহার কতক অংশ **পুনরায় রপ্তানি** (Entrepo trade) করে। যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশও চা আমদানি করে।

কফি

কফির ব্যবহার—কফি ফলের বীজের চূর্ণ ঔষধ হিসাবে এবং পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কফি গাছের পাকা ফলকে বলে **চেরি** (Cherry)। যে কফি ফলের মধ্যে দুইটি বীজ থাকে তাহাকে বলে **বেরি**, আর যাহার মধ্যে একটি বীজ থাকে তাহার নাম **পি বেরি** (Pea berry)।

কফি চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা—ইহার চাষের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা অনেকটা চায়ের চাষের মত (ক) **মৃত্তিকা**—ইহার জন্য লৌহমিশ্রিত ও হিউমাস সারযুক্ত উর্বর দো-আঁশ মৃত্তিকা আবশ্যক। এই গাছের গোড়াতে জল জমিলে গাছ মরিয়া যায়। তাই চা গাছের মত কফি গাছও মালভূমির ঢালুতে ও পাহাড়ের উপত্যকাতে জন্মে।

(খ) **জলবায়ু**—ইহা উষ্ণ মণ্ডলের ফসল। ইহার চাষের জন্য ২৪-২৬ সে **উষ্ণতা**

প্রয়োজন। **সূর্যের প্রচণ্ড কিরণ** কফির চারার পক্ষে অনিষ্টকর। সেজন্য চারাগুলিকে পাহাড়ের যে ঢালুতে **ছায়া** পাওয়া যায়, তথায় লাগানো হয়। তাহাছাড়া ব্রেজিলে বড় বড় মটর (Pea) ও ঐ জাতীয় গাছ লাগাইয়া এবং দাক্ষিণাত্যে কমলালেবু, কলা ও দারুচিনি, গোলমরিচ প্রভৃতি গাছের সারি রোপন করিয়া কফির চারার জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়। আরবের ইয়েমেন রাজ্যে লোহিত সাগর (Red Sea) হইতে দিবাভাগে পাহাড়ের গা বাহিয়া যে কুয়াসা (Hill mist) উপর দিকে উঠে, তাহাই এই চারার পক্ষে ছায়ার কাজ করে। কফির চাষের জন্য প্রয়োজন ১৭৫-২২৫ সেঃ মিঃ **বৃষ্টিপাত**। তবে ১২৫-১৫০ সেমি বৃষ্টিপাতেও জলসেচের সাহায্যে কফির চাষ হয়।

(গ) **কৃষক ও শ্রমিক**—কফি গাছ জন্মিবার ২।৩ বৎসর পরে গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করে, আর ৩০।৩৫ বৎসর পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। এসকল গাছ হইতে উপযুক্ত সময়ে ফল সংগ্রহ করার জন্য পুরুষ শ্রমিক এবং ফল কাটিয়া বীজ বাহির করা, তাহাদিগকে বাছিয়া ও ভাজিয়া পানীয় হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী কফি তৈরী করা প্রভৃতি কাজের জন্য দরকার প্রচুর দক্ষ মহিলা শ্রমিক।

চা ও কফি গাছের মধ্যে পার্থক্য—চা গাছের পাতা ও কুঁড়ি হইতে পানীয় চা তৈরী হয়, আর কফি গাছের ফলের বীজ হইতে তৈরী হয় পানীয় কফি। কাজেই কফি চাষের ক্ষেত্রে **ঝড়** খুব বিপজ্জনক। কারণ প্রবল ঝড়ে কফি গাছের ফল পড়িয়া যাওয়ার ভয় থাকে। তাহাছাড়া কফি গাছ **তুষারপাত** সহ্য করিতে পারে না।

কফির প্রধান উৎপাদন অঞ্চল—এখন (১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে) পৃথিবীতে ১৮ লক্ষ টন কফি উৎপন্ন হয়। নিম্নলিখিত দেশগুলিতে তাহা অধিক জন্মে।

ব্রেজিল	১৬ লক্ষ টন	উগাণ্ডা	২'১ লক্ষ টন
কলম্বিয়া	৫'৭ ,,	ইথিওপিয়া	১'৮ ,,
আইভরি কোস্ট	৩ ,,	ইন্দোনেশিয়া	১'৭ ,,
এঙ্গোলা	২'২ ,,	গুয়াটেমালা	১'৩ ,,
মেক্সিকো	২'১ ,,	ভারত	০'৯ ,,

দক্ষিণ আমেরিকার **ব্রেজিল** দেশে, প্রধানতঃ সাও পাওলোর আশপাশে মালভূমিতে (উচ্চতা ৮০০ মিঃ), পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী** (⅓ অংশ) কফি জন্মে। এই মহাদেশের **কলম্বিয়ার** স্থান পৃথিবীতে **দ্বিতীয়** (পৃথিবীর ১৩%)।

পশ্চিম আফ্রিকার **আইভরি কোস্টের** স্থান **তৃতীয়** (পৃথিবীর ৬%), **এঙ্গোলার** স্থান **চতুর্থ**। পূর্ব আফ্রিকার উগাণ্ডা ও ইথিওপিয়াতেও কফি জন্মে।

ইহা ভিন্ন উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকার গুয়াটেমালা, এশিয়ার ভারত, ইন্দোনেশিয়া, আরবের ইয়েমেন প্রভৃতি দেশে কফি জন্মে। ইয়েমেনের কফি **মোকা কফি** নামে বিখ্যাত।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—পৃথিবীর প্রায় ৯০% কফি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহার মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার **ব্রেজিল** দেশ **রপ্তানি** করে **সবচেয়ে বেশী** কফি। তারপর ঐ মহাদেশের **কলম্বিয়া, আফ্রিকার** আইভরি কোস্ট, এঙ্গোলা, উগাণ্ডা, ইথিওপিয়া প্রভৃতি দেশ। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইয়েমেন প্রভৃতিও কিছু কফি রপ্তানি করে। আমেরিকার **যুক্তরাষ্ট্র** পৃথিবীর প্রায় ৬০% কফি **আমদানি** করে। ফ্রান্স, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী, ইটালি, সুইডেন, ক্যানাডা, আর্জেন্টিনা প্রভৃতিও কফি আমদানি করে।

•

শিল্পের উপাদান ও বাণিজ্যিক ফসল

মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনের মধ্যে খাদ্য ও বাসস্থানের পরেই বস্ত্রের স্থান। আধুনিক মানুষের পক্ষে আরও বহু জিনিস আবশ্যক। তাহাদের এক বৃহৎ অংশ শিল্পদ্রব্য। এগুলি তৈরীর জন্য কৃষিজ, খনিজ, বনজ ও প্রাণিজ নানাপ্রকার উপাদান প্রয়োজন। **কৃষিজ উপাদানসমূহের** মধ্যে প্রধান কয়েকটির বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। এসকল জিনিস মানুষের প্রয়োজনায় প্রধান **শিল্পের উপাদান** (Industrial crops)। সেজন্য এগুলির বাণিজ্যিক মূল্য অধিক। তাই ইহাদিগকে **বাণিজ্যিক ফসলও** (Commercial crops) বলা হয়।

বস্ত্র

বস্ত্রের প্রধান উপাদান—মানুষ বহু প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করে। কতক বস্ত্রের উপাদান প্রাকৃতিক; এগুলি উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর দেহ হইতে পাওয়া যায়। আর কতক উপাদান কৃত্রিম: মানুষ বিভিন্ন কৃত্রিম উপায়ে সেগুলি তৈরী করে।

(অ) **প্রাকৃতিক উপাদান** (Natural fibres)—বস্ত্র তৈরীর প্রাকৃতিক উপাদানগুলি দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত:—(১) উদ্ভিজ্জ ও (২) প্রাণিজ উপাদান।

(১) **উদ্ভিজ্জ উপাদান**—কতক উদ্ভিদের বীজ হইতে, কতকের খোসা হইতে, আর কতকের পাতা হইতে বস্ত্র তৈরীর সূতা পাওয়া যায়। তদনুসারে উদ্ভিজ্জ সূতা (Vegetable fibre) নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত—

(ক) **বীজ** হইতে উৎপন্ন সূতা (Seed fibre or boll fibre)—ইহার উদাহরণ

কার্পাস সূতা। কার্পাস গাছের বীজের চারিদিকে প্রচুর আঁশ থাকে। তাহার সাহায্যে পৃথিবীর প্রায় ৬০% সূতা ও বস্ত্র তৈরী হয়।

(খ) **বল্কল** হইতে উৎপন্ন সূতা (Bast fibre or stalk fibre)—পাট, শণ, তিসি, রেমি, মেস্তা প্রভৃতি গাছের ছাল হইতে যে সূতা পাওয়া যায়, তাহা এই শ্রেণীর উদাহরণ। এসকল গাছের ছাল হইতে প্রায় ২৫% সূতা তৈরী হয়। এরূপ সূতার সাহায্যে চট, থলে, গালিচা বা কার্পেট, দড়ি প্রভৃতি তৈরী হয়।

(গ) **পাতা** হইতে উৎপন্ন সূতা (Leaf fibre)—আবাকা, শিশাল ও ম্যানিলা শণ ও আনারস গাছের পাতা হইতে যে সূতা পাওয়া যায়, তাহা এই শ্রেণীর উদাহরণ। এসকল গাছের পাতা হইতে সামান্যই সূতা তৈরী হয়।

(ঘ) **ফলের খোসা** (Fruit husk) হইতে উৎপন্ন সূতা—নারিকেলের উপরিভাগের খোসা হইতে উৎপন্ন সূতা (Coir) ইহার উদাহরণ। ইহার সাহায্যে সাধারণতঃ পাপোষ, মোটা গালিচা প্রভৃতি তৈরী হয়।

(ঙ) **সমগ্র উদ্ভিদ্**—স্পেনীয় মস্ (Spanish moss) নামক শৈবালের সাহায্যে তৈরী সূতা ইহার উদাহরণ। এরূপ সূতার পরিমাণ খুব সামান্য।

(২) **প্রাণিজ উপাদান**—কতক প্রাণীর পশমের সাহায্যে ও কতকের দেহ হইতে নির্গত রসের সাহায্যে যথেষ্ট সূতা তৈরী হয়।

(ক) **পশম** হইতে উৎপন্ন সূতা (Woollen fibre)—মেষের পশমের সাহায্যে প্রচুর সূতা তৈরী হয়। আলপাকা, লামা, ভিকুনা, উট, ছাগল, ঘোড়া, গরু, খরগোশ প্রভৃতির পশমের সাহায্যে কিছু কিছু সূতা পাওয়া যায়। আলপাকা ও দীর্ঘলোমযুক্ত কতক মেষ, পার্বত্য ছাগল প্রভৃতির পশমের সাহায্যে তৈরী হয় অত্যন্ত মসৃণ ও সূক্ষ্ম সূতা। এগুলি উৎকৃষ্ট শাল জাতীয় জিনিস তৈরীর প্রধান উপাদান।

(খ) **প্রাণীদেহ** হইতে নির্গত **রসের** সাহায্যে উৎপন্ন সূতা (Fibre from excretion)—রেশমকীট, তসরকীট প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র প্রাণী; ইহাদের শরীর হইতে কতক রস নির্গত হয় এবং তাহা ইহাদের গায়ে ক্রমশঃ জড়াইয়া শক্ত হইয়া পড়ে। এই শক্ত আবরণের সাহায্যে তৈরী হয় রেশম, তসর প্রভৃতি অতিশয় মূল্যবান্ সূক্ষ্ম সূতা।

(আ) **অপ্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উপাদান** (Artificial or man-made fibres)—নানা প্রকার উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ, খনিজ পদার্থ, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে কৃত্রিম সূতা তৈরী করিয়া মানুষ বহু রকম কাপড় জামা তৈরী করিতেছে। এগুলি রেয়ন, নাইলন, ভিনিয়ান প্রভৃতি

নামে পরিচিত। ইহাদের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। (এখন মোট বস্ত্রের অন্ততঃ ২০-২৫%।)

বস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে পার্থক্য—বস্ত্র প্রধানতঃ দুই ভাবে ব্যবহৃত হয়—

(ক) **ব্যক্তিগত পোশাক, পরিচ্ছদ ও গৃহস্থালীর** কাজে ব্যবহৃত বস্ত্র (Mainly apparel and household uses)–পৃথিবীতে উৎপন্ন মোট বস্ত্রের অধিকাংশ (৭৫-৮০%) এসকল উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। তাহাদের মধ্যে কার্পাস বস্ত্রের পরিমাণ ৬০%; তাহার পরেই কৃত্রিম উপাদানের সাহায্যে তৈরী রেয়ন, নাইলন প্রভৃতির স্থান। ইহাদের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাদের পর তিসির (Flax) তৈরী লিনেন, প্রাণিজ উপাদানের সাহায্যে তৈরী পশম, রেশম প্রভৃতির স্থান।

(খ) **শিল্পকার্যে** ব্যবহৃত বস্ত্র (Industrial uses)–কার্পাসের শক্ত ও মোটা সূতা এবং পাট, মেস্তা, শন প্রভৃতির সাহায্যে তৈরী চট, থলে, কার্পেট, দড়ি প্রভৃতির পরিমাণ মোট বস্ত্রের প্রায় ২০-২৫%। এসকল জিনিস সাধারণতঃ বিভিন্ন শিল্প সংক্রান্ত কাজে (কচিৎ ব্যক্তিগত কাজে) ব্যবহৃত হয়।

কার্পাস

কার্পাসের (তুলা) শ্রেণীবিভাগ ও ব্যবহার—সভ্য মানুষের **প্রাথমিক** প্রয়োজনসমূহের (Primary needs) মধ্যে বস্ত্র **তৃতীয়** (খাদ্য ও বাসস্থানের পরে)। আর। মানবসমাজের পক্ষে **সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ্** হিসাবে **কার্পাসের** স্থান **প্রথম**। কারণ, সকল লোকেরই কিছু-না-কিছু কার্পাস বস্ত্র প্রয়োজন। অথচ খাদ্যশস্যের মধ্যে কেহ খান ধান, কেহ গম, কেহ ভুট্টা বা অন্য কিছু। পৃথিবীর প্রায় ⅔ অংশ মানুষ বাস করেন উষ্ণমণ্ডলে। এখানে কার্পাস বস্ত্রই ৯৫%-এর বেশী ব্যবহৃত হয়। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেও কার্পাসের (তুলা) তৈরী সার্ট, গেঞ্জি, মোজা, চাদর বিছানাপত্র, শতরঞ্চি, দড়ি ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কার্পাস দ্বারা গ্যাসের ম্যাণ্টেল, কতক কাগজ, সেলুলোজ, বন্দুকের গুলি, কার্তুজ প্রভৃতিও তৈরী হয়। তাহাছাড়া তুলার বীজ হইতে তৈরী হয় কতক তৈল (Cotton oil)। তৈল তৈরীর পর যে খৈল (Oil cake) অবশিষ্ট থাকে তাহা জমির উৎকৃষ্ট সার।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে উৎপন্ন কার্পাস তাহাদের আঁশের দৈর্ঘ্য এবং রং, মসৃণতা ও ব্যবহারের পার্থক্য প্রভৃতি অনুসারে নিম্নলিখিত চারি ভাগে বিভক্ত :

(ক) **সাগর দ্বীপের কার্পাস** (Sea Island cotton) -ইহাই পৃথিবীর মধ্যে **সর্বশ্রেষ্ঠ ও দীর্ঘতম** আঁশযুক্ত (Longest staple) কার্পাস; আঁশ প্রায় ৮ সেঃ মিঃ

দীর্ঘ। ইহার আঁশ রেশমের মত সূক্ষ্ম, মিহি, মসৃণ ও কোমল। কাজেই ইহাকে রেশম ও পশমের সহিত মিশাইয়া উৎকৃষ্ট কাপড় তৈরী করা হয়। তবে ইহার উৎপাদনের পরিমাণ খুব কম। ইহা সাধারণতঃ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জন্মে।

(খ) **দীর্ঘ আঁশযুক্ত** (Long staple) **কার্পাস**—ইহার আঁশ প্রায় ৩ সেঃ মিঃ বা তাহার অধিক দীর্ঘ। ইহার তৈরী সূতা সূক্ষ্ম। ইহাই **মিহি** (Fine) কাপড় তৈরীর প্রধান উপাদান। বর্তমানে ইহাই বস্ত্রশিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্পাস। ইহা মিশরে সবচেয়ে বেশী জন্মে; তাই ইহাকে **মিশরীয় কার্পাস** বলে।

(গ) **মধ্যম আঁশযুক্ত** (Medium staple) **কার্পাস**—ইহার আঁশ ২·৫—৩ সেঃ মিঃ দীর্ঘ এবং মধ্যম রকমের (Medium) কাপড় তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ কার্পাস এই জাতীয় এবং ইহাই **সর্বপ্রধান** বাণিজ্যিক কার্পাস। ইহা যুক্তরাষ্ট্রের সামান্য উচ্চভূমিতে সবচেয়ে বেশী জন্মে। তাই ইহার নাম **উচ্চভূমির কার্পাস** (Upland cotton)।

(ঘ) **ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত** (Short staple) **কার্পাস**—ইহার আঁশ ২·৫ সেমির কম দীর্ঘ। ইহা দ্বারা মোটা (Coarse) কাপড় তৈরী হয়। ইহা ভারতে সবচেয়ে বেশী জন্মে তাই ইহার নাম **ভারতীয় কার্পাস** (Indian cotton)।

কাপক (Kapok) বা **শিমূল তুলা**—শিমূল গাছের তুলা দ্বারা সাধারণতঃ বালিশ, বিছানার তোষক প্রভৃতি তৈরী হয়

কার্পাস চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা—(ক) **মৃত্তিকা**—উর্বর **দো-আঁশ মাটিতে** কার্পাস জন্মে তবে ভারতের লাভা হইতে উৎপন্ন **কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকাতে** (Black Cotton soil) প্রচুর কার্পাস উৎপন্ন হয়। কার্পাস চাষের জমিতে প্রয়োজনমত সার দিতে হয়। আবার দরকার মত জমি হইতে জল নিকাশের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন।

(খ) **জলবায়ু**—কার্পাস চাষের প্রথম দিকে প্রায় ২৪° সেঃ উষ্ণতা ও ফসল পাকিবার সময় **উজ্জ্বল** ও প্রখর **সূর্যকিরণ** এবং ২৬-২৮° সেঃ **উষ্ণতা** আবশ্যক। ইহা উষ্ণ মণ্ডলে, উপক্রান্তীয় (Sub-tropical) অঞ্চলে এবং নাতিশীতোষ্ণ বা মৃদু শীতল অঞ্চলের উষ্ণতর অংশে জন্মে। ইহার জন্য একাদিক্রমে ৭ মাস বা অন্ততঃ ২০০ **তুষারমুক্ত দিবস** (Frost-free days) আবশ্যক।

কার্পাস চাষের প্রথম দিকে কয়েক দিন অন্তর কিছু বৃষ্টি এবং ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্র আবশ্যক। তবে গাছের গুটি বা ফল ভাঙ্গিয়া তুলা বাহির হওয়ার পর বৃষ্টি হইলে ফসলের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। কার্পাস চাষের জন্য মোট ৫০-১০০ সেঃ মিঃ **বৃষ্টি** আবশ্যক।

তবে পশ্চিম পাকিস্তানে সিন্ধু নদের উপত্যকায়, মিশরে নীলনদের তীরে ও বদ্বীপে, যুক্তরাষ্ট্রের এরিজোনাতে ও দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশে মরুপ্রায় অঞ্চলে বৃষ্টি কম হওয়া সত্ত্বেও **জলসেচের** সাহায্যে প্রচুর উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মে।

(গ) **কৃষক ও শ্রমিক**—কার্পাস চাষের জন্য দক্ষ কৃষক এবং পাকা তুলা সংগ্রহের জন্য প্রচুর দক্ষ পুরুষ ও মেয়ে শ্রমিক আবশ্যক। আজকাল ফসল সংগ্রহ সমেত সকল কাজে প্রচুর যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। তাই অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু দক্ষ শ্রমিক দরকার।

(ঘ) **প্রতিষেধক ব্যবস্থা**—কার্পাস চাষের প্রধান শত্রু **বল উইভিল** (Boll weevil) কীট। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অংশে ইহার উৎপাত খুব বেশী। এই জাতীয় বা অন্য কোন পোকা লাগিলে সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত গ্যাস বা অন্যান্য ঔষধের সাহায্যে পোকা মারিয়া ফেলা আবশ্যক।

প্রধান উৎপাদন-অঞ্চল—নিম্নলিখিত দেশগুলিতে বর্তমানে (১৯৭৫ খ্রীঃ) সর্বাপেক্ষা অধিক কার্পাস জন্মে।

যুক্তরাষ্ট্র	১·৩৭ কোটি বেল (গাঁট)	ভারত	০·৫৬ কোটি বেল (গাঁট)
সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র	১·২৫ „ „ „	পাকিস্তান	০·৩১ „ „ „
চীন	১·০৫ „ „ „	মিশর	০·২৬ „ „ „
		ব্রেজিল	০·২৫ „ „ „

যুক্তরাষ্ট্র—পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী** (পৃথিবীর ২৫%) ও **শ্রেষ্ঠ কার্পাস** জন্মে এদেশে। এখন সাগর দ্বীপীয় কার্পাস দুর্লভ। তাই দীর্ঘ ও মধ্যম আঁশযুক্ত
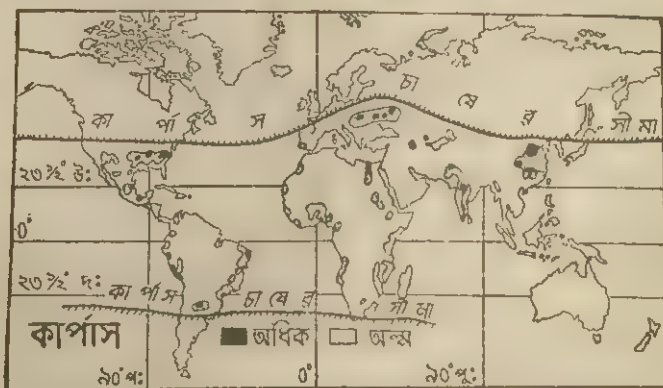
কার্পাসই সবচেয়ে বেশী। এখানকার **দক্ষিণ-পূর্ব অংশে** উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া, আলাবামা ও মিসিসিপি রাজ্য বিখ্যাত **কার্পাস বলয়ের** অন্তর্গত। এখানে কার্পাসই প্রধান ফসল, তবে কিছু ভুট্টা ও তামাকও জন্মে। ক্রমশঃ মিসিসিপি নদীর

পশ্চিমে অর্থাৎ দেশের **মধ্যভাগে** আর্কানসাস, টেক্সাস, ওকলাহোমা প্রভৃতি রাজ্যে এবং আরও **পশ্চিমদিকে** এরিজোনা, ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ মেক্সিকো প্রভৃতি রাজ্যে ৫০ সেঃ মিঃর কম বৃষ্টিপাত-অঞ্চলে **জলসেচের** সাহায্যে কার্পাসের চাষ হইতেছে। উত্তরদিকে অধিক শীতের জন্য (এক সঙ্গে ২০০ তুষারমুক্ত দিবস পাওয়া যায় না বলিয়া) ইহার চাষ উত্তরে বেশীদূর বিস্তৃত হওয়া সম্ভবপর নহে।

কার্পাস উৎপাদন সম্পর্কে **সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের** স্থান পৃথিবীতে **দ্বিতীয়** (পৃথিবীর ২৩%)। এদেশের দক্ষিণ অংশে কাজাকস্থান ও উজবেকিস্থানে এবং ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে ককেশাস অঞ্চল ও ইউক্রেনে **জলসেচের** সাহায্যে প্রচুর কার্পাস জন্মে।

কার্পাস উৎপাদন সম্পর্কে **চীন** দেশের স্থান পৃথিবীতে **তৃতীয়** (পৃথিবীর ২০%)। এদেশের মধ্য অংশে ইয়াংসি কিয়াং ও মধ্যচীনে ও দক্ষিণপূর্ব অংশে সিকিয়াং নদীর উপত্যকায় প্রচুর কার্পাসের চাষ হয়।

ভারতের স্থান পৃথিবীতে **চতুর্থ** (১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে দ্বিতীয় ছিল)।

পাকিস্তানের স্থান **পঞ্চম** (ভারতের অর্ধেকের চেয়ে সামান্য বেশী)। ভারত ও এই দেশে জলসেচের সাহায্যে মধ্যম ও দীর্ঘ আঁশযুক্ত কার্পাস জন্মে।

মিশরে নীলনদের উপত্যকা ও বদ্বীপ উৎকৃষ্ট কার্পাস চাষের জন্য বিখ্যাত। ক্রমশঃ মিশরের দক্ষিণে সুদান, পূর্ব আফ্রিকার উগাণ্ডা, ট্যাঙ্গানিয়া প্রভৃতি, পশ্চিম আফ্রিকার নাইজেরিয়া ও মধ্য আফ্রিকার কঙ্গো গণতন্ত্র প্রভৃতি দেশে কার্পাসের চাষ বৃদ্ধি হইতেছে।

দক্ষিণ আমেরিকার **ব্রেজিল** দেশে কার্পাস উৎপাদনের পরিমাণ মিশরের চেয়ে সামান্য কম। এদেশের উচ্চভূমিতে বড় বড় গাছ হইতে কতক দীর্ঘ আঁশের তুলা পাওয়া যায়।

কাপক বা **শিমূল তুলা**—ভারত, ইন্দোনেশিয়ার জাভা, পশ্চিম আফ্রিকার নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশে ইহা জন্মে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী** কার্পাস **রপ্তানি** করে **যুক্তরাষ্ট্র**। তারপর **মিশরের** স্থান। এ দেশের প্রায় সমুদয় তুলাই রপ্তানি হয়। তাহাছাড়া সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, ভারত, ব্রেজিল, ট্যাঙ্গানিয়া, উগাণ্ডা, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশও কার্পাস রপ্তানি করে। কার্পাস **আমদানি** সম্পর্কে এখন **জাপানের স্থান প্রথম, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ দ্বিতীয়**। এই দুই দেশের বস্ত্রশিল্প সম্পূর্ণরূপে আমদানি-করা কার্পাসের উপর নির্ভরশীল। পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালি প্রভৃতি দেশও যথেষ্ট কার্পাস আমদানি করে।

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের কার্পাস আমদানি-রপ্তানি—কার্পাস আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কে এই দুই দেশের **বিশেষত্ব** উল্লেখযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রের উৎকৃষ্ট কার্পাস আমদানি করিয়া **ভারত** তৈরী করে বস্ত্র, আর ভারতের নিকৃষ্ট কার্পাস আমদানি করিয়া **যুক্তরাষ্ট্র** তৈরী করে মোটা কম্বল।

পাট

পাটের ব্যবহার—গাছের বল্কল বা ছাল হইতে সুতা তৈরীর (Bast or stalk fibre) শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পাট। পৃথিবীতে যত প্রাকৃতিক উপায়ে সুতা তৈরী হয়, তাহাদের মধ্যে কার্পাসের পরিমাণ প্রথম, পশম দ্বিতীয়, পাট তৃতীয়। কিন্তু পাটের **দাম** সকলের তুলনায় **কম**। তাহাছাড়া পাটের তৈরী জিনিস খুব **টিকসই**। কাজেই বিভিন্ন জিনিস প্যাক করিবার জন্য পাটের তৈরী চট ও থলের চাহিদা সবচেয়ে বেশী। পাট দ্বারা চট, থলে, কার্পেট, ক্যাম্বিস, ত্রেপল, নানারকম সুতা, সুতলি, নকল রেশম (Rayon), কাগজ প্রভৃতি বহু জিনিস তৈরী হয়। পাটকাঠি উৎকৃষ্ট জ্বালানি। ইহা দ্বারা কুঁড়ে ঘরের বেড়াও তৈরী হয়।

চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা—(ক) **মৃত্তিকা**—উর্বর **দো-আঁশ মাটিতে,** বিশেষতঃ নদীর ধারের যে সকল নীচু জমিতে প্রতি বৎসর **বন্যার** ফলে **পলি** পড়ে, তথায় পাট খুব ভাল জন্মে। অবশ্য উঁচু জমিতেও কিছু পাট জন্মে। তবে জমির পাশে পাট পচাইবার জন্য উপযুক্ত খাল, বিল থাকা আবশ্যক।

(খ) **জলবায়ু**—পাট চাষের জন্য প্রায় ২৭° সে উষ্ণতা এবং ২০০-২৫০ সেঃ মিঃ বৃষ্টি আবশ্যক। **মৌসুমী অঞ্চলে** গ্রীষ্মকালে এরূপ জলবায়ু দেখা যায় বলিয়া পাট এখানকার প্রায় **একচেটিয়া** ফসল (Monopoly crop)।

(গ) **কৃষক ও শ্রমিক**—পাট চাষের জমি চাষ, বীজ বপন, জমি হইতে আগাছা বাছিয়া ফেলা, পরে উপযুক্ত সময়ে পাট কাটা, জলে পচাইবার পর তাহার ছাল আলাদা করিয়া নেওয়া ও তাহাকে পরিষ্কার রূপে ধুইয়া শুকানো ইত্যাদি সকল কাজের জন্য প্রয়োজন প্রচুর দক্ষ অথচ সস্তা শ্রমিক।

প্রধান উৎপাদন অঞ্চল—নিম্নলিখিত দেশগুলিতে এখন (১৯৭৫) পৃথিবীর অধিকাংশ পাট জন্মে।

ভারত	১৪·১৪ লক্ষ টন	থাইল্যাণ্ড	৪·৯ লক্ষ টন
বাংলাদেশ	১০ " "	ব্রেজিল	০·৫৫ " "
চীন	৫·২৫ " "	সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র	০·৫৪ " "

ভারত -এদেশের অন্তর্গত **গঙ্গা** ও **ব্রহ্মপুত্র** নদের **নিম্ন উপত্যকা** ও **বদ্বীপ** অঞ্চলে পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী** (৫০%) পাট জন্মে। ইহা **পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রধান অর্থপ্রসূ** বা বাণিজ্যিক ফসল (Cash or Commercial crop)।

উপরে পাট কাটা ও নীচে তাহার আঁশ ছাড়ান

পাট উৎপাদন সম্পর্কে এখন (১৯৭৫) **বাংলাদেশের** স্থান পৃথিবীতে **দ্বিতীয়** (পৃথিবীর প্রায় ৩০%)। এদেশের (পূর্ব অংশের উচ্চভূমি অঞ্চল ভিন্ন) প্রায় সর্বত্র ইহার চাষ হয়।

চীন দেশের স্থান এখন পৃথিবীতে **তৃতীয়** (পৃথিবীর ১৬%)। এদেশের মধ্য অংশে ইয়াংসি কিয়াং ও দক্ষিণ অংশে সিকিয়াং নদীর উপত্যকায় ইহা জন্মে।

থাইল্যাণ্ডে পাট উৎপাদনের পরিমাণ চীনের চেয়ে সামান্য কম, পৃথিবীতে **চতুর্থ**। নেপাল দেশেও পাট জন্মে।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বাহিরে দক্ষিণ আমেরিকার **ব্রেজিলে** পাটের চাষ বাড়িতেছে। **সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের** দক্ষিণ অংশে পাটের চাষ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। (এখন উৎপাদন ব্রজিলের প্রায় সমান।)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—পাটের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দুইভাগে বিভক্ত—পাট রপ্তানি ও পাটজাত-দ্রব্য রপ্তানি। (ক) কেবলমাত্র **পাট**
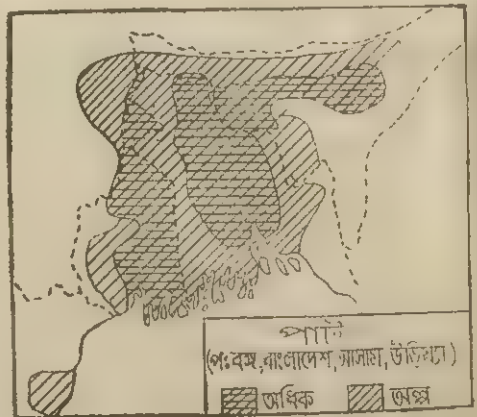
রপ্তানি সম্পর্কে **বাংলাদেশ প্রথম, ভারত দ্বিতীয়**। (খ) পাটজাত দ্রব্যাদি (চট, থলে প্রভৃতি) রপ্তানি সম্পর্কে **ভারত প্রথম**। পাট **আমদানি** করে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালি প্রভৃতি দেশ। আর পাটজাত দ্রব্যাদি **আমদানি** করে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ।

পাটের বিভিন্ন বিকল্প দ্রব্য (Jute substitutes)—কিছুকাল যাবৎ ভারতের পাটজাত দ্রব্য (চট, থলে প্রভৃতি) ব্যবহারের পরিবর্তে নানা স্থানে পুরু কাগজের থলের মধ্যে সিমেন্ট ও কাপড়ের থলের মধ্যে ময়দা বিক্রয় হইতেছে। তাহাছাড়া পশ্চিম জার্মানীতে অন্য কতক গাছের ছালের আঁশ দিয়া এবং ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের ডাণ্ডিতে পাটের সহিত ঐরূপ কতক গাছের আঁশ মিশাইয়া থলে তৈরী হইতেছে।

মেস্তা—ভারত ও বাংলাদেশে প্রচুর **মেস্তার** (Mesta) চাষ হইতেছে। ইহার জন্য পাট চাষের অনুরূপ মৃত্তিকা ও জলবায়ু প্রয়োজন। ভারতে ইহার উৎপাদনের পরিমাণ **পাটের** প্রায় ½ **অংশ**। ইহা অধিক জন্মে পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে। ইহা বিহারে পুসা শণ নামে, অন্ধ্রপ্রদেশে বিমলি নামে এবং মহারাষ্ট্রে আম্বাদী নামে পরিচিত।

শণ

শণের ব্যবহার—শণ গাছের ছালের আঁশ দিয়া তৈরী হয় নানারকম দড়ি, সুতা, সুতলি, চট ও ত্রেপল। ইহার বীজ হইতে তৈরী হয় তৈল। তাহা রং, সাবান, পালিশ প্রভৃতি তৈরার জন্য ও জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের বীজ পশুর খাদ্য। তারপর পাট গাছের কাঠির মত শণের ডাঁটাও উৎকৃষ্ট জ্বালানি। কতক শণ গাছের পাতা ও মুকুল দিয়া ভাঙ, এই গাছের রস জাতীয় আঠাল জিনিস দিয়া চরস এবং স্ত্রীজাতীয় শণ গাছের জটা দিয়া গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য তৈরী হয়।

চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা—(ক) **মৃত্তিকা**—শণ চাষের জন্য **দো-আঁশ** মাটি প্রয়োজন। ইহার মধ্যে কাদার ভাগ বেশী থাকিলে চাষ ভাল হয়।

(খ) **জলবায়ু**—ইহার জন্য ১২-১৮° সে উষ্ণতা প্রয়োজন। ইহার জন্য বৃষ্টিও দরকার মধ্যম রকম (প্রায় ৩১·৭৫ সেঃ মিঃ)। তাই ইহা **নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের** মধ্যভাগের ফসল।

(গ) **কৃষক ও শ্রমিক**—শণ গাছ খুব শক্ত। তাই ইহাকে কাটিয়া অনেক দিন জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তারপর শক্ত কাঠ দিয়া পিটাইয়া শণের সুতা বাহির করা হয়। এজন্য যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষ শ্রমিক দরকার।

প্রধান উৎপাদন অঞ্চল—সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রে (দেশের দক্ষিণ অর্ধাংশে)

পৃথিবীর অর্ধেকের বেশী শণ জন্মে। তাহাছাড়া যুগোশ্লাভিয়া, রোমানিয়া ও ইটালি দেশে কিছু বেশী এবং চীন, কোরিয়া, ভারত ও পাকিস্তানে কম শণ উৎপন্ন হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র বেশী শণ রপ্তানি করে না। তাহা **রপ্তানি** করে **ইটালি**, যুগোশ্লাভিয়া, রোমানিয়া এবং ভারত। আর তাহা **আমদানি** করে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশ।

শণ জাতীয় অন্যান্য উদ্ভিদ্—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের অন্য কতক গাছ হইতেও শণ জাতীয় শক্ত সুতা পাওয়া যায়। যেমন, (ক) **ম্যানিলা শণ** (Abaca or Manila hemp)—ইহা সবচেয়ে বেশী জন্মে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে। এরূপ শণের তৈরী দড়ি জাহাজে অধিক ব্যবহৃত হয়। (খ) **শিশাল শণ** (Sisal hemp)—ইহা অধিক জন্মে মেক্সিকো দেশের ইউকাটান অঞ্চলে ও পূর্ব আফ্রিকার দেশসমূহে। (গ) **রেমি** (Ramie)—ইহা চীনা ঘাস নামেও পরিচিত। ইহার সাহায্যেও দড়ি তৈরী হয়। (ঘ) **অতসী** (Flax)—এই গাছের ছাল হইতে সুতা তৈরী হয়। ইহা সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রে সবচেয়ে বেশী (৭০-৮০%) জন্মে। তারপরে উত্তর পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, অস্ট্রেলিয়া ও মিশরের স্থান। এই গাছের সুতা দ্বারা উৎকৃষ্ট বস্ত্র (Linen) তৈরী হয়। এই গাছের বীজদ্বারা তৈল (Linseed oil) তৈরী হয়। এই উদ্দেশ্যে ইহার চাষ করা হয় ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা ও আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে।

তামাক

ব্যবহার—তামাক (নিকোটিয়ানা) এক জাতীয় ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্, কিন্তু ইহার পাতা খুব বড়। এই পাতা সেঁকিয়া ও শুকাইয়া চুরুট, সিগারেট, বিড়ি, নস্য, খইনি, জর্দা প্রভৃতি তৈরী করা হয়। কতক তামাক পাতাদ্বারা কীটনাশক ঔষধ, কৃষিসার প্রভৃতি তৈরী হয়।

চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা—(ক) **মৃত্তিকা**—চুন ও পটাশমিশ্রিত হাল্কা মৃত্তিকা তামাক চাষের পক্ষে সুবিধাজনক। (ভারী মাটিতে উৎপন্ন তামাকের গন্ধ তীব্র।) এই ফসল উৎপাদনের জন্য মাটি গভীরভাবে চাষ করা দরকার। জমি হইতে জল নিকাশেরও ব্যবস্থা প্রয়োজন।

(খ) **জলবায়ু**—ইহা ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের উষ্ণতর অংশেও প্রচুর জন্মে। ইহা অধিক তুষারপাত সহ্য করিতে পারে না। তাই শীতলতর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল ইহার চাষের পক্ষে অসুবিধাজনক। ইহার জন্য অধিক বৃষ্টিপাত দরকার হয় না। সেজন্য মরুপ্রায় অঞ্চলেও জলসেচের সাহায্যে ইহার চাষ হয়।

(গ) **কৃষক ও শ্রমিক**—জমি গভীর ভাবে চাষ, আগাছা নিড়ানো, পোকা মাকড়ের উৎপাত হইতে গাছকে রক্ষা করা, খারাপ পাতা বাছিয়া ফেলা এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পাতা ঠিক সময়ে সংগ্রহ করা প্রভৃতি কাজের জন্য প্রচুর দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন। চা-পাতা সংগ্রহের মত একাজেও বালক, বালিকা ও মেয়ে শ্রমিক দক্ষ।

প্রধান উৎপাদন অঞ্চল—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এখন (১৯৭৫) নিম্নলিখিত পরিমাণ তামাক উৎপন্ন হয়।

চীন	৯'৮	লক্ষ টন	ব্রেজিল	২'৩	লক্ষ টন
যুক্তরাষ্ট্র	৮'৮	„	তুরস্ক	১'৯	„
ভারত	৪'৪	„	বুলগেরিয়া	১'৫	„
সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র	৩'১	„	জাপান	১'৪	„

চীনদেশে এখন পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী** (পৃথিবীর প্রায় ১৮%) তামাক জন্মে। দক্ষিণে সিকিয়াং নদীর উপত্যকা হইতে উত্তরে হোয়াংহো নদীর উপত্যকা পর্যন্ত ইহার চাষ হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে এতদিন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী তামাক উৎপন্ন হইত, এখন এদেশের স্থান **দ্বিতীয়**। মিসিসিপি নদীর উপত্যকা হইতে পূর্বদিকে আটলান্টিক উপকূল পর্যন্ত **তামাক বলয়** বিস্তৃত। ভার্জিনিয়া, কেন্টাকি, টেনেসি, উত্তর ও দক্ষিণ কেরোলিনা, জর্জিয়া প্রভৃতি স্টেটে এদেশের অধিকাংশ তামাক জন্মে। এদেশের **ভার্জিনিয়া স্টেটের** ও পাশের (পূর্বদিকের) পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত **কিউবার** তামাক উৎকৃষ্ট।

ভারত—আমাদের দেশে তামাক উৎপাদনের পরিমাণ এখন পৃথিবীতে **তৃতীয়**।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের স্থান এখন **চতুর্থ**।

তাহাছাড়া ব্রেজিল, ইউরোপের ফ্রান্স, বালগেরিয়া, পশ্চিম জার্মানী, গ্রীস, ইটালি, এশিয়ার পাকিস্তান, তুরস্ক, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, জাপান; আফ্রিকার আলজেরিয়া, রোডেশিয়া; দক্ষিণ আমেরিকার পেরু, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশেও তামাক জন্মে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—তামাক পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বহু দেশে উৎপন্ন হয় এবং অধিকাংশ দেশেই ইহার সাহায্যে নানারকম জিনিস (চুরুট, সিগারেট প্রভৃতি) তৈরী হয়। কাজেই তামাকের উৎপাদনের তুলনায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ

কম। ইহা অধিক **রপ্তানি** করে যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক, গ্রীস, বালগেরিয়া, ব্রেজিল, ইন্দোনেশিয়া, ভারত ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। আর ইহা অধিক **আমদানি** করে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশ।

রেশম

রেশম কীটের জীবন ও খাঁটি রেশমের ব্যবহার—উষ্ণ, উষ্ণতর নাতিশীতোষ্ণ এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে **রেশমকীট** বা গুটিপোকা (Silk worm) সবচেয়ে বেশী পালন করা হয়। **তুঁত গাছের** (Mulberry) কচি পাতা ইহার খাদ্য। জন্মের কিছু দিন পর ইহার শরীর হইতে নির্গত লালা শরীরের চারিদিকে জমিয়া **গুটি** (Cocoon) তৈরী হয়। ভিতরের কীট গুটির কতক অংশ কাটিয়া বাহিরে আসিবার পূর্বে গুটির গায়ে সাধারণতঃ গরম বাষ্প প্রয়োগ করিয়া এই কীটকে মারিয়া ফেলা হয়। তারপর এই গুটি হইতে তৈরী হয় খাঁটি রেশম সূতা। এই সূতা এত সূক্ষ্ম বা সরু যে এরূপ অন্ততঃ ৪।৫ খানা সূতা এক সঙ্গে পাকাইয়া তৈরী হয় মূল্যবান রেশমী কাপড় (পরিধানের ধুতি, সাড়ী, জামার সার্টিং, কোটিং, চাদর প্রভৃতি)। ইহা ভিন্ন বিদ্যুৎরোধক বস্ত্র, অস্ত্র চিকিৎসার জন্য বস্ত্র, টাইপ রাইটিং যন্ত্রের কার্বন ও প্যারাসুট প্রভৃতি তৈরীর জন্য প্রচুর রেশম ব্যবহৃত হয়। আর কার্পাস সূতার সহিত ছেঁড়া বা টুকরা রেশমী সূতা মিশাইয়া তৈরী করা হয় নিকৃষ্ট ও মিশ্রিত রেশমী কাপড়।

তুঁত গাছ চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা ও রেশম কীট পালন—(ক) **মৃত্তিকা**— কতক নদীর ও পাহাড়ের উপত্যকায় দো-আঁশ মাটিতে তুঁত গাছের চাষ হয়। ঝোপজাতীয় গাছের (Mulberry bush) তুলনায় বড় তুঁত গাছ (Mulberry tree) হইতে অনেক বেশী পাতা পাওয়া যায়। তাই এরূপ গাছের পাতার সাহায্যে বেশী পোকা পালন করা হয়। সেজন্য এই জাতীয় গাছের চাষ বাড়িতেছে।

(খ) **জলবায়ু**—তুঁত গাছের জন্ম ও গুটিপোকা (রেশমকীট) পালনের জন্য প্রায় ২১° সে উষ্ণতা ও মধ্যম রকম বৃষ্টি আবশ্যক। সেজন্য মৌসুমী অঞ্চল, উষ্ণতর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের যে সকল অংশে বৃষ্টি মধ্যম রকম, তথায় এই গাছ অধিক জন্মে।

(গ) **কৃষক ও শ্রমিক**—তুঁত গাছের কচি পাতা সংগ্রহ করা ও তাহাদের সাহায্যে গুটিপোকা পালন, তারপর উত্তপ্ত বাষ্প দ্বারা গুটির মধ্যস্থিত কীটগুলিকে মারিয়া ফেলা প্রভৃতি কাজের জন্য দরকার দক্ষ অথচ সস্তা শ্রমিক। কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েরা

এবং মহিলারা এই কাজে খুব পটু। গুটির সাহায্যে সূক্ষ্ম রেশম সূতা কাটা এবং তাঁতে রেশমী কাপড় তৈরীর জন্য প্রয়োজন অত্যন্ত দক্ষ শ্রমিক।

প্রধান উৎপাদন অঞ্চল—পৃথিবীতে **সবচেয়ে বেশী** কাঁচা রেশম (Raw silk) উৎপন্ন হয় **জাপানে**। প্রধানতঃ এদেশের **হন্‌সু** দ্বীপের মধ্যভাগের পাহাড়ের গায়ে ও উপত্যকাতে এবং **বিওয়া হ্রদ** অঞ্চলে এদেশের প্রায় অর্ধেক চাষের জমিতে তুঁত গাছ জন্মে। ধান চাষের জমির আলের উপর এবং চাষীদের বাড়ীতেও দেখা যায় বহু তুঁত গাছ।

রেশম উৎপাদন সম্পর্কে **চীনদেশের** স্থান **দ্বিতীয়**। এখানকার ইয়াংসি কিয়াং নদীর উপত্যকা ও সাইং অঞ্চলে ইহা অধিক উৎপন্ন হয়।

তাহাছাড়া ভারত, কোরিয়া, সিরিয়া, তুরস্ক, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের দক্ষিণ অংশ এবং ইউরোপে ফ্রান্সের রোন নদীর উপত্যকা, ইটালিতে পো নদীর উপত্যকা, যুগোশ্লাভিয়া, রোমানিয়া, গ্রীস ও স্পেন দেশে রেশম উৎপন্ন হয়।

তসর, এণ্ডি প্রভৃতি—শাল, সেগুন, কুল, জাম, শিমূল, অশ্বত্থ, অর্জুন প্রভৃতি গাছের ডালাতে তসর কীট জন্মে। এই কীটের রসের সাহায্যে প্রচুর **তসর** উৎপন্ন হয়। তাহাছাড়া এরণ্ড (ভেরেণ্ডা) গাছের পাতার সাহায্যে পালন করা হয় এণ্ডি কীট। ইহার সাহায্যে **এণ্ডি** উৎপন্ন হয়। মুগা কীটের সাহায্যে তৈরী হয় যথেষ্ট **মুগা**।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—জাপান হইতে সবচেয়ে বেশী রেশম সূতা **রপ্তানি** হয়। ইহার পর চীন, তুরস্ক, কোরিয়া, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র ও ইটালির স্থান। ভারতও কিছু রেশম রপ্তানি করে। রেশম সবচেয়ে বেশী (প্রায় অর্ধেক) **আমদানি** করে **যুক্তরাষ্ট্র**। তারপর ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশের স্থান।

রবার

রবারের ব্যবহার—দক্ষিণ আমেরিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলের আমাজন নদীর অববাহিকার গহন বনে কতক গাছ ও লতার রস (Latex) দ্বারা পূর্বে রবার তৈরী হইত। তাহাদের মধ্যে হেভিয়া (Hevea) গাছ প্রধান। প্রথমে ঐ গাছের রস শুকাইয়া পেন্সিলের দাগ মুছিবার (rub) কাজে ইহা ব্যবহৃত হইত। সেজন্যই ইহার নাম হইয়াছে রবার (Rubber)। পরে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সাহায্যে বর্ষাতি (Water-proof cloth) তৈরী হইল। ইহার পরে (১৮৪২ খ্রীঃ) এই রসের সহিত গন্ধক (Sulphur) মিশাইয়া ইহাকে দৃঢ় ও স্থায়ী করার (Vulcanize) ব্যবস্থা হয়। ইহার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই তৈরী হইল সাইকেল, মোটর গাড়ী, ট্রাক, লরি প্রভৃতির **রবারের চাকা**

(Tyre)। ইহাই রবারের **সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার**। এখন রবারের সাহায্যে অসংখ্য জিনিস তৈরী হয়। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিস, আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে বালিশ, বিছানা, জুতা, নল, থলে, গরম জল ও বরফের ব্যাগ, হাতের দস্তানা (Glove), বৈদ্যুতিক ও ডাক্তারী জিনিসপত্রও রবারের সাহায্যে তৈরী হয়।

চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা—(ক) **মৃত্তিকা**—উর্বর **দো-আঁশ মৃত্তিকাতে** রবার গাছের চারা রোপণ করিয়া ইহার **আবাদ** করা হয়। এই গাছের গোড়ায় জল জমিলে ক্ষতি হয় বলিয়া সামান্য উঁচু জমি, বিশেষতঃ পাহাড়ের নীচের দিকের সামান্য ঢালু জমি, ইহার চাষের পক্ষে ভাল। এরূপ জমি হইতে জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

(খ) **জলবায়ু**—ইহার চাষের জন্য সমস্ত বৎসর প্রচুর (২৬-২৭° সে) উষ্ণতা ও প্রচুর (২০০-২৫০ সেঃ মিঃ) বৃষ্টি আবশ্যক। কোন মাসে উষ্ণতার পরিমাণ ইহা অপেক্ষা ৫ সেঃ অথবা বৃষ্টির পরিমাণ ১০ সেমি কমিয়া গেলে গাছের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতি হয়। তাই **নিরক্ষীয় অঞ্চল** রবার চাষের পক্ষে উপযোগী। মৌসুমী অঞ্চলের যে অংশে বৎসরের বেশীর ভাগ সময় বৃষ্টি হয়, তথায়ও (দক্ষিণ ভারত) রবারের চাষ হইতেছে

(গ) **শ্রমিক**—রবার গাছের ছাল সূক্ষ্ম ছুরির সাহায্যে কাটার দক্ষতার উপর রবারের সরবরাহ নির্ভর করে। (গাছ কম কাটা হইলে রবার কম পাওয়া যায়, আবার বেশী কাটা হইলে গাছের ক্ষতি হয়।) প্রত্যহ বৃষ্টির আগেই রবার সংগ্রহের কাজ শেষ করিতে হয়। তাই এই কাজের জন্য চাই প্রচুর দক্ষ শ্রমিক।

প্রধান উৎপাদন অঞ্চল—পূর্বে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলের নিরক্ষীয় অরণ্য

হইতে প্রায় সমুদয় বন্য রবার পাওয়া যাইত। আর বর্তমানে **রবারের আবাদসমূহ হইতে পাওয়া** যায় ৯৫% স্বাভাবিক রবার।

নিম্নলিখিত দেশগুলিতে এখন (১৯৭৫) পৃথিবীর অধিকাংশ স্বাভাবিক রবার (Natural rubber) উৎপন্ন হয়।

মালয়েশিয়া	১৫·৭	লক্ষ টন	শ্রীলঙ্কা	১·৫	লক্ষ টন
ইন্দোনেশিয়া	৯·৯	"	ভারত	১·৩	"
থাইল্যাণ্ড	৩·৬	"	নাইজেরিয়া	১	"
			লাইবেরিয়া	১	"

মালয়েশিয়া—এদেশে উৎপন্ন হয় **পৃথিবীর** মধ্যে **সবচেয়ে বেশী** (৪৪%) আবাদী রবার। **ইন্দোনেশিয়াতে** রবার উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **দ্বিতীয়** (২৮%)। **থাইল্যাণ্ডের** স্থান পৃথিবীতে **তৃতীয়, শ্রীলঙ্কা চতুর্থ** এবং **ভারত পঞ্চম**। এখন দক্ষিণপূর্ব **এশিয়াতে** উৎপন্ন হয় পৃথিবীর ৯০% আবাদী রবার।

আফ্রিকার পশ্চিম অংশে **নাইজেরিয়া** ও **লাইবেরিয়াতে** এবং দক্ষিণ আমেরিকার **ব্রেজিলে** বাকী আবাদী রবার উৎপন্ন হয়।

এখনও আফ্রিকার জায়েরে (কঙ্গো গণতন্ত্র) ও দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশে সামান্য **বন্য রবার** উৎপন্ন হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—মালয়েশিয়া ও **ইন্দোনেশিয়া** পৃথিবীর ৮০%-এর বেশী আবাদী রবার **রপ্তানি** করে। এই রপ্তানি সম্পর্কে **সিঙ্গাপুর** বন্দরের স্থান সর্বপ্রথম। থাইল্যাণ্ড, ভিয়েটনাম, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া প্রভৃতি দেশও রবার রপ্তানি করে। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী আবাদী রবার **আমদানি** করে **যুক্তরাষ্ট্র**। ইহার পর **যুক্তরাজ্য**, ফ্রান্স, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশ।

কৃত্রিম রবার (Synthetic rubber)- রবারের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে কতকগুলি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ রবার গাছের ১২ ১৩ বৎসর বয়সের সময় গাছ হইতে সবচেয়ে বেশী রস পাওয়া যায়। বেশী আগে গাছ কাটিলে গাছের ক্ষতি হয়। তাহাছাড়া গাড়ীর চাকা কত দিন টিকিবে তাহা রাস্তার অবস্থা, গাড়ীর গতিবেগ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। সেজন্য চাকা তৈরীর জন্য রবারের চাহিদা সঠিকভাবে অনুমান করা শক্ত। তার উপর আবাদী রবারের প্রধান উৎপাদন অঞ্চল পৃথিবীর এক অংশে, আর প্রধান খরিদ্দার পৃথিবীর অপর অংশে। তাই রবারের সরবরাহ ও পরিবহন ব্যবস্থা, মূল্য আদান প্রদান প্রভৃতির কারণেও ইহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে

(Tyre)। ইহাই রবারের **সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার**। এখন রবারের সাহায্যে অসংখ্য জিনিস তৈরী হয়। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিস, আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে বালিশ, বিছানা, জুতা, নল, থলে, গরম জল ও বরফের ব্যাগ, হাতের দস্তানা (Glove), বৈদ্যুতিক ও ডাক্তারী জিনিসপত্রও রবারের সাহায্যে তৈরী হয়।

চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা—(ক) **মৃত্তিকা**—উর্বর **দো-আঁশ মৃত্তিকাতে** রবার গাছের চারা রোপণ করিয়া ইহার **আবাদ** করা হয়। এই গাছের গোড়ায় জল জমিলে ক্ষতি হয় বলিয়া সামান্য উঁচু জমি, বিশেষতঃ পাহাড়ের নীচের দিকের সামান্য ঢালু জমি, ইহার চাষের পক্ষে ভাল। এরূপ জমি হইতে জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

(খ) **জলবায়ু**—ইহার চাষের জন্য সমস্ত বৎসর প্রচুর (২৬-২৭° সে) উষ্ণতা ও প্রচুর (২০০-২৫০ সেঃ মিঃ) বৃষ্টি আবশ্যক। কোন মাসে উষ্ণতার পরিমাণ ইহা অপেক্ষা ৫ সেঃ অথবা বৃষ্টির পরিমাণ ১০ সেমি কমিয়া গেলে গাছের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতি হয়। তাই **নিরক্ষীয় অঞ্চল** রবার চাষের পক্ষে উপযোগী। মৌসুমী অঞ্চলের যে অংশে বৎসরের বেশীর ভাগ সময় বৃষ্টি হয়, তথায়ও (দক্ষিণ ভারত) রবারের চাষ হইতেছে

(গ) **শ্রমিক**—রবার গাছের ছাল সূক্ষ্ম ছুরির সাহায্যে কাটার দক্ষতার উপর রবারের সরবরাহ নির্ভর করে। (গাছ কম কাটা হইলে রবার কম পাওয়া যায়, আবার বেশী কাটা হইলে গাছের ক্ষতি হয়।) প্রত্যহ বৃষ্টির আগেই রবার সংগ্রহের কাজ শেষ করিতে হয়। তাই এই কাজের জন্য চাই প্রচুর দক্ষ শ্রমিক।

প্রধান উৎপাদন অঞ্চল—পূর্বে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলের নিরক্ষীয় অরণ্য

হইতে প্রায় সমুদয় বন্য রবার পাওয়া যাইত। আর বর্তমানে **রবারের আবাদসমূহ হইতে** পাওয়া যায় ৯৫% স্বাভাবিক রবার।

নিম্নলিখিত দেশগুলিতে এখন (১৯৭৫) পৃথিবীর অধিকাংশ স্বাভাবিক রবার (Natural rubber) উৎপন্ন হয়।

মালয়েশিয়া	১৫'৭	লক্ষ টন	শ্রীলঙ্কা	১'৫	লক্ষ টন
ইন্দোনেশিয়া	৯'৯	„	ভারত	১'৩	„
থাইল্যাণ্ড	৩'৬	„	নাইজেরিয়া	১	„
			লাইবেরিয়া	১	„

মালয়েশিয়া -এদেশে উৎপন্ন হয় **পৃথিবীর** মধ্যে **সবচেয়ে বেশী** (৪৪%) আবাদী রবার। **ইন্দোনেশিয়াতে** রবার উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **দ্বিতীয়** (২৮%)। **থাইল্যাণ্ডের** স্থান পৃথিবীতে **তৃতীয়, শ্রীলঙ্কা চতুর্থ** এবং **ভারত পঞ্চম**। এখন দক্ষিণপূর্ব **এশিয়াতে** উৎপন্ন হয় পৃথিবীর ৯০% আবাদী রবার।

আফ্রিকার পশ্চিম অংশে **নাইজেরিয়া** ও **লাইবেরিয়াতে** এবং দক্ষিণ আমেরিকার **ব্রেজিলে** বাকী আবাদী রবার উৎপন্ন হয়।

এখনও আফ্রিকার জায়েরে (কঙ্গো গণতন্ত্র) ও দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশে সামান্য **বন্য রবার** উৎপন্ন হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—মালয়েশিয়া ও **ইন্দোনেশিয়া** পৃথিবীর ৮০%-এর বেশী আবাদী রবার **রপ্তানি** করে। এই রপ্তানি সম্পর্কে **সিঙ্গাপুর** বন্দরের স্থান সর্বপ্রথম। থাইল্যাণ্ড, ভিয়েটনাম, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া প্রভৃতি দেশও রবার রপ্তানি করে। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী আবাদী রবার **আমদানি** করে **যুক্তরাষ্ট্র**। ইহার পর **যুক্তরাজ্য**, ফ্রান্স, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশ।

কৃত্রিম রবার (Synthetic rubber)· রবারের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে কতকগুলি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ রবার গাছের ১২।১৩ বৎসর বয়সের সময় গাছ হইতে সবচেয়ে বেশী রস পাওয়া যায়। বেশী আগে গাছ কাটিলে গাছের ক্ষতি হয়। তাহাছাড়া গাড়ীর চাকা কত দিন টিকিবে তাহা রাস্তার অবস্থা, গাড়ীর গতিবেগ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। সেজন্য চাকা তৈরীর জন্য রবারের চাহিদা সঠিকভাবে অনুমান করা শক্ত। তার উপর আবাদী রবারের প্রধান উৎপাদন অঞ্চল পৃথিবীর এক অংশে, আর প্রধান খরিদ্দার পৃথিবীর অপর অংশে। তাই রবারের সরবরাহ ও পরিবহন ব্যবস্থা, মূল্য আদান প্রদান প্রভৃতির কারণেও ইহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে

অসুবিধা ঘটে। ফলে, পরিত্যক্ত বা ছেঁড়া রবারের জিনিস, কয়লা, পেট্রোলিয়াম, কাঠের মণ্ড, নানাপ্রকার শস্য ও উদ্ভিদের সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানী, জাপান, ভারত প্রভৃতি দেশে **কৃত্রিম রবার** তৈরী হইতেছে। তবে এখনও স্বাভাবিক রবারের তুলনায় ইহার উৎপাদনের জন্য খরচ বেশী। প্রধানতঃ সেজন্য স্বাভাবিক রবারের চাহিদা কৃত্রিম বরারের চাহিদার তুলনায় অধিক। তাহাছাড়া স্বাভাবিক রবারের উৎপাদনের পরিমাণ এখনও কৃত্রিম রবারের উৎপাদনের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু কৃত্রিম রবারের উৎপাদন অসামান্য হারে বাড়িতেছে। তাই স্বাভাবিক রবারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা হইতে পারে। তবে এখনও উভয় প্রকার রবারের উৎপাদনের তুলনায় ইহাদের চাহিদা অনেক বেশী এবং ক্রমশঃ রবারের নূতন নূতন ব্যবহার আবিষ্কৃত হইতেছে। তাই শীঘ্রই ভয়ের কোন কারণ নাই।

তৈলবীজ

তৈলবীজের ব্যবহার—চীনাবাদাম, তিল, তিসি, অলিভ প্রভৃতি নানারকম উদ্ভিদের বীজ হইতে বিভিন্ন উপায়ে তৈল সংগ্রহ করা হয়। এজন্য এগুলিকে তৈলবীজ (Oil seeds) বলা হয়। এরূপ কতক তৈল রান্নার জন্য, স্যালাড ও ঔষধ তৈরীর জন্য, কৃত্রিম মাখন, সাবান, রঙ, বার্নিশ, মোমবাতি প্রভৃতি তৈরীর জন্য এবং ঘরে প্রদীপ জ্বালিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। আর চীনাবাদাম, কার্পাস, মহুয়ার তৈল প্রভৃতি বনস্পতি (দালদা) তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়। তৈল তৈরীর পর যে খইল (Oil cake) অবশিষ্ট থাকে তাহা পশুর খাদ্য এবং জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়।

কয়েকটি প্রধান তৈলবীজ—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের কয়েকটি প্রধান তৈলবীজের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল :—

(১) **চীনাবাদাম**—দালদা তৈরীর জন্য এবং সাধারণ রান্নার কাজে ইহার তৈল ব্যবহৃত হয়। ইহা উষ্ণমণ্ডলের একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের গোড়াতে মাটির নীচে জন্মে। দক্ষিণ **ভারতে** ইহা উৎপন্ন হয় **পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী**। তারপর চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রহ্মদেশ, পশ্চিম আফ্রিকার নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশের স্থান। দক্ষিণ ভারতে ইহার নাম মাটি কড়াই বা মাট কড়াই (Ground nut), ফিলিপাইনে ম্যানিলা কড়াই, যুক্তরাষ্ট্রে মটর কড়াই (Pea nut), যুক্তরাজ্যে বাঁদুরে কড়াই (Monkey nut) প্রভৃতি। ভারত, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশ চীনাবাদাম রপ্তানি করে, আর চীন রপ্তানি করে চীনা বাদামের তৈল।

(২) **তিসি বীজ** (Flax seed) **বা মসিনা** (Linseed)—ইহার তৈল খুব

তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায়। সেজন্য রঙ, বার্নিশ, ছাপাখানার কালি, তেলা কাপড় (Oil cloth), জল আটকান কাপড় (Linoleum) প্রভৃতি তৈরীর জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত **সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, আর্জেন্টিনা**, যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, উরুগুয়ে প্রভৃতি দেশে এবং উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত ভারত, ইথিওপিয়া প্রভৃতি দেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ক্যানাডা, ভারত, উরুগুয়ে প্রভৃতি তিসি বীজ রপ্তানি করে। যুক্তরাজ্য পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশ ইহা অধিক আমদানি করে।

(৩) **কার্পাস বীজ** –ভেষজ (Vegetable) ঘি, কৃত্রিম মাখন (Margarine), সাবান, মোমবাতি, গ্রামোফোনের রেকর্ড, রঙ প্রভৃতি তৈরীর জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার খইল জমির সার ও পশুর খাদ্য। যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, চীন, ভারত, পাকিস্তান, ব্রেজিল, মিশর, সুদান প্রভৃতি দেশে কার্পাস অধিক উৎপন্ন হয়। এসকল দেশ কার্পাস বীজ রপ্তানি করে এবং যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, পশ্চিম জার্মানী, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশ ইহা অধিক আমদানি করে।

(৪) **ভাটকলাই** (Soyabean)—ইহার তৈলের সাহায্যে খুব বেশী ভেষজ ঘি, সাবান, বার্নিশ, রঙ, ছাপাখানার কালি প্রভৃতি এবং ইহার গুঁড়ার সাহায্যে দুধের মত তরল পদার্থ তৈরী হয়। **চীন** ও **যুক্তরাষ্ট্রের** নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত অংশে পৃথিবীর অধিকাংশ ভাটকলাই উৎপন্ন হয়। চীনের উৎপাদনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। চীন ভাটকলাই রপ্তানি করে, আর জাপান, ক্যানাডা, চিলি, পশ্চিম জার্মানী, গ্রীস, স্পেন প্রভৃতি দেশ ইহা আমদানি করে। জাপান ভাটকলাইয়ের তৈল রপ্তানি করে।

(৫) **অলিভ** (Olive)—ইহার তৈল রান্না ও স্যালাড তৈরীর জন্য এবং মাখনের পরিবর্তে ও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। এই তৈল দ্বারা সাবান, নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য, মোমবাতি প্রভৃতি তৈরী হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইহা সবচেয়ে বেশী জন্মে। এই অঞ্চলের অন্তর্গত ফ্রান্স, স্পেন, ইটালি প্রভৃতি দেশ ইহা রপ্তানি করে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, যুক্তরাষ্ট্র, ও আফ্রিকার কতক দেশ ইহা আমদানি করে।

(৬) **পাম** (Oil palm)—ইহার ফল খুব ছোট। এই ফল দ্বারা প্রচুর তৈল তৈরী হয়। এই তৈল অধিক ব্যবহৃত হয় সাবান, মোমবাতি, কৃত্রিম মাখন প্রভৃতি তৈরীর জন্য। নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত আফ্রিকার জায়েরে (কঙ্গো গণতন্ত্র), নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশে স্বাভাবিক অবস্থায়, আর আফ্রিকার অন্য কতক দেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে আবাদী ফসলরূপে পাম গাছ জন্মে।

(৭) **নারিকেল** -ইহার ছিবড়া দ্বারা দড়ি, ম্যাটিং ও গাছের গুঁড়ি দ্বারা ঘরের

খুঁটি তৈরী হয়। নারিকেল শাঁস হইতে উৎপন্ন তৈল সাবান, মোমবাতি, গ্লিসারিন, কৃত্রিম মাখন প্রভৃতি তৈরী এবং রান্নার কাজে ও মাথার চুলে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের শাঁস সুখাদ্য। এই শাঁস এবং শাঁসের দুধ দ্বারা কতক খাদ্যদ্রব্যও তৈরী হয়। উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত **ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ভারত,** শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জে (সমুদ্রতীরের নোনা মৃত্তিকাতে) নারিকেল সবচেয়ে বেশী জন্মে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ওশিয়ানিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও শ্রীলঙ্কা ৯৫% নারিকেলের শাঁস রপ্তানি করে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশ ইহা অধিক আমদানি করে।

(৮) **এরণ্ড (ভেরেণ্ডা) বীজ বা রেড়ি** (Castor) —এই গাছের পাতা রেশম কীটের খাদ্য, আর গাছের বীজ হইতে পাওয়া যায় প্রচুর তৈল। এই তৈল সাবান, মোমবাতি প্রভৃতি তৈরী, ঘরে প্রদীপ জ্বালান এবং ঔষধ ও মাথার তৈল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা সহজে জমিয়া যায় না বলিয়া বিমানপোতের ও অন্যান্য কলকারখানার যন্ত্রপাতিতে মাখাইবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। **ভারত** ও ব্রেজিলে পৃথিবীর প্রায় সমুদয় রেড়িগাছ জন্মে। তন্মধ্যে ভারতের পরিমাণ বেশী। এই দুই দেশই এই বীজ রপ্তানি করে। আর যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ ইহা আমদানি করে।

ভারতের প্রধান কৃষিজ সম্পদ

ফসলের বৈচিত্র্য—ভারতের অধিকাংশ উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত এবং এদেশের জলবায়ু প্রধানতঃ উষ্ণ আর্দ্র **মৌসুমী** প্রকৃতির। তবে দেশের বিভিন্ন অংশে দেখা যায় মরু ও মরুপ্রায়, নাতিশীতোষ্ণ, পার্বত্য প্রভৃতি আরও বহুপ্রকার জলবায়ু। এদেশের নানাস্থানে **মৃত্তিকার পার্থক্যও** খুব বেশী। সেজন্য এদেশের ফসলের মধ্যে কতক (ধান, পাট, ভুট্টা, আখ প্রভৃতি) **উষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলের,** কতক (রাগি, জোয়ার, বাজরা) **শুষ্ক উষ্ণ অঞ্চলের ও** কতক (গম, যব প্রভৃতি) **নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের** ফসল। আর (আলু, কপি, টমেটো প্রভৃতি) **সমভূমিতে** শীতকালে জন্মে, **পার্বত্য অঞ্চলে** জন্মে তাহার বেশ কয়েক মাস আগে। তাহাছাড়া এদেশের নানাপ্রকার ফসলের মধ্যে ৭৫-৯০% **খাদ্যদ্রব্য**। তাহাদের মধ্যে ধান, ভুট্টা প্রভৃতি **খারিফ** ফসল এবং গম, যব, ডাল প্রভৃতি **রবি** শস্য। এদেশের কতক ফসল **শিল্পের উপাদান**। তন্মধ্যে পাট, কার্পাস, তামাক, চা প্রভৃতি প্রধান।

এদেশের কয়েকটি প্রধান কৃষিজ সম্পদের বিষয় পর পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(ক) খাদ্যদ্রব্য

(১) **ধান**—ইহা এদেশের **সর্বপ্রধান** কৃষিজ সম্পদ ও খাদ্যশস্য। এদেশের ৩০% চাষের জমিতে ধান জন্মে।

বিভিন্ন প্রকার ধান ও তাহাদের চাষের ব্যবস্থা—এদেশে তিন রকম ধান জন্মে। তন্মধ্যে **আমন ধানের** পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। আউস বা আশু ধান চাষের উপযোগী অনেক জমিতে পাট বা মেস্তার চাষ হয়। তাই এই ফসলের পরিমাণ কম। গত কয়েক বৎসরে সেচ ও নূতন ধরনের বীজ ব্যবহারের ফলে **বোরো ধানের উৎপাদনের হার** ৩.৪ গুণ **বাড়িয়াছে**। ইহার চাষের জমি এবং ফসল উৎপাদনের পরিমাণও অনেক বাড়িয়াছে।

ধান চাষের অঞ্চল—এদেশের উত্তরে জম্মু ও কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে কেরালা এবং পূর্বদিকে অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর হইতে পশ্চিমদিকে গুজরাট ও মহারাষ্ট্র পর্যন্ত (রাজস্থান ব্যতীত) ধান চাষ হয়। রাজ্য হিসাবে সবচেয়ে বেশী ধান জন্মে **পশ্চিমবঙ্গে** (ধান চাষের জমির পরিমাণ হিসাবে এই রাজ্যের স্থান এদেশে দ্বিতীয়), তারপর **বিহারে** (ধান চাষের জমির পরিমাণ হিসাবে এই রাজ্য প্রথম)।

উৎপাদন—১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে প্রায় ৩ কোটি হেক্টর জমিতে ধান চাষ ও ২.২ কোটি টন চাল উৎপন্ন হইয়াছে। ২।২৪ বৎসরে এদেশে ধান **চাষের জমি** ২৫% **বাড়িয়াছে**, অর্থাৎ (১৯৭৩-৭৪ খ্রীঃ) এদেশে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ হেঃ জমিতে ধান চাষ হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ধান **চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে** (সেচ, সার, উৎকৃষ্ট বীজ, কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার প্রভৃতি) **উন্নতি** হইয়াছে ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ তুলনায় অনেক বেশী। ফলে সম্প্রতি (১৯৭৩-৭৪ খ্রীঃ) এদেশে প্রায় ৪.৪ কোটি টন (অর্থাৎ ঐ বৎসর ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ তুলনায় দ্বিগুণ) চাল উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে ধান চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধির তুলনায় ধানের, বিশেষভাবে **বোরো ধানের**, **উৎপাদন বাড়িয়াছে অনেক বেশী**। এদেশে ধান উৎপাদনের পরিমাণ **পৃথিবীতে দ্বিতীয়** (চীনের পরে)।

(২) **গম**—ইহা এদেশের **দ্বিতীয়** (তবে উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রথম) খাদ্যশস্য। এদেশের প্রায় ১৫% চাষের জমিতে (অর্থাৎ ধান চাষের জমির তুলনায় অর্ধেক জমিতে) ইহার চাষ হয়।

গম চাষের বৈশিষ্ট্য—সাধারণতঃ কোন জমিতে **পর পর গমের চাষ হয় না**। পঞ্জাব ও হরিয়ানা অঞ্চলে দুই বার গম চাষের মাঝখানে একবার কার্পাস বা আখের চাষ হয়, আর মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে দুই বার গম চাষের মাঝখানে চীনাবাদাম বা তিসির চাষ হয়।

গম চাষের অঞ্চল—এদেশের অধিকাংশ (৭৫%) গম জন্মে **পঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশে**। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অংশেও ইহা যথেষ্ট উৎপন্ন হইতেছে। দেশের দক্ষিণ ও পূর্ব অংশে প্রধানতঃ উষ্ণ, আর্দ্র জলবায়ুর জন্য গমের চাষ কম।

উৎপাদন—১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে প্রায় এক কোটি হেঃ জমিতে গমের চাষ ও ৬৮ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হইয়াছে। গত ২৩।২৪ বৎসরে এদেশে গম চাষের **জমি বাড়িয়াছে** দ্বিগুণ, অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ খ্রীঃ এদেশে প্রায় ২ কোটি হেঃ জমিতে গমের চাষ হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে **চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে** (বিশেষতঃ সেচ, সার ও উৎকৃষ্ট বীজ ব্যবহার) **উন্নতির** ফলে গমের **উৎপাদন বাড়িয়াছে** অনেক বেশী। ১৯৭৩-৭৪ খ্রীঃ (খরা ও অন্যান্য অসুবিধা সত্ত্বেও) প্রায় ২ কোটি ২০ লক্ষ টন (১৯৫০-৫১ খ্রীঃ উৎপাদনের তুলনায় প্রায় ৩ গুণ) গম উৎপন্ন হইয়াছে। (ঐ বৎসর ১৯৭১-৭২ খ্রীঃ তুলনায় প্রায় ৩০ লক্ষ টন কম গম উৎপন্ন হইয়াছে।)

(৩) **জোয়ার, রাগি, বাজরা**—এগুলি **নিকৃষ্ট খাদ্যশস্য** এবং দেশের শুষ্ক অঞ্চলে জন্মে। এগুলি তথায়ই গরীব লোকদের প্রধান খাদ্য। দেশের অন্যান্য অংশেও দুর্ভিক্ষের মত অবস্থায় এসকল খাদ্য যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

রাজস্থান হইতে দক্ষিণে **মালভূমির মধ্যভাগে** (যেখানে নিকৃষ্ট মৃত্তিকা ও শুষ্ক জলবায়ুর জন্য ধান চাষ হয় না) ইহাদের চাষ হয়। ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ তুলনায় গত

২৩।২৪ বৎসরে (১৯৭৩-৭৪ খ্রীঃ) ইহাদের চাষের জমির পরিমাণ ২৫% বাড়িয়াছে। (এখন ইহাদের চাষের মোট জমি ধান চাষের জমির তুলনায় সামান্য কম।) কিন্তু এসকল ফসলের উৎপাদন খুব কম। (ধানের উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক।)

(৪) **ভুট্টা**—ইহার গুঁড়ো **উত্তর ভারতের মধ্য অংশের** বহু লোকের অন্যতম প্রধান খাদ্য।

১৯৫০-৫১ খ্রীঃ (৩২ লক্ষ হেঃ) তুলনায় গত ২৩ বৎসরে ইহার চাষের জমি ৭৫%-র বেশী বাড়িয়াছে (১৯৭৩-৭৪ খ্রীঃ ৬০ লক্ষ হেঃ)। চাষের পদ্ধতির উন্নতির (সার, সেচ, উৎকৃষ্ট বীজ প্রভৃতি) ফলে এই সময়ে **উৎপাদন বাড়িয়াছে** ১½ গুণের বেশী (১৯৫০-৫১ খ্রীঃ ২৪ লক্ষ টন ; ১৯৭৩-৭৪ খ্রীঃ ৫৬ লক্ষ টন)। **পঞ্জাব** হইতে **বিহার** পর্যন্ত এদেশের অধিকাংশ (৮০%-এর বেশী) ভুট্টা জন্মে। ইহার সাহায্যে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য (কর্ন ফ্লাওয়ার), গ্লুকোজ প্রভৃতি ক্রমশঃ অধিক তৈরী হইতেছে।

(৫) **যব**—ইহা গম চাষের অনুরূপ অবস্থায় জন্মে। তবে এদেশে গমের তুলনায় ইহার **উৎপাদন খুব কম** (গম চাষের জমির ১০% জমিতে চাষ হয় এবং উৎপাদনও গমের উৎপাদনের ১০%)। ইহার ব্যবহারও কম।

(৬) **ডাল**—এদেশে মসুর, মুগ, ছোলা, কলাই, অড়হর প্রভৃতি নানারকম ডাল উৎপন্ন হয়। এগুলি রবিশস্য (শীতকালে জন্মে)। দেশের প্রায় সর্বত্র কোন-না-কোন রকম ডাল জন্মে। ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে প্রায় ২ কোটি হেঃ জমিতে ডালের চাষ এবং প্রায় এক কোটি টন ডাল উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৭৩-৭৪ খ্রীঃ এদেশে ডাল চাষের জমি বাড়িয়াছে ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ তুলনায় ১০%, উৎপাদনও বাড়িয়াছে প্রায় ১০%।

(খ) শিল্পের উপাদান ও অর্থকরী (বাণিজ্যিক) ফসল

(৭) **কার্পাস**—এদেশের অর্থকরী (বাণিজ্যিক) ফসলের মধ্যে কার্পাস **সর্ব-প্রধান**। এদেশের কার্পাস শিল্প এখন দেশীয় কার্পাসের উপর নির্ভরশীল। এদেশের

প্রচুর কার্পাস বিদেশে রপ্তানিও হয়। আগে এদেশে কেবল **ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত** কার্পাসের চাষ হইত, এখন **মধ্যম ও দীর্ঘ আঁশযুক্ত** কার্পাসই উৎপন্ন হয় অধিক।

চাষের অঞ্চল ও উৎপাদন—১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে প্রায় ৫৯ লক্ষ হেঃ জমিতে কার্পাসের চাষ ও ২৯ লক্ষ বেল বা গাঁট কার্পাস উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৭৩-৭৪ খ্রীঃ এদেশে প্রায় ৭৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে কার্পাসের চাষ ও ৫৮ লক্ষ বেল বা গাঁট কার্পাস উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ গত ২৩/২৪ বৎসরে এদেশে কার্পাস চাষের জমি বাড়িয়াছে প্রায় ৩০%, কিন্তু **উৎপাদন বাড়িয়াছে দ্বিগুণ।** অধিক **সেচ ও সারের ব্যবহার** এবং ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত কার্পাসের চাষ কমাইয়া **দীর্ঘ ও মধ্যম আঁশযুক্ত কার্পাস চাষের** ফলে এরূপ উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে।

এদেশে প্রায় ২০% কার্পাস চাষের জমিতে দীর্ঘ আঁশযুক্ত ও প্রায় ৪০% জমিতে মধ্যম আঁশযুক্ত কার্পাস জন্মে। উৎকৃষ্ট কার্পাসের অধিক চাষ হয় উত্তরে **হরিয়ানা, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশে,** পশ্চিমে **গুজরাটে** ও দক্ষিণে **কর্ণাটক, তামিলনাড়ু** প্রভৃতি রাজ্যে। বিহারের ধানবাদ অঞ্চলেও উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মে। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলেও উৎকৃষ্ট কার্পাস চাষের জন্য চেষ্টা হইতেছে। ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত (নিকৃষ্ট) কার্পাস জন্মে **মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশের** লাভাযুক্ত কৃষ্ণ মৃত্তিকাতে।

(৮) **পাট ও মেস্তা**—পাটশিল্পের উপর এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অনেকটা নির্ভরশীল। বিশেষতঃ পাটের জিনিস রপ্তানি করিয়া বিদেশ হইতে প্রচুর মূল্যবান **স্বর্ণমুদ্রা আমদানি** করা হয়। তাই এদেশে পাটের গুরুত্ব অতুলনীয়। পাটের চাষের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে পাটজাতীয় মেস্তার চাষও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এখন এদেশে পাট ও মেস্তার উৎপাদনের পরিমাণ **পৃথিবীতে প্রথম।**

চাষের অঞ্চল ও উৎপাদন [১৯৪৭ খ্রীঃ দেশবিভাগের সময় এদেশের অংশে মাত্র ২½ লক্ষ হেঃ পাট চাষের জমি ছিল।] ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে ৬ লক্ষ হেঃ জমিতে পাট ও মেস্তা চাষ ও ৩১ লক্ষ বেল বা গাঁট পাট ও মেস্তা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৭৩-৭৪ এদেশে ৮ লক্ষ হেঃ জমিতে পাট ও প্রায় ৪ লক্ষ হেঃ জমিতে মেস্তার চাষ হইয়াছে। ঐ

বৎসর ৬২ লক্ষ বেল বা গাঁট পাট ও প্রায় ১৫ লক্ষ বেল মেস্তা উৎপন্ন হইয়াছে। কাজেই গত ২৩/২৪ বৎসরে এদেশে পাট ও মেস্তা চাষের **জমি** হইয়াছে প্রায় দ্বিগুণ। আর পাট ও মেস্তার **উৎপাদন** বৃদ্ধি হইয়াছে ৭০%।

পশ্চিমবঙ্গে এদেশের প্রায় অর্ধেক পাট ও মেস্তা জন্মে। এখন ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশে আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্য হইতে পশ্চিমে উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত এবং দক্ষিণে উড়িষ্যা হইতে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত পাটের চাষ হয়।

(৯) **আখ** –এদেশে **গুড়, চিনি ও মিছরি** তৈরীর **সর্বপ্রধান উপাদান** আখ। পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী** আখ জন্মে **ভারতে**।

আখ চাষের অঞ্চল ও উৎপাদন –১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে ১৭ লক্ষ হেঃ জমিতে আখের চাষ হয় ও ৭ কোটি টন আখ উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৭৩-৭৪ খ্রীঃ এদেশে ২৭ লক্ষ হেঃ জমিতে আখের চাষ ও প্রায় ১৪ কোটি টন আখ উৎপন্ন হইয়াছে। গত ২৩-২৪ বৎসরে আখ চাষের জমি বাড়িয়াছে ৬০%, কিন্তু সেচ, সার প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে **আখের উৎপাদন বাড়িয়াছে দ্বিগুণ**। এদেশের প্রায় ৭০% আখ জন্মে উত্তর ভারতে পঞ্জাব হইতে বিহার পর্যন্ত, আর ৩০% জন্মে দক্ষিণ ভারতে। আখ চাষের জমি সম্পর্কে রাজ্যগুলির মধ্যে **উত্তর প্রদেশ প্রথম** (দেশের অর্ধেক), আর প্রতি হেঃ জমিতে আখ **উৎপাদনের হার** হিসাবে **মহারাষ্ট্র প্রথম**।

আখ পিষিয়া সঙ্গে সঙ্গে রস বাহির না করিলে, অথবা রস বাহির করিয়া সঙ্গে সঙ্গে

জ্বাল দিয়া গুড়, চিনি প্রভৃতি তৈরী না করিলে রস টক হয়। এজন্য আখ চাষের **জমির আশপাশেই** তৈরী হয় **গুড় ও চিনি** তৈরীর কলকারখানা।

(১০) **তামাক**—গত ২৩-২৪ বৎসরে এদেশে তামাক চাষের জমি বাড়িয়াছে ১৯৫০-৫১ খ্রী. তুলনায় ২৫%, কিন্তু তামাক পাতার উৎপাদন বাড়িয়াছে অন্ততঃ ৬০% (১৯৭৩-৭৪ খ্রীঃ প্রায় ৩½ লক্ষ টন)। এখন তামাক উৎপাদনে এদেশের স্থান **পৃথিবীতে তৃতীয়** (চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের পরে)। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে তামাক অধিক জন্মে।

(১১) **তৈলবীজ**—এদেশে চীনাবাদাম, তিল, তিসি, সরিষা প্রভৃতি তৈলবীজের মোট উৎপাদন **পৃথিবীতে প্রথম**। ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে প্রায় এক কোটি একর জমিতে তৈলবীজের (তাহার অর্ধেক চীনাবাদাম ও ২০% সরিষা) চাষ হয় ও প্রায় ৫০ লক্ষ টন তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৭৩-৭৪ খ্রীঃ প্রায় ১½ কোটি একর জমিতে ইহাদের চাষ হয় ও প্রায় ৯০ লক্ষ টন তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়াছে। ২৩/২৪ বৎসরে এদেশে ইহাদের চাষের জমি বাড়িয়াছে ৫০%, কিন্তু ফসলের উৎপাদন বাড়িয়াছে ৮০%। তন্মধ্যে **সরিষার** উৎপাদন ৭৫% ও চীনাবাদামের উৎপাদন ৫৫% বাড়িয়াছে।

নারিকেল—১৯৫০-৫১ খ্রী. তুলনায় গত ২৩/২৪ বৎসরে (১৯৭৩-৭৪ খ্রীঃ) এদেশে নারিকেলের উৎপাদন প্রায় ৮৫% বাড়িয়াছে। মোট নারিকেল উৎপাদন হিসাবে এদেশ **পৃথিবীতে দ্বিতীয়** (ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের পরে)। এদেশের অধিকাংশ নারিকেল বাগান **কেরালা ও তামিলনাড়ুতে**। তারপর উপকূলের অন্যান্য রাজ্যে। এসকল স্থানের লোনামাটি ও লোনা হাওয়া নারিকেলের পক্ষে উপকারী।

(১২) **আবাদী ফসল**—এদেশে নিম্নলিখিত আবাদী ফসলের চাষ উল্লেখযোগ্য।

(ক) **চায়ের আবাদ ও উৎপাদন**—এদেশের অর্ধেক চা জন্মে **আসামে**, ২৫% এর মত জন্মে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে। **দক্ষিণ ভারতে** কর্ণাটকের ও তামিলনাড়ুর নীলগিরির এলাকাতে চায়ের **উৎপাদন বৃদ্ধি** বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। **দার্জিলিঙের চা** শ্রেষ্ঠ। ত্রিপুরা, বিহারের রাঁচি, উত্তর প্রদেশের দেরাদুন, আলমোড়া ও হিমাচল প্রদেশের কাংড়াতেও চা জন্মে। এদেশের মোট চা উৎপাদন **পৃথিবীতে প্রথম**। ১৯৭৩-৭৪ খ্রীঃ তাহার পরিমাণ প্রায় ৪৮ কোটি কেজি (১৯৫০-৫১ খ্রীঃ তুলনায় ৭০%-এর বেশী), অথচ এই ২৩/২৪ বৎসরে চা চাষের জমি বাড়িয়াছে মাত্র ১৬-১৭%।

(খ) **কফি**—এদেশের ৭৫% কফি জন্মে কর্ণাটকে **নীলগিরি** অঞ্চলে। বাকী

অংশ জন্মে তামিলনাড়ু ও কেরালাতে নীলগিরির আশপাশে। ১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ এদেশে প্রায় ৯০ হাজার টন কফি উৎপন্ন হয় (১৯৫০-৫১ খ্রীঃ তুলনায় ২৫০ গুণ বেশী)। এই সময়ে এদেশে কফি চাষের জমি বাড়িয়াছে ৬৬%।

(গ) **রবার**—১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে উৎপন্ন হইয়াছে প্রায় ১৪,০০০ টন রবার (রস)। তাহার ২৩/২৪ বৎসর পরে (১৯৭৩-৭৪ খ্রীঃ) উৎপন্ন হইয়াছে ১½ লক্ষ টন (ঐ সময়ের ৯ গুণ) রবার। এই সময়ে এদেশে রবার চাষের জমি বাড়িয়াছে প্রায় ৪ গুণ। এদেশের ৯০% এর বেশী রবার উৎপন্ন হয় **কেরালাতে**।

এদেশে **স্বাভাবিক রবারের** (রবার গাছের রস) উৎপাদন এভাবে বাড়িলেও দেশের বর্তমান চাহিদার তুলনায় তাহা কম। সেজন্য এদেশেও **কৃত্রিম** (সিন্থেটিক) **রবারের** উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে (এখন স্বাভাবিক রবারের ৫-১০%)।

(ঘ) **সিঙ্কোনা**—চা-গাছের চাষের উপযুক্ত ঢালু জমি ও উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুতে সিঙ্কোনা গাছের চাষ হয়। ইহার ছাল দ্বারা তৈরী হয় কুইনাইন। দার্জিলিং জেলার **মংপু** ইহার চাষের প্রধান কেন্দ্র।

(খ) পশুপালন ও প্রাণিজ সম্পদ

মনুষ্যসমাজ ও জীবজগৎ—জীবজগৎ **স্থলচর, জলচর** ও **খেচর** অসংখ্য জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গ লইয়া গঠিত। এরূপ অনেক প্রাণীর সহিত মানুষের সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। অতি প্রাচীন কালে যখন মানুষ কৃষি কাজ জানিত না, স্থায়ী ঘর-বাড়ী তৈরী করিতেও শিখে নাই, তখনও পশুর উপর মানুষ নির্ভরশীল ছিল অনেক পরিমাণে। সেই অতীত দিনেও মানুষ **বন্য পশুর মাংস** খাইয়া ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করিত। ক্রমশঃ মানুষ নানা প্রকার পশুপালন আরম্ভ করে। এখনও পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অংশের **তৃণভূমিসমূহের** বহু লোকের **প্রধান উপজীবিকা পশুপালন**। বিভিন্ন গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি পশু পালন ও তাহাদের দুধের ব্যবহার পৃথিবীতে সর্বপ্রথম আরম্ভ হইয়াছে এশিয়া মহাদেশে।

ক্রমশঃ অন্যান্য মহাদেশেও পশুপালন মানুষের অন্যতম প্রধান জীবিকাতে পরিণত হইয়াছে।

পশুপালনের আবশ্যকতা ও বিভিন্ন পশুর গুরুত্ব—কয়েকটি প্রধান **গৃহপালিত** পশু পালনের প্রয়োজনীতা ও ইহাদের গুরুত্বের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইবে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষ ইহাদিগকে নিম্নলিখিত কাজে অধিক ব্যবহার করিতেছে এবং ইহাদের দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হইতেছে।

(ক) **পানীয় ও খাদ্য (দুধ ও মাংস) সরবরাহ**—মানবসমাজের খাদ্যদ্রব্যসমূহ দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত:—(১) নিরামিষ (Vegetarian) ও (২) আমিষ (Non-vegetarian)। এই দুই প্রকার খাদ্যদ্রব্যেরই কতক উপাদান (যেমন, আমিষ জাতীয় মাংস এবং নিরামিষ জাতীয় দুধ, দধি, মাখন, ঘি, ছানা প্রভৃতি) মানুষ বিভিন্ন প্রাণী হইতে লাভ করে। ইহাদের মধ্যে গরুর **দুধ** মাতৃদুগ্ধের মতই মূল্যবান্। বিভিন্ন পশুর মাংসও মানুষের পক্ষে অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। পৃথিবীর সর্বত্র **মেষ-মাংস** ও **ছাগ-মাংস** খাওয়ার রীতি আছে। তাহাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সমাজে হরিণ, শূকর, গরু, বল্গাহরিণ, উট প্রভৃতির মাংস খাওয়ার রীতি আছে। বহু স্থানে স্থানীয় পশুর মাংস দ্বারা মাংসের চাহিদা মিটান সম্ভবপর নহে। ফলে, সুদূর অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশ হইতে জীবন্ত পশু এবং বহু জাহাজের উষ্ণতা-নিয়ন্ত্রিত প্রকোষ্ঠের মাধ্যমে প্রচুর **জমান মাংস** (Frozen meat), কৌটা-ভরা মাংস প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে সরবরাহ করা হয়।

(খ) **অন্যান্য প্রাণিজ সম্পদ সরবরাহ**—গৃহপালিত বিভিন্ন প্রাণী হইতে মানুষ আরও নানাপ্রকার সম্পদ লাভ করে। ইহাদের অধিকাংশ **বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পের উপাদান**। যেমন, **মেষ**, আলপাকা, লামা প্রভৃতির **পশম** বস্ত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে এবং নানাপ্রকার **পশুর চর্ম**, হাতীর দাঁত, হাড়, মহিষের শিঙ প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়।

(গ) **শক্তির উৎস**—অতি পূর্বকাল হইতে মানুষ নানা কাজে পশুশক্তি ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। যেমন, বিভিন্ন দেশে **জমি চাষ**, আখ ও তৈলবীজ পেষণ, গভীর কূপ হইতে কপিকলের সাহায্যে জল সংগ্রহ প্রভৃতি কাজে গরু, মহিষ, উট প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। পূর্বকালে যুদ্ধের সময় ঘোড়া, হাতী প্রভৃতির ব্যবহার সুপরিচিত। বর্তমানে মানুষ সৌরতাপ, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তৈল, কয়লা, জলপ্রবাহ প্রভৃতি নানা সূত্র (Source) হইতে শক্তি লাভ করিতেছে এবং চাষাবাদ, তৈলবীজ পেষণ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার করিতেছে। ফলে, পশুশক্তির ব্যবহার ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে।

(ঘ) **পরিবহন ব্যবস্থা**—অতি প্রাচীনকাল হইতে মানুষ বিভিন্ন পশুকে পরিবহনের কাজে ব্যবহার করিতেছে। ঘোড়ার পিঠে চিঠি-পত্র বহনের ও ঘোড়ার সাহায্যে রথ টানিবার ব্যবস্থা অতি প্রাচীন। এখনও বহু দেশে জিনিসপত্র ও লোকজন বহনের জন্য **গরু, ঘোড়া** ও **মহিষের** গাড়ী এবং **ঘোড়া, গাধা, অশ্বতর** (Mule) প্রভৃতি প্রাণী ব্যবহৃত হয়. ব্রহ্মদেশে বনের কাঠ বহনের জন্য বহু হাতী ব্যবহৃত হয়। তারপর শীতল তুন্দ্রা অঞ্চলে পরিবহনের জন্য একান্ত আবশ্যক প্রাণী হইল শ্লেজকুকুর ও বল্গাহরিণ. তিব্বতের পার্বত্য অঞ্চলে চমরী (Yak), দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ অঞ্চলে লামা ও আলপাকা এবং বিভিন্ন মরুভূমিতে উট মালপত্র পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

গো-মহিষ ও মেষপালনের প্রধান ক্ষেত্রসমূহ

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের অসংখ্য রকমের জীবজন্তুর মধ্যে গরু, মহিষ, মেষ, প্রভৃতি মানবসমাজের পক্ষে সবচেয়ে বেশী উপকারী গৃহপালিত পশু।

(ক) গো-মহিষ

প্রয়োজনীয়তা—গো-মহিষের (Cattle) দুধ মানুষের পক্ষে প্রায় মাতৃদুগ্ধের সমান উপকারী। এজন্য গরুকে **গোমাতা** বলা হয়। দুধের সাহায্যে বিভিন্ন রকমের পুষ্টিকর খাদ্যও তৈরী হয়। তাহাছাড়া নানা দেশে লাঙ্গল টানা, গাড়ী টানা, তৈলের ঘানি টানা, গভীর কূপ হইতে জল উঠান প্রভৃতি বহু কাজে ইহাদিগকে ব্যবহার করা হয়। তারপর গোমাংসও কতক লোকের খাদ্য। তাহাছাড়া মৃত গো-মহিষের চামড়া দ্বারা তৈরী হয় জুতা, ব্যাগ প্রভৃতি; শিং ও খুর দ্বারা তৈরী হয় বহু রকমের প্রয়োজনীয় ও কতক সৌখিন জিনিস, আর হাড় দ্বারা জমির সার তৈরী হয়।

জলবায়ু ও গো-মহিষের খাদ্য—মরু অঞ্চল, মেরু অঞ্চল ও নিরক্ষীয় অঞ্চল ভিন্ন পৃথিবীর অন্য প্রায় সর্বত্র **গরু** দেখিতে পাওয়া যায়। তবে **উষ্ণ** মণ্ডলের পূর্ব অংশে প্রধানতঃ মৌসুমী অঞ্চলে ও **নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের** পশ্চিম ও মধ্য অংশে ইহারা বাস করে সবচেয়ে বেশী। **মহিষ** প্রধানতঃ উষ্ণ মণ্ডলের আর্দ্র অঞ্চলে বাস করে।

কাঁচা ঘাস, কচি ভুট্টা, যব, রাই, ওট এবং বিভিন্ন শস্যের তুঁষ, ভুসি, গম ও ধানের শুকনা খড় (বিচালি) প্রভৃতি গরুর প্রধান খাদ্য। যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, ক্যানাডা, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশের তৃণভূমি অঞ্চলের যে সকল স্থানে **বৃষ্টির** পরিমাণ

বেশী বলিয়া **ভাল ঘাস** জন্মে বা ভাল জাতের ঘাসের চাষ করা হয়, তথায় **দুধের গরু** অধিক পালন করা হয়। আর যেখানকার বৃষ্টি কিছু কম ও ঘাস একটু ছোট, তথায় অন্যান্য গরু পালন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে মাংসের জন্য পালিত গরুগুলিকে আরও মোটা হওয়ার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু দিন **ভুট্টার ক্ষেতে** অবাধে **বিচরণ** করিতে দেওয়া হয়। **উষ্ণ মণ্ডলের** অন্তর্গত মৌসুমী অঞ্চলে গরু, মহিষ বিভিন্ন জমিতে একটি ফসল উঠিবার পর ও অপর ফসল চাষের আগে জমিতে কিছু কিছু ঘাস খাওয়ার সুযোগ পায়। তাহাছাড়া ইহারা বহুপ্রকার ফসলের খড়, জলাভূমির নানারকম বড় বড় ঘাস ও বিভিন্ন তৈলবীজ হইতে প্রাপ্ত খইল খায়।

প্রধান অঞ্চলসমূহ—পৃথিবীতে বর্তমানে (১৯৭৪) প্রায় ১১৮ কোটি গো-মহিষ আছে। তন্মধ্যে পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান দেশের গো-মহিষের সংখ্যা এবং তাহাদের

দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের (মাখন, পনীর) বর্তমান সময়ের (১৯৭৫) উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল।

দেশ	গো-মহিষের সংখ্যা (কোটি)	দুধ (লক্ষ টন)	মাখন (লক্ষ টন)	পনীর (লক্ষ টন)
ভারত	১৮	২৪৬	৪.৪	৫.৭
যুক্তরাষ্ট্র	১২.২	৫৩৫	৪.৩	১৫.৭
সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র	১১.৫	৮৭১	১১.৯	৫.৫
ব্রেজিল	১০.১	৮৩	০.৪	০.৫
আর্জেন্টিনা	৫.৬	৫৪	০.৪	২
অস্ট্রেলিয়া	৩	৭০	১.৯	১

ভারত—এদেশে পালন করা হয় পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী** (পৃথিবীর ১৫%) গরু ও মহিষ। এদেশে গরুর জাতি নিকৃষ্ট বলিয়া গরু, মহিষের সংখ্যার অনুপাতে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের পরিমাণ কম।

যুক্তরাষ্ট্র—এদেশের গরুর **সংখ্যা** পৃথিবীতে **দ্বিতীয়** (পৃথিবীর ১০%), **দুধ** উৎপাদন হিসাবেও এদেশের স্থান **দ্বিতীয়**। **মাংস** ও **পনীর** উৎপাদন সম্পর্কে এদেশের স্থান পৃথিবীতে **প্রথম**। গোপালনের উদ্দেশ্যে এদেশের তৃণভূমি (Ranching ground) অতি বিস্তৃত ও অত্যন্ত উন্নত ধরনের। এখানকার হ্রদ অঞ্চল হইতে পূর্বদিকে উৎকৃষ্ট **ঘাসের চাষ** করিয়া প্রধানতঃ **দুধের গরু** পালন করা হয়। আর প্রেইরী অঞ্চলে মাংসের জন্য গরু পালন করা হয়। তাহাছাড়া ইহাদিগকে বিস্তীর্ণ **ভুট্টার ক্ষেতে** অবাধভাবে **বিচরণ** করিবার সুযোগ দেওয়া হয়।

উপরে দুধের গরু
নীচে মাংসের জন্য পালিত গরু

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র—এদেশের গরুর সংখ্যা পৃথিবীতে **তৃতীয়** (পৃথিবীর প্রায় ১০%)। বিস্তীর্ণ স্টেপ অঞ্চলে প্রয়োজন মত **ঘাসের চাষ** করিয়া দুধ এবং মাংস সরবরাহ—এই দুই উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথক জাতের গরু পালন করা হয়। ভাল জাতের গরু পালন ও তাহাদের উপযুক্ত যত্নের ফলে এদেশে **দুধের** ও **মাখনের** উৎপাদন পৃথিবীতে **প্রথম**।

ব্রেজিলের লানস এবং **আর্জেন্টিনার** পাম্পাস তৃণভূমির নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অন্তর্গত অংশে কোমল ঘাস, আর কতক অংশে কোমল ও শক্ত (মিশ্রিত) তৃণ জন্মে। এগুলি গোপালনের পক্ষে সুবিধাজনক। ফলে, **ব্রেজিলে** গরুর সংখ্যা পৃথিবীতে **চতুর্থ**, **আর্জেন্টিনায় পঞ্চম**। তবে এই দুই দেশে গরুর সংখ্যা অনুপাতে দুধের সরবরাহ কম। এখান হইতে মাংসের সরবরাহ অধিক।

পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপ—পশ্চিম ইউরোপের ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ডস, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের অনেক জায়গাতে খুব ভাল জাতের **দুধের গরু** আছে। এখানকার বহু স্থানে বিভিন্ন ফসল চাষের ফাঁকে ফাঁকে ইহাদের খাদ্য

উৎপন্ন করা হয় (Crop rotation)। তাহাছাড়া বসন্ত কালে পাহাড়ের গায়ে নূতন ঘাস জন্মিলে গরুগুলিকে উপরদিকে লইয়া যাওয়া হয়, আর শীতকালে তুষারপাত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে তাহাদিগকে নীচে লইয়া আসা হয়। ফলে, এসকল দেশে গরুর সংখ্যা অনুপাতে দুধের পরিমাণ বেশী।

অস্ট্রেলিয়ার বিস্তীর্ণ ডাউনস্ তৃণভূমিতে এবং উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন অংশে প্রচুর গরু পালন করা হয় (সংখ্যা পৃথিবীতে ষষ্ঠ)। এদেশের পূর্বদিকে **নিউ জীল্যাণ্ডে** উৎকৃষ্ট তৃণভূমিতে দুধের গরু পালন করা হয়, আর নিকৃষ্ট তৃণভূমিতে মাংসের জন্য গরু পালন করা হয়।

মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্গত বাংলাদেশে গরুর সংখ্যা পৃথিবীতে সপ্তম। পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশেও বহু গরু ও মহিষ পালন করা হয়। ভারতের মত এসকল দেশেরও গরুর জাতি ছোট এবং তাহাদেরও দুধের পরিমাণ কম।

আফ্রিকা—দক্ষিণ আফ্রিকার নাতিশীতোষ্ণ ভেল্ড তৃণভূমিতে অপেক্ষাকৃত ভাল জাতের গরু পালন করা হয়। অন্যান্য স্থানে (ক্রান্তীয় তৃণভূমির বিভিন্ন অংশেও) বহু গরু আছে। তবে উৎকৃষ্ট জাতের নহে। ফলে, এখানেও দুধ ও মাংসের সরবরাহ কম।

(খ) মেষ

প্রয়োজনীয়তা—পৃথিবীর সর্বত্র **মেষ-মাংস** (Mutton) একটি উপাদেয় ও উপকারী খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়. তন্মধ্যে **রোম্‌নে** (Romney) মেষের মাংস সর্বপ্রধান। তাহাছাড়া শীতল অঞ্চলে জামা কাপড়ের সর্বপ্রধান উপাদান হইল মেষের **পশম** (Wool)। তন্মধ্যে **মেরিনো** (Merino) মেষের পশম সর্বোৎকৃষ্ট। মেষের দুধ দ্বারা কিছু মাখন, পনীর ইত্যাদি তৈরী হয়, চর্মদ্বারা তৈরী হয় ব্যাগ, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি, শিঙ, হাড় প্রভৃতি দ্বারা তৈরী হয় কতক প্রয়োজনীয় ও কিছু সৌখিন জিনিস।

মেষপালক ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া পাহারা দিতেছে

জলবায়ু ও মেষের খাদ্য—মেষের শরীর দীর্ঘ লোম দ্বারা আবৃত। তাই উষ্ণ মণ্ডলের পার্বত্য অঞ্চল এবং **নাতিশীতোষ্ণ** ও **শীতল অঞ্চলে** ইহারা বাস করে সবচেয়ে বেশী। এখানকার তৃণভূমি অঞ্চলে এক এক দলে কয়েক হাজার মেষ থাকে।

মেষপালক ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া ইহাদিগকে পাহারা দেয়। **পশমের** জন্য পালিত মেষের সহিত জলবায়ুর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। অধিক উষ্ণ অঞ্চলে ইহারা বাস করিতে পারে না, আবার অধিক বৃষ্টি বা তুষারপাতেও ইহাদের পশম নষ্ট হইয়া যায়। মেষের শরীর ছোট বলিয়া পাহাড়, পর্বতে আরোহণের বা অবাধে চলাফেরার পক্ষে ইহাদের অসুবিধা হয় না। তাই অনেক স্থানেই গ্রীষ্মকালে ইহাদিগকে নিকটবর্তী পাহাড়, পর্বতে লইয়া যাওয়া হয়, আর শীতকালে তুষারপাতের পূর্বে সমভূমিতে লইয়া আসা হয়। গরু, মহিষের মত ইহারা শুকনা খড়, ভূসি, খইল ইত্যাদি খায় না। তবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট তৃণ খায়। সেজন্য **তৃণভূমি অঞ্চল** ও **মরুপ্রায়** অঞ্চলের বাহিরে মেষ খুব কম দেখা যায়।

প্রধান অঞ্চলসমূহ—পৃথিবীর মোট মেষের সংখ্যা এখন (১৯৭৫) ১২৫ কোটি। নিম্নলিখিতগুলি দেশগুলিতে অধিক মেষ পালিত হয় ও বেশী পশম পাওয়া যায়।

দেশ	মেষের সংখ্যা (কোটি)	পশম (লক্ষ টন)	দেশ	মেষের সংখ্যা (কোটি)	পশম (লক্ষ টন)
অস্ট্রেলিয়া	১৮·২	৪·৬	আর্জেন্টিনা	৪·৮	০·৯
সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র	১৫·৭	৩·৫	দক্ষিণ আফ্রিকা গণতন্ত্র	৩·২	০·৬
চীন	৮	—			
নিউ জীল্যাণ্ড	৬	২·৩	যুক্তরাষ্ট্র	১·১	০·৪

অস্ট্রেলিয়া—এদেশের বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে **পৃথিবীর** মধ্যে **সবচেয়ে বেশী মেষ** (পৃথিবীর মোট মেষের ১৫%) পালন করা হয়। গ্রেট্ ডিভাইডিং রেঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিমে নিউ সাউথ ওয়েলস প্রদেশের **ডাউন্স তৃণভূমিতে** সবচেয়ে বেশী মেষ পালন করা হয়। গ্রেট্ ডিভাইডিং রেঞ্জের পশ্চিমদিকে গ্রেট্ অস্ট্রেলিয়ান বেসিন ও তাহার দক্ষিণে মারে বেসিন বা মারে নদীর অববাহিকা, দেশের পশ্চিম অংশে মরুভূমি অববাহিকা ও উত্তর-পশ্চিম অববাহিকা এবং দক্ষিণে ইউক্লা অববাহিকা প্রভৃতি স্থানে **আর্টেজীয় কূপের** সাহায্যে জল সরবরাহের ফলে মেষ পালনের বিশেষ সুবিধা আছে। এখানে **মেরিনো** জাতীয় মেষ বেশী পালন করা হয়। তাই এখানে উৎপন্ন হয় পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী** (পৃথিবীর ২৭%) **পশম**।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র—এদেশের মেষের সংখ্যা **পৃথিবীতে দ্বিতীয়** (পৃথিবীর ১২%) এবং **উত্তর গোলার্ধে প্রথম**। এদেশে **স্টেপ** তৃণভূমিতে মেষের সংখ্যা অধিক এবং তাহাদের পশম উৎকৃষ্ট। এদেশের পশম উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে দ্বিতীয়। এদেশের দক্ষিণ অংশেও কিছু মেষ আছে, তবে তাহাদের পশম নিকৃষ্ট।

চীন—এদেশের ৮০%এর বেশী উচ্চভূমি। এখানকার নিকৃষ্ট তৃণভূমিতে বহু মেষ পালন করা হয়। এদেশের মেষের সংখ্যা পৃথিবীতে **তৃতীয়** (পৃথিবীর ১০%)।

নিউ জীল্যাণ্ডের মেষের সংখ্যা পৃথিবীতে **চতুর্থ** (পৃথিবীর প্রায় ৫%)। এদেশে প্রচুর উৎকৃষ্ট পশম পাওয়া যায়।

আর্জেন্টিনার বিস্তীর্ণ নাতিশীতোষ্ণ **পাম্পাস** তৃণভূমিতে ও প্যাটাগোনিয়া মরুভূমির আশপাশে মরুপ্রায় অঞ্চলে প্রচুর মেষ পালন করা হয়। তাহাদের সংখ্যা পৃথিবীতে পঞ্চম (পৃথিবীর ৫%)। পাশে উরুগুয়ে এবং চিলি দেশেও কিছু মেষ পালন করা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা গণতন্ত্র -এদেশের নাতিশীতোষ্ণ ভেল্ড তৃণভূমিতে বহু মেরিনো জাতীয় মেষ পালন করা হয়। এদেশের মেষের সংখ্যা পৃথিবীতে ষষ্ঠ (পৃথিবীর ৩%)।

যুক্তরাষ্ট্র —এদেশের বিস্তীর্ণ প্রেইরী তৃণভূমি এবং পশ্চিমে পার্বত্য অঞ্চলের গায়ে মেষ পালন করা হয়। ইহাদের সংখ্যা পৃথিবীতে সপ্তম।

ভারত—এদেশে পার্বত্য অঞ্চলে ও অন্যত্র নিকৃষ্ট তৃণভূমিতে বহু মেষ পালন করা হয়। এখানকার উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের মেষ ও ছাগের পশম উৎকৃষ্ট, অন্যান্য অংশের ছাগ ও মেষের পশম নিকৃষ্ট।

ছাগ

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ছাগ পালন করা হয়। ইহারা নিকৃষ্ট তৃণ খাইয়া জীবন ধারণ করে। মরুপ্রায় অঞ্চল ও নিকৃষ্ট তৃণভূমিতে ইহাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। সেজন্য ছাগ মাংস পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে পাওয়া যায়। আর উঁচু পাহাড়, পর্বতের ছাগের দেহ হইতে উৎকৃষ্ট পশম পাওয়া যায়। কাশ্মীরী ছাগের পশম বিখ্যাত।

প্রাণিজ সম্পদ্—ইহাদের ব্যবহার ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের অসংখ্য গৃহপালিত পশুর নিকট হইতে আমরা নিম্নলিখিত জিনিস প্রচুর পরিমাণে পাই।

(ক) **দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য** —প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃ মাতৃজাতীয় প্রত্যেক প্রাণীর দেহে নিজ নিজ সন্তানের জন্য দুগ্ধ সৃষ্টি হয়। তবে **গরু** ও **মহিষ** হইতেই আমরা অধিক দুধ সংগ্রহ করি। পশ্চিম ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্র এবং ওশিয়ানিয়ার অনেক গাভী প্রতি বৎসর গড়ে ২-২½ টনের বেশী দুধ দেয়। এই সকল স্থানের কতক বিখ্যাত জাতের গরু প্রতি বৎসর ৬ টনের বেশী দুধ দেয়। **পশ্চিম ইউরোপে, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের স্টেপ অঞ্চলে, যুক্তরাষ্ট্রের হ্রদ অঞ্চলের দক্ষিণপূর্ব অংশে** এবং

অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণপূর্ব অংশে ও নিউ জীল্যাণ্ডে সবচেয়ে ভাল জাতের গাভী অতিশয় যত্নের সহিত পালন করা হয়। কাজেই এই সকল স্থানে ও ইহাদের আশপাশে প্রচুর **টাটকা দুধ** পাওয়া যায়। দুধ ও মাখন উৎপাদনে **সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র** পৃথিবীতে **প্রথম**। **যুক্তরাষ্ট্রের** স্থান দ্বিতীয়। অনেক দেশে দুধ দোহন করিবার পর (প্রয়োজন মত গরম করিয়া বা না করিয়া) **পাস্তুরাইজ** (Pasturise) করিয়া তাহা বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়। তাহাছাড়া দুধকে **ঘনীভূত** (Condensed milk) করিয়া এবং কখন কখন একেবারে **গুঁড়া** অবস্থায় (Powdered milk) নানা স্থানে সরবরাহ করা হয়। ইহা ভিন্ন দুধের সাহায্যে ঘি, মাখন, পনীর প্রভৃতি বহু জিনিষ তৈরী হয়। ঘি বেশী তৈরী হয় ভারতে।

স্বাভাবিক (তরল) **দুধ** সাধারণতঃ বিশেষভাবে তৈরী ট্রাক, লরী প্রভৃতির সাহায্যে এবং রেলগাড়ীতে বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়। যেমন, নদীয়া জেলার কল্যাণীর পাশে হরিণঘাটা কেন্দ্র হইতে কলিকাতাতে নিয়মিতভাবে দুধ সরবরাহ হয়। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি প্রায় সকল উন্নত দেশের বড় বড় শিল্পকেন্দ্র, নগর প্রভৃতির প্রয়োজনীয় দুধও এভাবে সরবরাহ করা হয়।

ঘন দুধ, গুঁড়া দুধ প্রভৃতি দূর দেশেও আমদানি রপ্তানি হয়। রপ্তানি সম্পর্কে উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা, পশ্চিম ইউরোপের নেদারল্যাণ্ডস, ডেনমার্ক এবং ওশিয়ানিয়ার অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জীল্যাণ্ডের নাম প্রসিদ্ধ। তারপর পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের স্থান। এসকল জিনিস অধিক **আমদানি** করে যুক্তরাজ্য, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশ। **মাখন** অধিক **রপ্তানি** করে অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ডস, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশ। আর তাহা অধিক **আমদানি** করে যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ। **পনীর** অধিক **রপ্তানি** করে যুক্তরাষ্ট্র, নিউ জীল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, নেদারল্যাণ্ডস ও ডেনমার্ক। আর তাহা অধিক **আমদানি** করে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ।

(খ) **মাংস**—দরিদ্র দেশের তুলনায় ধনী দেশে মাংসের ব্যবহার স্বভাবতঃ অধিক। পৃথিবীর সর্বত্র মেষ ও ছাগের (একই জাতি) মাংস ব্যবহৃত হয়। গরু, উট, শূকর প্রভৃতি প্রাণীর মাংসও অনেক মানুষের খাদ্য। তবে গোমাংস হিন্দুগণের পক্ষে এবং শূকর-মাংস মুসলমানগণের পক্ষে অভক্ষ্য। হরিণের মাংসও (বিশেষতঃ শীতপ্রধান দেশসমূহে বল্গা হরিণের মাংস) যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে **মাংস সরবরাহ** সম্পর্কে পূর্বের তুলনায় অনেক **উন্নত ব্যবস্থা** হইয়াছে। এখন

উষ্ণতানিয়ন্ত্রিত গাড়ী (Refrigerator Car) সাহায্যে দেশের বিভিন্ন অংশে এবং বিভিন্ন জাহাজের হিমপ্রকোষ্ঠে অথবা বিশেষভাবে নির্মিত উষ্ণতানিয়ন্ত্রিত জাহাজের সাহায্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে মাংস সরবরাহ করা হয়। তাহাছাড়া রপ্তানিকারী ও আমদানিকারী দেশ বিভিন্ন উষ্ণতানিয়ন্ত্রিত কক্ষে বহুদিন পর্যন্ত ঐ মাংস রাখিয়া দিয়া **জমান মাংস** (Frogen meat) প্রয়োজনমত বাজারে বিক্রয় করে। **কৌটাবদ্ধ মাংসও** (Canned meat) যথেষ্ট বিক্রয় হয়। কতক জীবন্ত পশুও নানাস্থানে ক্রয় বিক্রয় এবং রপ্তানি হয়।

গোমাংস অধিক **রপ্তানি** করে ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জীল্যাণ্ড। মেষ-মাংস অধিক রপ্তানি করে অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও চিলি দেশ। উভয় প্রকার মাংস অধিক **আমদানি** করে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ।

(গ) **পশম**—পৃথিবীর বেশীর ভাগ মেষ পালন করা হয় দক্ষিণ গোলার্ধে, কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ বাস করেন উত্তর গোলার্ধে। এখানকার নাতিশীতোষ্ণ ও শীতল অঞ্চলের অধিবাসিগণেরই পশমের চাহিদা সবচেয়ে বেশী। এজন্য অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা গণতন্ত্র, আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ে হইতে উৎকৃষ্ট পশম

রপ্তানি হয় সবচেয়ে বেশী। আর উৎকৃষ্ট গরম কাপড় তৈরীর জন্য ইহা অধিক **আমদানি** করে যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইটালি, জাপান প্রভৃতি দেশ। সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের দক্ষিণ অংশ, উত্তর আফ্রিকা, ভারত প্রভৃতি দেশের মেষের পশম নিকৃষ্ট। ইহা দ্বারা সাধারণ কম্বল, আসন প্রভৃতি তৈরী হয়। তাই ইহাদেরও কিছু কিছু আমদানি-রপ্তানি হয়। তাহাছাড়া নূতন পশমের সহিত **পুরানো পশম** ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। (পশমের তৈরী পুরানো জিনিস খুলিয়া ফেলিয়া তাহার সাহায্যে আবার নূতন জিনিস তৈরীর কাজ অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।)

(ঘ) **পশুচর্ম**—বন্য, গৃহপালিত এবং জলজ—বিভিন্ন প্রকার পশুর চর্ম মানুষ নানা কাজে ব্যবহার করে। তবে ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ (৯০% অংশ) পাওয়া যায় গরু, মহিষ, মেষ, ছাগ, ঘোড়া, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত জীবজন্তুর দেহ হইতে। আর মানুষের ব্যবহারোপযোগী বাকী চামড়া পাওয়া যায় খেঁকশিয়াল, হরিণ, খরগোশ, বানর, সাপ, ক্যাঙ্গারু, হাঙ্গর, কুমীর প্রভৃতি অসংখ্য জীবজন্তু হইতে।

বিভিন্ন প্রকার চর্মের মধ্যে বড় বড় জন্তুর মোটা ও পুরু চামড়াকে বলা হয় Hides। যেমন, হাতীর চর্ম (Elephant hides), জলহস্তীর চর্ম (Walrus hides), বৃষ, ষাঁড় বা গাভীর চর্ম (Ox and cow hides), ঘোড়ার চর্ম (Horse hides) ইত্যাদি। অপরদিকে ছোট জন্তুর চামড়াকে বলা হয় Skins। যেমন, ক্যাঙ্গারু চর্ম (Kangroo skin), ছাগশিশু চর্ম (Kid skin), মেষশাবক চর্ম (Lamb skin) ইত্যাদি।

গরু ও মহিষের চর্ম সবচেয়ে বেশী রপ্তানি করে ভারত, মেষ চর্ম অধিক **রপ্তানি** করে অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড, স্পেন, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশ। আর এসকল চর্ম অধিক **আমদানি** করে পশ্চিম ইউরোপের যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য দেশ।

অনুশীলনী

(ক) ১। কৃষিকার্য কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক বিষয়ের উপর একান্ত নির্ভরশীল? ইহাদিগকে কৃষির পক্ষে প্রাকৃতিক বাধা বলা হয় কেন? ২। কৃষিকার্যের সাফল্য আর কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে? ইহাদের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৩। চাষের পদ্ধতি অনুসারে কৃষিকার্য কতভাগে বিভক্ত? কি কি? সংক্ষেপে আলোচনা কর। বাৎসরিক ফসল উৎপাদনের পার্থক্য অনুসারে কৃষিকার্য কতভাগে বিভক্ত? সংক্ষেপে আলোচনা কর। বৃষ্টিপাতের পরিমাণের সহিত কৃষির পার্থক্য অনুসারে কৃষিকার্য কত ভাগে বিভক্ত? কি কি? সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৪। পৃথিবীর কোন্ কোন্ মহাদেশে কৃষিঅঞ্চল অধিক বিস্তৃত? কোন্ কোন্ মহাদেশে কম? উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের মহাদেশগুলির মধ্যে কৃষি অঞ্চল সম্বন্ধে কি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়? বিভিন্ন মহাদেশে কৃষি অঞ্চলে কোন্ কোন্ ফসল অধিক উৎপন্ন করা হয়? ইহাদের উৎপাদনের উদ্দেশ্য কি? ৫। পৃথিবীর প্রধান কৃষিজ সম্পদসমূহ ইহাদের ব্যবহারের পার্থক্য অনুসারে কত ভাগে বিভক্ত? বিভাগগুলি কি কি? ৬ কৃষির জন্য জলসেচের প্রয়োজন কি? ভারতে পূর্বে কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে সেচকার্য হইত? এখন কোন্ পদ্ধতিতে সেচকার্যের অধিক উন্নতি হইয়াছে? বহুমুখী নদী প্রকল্প বলিতে কি বুঝায়? এদেশের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ অংশে একটি করিয়া প্রধান নদী প্রকল্পের মাধ্যমে সেচকার্য

বর্ণনা কর। পশ্চিমবঙ্গে কোন্ কোন্ নদী প্রকল্প অনুসারে অধিক সেচকার্য হয়? তাহাদের সাহায্যে এই রাজ্যের কোন্ কোন্ অংশের অধিক উন্নতি হইতেছে? এদেশের প্রাচীনতম সেচপ্রকল্প কোন্‌টি? স্বাধীন ভারতের সর্বপ্রথম সেচপ্রকল্প কোন্‌টি? ৭। এদেশের কৃষিকার্য সম্পর্কে বৃহৎ নদী প্রকল্প ভিন্ন আর কোন্ পদ্ধতিতে সেচকার্য হয়? তাহাদের গুরুত্ব কিরূপ? ৮। ধান চাষের জন্য কোন্ কোন্ ভৌগোলিক অবস্থা সুবিধাজনক? পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে ধান অধিক উৎপন্ন হয়? আমাদের দেশে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে কোন্ কোন্ জাতীয় ধানের চাষ হয়? ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান? ৯। গম চাষের জন্য কোন্ ভৌগোলিক অবস্থা বিশেষ উপকারী? শীত- ও বসন্তকালীন গমের চাষের মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়? গম এবং ধান একই অঞ্চলে চাষ করা হয় না কেন? এই দুই ফসলের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে কি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়? ১০। পাট ও আখ চাষের জন্য কোন্ কোন্ ভৌগোলিক অবস্থা আবশ্যক? এই দুই ফসল এক অঞ্চলে চাষ করা হয় না কেন? ইহাদের চাষের অবস্থা তুলনা কর। ১১। চা, কফি ও কোকোকে পানীয় ফসল বলিয়া বর্ণনা করা হয় কেন? এগুলি কোন্ জাতীয় ভৌগোলিক অবস্থাতে অধিক উৎপন্ন হয়? এই তিন ফসলের মধ্যে কোন্‌টি পৃথিবীর কোন্ অংশে সবচেয়ে বেশী উৎপন্ন হয়? চা-পাতা সংগ্রহের জন্য কোন্ জাতীয় শ্রমিক অধিক প্রয়োজন? ১২। কার্পাস কত ভাগে বিভক্ত? ইহাদের কোন্ বিভাগ বস্ত্র শিল্পের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ? কার্পাস চাষের জন্য কোন্ ভৌগোলিক অবস্থা উপকারী? তাহা আলোচনা কর। পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে কার্পাস অধিক উৎপন্ন হয়? ১৩। পাট চাষের জন্য কোন্ ভৌগোলিক অবস্থা বিশেষ প্রয়োজন? ইহা কোন্ দেশে এখন সর্বাপেক্ষা অধিক জন্মে? ইহা কোন্ কোন্ কাজে অধিক ব্যবহৃত হয়? ১৪। তৈলবীজ কাহাকে বলে? এগুলি কি কি কাজে অধিক ব্যবহৃত হয়? এদেশে কোন কোন্ তৈলবীজ অধিক জন্মে?

(খ) ১। গো-মহিষ পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে অধিক পালন করা হয়? ইহাদিগকে কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে অধিক পালন করা হয়? কোন্ কোন্ দেশে অধিক গোপালন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের গোপালন ব্যবস্থার সহিত ভারতের গোপালন ব্যবস্থার তুলনা কর। ২। মেষ কোন্ অঞ্চলে অধিক পালন করা হয়? পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে ইহাদের সংখ্যা বেশী? ইহাদিগকে কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে অধিক সংখ্যায় পালন করা হয়? ৩। আমরা প্রাণিজগৎ হইতে কোন্ কোন্ সম্পদ অধিক পরিমাণে লাভ করি? ইহাদিগকে কোন্ কোন্ কাজে অধিক ব্যবহার করি? ৪। দুধ, মাংস ও পশম কি ভাবে বিভিন্ন স্থানে আমদানি-রপ্তানি করা হয়?

নবম অধ্যায়

শ্রম শিল্প

শিল্পের ক্রমবিকাশঃ প্রাচীন ও আধুনিক শিল্প –মানুষের প্রথম আবির্ভাবের সময় হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত তাহাদের বিভিন্ন বিষয়ে ক্রমোন্নতি ও নানাপ্রকার জিনিসের ব্যবহার সম্পর্কে ইহা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় যে মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের রূপ নানাভাবে পরিবর্তিত করিয়া নূতন নূতন জিনিস সৃষ্টি করিতেছে। আর তাহাদের সাহায্যে পূরণ করিতেছে তাহাদের বিভিন্ন রকম চাহিদা। এরূপ **নূতন জিনিস সৃষ্টিই শিল্প**। তাই **শিল্পীর** সংখ্যা অগণিত। একদিকে মানুষের শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতির ক্রমোন্নতি, তাহাদের রুচি ও অর্থ সামর্থ্যের পরিবর্তন ও বিভিন্ন জিনিসের জন্য চাহিদা বৃদ্ধি হইতেছে। অপরদিকে বিভিন্ন জিনিসের উৎপাদন ও তাহাদের সরবরাহ সম্পর্কে ক্রমশঃ অধিকতর উন্নত ব্যবস্থা হইতেছে। এরূপ নানা কারণে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের বৈচিত্র্য ও পরিমাণ প্রতিনিয়ত বাড়িয়া চলিয়াছে।

বিভিন্ন শিল্পদ্রব্যের মধ্যে কতকগুলিকে মানুষ তৈরী করে আপন **মনের তৃপ্তির** জন্য, আপন **চিন্তাকে রূপ দেওয়ার** জন্য। আর কতকগুলিকে মানুষ তৈরী করে অপরের **চাহিদা পূরণের** জন্য এবং আপন **জীবিকা নির্বাহের** উদ্দেশ্যে। এজন্যই সুদূর অতীত হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত কত শিল্পী নিজেদের গৃহকোণে বসিয়া কত বিচিত্র শিল্পের অনুশীলন করিতেছেন! তাঁহাদের এরূপ প্রচেষ্টার ফলেই পূর্বকালে ভারতে তৈরী হইয়াছে মসলিন। আর দেশবিদেশে আজও তৈরী হইতেছে অনেক রকমের শিল্পদ্রব্য, যাহাদের কলাকৌশল সকলের মনকে মুগ্ধ করে। এগুলি **কারুশিল্প** (Art and craft)। বিভিন্ন শিল্পী আপন ঘরে বসিয়া নানাজাতীয় যে সকল শিল্পদ্রব্য তৈরী করেন ইহাদিগকে সাধারণতঃ বলা হয় **কুটীর শিল্প** বা **উটজ শিল্প** (Cottage industry)। তারপর গ্রামে গ্রামে কুটিরে কুটিরে, পল্লীতে পল্লীতে কতক শিল্পীগোষ্ঠী প্রধানতঃ জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে বহু জিনিস অতি প্রাচীনকাল হইতে তৈরী করিতেছেন। গ্রামের কামার, কুমার, তাঁতী প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের তৈরী বিভিন্ন প্রকার শিল্পকে বলা হয় **গ্রামীণ বা গোষ্ঠী শিল্প** (Village or Community industry)। এপ্রকার শিল্পের কেন্দ্রগুলি সাধারণতঃ খুব ছোট, কর্মীর সংখ্যাও কম। ইহাদের জন্য শিল্পের উপাদানের প্রয়োজনও কম। **প্রাচীনকালে** ইহাদের জন্য যন্ত্রপাতি নামমাত্র ব্যবহৃত হইত, **শিল্পীর কলাকৌশলই** ইহাদের উন্নতির প্রধান কারণ। কাজেই সে যুগের প্রায় সমুদয় শিল্পই ছিল (পরিমাণ হিসাবে) **ক্ষুদ্র শিল্প**, যদিও গুণপনা হিসাবে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই ছিল যথেষ্ট উন্নত ধরনের, অর্থাৎ **কারুশিল্প**।

তারপর হইতে ক্রমশঃ মানুষের সংখ্যা বা গোষ্ঠী বৃদ্ধি, বিভিন্ন শিল্পদ্রব্যের ও অন্যান্য জিনিসের চাহিদা বৃদ্ধি এবং মানবসমাজের শিক্ষা, সভ্যতা, রুচি ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইতেছে। এসকল কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সৃষ্টি বা উৎপন্ন হইতেছে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে নানা জাতীয় শিল্পদ্রব্য। আগেকার পদ্ধতিতে ইহাদের অনেকগুলিই এত অধিক পরিমাণে উৎপাদন সম্ভবপর নহে। তাই ক্রমশঃ **শিল্পকেন্দ্রের** ও **শিল্পীর সংখ্যা বৃদ্ধি** ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় **উপাদানের** (কাঁচা মাল) উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি হইতেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর সাহায্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে ক্রমশঃ **অধিক শক্তি** ও আধুনিক **যন্ত্রপাতি**। (অবশ্য বর্তমানে অনেক কুটির শিল্পের কেন্দ্রেও কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতেছে।) আর বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইতেছে নিত্য নূতন **কলকারখানা**। ইহাদের মাধ্যমে তৈরী হইতেছে কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের তুলনায় শত সহস্র গুণ বেশী জিনিস। ইহাই **আধুনিক বৃহৎ শিল্পের** বা **শ্রমশিল্পের** (Manufacturing industries) বৈশিষ্ট্য। এরূপ অনেক কারখানাতে ২৪ ঘণ্টাই কাজ চলে। এবিষয়ে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র প্রভৃতি **শ্রমশিল্পে উন্নত** দেশের উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের তুলনায় আমাদের দেশ সহ পৃথিবীর বহু দেশ এখনও বৃহৎ শিল্পে অনগ্রসর। তবে অনেক দেশই এই বিষয়ে উন্নতির জন্য সচেষ্ট বা **উন্নতিশীল**। আমাদের **ভারত** তাহাদের মধ্যে অগ্রণী। শিল্প সম্বন্ধে আমাদের দেশের অপর বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে বর্তমানে **বৃহৎ** ও **ক্ষুদ্র শিল্প** উভয় জাতীয় শিল্পেরই উন্নতি হইতেছে। অথচ **যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স** প্রভৃতি দেশে এখন **বৃহৎ শ্রমশিল্পেরই যুগ**।

শিল্পের শ্রেণীবিভাগ—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের শিল্পসমূহ তাহাদের প্রাধান্যের কাল, উৎপাদনের অঞ্চল, শিল্পে নিযুক্ত লোক বা শ্রমিকের সংখ্যা, শিল্পের জন্য ব্যবহৃত উপাদান প্রভৃতির পার্থক্য অনুসারে নানাভাগে বিভক্ত।

(১) **শিল্পের প্রাধান্যের কাল অনুসারে বিভাগ**—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের কতক শিল্প বহু শত, সহস্র বৎসরের পুরানো। এগুলি **প্রাচীন শিল্প**। বস্ত্রশিল্প, লৌহশিল্প প্রভৃতি ইহাদের মধ্যে অন্যতম। এরূপ কতক শিল্প আজও প্রচলিত, আবার কতক অপ্রচলিত বা মৃত। কতক প্রাচীন শিল্পের পুনরুজ্জীবন চলিতেছে। যেমন, শোলা শিল্প। অপরদিকে কতক শিল্প সম্পূর্ণ **আধুনিক**। যেমন, কৃত্রিম রেশম শিল্প, প্ল্যাস্টিক শিল্প প্রভৃতি।

(২) **শিল্পের উৎপাদনের অঞ্চল অনুসারে বিভাগ**—অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত কতক শিল্প বিভিন্ন শিল্পী বা শ্রমিকের বাড়িতে কেন্দ্রীভূত।

এগুলিকে বলা হয় **কুটীর শিল্প**। আমাদের দেশে অনেক গ্রামে এজাতীয় কতক শিল্পের বহু কেন্দ্র দেখা যায়। এগুলিকে বলা হয় **গ্রামীণ শিল্প**।

(৩) **শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা অনুসারে বিভাগ**—কতক শিল্পকেন্দ্রে সামান্য কয়েক জন মাত্র লোক কাজ করেন। স্বভাবতঃ এসকল কেন্দ্রের উৎপাদনের পরিমাণও কম। ইহাদিগকে বলা হয় **ক্ষুদ্র (Small scale) শিল্প**। অধিকাংশ কুটীর শিল্প এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আবার কতক গ্রামে বা অঞ্চলে দেখা যায় বহু লোক এক একটি শিল্পে নিযুক্ত। এগুলি গ্রামীণ শিল্প বা **গোষ্ঠী শিল্প**। অপরদিকে কতক বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রে হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করেন। এগুলি **বৃহৎ (Large scale) শিল্প**। জামসেদপুরের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা এদেশে এই জাতীয় শিল্পের সর্বপ্রধান উদাহরণ। বৃহৎ **শ্রমশিল্পে** প্রচুর পরিমাণে যন্ত্রপাতি ও কলকব্জাও ব্যবহৃত হয়। অনেক পাশ্চাত্য দেশে স্বয়ংক্রিয় (Automatic) যন্ত্রপাতির ব্যবহার ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে বাড়িতেছে।

(৪) **শিল্পের উপাদান অনুসারে বিভাগ**—কুটীর শিল্প, গ্রামীণ শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প, শ্রম শিল্প বা বৃহৎ শিল্প প্রভৃতি সকল প্রকার শিল্পই তাহাদের প্রধান বা মুখ্য উপাদান অনুসারে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। যেমন -

কৃষিজ সম্পদ-ভিত্তিক শিল্প—কার্পাস বস্ত্র, চিনি, চা প্রভৃতি এই জাতীয় শিল্প।
খনিজ সম্পদ ভিত্তিক শিল্প—লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।
উদ্ভিজ্জ সম্পদ-ভিত্তিক শিল্প—কাগজ, বোর্ড প্রভৃতি এই জাতীয় শিল্প।
প্রাণিজ সম্পদ ভিত্তিক শিল্প—চর্ম শিল্প, পশম শিল্প, রেশম শিল্প প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

শিল্পের বুনিয়াদ—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের শ্রম শিল্পসমূহের **সৃষ্টি ও উন্নতি** নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয়ে অধিক সুবিধার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এগুলিই **শিল্পোন্নতির প্রধান ভৌগোলিক কারণ**।

শিল্পের বুনিয়াদ

- প্রাকৃতিক
  - শিল্পের উপাদান
  - জলবায়ু
  - শক্তির উৎস
- অর্থনৈতিক
  - পরিবহন
  - যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা
  - মূলধন
  - উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা ও সরবরাহ
  - ক্রয়বিক্রয় ব্যবস্থা ও বাণিজ্য-কেন্দ্র
  - পরিচালনার ব্যবস্থা
  - উপজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন
- রাজনৈতিক
  - সরকারী সহানুভূতি সাহায্য ও পরিচালনা
  - করপ্রথা, পেটেন্ট ও অন্যান্য বিষয়ে আইন কানুন
  - শিল্পনীতি ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা
- মানবিক বা সাংস্কৃতিক
  - শ্রমিক ও শ্রমশক্তি
  - কারিগরি শিক্ষা, গবেষণা ও আবিষ্কার
  - স্থিতি-প্রবণতা বা ঐতিহ্য
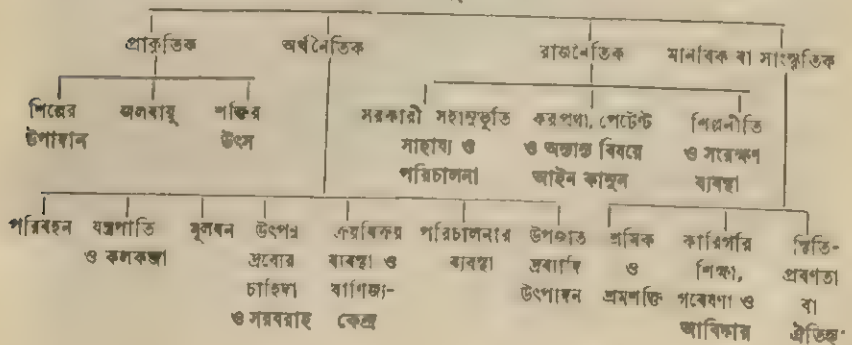
উপরিলিখিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর নানাপ্রকার শিল্পের উন্নতি ও প্রসার এত অধিক নির্ভরশীল যে ইহাদিগকে **শিল্পের বুনিয়াদ** বা **ভিত্তি** (Infra-structure) বলা হয়। ইহাদের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(ক) **প্রাকৃতিক ভিত্তি বা ঐ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ**—এসকল বিষয় তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত।

(১) **শিল্পের উপাদান** (Raw materials)—কতক শিল্প মূলতঃ একটিমাত্র উপাদানের উপর নির্ভরশীল। যেমন, মৃৎশিল্প, কাষ্ঠশিল্প প্রভৃতি। আবার কতক শিল্পের জন্য একাধিক উপাদান প্রয়োজন। যেমন, লৌহ ও ইস্পাতশিল্প। তবে এসকল উপাদানের মধ্যে কতক **প্রধান**, আর কতক অপ্রধান বা **গৌণ**। পৃথিবীর যে স্থানে এরূপ যে-কোন একটি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় একমাত্র উপাদান বা প্রধান উপাদান খুব বেশী পাওয়া যায়, সেই স্থান ঐ শিল্পের উন্নতির পক্ষে সুবিধাজনক। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার আশপাশে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পাট সংগ্রহ করার সুযোগ থাকাতে এখানে পাট শিল্পের পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রধান কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে এই পাটের অধিকাংশই স্থানীয় উৎপাদন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে যদি কোথাও **শিল্পকেন্দ্রের আশপাশে** ঐ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান **অধিক উৎপন্ন** হয়, তবে তথায় ইহার পরিবহনের জন্য অধিক সময় এবং অর্থ ব্যয় করা দরকার হয় না। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে শিল্পদ্রব্য তৈরীর ব্যয় স্বভাবতঃ কমিয়া যায়। অপর পক্ষে অন্য স্থান হইতে আমদানি-করা উপাদানের সাহায্যে কোন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য পরিবহন খরচ খুব বেশী। শিল্পের উপাদানের পরিবহন সম্পর্কে অন্য একটি বিষয়ও খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, **লৌহ, পাট, কার্পাস, পশম**, কাঠ প্রভৃতি কতক উপাদান যথেষ্ট **দূরদেশ** হইতে সংগ্রহ করা যায়, অথবা বহুদিন সঞ্চয় করিয়াও রাখা যায়। কিন্তু **আখ, বীট** প্রভৃতি উপাদান উৎপাদনক্ষেত্র হইতে দূরে প্রেরণ করা সম্ভবপর নয়, বেশী সময় সঞ্চয় করিয়া রাখাও সম্ভব নয়। কাজেই ইহাদের উৎপাদন-ক্ষেত্র হইতে দূরবর্তী অঞ্চলে ইহাদের দ্বারা শিল্পদ্রব্য তৈরী করা সম্ভব হয় না।

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নানা প্রকার শিল্পদ্রব্যের চাহিদা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে. আর এই চাহিদা পূরণের জন্য শিল্পের উৎপাদনও বহু গুণ বৃদ্ধি হইতেছে। এরূপ উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেক ক্ষেত্রে পুরানো শিল্পদ্রব্যের **ভাঙ্গা টুকরা** (Scrap) প্রচুর পরিমাণে নূতন উপাদানের সহিত মিশাইয়া নূতন শিল্পদ্রব্য তৈরী হইতেছে। লোহা, তামা, এলুমিনিয়াম প্রভৃতির ভাঙ্গা জিনিস, এমন কি ছেঁড়া কাপড়, কাগজের টুকরা প্রভৃতিও বিভিন্ন শিল্পের নূতন উপাদানের সহিত মিশান হইতেছে।

শিল্পের জন্য নূতন বা পুরাতন যেরূপ উপাদানই ব্যবহৃত হয় না কেন, উপাদানের প্রাধান্য অনুসারে শিল্পসমূহ উদ্ভিজ্জ সম্পদ ভিত্তিক, কৃষিজ সম্পদভিত্তিক, প্রাণিজ সম্পদভিত্তিক ও খনিজ সম্পদভিত্তিক—এরূপ ভাগে বিভক্ত।

(২) **শক্তির উৎস**—বৃহৎ শ্রমশিল্পের উন্নতি সম্পর্কে শক্তির চাহিদা এত বেশী যে, কোথাও শিল্পের উপযুক্ত পরিমাণ ইন্ধনশক্তি (Fuel) পাওয়া না গেলে শিল্প গড়িয়া উঠে না। যেমন, বাংলাদেশে প্রচুর পাট জন্মে (পৃথিবীতে দ্বিতীয়)। কিন্তু কয়লা ও বিদ্যুৎশক্তির অভাবে বহুকাল এখানে পাট-শিল্প গড়িয়া উঠে নাই। এখন জলজ ও তাপ বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে এই শিল্প এখানে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে।

ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পের (মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প প্রভৃতি) শক্তির উৎস হইল **মনুষ্য শক্তি** (Man power)। কতক ক্ষুদ্র শিল্পের (কাঠের ঘানির সাহায্যে তিল, সরিষা প্রভৃতির তৈল তৈরী, আখের রস তৈরী প্রভৃতি) জন্য ব্যবহৃত হয় **পশু শক্তি** (Quadruped power)। আর আখের রস জ্বাল দিয়া গুড় তৈরী, সামান্য পরিমাণ লোহা গলাইয়া সাধারণ যন্ত্রপাতি তৈরী প্রভৃতি শিল্পের জন্য শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয় **কাঠ, কাঠ কয়লা** (Charcoal power) বা **কয়লা**। পশ্চিম ইউরোপের নেদারল্যাণ্ডস্ ও আশপাশের অনেক জায়গাতে বায়ু কলের (Wind mill) বা **বায়ু শক্তির** (Wind power) সাহায্যে পেষণ যন্ত্র চালু করিয়া গম হইতে ময়দা তৈরী হয়। তারপর যুক্তরাজ্যের ম্যাঞ্চেস্টার অঞ্চলের এবং যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব অংশে নিউ ইংল্যাণ্ড স্টেটের অনেক ছোট কারখানার কল প্রথম অবস্থায় নদী ও জলপ্রপাতের **প্রবল জলস্রোতের** বেগে চলিত।

আগেকার তুলনায় **বর্তমানে** পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কলকারখানার সংখ্যা অনেক বেশী। তাহাদের অধিকাংশের আয়তনও আগেকার চেয়ে অনেক গুণ বড়। এরূপ এক একটি বিরাট কারখানার জন্য যন্ত্রপাতি, কলকব্জা প্রভৃতিরও প্রয়োজন আগেকার তুলনায় বহুগুণ বেশী। আর এসকল কারখানার যন্ত্রগুলি চলেও আগেকার তুলনায় অনেক বেশী দ্রুত গতিতে। এরূপ অধিকাংশ কল-কারখানাতেই কাজ চলে ৮ ঘণ্টা হিসাবে দৈনিক ২।৩ বার (in different shifts)। কাজেই এখন বিভিন্ন দেশের **শিল্পকেন্দ্রে** শক্তির উৎস হিসাবে **প্রাকৃতিক গ্যাস** (Natural gas), **খনিজ তৈল, কয়লা, তাপবিদ্যুৎ শক্তি** (Thermal power) এবং **জলজ বিদ্যুৎশক্তি** (Hydro-electric power) ব্যবহৃত হয় সবচেয়ে বেশী। ইহাদিগকে বলা হয় **যান্ত্রিক শক্তি** (Mechanical energy)। ভবিষ্যতে বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে **আণবিক শক্তি** (Atomic energy), **সৌর-তাপশক্তি** (Solar radiation) প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইবে।

(৩) **জলবায়ু**—প্রায় সকল প্রকার শিল্পের সহিত জলবায়ুর কতক **সম্পর্ক সাধারণ** ধরনের। যেমন, উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে শ্রমিকগণ সহজেই ক্লান্ত হন, কিন্তু উষ্ণ অঞ্চলেও শীতকালে তাঁহাদের পক্ষে বেশী পরিশ্রম করা সম্ভবপর। অপরদিকে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের প্রায় সারা বৎসরের জলবায়ুই কঠোর শ্রমের পক্ষে উপযোগী।

এরূপ সাধারণ সম্পর্ক ছাড়া কতক শিল্পের সহিত জলবায়ুর সম্পর্ক আরও গভীর। এই সম্পর্ক দুই প্রকার—মুখ্য বা প্রত্যক্ষ (Direct) এবং গৌণ (Indirect)।

প্রত্যক্ষ ভাবে **কার্পাস** ও অন্যান্য প্রকার বস্ত্র **বয়ন শিল্পের** জন্য দরকার **আর্দ্র** (Humid) জলবায়ু। (প্রয়োজনমত পাক দেওয়ার সময় সূতা শুষ্ক জলবায়ুতে অধিক ছিঁড়িয়া যায়।) ভারতের বোম্বাই-আহমদাবাদ অঞ্চলে, যুক্তরাজ্যের ম্যাঞ্চেস্টার অঞ্চলে, জাপানের কোবে-ওসাকাতে বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক আর্দ্রতা অধিক বলিয়া বস্ত্রশিল্পের উন্নতির পক্ষে বিশেষ সুবিধা আছে। আবার **ময়দা**, সুজি প্রভৃতি তৈরীর জন্য দরকার **শুষ্ক** (Dry) জলবায়ু। ভারতের উত্তর-প্রদেশ, হরিয়ানা, পঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যের জলবায়ু শুষ্ক। (অবশ্য এই সকল স্থানে গমও জন্মে অধিক।) তাই এই অঞ্চলে গমজাত দ্রব্যের উৎপাদন অধিক। তারপর সিনেমা শিল্প বা **চলচ্চিত্রের** জন্য দরকার নির্মেঘ, **উজ্জ্বল আকাশ** ও প্রচুর **সূর্যকিরণ**। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের হলিউডের জলবায়ু এপ্রকার। (অবশ্য এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং অন্যান্য বিষয়ে সুযোগ সুবিধাও প্রচুর।) তাই এই শিল্প অধিক উন্নত।

জলবায়ুর **পরোক্ষ** প্রভাব সম্পর্কে দেখা যায় যে নাতিশীতোষ্ণ বা মৃদুশীতল ও শীতল অঞ্চলে গরম বা পশমী জামার চাহিদা বেশী। তাই এখানে পশম শিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা বেশী। অপর দিকে উষ্ণ মণ্ডলে কলকারখানার যন্ত্রাদি অল্পেই অধিক উত্তপ্ত হইয়া পড়ে। তাই এখানে (বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে) কারখানাতে কলকব্জা ও যন্ত্রের সাহায্যেও বেশী সময় কাজ করা যায় না। জলবায়ুর এপ্রকার **প্রভাব** যথাসম্ভব কমাইবার উদ্দেশ্যে আজকাল অনেক জায়গাতে উষ্ণতা-নিয়ন্ত্রিত (Air conditioned) কক্ষে কলকারখানার যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়। তারপর কোথাও অত্যধিক বৃষ্টি হইলে বন্যার ফলে শিল্পকেন্দ্রে কাজের ক্ষতি হয়, এমন কি সাময়িকভাবে কাজ বন্ধও থাকে। ইহা ভিন্ন কতক শিল্পের উপাদানসমূহের (আখ, চা, বাঁট, কার্পাস প্রভৃতি ফসল ও কাঠ ইত্যাদি) উৎপাদন, ইহাদের ও যন্ত্রাদির শিল্পকেন্দ্রে **পরিবহন** এবং তথা হইতে শিল্পজাত দ্রব্য সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়েও দেখা যায় জলবায়ুর গৌণ বা পরোক্ষ প্রভাব।

(খ) **অর্থনৈতিক ভিত্তি বা ঐ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ**—এসকল বিষয় নিম্নলিখিত ভাগে আলোচিত হইল।

(১) **পরিবহন**—পৃথিবীর খুব কম শিল্পের জন্যই প্রয়োজনীয় সমুদয় উপাদান ও কয়লা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি ইন্ধনশক্তি ঠিক শিল্পাঞ্চলে বা আশপাশে পাওয়া যায়। বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বহু দূরদেশ হইতে (এমন কি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের শিল্পকেন্দ্রে) এসকল জিনিস আমদানি-রপ্তানি করা হয়। যেমন, অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশের পশম নিয়া যুক্তরাজ্যে পশম শিল্প এবং বাংলাদেশ ও ভারতের পাট নিয়া যুক্তরাজ্যের পাট শিল্প উন্নতি লাভ করে। কাজেই বিভিন্ন শিল্পের উন্নতির জন্য কম খরচে দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। **শিল্পের উপাদান ও ইন্ধন-শক্তি** ভিন্ন **কলকব্জা, যন্ত্রপাতি** প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রে সরবরাহ, তথা হইতে শিল্পদ্রব্য বিভিন্ন বিক্রয়কেন্দ্রে সরবরাহ প্রভৃতি নানা বিষয়েও সুলভ পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। ভারতে কলিকাতা, জামসেদপুর, বোম্বাই প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রের আশপাশের উত্তম পরিবহন ব্যবস্থা এসকল স্থানের বিভিন্ন শিল্পের উন্নতির পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক।

এই সম্পর্কে আরও দুই একটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লার পরিমাণ লৌহ আকরিক ও লোহার ভাঙ্গা টুকরার পরিমাণের চেয়ে বেশী। তাই লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কয়লাখনি অঞ্চলের নিকট বা তাপবিদ্যুৎ শক্তি বা জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের নিকট স্থাপন করা উচিত। ইহাতে পরিবহন খরচ কমে। পশম ও কার্পাস শিল্পের জন্য পশম ও কার্পাসের (তূলা) পরিবহন খরচ খুব কম। তাই এসকল শিল্পও শক্তির উৎসের নিকট স্থাপন করিলে শিল্পের উন্নতি হয়। অপরদিকে এই জাতীয় শিল্পের উপাদান যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে কয়লা আমদানি করিয়া শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইলে প্রচুর পরিবহন খরচ দিতে হইবে। ফলে, ঐ শিল্প অন্য স্থানের শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় হারিয়া যাইবে।

(২) **যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা**—আগেকার দিনের তুলনায় এখন সকল কারখানাতেই ক্রমশঃ **অধিক** যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতেছে। তাহাছাড়া আজকাল প্রচুর তাপবিদ্যুৎ ও জলজবিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের সুযোগে যন্ত্রগুলিকে অনেক বেশী সময় ও অধিক দ্রুত ব্যবহার করা হইতেছে। তারপর ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে **স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি** (Automatic machinery) তৈরী ও ব্যবহৃত হইতেছে। বস্তুতঃ অধিকতর উন্নত যন্ত্রপাতির চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ইহাদের সম্বন্ধে অনবরত উন্নতিবিধান হইতেছে এবং উৎপাদনের পরিমাণও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। (যুক্তরাজ্যের ম্যাঞ্চেস্টার অঞ্চলে এখন কার্পাস বস্ত্র তৈরীর চেয়ে কাপড়ের কলের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরীর শিল্পই অধিকতর উন্নত ও লাভজনক।)

(৩) **মূলধন**—বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র স্থাপন এবং তথায় ক্রমশঃ অধিক শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের জন্য অধিক যন্ত্রপাতি, অধিক উপাদান, অধিক শ্রমিক প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থা আবশ্যক। ইহাদের প্রত্যেকটির জন্য দরকার খুব বেশী মূলধন। বিভিন্ন দেশের প্রধান শহর ও নগরসমূহের ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সূত্র হইতে আজকাল প্রয়োজনীয় মূলধন লাভের যথেষ্ট সুযোগ আছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক (World Bank), এমন কি কতক দেশও অপর কতক দেশের শিল্পোন্নতির জন্য মূলধন সরবরাহ করে।

(৪) **উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা**—শিল্পের উন্নতির জন্য যে-কোন শিল্পদ্রব্যের প্রচুর চাহিদাও (Market and demand) একান্ত আবশ্যক। শিল্পদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি সম্পর্কে কতকগুলি বিষয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। তন্মধ্যে লোক বসতির ঘনত্ব ও তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বভাবতঃ যেখানে লোকবসতি অধিক ও মানুষের আর্থিক অবস্থা উন্নত, তথায় বিভিন্ন জিনিসের চাহিদা বেশী। আজকাল বিভিন্ন জিনিসের চাহিদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার প্রদর্শনী (Exhibition), মেলা (Fair), প্রচার (Publicity), পোস্টার, বিজ্ঞাপন (Advertisement) প্রভৃতির মাধ্যমে নানা ভাবে চেষ্টা করা হয়।

(৫) **ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা ও বাণিজ্যকেন্দ্র**—বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রসমূহে আধুনিক পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয় ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রতিনিয়ত যে পরিমাণ জিনিসপত্র তৈরী হইতেছে, তাহা ন্যায্য মূল্যে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয়ের ব্যবস্থা না করিলে শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হয়. এজন্য পূর্ব হইতেই উৎপন্ন জিনিসের উৎপাদনের ব্যয় হিসাব করা এবং জিনিসগুলি সহজে বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত বাণিজ্যকেন্দ্র স্থির করা, তথায় ইহাদিগকে বিক্রয় ও মূল্য লেন-দেন প্রভৃতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। এসকল বিষয়ে ত্রুটি হইলে শিল্পের উন্নতির পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ও ক্ষতি হয়। এজন্য আজকাল অনেক কলকারখার কর্তৃপক্ষ পূর্ব হইতে বিভিন্ন এজেন্সীর মারফৎ এসকল ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ফলে, এবিষয়ে নিজেদের আর বেশী দায়দায়িত্ব থাকে না, জিনিস উৎপাদন এবং ঠিকমত সরবরাহ করার উপরই সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া থাকে।

(৬) **পরিচালনা ব্যবস্থা**—শিল্পদ্রব্যের উপাদান সংগ্রহ, তাহা শিল্পকেন্দ্রে সরবরাহ, তাহাদ্বারা শিল্পদ্রব্য উৎপাদন, তাহাদিগকে বিক্রয়কেন্দ্রে সরবরাহ, লেন-দেন প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত পরিচালনা ব্যবস্থা (Management) একান্ত আবশ্যক। এ সকল বিষয়ে ত্রুটি ঘটিলে শিল্পের সাফল্যলাভ সম্ভবপর হয় না।

(৭) **বিভিন্ন উপজাত-দ্রব্য** (By-product) **উৎপাদন**—যে সকল বড় বড় শিল্পকেন্দ্রে বিভিন্ন জিনিস খুব বেশী পরিমাণে তৈরী হয়, তথায় বহু খারাপ ও ছাঁটাই

জিনিস অনবরতই সঞ্চিত হয়। এসকল ছাঁটাই মালের উপযুক্ত সদ্ব্যবহারের জন্য নূতন নূতন শিল্পের ব্যবস্থা করিয়া বহু উপজাত-দ্রব্য তৈরী করা হয়। ইহার ফলে মূল শিল্পেরও অনেক সাহায্য হয়। যেমন, জামসেদপুরে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রের পরিত্যক্ত জিনিসের সাহায্যে পিন, তারাকাটা প্রভৃতি বহু ক্ষুদ্র জিনিস তৈরী হইতেছে। বোম্বাই-আহ্‌মদাবাদ অঞ্চলে কার্পাসের ছেঁড়া টুকরার সাহায্যে রেয়ন, কাগজ ও অন্য নানারকম জিনিস তৈরী হইতেছে।

(গ) **রাজনৈতিক ভিত্তি বা ঐ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ**—এগুলি তিন ভাগে আলোচিত হইল।

(১) **সরকারী সহানুভূতি, সাহায্য ও পরিচালনা**—বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্ট নানাভাবে সাহায্য করিয়া শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা করিতে পারে। এমন কি, সরকার নিজেও বিভিন্ন শিল্প পরিচালনা করিতে পারে। গত ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক প্রকল্প অনুসারে আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট **প্রত্যক্ষ** ভাবে (Public sector) ক্রমশঃ অধিক শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা করিতেছে। কলিকাতার দক্ষিণ অংশে যাদবপুরে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা (National Instrument Factory), ব্যাঙ্গালোরে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও টেলিফোনের তার (Cable) তৈরীর কারখানা, চিত্তরঞ্জনে রেলগাড়ীর ইঞ্জিন তৈরীর কারখানা, দুর্গাপুর, ভিলাই ও রৌরকেল্লাতে ইস্পাত কারখানা প্রভৃতি বহু শিল্পকেন্দ্র গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। তাছাড়া গভর্ণমেণ্ট বেসরকারী (Private sector) শিল্প প্রতিষ্ঠানকেও **পরোক্ষ** ভাবে পরামর্শ দিয়া থাকে। এরূপ আরও অনেক উপায়েও গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতে পারে।

(২) **সরকারী শিল্পনীতি ও শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থা**—যে-কোন দেশের শিল্পের সহিত দেশের অর্থনৈতিক বিষয়ের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে এসকল বিষয়ে সরকারের বলিষ্ঠ ও উন্নয়নমূলক নীতি স্থির করা প্রয়োজন। সেগুলি যথাযথভাবে পালনের ব্যবস্থাও একান্ত আবশ্যক। এই সম্পর্কে সরকার কতক শিল্পের সংরক্ষণের জন্য অর্থ সাহায্য করিতে পারে, শিল্পদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি সম্বন্ধে সাহায্য করিতে পারে, বিদেশী জিনিস আমদানি বন্ধ করিয়া ঐ শিল্পকে বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতার কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে। এই জাতীয় বিভিন্ন ব্যবস্থার ফলে আমাদের দেশে গত ২৭।২৮ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইতেছে।

(৩) **করপ্রথা, পেটেণ্ট ও অন্যান্য বিষয়ক আইনকানুন**—দেশের শিল্প-সমূহের উন্নতি সম্পর্কে সহায়তার উদ্দেশ্যে সরকার নূতন করপ্রথার প্রবর্তন, পুরাতন

প্রথার পরিবর্তন ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে পারে। উৎপন্ন দ্রব্যের নকল বন্ধ করার জন্য পেটেন্ট রেজেস্ট্রি করা সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। তাহাছাড়া অন্যান্য বিষয়েও আইন তৈরী ও চালু করিতে পারে।

(ঘ) **মানবিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি বা ঐ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ**—এগুলি তিনভাগে আলোচিত হইল।

(১) **শ্রমিক ও শ্রমশক্তি**—পূর্বকালে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের যুগে শ্রমিকের উপরই শিল্পের উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিত। অপরদিকে আধুনিক বৃহৎ শ্রমশিল্পের যুগে কারখানাগুলিতে অনেক বেশী (বিশেষতঃ অধিক স্বয়ংক্রিয় বা Automatic) যন্ত্র ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু এখনও সকল শিল্পের জন্যই অল্প ব্যয়ে **উপযুক্ত সংখ্যক দক্ষ** শ্রমিক আবশ্যক। এবিষয়ে কতক অঞ্চলের সুবিধা অধিক। যেমন, মৌসুমী অঞ্চলের সর্বত্র **অধিক লোকবসতির** জন্য সাংহাই, কোবে, ওসাকা, জামসেদপুর, ভিলাই, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানে সস্তায় প্রচুর দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। অপর পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার শুষ্ক মরুপ্রায় অঞ্চলে লোকের অভাবে সকল প্রকার শ্রমিকেরই মজুরী বেশী।

(২) **স্থিতিপ্রবণতা ও ঐতিহ্য**—কোন স্থানে উপরিলিখিত (প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি) বিভিন্ন কারণে কোন শিল্প যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিলে তথায় তাহার ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়। পরে তথায় ঐ জাতীয় শিল্পের নূতন কেন্দ্র স্থাপনের পক্ষে ইহা বিশেষভাবে বিবেচ্য। তারপর কোথাও কোন শিল্প দীর্ঘ দিন চালু থাকিলে পরে কোন কারণে তাহার উন্নতির পক্ষে সাময়িক অসুবিধা ঘটিলেও পূর্বের স্থিতিপ্রবণতার (Inertia) ফলে ঐ শিল্প সাময়িক বিপদে উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় উন্নতিলাভ করিতে পারে। এসকল বিষয়ে শ্রমিক, মালিক এবং শিল্পদ্রব্য ব্যবহারকারী—সকলের পক্ষেই ধৈর্য, সহযোগিতা প্রভৃতি আবশ্যক।

(৩) **কারিগরি শিক্ষা, গবেষণা, আবিষ্কার প্রভৃতি**—বিভিন্ন শিল্পের উন্নতির পক্ষে এসকল বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। শ্রমিকগণের কারিগরি শিক্ষার ফলে শিল্পের উৎপাদনের ব্যয় কমে এবং অধিকতর উন্নত ধরনের জিনিস তৈরী হয়। তাহাছাড়া গবেষণা ও নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে শিল্পের উপাদানসমূহের নূতন নূতন ব্যবহার, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরী, উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের উৎকর্ষ বা উন্নতি প্রভৃতি ব্যবস্থা দ্বারা শিল্পের উন্নতিবিধান একান্ত প্রয়োজন।

শিল্পের কেন্দ্রীভবন বা একদেশীভবন—পৃথিবীর যে সকল অংশে কোন একটি শিল্পের উন্নতির পক্ষে উপরিলিখিত বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী সুবিধা

পাওয়া যায়, তথায় সেই শিল্পের কেন্দ্রীভবন বা একদেশীভবন (Localisation of industries) হয়। আমাদের দেশে কলিকাতার আশপাশে দেখা যায় পাট শিল্পের কেন্দ্রীভবন, আসাম এবং দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি অঞ্চলে আছে চা শিল্পের কেন্দ্রীভবন, ছোটনাগপুর-উড়িষ্যা-মধ্যপ্রদেশ-পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে দেখা যায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্রীভবন, উত্তরপ্রদেশে আছে চিনি ও নানারকম তৈল শিল্পের কেন্দ্রীভবন, আর বোম্বাই-আহ্‌মদাবাদ অঞ্চলে আছে কার্পাস শিল্পের কেন্দ্রীভবন।

কোন অঞ্চলে নানাপ্রকার শিল্পের উন্নতির সুযোগ থাকিলে তথায় বহু শিল্পই স্থাপিত হয় এবং ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করে। ফলে, তথায় প্রথমে সৃষ্টি হয় **শিল্পকেন্দ্র**। তারপর তাহার উন্নতি ও প্রসারের ফলে সৃষ্টি হয় **শিল্পনগর**। রৌরকেল্লা, ভিলাই প্রভৃতি এদেশের আধুনিক শিল্পনগর। আর একই অঞ্চলে অনেক শিল্পনগরের সৃষ্টি হইলে সমগ্র অঞ্চল **শিল্পাঞ্চলে** পরিণত হয়। কলিকাতার উত্তর ও দক্ষিণে ভাগীরথী-হুগলির উভয় তীরে বিস্তৃত কলিকাতা শিল্পাঞ্চল বা ভাগীরথী শিল্পাঞ্চল ভারতের বৃহত্তম এবং সমগ্র পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শিল্পাঞ্চল।

পৃথিবীর প্রধান শিল্পাঞ্চলসমূহ—সমগ্র পৃথিবীতে সবপ্রধান শিল্পাঞ্চল চারিটি। ইহাদের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(১) **উত্তরপশ্চিম ও মধ্য ইউরোপ**—ইহা পৃথিবীর সর্বপ্রধান শিল্পাঞ্চল। ইহা উত্তরপশ্চিমে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ হইতে মধ্য ইউরোপের সুইজারল্যাণ্ড ও চেকো-শ্লোভাকিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। নরওয়ে ও সুইডেনের দক্ষিণ অংশও এই অঞ্চলের অন্তর্গত। ২০০ বৎসরের অধিক পূর্বে (১৭৬৯খ্রীঃ) শিল্প বিপ্লবের সময় হইতে এই অঞ্চলে বৃহৎ শিল্পসমূহের ক্রমাগত প্রসার ও উন্নতি হইতেছে। এখানকার দেশসমূহের নিজস্ব শিল্পোপাদান অধিক না হইলেও রাজনৈতিক বিষয়ে সুবিধার জন্য এখানকার অনেক দেশ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ হইতে শিল্পের উপাদান খুব সহজে আমদানি করিতে পারিত (এখনও পারে)। এসকল দেশে প্রাকৃতিক অপর দুই বিষয়ে (শক্তির উৎস ও জলবায়ু) এবং অর্থনৈতিক ও মানবিক বা সাংস্কৃতিক বিষয়েও সুবিধা খুব বেশী। বিশেষতঃ নূতন নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও ব্যবহার, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, আর্থিক স্বচ্ছলতা, প্রচুর মূলধন, যানবাহনের সুযোগ, শ্রমিকগণের শিক্ষা, গবেষণা, শিল্পদ্রব্য বিদেশে অনায়াসে বিক্রয় প্রভৃতি বহু বিষয়ে এই অঞ্চল সমগ্র পৃথিবীতে অগ্রণী। সুতরাং ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক যে ইহাই পৃথিবীর **শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল**।

এখানকার অন্তর্গত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানী, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, বিশেষভাবে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, যানবাহন (গাড়ি, জাহাজ,

স্টীমার প্রভৃতি) নির্মাণ এবং এই সমুদয় অঞ্চলের বিভিন্ন কেন্দ্রে কার্পাস, পশম, রেয়ন প্রভৃতি বস্ত্রশিল্প, চিনি (বীট চিনি), কাগজ, রাসায়নিক শিল্প ইত্যাদি অত্যন্ত উন্নত ধরনের।

(২) **উত্তর আমেরিকার পূর্ব অংশের মধ্যভাগ**—ইহা পৃথিবীর **দ্বিতীয় শিল্পাঞ্চল**। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরপূর্ব ও পূর্ব অংশ এবং ক্যানাডার দক্ষিণপূর্ব অংশ এই শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে ও আশপাশে বিভিন্ন শিল্পের উপযোগী নানা প্রকার উপাদান প্রচুর। (উত্তরপশ্চিম ইউরোপের তুলনায় এখানে এবিষয়ে সুবিধা অধিক।) তারপর শক্তির উৎস, জলবায়ু, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা, মূলধন, শ্রমিকগণের শিক্ষা, গবেষণা, যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে এখানকার সুযোগ খুব বেশী। (অনেক ক্ষেত্রে উত্তরপশ্চিম ইউরোপের মত। মূলধন, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে সুবিধা বরং অধিক।) ফলে, এখানকার বিভিন্ন শিল্প অতি দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছে। তারপর প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপের দেশসমূহ যখন যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যস্ত ছিল, তখন এই অঞ্চল শিল্পের উন্নতির সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে।

এখানকার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অংশের শিল্পোন্নতি অসামান্য। লৌহ ও ইস্পাত, বিশেষতঃ বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা, জাহাজ, স্টীমার, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, বিমানপোত প্রভৃতি নির্মাণ এবং নানারকম বস্ত্র, কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি সংক্রান্ত শিল্প এখানে বিশেষ উন্নত।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিম অংশ—ইহা পৃথিবীর তৃতীয় শিল্পাঞ্চল। উত্তরপশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক কম সময়ে (মাত্র ৭৫ বৎসরের মত সময়ে) এই অঞ্চলের অতি দ্রুত শিল্পোন্নতি হইয়াছে। এখানে ও আশপাশে নানাপ্রকার শিল্পের উপাদান, শক্তির উৎস (কয়লা ও জলজ বিদ্যুৎশক্তি,) উত্তম যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে সুবিধার ফলে এখানকার এরূপ উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। এদেশের উত্তরপশ্চিমে লেনিনগ্র্যাড হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণ সাগরের নিকট পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত।

লৌহ ও ইস্পাত ও পূর্ত বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, রাসায়নিক ও বস্ত্রশিল্প, চিনি শিল্প প্রভৃতি এখানে অধিক উন্নত।

(৪) **দক্ষিণপূর্ব ও পূর্ব এশিয়া**—ইহা পৃথিবীর চতুর্থ শিল্পাঞ্চল। এশিয়ার পূর্বদিকে জাপান হইতে দক্ষিণে ভারত পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। এই অঞ্চলের তিনটি বিভাগ—পূর্বদিকে জাপান, দক্ষিণে ভারত এবং এই দুইয়ের মধ্যভাগে চীন।

ইহাদের মধ্যে ভারত ও চীনে নানাপ্রকার উপাদান, শক্তির উৎস প্রভৃতি বিষয়ে সুবিধা অধিক। অপর দিকে জাপানে শিল্পের উপাদানের বিশেষ অভাব। এখানে এসকল জিনিস প্রায় সম্পূর্ণরূপে আমদানি করা হয়। শক্তির উৎস হিসাবে এখানে জলজ বিদ্যুৎ-শক্তি উল্লেখযোগ্য। তবে এখানে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, দক্ষ শ্রমিক, মূলধন প্রভৃতি বিষয়ে সুবিধা প্রায় উত্তরপশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মত। ফলে, এখানকার শিল্পসমূহ বিশেষ উন্নত।

ভারত ও চীনে মাত্র সম্প্রতি বৃহৎ শ্রম শিল্পের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। তবে স্থানীয় উপাদান, শক্তির উৎস, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতির সুযোগে এখানে যথেষ্ট শিল্পোন্নতি হইতেছে।

পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান শ্রমশিল্প

পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান শ্রমশিল্পের বিষয় ইহাদের উপাদানের প্রাধান্য অনুসারে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

(ক) খনিজ সম্পদভিত্তিক শিল্প

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

পথেঘাটে, বাড়ীতে, অফিস আদালতে, হাটে বাজারে যেখানেই আমরা চারিদিকে তাকাই না কেন, আমরা অনবরত দেখিতে পাই লোহা ও ইস্পাতের অসংখ্য জিনিস। তারপর গৃহস্থালীর কাজ, চাষ আবাদের কাজ বা অন্য যে কোন কাজই আমরা করি না কেন, সর্বত্র আমরা ব্যবহার করি লোহ-ইস্পাতের বিভিন্ন জিনিস। ইউরোপের বহু দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র আমাদের চেয়েও বেশী লোহ-ইস্পাতের জিনিস ব্যবহার করে। এরূপ কতক জিনিস তৈরী হয় লৌহ ও ইস্পাতের বিভিন্ন কারখানাতে। আবার অনেক জিনিস তৈরী হয় পূর্ত বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কাঠামো বা এজন্য প্রয়োজনীয় জিনিস—লোহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত জিনিসগুলি একান্ত আবশ্যক :
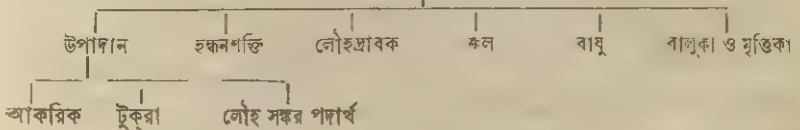
ইহাদের বিষয় পরপৃষ্ঠায় সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(ক) **আকরিক লৌহ**—ইহাই এই শিল্পের **সর্বপ্রধান উপাদান।** ইহাদের মধ্যে ম্যাগনেটাইট ও সিডেরাইট শ্রেণীর লৌহ আকরিক পৃথিবীর নানা দেশে পাওয়া যায়। তবে বিভিন্ন শিল্পে সাধারণতঃ হেমাটাইট ও ম্যাগনেটাইট জাতীয় লৌহ আকরিক অধিক ব্যবহৃত হয়।

(খ) **লৌহ ও ইস্পাতের টুকরা**—ইস্পাতশিল্পে (বিশেষতঃ ব্ল্যাস্ট ফার্নেস পদ্ধতিতে) অর্ধেক ঢালাই লৌহ (লৌহ আকরিক হইতে উৎপন্ন) এবং অর্ধেক লৌহ ও ইস্পাতের পুরনো জিনিসের টুকরার (Scrap) ব্যবহার সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক। এজন্য আজকাল সর্বত্র লোহা ও ইস্পাতের ভাঙ্গা জিনিসের টুকরার প্রচুর ক্রয় বিক্রয় হয়। শিল্পোন্নত দেশে এজাতীয় টুকরা সর্বাপেক্ষা অধিক পাওয়া যায়। অনেক সময় ভাঙ্গা জাহাজও টুকরা হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে একদেশ হইতে অন্যদেশে রপ্তানি হয়। যে সকল দেশে লৌহ আকরিকের অভাব তথায় লৌহ ও ইস্পাতের টুকরার ব্যবহার খুব বেশী। তাহাছাড়া যুদ্ধবিগ্রহের সময় এরূপ টুকরার চাহিদা বাড়ে সবচেয়ে বেশী।

(গ) **লৌহসঙ্কর ধাতব খনিজ পদার্থ** (Ferro-alloys)—ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, মলিব্‌ডেনাম, নিকেল, টাংস্টেন, ভ্যানাডিয়াম প্রভৃতি খনিজ পদার্থ লৌহকে শক্ত বা কঠিন ও মজবুত করার জন্য অর্থাৎ ইস্পাতে পরিণত করার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

(ঘ) **ইন্ধন শক্তি**—কয়লা, শক্ত কোক, তাপবিদ্যুৎ ও জলজ বিদ্যুৎশক্তি এই শিল্পের পক্ষে অত্যাবশ্যক। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাসও ব্যবহৃত হয়। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য কয়লার প্রয়োজন খুব বেশী। লৌহ আকরিকের ও লৌহ সঙ্কর ধাতব খনিজ পদার্থের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে কয়লা এই শিল্পের জন্য প্রয়োজন। সেজন্য যেখানে এই সকল উপাদান একসঙ্গে বা আশপাশে পাওয়া যায়, সেখানেই এই শিল্প গড়িয়া উঠে। তাহা সম্ভব না হইলে কয়লা খনির নিকট শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। অবশ্য তাপবিদ্যুৎ বা জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের নিকটও এই শিল্পের কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

(চ) **লৌহ-দ্রাবক** (Flux)—লৌহ আকরিকের সহিত চুনাপাথর মিশাইয়া প্রচণ্ড তাপে তাহা বাতচুল্লীতে গলানো হয়। লৌহকে গলাইবার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী।

(চ) **জল**—লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রের নিকটে নদী বা অতিবৃহৎ জলাশয় একান্ত আবশ্যক। এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জলের সাধারণতঃ ৪০% বাষ্প (Steam) তৈরীর উদ্দেশ্যে, ৩০% বাতচুল্লীর দরজা ও কারখানার রোল (Rolls) শীতল করা এবং

কতক যন্ত্রপাতি (Hydraulic machinery, rolling mills প্রভৃতি) পরিচালনার জন্য, ২০% বাতচুল্লী শীতল কমাবার জন্য, ৭% কোক ভিজাইবার জন্য এবং ৩% অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

(ছ) **বায়ু**—বাতচুল্লীর মধ্যে অঙ্গারাম্লজানের (Nitrogen) পরিমাণ কমাইবার উদ্দেশ্যে অধিক অম্লজানযুক্ত বায়ু (Oxygenated air) অত্যন্ত বেগে ঐ চুল্লীর মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

(জ) **বালুকা ও তাপসহ মৃত্তিকা প্রভৃতি**—এই শিল্পের জন্য ছাঁচ তৈরীর (Moulding) উদ্দেশ্যে বিশেষ ধরনের মৃত্তিকা ও বালুকা এবং বাতচুল্লী ও অন্যান্য চুল্লী তৈরীর জন্য তাপসহ মৃত্তিকা, নানারকম ইট (Clay brick, silica brick or chromium brick) প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক।

ইস্পাত উৎপাদনের পদ্ধতি—লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য **উৎকৃষ্ট** লৌহ **আকরিক,** অর্থাৎ যে আকরিকের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে লৌহ থাকে সাধারণতঃ তাহাই ব্যবহৃত হয়। আকরিকের মধ্যে অন্ততঃ ⅓ অংশ লৌহ না থাকিলে তাহা ব্যবহার করা হয় না। কারণ, তাহা হইতে লৌহ নিষ্কাশনের জন্য অতিরিক্ত খরচ হয় এবং শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের ব্যয় অতিমাত্রায় বাড়িয়া যায়। অবশ্য কখন কখন বাধ্য হইয়া নিকৃষ্ট আকরিকও ব্যবহার করা হয়। যুক্তরাজ্যে এবং আমাদের দেশেও কখন কখন এরূপ জিনিস ব্যবহার করা হইয়াছে।

আকরিক লৌহের সাহায্যে উৎকৃষ্ট ইস্পাত তৈরী করার উদ্দেশ্যে প্রথমে লৌহকে গলান হয়। পূর্বে খোলা উনুনে (Open hearth) লোহা গলানো হইত। ক্রমশঃ এ সম্পর্কে বেসেমার (Bessemar) পদ্ধতি, (Siemens) পদ্ধতি, মার্টিন (Martin) পদ্ধতি, বৈদ্যুতিক চুল্লীর (Electric furnace) ব্যবহার প্রভৃতি বহু পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এসকল পদ্ধতির তুলনায় **বাতচুল্লীর** (Blast furnace) পদ্ধতি অনেক উন্নত ধরনের। ইহা এখন পর্যন্ত **সর্বোত্তম** পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত। এই চুল্লীর সাহায্যে লৌহ গলাইবার উদ্দেশ্যে **চুনাপাথর ও কোক কয়লা** মিশাইয়া প্রচুর **আকরিক লৌহ** চুল্লীর মধ্যে চাপাইয়া দেওয়া হয়। আর প্রচুর অম্লজানযুক্ত **বাতাস প্রচণ্ড-বেগে** প্রবেশ (Oxygenated air blast) করানো হয়। তাই ইহার নাম বাতচুল্লী (Blast furnace)।

ইস্পাত শিল্পের বিভিন্ন অবস্থা ও ব্যবহার—আকরিক লোহা গলিয়া যাওয়ার সময় ইহার মধ্যস্থিত ময়লা (গাদ) চুনের সঙ্গে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে উপরে

ভাসিয়া উঠে। তখন খাঁটি লোহার অংশ নীচে পড়িয়া থাকে। ইহাই **কাঁচা লোহা** (Raw iron)। ইহাকে উত্তপ্ত অবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ছাঁচে (Mould) ঢালা হয়। তাই ইহার নাম **ঢালাই লৌহ** (Cast iron)। পূর্বে একাজে শূকর ছানার (Pig) মত আকৃতি বিশিষ্ট ছাঁচ ব্যবহার করা হইত। তাই এরূপ লৌহপিণ্ড Pig iron নামে পরিচিত। ইহা কঠিন, কিন্তু ইহার মধ্যে কিছু ময়লা থাকে এবং ইহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়। তাই ইহা দ্বারা বাগানের বা বাড়ীর রেলিং ও ঐ জাতীয় অন্যান্য জিনিস তৈরী হয়। ঢালাই লোহাকে আরও গলাইয়া ও শোধন করিয়া পাওয়া যায় **পেটা লোহা** (Wrought iron)। ইহা গরম করিয়া পিটাইলে বাঁকে, কিন্তু ভাঙ্গে না। তাই ইহা দ্বারা লোহার শিক, লোহার পাত, কড়াই প্রভৃতি তৈরী হয়। পেটা লোহার মধ্যস্থিত অঙ্গার (Carbon) কমাইয়া এবং ইহাকে আরও শক্ত বা মজবুত করিবার জন্য বিভিন্ন লৌহশঙ্কর ধাতব খনিজ পদার্থ মিশাইয়া ইস্পাত (Steel) তৈরী করা হয়। সাধারণতঃ লোহার সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ ব্যবহার করিয়া তৈরী করা হয় **সাধারণ ইস্পাত** (Common steel)। আর পেটা লোহার সঙ্গে ক্রোমিয়াম, নিকেল, টাংস্টেন প্রভৃতি লৌহখাদ (Ferro-alloy) মিশাইয়া তৈরী হয় বিভিন্ন ধরনের শক্ত ও মজবুত **শঙ্কর ইস্পাত** (Alloy steel)।

যেমন, (১) নিম্নশ্রেণীর কার্বন ইস্পাত (Tonnage or low-grade carbon steel)
(২) উচ্চ শ্রেণীর " " (High grade carbon steel)
(৩) নিম্ন শ্রেণীর সঙ্কর ইস্পাত (Low-grade alloy steel)
(৪) উচ্চ শ্রেণীর " " (High grade " "); ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট।

সাধারণতঃ **ইস্পাত তৈরী** করিবার **কেন্দ্রেই** ইস্পাতের সাহায্যে নানারকম যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, গাড়ী ইত্যাদি অসংখ্য **শিল্পদ্রব্য তৈরী** হয়। তাই ইস্পাত তৈরীর কেন্দ্রগুলিই লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেরও প্রধান কেন্দ্র। তবে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অনেক **পৃথক্ কেন্দ্রও** আছে। ইস্পাত তৈরীর কেন্দ্র হইতে এসকল স্থানে ইস্পাত আমদানি করিয়া তাহার সাহায্যে নানারকম ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি, কলকব্জা প্রভৃতি তৈরী করা হয়।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ও উৎপাদনের পরিমাণ – পৃথিবীর মাত্র তিনটি দেশে পৃথিবীর প্রায় ৬৬% (১৯৭৫ খ্রীঃ) ইস্পাত তৈরী হয়। ইহাদের মধ্যে **যুক্তরাষ্ট্র** প্রথম, **সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র** দ্বিতীয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নামমাত্র। তার পরের দেশটি **জাপান**। ইহাদের পরবর্তী পাঁচটি দেশ ইউরোপে অবস্থিত—পশ্চিম জার্মানী, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইটালি ও বেলজিয়াম। ইহাদের

পরে ক্যানাডা ও চেকোশ্লোভাকিয়ার স্থান। কাজেই উত্তর আটলান্টিকের দুই দিকে পৃথিবীর প্রায় [illegible] অংশ ইস্পাত তৈরী হয়।

লৌহ আকরিক ও ইস্পাত উৎপাদন সম্পর্কে পৃথিবীর **প্রধান দেশসমূহের** বর্তমান সময়ের (১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের) উৎপাদনের পরিমাণ নিচে দেওয়া হইল।

দেশ	লৌহ আকরিক উৎপাদন (কোটি টন)	পৃথিবীর শতাংশ %	ইস্পাত উৎপাদন (কোটি টন)	পৃথিবীর শতাংশ %
যুক্তরাষ্ট্র	৯	১৫'৫	১৪	২৪'১
সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র	২১	৩৬'২	১৩'৩	২৩
জাপান	*		১২	২০'৭
পশ্চিম জার্মানী	*		৫	৮'৫
যুক্তরাজ্য	০'৮	১'৪	২'৬	৪'৪
ফ্রান্স	৬	১০'৩	২'৪	৪'১
ইটালি	*		২'১	৩'৬
চীন	৫	৮'৬	১'৯	৩'৩
বেলজিয়াম	*		১'৪	২'৪
ক্যানাডা	৫	৮'৬	১'৪	২'৪
চেকোশ্লোভাকিয়া	*		১'৩	২'২
ভারত	৩'৬	৬'২	০'৮	১'৪

* চিহ্নিত দেশে লৌহ আকরিকের উৎপাদন কম। তাই লৌহ আকরিক ও ইস্পাতের টুকরা আমদানি করিয়া ইস্পাত শিল্প উন্নত [illegible]।

যুক্তরাষ্ট্র কয়লা উৎপাদন সম্পর্কে [illegible] স্থান এখন (১৯৭২) পৃথিবীতে **দ্বিতীয়** ([illegible]), **লৌহ আকরিক** উৎপাদন সম্পর্কেও **দ্বিতীয়** ([illegible])। তাছাড়া এদেশে খুব বেশী লৌহ আকরিক এবং লৌহ ও ইস্পাতের **টুকরা আমদানি** করিয়া ইস্পাত [illegible] ব্যবহার করা হয়। তার উপর এদেশের **রেলপথ ও স্থলপথ** পৃথিবীর মধ্যে **দীর্ঘতম**। [illegible] উন্নত। [illegible] এদেশে [illegible] কলকব্জা [illegible] দেশের অধিকাংশ [illegible] এদেশে শ্রমিকের অভাব নাই [illegible] এবং তাহাদের [illegible] এদেশ ইস্পাত শিল্পে পৃথিবীতে **প্রথম** ([illegible])। এদেশের নিম্নলিখিত শিল্পকেন্দ্রগুলি বিখ্যাত।

(ক) **পিটস্‌বার্গ ও ইয়ংস্ টাউন অঞ্চল**—ঈরি হ্রদের দক্ষিণ-পূর্বে এবং এপালেচিয়ান কয়লা খনি অঞ্চলের উত্তর অংশে এই অঞ্চল অবস্থিত। উৎকৃষ্ট কয়লা এখানেই আছে। আর সুপিরিয়র হ্রদের পশ্চিমদিকের মেসাবি অঞ্চল হইতে লোহ আকরিক অতি সহজে এখানে নৌপথে আনা হয়। ফলে, এখানে এদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ইস্পাত তৈরী হয়। সমগ্র **পৃথিবীর** মধ্যেও ইহাই **সর্বশ্রেষ্ঠ ইস্পাত উৎপাদন অঞ্চল**।

(খ) **হ্রদ অঞ্চল**—এই অঞ্চল বৃহৎ হ্রদসমূহের দক্ষিণপূর্বদিকে অবস্থিত। পশ্চিম পাশেও ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। এই অঞ্চল তিন ভাগে বিভক্ত—(১) মিচিগান হ্রদের দক্ষিণে **শিকাগো ও গেরি**, (২) ঈরি হ্রদের পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে **বাফেলো, ক্লীভল্যাণ্ড**, লোরেন, ঈরি প্রভৃতি এবং (৩) ঈরি হ্রদের পশ্চিমে **ডেট্রয়েট**। ডেট্রয়েটে তৈরী হয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী মোটরগাড়ী। হ্রদ অঞ্চলেও ইস্পাত শিল্পের উন্নতির জন্য পিটস্‌বার্গ-ইয়ংস্ টাউনের মত সুবিধা বর্তমান। তবে এখানকার কেন্দ্রগুলি তত বড় নয় এবং মোট ইস্পাত উৎপাদনও তথাকার তুলনায় কম। মেসাবি অঞ্চল হইতে যে সকল জাহাজ লোহ আকরিক লইয়া এই অঞ্চলে আসে, তাহারা ফিরিবার সময় এখান হইতে কয়লা লইয়া যায়। ফলে, হ্রদসমূহের পশ্চিম পাশেও এই শিল্পের উন্নতি হইতেছে।

(গ) **পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া** অঞ্চল—যুক্তরাষ্ট্রের এপালেচিয়ান (পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া) কয়লাখনি অঞ্চলের উত্তরপূর্বদিকে আট্‌লান্টিক মহাসাগরের নিকট এই অঞ্চল অবস্থিত। এখানে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। পাশের ক্যানাডা এবং আট্‌লান্টিক মহাসাগর পথে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল, ভেনিজুয়েলা এবং ইউরোপের সুইডেন প্রভৃতি দেশ হইতে এখানে লোহ আকরিক আমদানি করা হয়। ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর এবং তাহার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত **স্প্যারোজ পয়েণ্ট** এখানকার ইস্পাত শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

(ঘ) **বার্মিংহাম অঞ্চল**—যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অংশে এলাবামা রাজ্যে স্থানীয় কয়লা, লোহ আকরিক, চুনাপাথর বা ডোলোমাইট প্রভৃতির সাহায্যে এই শিল্প ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে।

(ঙ) **অন্যান্য কেন্দ্র**—যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে কলোরোডা, ইউটা ও ক্যালিফোর্নিয়া এবং দক্ষিণে টেকসাস রাজ্যেও এই শিল্পের কয়েকটি কেন্দ্র আছে।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র—বর্তমানে (১৯৭৫) এদেশে পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী আকরিক লৌহ** (৩৬%), **কয়লা** (৩২%) ও **ম্যাঙ্গানিজ** (৬০%) উৎপন্ন হয়। (তবে যুক্তরাষ্ট্রের মত লৌহ আকরিক ও ইস্পাতের টুকরা এখানে আমদানি করা হয়

না।) কাজেই ইস্পাত শিল্পে এদেশের স্থান **পৃথিবীতে দ্বিতীয়** (২৩%)। এখানকার উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনের তুলনায় অতি সামান্য কম। এখানে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় এদেশে বৃহৎ শিল্পের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে অনেক পরে। গত কয়েক বৎসরে এখানে বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি হইতেছে অনেক দ্রুত ভাবে। যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় এদেশের আয়তন বেশী। তাহাছাড়া শিল্পের **বিকেন্দ্রীকরণ** (Decentralisation) **নীতি** অনুসারে এখানকার শিল্পকেন্দ্রসমূহ যথাসম্ভব দূরে দূরে গড়িয়া উঠিতেছে। এদেশের নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলি বিখ্যাত।

(ক) **ইউক্রেন অঞ্চল**—এখানকার ডোনেৎস অঞ্চলে (Donbas) এদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী (৬০%) **কয়লা**, ঐ অঞ্চলের ক্রিভয়রগে এবং আশপাশে এদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী **লৌহ আকরিক** ও সবচেয়ে বেশী **ম্যাঙ্গানিজ** পাওয়া যায়। তাই এখানে এদেশের প্রায় অর্ধেক **ইস্পাত** তৈরী হয়। **মাকিভকা, স্টেলিনো, নেপ্রো-পেট্রোভস্ক, স্ট্যালিনগ্র্যাড, কীভ, রোস্টভ, খারকভ** প্রভৃতি এখানকার ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্র। দক্ষিণে আজভ-ক্রাইমিয়া অঞ্চলেও এই শিল্পের কয়েকটি বৃহৎ কেন্দ্র আছে।

(খ) **উরল অঞ্চল**—লৌহ আকরিক ও ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদন সম্পর্কে এখানকার স্থান এদেশের মধ্যে দ্বিতীয়। আর কয়লা উৎপাদন সম্পর্কে কুজনেৎস অঞ্চলের স্থান দ্বিতীয়। কারাগাণ্ডা হইতেও এখানে কয়লা আসে। তাই এখানে ইস্পাত শিল্পের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। এখানকার ম্যাগ্‌নেট পর্বতের লৌহখনির পাশে অবস্থিত **ম্যাগনিটোগর্স্ক** এদেশের সর্বপ্রধান ইস্পাত উৎপাদন-কেন্দ্র। সমগ্র **পৃথিবীতে** ইহার স্থান **দ্বিতীয়** (যুক্তরাষ্ট্রের পিটস্‌বার্গের পরে)। চেলিয়াবিনস্ক, পার্ম, স্বার্ডেলোভস্ক প্রভৃতি এই শিল্পের এখানকার অন্যান্য কেন্দ্র।

(গ) **অন্যান্য অঞ্চল**—এদেশের রাজধানী মস্কো অঞ্চলে, দক্ষিণ অংশে কুজনেৎস অঞ্চলে, তাহার পূর্বদিকে বৈকাল হ্রদের নিকট ইর্খুটস্ক অঞ্চলে, দেশের পূর্ব সীমার নিকট আমুর নদীর উপত্যকায় কম্‌সোমলস্ক অঞ্চলে ইস্পাত শিল্পের আরও কয়েকটি বৃহৎ কেন্দ্র আছে।

জাপান—যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতির পক্ষে সহায়ক যে সকল সুবিধা আছে, এখানে তাহার অনেকগুলিরই অভাব। যেমন, এদেশে অতি সামান্য আকরিক লৌহ পাওয়া যায়, কয়লাও খুব কম। অথচ আকরিক লৌহ, ইস্পাত-টুকরা, কয়লা প্রভৃতি আমদানি করিয়া স্থানীয় জলজ বিদ্যুৎ-শক্তি ও অন্যান্য সম্পদের সাহায্যে এই শিল্পটি এত উন্নত হইয়াছে যে এখানকার ইস্পাত

উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **তৃতীয়** (২০·৭%)। এদেশে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, দক্ষ শ্রমিক প্রভৃতি বিষয়ে সুবিধা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদেশের ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ প্রথম দুই দেশের তুলনায় খুব সামান্যই কম। কিউস্থ দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম অংশের **ইয়াওয়াটা** সমগ্র **পৃথিবীতে তৃতীয়,** কিন্তু এশিয়াতে বৃহত্তম ইস্পাতকেন্দ্র।

পশ্চিম জার্মানী—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীতে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ইস্পাত তৈরী হইত। ঐ যুদ্ধের ফলে সেদেশের ইস্পাত শিল্পের বিশেষ ক্ষতি হয়। সেদেশও দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এখন ইস্পাত শিল্পে **পশ্চিম জার্মানীর** স্থান পৃথিবীতে **চতুর্থ** (৮·৬%)। এদেশের **রাইন** ও রূঢ় অঞ্চলে লৌহ ও কয়লা পাশাপাশি পাওয়া যায়, আর ফ্রান্স, স্পেন, সুইডেন প্রভৃতি দেশ হইতে এখানে আমদানি করা হয় আকরিক লৌহ। এখানে অন্যান্য বিষয়েও বিস্তর সুবিধা আছে। তাই এই অঞ্চলেই তৈরী হয় এদেশের **বেশীর ভাগ** (৮০%) **ইস্পাত**. **এসেন, ডার্টমণ্ড, ডুসেলডর্ফ** প্রভৃতি এদেশে এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

যুক্তরাজ্য—এদেশের বিভিন্ন অংশে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। পেনাইন অঞ্চলে আছে চুনাপাথর, কতক কয়লাখানির পাশে কিছু নিকৃষ্ট ধরনের আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। পূর্বে এদেশের পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যের বহির্ভূত অন্য নানাস্থান হইতে আকরিক লৌহ ও ইস্পাতের টুকরা আমদানির সুবিধা ছিল। তাহাছাড়া তখন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র প্রভৃতি দেশে ইস্পাত শিল্প তেমন উন্নতিলাভ করে নাই। এসকল কারণে **বহু পূর্বে** এদেশে পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী** ইস্পাত তৈরী হইত। এখনও সুইডেন, স্পেন ও আফ্রিকার আলজিরিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে লৌহ আকরিক এবং নানাস্থান হইতে লোহা ও ইস্পাতের টুকরা এখানে আমদানি করা হয়। এদেশের ইস্পাত শিল্পের স্থান পৃথিবীতে **পঞ্চম** (৪·৫%)। এখানকার নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলি প্রধান।

(ক) **উত্তর-পূর্ব উপকূল অঞ্চল**—এদেশের উত্তর-পূর্ব উপকূলের **নিউ ক্যাসল** ও তাহার দক্ষিণদিকের **সাণ্ডারল্যাণ্ড, মিডলসব্রো, ডার্লিংটন** ও **হার্টল্‌পুল** এদেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কয়েকটি প্রধান কেন্দ্র। এখানকার নর্দাম্বারল্যাণ্ড ও ডারহাম কয়লাখনিকে কেন্দ্র করিয়া এই শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে।
(খ) **কৃষ্ণদেশ**—পেনাইন পর্বতের দক্ষিণে পাশাপাশি অবস্থিত **বার্মিংহাম, কভেণ্ট্রি** প্রভৃতি নগর এদেশের ইস্পাত শিল্পের কয়েকটি প্রধান কেন্দ্র। এই অঞ্চলের অধিক ধোঁয়ার জন্য ইহা বহুকাল যাবৎ ‘কৃষ্ণদেশ (Black country) নামে

পরিচিত। এই অঞ্চলের ওয়ারউইক্‌শায়ার, দক্ষিণ স্ট্যাফোর্ডশায়ার ও লিস্টারশায়ার খনি হইতে ইহারা কয়লা পাইয়া থাকে। এখন এসকল এবং অন্যান্য কেন্দ্রে বিদ্যুৎশক্তি অধিক ব্যবহৃত হয়। কাজেই এখন আর আগেকার মত কয়লার ধোঁয়াতে আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন নহে। (গ) **সেফিল্ড**—পেনাইন পর্বতের পূর্বদিকে নাটিংহামশায়ার ও ডার্বিশায়ারের কয়লাখনিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে সেফিল্ডের ইস্পাত শিল্প। (ঘ) **অন্যান্য কেন্দ্র**—স্কটল্যাণ্ডের গ্লাস্‌গো, উত্তর-পশ্চিম উপকূলের ব্যারো, দক্ষিণ ওয়েল্‌সের সোয়ান্‌সি, ল্যানেলি প্রভৃতিও এই শিল্পের কয়েকটি বিখ্যাত কেন্দ্র।

ফ্রান্স—আকরিক **লৌহ** উৎপাদন সম্পর্কে এদেশের স্থান বর্তমান (১৯৭৫) পৃথিবীতে **তৃতীয়** (পৃথিবীর ১০·৩%)। তাহার বেশীর ভাগ এবং এদেশের অধিকাংশ কয়লা পাওয়া যায় উত্তর-পূর্বে লোরেন অঞ্চলে। অবশ্য এদেশে কয়লার পরিমাণ খুব কম। তাই যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানী হইতে প্রচুর কয়লা আমদানি করা হইত। এখন এই শিল্পের জন্য বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয় সবচেয়ে বেশী। উত্তর অঞ্চলের **লীল,** পশ্চিমদিকের **ন্যাণ্টেস,** মধ্যভাগের **সেণ্ট এটিয়েন, ক্লেরমণ্ট ফেরাণ্ড** প্রভৃতি কেন্দ্রে এদেশের অধিকাংশ ইস্পাত তৈরী হয়। এখন এদেশে ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **ষষ্ঠ** (৪·১%)।

ইটালি—এদেশে মাত্র **সম্প্রতি** (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে) এই শিল্পের বিস্তর উন্নতি হইতেছে। এখানে আকরিক লৌহ ও কয়লার অভাব অথচ ভূমধ্য-সাগরের পথে এখানে যাতায়াত ও পরিবহনের সুযোগ অধিক। এদেশে জলজ বিদ্যুৎ-শক্তি প্রচুর, অন্যান্য বিষয়েও সুবিধা বিস্তর। তাই আকরিক লৌহ ও ইস্পাতের টুকরা আমদানি করিয়া এই শিল্প উন্নতিলাভ করিতেছে। এখন এখানকার উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **সপ্তম**।

চীন—আকরিক লৌহ উৎপাদন সম্পর্কে এদেশের স্থান পৃথিবীতে **চতুর্থ** (৯·৬), **কয়লা** উৎপাদনে **তৃতীয়** (১৮%)। এসকল সুবিধার জন্য ইস্পাত উৎপাদনে এদেশের স্থান পৃথিবীতে **অষ্টম**। মাঞ্চুরিয়ার লৌহ ও নিকটবর্তী সান্‌সি, সেন্‌সি অঞ্চলের কয়লার সাহায্যে মাঞ্চুরিয়ার **আন্‌শানে** স্থাপিত হইয়াছে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ইস্পাতকেন্দ্র।

বেলজিয়াম—এদেশে আছে কয়লা, আর পাশে লুক্সেমবার্গে আছে লৌহ আকরিক। তাই পরস্পরের সহযোগিতায় এই দেশের ইস্পাতশিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। বেলজিয়ামের **লীজ** এই শিল্পের বিখ্যাত কেন্দ্র। **লুক্সেমবার্গে** এই শিল্পের উন্নতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

ক্যানাডা—এদেশের পূর্ব অংশে লাব্রাডর, কুইবেক ও নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড অঞ্চলে

আকরিক লৌহ উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে পঞ্চম (৮·৬%)। আর পূর্ব অংশে নোভাস্কোসিয়াতে এবং পশ্চিমে রকি অঞ্চলে পাওয়া যায় কয়লা। নায়গ্রা জলপ্রপাত হইতে পাওয়া যায় প্রচুর জলজ বিদ্যুৎশক্তি। তাই এদেশে অণ্টেরিও হ্রদের তীরে **হ্যামিল্টন** অঞ্চলে, সুপিরিয়র ও হিউরন হ্রদের মিলনস্থলের পাশে সু বা **সেণ্ট মেরী** নগরে (ঐ নামের খালের উপর) এবং নোভাস্কোসিয়ার সিড্‌নিতে ইস্পাত তৈরী হয়।

চেকোস্লোভাকিয়া—এদেশে প্রচুর উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস কয়লা আছে। পাশের সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র হইতে এখানে আকরিক লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি আমদানির সুবিধা প্রচুর। তাই সম্প্রতি (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে) এখানে এই শিল্পের দ্রুত উন্নতি হইতেছে। ইহার প্রধান কেন্দ্র **প্রাগ** (প্রাহা)।

ভারত—এদেশে ছোটনাগপুর অঞ্চলে লৌহ আকরিক, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি প্রচুর। তাই এদেশের ইস্পাত শিল্প **বহু প্রাচীন**। তবে এই শিল্পের **সাম্প্রতিক উন্নতি** অতি দ্রুত। তাহার প্রধান কেন্দ্র—**জামসেদপুর**, **রৌরকেল্লা**, **ভিলাই**, **বোকারো** ও **দুর্গাপুর**।

লৌহ ও ইস্পাতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—ইস্পাতের জিনিস বেশী **রপ্তানি** করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, পশ্চিম জার্মানী, জাপান, ভারত প্রভৃতি দেশ। ক্ষুদ্র **বেলজিয়াম** দেশের রপ্তানির পরিমাণ দেশের আয়তনের তুলনায় অধিক। অন্য দেশ হইতে আমদানি-করা জিনিসও সেদেশ রপ্তানি করে। এসকল জিনিস অধিক **আমদানি** করে এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং ওশিয়ানিয়ার বিভিন্ন দেশ।

পূর্তশিল্প

আগেকার দিনে মানুষ কৃষিকার্যে **সামান্যই যন্ত্রপাতি** ব্যবহার করিত। তখনকার ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের জন্যও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন ছিল কম। তারপর যাতায়াত ও পরিবহন প্রভৃতির জন্যও তখন যানবাহন কমই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু ধীরে ধীরে সে যুগের পরিবর্তন হইয়াছে। **এখন** মানুষ সকল কাজেই যন্ত্রের ব্যবহার করিতেছে আগেকার তুলনায় শত, সহস্র গুণ বেশী। অনেক ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় **যন্ত্রই প্রায় সমুদয় কাজ করে**। মানুষ সেই যন্ত্রের চালক মাত্র। তাহাছাড়া বর্তমানে মানুষের তৈরী বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার সাহায্যে মানুষছাড়া আকাশপথে ভ্রমণ, সুদূর মঙ্গলগ্রহ ও চন্দ্রে ইহাদের অবতরণ, পৃথিবীর মানুষের নির্দেশে তথায় নানাপ্রকার গবেষণামূলক কাজ করা—ইত্যাদি কত বিচিত্র ব্যবস্থা যে হইতেছে তাহা ভাবিলে

বিস্মিত হইতে হয়। অথচ এগুলি বাস্তব সত্য। ৫০ বৎসর আগেকার মানুষের পক্ষে আধুনিক মানুষের সাংস্কৃতিক, বিশেষতঃ **প্রযুক্তি বিদ্যার** এমন **উৎকর্ষের** কথা চিন্তা করাও সম্ভবপর ছিল না। তারপর যানবাহনের উন্নতিও অতি চমকপ্রদ।

যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, যানবাহন প্রভৃতি সংক্রান্ত নানাপ্রকার শিল্পের প্রধান উপাদান বিভিন্ন প্রকার ইস্পাত বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের কলকারখানাসমূহে তৈরী নানাপ্রকার ইস্পাতের (Alloy steel) সাহায্যে পূর্ত বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের আধুনিক উন্নতির বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(১) **কৃষির যন্ত্রপাতি**—সুদূর অতীতকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত **কৃষিই** মানবসমাজের **প্রধান উপজীবিকা**। অবশ্য এখন আমাদের ভারতের মত কতক দেশে ৭০%, এবং আরও অনুন্নত বহু দেশে ৯০% লোকের ইহাই একমাত্র বা প্রধান জীবিকা. অপরদিকে শিল্পোন্নত দেশে (যেমন ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ) ৭০-৭৫% লোকের জীবিকা নানাপ্রকার শিল্প। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশগুলি কৃষিকার্যে নানাপ্রকার **যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা**, যেমন চাষের যন্ত্র (ট্র্যাক্টর), জমি নিড়াইবার ও বীজ বপনের যন্ত্র, ফসল সংগ্রহের যন্ত্র (হারভেস্টর, রীপার, কটন পিকার) প্রভৃতি ব্যবহার করে। উত্তর পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, জাপান, প্রভৃতি দেশে এসকল যন্ত্রপাতি অধিক তৈরী হয়। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে ১৫০০ এর অধিক কারখানাতে এসকল যন্ত্রপাতি তৈরী হয়। ঐ সকল দেশ হইতে এসকল জিনিস রপ্তানিও হয় প্রচুর।

(২) **শিল্পের যন্ত্রপাতি**—প্রাচীনকালে শিল্পের সংখ্যা ছিল অনেক কম এবং তখন শিল্প ছিল ক্ষুদ্র। কাজেই তাহাদের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন ছিল খুবই কম। আর এখন শিল্প অসংখ্য রকমের এবং তাহাদের মধ্যে কতক অতি বৃহৎ, কতক মধ্যম আকৃতির, আর কিছু ক্ষুদ্র। তারপর প্রত্যেক রকম শিল্পের জন্যই এখন ব্যবহৃত হয় বহু রকমের যন্ত্র। যেমন, কাষ্ঠ শিল্পের ক্ষেত্রে বড় বড় গাছ কাটা, তাহাদিগকে টুকরা করা, তাহাদের সাহায্যে তক্তা তৈরী করা প্রভৃতি প্রতি কাজে ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন যন্ত্র। কাপড় তৈরীর উদ্দেশ্যে তুলা হইতে বীজ ছাড়ান, সূতা কাটা, কাপড় বুনা, ধোলাই করা, ছাপ দেওয়া, ইস্ত্রি করা, প্যাক করা প্রভৃতি সকল কাজের জন্যই ব্যবহার করা হয় ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র। এভাবে নানা প্রকার বস্ত্র শিল্প, খনিজ সম্পদ সংগ্রহ, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, চিনি শিল্প, চা শিল্প, বই, পত্রিকা প্রভৃতি ছাপা সংক্রান্ত শিল্প প্রভৃতি সকল রকম শিল্পের জন্যই তৈরী হইতেছে নানারকম যন্ত্র।

এরূপ নানা প্রকার শিল্পের জন্য তৈরী হয় কতক **সাধারণ** ধরনের যন্ত্রপাতি, আর

কতক অত্যল্প সূক্ষ্ম ধরনের (Sophisticated) যন্ত্র। এরূপ বহু যন্ত্রপাতি স্বয়ংক্রিয় (Automatic)।

পৃথিবীর কয়েকটি দেশে এরূপ যন্ত্রপাতি অধিক তৈরী হয়। তাহাদের মধ্যে উত্তর পশ্চিম ইউরোপের ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম জার্মানী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশে তৈরী হয় উত্তরপশ্চিম ইউরোপের চেয়ে বেশী পরিমাণে এসকল যন্ত্রপাতি।

(গ) **মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প** (Automobile industry)—প্রায় ৯২ বৎসর পূর্বে (১৮৮৬ খ্রীঃ) জার্মানীতে প্রথম মোটর গাড়ির যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়। ক্রমশঃ মোটর গাড়ির চাহিদা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের মোটর গাড়ি (ট্রাক, বাস, লরি প্রভৃতি সহ) তৈরী অসামান্যভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। এখন (১৯৭৪ খ্রীঃ) বাৎসরিক মোট প্রায় ৩ কোটি মোটর গাড়ি তৈরী হইতেছে। ঐ বৎসর পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান দেশে মোটর গাড়ির তৈরীর পরিমাণ নিম্নরূপ।

	যাত্রীবাহী	মোট		যাত্রীবাহী	মোট
যুক্তরাষ্ট্র	৮০ লক্ষ	এক কোটি	ইতালি	১৮ লক্ষ	১৯ লক্ষ
জাপান	৩৪ ”	৬৬ লক্ষ	ক্যানাডা	১৩ ”	১৬ ”
পশ্চিম জার্মানী	৪১ ”	৪৪ ”	সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র	৫ ”	১১ ”
ফ্রান্স	২৭ ”	৩০ ”			
যুক্তরাজ্য	১৬ ”	২১ ”	অস্ট্রেলিয়া	৩ ”	৪ ”

যুক্তরাষ্ট্রে সমগ্র পৃথিবীর ⅓ অংশ মোটর গাড়ি তৈরী হয় এবং এদেশের **ডেট্রয়েট** সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এই শিল্পের **সর্বপ্রধান কেন্দ্র**। সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের **গর্কি** পৃথিবীতে এই শিল্পের দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্র। তাহাকে সোভিয়েট ডেট্রয়েটও বলা হয়। এসকল দেশের কতক মোটর গাড়ি তৈরীর কোম্পানী পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও মোটর গাড়ি তৈরী করিতেছে।

রেলওয়ে ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প (Locomotive industry)—গত ১২৫ বৎসর যাবৎ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে রেলপথের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে ইঞ্জিন এবং গাড়ি (ওয়াগন) তৈরার পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। আগে কেবলমাত্র বাষ্পচালিত ইঞ্জিন (Steam engine) তৈরী ও ব্যবহৃত হইত। এখন তাহাদের প্রচলন সর্বাপেক্ষা কম। এখন ডিজেল (Diesel) ইঞ্জিন ও বৈদ্যুতিক (Electric) ইঞ্জিনই তৈরী ও ব্যবহৃত হয় সবচেয়ে বেশী। যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ ইঞ্জিন তৈরীর পরিমাণ পৃথিবীতে প্রথম। তারপর সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের স্থান। তবে উত্তরপশ্চিম ইউরোপের ব্রিটিশ-

দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি, ইহাদের বাহিরে জাপান, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশেও প্রচুর রেলওয়ে ইঞ্জিন তৈরী হয়।

(ঙ) **জাহাজ নির্মাণ শিল্প** -পূর্বকালে কাঠের তৈরী জাহাজ পালের সাহায্যে বিভিন্ন সমুদ্রের উপর দিয়া যাতায়াত করিত। আর এখন জাহাজ তৈরী হয় প্রধানত লৌহ ও ইস্পাত ও এলুমিনিয়ামের সাহায্যে। এই শিল্পের জন্য প্রয়োজন শিল্প-কেন্দ্রের নিকট গভীর সমুদ্র, যেখানে জাহাজের গতি সহজে পরীক্ষা করা যায়। এগুলি যাতায়াত করে কয়লা ও ডিজেল তেলের সাহায্যে। জাহাজ তৈরীর জন্য প্রচুর কাঠও দরকার। আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অতিবিরাট জাহাজ (Liner) হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যন্ত ছোট লঞ্চ প্রভৃতি বহু প্রকার জলযান তৈরী হয়। ইহাদের মধ্যে কতক যাত্রীবাহী (Passenger boat), কতক বাণিজ্য জাহাজ (Merchant vessel), কতক কেবল মালবাহী জাহাজ (Cargo boat)। ইহাদের মধ্যে আবার অনেকগুলি বিভিন্ন ধরনের। যেমন, তৈলবাহী (Oil tanker) জাহাজ, প্রচুর পরিমাণে মালবাহী (Bulk carrier) জাহাজ ইত্যাদি। এরূপ অনেক জাহাজেই আছে হিমায়ন ব্যবস্থা।

সাধারণ মানুষের ব্যবহার ও মালপত্র, বাণিজ্য প্রভৃতির উপযোগী জাহাজ ভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহ ও দেশরক্ষা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে তৈরী জাহাজও অনেক ধরনের। যেমন, বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ (Man of war), ডুবো জাহাজ (Submarine), বিমানপোতবাহী জাহাজ (Aircraft carrier) প্রভৃতি। পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান দেশে। যুদ্ধ সংক্রান্ত বিভিন্ন জাহাজ ভিন্ন) সাধারণ কাজে ব্যবহারের উপযোগী জাহাজ তৈরীর বর্তমান সময়ের (১৯৭৪ খ্রীঃ) পরিমাণ নিম্নরূপ।

দেশ	লক্ষ গ্রস টন (G R T)	শতাংশ	দেশ	লক্ষ গ্রস টন (G R T)	শতাংশ
জাপান	১১৫	৫১%	যুক্তরাজ্য	১০	৪.৫%
পশ্চিম জার্মানী	১৮	৮%	সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র	১০	৪.৫%
সুইডেন	১৭	৭.৫%	নেদারল্যাণ্ডস	৬	২.৫%
ফ্রান্স	১৪	৬%	যুক্তরাষ্ট্র	৫	.২%
ইটালি	১১	৫%			

জাপানের টোকিও-ইওকোহামা, কোবে-ওসাকা, নাগাসাকি প্রভৃতি এই শিল্পের কেন্দ্র। এখন জাপানই সমুদ্রের রাণী (Mistres of the sea)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে (১৯৩৯ খ্রী.) পর্যন্ত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এই গৌরবের অধিকারী ছিল। তখন পর্যন্ত সে দেশেই তৈরী হইত সবচেয়ে বেশী জাহাজ।

(চ) **বিমানপোত নির্মাণ শিল্প** (Aircraft industry)—প্রায় ৭৫ বৎসর আগে (১৯০৩ খ্রীঃ) পৃথিবীতে প্রথম বিমানপোত তৈরী হয় যুক্তরাষ্ট্রে। বিমানপথে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পের দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে। এখন পৃথিবীর অধিকাংশ বিমানপোত সামরিক কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে বহু বিভাগ আছে আর সাধারণ যাত্রীবাহী ও মালবাহী বিমানও অনেক রকমের। তাহাদের কতক খুব বড় (জেট, বোয়িং, সুপার কন্সটিলেশন প্রভৃতি), আবার কতক অত্যন্ত ছোট (এক মাত্র চালকের উপযোগী)

বিমানপোত নির্মাণ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান পৃথিবীতে প্রথম। এদেশের লসএঞ্জেলস, সান ফ্রান্সিস্কো প্রভৃতি এই শিল্পের কেন্দ্র। সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের স্থান দ্বিতীয়। পশ্চিম ইউরোপের ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও এই শিল্প উন্নত।

আমাদের ভারতে উপরিলিখিত সকল প্রকার শিল্পই আছে। (এ বিষয় পরে আলোচিত হইবে।)

(২) কৃষিজ সম্পদভিত্তিক শিল্প

কার্পাস শিল্প, পাট শিল্প, লিনেন শিল্প, চিনি শিল্প, চা ও কফি শিল্প প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(ক) কার্পাস শিল্প ঃ

কার্পাসের ব্যবহার—পৃথিবীর সকল লোকেরই কার্পাস বস্ত্র প্রয়োজন। উষ্ণ মণ্ডলের মানুষ সাধারণতঃ কার্পাস বস্ত্র ব্যবহার করেন। কেবলমাত্র কিছু মানুষ শীতকালে পশমী বস্ত্র ব্যবহার করেন। আর খুব সামান্য লোক গরমের সময়, বা বিশেষ কোন উপলক্ষে রেশমী ও মুগার কাপড় জামা ব্যবহার করেন। শীতপ্রধান দেশেও গেঞ্জি, তোয়ালে, সার্ট প্রভৃতি তৈরী হয় কার্পাস সুতার সাহায্যে। আমাদের জামা-কাপড়, গেঞ্জি, বিছানার চাদর, গা মুছিবার তোয়ালে, দরজা জানালার পর্দা প্রভৃতি কত জিনিস তৈরীর জন্য যে কার্পাস বস্ত্র প্রয়োজন, তাহার সীমা সংখ্যা নাই।

কার্পাস শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ—কার্পাস শিল্পের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে সুবিধা একান্ত আবশ্যক।

(১) **কার্পাস শিল্পের উপাদান**—যে দেশে দীর্ঘ আশযুক্ত কার্পাস অধিক জন্মে তথায় কার্পাস বস্ত্র বয়ন শিল্পের উন্নতির পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশে উৎকৃষ্ট কার্পাস অধিক উৎপন্ন হয়। এজন্য এসকল দেশের কার্পাস শিল্পের উন্নতির পক্ষে একটি প্রধান সুবিধা অন্যান্য

দেশের তুলনায় অধিক। তবে এই শিল্পের জন্য অধিক (তুলা) দরকার হয় না বলিয়া ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও জাপানে সম্পূর্ণরূপে আমদানি-করা কার্পাসের সাহায্যে এই শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে।

(২) **ইন্ধনশক্তি**—এই শিল্পের জন্য প্রচুর ইন্ধন শক্তি দরকার। যে সকল দেশে কয়লা, তাপবিদ্যুৎ ও জলজ বিদ্যুৎশক্তি প্রচুর তথায় কার্পাসশিল্পের উন্নতির পক্ষে অপর একটি প্রধান সুবিধাও পাওয়া যায়। প্রধানতঃ এই শক্তির অভাবে মিশরে (প্রচুর উৎকৃষ্ট কার্পাস উৎপন্ন হওয়া সত্বেও) কার্পাস শিল্প উন্নত নহে। (অবশ্য সে দেশের শুষ্ক বায়ুও এবিষয়ে একটি প্রধান বাধা।)

(৩) **জলবায়ু**—এই শিল্পের জন্য আর্দ্র জলবায়ু একান্ত আবশ্যক। ভারতের বোম্বাই-আহ্‌মদাবাদ অঞ্চল, যুক্তরাজ্যের ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চল, জাপান ও চীনের পূর্ব অঞ্চল প্রভৃতি স্থানের আর্দ্র জলবায়ু এই শিল্পের উন্নতির একটি প্রধান সহায়। পাকিস্তানের করাচি, মিশরের কায়রো প্রভৃতি স্থানে কৃত্রিম উপায় আর্দ্রতার ব্যবস্থা করিয়া এই শিল্প স্থাপিত হইয়াছে।

(৪) **অন্যান্য বিষয়**—লৌহ ও ইস্পাত বা অন্য যে-কোন শিল্পের মত এই শিল্পেরও উন্নতির জন্য প্রচুর সস্তা শ্রমিক, উত্তম যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, আধুনিক কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি, প্রচুর মূলধন, উৎপন্ন দ্রব্যের প্রচুর চাহিদা, সরকারী সহায়তা এবং উপজাত-দ্রব্যাদি তৈরীর সুযোগ ইত্যাদি বিষয়ে সুবিধা আবশ্যক।

প্রধান উৎপাদন অঞ্চল—এখন (১৯৭৫) নিম্নলিখিত দেশগুলিতে কার্পাস শিল্প অধিক উন্নত। ইহাদের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল :

দেশ	কার্পাস বস্ত্র উৎপাদন (লক্ষ টন)	কার্পাস উৎপাদন (লক্ষ বেল)	দেশ	কার্পাস বস্ত্র উৎপাদন (লক্ষ টন)	কার্পাস উৎপাদন (লক্ষ বেল)
চীন	৯'৭	১০৫	পশ্চিম জার্মানী	২'১৭	—
সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র	৯'৩৬	১২৫	ফ্রান্স	২'১৫	—
			স্পেন	১'২৫	—
যুক্তরাষ্ট্র	৯'২৬	১৩৬	ইটালি	১'০৫	—
ভারত	৯'০৫	৫৬	যুক্তরাজ্য	০'০৭	—
জাপান	৩'২৬	—			

যুক্তরাষ্ট্র—এদেশে পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী** (এখন পৃথিবীর ২৫%) **কার্পাস** জন্মে। কয়লা উৎপাদন সম্পর্কে এদেশের স্থান এখন (১৯৭৫) পৃথিবীতে দ্বিতীয়

(২৩%)। এদেশে জলবায়ু, শ্রমিক, পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়েও সুযোগ প্রচুর। তাই বহুদিন যাবৎ এদেশে **সবচেয়ে বেশী কার্পাস বস্ত্র** তৈরী হইতেছিল। এখন (১৯৭৫ খ্রীঃ) এদেশের কার্পাস বস্ত্র উৎপাদন পৃথিবীতে **তৃতীয়**। (চীন ও সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের চেয়ে অতি সামান্য কম।) এই শিল্প এদেশের নিম্নলিখিত তিনটি অঞ্চলে অধিক উন্নত।

(ক) **নিউ ইংল্যাণ্ড স্টেটস অঞ্চল**—যুক্তরাজ্যের অনেক দক্ষ তাঁতী এই অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা এবং তাঁহাদের বংশধরগণ এখানে আর্দ্র জলবায়ু, প্রচুর কয়লা, উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা, উৎপন্ন বস্ত্রের জন্য যথেষ্ট চাহিদা ও অন্যান্য বিষয়ে সুবিধা লাভ করেন। দক্ষিণদিকের কার্পাস বলয় এবং মেক্সিকো, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানি-করা কার্পাস এখানে ব্যবহৃত হয়। ম্যাসাচুসেটস, কনেক্টিকাট প্রভৃতি এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

(খ) **মধ্য আটলান্টিক অঞ্চল**—নিউ ইংল্যাণ্ড স্টেটস্ অঞ্চলের দক্ষিণে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলভাগে নিউ ইয়র্ক, পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া ও মেরিল্যাণ্ড অঞ্চলে প্রচুর জলজ বিদ্যুৎশক্তি ও নিকটে কার্পাস (তুলা) পাওয়া যায়। তাহাছাড়া জলবায়ু, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতির সুবিধা তো আছেই। তাই এখানেও এই শিল্প উন্নত।

(গ) **দক্ষিণ এপালেচিয়ান** বা **দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল**—বিখ্যাত কার্পাস বলয় এদেশের দক্ষিণপূর্ব অংশে বিস্তৃত। এখানে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী কার্পাস উৎপন্ন হয় ও প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। তাহাছাড়া এখানে দক্ষ (নিগ্রো) শ্রমিক সুলভ। যাতায়াত ও পরিবহন প্রভৃতি বিষয়েও এখানে প্রচুর সুবিধা আছে। এখানকার জলবায়ুও আর্দ্র। তাই এখানেই **সবচেয়ে বেশী কার্পাস বস্ত্র** তৈরী হয়। শার্লোট, গ্রীনভিল, কঙ্কর্ড প্রভৃতি এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

চীন—এদেশের মধ্য অংশে ও পূর্বদিকে ইয়াংসি কিয়াং ও সিকিয়াং নদীর অববাহিকা অঞ্চলে এখন (১৯৭৫) **কার্পাস** উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **তৃতীয়**। তারপর এদেশে কয়লা প্রচুর, শ্রমিক দক্ষ ও সুলভ, আর পূর্বদিকের জলবায়ুও আর্দ্র। তাহাছাড়া এদেশের লোকসংখ্যা পৃথিবীতে প্রথম। তাই এখানে নানারকম বস্ত্রের স্থানীয় **চাহিদা খুব বেশী**। সেজন্য এখানকার **বস্ত্র উৎপাদনের** পরিমাণ এখন (১৯৭৫) পৃথিবীতে **প্রথম** (১৯৭৪ খ্রীঃ এদেশের স্থান ছিল তৃতীয়।) সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রের সহিত এদেশের কার্পাস শিল্প সম্পর্কে প্রতিযোগিতা খুব বেশী। সাংহাই, নান্‌কিং, হাঙ্কৌ প্রভৃতি এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র—এদেশের দক্ষিণ অংশে **কার্পাস উৎপাদনের**

পরিমাণ পৃথিবীতে **দ্বিতীয়**। এই অংশে প্রচুর কয়লা ও দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। তাই এখানকার কার্পাস শিল্প খুব উন্নত। এখান হইতে কার্পাস আনিয়া **মস্কো** ও **লেনিনগ্র্যাড অঞ্চলে** স্থানীয় কয়লা, আর্দ্র জলবায়ু, উত্তম পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে সুযোগের ফলে, এই শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে মস্কো অঞ্চল সর্বপ্রধান। এখন (১৯৭৫) এদেশের কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে দ্বিতীয়। এদেশ, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে কার্পাস (তুলা) উৎপাদন ও কার্পাস বস্ত্র তৈরী সম্পর্কে প্রবল প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। কার্পাস (তুলা) উৎপাদন সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র দ্বিতীয় ও চীন তৃতীয়। অথচ কার্পাস বস্ত্র উৎপাদন সম্পর্কে ১৯৭৪ খ্রীঃ যুক্তরাষ্ট্র ছিল প্রথম ও চীন তৃতীয়। ১৯৭৫ খ্রীঃ কার্পাস বস্ত্র বয়ন শিল্পে চীন হইয়াছে প্রথম, যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয়। সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র দুই বৎসরই দ্বিতীয়।

ভারত—কার্পাস উৎপাদন এবং বস্ত্র তৈরী উভয় হিসাবে বর্তমানে (১৯৭৫) ভারতের স্থান পৃথিবীতে **চতুর্থ**। এদেশের কার্পাস (তুলা) উৎপাদনের পরিমাণ প্রথম তিন দেশের চেয়ে যথেষ্ট কম হইলেও এদেশের বস্ত্র উৎপাদন তাহাদের তুলনায় সামান্যই কম। এবিষয় পরে আলোচিত হইবে।

জাপান—এদেশে কার্পাসের (তুলা) অভাব। অথচ এখানে আর্দ্র জলবায়ু, প্রচুর জলজ বিদ্যুৎশক্তি, সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক, উত্তম পরিবহন ব্যবস্থা, প্রচুর মূলধন প্রভৃতি বিষয়ে সুবিধা অধিক। দেশ-বিদেশে এদেশের বস্ত্রের চাহিদা অধিক। তাই যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, মিশর, চীন প্রভৃতি দেশ হইতে কার্পাস আমদানি করিয়া এদেশে কার্পাসবস্ত্র তৈরী হয়। এদেশের কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **পঞ্চম**। উৎপাদনের তুলনায় এদেশে কার্পাস বস্ত্রের চাহিদা কম সেজন্য এদেশ হইতে সবচেয়ে বেশী কার্পাস বস্ত্র রপ্তানি হয়। এদেশের বস্ত্র শিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র **ওসাকা**। ইহাকে বলা হয় "জাপানের ম্যাঞ্চেস্টার"। (অবশ্য ইহা ম্যাঞ্চেস্টারের চেয়ে বড় নগর।) টোকিও, কোবে, নাগোয়া প্রভৃতি এদেশের এই শিল্পের অন্যান্য প্রধান কেন্দ্র।

পশ্চিম জার্মানী—এদেশে কার্পাসের (তুলা) অভাব। অথচ কয়লা ও জলজ বিদ্যুৎশক্তি, আর্দ্র জলবায়ু, উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে সুবিধা বিস্তর। তাই যুক্তরাষ্ট্র, মিশর প্রভৃতি দেশ হইতে প্রচুর কার্পাস আমদানি করিয়া এখানে কার্পাস শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে। এখন (১৯৭৫) এই শিল্পে এদেশের স্থান পৃথিবীতে **ষষ্ঠ**। উত্তরদিকের ব্রেমেন, পশ্চিমদিকের ডুসেলডর্ফ প্রভৃতি এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

ফ্রান্স—এদেশেও কার্পাসের (তুলা) অভাব, কয়লাও কম। কিন্তু জলজ বিদ্যুৎশক্তি

প্রচুর। তাহাছাড়া আর্দ্র জলবায়ু, উত্তম পরিবহন ব্যবস্থা, মূলধন ইত্যাদি বিষয়ে এদেশে সুবিধা বিস্তর। এজন্য যুক্তরাষ্ট্র, মিশর প্রভৃতি দেশ হইতে কার্পাস আমদানি করিয়া এদেশে এই শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে। এদেশে রেশম শিল্পের দক্ষ শ্রমিকগণ কার্পাস সূতার সাহায্যে অতি উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র তৈরী করেন। এদেশে বর্তমানে (১৯৭৫) কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনের পারিমাণ পৃথিবীতে **সপ্তম**। লীল, রুঁয়ে প্রভৃতি নগর এদেশের এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

স্পেন ও **ইটালি** দেশেও কার্পাসের (তূলা) অভাব। অথচ আর্দ্র জলবায়ু, জলজ বিদ্যুৎশক্তি, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা, দক্ষ শ্রমিক প্রভৃতি বিষয়ে সুবিধার জন্য উভয় দেশে কার্পাস বস্ত্র শিল্প উন্নত। এখন (১৯৭৫) স্পেনের কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবাতে **অষ্টম**, ইটালির স্থান **নবম**।

যুক্তরাজ্য—এখানে প্রচুর কয়লা ও জলজ বিদ্যুৎশক্তি এবং নদীর হাল্কা জল (Soft water), আর্দ্র জলবায়ু, উত্তম পরিবহন ব্যবস্থা, প্রচুর মূলধন, দক্ষ শ্রমিক প্রভৃতি বিষয়ে সুযোগ প্রচুর। এদেশে উৎপন্ন বস্ত্রের দেশ-বিদেশে চাহিদা অধিক এজন্য যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, ভারত প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানি-করা কার্পাসের সাহায্যে পূর্বে এদেশে উৎপন্ন হইত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী কার্পাস বস্ত্র। এই শিল্পের প্রধান অঞ্চল **ম্যাঞ্চেস্টারের** আশপাশে। স্কট্‌ল্যাণ্ডের **গ্ল্যাসগো** আর একটি প্রধান কেন্দ্র। কালক্রমে বিভিন্ন দেশের সহিত প্রতিযোগিতা, এদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব হ্রাস, বিদেশ হইতে কার্পাস আমদানির পক্ষে অসুবিধা, দেশে শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি, বিদেশে এদেশের কার্পাস বস্ত্রের চাহিদার অভাব প্রভৃতি নানাকারণে বস্ত্র শিল্পের অবনতি হইয়াছে। এখন (১৯৭৫) এদেশের কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে দশম। এদেশ বহুদিন যাবৎ কার্পাস শিল্পের জন্য কলকব্জা তৈরী সম্পর্কে অধিক মনোযোগী।

অন্যান্য দেশ—ইউরোপের অন্তর্গত পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া, উত্তর আমেরিকার ক্যানাডা, মেক্সিকো, আফ্রিকার মিশর, এশিয়ার পাকিস্তান প্রভৃতি দেশেও কার্পাস শিল্পের বহু কেন্দ্র আছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—কার্পাস বস্ত্র **রপ্তানি** সম্পর্কে জাপান প্রথম, ভারত দ্বিতীয় ও চীন তৃতীয়। পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, নেদারল্যাণ্ডস, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশও কার্পাস বস্ত্র রপ্তানি করে। আর তাহা **আমদানি** করে ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া এবং আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ।

(খ) পাট শিল্প

পাটের ব্যবহার—পাটের সাহায্যে ত্রিপল, চট, থলে, দড়ি, সূতা প্রভৃতি অধিক তৈরী হয়। কৃত্রিম রেশম, কাগজ প্রভৃতি তৈরীর জন্যও পাট ব্যবহৃত হইতেছে। কিছুকাল যাবৎ আমাদের দেশে **পাটের বিকল্প** (Substitute) হিসাবে মেস্তা ব্যবহৃত হইতেছে। অন্য কতক দেশে চটের থলের পরিবর্তে মোটা কাগজ ও কাপড়ের থলে ব্যবহার করা হয়। আর পাটের দড়ির পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় ঘাস ও অন্যান্য জিনিসের তৈরী দড়ি।

প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ—এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি (প্রধান উপাদান, কয়লা, তাপবিদ্যুৎ শক্তি, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা, মূলধন প্রভৃতি) অনেক পরিমাণে বস্ত্র শিল্পের মত।

প্রধান উৎপাদন-অঞ্চল—প্রধান পাট-উৎপাদনকারী দেশ ভারত ও বাংলাদেশে তৈরী হয় পৃথিবীর অধিকাংশ পাটের জিনিস। চীন, থাইল্যাণ্ড, ব্রেজিল এবং সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রেও পাটের চাষ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এই সকল দেশেও এই শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। তাহাছাড়া পাট আমদানি করিয়াও কতক দেশে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। নিম্নলিখিত দেশগুলিতে পাট শিল্প অধিক উন্নত।

ভারত—এদেশে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী (অন্ততঃ ৪০%) পাট ও মেস্তা উৎপন্ন হয়। ইহাদের সাহায্যে এদেশে তৈরী হয় **সবচেয়ে বেশী** পাটের জিনিস। কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চল এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

বাংলাদেশ—পাট ও মেস্তা উৎপাদন সম্পর্কে এদেশের স্থান পৃথিবীতে **দ্বিতীয়** (প্রায় ২৮%)। কয়লার অভাবে পূর্বে এখানে পাটশিল্প ছিল না। অন্যান্য বিষয়েও অসুবিধা ছিল। এখন স্থানীয় জলজ বিদ্যুৎশক্তি ও আমদানি করা কয়লার সাহায্যে তাপ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করিয়া) এই শিল্পের উন্নতি হইতেছে। **নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম,** ও **খুলনা** প্রভৃতি এই শিল্পের কেন্দ্র। এখানকার পাটকলের যন্ত্রগুলি অত্যন্ত আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয়। তাই এখানকার শিল্পদ্রব্য ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

যুক্তরাজ্য—ভারত ও বাংলাদেশ হইতে পাট আমদানি করিয়া এদেশের **ডাণ্ডি** নগরে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে দক্ষ শ্রমিক, আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি থাকার ফলে পাটের উৎকৃষ্ট জিনিস তৈরী হয়। তবে উৎপাদনের পরিমাণ কম।

অন্যান্য দেশ—চীন, থাইল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল প্রভৃতি দেশে সামান্য পাট জন্মে তাহার সাহায্যে এ সকল দেশে কিছু কিছু পাট শিল্প গড়িয়া

উঠিয়াছে। ফ্রান্স, ইটালি, পশ্চিম জার্মানী, স্পেন, জাপান প্রভৃতি দেশে আমদানি-করা পাটের সহিত কিছু কিছু অন্য জিনিস ব্যবহার করিয়া কতক শিল্পদ্রব্য তৈরী করা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—পাটের তৈরী জিনিস সবচেয়ে বেশী **রপ্তানি** করে ভারত, তারপর বাংলাদেশ। আর এসকল জিনিস **আমদানি** করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ।

(৩) প্রাণিজ সম্পদভিত্তিক শিল্প

পশম, রেশম ও চর্ম শিল্প এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(ক) পশম শিল্প

পশম শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ—কার্পাস শিল্পের মত পশম শিল্পও একটি বয়ন শিল্প। এই শিল্পের প্রধান উপাদান **মেষের পশম**। এই শিল্পের উন্নতির জন্য পশম (শিল্পের উপাদান) ও কয়লা সরবরাহ, উত্তম পরিবহন ব্যবস্থা, আর্দ্র জলবায়ু, প্রচুর শ্রমিক, মূলধন সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়ে সুযোগ সুবিধা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কার্পাসের মত পশমও সহজে নষ্ট হয় না। সেজন্য দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ওশিয়ানিয়ার বিভিন্ন দেশ হইতে পশম আমদানি করিয়া উত্তর গোলার্ধের বিভিন্ন দেশে এই শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। পুরান পশমী কাপড়, জামার পশম আলাদা করিয়া নিয়া কিছু নূতন পশমের সহিত তাহা মিশাইয়া ব. পশমের সহিত কার্পাস মিশাইয়াও নূতন পশমী কাপড় তৈরী করা হয়।

প্রধান উৎপাদন অঞ্চল—উত্তর গোলার্ধের নিম্নলিখিত দেশে এই শিল্প অধিক উন্নতিলাভ করিয়াছে।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র—পশম উৎপাদন সম্পর্কে এখন এদেশের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়। তার উপর এখানে প্রচুর কয়লা, জলজ বিদ্যুৎশক্তি, যন্ত্রপাতি, শ্রমিক মূলধন ইত্যাদি বিষয়ে সুবিধা আছে। এদেশের পরিবহন ব্যবস্থাও উন্নত। এদেশে পশমী কাপড়-জামার চাহিদা খুব বেশী। তাই এদেশের পশম **শিল্প** এখন পৃথিবীতে **বৃহত্তম**। এখন (১৯৭৫) এখানকার পশমবস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **প্রথম** (৬৮ কোটি বর্গ মিঃ)। উত্তরে **মস্কো, লেনিনগ্র্যাড** প্রভৃতি অঞ্চলে এবং দক্ষিণে স্টেপ তৃণভূমির (মেষপালনের অঞ্চলে) বিভিন্ন কেন্দ্রে পশম শিল্প খুবই উন্নত।

জাপান—এখানকার কার্পাস ও রেশম শিল্পের উন্নতির সুযোগে এখানে পশম শিল্প অতিশয় উন্নত। তবে এদেশে পশমের উৎপাদন অতি সামান্য। এজন্য প্রায় সমুদয় পশম আমদানি করা হয়। এদেশের পশম বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ (১৯৭৫) পৃথিবীতে

দ্বিতীয় (৪৪ কোটি বর্গ মিঃ)। **টোকিও-ইওকোহামা, কোবে, ওসাকা** প্রভৃতি এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

যুক্তরাষ্ট্র—পশম উৎপাদন সম্পর্কে এদেশের স্থান এখন (১৯৭৪) পৃথিবীতে সপ্তম, কিন্তু পশম শিল্পে **তৃতীয়**। এদেশের উত্তরপূর্ব অংশে উত্তরে **মেইন** হইতে দক্ষিণে **মেরীল্যাণ্ড** পর্যন্ত এই শিল্প বিস্তৃত। এদেশে পশমী বস্ত্রের চাহিদা সবচেয়ে বেশী। তাই অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে প্রভৃতি দেশ হইতে এখানে প্রচুর পশম আমদানি করা হয়। এদেশের এপালেচিয়ান অঞ্চলে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। তাহাছাড়া উত্তম পরিবহন ব্যবস্থা, আর্দ্র জলবায়ু, প্রচুর যন্ত্রপাতি, (যুক্তরাজ্য হইতে আগত) দক্ষ তাঁতী প্রভৃতি বিষয়ে এদেশে সুবিধা প্রচুর। ফলে, এদেশে এই শিল্প এত অধিক উন্নত। **ফিলাডেল্‌ফিয়া, ক্লীভল্যাণ্ড** প্রভৃতি এখানকার এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

যুক্তরাজ্য—এদেশে পশম বস্ত্রের চাহিদা অধিক। তাই প্রধানতঃ অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানি-করা উৎকৃষ্ট পশমের সাহায্যে এদেশের পশম শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে। তবে পেনাইন পর্বত অঞ্চলে কিছু মেষও পালন করা হয়। এদেশে স্থানীয় কয়লা, উত্তম পরিবহন ব্যবস্থা, আর্দ্র জলবায়ু, দক্ষ শ্রমিক, মূলধন, প্রভৃতি বিষয়েও সুবিধা বিস্তর। পশম শিল্পে এদেশের স্থান এখন (১৯৭৫) **চতুর্থ**। **ইয়র্কশায়ার অঞ্চল** এই শিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র। ওয়েল্‌স, ল্যাঙ্কাশায়ার প্রভৃতি অঞ্চলেও এই শিল্প উন্নত।

অন্যান্য দেশ—পশম শিল্পে এখন (১৯৭৫) **ফ্রান্সের** স্থান **পঞ্চম, পশ্চিম জার্মানী ষষ্ঠ**। জাপান ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের মত এই দুই দেশেও কার্পাস শিল্পের উন্নতি ও অন্যান্য বিষয়ে সুযোগ থাকাতে পশম আমদানি করিয়া এই শিল্প উন্নতি লাভ করিতেছে। **অস্ট্রেলিয়াতে** পশমের উৎপাদন পৃথিবীতে প্রথম, পাশের **নিউ-জীল্যাণ্ডে** চতুর্থ। এই দুই দেশে পশমী বস্ত্রের চাহিদা কম (লোক কম বলিয়া)। তথাপি এই শিল্প ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। **চীনে** পশমের উৎপাদন পৃথিবীতে সম্ভবতঃ তৃতীয়। **আর্জেন্টিনার** স্থান তাহার পরে। এই দুই দেশেও পশম শিল্প ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। তাহাছাড়া ইটালি, ভারত, মেক্সিকো, চিলি, ব্রেজিল, প্রভৃতি দেশেও এই শিল্প উন্নত।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য হইতে **রপ্তানি হয়** বেশী পশমী কাপড়। অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশও কিছু রপ্তানি করে। এসকল জিনিস অধিক **আমদানি** করে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, স্পেন, ইটালি, গ্রীস প্রভৃতি দেশ।

(ঘ) রেশম শিল্প (Silk Industry)

রেশম শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ—পশম শিল্পের মত ইহাও একটি প্রাণিজ সম্পদভিত্তিক বয়ন শিল্প। কারণ, রেশমকীট নামক (অতি ক্ষুদ্র) প্রাণীর (কীটের) সাহায্যে রেশমী সূতা তৈরী হয়। তবে ঐ কীট পালন করা হয় তুঁত গাছের কচি পাতার সাহায্যে। কাজেই এই শিল্প আংশিকভাবে উদ্ভিজ্জ সম্পদভিত্তিক এই শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ (দক্ষ শ্রমিক, আর্দ্র জলবায়ু, প্রচুর মূলধন প্রভৃতি) কার্পাস ও পশম শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের মত। তবে এই শিল্পের মূল উপাদান খাটি রেশমের উৎপাদনের পরিমাণ কার্পাস (তুলা) ও পশমের তুলনায় অনেক কম।

প্রধান উৎপাদন অঞ্চল—নিম্নলিখিত দেশে এই শিল্প অধিক উন্নত।

যুক্তরাষ্ট্র—এদেশের **উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে** কার্পাস এবং **পশম** শিল্প **উন্নত**। এখানে স্থানীয় কয়লা ও জলজ বিদ্যুৎশক্তি, দক্ষ শ্রমিক, আর্দ্র জলবায়ু, যথেষ্ট উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি সকল বিষয়ে সুবিধা আছে। তাহাছাড়া এদেশের অধিবাসিগণই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী ধনী ও অত্যন্ত সৌখিন। তার উপর দেশের দক্ষিণ অংশের জলবায়ু যথেষ্ট উষ্ণ। কাজেই দামী রেশমী বস্ত্রের চাহিদা এদেশেই সবচেয়ে বেশী। ফলে, জাপান হইতে অধিক এবং ইটালি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে যথেষ্ট খাটি রেশম আমদানি করিয়া এদেশে পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী** রেশমীবস্ত্র তৈরী হয়। এখানকার নিউ জার্সি স্টেটের **প্যাটার্সন** এই শিল্পের সবপ্রধান কেন্দ্র।

জাপান—এদেশে পাহাড়ের গায়ে তুঁতগাছের চাষ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী খাটি রেশম উৎপন্ন হয়। তাহাছাড়া এদেশের কার্পাস ও পশম শিল্পের সুবিধাগুলি এই শিল্পের পক্ষেও সমানভাবে পাওয়া যায়। তাই এদেশে এই শিল্পটিও বিশেষ উন্নত; পৃথিবীতে **দ্বিতীয়**। (যুক্তরাষ্ট্রের পরেই এদেশের স্থান।) হনসু দ্বীপের **ফুকুই, কানাজাওয়া,** নাগোয়া, **গুভা,** কিওটো প্রভৃতি এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

চীন—এদেশের ইয়াংসি কিয়াং নদীর অববাহিকা ও উত্তর-পূর্বে সান্টুং প্রদেশে প্রচুর রেশম উৎপন্ন হয়। তাহাছাড়া এদেশের কার্পাস শিল্পের সুযোগসমূহ এই শিল্পের ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। ইয়াংসি কিয়াং নদীর উপত্যকার **জেকোয়ান, হ্যাংচৌ, সাংহাই** এবং দক্ষিণে সিকিয়াং নদীর উপত্যকার **ক্যান্টন** এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

অন্যান্য দেশ—ইটালি ও ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তুঁত গাছ অধিক জন্মে। তাই এখানে খুব বেশী খাটি রেশম উৎপন্ন হয়। তাহাছাড়া এই দুই দেশে প্রচুর রেশম আমদানিও করা হয়। **ফ্রান্সের** দক্ষিণ অংশে রোন নদীর তীরে **লিঁয়** এদেশের রেশম

শিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র। আর **ইটালির** সর্বপ্রধান কেন্দ্র **মিলান**। **সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ, পশ্চিম জার্মানীর ক্রেফেল্ড** প্রভৃতি স্থানেও আমদানি-করা রেশমের সাহায্যে রেশম শিল্প যথেষ্ট উন্নত।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—রেশমী বস্ত্রের উৎপাদন কার্পাস ও পশম বস্ত্র প্রভৃতির উৎপাদনের তুলনায় কম, কাজেই ইহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণও কম। রেশম এবং রেশমী বস্ত্র সবচেয়ে বেশী **রপ্তানি** করে জাপান। তারপর চীন। রেশমী বস্ত্র **আমদানি** করে ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ।

(৪) উদ্ভিজ্জ সম্পদভিত্তিক শিল্প

কাগজ ও নানারকম বোর্ড, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি এই জাতীয় শিল্প। ইহাদের প্রধান উপাদান উদ্ভিদ্ (কোমল কাঠের মণ্ড)।

(১) কাগজ শিল্প

কাগজের ব্যবহার এবং এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ—মানুষ প্রথমে অন্যের নিকট হইতে শুনিয়া ও শুনা কথা মনে রাখিয়া জ্ঞানার্জন করিত। এজন্যই বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। তারপর লেখার প্রচলন হওয়াতে ভূর্জপত্র (ভোজপাতা), তালপাতা, কলাপাতা প্রভৃতির উপর মানুষ লিখিতে আরম্ভ করিল। ইহার পর ১০৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে ছেঁড়া কাপড়ের সাহায্যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যে ঘাসের সাহায্যে এবং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে কেবলমাত্র কাষ্ঠমণ্ডের সাহায্যে কাগজ তৈরী হয়। এখন পৃথিবীর **কাগজ শিল্পের** ৯০% উপাদান পাইন, স্প্রুস, হেমলক প্রভৃতি সরলবর্গীয় গাছের **কোমল কাঠের মণ্ড** এবং বাকী ১০% উপাদান পুরাতন চট, ছেঁড়া কাপড়, দড়ি, ধানের খড়, কার্পাস, আখের ছিবড়া, বাঁশ, এস্পার্টো ও সাবই ঘাস প্রভৃতির মণ্ড। এসকল উপাদানের সাহায্যে হাতে লেখার এবং বইপত্র ও পত্রিকা ছাপার কাগজ (News print), জিনিসপত্র প্যাক করার কাগজ (Packing paper), কাপড়ের চেয়ে হাল্কা কাগজ, ফটো ছাপার কাগজ, নোট ছাপার কাগজ, নানারকম শক্ত কাগজ (Stout paper), কাগজের বোর্ড (Paper board) প্রভৃতি বহু রকম জিনিস তৈরী হয়।

প্রধান উৎপাদন-অঞ্চল—পৃথিবীর দুইটি অঞ্চলে কাগজ তৈরীর প্রধান উপাদান কোমল কাঠের বা সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন এবং প্রচুর জলজ বিদ্যুৎশক্তি, বিভিন্ন নদীর নির্মল জল এবং পরিবহনের সুবিধা ইত্যাদি অধিক পরিমাণে বর্তমান। ইহাদের একটি

উত্তর আমেরিকাতে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর অঞ্চল ও ক্যানাডা, অপরটি ইউরোপের নরওয়ে, সুইডেন, ফিন্‌ল্যাণ্ড ও সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের উত্তর অঞ্চল।

যুক্তরাষ্ট্র—এদেশের উত্তর অংশে ও পশ্চিমে পার্বত্য অঞ্চলের উপরিভাগে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন যথেষ্ট বিস্তৃত। তদুপরি ক্যানাডা, নরওয়ে, সুইডেন ও ফিন্‌ল্যাণ্ড হইতেও এদেশে প্রচুর কোমল কাঠের মণ্ড আমদানি করা হয়। তারপর হ্রদ অঞ্চলে পাওয়া যায় প্রচুর জলজ বিদ্যুৎশক্তি। এদেশে উত্তম পরিবহন ব্যবস্থা, প্রচুর দক্ষ শ্রমিক, মূলধন, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই বিস্তর সুবিধা আছে। ফলে, এদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে নিউ ইংল্যাণ্ড স্টেটস্ হইতে দক্ষিণে নিউ ইয়র্ক এবং পশ্চিমে হ্রদসমূহ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উৎপন্ন হয় পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী** কাগজ। উত্তর-পশ্চিমে ওয়াশিংটন-ওরিগন অঞ্চলেও উৎপন্ন হয় প্রচুর কাগজ।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র—এদেশের উত্তর অংশের বেশীর ভাগ সরলবর্গীয় বৃক্ষের 'তৈগা' বন অঞ্চল। ফলে, এদেশে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী কোমল কাঠ পাওয়া যায়। তাহাছাড়া এদেশে প্রচুর জলজ ও তাপ বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যায়। পরিবহন ব্যবস্থা, মূলধন প্রভৃতি বিষয়েও এদেশে সুবিধা বিস্তর। ফলে, এদেশে কাগজ তৈরীর পরিমাণ পৃথিবীতে **দ্বিতীয়**। ইহার প্রধান কেন্দ্র লেনিনগ্রাড।

ক্যানাডা—ক্যানাডার দক্ষিণপূর্ব অংশে কাগজ তৈরীর সুযোগ সুবিধা প্রায় যুক্তরাষ্ট্রের মত। তাই এখানেও খুব বেশী কাগজ উৎপন্ন হয়। **সংবাদপত্র ছাপার কাগজ** উৎপাদনে এদেশের স্থান পৃথিবীতে **প্রথম**।

নরওয়ে, সুইডেন ও ফিন্‌ল্যাণ্ড—এই অঞ্চলে প্রচুর কোমল কাঠ পাওয়া যায়। তবে এসকল দেশে জলজ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ, পরিবহন ব্যবস্থা এবং কাগজের স্থানীয় চাহিদা প্রভৃতি বিষয়ে সুবিধা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের তুলনায় কম। তাই, এখানকার কাগজ শিল্পের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম।

জাপান—হোকাইডো দ্বীপের কোমল কাঠ এবং নরওয়ে, সুইডেন, ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানি-করা কোমল কাঠ ও কাঠের মণ্ডের সাহায্যে এদেশে লেখার কাগজ তৈরী হয়। ঐ মণ্ড এবং উডো (Udo) গাছের ছাল, নদী ও সমুদ্রে ভাসমান জঞ্জাল ও অন্যান্য জিনিসের সাহায্যে অত্যন্ত নরম হইতে খুব মোটা ও শক্ত নানারকম কাগজ তৈরী হয়।

চীন—এদেশে খড়ের সাহায্যে অত্যন্ত সস্তা কাগজ তৈরী হয়, আর আমদানি-করা কোমল কাঠের সাহায্যে তৈরী হয় প্রচুর ভাল কাগজ।

ভারত—আমাদের দেশে কোমল কাঠ, বাঁশ, সাবই ঘাস প্রভৃতি নানা উপাদানের সাহায্যে কাগজ তৈরী হয়। এবিষয় পরে আলোচিত হইবে।

যুক্তরাজ্যে সুইডেন ও নরওয়ে হইতে আমদানি-করা কাঠের মণ্ডের সাহায্যে, পশ্চিম **জার্মানীতে** ছেঁড়া কাপড় ও কাঠের মণ্ডের সাহায্যে এবং **স্পেনে** এস্পার্টো ঘাসের সাহায্যে কাগজ তৈরী হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—কাগজ ও কোমল কাঠের মণ্ড সবচেয়ে বেশী **রপ্তানি** করে ক্যানাডা। তারপর নরওয়ে, সুইডেন ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের স্থান। আর তাহা বেশী **আমদানি** করে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ডস প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশ। পৃথিবীর অন্য বহু দেশও কাগজ আমদানি করে।

কৃত্রিম রেশম শিল্প

কৃত্রিম রেশমের ব্যবহার ও এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ—খাঁটি রেশমের অধিকাংশ উৎপন্ন হয় পূর্ব এশিয়াতে, আর তাহার দামও বেশী। অথচ রেশম জাতীয় অতিশয় মিহি সূতাদ্বারা তৈরী জামা কাপড়ের চাহিদা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। পাইন, স্প্রুস প্রভৃতি **সরলবর্গীয় গাছের মণ্ড, কার্পাসের মণ্ড** প্রভৃতির সাহায্যে রাসায়নিক উপায়ে সেলুলোজ (Cellulose) তৈরী করা হয়। আর তাহার সাহায্যে অতিমিহি সূতা তৈরী করিয়া তাহাদ্বারা কৃত্রিম রেশম বস্ত্র (রেয়ন, নাইলন প্রভৃতি) প্রস্তুত করা হয়। এরূপ সূতার রঙ রেশমের মত উজ্জল। এই সূতাকে খাঁটি রেশম ও পশমের সহিত মিশ্রিত করিয়াও বস্ত্র তৈরী করা হয়। খাঁটি রেশমের তুলনায় এই জাতীয় বস্ত্র দামে অনেক সস্তা। তাহাছাড়া ইহার উপাদানের জন্য (রেশমের মত) এশিয়ার উপর নির্ভর করিতে হয় না। বরং যেখানেই প্রচুর কোমল কাঠ ও কার্পাস পাওয়া যায়, সেখানেই ইহা তৈরী করা যায়। ফলে, পৃথিবীর নানাদেশে ইহা তৈরী হইতেছে। ক্রমশঃ ইহার উৎপাদন এত বাড়িয়া যাইতেছে যে ইহা **খাঁটি রেশমের** প্রবল **প্রতিযোগী** হইয়া উঠিয়াছে।

প্রধান উৎপাদন-অঞ্চল—ফ্রান্সে সর্বপ্রথম কৃত্রিম রেশম আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এখন ইহা অন্যান্য দেশেই উৎপন্ন হয় অনেক বেশী।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র—এদেশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য অঞ্চল (তৈগা) পৃথিবীতে বৃহত্তম। তাহাছাড়া বস্ত্র শিল্পের অন্যান্য সুযোগও এখানে খুব বেশী। কার্পাস এবং পশম বস্ত্র উৎপাদন সম্পর্কে এখন (১৯৭৫) এদেশের স্থান পৃথিবীতে প্রথম। এসকল সুযোগের ফলে কৃত্রিম রেশম শিল্পেও এদেশের স্থান এখন পৃথিবীতে **প্রথম**। এদেশে

তৈরী মোট কার্পাস বস্ত্রের প্রায় ২০% কৃত্রিম রেশম বস্ত্র। মস্কো, লেনিনগ্র্যাড, গর্কি প্রভৃতি এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

যুক্তরাষ্ট্র—এদেশের উত্তরপূর্ব অংশে ও পূর্ব উপকূলে একদিকে পাওয়া যায় (উত্তরের) কোমল কাঠ, আর অন্যদিকে পাওয়া যায় (দক্ষিণের) কার্পাস। তাহাছাড়া এই অঞ্চলে কার্পাস, রেশম, পশম প্রভৃতি শিল্পও উন্নত এবং তাহাদের উন্নতির সকল সুযোগই এই শিল্প লাভ করিয়া থাকে। এদেশে রেশমের মত কৃত্রিম রেশমের চাহিদাও পৃথিবীর দেশসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। ফলে, এদেশের এই শিল্পটির স্থান বর্তমানে (১৯৭৪) পৃথিবীতে দ্বিতীয়। **ম্যাসাচুসেটস, কনেক্টিকাট** প্রভৃতি এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

জাপান—এদেশে কোমল কাঠ প্রচুর। তার উপর এদেশের পশম, রেশম ও কার্পাস শিল্প উন্নত। তাই এদেশে এই শিল্পের উপযোগী সুবিধা খুব বেশী। এদেশের কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে তৃতীয়; যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে কিছু কম। এদেশের **ফুকুই, কানাজাওয়া, নাগোয়া,** কিওটো, ওসাকা প্রভৃতি এই শিল্পের কেন্দ্র।

ভারত—আমাদের দেশে কোমল কাঠ, ছেঁড়া কাপড় প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া যায়। আর কৃত্রিম রেশম বস্ত্রের চাহিদাও দিন দিন বাড়িতেছে। বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাও এদেশে প্রচুর। তাই এদেশে এই শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে **চতুর্থ**। বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

পশ্চিম জার্মানী এবং **যুক্তরাজ্যেও** কার্পাস, পশম প্রভৃতি শিল্পের সুযোগে এবং এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সহজে লাভ করার ফলে এই শিল্প ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে।

অন্যান্য দেশ—ইটালি, ফ্রান্স, কোরিয়া প্রভৃতি দেশেও এই শিল্প ক্রমশঃ উন্নতি-লাভ করিতেছে।

রাসায়নিক শিল্প (Chemical Industry)

রাসায়নিক পদ্ধতিতে নানা প্রকার ঔষধ, জমির সার, লেখার কালি, অসংখ্য প্রসাধন দ্রব্য, রঙ এবং আরও হাজার রকমের জিনিস তৈরী হইতেছে।

রাসায়নিক শিল্পের উপাদান—প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে প্রাপ্ত কয়লা, গন্ধক, চুন, লবণ, বায়ু, কাঠ, কাঠের ও কার্পাসের সেলুলোজ, খনিজ তৈল, পটাশ (যবক্ষার), নাইট্রেট প্রভৃতি জিনিস এই শিল্পের প্রধান উপাদান। এ সকল জিনিস সোজাসুজি ব্যবহার করা যায় না। তাই ইহাদের সাহায্যে তৈরী করা হয় বিভিন্ন এসিড (Acid)

বা অম্ল বা দ্রাবক, আর কতক এল্‌কেলি (Alkali) বা ক্ষার জাতীয় মাধ্যমিক পদার্থ (Intermediaries)। সেজন্য এসিড ও এল্‌কেলি হইল বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পের **মুখ্য** (Primary) উপাদান। আর গন্ধক, লবণ, খনিজ তৈল প্রভৃতি (মূল হইলেও) এই শিল্পের **গৌণ** (Secondary) উপাদান। নিম্নের তালিকার সাহায্যে বিষয়টি আরও ভালভাবে বুঝা যাইবে।

রাসায়নিক দ্রব্যের বিভাগ—কতক রাসায়নিক দ্রব্য খুব সহজে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় ও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আর কতকগুলি অনেক খরচ করিয়াও কমই উৎপন্ন হয় এবং অল্পই ব্যবহৃত হয়। তদনুসারে রাসায়নিক দ্রব্যাদি দুই ভাগে বিভক্ত :—(ক) গুরু রাসায়নিক দ্রব্য ও (খ) লঘু রাসায়নিক দ্রব্য।

(ক) কয়েকটি প্রধান গুরু রাসায়নিক দ্রব্য

কম খরচে ও মূল উপাদানকে বিশেষ যত্নের সহিত শোধন না করিয়াই এসকল জিনিস বহু পরিমাণে উৎপন্ন করা হয় এবং এগুলি এই অবস্থাতেই ব্যবহৃত হয়। সাল্‌ফিউরিক এসিড, সোডা অ্যাস, কস্টিক সোডা, ক্লোরিন, পটাশ প্রভৃতি এই জাতীয় জিনিস। ইহাদের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(১) **সালফিউরিক এসিড** (Sulphuric Acid)—ইহা সর্বপ্রধান এসিড এবং রাসায়নিক শিল্পের সর্বপ্রধান উপাদান। অথচ ইহার প্রধান উপাদান গন্ধক (Sulpbur) লবণের মত সহজপ্রাপ্য নহে। ভূপৃষ্ঠের ০·০৫%-এরও কম হইল গন্ধক। কেবলমাত্র

জাপান, মেক্সিকো ও চিলি দেশে কতক আগ্নেয়গিরির আশপাশে এবং সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রে ও ইটালির নিকটবর্তী সিসিলি দ্বীপে স্বাভাবিক অবস্থায় (Natural-state) গন্ধক পাওয়া যায়। সুতরাং পাইরাইট (Pyrite) হইতে অধিক পরিমাণে এবং কয়লা ও অন্যান্য জিনিস হইতে উপজাত-দ্রব্য (By-product) হিসাবে গন্ধক উৎপন্ন হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ইহা উৎপন্ন হয় সবচেয়ে বেশী। তারপর জাপান, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, পশ্চিম জার্মানী, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশের স্থান। ইটালি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বহু দেশেও ইহা উৎপন্ন হয়। জমির সার, কাষ্ঠ মণ্ড, কাগজ, রবার প্রভৃতি বহু শিল্পদ্রব্য তৈরীর জন্য এই গুরু রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়।

২) **সোডা অ্যাস** (Soda Ash)—ইহা একপ্রকার ক্ষার। সাধারণ লবণ, চুনাপাথর, গন্ধক, কয়লা, কোক কয়লা প্রভৃতি উপাদানের সাহায্যে ইহা তৈরী হয়। ইহাও সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় যুক্তরাষ্ট্রে। তাহাছাড়া সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানী, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, জাপান, পোল্যাণ্ড, ইটালি, স্পেন ও ভারতে ইহা যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। কাগজ, কাচ, সাবান, কার্পাস প্রভৃতি জিনিস তৈরী এবং খনিজ তৈল শোধনের উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়।

(৩) **কস্টিক সোডা** (Caustic Soda) ও (৪) **ক্লোরিন** (Chlorine)—এই দুইটিও ক্ষার। এগুলি লবণের সাহায্যে তৈরী হয়। কস্টিক সোডা ব্যবহৃত হয় কাগজ ও কাষ্ঠমণ্ড, সাবান, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি শিল্পে। আর ক্লোরিন ব্যবহৃত হয় ঔষধ, রঙ ও বিস্ফোরক পদার্থ তৈরী, কাপড় জামা ধোলাই ও জল শোধনের জন্য।

(৫) **রাসায়নিক সার** (Chemical fertilizer)—অধিক ফসল ফলাইবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের জমিতে গোময় বা গোবর, হাড়ের গুঁড়া, দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশে), সামুদ্রিক পাখীর মল (Niter) এবং (চীনদেশে) কম্পোস্ট প্রভৃতি স্বাভাবিক সার বহুকাল যাবৎ ব্যবহৃত হইতেছে। এগুলি ভিন্ন বর্তমানে নাইট্রোজেন ও ইহার বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ, ফস্‌ফরাস, পটাশ প্রভৃতির সাহায্যে তৈরী প্রচুর কৃত্রিম সার ব্যবহৃত হইতেছে। যেমন—

নাইট্রোজেন ও ইহার বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ—৭৫ বৎসর পূর্বে (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে) জমির সার তৈরীর জন্য পৃথিবীর ⅔ অংশ নাইট্রেট চিলির আটাকামা মরুভূমির পক্ষীর মল হইতে পাওয়া যাইত। ইহাকে বলা হইত প্রাকৃতিক (Natural) সোডিয়াম নাইট্রেট। তখন বাকী ⅓ অংশ নাইট্রেট পাওয়া যাইত কয়লা হইতে। তারপর হইতে বায়ু, কোক কয়লা ও চুনাপাথরের সাহায্যে নাইট্রেট তৈরী করিয়া তাহার সাহায্যে এত বেশী **এমোনিয়াম সালফেট** (Ammonium Sulphate)

তৈরী হইতেছে যে এখন বায়ুমণ্ডল ও কয়লা হইতে পাওয়া যায় ৯৫% নাইট্রেট। আর মাত্র ৫%-এরও কম পাওয়া যায় **চিলির মরুভূমি** হইতে। এখন **সবচেয়ে বেশী** কৃত্রিম সার তৈরী হয় **যুক্তরাষ্ট্র** ও **সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রে**। তারপর পশ্চিম জার্মানী, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, নরওয়ে, ইটালি, জাপান, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের স্থান।

ফস্‌ফরাস —জমির সার তৈরীর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মৃত জীবজন্তুর হাড় হইতে কতক প্রাকৃতিক ফস্‌ফেট পাওয়া যায়। তবে মোট প্রয়োজনের তুলনায় তাহার পরিমাণ নিতান্তই কম। তাই বিভিন্ন দেশের পর্বত অঞ্চলে ফস্‌ফেট শিলা নামক জীবাশ্ম (Fossil) বা খনিজ ফস্ফেট হইতে **এসিড ফস্ফেট** বা **সুপার ফস্ফেট** (Superphosphate) নামক সার তৈরী হয়। **যুক্তরাষ্ট্রের** (রকি ও এপালেচিয়ান পর্বত অঞ্চলে) ইহা খুব বেশী তৈরী হয়। তারপর সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের (কোলা উপদ্বীপ, কাজাকস্থান ও মস্কো অঞ্চল) স্থান। জাপান, ইটালি, নেদারল্যাণ্ডস, স্পেন, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার মিশর, মরক্কো প্রভৃতি দেশে এজাতীয় জিনিস প্রচুর তৈরী হয়।

পটাশ —জমির সার তৈরীর জন্য পটাশ নামক খনিজ লবণ বহুদিন যাবৎ ব্যবহৃত হইতেছে। **যুক্তরাষ্ট্রে** ইহা সবচেয়ে বেশী উৎপন্ন হয়। তারপর সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানী, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশের স্থান।

(খ) লঘু রাসায়নিক দ্রব্য

এসকল জিনিস তৈরীর খরচ অনেক, অথচ জিনিস উৎপন্ন হয় কম। কাজেই ইহাদের সাহায্যে যে সকল শিল্পদ্রব্য তৈরী হয়, তাহাদের দাম বেশী। নানারকম রঙ, বার্নিশ, ফটোগ্রাফের সাহায্যে ছবি তুলিবার জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক জিনিস, ঔষধপত্র প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

আলকাতরা-জাত রঙ (Coal tar dyes)—যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, ইটালি প্রভৃতি দেশে কয়লা হইতে উৎপন্ন আলকাতরার সাহায্যে তৈরী হয় বেঞ্জল। আর তাহা দ্বারা তৈরী হয় অসংখ্য রঙ।

সাবান—নানারকম পশুর চর্বি ও বিভিন্ন জাতীয় তৈলের সহিত নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী সোডা ও পটাশ মিশ্রিত করিয়া সাবান (Soap) তৈরী হয়। অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে খুব বেশী প্রাণিজ চর্বি (Animal fat) পাওয়া যায়। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে প্রচুর নারিকেল তৈল,

কঙ্গো গণতন্ত্র, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশে পাম তৈল ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অলিভ তৈল পাওয়া যায়। সাবান তৈরী সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান প্রথম।

ঔষধপত্র (Drugs and medicines), **বিস্ফোরক পদার্থ** (Explosives) প্রভৃতি বহুরকম রাসায়নিক পদার্থ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে তৈরী হইতেছে।

ভারতের শিল্প সম্ভার

প্রাচীন শিল্প—প্রাচীনকালে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল অনেক সহজ, সরল এবং তাহাদের চাহিদা ছিল কম। ক্রমশঃ **সভ্যতার বিকাশের** সঙ্গে সঙ্গে মানুষের **চাহিদা** বাড়িতেছে, এবং তাহা মিটাইবার জন্য নানারকম জিনিসের উৎপাদনও বাড়িতেছে। তবে বহুকাল পর্যন্ত **কুটীর ও গ্রামীণ শিল্প হিসাবে** মানব সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন খাদ্য, বস্ত্র, যানবাহন (নৌকা, গরু, মহিষের টানার উপযুক্ত গাড়ি), চাষাবাদের যন্ত্রপাতি (লাঙ্গল, কোদাল) প্রভৃতি তৈরী হইত। তবে আমাদের দেশের তখনকার কতক **শিল্পও** নানা বিষয়ে ছিল **অতুলনীয়**। যেমন, মসলিন বস্ত্র, ময়ূরপঙ্খী জাহাজ, পুষ্পক রথ প্রভৃতি।

শিল্পযুগের পরিবর্তন—জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন শিল্প, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নতির জন্য চেষ্টা আরম্ভ হয়। ফলে, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে আবিষ্কৃত হয় বাষ্পীয় শক্তি ও নানারকম কলকব্জা, যন্ত্রপাতি। সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে আরম্ভ হয় **শিল্পবিপ্লব**।

ভারতে প্রাচীন ও আধুনিক ব্যবস্থার সমন্বয়—আমাদের ভারত অতীত মহিমায় উজ্জ্বল, আবার আধুনিক উন্নত ব্যবস্থাদি বা প্রগতি সম্পর্কেও বিশেষ উৎসাহী। ফলে, এদেশের জনগণ শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রাচীন ও আধুনিক উভয় ব্যবস্থার মধ্যে যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ করার বা উভয়ের সমন্বয়ের জন্য আগ্রহী।

দেশের শিল্পনীতি ও শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা—স্বাধীনতালাভের পর সঙ্গে সঙ্গে এদেশ **সমাজতন্ত্র ও মিশ্র অর্থনীতির** আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। শিল্পক্ষেত্রেও এই আদর্শই অনুসরণ করা হইতেছে। এদেশের ৭০% মানুষ গ্রামবাসী। তাহাদের কাজের ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য **কুটীর ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নতিবিধান** একান্ত আবশ্যক। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে নিখিল ভারত খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন, নিখিল ভারত তাঁত বোর্ড, কেন্দ্রীয় সিল্ক বোর্ড প্রভৃতি বহু সংস্থা, কমিশন ইত্যাদি

গঠিত হইয়াছে। অপর দিকে দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য **বৃহৎ শ্রম শিল্পসমূহের উন্নতির** উদ্দেশ্যে সরকারী ও বেসরকারী উভয় ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হইতেছে। **সরকারী প্রচেষ্টায়** স্থাপিত ও পরিচালিত হইতেছে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, কয়লা ও খনিজ তৈল সংগ্রহ, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ, যানবাহন ব্যবস্থা, ঔষধ, সার প্রভৃতি শিল্প। আর **বেসরকারী** ব্যবস্থায় শিল্পসমূহের প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতি সম্পর্কেও সরকার প্রয়োজনমত উৎসাহ, পরামর্শ ও সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। ফলে, বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সম্পর্কে এদেশ ইতিমধ্যেই পৃথিবীর **প্রথম সারির** উন্নত দেশসমূহের মধ্যে আসন লাভ করিয়াছে। এখানকার অনেক শিল্পদ্রব্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, ফ্রান্স, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশেও রপ্তানি হইতেছে।
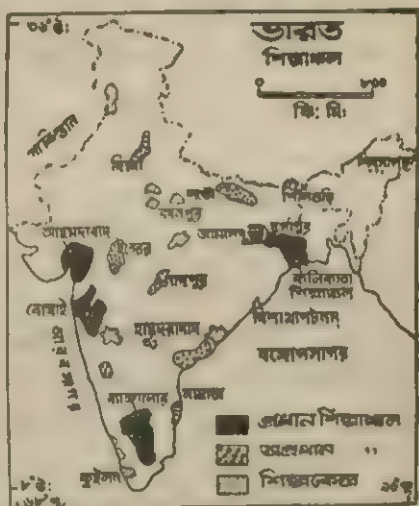
শিল্পের কেন্দ্রীভবন এবং শিল্পাঞ্চল ও শিল্পনগরের প্রতিষ্ঠা এদেশের কোন কোন অংশে কতক বৃহৎ শিল্পের উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার উপাদান (কার্পাস, পাট, আখ, চা, লৌহ প্রভৃতি), শক্তির উৎস (কয়লা, তাপবিদ্যুৎ ও জলজ বিদ্যুৎশক্তি), যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা, মূলধন, শ্রমিক প্রভৃতি প্রচুর। এরূপ স্থানে **কতক শিল্প** সহজে **কেন্দ্রীভূত** হইয়াছে। কখন কখন এরূপ শিল্পের সুযোগে **অন্য কতক শিল্পও** তথায় বা আশপাশে উন্নতিলাভ করিয়াছে। এজন্য দেশের কয়েকটি অংশ **প্রধান শিল্পাঞ্চলে** পরিণত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কলিকাতা-শিল্পাঞ্চল পৃথিবীর অন্যতম **প্রধান শিল্পাঞ্চল**। জামসেদপুর, বোম্বাই পুণা, আহমদাবাদ-বরোদা, ব্যাঙ্গালোর-মহীশূর প্রভৃতি এদেশের অন্যান্য প্রধান শিল্পাঞ্চল।

দেশের বিভিন্ন অংশে এভাবে শিল্পোন্নতির ফলে মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, বিহার, কর্ণাটক, অন্ধ্র ও মধ্যপ্রদেশ—এই **নয়টি রাজ্যে** আছে ভারতের প্রায় ৮০% কলকারখানা এবং এসকল রাজ্যে উৎপন্ন হয় দেশের ৮৫% শিল্পদ্রব্য। রাজ্য হিসাবে **মহারাষ্ট্র** প্রথম, **পশ্চিমবঙ্গ** দ্বিতীয়, **তামিলনাড়ু** তৃতীয়।

এদেশের কয়েকটি প্রধান শ্রম শিল্প

এদেশের শিল্পসমূহ তাহাদের প্রধান উপাদান অনুসারে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত— (ক) কৃষিজ-সম্পদ ভিত্তিক, (খ) খনিজ সম্পদ-ভিত্তিক, (গ) উদ্ভিজ্জ সম্পদ-ভিত্তিক ও (ঘ) রাসায়নিক শিল্প। ইহাদের কয়েকটির বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(ক) কৃষিজ সম্পদ-ভিত্তিক শিল্প

এদেশের কৃষিজ সম্পদ-ভিত্তিক বৃহৎ শিল্পের মধ্যে কার্পাস বস্ত্র, পাটের তৈরী জিনিস, চা ও চিনি প্রধান। তারপর তামাক (সিগারেট), কফি, বনস্পতি, রবার প্রভৃতির স্থান।

(১) **কার্পাস বস্ত্রশিল্প**

বস্ত্র সভ্য মানুষের **প্রাথমিক প্রয়োজন**। আমাদের দেশ **মানব সভ্যতার** অন্যতম **আদিকেন্দ্র**। সেজন্য বহু প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে বস্ত্র তৈরী হইতেছে। পূর্বে ইহা ছিল **কুটীর** শিল্প। এখন কার্পাস বস্ত্র তৈরী এদেশের **সর্বপ্রধান বৃহৎ শিল্প**। এদেশের বিভিন্ন কাপড়ের কলে বস্ত্র তৈরীর পরিমাণ এখন (১৯৭৫) **পৃথিবীতে চতুর্থ**। অপর তিনটি প্রধান দেশের (চীন, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্র) তুলনায় এখানকার বিভিন্ন কলে কার্পাসবস্ত্র উৎপাদন অতি সামান্যই কম (৫-৭% মাত্র)। তাহার উপর এদেশে এখনও কুটীর ও গ্রামীন শিল্প হিসাবে **খাদি ও তাঁত বস্ত্রের গুরুত্ব** অপরিসীম। এরূপ কাপড়ের উৎপাদনের পরিমাণ মিলের চেয়ে সামান্য কম। এদেশের তাঁতের ও মিলের কাপড় যথেষ্ট রপ্তানিও হয়। **বস্ত্র রপ্তানি** সম্পর্কে এখন এদেশের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয় (জাপানের পরে)। এদেশের বিভিন্ন কাপড়ের কলে কাজ করেন প্রায় এক কোটি লোক। তাঁতে কাপড় তৈরী করেন আরও বেশী মানুষ।

উন্নতি—এদেশের প্রথম কাপড়ের কল তৈরী হয় কলিকাতার পাশে ঘুসুড়িতে (সম্ভবতঃ ১৮১৮ খ্রীঃ)। ক্রমশঃ এই শিল্প বিস্তার লাভ করিয়াছে দেশের ৮০টির অধিক শহর, নগরে। এখন এদেশে কাপড়ের কলের সংখ্যা প্রায় ৬৯০। এই শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে এদেশের কতকগুলি **সুবিধা** বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগকে বলা যায় এই **শিল্পের প্রধান ভিত্তি** (Infra-structure)। সুবিধাগুলি নিম্নরূপ—

এদেশে তুলার উৎপাদন প্রচুর। বর্তমানে তাহার অধিকাংশ উৎকৃষ্ট দীর্ঘ আঁশযুক্ত। (এদেশের কাপড়ের কলগুলির চাহিদা মিটাইয়া এই জাতীয় কতক তুলা রপ্তানিও হইতেছে।) এদেশের অনেক স্থানেই জলবায়ু আর্দ্র এবং প্রয়োজনমত শক্তি (কয়লা,

তাপবিদ্যুৎ ও জলজ বিদ্যুৎশক্তি) পাওয়া যায়। শ্রমিক, মূলধন প্রভৃতিও সাধারণতঃ প্রয়োজনমত পাওয়া যায়। যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থাও উন্নত। এদেশে কার্পাস বস্ত্রের চাহিদা অধিক। তাহাছাড়া এদেশে তৈরী বস্ত্র যথেষ্ট রপ্তানিও হয়।

কেন্দ্রীভবন—এদেশের কতক অংশে এসকল সুবিধা এত অধিক যে তথায় এই শিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি প্রসিদ্ধ।

পশ্চিম ভারত অঞ্চল—পশ্চিম ভারতের গুজরাট ও মহারাষ্ট্র এদেশের কার্পাস শিল্পের **সর্বপ্রধান অঞ্চল**। দেশের প্রায় অর্ধেক (৫৫%) কাপড়ের কল এই অঞ্চলে। (ক) **গুজরাট**—এই রাজ্যের ও সমগ্র দেশের কার্পাস শিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র **আহমদাবাদ**। (ইংরেজ শাসনকালে ইহাকে বলা হইত 'ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার'। এখন এখানকার বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ ম্যাঞ্চেস্টারের চেয়ে অনেক বেশী।) এখানে এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় উপরিলিখিত সকল প্রকার সুবিধা পাওয়া যায় বলিয়া এই অঞ্চলে বস্ত্র শিল্পের এপ্রকার **উন্নতি ও কেন্দ্রীভবন** হইয়াছে। বিশেষতঃ এখানে ও আশপাশে উৎকৃষ্ট তুলার উৎপাদন অধিক এবং এই অঞ্চলে

আর্দ্র জলবায়ু, যাতায়াত ও পরিবহন, কাপড়ের চাহিদা প্রভৃতি বিষয়ে সুযোগ খুব বেশী। বরোদা, ভাবনগর, রাজকোট, পোড়বন্দর প্রভৃতি এই অঞ্চলের অপর কয়েকটি প্রধান কেন্দ্র। (খ) **মহারাষ্ট্র** এই রাজ্যের বস্ত্র শিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র **বোম্বাই**। (সমগ্র দেশের মধ্যে দ্বিতীয় কেন্দ্র।) নাগপুর, পুণা, কোলাপুর, ওয়ার্ধা, শোলাপুর অন্যান্য কেন্দ্র।

দক্ষিণ ভারত অঞ্চল—এদেশের দক্ষিণ অংশের তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও কেরালা এই শিল্পের **দ্বিতীয় অঞ্চল**। এখানে এই শিল্পের উন্নতির জন্য প্রায় সকল রকম সুযোগ বর্তমান; বিশেষতঃ এখানে বস্ত্রের চাহিদা খুব বেশী। এখানে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদনের পরিমাণ কিছু কম। তবে তাহা সহজেই আমদানি করা হয়। **তামিলনাড়ুর** কাপড়ের কলের সংখ্যা ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম। এখানকার প্রধান কেন্দ্র **কয়েম্বেটোর**। তারপর এই রাজ্যের মাদ্রাজ, মাদুরাই, সালেম; কর্ণাটকের

ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর এবং কেরালার ত্রিবান্দ্রম, ম্যাঙ্গালোর, কারকল (কারিকল) প্রভৃতি।

দিল্লী-উত্তরপ্রদেশ অঞ্চল—ইহা এদেশের কার্পাস শিল্পের তৃতীয় অঞ্চল। এই শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সকল প্রকার সুবিধা এখানে বর্তমান। বিশেষতঃ বস্ত্রের চাহিদা, যাতায়াত ও পরিবহন, মূলধন প্রভৃতি বিষয়ে এখানে সুযোগ খুব বেশী। তবে এখানে বায়ুতে আর্দ্রতা কম এবং পাশে বন্দরের অভাব—এই দুইটি অসুবিধা উল্লেখযোগ্য। তাই কৃত্রিম উপায়ে প্রয়োজনমত আর্দ্রতার ব্যবস্থা করা হয়। আর কান্দলা, বোম্বাই প্রভৃতি বন্দরের মারফত জিনিসপত্র আমদানি রপ্তানি করা হয়। এখানে এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র **কানপুর**। তারপর **দিল্লী**। উত্তরপ্রদেশের আগ্রা, আলিগড়, বেরেলী প্রভৃতি এখানকার অন্যান্য কেন্দ্র।

পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল—এখানে ভারতের প্রথম কাপড়ের কল তৈরী হয়। এই শিল্পের প্রায় সকল প্রকার সুবিধা এখানে বর্তমান, কেবল তুলার অভাব। অপরপক্ষে এখানে বস্ত্রের চাহিদা খুব বেশী। এখানে প্রয়োজনমত তুলা আমদানি করা হয়। সম্প্রতি সুন্দরবনে তুলার চাষের জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। ভাগীরথী-হুগলি নদীর পূর্বতীরে শ্যামনগর, পাণিহাটি, সোদপুর, বেলঘরিয়া ও পশ্চিম তীরে শ্রীরামপুর, সালকিয়া, মৌরিগ্রাম, ঘুষুড়ি প্রভৃতি এই শিল্পের বিভিন্ন কেন্দ্র।

মধ্যপ্রদেশ অঞ্চল—ইহা এদেশের কার্পাস তুলা উৎপাদন অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত। এখানে এই শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে অন্যান্য সুবিধাও প্রচুর। তবে বায়ুতে আর্দ্রতা কম এবং পাশে বন্দরের অভাব। (দিল্লী-উত্তরপ্রদেশের মত ব্যবস্থা দ্বারা এই অসুবিধা দূর করা হয়।) গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ভূপাল প্রভৃতি এই শিল্পের কেন্দ্র।

উৎপাদন—১৯৫১ খ্রীঃ এদেশে কাপড়ের **কলের** সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০০ আর এখন (১৯৭৫-৭৬ খ্রীঃ) **প্রায়** ৬৯০। ইহাদের মধ্যে প্রায় ২৯০টি সূতা কাটা ও কাপড় বোনা উভয় কাজের, বাকী ৮০৩টি কেবল সূতাকাটার। (এসকল কলে তৈরী সূতা তাঁতের কাপড়, গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি তৈরীর জন্যও ব্যবহৃত হয়।) এদেশের কলগুলিতে ২ কোটি সূতাকাটার টেকোযন্ত্র ও ২ লক্ষের অধিক তাঁত আছে। ১৯৫০ খ্রীঃ এদেশের কলগুলিতে ৫৩ কোটি কেজি কার্পাস সূতা ও ৩৪০ কোটি মিটার বস্ত্র তৈরী হইত। ১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ এদেশে কলে তৈরী হইয়াছে প্রায় ১০১ কোটি কেজি (১৯৫০ খ্রীঃ তুলনায় ৯৫% বেশী) **সূতা** ও প্রায় ৪৩২ কোটি মিটার (১৯৫০ খ্রীঃ তুলনায় ২৫% বেশী) **বস্ত্র**। [এই ২৪ বৎসরে (১৯৫০-৭৪ খ্রীঃ) এদেশে **তাঁতবস্ত্রের** উৎপাদন ৮০

কোটি মিটার হইতে বাড়িয়া প্রায় ৪০০ কোটি মিটারে (১৯৫০ খ্রীঃ তুলনায় প্রায় পাঁচ গুণ) পৌছিয়াছে।]

সমস্যা—এদেশে কার্পাস বস্ত্র শিল্পের সমস্যা অনেক। যেমন, এদেশের বিভিন্ন (বিশেষতঃ পূর্ব) অংশে কার্পাস **তুলা উৎপাদনের** পরিমাণ চাহিদার তুলনায় নিতান্ত কম। দেশের কতক (বিশেষতঃ মধ্য ও উত্তরপশ্চিম) অংশে **বায়ুতে আর্দ্রতা** খুব কম। দেশের বিস্তীর্ণ অংশ সমুদ্র হইতে দূরে এবং সেজন্য সরাসরি **বন্দরের** সুযোগ হইতে বঞ্চিত প্রধানতঃ অর্থাভাব বশতঃ এদেশের কাপড়ের কলগুলিতে (পুরাতন কলকব্জা পরিবর্তন করিয়া) **আধুনিক কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি** ব্যবহার করা সম্ভব হইতেছে না। এদেশে কয়লা ও **বিদ্যুৎশক্তি** সরবরাহের অসুবিধা, **পরিবহন** ব্যবস্থার ত্রুটি, **শ্রমিক** সমস্যা প্রভৃতি মাঝে মাঝে জটিল আকার ধারণ করে। এদেশের জনসংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও অর্থাভাব বশতঃ এখানে **কাপড়ের** (বিশেষতঃ উৎকৃষ্ট ধরনের) **চাহিদা** উন্নত দেশগুলির তুলনায় কম। তাহাছাড়া গত ২০-২৫ বৎসরে কৃত্রিম সুতার তৈরী বস্ত্রের (টেরিলিন, নাইলন প্রভৃতি) চাহিদা ও উৎপাদন ক্রমাগত এত বেশী (১৯৫০ খ্রীঃ তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ ঐরূপ সুতার উৎপাদন প্রায় ৬০ গুণ) বাড়িয়া চলিয়াছে যে এগুলি উৎকৃষ্ট সূতী বস্ত্রের উন্নতির পক্ষে বিরাট বাধা স্বরূপ

ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা—নানা অসুবিধা সত্ত্বেও এদেশে বস্ত্রশিল্পের **উন্নতি অব্যাহত**। এদেশে (মোটা ও মাঝারি ধরনের) কাপড়ের **চাহিদা** ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং আরও বাড়িবে। দেশের কলগুলিতে **উৎপাদন বৃদ্ধি** এবং **উৎকর্ষ সাধনের** জন্যও চেষ্টা চলিতেছে। (দেশেই অধিকাংশ যন্ত্রপাতি তৈরীর ব্যবস্থা হওয়াতে এসকল বিষয়ে উন্নতিও হইবে।) তাহাছাড়া এদেশের বস্ত্র **রপ্তানির** পরিমাণ পৃথিবীতে দ্বিতীয়। এখানকার উৎকৃষ্ট ধরনের (মিল ও তাঁতের) কিছু কিছু বস্ত্র বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশেও রপ্তানি হইতেছে। সুতরাং এদেশের বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

(২) পাটশিল্প

ইহা এদেশের একটি প্রাচীন শিল্প। তবে পূর্বে ইহা (পাটের দড়ি, আসন, চট প্রভৃতি তৈরী) ছিল **কুটীরশিল্প**। আর এখন ইহা একটি অত্যন্ত **গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ শ্রম শিল্প**। বিশেষতঃ এদেশের উৎপন্ন জিনিস রপ্তানি করিয়া বিদেশ হইতে স্বর্ণমুদ্রা উপার্জন সম্পর্কে এদেশের পক্ষে এই শিল্পের স্থান এখনও প্রথম।

উন্নতি—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য** সম্পর্কে পাটের চট, থলে প্রভৃতির **গুরুত্ব খুব** বেশী। কারণ, অনেক জিনিসই ইহাদের সাহায্যে প্যাক করা

আবশ্যক। নানা কাজে পাটের তৈরী দড়ি, আসন, চট প্রভৃতির চাহিদাও প্রচুর। এদেশে এসকল জিনিস তৈরীর জন্য **প্রথম পাটের কল** স্থাপিত হয় ভাগীরথী-হুগলির পশ্চিম তীরে হুগলি জেলার রিষড়াতে (সম্ভবতঃ ১৮৫৯ খ্রীঃ)। তারপর **বিদ্যুৎচালিত পাটকল** স্থাপিত হয় ঐ নদীর পূর্বতীরে বরাহনগরে। ক্রমশঃ এদেশে পাটকলের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল এক শতের উপর। **এখন** ইহাদের **সংখ্যা** ৮০-এর কম (কয়েক ক্ষেত্রে আগেকার কয়েকটি কল একত্রিতও হইয়াছে)। এদেশে এই শিল্পের উন্নতির কারণ অনেক। এখানে **পাটের** (মেস্তাসহ) **উৎপাদন** পৃথিবীতে **প্রথম** (পাশের বাংলাদেশে দ্বিতীয়)। এখানকার **জলবায়ু** আর্দ্র। এই শিল্পের জন্য **প্রয়োজনীয়** কয়লা, বিদ্যুৎশক্তি শ্রমিক, মূলধন প্রভৃতি এখানে **সুলভ**। এখানে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত, তাহাছাড়া পাটজাত জিনিসের স্থানীয় চাহিদা

এবং এখান হইতে (প্রধানতঃ কলিকাতা বন্দরের মারফৎ) অন্যত্র রপ্তানির সুযোগও প্রচুর।

কেন্দ্রীভবন—এদেশে আধুনিক পাটশিল্পের আরম্ভ **কলিকাতা শিল্পাঞ্চলে**। এখানে এই শিল্পের **উন্নতির সুযোগ** অন্য যে-কোন জায়গার চেয়ে বেশী। ফলে, ইংরেজ শাসনকালেই এখানে এই শিল্পের কেন্দ্রীভবন হইয়াছে। এই অঞ্চল কেবলমাত্র ভারত নহে, সমগ্র **পৃথিবীর** মধ্যে পাটশিল্পের **সর্বপ্রধান কেন্দ্র**। এই শিল্পই বহুদিন যাবৎ কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের **সর্বপ্রধান শিল্প**। ভাগীরথী-হুগলির পূর্বতীরে ভাটপাড়া, আগরপাড়া, বরাহনগর, বজবজ, বিড়লাপুর প্রভৃতি এবং পশ্চিমতীরে, রিষড়া, শ্রীরামপুর, হুগলি, বালি, উলুবেড়িয়া প্রভৃতি এই শিল্পের কেন্দ্র।

বিহারের কাটিহার, উত্তরপ্রদেশের কানপুর, সাজানওয়া, অন্ধ্রপ্রদেশের চিতভালসা, নেলিমরলা প্রভৃতি এদেশে এই শিল্পের অন্যান্য কেন্দ্র।

উৎপাদন—১৯৪৭ খ্রীঃ দেশবিভাগের সময় হইতে কিছুদিন এদেশে পাটশিল্পের **চরম দুরবস্থা** ছিল। ক্রমশঃ অবস্থার উন্নতি হইয়াছে এবং **উৎপাদন বাড়িয়াছে**। ১৯৫০ খ্রীঃ এদেশে উৎপন্ন হইয়াছে ৮ লক্ষ টনের অধিক পাটের জিনিস। ১৫ বৎসর পরে

(১৯৬৫-৬৬ খ্রীঃ) এদেশে উৎপন্ন হইয়াছে ১৩ লক্ষ টন পাটের জিনিস। এখন ১৯৭৪ খ্রীঃ উৎপন্ন হইয়াছে ৯ লক্ষ টনের কিছু বেশী। (অর্থাৎ ১০ বৎসরে উৎপাদন যথেষ্ট কমিয়াছে।) এদেশে পাটের তৈরী মোট উৎপন্ন দ্রব্যের প্রায় অর্ধেক থলে, ৯০% চট। বাকি জিনিসের মধ্যে দড়ি, কার্পেট, ক্যানভাস, ত্রিপল, আসন, প্ল্যাস্টিকের জিনিস, বৈদ্যুতিক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সমস্যা—১৯৪৭ খ্রীঃ দেশবিভাগের সময় এদেশে পাটশিল্পের সর্বপ্রধান সমস্যা ছিল প্রয়োজনীয় **পাট সংগ্রহ**। তখন পাটের অভাবে অনেক কল বন্ধ হইয়াছিল। ক্রমশঃ দেশে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে এখন সেই সমস্যার অনেকটা সমাধান হইয়াছে। তবে **এখনকার** সমস্যাও অনেক। যেমন, কৃষকগণ পাট চাষের জন্য পরিশ্রম ও ব্যয়ের অনুপাতে টাকা পাট বিক্রয় করিয়া পান না। তাই **পাট চাষ কমাইয়া** আউস ধান বা অন্য ফসল চাষের জন্য চেষ্টা করেন। পাটশিল্পের **অভ্যন্তরীণ অবস্থা** ও **উৎপাদন** সম্পর্কিত সমস্যাও আছে। এদেশের অনেক কলের **যন্ত্রপাতি পুরানো**। অর্থাভাবে তাহাদের পরিবর্তে আধুনিক কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায় না। তারপর বিদ্যুৎ-শক্তি, শ্রমিক, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা, মূলধন প্রভৃতি সম্পর্কেও সমস্যা যথেষ্ট জটিল। এই শিল্পের অপর কতক সমস্যা শিল্পের **চাহিদা** ও **বাজার** সম্পর্কে। একদিকে বহু দেশ থলে ছাড়াই কতক জিনিস জাহাজ বোঝাই করিয়া বিদেশে চালান দিতেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য জিনিসের (কাগজ, মোটা কাপড় প্রভৃতির) থলে ও প্যাকিং কাগজ ব্যবহার করিতেছে। কাজেই পাটের চট, থলে প্রভৃতির চাহিদা **কমিতেছে**। তার উপর বাংলাদেশের উন্নত মানের থলে, চট প্রভৃতিও এদেশের পাটের জিনিসের সহিত যথেষ্ট **প্রতিযোগিতা** করিতেছে।
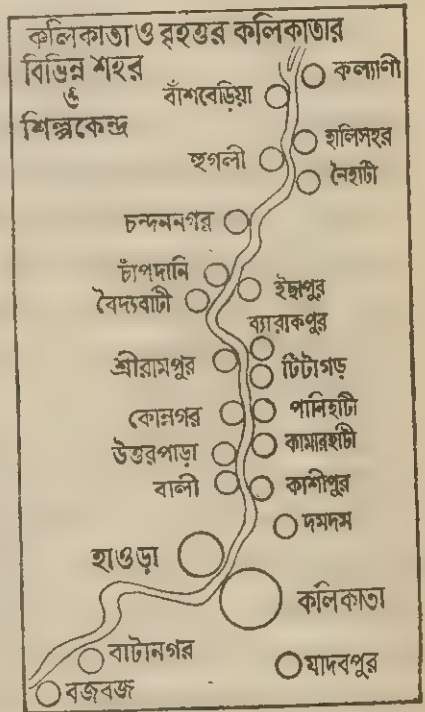
ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা—এদেশের পাটজাত জিনিস এখনও এখানকার **সর্বপ্রধান রপ্তানি-দ্রব্য**। কাজেই দেশ ও জাতির স্বার্থে এই **শিল্পের উন্নতি** অব্যাহত রাখা আবশ্যক। এ বিষয়ে সম্ভাবনাও প্রচুর। কারণ, পাটের চট, থলে প্রভৃতির চাহিদা বিদেশে কমিলেও ত্রিপল, আসন, ক্যানভাস, কার্পেট, দড়ি, পাটের সুতার সাহায্যে তৈরী কাপড় (জুট সিল্ক) প্রভৃতির **চাহিদা** বাড়িতেছে। এসকল জিনিসের **উৎপাদন বৃদ্ধির** জন্য সকল রকম ব্যবস্থা করা দরকার। তাছাড়া অন্য দেশের জিনিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়লাভের জন্য এখানকার পাটের জিনিসের **মান উন্নয়ন** ও উৎপাদনের **ব্যয় হ্রাসের** ব্যবস্থা করা দরকার।

(৩) **চা শিল্প**

এদেশের এই শিল্পটি অপেক্ষাকৃত **আধুনিক** (মাত্র ১৮২৫ খ্রীঃ এর কাছাকাছি এদেশে চায়ের আবাদ আরম্ভ হয়)। অথচ বিদেশ হইতে স্বর্ণমুদ্রা আমদানি সম্পর্কে ইহার **গুরুত্ব** অসামান্য (পাটজাত জিনিসের পরেই)।

উন্নতি—চা এদেশে সর্বাপেক্ষা **সহজলভ্য ও জনপ্রিয় পানীয়**। বিদেশেও ইহার চাহিদা প্রচুর. ফলে, গত ১৫০ বৎসর যাবৎ এদেশে এই শিল্প ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। বর্তমানে এদেশে ৬,০০০ এর বেশী **চা-বাগান** আছে এবং প্রায় ১০ লক্ষ লোক এই শিল্পে (চায়ের আবাদে কাজসহ) নিযুক্ত। তাহাছাড়া এই শিল্পের উন্নতি উপলক্ষে ভারতের উত্তরপূর্ব অংশে ইঞ্জিনিয়ারিং, প্যাকিং প্রভৃতি শিল্প এবং যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হইতেছে।

কেন্দ্রীভবন—ভারতের **উত্তরপূর্ব অংশের** পার্বত্য ভূ-প্রকৃতি, উর্বর হিউমাস মৃত্তিকা ও উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু **চায়ের আবাদের** পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এখানে শ্রমিক, মূলধন প্রভৃতিও প্রচুর। (অন্য রাজ্যের শ্রমিকও অনেক। পরিবারের মহিলা ও শিশুরা চায়ের কুঁড়ি সংগ্রহের কাজে এবং পুরুষগণ আবাদ ও অন্যান্য কাজে নিযুক্ত হন।) এসকল সুবিধার ফলে এদেশের চা শিল্প **উত্তরপূর্ব ভারতে কেন্দ্রীভূত**। এতদিন ৫০% চা **আসামের** নওগাঁ, ডিব্রুগড়, শিবসাগর, লখিমপুর, কাছাড় প্রভৃতি জেলাতে এবং ২৫-৩০% পশ্চিমবঙ্গের **দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে** উৎপন্ন হইত। ক্রমশঃ দক্ষিণ ভারতের **নীলগিরি অঞ্চলে** চায়ের উৎপাদন বাড়িয়া চলিয়াছে (এখন অন্ততঃ ২৫%)। ফলে, **তামিলনাড়ু, কর্ণাটক** ও **কেরালাতে** চা শিল্পের গুরুত্ব বাড়িতেছে। তাহাছাড়া এদেশের কিছু চা উৎপন্ন হয় ত্রিপুরা রাজ্য, বিহারের ছোটনাগপুর, উত্তর প্রদেশের দেরাদুন, আলমোড়া ও হিমাচল প্রদেশের কাংড়া উপত্যকায়।

উৎপাদন—১৯৫০ খ্রীঃ এদেশে প্রায় ২৮ কোটি কেজি চা তৈরী হইত, ১৯৭৫ খ্রীঃ তৈরী হইয়াছে ৪৮ কোটি কেজির অধিক চা (১৯৫০ খ্রীঃ তুলনায় ৬৬% বেশী)। বর্তমানে এদেশের চায়ের উৎপাদন **পৃথিবীতে প্রথম**। **দার্জিলিঙের ও আসামের** কয়েকটি বাগানের চা স্বাদে, গন্ধে **অতুলনীয়**; ইহাদের দামও বেশী। গত কয়েক বৎসরে **'ইন্‌স্‌ট্যান্ট টি'** নামে এদেশের কতক গুঁড়া চায়ের উৎপাদন ও বিক্রয় ১০ গুণের অধিক বাড়িয়াছে।

সমস্যা এদেশের চা শিল্পের সমস্যা অনেক। তাহাদের মধ্যে কতক প্রাকৃতিক। যেমন, চা-গাছের গোড়ার জল জমিলে গাছ মরিয়া যায়। অপরদিকে বৃষ্টি কম হইলে কুঁড়ি কম হয়, চায়ের উৎপাদনও কম হয়। চা তৈরী ও প্যাকিং সম্পর্কে ত্রুটি, শ্রমিকের সমস্যা, যাতায়াত ও পরিবহনের সমস্যা প্রভৃতিও খুবই জটিল। (এদেশের অধিকাংশ চা বাংলাদেশের মধ্য দিয়া আসাম হইতে কলিকাতাতে আসে এবং কলিকাতা বন্দরের মারফত বিদেশে রপ্তানি হয়।) বিদেশের বাজারে শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের চায়ের সহিত প্রতিযোগিতাও এক কঠিন সমস্যা।

ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা—এদেশের চায়ের চাহিদা দেশে ক্রমশঃ বাড়িতেছে। বিদেশেও এখানকার চায়ের সুখ্যাতি প্রচুর এবং চাহিদা যথেষ্ট। কাজেই উন্নত মানের চা বিদেশেও বিক্রয়ের সুযোগ আছে; তাই এই শিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

(খ) খনিজ সম্পদ্-ভিত্তিক শিল্প

এদেশের কতক খনিজ সম্পদ্-ভিত্তিক কুটীর শিল্প **অতি প্রাচীন**। এই জাতীয় আধুনিক বৃহৎ শিল্পেরও ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। তন্মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের এবং ইহার উপর নির্ভরশীল কয়েকটি শিল্পের বিষয় এখানে আলোচিত হইবে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

দিল্লীর কুতুব মিনারের পাশের লৌহস্তম্ভ, বিভিন্ন স্থানের পুরানো কামান প্রভৃতি এদেশের প্রাচীন লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতির নিদর্শন। তবে **আধুনিক** ইস্পাত শিল্পের (কয়লার চুলীর সাহায্যে লোহা গলাইয়া ইস্পাত তৈরী) সূত্রপাত হয় বীরভূম জেলাতে (সম্ভবতঃ ১৭৭৭ খ্রীঃ)। এখন এদেশের **জামসেদপুর** সমগ্র পৃথিবীতে ইস্পাত শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র (এশিয়াতে তৃতীয়)।

উন্নতি—এদেশে ইস্পাত শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির নিম্নলিখিত **সুযোগ** বর্তমান। বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যে পাওয়া যায় প্রচুর **উৎকৃষ্ট লৌহ আকরিক**। **কয়লা,**

ম্যাঙ্গানিজ, ডলোমাইট, চুনাপাথর প্রভৃতি পাওয়া যায় এই দুই রাজ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশে। **যাতায়াত ও পরিবহনের** সুবিধা, **জল** এবং **জলজ বিদ্যুৎশক্তি, তাপবিদ্যুৎশক্তি,** শ্রমিক, মূলধন প্রভৃতিও প্রচুর। তাই গত ২৪।২৫ বৎসরে এদেশে এই শিল্পের উন্নতি হইয়াছে অসামান্য। পূর্ব গোলার্ধে চীন ও জাপান ভিন্ন অন্য কোন দেশের ইস্পাত শিল্প এখানকার মত এত উন্নত নহে। তাই এদেশের ইস্পাত শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল **ইঞ্জিনিয়ারিং** বা **পূর্তশিল্পেরও উন্নতি** হইতেছে অসামান্য। কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি; যাতায়াত ও পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় নানারকম মোটরগাড়ি, ট্রাক, রেলগাড়ি, ইঞ্জিন, স্টীমার; আধুনিক কলকারখানার জন্য বহুরকম যন্ত্রপাতি, কলকব্জা; বড় ছোট নানারকম সেতু, বাড়ি প্রভৃতি তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস, দেশরক্ষা, গৃহস্থালী, অফিস প্রভৃতির নানা কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অসংখ্য জিনিস এদেশে তৈরী হইতেছে। এদেশের ইস্পাতের জিনিসের বিদেশেও চাহিদা প্রচুর।
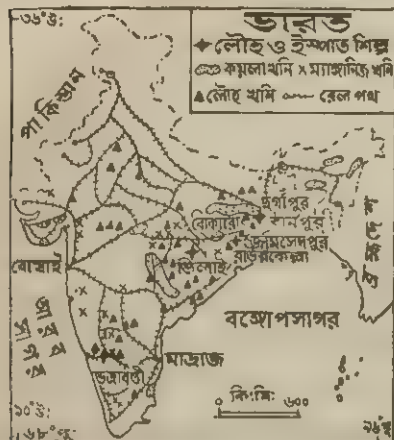
কেন্দ্রীভবন—ছোটনাগপুর ও তাহার **আশপাশের** স্থানসমূহ এদেশে এই শিল্পের **স্বাভাবিক কেন্দ্র**। প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে (সম্ভবতঃ ১৭৭৭ খ্রীঃ) কয়লার চুল্লীর সাহায্য **ঢালাই লোহের কারখানা** স্থাপিত হয় বীরভূম জেলাতে। তারপর **ব্ল্যাস্ট ফার্নেস** জাতীয় চুল্লীতে ইস্পাত তৈরী আরম্ভ হয় এই অঞ্চলের অন্তর্গত রাণীগঞ্জের পাশে **কুলটিতে** (সম্ভবতঃ ১৮৭৪ খ্রীঃ এবং প্রায় ৩০-৩৫ বৎসর ইহাই ছিল এদেশের ইস্পাত শিল্পের প্রধান কেন্দ্র)। তারপর এদেশে **ইস্পাতশিল্পের বৃহত্তম কেন্দ্র** স্থাপিত হয় এখানকার **জামসেদপুরে** (১৯০৭-৮ খ্রীঃ)। ইহার পর রাণীগঞ্জের পাশে **হীরাপুর** কেন্দ্র (১৯১৮ খ্রীঃ) এবং **বার্নপুর** কেন্দ্র (১৯২৩ খ্রীঃ) স্থাপিত হয়। স্বাধীনতা-

লাভের পূর্বে এদেশে ইস্পাতের উৎপাদন ছিল কম এবং তাহার ৭৫% তৈরী হইত জামসেদপুর কেন্দ্রে। **স্বাধীনতালাভের** সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্নমুখী উন্নতির জন্য
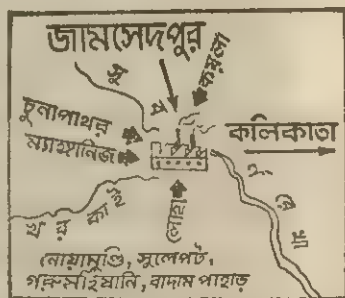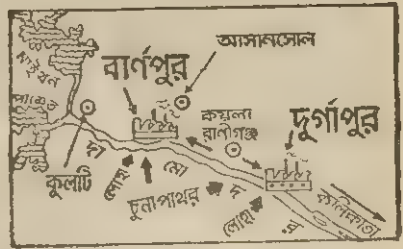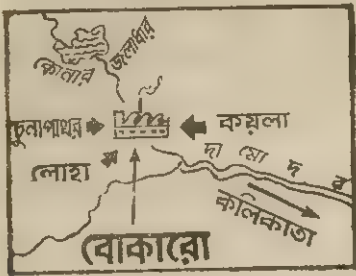
ইস্পাতের **চাহিদা** বাড়িয়া চলিয়াছে শত, সহস্রগুণ (বিদেশেও ভারতীয় ইস্পাতের চাহিদা বাড়িতেছে)। ফলে, **সরকারী প্রচেষ্টায়** ছোটনাগপুর ও আশপাশে গড়িয়া
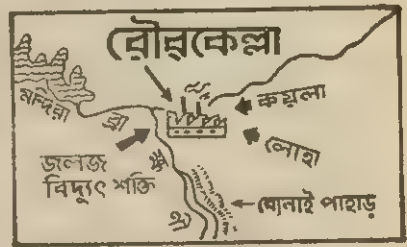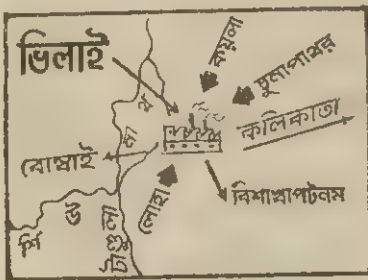
উঠিয়াছে ইস্পাত শিল্পের চারিটি বৃহৎ কেন্দ্র—পশ্চিমবঙ্গে **দুর্গাপুর**, বিহারে **বোকারো**, উড়িষ্যাতে **রৌরকেল্লা** ও মধ্যপ্রদেশে **ভিলাই**। (এগুলি প্রথমে ছিল হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেডের অধীন, এখন এগুলি স্টীল অথরিটি অথ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের বা SAIL-এর অধীন।) যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানী ও সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের সাহায্যে এসকল কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনতালাভের পর পশ্চিমবঙ্গের বার্নপুর, হীরাপুর ও কুলটির কারখানা এক কর্পোরেশনের অধীন হইয়াছে। এখন কুলটিতে ইস্পাত তৈরী হয় না। বার্নপুরের কারখানা হীরাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।
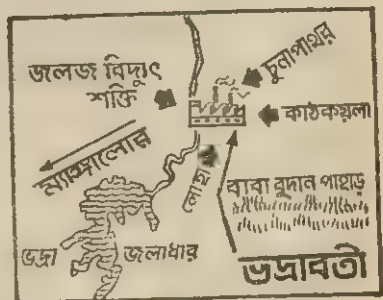
এদেশের ইস্পাত শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র কর্ণাটকের **ভদ্রাবতী**। (ইহা স্থাপিত হয় ১৯৩৬ খ্রীঃ।) এখানকার পাশে বাবাবুদান পাহাড় ও সিমোগাতে লৌহ আকরিক, সিমোগা ও চিতলদ্রুগে ম্যাঙ্গানিজ ও পাশে চুনাপাথর পাওয়া যায়। নদী (ভদ্রা—ইহা কৃষ্ণার উপনদী), শ্রমিক, মূলধন, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থাদিও এখানে সুবিধাজনক। কেবল কয়লার অভাব এখানে। তাই বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয় (আগে কাঠকয়লা ব্যবহৃত হইত)।

উৎপাদন—১৯৫১-৫২ খ্রীঃ এদেশে ১৩ লক্ষ টন ইস্পাতের উপাদান (লৌহপিণ্ড) ও ১১ লক্ষ টন ইস্পাত তৈরী হইয়াছিল। তাহার ৫ বৎসর পরেও (১৯৫৬-৫৭ খ্রীঃ) উৎপাদন বেশী বাড়ে নাই। ইহাদের পর নূতন কারখানাগুলির উৎপাদন সুরু হয় এবং পুরানো কারখানাগুলিরও উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। ফলে, গত ২৫ বৎসরে এদেশে ইস্পাতের উৎপাদন সম্পর্কে নিম্নলিখিতরূপ উন্নতি ঘটিয়াছে।

	লৌহ পিণ্ড উৎপাদন (লক্ষ টন)	উৎপাদনের ক্ষমতা (লক্ষ টন)	ইস্পাত উৎপাদন (লক্ষ টন)	উৎপাদনের ক্ষমতা (লক্ষ টন)	মন্তব্য ১৯৫১ খ্রীঃ
১৯৫১-৫২	১৭		১১		তুলনায় ইস্পাত
১৯৬০-৬১	৪৩	৬০	৩৪		১২০% বেশী
১৯৭৪-৭৫	৭৫	১০৬	৪৯	৮১	৩৫০% „

১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ এদেশের বিভিন্ন কারখানাতে নিম্নলিখিত পরিমাণ ইস্পাত (লক্ষ টন হিসাবে) উৎপন্ন হইয়াছে :

	লৌহ পিণ্ড উৎপাদন	উৎপাদনের ক্ষমতা	ইস্পাত উৎপাদন	উৎপাদনের ক্ষমতা
জামসেদপুর	প্রায় ১৭	প্রায় ২০	প্রায় ১৪·৬	প্রায় ১৫
বার্নপুর	৫	১০	৪	৮
দুর্গাপুর	৮	১৬	৫	১২
রৌরকেল্লা	১১	১৮	৮	১২
ভিলাই	২০	২৫ (৪০)	১৭	২০
বোকারো	১	১৭ (৪০)		১৪
মোট	৬২	১০৬	৪৯	৮১

সমস্যা—এদেশে ইস্পাত শিল্পের সমস্যা নানাপ্রকার। যেমন, এই শিল্প দেশের একটিমাত্র অংশে কেন্দ্রীভূত (প্রায় সীমাবদ্ধ)। এদেশের কারখানাগুলিতে ইস্পাত

তৈরীর ক্ষমতা অনুসারে কাজ হয় না। এবিষয়ে পরিচালনা ও শ্রমিক সমস্যা, লৌহ আকরিক, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, চুনাপাথর প্রভৃতির সরবরাহ ও পরিবহন সমস্যা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রয়োজনমত তাপবিদ্যুৎ ও জলজ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহও কঠিন সমস্যা। বিশেষতঃ ভদ্রাবতীতে বহুদিন পর্যন্ত ইহাই ছিল সর্বপ্রধান সমস্যা। এদেশে লৌহ আকরিকের উৎপাদনের তুলনায় ইস্পাতের উৎপাদন কম। তাহার ফলে প্রচুর লৌহ বিদেশে রপ্তানি হয়। আমাদের তৈরী ইস্পাতের জিনিসের সহিত বিদেশের বাজারে অন্যান্য দেশের উন্নত ধরনের উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতিযোগিতাও একটি গুরুতর সমস্যা।

ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা—এদেশে ইস্পাতের চাহিদা যেভাবে বাড়িতেছে তাহাতে দেশের প্রয়োজনেই ইস্পাতের উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়ানো দরকার। বিদেশেও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন। এসকল কারণে ১৯৮০ খ্রীঃ এদেশে ২ কোটি টন ইস্পাত উৎপাদন করা প্রয়োজন, অথচ ১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ উৎপন্ন হইয়াছে ৪৯ লক্ষ টন ইস্পাত (৬২ লক্ষ টন লৌহপিণ্ড)। সুতরাং এদেশের ইস্পাত শিল্পের **ভবিষ্যৎ** খুবই **উজ্জ্বল**। ইস্পাতের উৎপাদনবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এদেশে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা হইতেছে।

(১) সরকারী কারখানাগুলিকে স্টীল অথরিটি অব ইণ্ডিয়া লিঃ বা SAIL-এর **অধীন** করা হইয়াছে। সরকারী প্রচেষ্টায় **সালেম** (তামিলনাড়ু), **বিশাখাপটনম্** (অন্ধ্রপ্রদেশ) ও **বিজয়নগরে** (কর্ণাটক) তিনটি **নূতন** ইস্পাতকেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে। দুর্গাপুর, হাওড়া (গেস্টকীন উইলিয়মস্), বোম্বাই ও ভদ্রাবতীতে **বিশেষ ধরনের ইস্পাত** (এলয় স্টীল) তৈরী হইতেছে। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যে ক্ষুদ্র (মিনি) ইস্পাতকেন্দ্র তৈরীরও সম্ভাবনা আছে।

(২) এদেশে উৎপন্ন ইস্পাতের সাহায্যে **পূর্ত** বা **ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের** বিশেষ উন্নতি হইতেছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কতকগুলি উল্লেখযোগ্য—রাঁচির নিকট হাতিয়া, উত্তরপ্রদেশের হরিদ্বার ও নৈনি (এলাহাবাদের নিকট), হরিয়ানার পিঞ্জোর, পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর, অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দরাবাদ ও বিশাখাপটনম্, কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোর, কেরালার কলামাসেরি প্রভৃতি কেন্দ্রে **ভারি যন্ত্রপাতি** (রাস্তা তৈরীর রোলার, বড় বড় সেতুর বিভিন্ন অংশ প্রভৃতি), যানবাহন (রেলওয়ে ওয়াগন ও কোচ, মোটরগাড়ির অংশ, ট্রাক, স্কুটার প্রভৃতি) এবং নানাপ্রকার **কলকব্জা** ও **যন্ত্রপাতি** তৈরী হইতেছে।

(৩) **মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প**—এদেশের ইস্পাত শিল্পের সাহায্যে মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে কোন্নগর-উত্তরপাড়া অঞ্চলের **হিন্দ মোটরস** সমগ্র এশিয়ার মধ্যে **বৃহত্তম** মোটরগাড়ি নির্মাণকেন্দ্র।

(৪) **রেলওয়ে-ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প**—পশ্চিমবঙ্গে মিহিজামের পাশে **চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস** এদেশে এই শিল্পের **বৃহত্তম** কেন্দ্র। এখানে আগে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন তৈরী হইত। ১৯৬১ খ্রীঃ হইতে বৈদ্যুতিক ও ডিজেল রেল-ইঞ্জিন তৈরী হইতেছে। ১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ এখানে ৩০টি ডিজেল রেলইঞ্জিন এবং ৯২টি বৈদ্যুতিক রেলইঞ্জিন তৈরী হইয়াছে।

(৫) **জাহাজ নির্মাণ শিল্প**—অন্ধ্রপ্রদেশের **বিশাখাপটনম্** এদেশে এই শিল্পের **বৃহত্তম** কেন্দ্র (এখানে প্রতি বৎসর গড়ে ৩০টির অধিক জাহাজ তৈরী হয়)। কেরালা রাজ্যের **কোচিন** দ্বিতীয় কেন্দ্র।

(৬) **বিমানপোত নির্মাণ শিল্প**—এই শিল্পের জন্য এলুমিনিয়াম ও ইস্পাত এই দুই ধাতব পদার্থের প্রয়োজন অধিক। কর্ণাটকের **ব্যাঙ্গালোর** এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। এখানে খুব উন্নত ধরনের জঙ্গীবিমানও (সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনে) তৈরী হয়।

(গ) উদ্ভিজ্জ সম্পদভিত্তিক শিল্প

নানাপ্রকার গাছের কাঠ, বাঁশ, বেত, তৃণগুল্ম প্রভৃতির সাহায্যে অনেক রকম শিল্পদ্রব্য এদেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে কুটির শিল্প হিসাবে তৈরী হইতেছে। কিছুকাল যাবৎ এসকল উপাদানের সাহায্যে **বহু বৃহৎ শ্রম শিল্প** ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। এই জাতীয় নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্যের মধ্যে মোটর গাড়ি, ট্রাক, লঞ্চ, ষ্টীমার প্রভৃতির বিভিন্ন অংশ (বডি), রেলগাড়ির কোচ, ওয়াগন, আসবাবপত্র, কাগজ, বোর্ড, প্যাকিং বাক্স প্রভৃতি অন্যতম। ইহাদের মধ্যে কাগজ শিল্পের বিষয় এখানে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

কাগজ শিল্প

এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অতি প্রাচীন। তাই এদেশে লেখার প্রথাও অতি পুরাতন। বহুদিন আগে বার্চ বা ভুর্জ গাছের পাতায় (ভোজপাতা) লেখা হইত। (এখনও পশ্চিমবঙ্গের পাড়াগাঁয়ে শিশুরা প্রথম অবস্থায় কলাপাতায় বা শ্লেটে লেখে।)

তারপর এদেশে **কুটীর শিল্প** হিসাবে কাগজ তৈরী হইত। এখন বহু **বড় বড় কারখানায়** কাগজ তৈরী হয়।

উন্নতি—এদেশে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয় কলিকাতার পশ্চিমদিকে বালিতে (সম্ভবতঃ ১৮৭০ খ্রীঃ)। প্রথম অবস্থায় এই শিল্পের জন্য বিদেশী কাগজের মণ্ড (কোমল কাঠের মণ্ড) ব্যবহৃত হইত। ক্রমশঃ দেশের কোমল কাঠ, বাঁশ, লম্বা ঘাস, শণ, তুলা, আখের ছিবড়া, ছেঁড়া কাপড় প্রভৃতির সাহায্যে এদেশেই মণ্ড তৈরী হইতেছে। তাহাছাড়া এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা ও বিদ্যুৎশক্তি যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা, শ্রমিক, মূলধন প্রভৃতি বিষয়েও এদেশে সুবিধা অধিক। এদেশে কাগজের চাহিদাও প্রচুর। কাজেই এখানে কাগজ শিল্পের উন্নতি স্বাভাবিক।

কেন্দ্রীভবন—এদেশে কাগজ শিল্পের প্রধান কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের **কলিকাতা শিল্পাঞ্চল**। এদেশের প্রথম কাগজ কল স্থাপিত হয় এখানে। এই শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সমুদয় সুযোগ এখানে বিদ্যমান। এখানকার প্রধান কেন্দ্র **টিটাগড়**, তারপর কাঁকিনাড়া, নৈহাটি ও ত্রিবেণী। বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জও এই শিল্পের একটি কেন্দ্র। এদেশে কাগজ শিল্পের দ্বিতীয় অঞ্চল **মহারাষ্ট্র**। এখানকার এই শিল্পের

কেন্দ্র বোম্বাই, খোপলি, করাদ ও হাদাসপুর। এদেশে আরও কতক স্থানে কাগজের কল আছে। যেমন, উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ, সাহারানপুর, জগধ্রী, ফরিদাবাদ; মধ্যপ্রদেশের নেপানগর, বিহারের ডালমিয়ানগর; উড়িষ্যার ব্রজরাজনগর; অন্ধ্রপ্রদেশের সিরপুর, রাজামান্দ্রী; কর্ণাটকের নঞ্জনগড়, ভদ্রাবতী, ডাণ্ডেলি এবং কেরালার পুনালুর-কুইলন ও ত্রিবান্দ্রম্ প্রভৃতি। নেপানগরে সংবাদপত্র ছাপার কাগজ তৈরী হয়।

উৎপাদন—১৯৪৭ খ্রীঃ এদেশে কাগজকল ছিল মাত্র ১০টিরও কম, এখন (১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ) তাহাদের সংখ্যা ৬০। তারপর ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে তৈরী হইয়াছে ১.২ লক্ষ টন কাগজ, আর এখন (১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ) তৈরী হয় ৮.৪ লক্ষ টন (অর্থাৎ তখনকার ৭ গুণ)। তাহাছাড়া এখন এদেশে সাধারণ লেখার কাগজ, বই ছাপা, সংবাদপত্র ছাপা, বিভিন্ন মূল্যের নোট (টাকা) ছাপা, ফটো ছাপা, প্যাকিং প্রভৃতি **বহু কাজের উপযোগী কাগজ** তৈরী হয়। রঙীন কাগজ, সিগারেট মোড়ার পাতলা কাগজ, টিস্থ পেপার প্রভৃতি এবং নানারকমের বোর্ডও তৈরী হয় এদেশে।

সমস্যা—এদেশের কাগজ শিল্পের প্রধান সমস্যা এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি কাছাকাছি পাওয়া যায় না। যেমন, দেশের যে অংশে কাগজের মণ্ড তৈরীর উপাদান (বাঁশ, কোমল কাঠ প্রভৃতি) প্রচুর, সেখানে কয়লা ও বিদ্যুৎশক্তির অভাব। আর যেখানে কয়লা ও বিদ্যুৎশক্তি আছে, সেখানে কাগজের মণ্ড তৈরীর উপাদানের অভাব। তাই কাগজকলের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন ও জিনিসপত্র পরিবহনের সমস্যা জটিল। তাহাছাড়া অন্যান্য কারণেও এদেশে কাগজের উৎপাদন খুব কম। এদেশের লোকসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষিতের হার খুব অল্প (৩০% মাত্র)। তবু কাগজের চাহিদা অনুসারে এদেশে কাগজ তৈরী হয় না।

ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা—এদেশে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কাগজের চাহিদা বাড়িবে। তাহাছাড়া আশপাশের দেশগুলিতে, এমন কি আফ্রিকাতেও এখান হইতে কাগজ রপ্তানির সুযোগ আছে। এদেশ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ধরনের কাগজ ও বোর্ড তৈরী করিতে সফল হওয়াতে ইহা সহজেই মনে হয় যে এদেশে কাগজ শিল্পের **ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল**। এদেশের বিস্তীর্ণ অংশে (কাশ্মীর হইতে অরুণাচল হইয়া ত্রিপুরা পর্যন্ত এবং মধ্যপ্রদেশ হইতে কেরালা পর্যন্ত) কাগজ তৈরীর উপাদান প্রচুর। তাই এরূপ কতক সুবিধাজনক স্থানে নতুন কাগজকল স্থাপন করিলে এই শিল্পের উন্নতি হইবে।

(ঘ) সিমেণ্ট শিল্প

ইহা এদেশের আধুনিক বৃহৎ শিল্পসমূহের অন্যতম। দেশের বড় বড় কলকারখানা, নদীর উপর বাঁধ, সেতু, বহুতল বাড়ি প্রভৃতি তৈরী সম্পর্কে ইহার গুরুত্ব অসামান্য।

উন্নতি—এদেশে প্রথম সিমেণ্ট কারখানা তৈরী হয় তামিলনাড়ুতে (১৯০৪ খ্রীঃ)। তবে স্বাধীনতালাভের পর হইতে দেশের সর্বতোমুখী উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সিমেণ্টের **চাহিদা** বাড়িয়া গিয়াছে বহুগুণ। এদেশে এই শিল্পের উপাদান চুনাপাথর, এঁটেলমাটি, জিপসাম সুলভ। কয়লা ও বিদ্যুৎশক্তি, যাতায়াত ও পরিবহন, মূলধন, শ্রমিক প্রভৃতি বিষয়েও এদেশে সুবিধা প্রচুর। তাই গত কয়েক বৎসর যাবৎ এদেশে এই শিল্পের উন্নতি হইতেছে খুব বেশী।

কেন্দ্রীভবন—এদেশে এই শিল্পের প্রধান অঞ্চল **বিহার** রাজ্যের ছোটনাগপুর ও আশপাশ। এখানকার প্রধান কেন্দ্র ডালমিয়ানগর, জাপলা, চাইবাসা, সিন্ধ্রি, রাঁচি (খেলারি), কল্যাণপুর, শোনভ্যালি প্রভৃতি। **তামিলনাড়ুর** স্থান এদেশে দ্বিতীয়। এখানকার প্রধান কেন্দ্র মধুকড়াই (কয়েম্বেটোর), ডলমিয়াপুরম্, মঙ্গলগিরি, তেরুনেলভেলি। হরিয়ানার রোহ্‌টক, দাদরি ; উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ ; রাজস্থানের সাওয়াই-মাধোপুর, লাখেরি ; গুজরাটের পোড়বন্দর, সেভালিয়া ; মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর, গোয়ালিয়র, কাটনি ; উড়িষ্যার রাজগাঙ্গপুর ; অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াদা, হায়দারাবাদ ; কর্ণাটকের ভদ্রাবতী, ব্যাঙ্গালোর ; কেরালার কোট্টায়াম প্রভৃতি কেন্দ্রও প্রসিদ্ধ।

উৎপাদন—১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে তৈরী হইয়াছে প্রায় ২৭ লক্ষ টন সিমেণ্ট, আর ১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ তৈরী হইয়াছে দেড় কোটি টনের অধিক (ঐ সময়ের ৫ গুণের বেশী) সিমেণ্ট।

সমস্যা—এদেশে এই শিল্পের কয়েকটি সমস্যা উল্লেখযোগ্য। যেমন, ইহার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান প্রায়ই একসঙ্গে পাওয়া যায় না। তাই সিমেণ্টের কারখানা তৈরীর উপযুক্ত স্থান নির্বাচন এবং জিনিসপত্রের পরিবহনের সমস্যা জটিল। এদেশের আর্দ্র জলবায়ুতে সিমেণ্ট সহজে জমিয়া শক্ত (পাথরের মত) হইয়া যায়। কাজেই সিমেণ্ট উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ বা মজুত রাখাও এক সমস্যা।

ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা—এদেশে সিমেণ্টের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহাছাড়া আশপাশের দেশগুলিতেও ভারতের সিমেণ্ট রপ্তানির সুযোগ

আছে। ফলে, এই শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তাহা ভিন্ন নূতন নূতন উপাদানের সাহায্যে নূতন ধরনের সিমেণ্টও এদেশে তৈরী করা সম্ভবপর।

অনুশীলনী

১। কখন হইতে পৃথিবীতে শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি আরম্ভ হয়? কোন্ কোন্ বিষয়ে সুবিধা এই জাতীয় শিল্পের উন্নতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক? ২। শিল্পের কেন্দ্রীভবন বলিলে কি বুঝ? এদেশে কার্পাস শিল্প কোথায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে? তথায় ইহার কেন্দ্রীভবনের কারণ কি? ৩। শিল্পনগর ও শিল্পাঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য কি? ভারতের সর্বপ্রধান শিল্পাঞ্চল কোথায়? এখানে কোন্ কোন্ শিল্প অধিক উন্নত? পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান শিল্পাঞ্চলের নাম লিখ। ৪। শিল্পসমূহ ইহাদের প্রধান উপাদান অনুসারে কত ভাগে বিভক্ত? ভাগগুলি কি কি? ৫। পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশ লৌহ ও ইস্পাতশিল্পে অধিক উন্নত? যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের লৌহ ও ইস্পাতশিল্পের কেন্দ্রগুলি বর্ণনা কর। ৬। পূর্তশিল্প কাহাকে বলে? লৌহ ও ইস্পাতশিল্পের সহিত এই শিল্পের সম্পর্ক কিরূপ? জাহাজ নির্মাণ, কৃষির যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্পের অবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৭। কৃষিজ সম্পদভিত্তিক দুইটি প্রধান শিল্পের নাম লিখ। এগুলি পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে অধিক উন্নত? কেন? ৮। প্রাণিজ সম্পদভিত্তিক দুইটি প্রধান শিল্পের নাম লিখ। এগুলি কোন্ কোন্ দেশে অধিক উন্নত? কেন? ৯। উদ্ভিজ্জ সম্পদভিত্তিক দুইটি প্রধান শিল্পের নাম লিখ। এগুলি কোন্ কোন্ দেশে অধিক উন্নত? কেন? ১০। কোন দেশে শিল্পের উপযোগী প্রধান উপাদানের (Raw materials) অভাব সত্ত্বেও শিল্প প্রভূত উন্নতি লাভ করে। এবিষয়ে দুইটি উদাহরণ দাও। কিভাবে তথায় শিল্পের উন্নতি হইয়াছে তাহা লিখ। ১১। কোন দেশে শিল্পের উপাদান প্রচুর থাকা সত্ত্বেও শিল্প অধিক উন্নত নহে। এ সম্পর্কে দুইটি উদাহরণ দাও। তথায় এই শিল্পের উন্নতি না হওয়ার কারণ কি?

দশম অধ্যায়

যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা

বাণিজ্যপথ ও বাণিজ্যকেন্দ্র

পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা—পূর্বকালে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে খুব কম লোক বাস করিত। তখন তাহাদের চাহিদাও ছিল কম এবং তাহার প্রায় সবটুকুই নিজেরা উৎপন্ন করিত (Self-sufficient)। তাহাছাড়া নিজেদের দরকারমত কিছু কিছু জিনিস পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান বা বিনিময় (Barter) করিত। কাজেই তখন মানুষের পক্ষে দূর দূরান্তরে যাতায়াত বা দূরে জিনিসপত্র পরিবহনের তেমন প্রয়োজন ছিল না। আজও উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল, গহন অরণ্য অঞ্চল, শীতল মেরু অঞ্চল প্রভৃতি বহু স্থানে অনেক মানুষ সেই প্রাচীন যুগের মতই জীবন যাপন করেন। তাঁহারা পায়ে হাঁটিয়া চলেন, নিজেরাই প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী বা উৎপন্ন করেন এবং প্রয়োজনমত এখানে-ওখানে বহন করেন। তবে ক্রমে ক্রমে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাঁহাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আর্থিক অবস্থা, কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের চাহিদা বাড়িতেছে। আধুনিককালের মানুষের প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসই তাঁহাদের বাসস্থলের আশপাশে বা ভোগকেন্দ্রে উৎপন্ন হয় না। তাই নিম্নলিখিত **নানা কারণে** পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

(১) **মানবসমাজের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটানো**—পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক মানুষের প্রতিদিনের নানা প্রয়োজন মিটাইবার জন্য জিনিসপত্রের পরিবহন অত্যাবশ্যক। নিজেদের বিভিন্ন কাজে নানা স্থানে যাতায়াতের উদ্দেশ্যেও যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

(২) **দেশের বিভিন্ন সম্পদ সংগ্রহ ও সরবরাহ**—বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশের নানাস্থানে উদ্ভিজ্জ, কৃষিজ, প্রাণিজ ও খনিজ বহু প্রকার সম্পদ আছে। এসকল জিনিস ইহাদের উৎপাদনস্থল হইতে সংগ্রহ করা এবং ইহাদিগকে ব্যবহারের উপযুক্ত স্থানে ঠিকমত সরবরাহের জন্য যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি একান্ত প্রয়োজন। যেমন, শাক, সবজি, দুধ, ফল, মাছ, মাংস, আখ প্রভৃতি খুব দ্রুত পরিবহনের ব্যবস্থা আবশ্যক। অন্যথা এগুলি ব্যবহার করা যায় না। কাঠ সরবরাহের জন্য বড় ট্রাক প্রয়োজন। খনিজ তৈল, দুধ প্রভৃতি তরল পদার্থ সরবরাহের জন্য বিশেষ ধরনের গাড়ি প্রয়োজন।

(৩) **শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিবিধান**—পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদের কতক অংশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করি। কিন্তু ইহাদের একটি বৃহৎ অংশ নানাপ্রকার শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হয়। আর এরূপ বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য বহু দূর দূরান্তরেও তৈরী ও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং শিল্পের উপাদানগুলিকে শিল্পকেন্দ্রে সরবরাহ, আবার শিল্পকেন্দ্র হইতে ইহাদের ব্যবহারের উপযুক্ত স্থানে (শহর, নগর, বন্দর, হাট, বাজার প্রভৃতি) সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি আবশ্যক।

(৪) **অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য**—বিভিন্ন দেশে উৎপন্ন নানাপ্রকার সম্পদ (শিল্পদ্রব্য সহ) ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকেন্দ্রে (হাটে বাজারে) প্রেরণের জন্য যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি অত্যাবশ্যক। আধুনিক কালে বহু জিনিসই উৎপাদনকারী দেশের সীমা ছাড়াইয়া অনেক দূর দেশেও বিক্রয় হয়। যেমন, ভারতের চা, পাটের জিনিস প্রভৃতি পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত দেশে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বিভিন্ন জিনিসের বৈদেশিক বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধার জন্যও উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন।

(৫) **দেশের শাসনকার্যে শান্তিশৃঙ্খলা বিধান ও স্বাধীনতা রক্ষা**—যে-কোন দেশের শাসন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন, উপযুক্ত শৃঙ্খলা বিধান এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে দ্রুত যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। এবিষয়ে ত্রুটির ফলে সমূহ বিপদ হইতে পারে।

(৬) **দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, প্রবল বন্যা প্রভৃতি বিপদের ফলে ও দেশের অন্য যে-কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে উপযুক্ত সাহায্যের ব্যবস্থা**—উপরিলিখিত যে-কোন বিপজ্জনক অবস্থাতে প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থার জন্য দ্রুত যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। বিপদের সময় অনেক ক্ষেত্রে স্থলপথ ও রেলপথে কোন প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থাই করা যায় না। সুতরাং আকাশপথে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিও বিশেষ প্রয়োজন।

(৭) **বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে সহযোগিতা ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপন**—বর্তমানে পৃথিবীর কোন দেশ বা জাতির পক্ষেই স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে থাকা সম্ভবপর নহে। সকলের পক্ষেই অপরের সাহায্য গ্রহণ ও অপরকে সাহায্য দেওয়ার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি আবশ্যক।

বস্তুতঃ এসকল কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বহু আন্তর্জাতিক স্থলপথ ও রেলপথের প্রসার ও উন্নতি হইতেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সহিত ইউরোপের যোগাযোগের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক স্থলপথ তৈরী হইতেছে। তারপর ইউরেশিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে ট্রান্সসাইবেরিয়ান রেলপথ। ঐ অংশে আরও একটি রেলপথও তৈরী হইতেছে। তারপর আফ্রিকাতে আছে কেপ-টু-কায়রো পথ। উত্তর আমেরিকাতে আছে ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক, ন্যাশন্যাল প্যাসিফিক প্রভৃতি বিখ্যাত রেলপথ। তাহাছাড়া সুয়েজখাল পথ, উত্তর আটলান্টিক পথ প্রভৃতি সমুদ্রপথ এবং বিভিন্ন বিমান প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক পথসমূহ এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি—মানুষ সর্বপ্রথম পায়ে হাঁটিয়া এক স্থান হইতে অন্যত্র যাতায়াত করিত এবং নিজেরাই জিনিসপত্র বহন করিত। (ক) ক্রমশঃ এবিষয়ে উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে তাহারা তৈরী করিল বিভিন্ন **স্থলপথ**। আর গরু, ঘোড়া, অশ্বতর, উট, হাতী, প্রভৃতি প্রাণীর সাহায্যে সে সকল পথে মালপত্র বহন করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে তাহারা **চাকাযুক্ত গাড়ী** তৈরী করিয়া গরু, ঘোড়া, মহিষ প্রভৃতির সাহায্যে তাহা চালনা করিতে লাগিল। আজও এফ্রো-এশিয়ার বহু স্থানে এরূপ গাড়ীই যানবাহনের প্রধান সহায়। (খ) মানবসমাজের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে ক্রমে বাষ্পীয় শক্তি আবিষ্কৃত হইল। তাহার সাহায্যে স্থলপথে **মোটরগাড়ী, বাস, লরি** প্রভৃতি চলিতে সুরু করিল। ইহাদের তুলনায় অনেক বেশী লোকজন ও মালপত্র বহনের উদ্দেশ্যে তৈরী হইল **রেলগাড়ী**। প্রথমদিকে এসকল পথ বিভিন্ন দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমশঃ আশপাশের দেশের মধ্যে স্থলপথ ও রেলপথের যোগাযোগ স্থাপিত হইল। এবিষয়ে আরও উন্নতির ফলে বিভিন্ন **আন্তর্জাতিক** বা **মহাদেশীয়** পথের সাহায্যে বিভিন্ন দেশের মানুষ ও জিনিসের পক্ষে সহজ উপায়ে ও অল্প সময়ে অপরাপর দেশে পৌঁছিবার ব্যবস্থা হইল। (গ) ইহার বহু পূর্ব হইতেই বিভিন্ন খাল ও নদনদীর মধ্য দিয়া যাতায়াত ও পরিবহনের উদ্দেশ্যে **নৌকা** এবং সমুদ্রপথে কতক **পালের জাহাজ** ব্যবহৃত হইতেছিল। ক্রমশঃ জড়শক্তি (বাষ্পীয় শক্তি) ব্যবহারের ফলে তৈরী হইল **লঞ্চ, স্টীমার ও জাহাজ**। ইহাদের সাহায্যে অভ্যন্তরীণ নৌপথ (খাল, নদনদী) ও সমুদ্রপথে পরিবহনের কাজ অনেক সহজ হইল। সম্প্রতি আণবিক শক্তির সাহায্যে মেরু অঞ্চলে জাহাজ চালনা সম্ভবপর হইয়াছে। (ঘ) ইতিমধ্যে মাটি ও জলভাগ ছাড়াইয়া আকাশপথে অতিদ্রুত যাতায়াত ও পরিবহনের জন্য তৈরী হইয়াছে **বিমানপোত**।

যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার এরূপ ক্রমোন্নতির ফলে বিভিন্ন **স্থানের** ও **মানুষের**

মধ্যে দূরত্ব এত কমিয়া গিয়াছে যে মনে হয়, পৃথিবী যেন ছোট হইয়া গিয়াছে এবং কোন মানুষই আর দূরে নহে বা পর নহে। তারপর সম্প্রতি বিভিন্ন কৃত্রিম উপগ্রহের (বহু সংখ্যক স্পুটনিক, এপোলো, সোয়েজ, ভাইকিং প্রভৃতি) সৃষ্টি এবং নির্দিষ্ট পথে ও গতিতে তাহাদের আকাশ-পথে পরিভ্রমণ, চাঁদে গমন ও প্রত্যাবর্তন, চাঁদ ও মঙ্গল (গ্রহ) সম্বন্ধে সংবাদ ও তথাকার শিলা সংগ্রহ, বিভিন্ন সোয়েজ-এর পরস্পরের মধ্যে আকাশে সংযোগ প্রভৃতির ফলে পরিবহনের ক্রমবিকাশ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কল্পনাই এখন আর অবাস্তব নহে।

বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি এবং প্রসারের সুযোগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ অপর যে-কোন দেশে অনায়াসে (অবশ্য অপর দেশের অনুমতিক্রমে) যাতায়াত করিতে পারে। আর পৃথিবীর বহু দেশের নানাপ্রকার জিনিসই এখন পৃথিবীর অপর অনেক দেশে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতি** সম্পর্কে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্ব অতুলনীয়। ফলে, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনার পশুমাংস, ভারতের কলা, আম, আনারস প্রভৃতিও এখন ইউরোপের বাজারে টাটকা অবস্থায় কিনিতে পাওয়া যায়। অপরদিকে বাণিজ্যের এপ্রকার উন্নতির সুযোগে **বাণিজ্য-পথেরও** ক্রমশঃ **উন্নতি** হইতেছে।

যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার ধরন ও প্রসার—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্য, লোকবসতির ঘনত্ব, তাহাদের আর্থিক উন্নতি, বিভিন্ন সম্পদের চাহিদা ও ব্যবহার, ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ প্রভৃতি সম্পর্কে পার্থক্য বিস্তর। ফলে, **পরিবহন ব্যবস্থা বহু ধরনের** এবং তাহাদের **প্রসার** বা **উন্নতি** সম্বন্ধে **পার্থক্যও** খুব বেশী। যেমন, গহন অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলে আছে সঙ্কীর্ণ স্থলপথ। এমন কি, কতক স্থানে রজ্জুপথই (Rope way) প্রধান সহায়। তারপর এফ্রো-এশিয়ার বিভিন্ন অনুন্নত অংশে আছে প্রায় প্রাচীন যুগের যানবাহন ব্যবস্থা। যেমন, বিভিন্ন স্থলপথে চলে সারি সারি গরু, মহিষ ও ঘোড়ার গাড়ী। ইহাদের **গতি মন্থর** এবং মালপত্র **পরিবহনের** ক্ষমতা বা **পরিমাণ কম**। অপরদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত অংশে স্থলপথে চলে আধুনিক **দ্রুতগামী** মোটরগাড়ী, ট্রাম, বাস, ট্রাক, লরি। অধিকতর মালপত্র ও যাত্রী বহনের জন্য স্থলপথে চলে বিভিন্ন ধরনের রেলগাড়ি। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের কতক রেলগাড়ির গতিবেগ ঘণ্টায় ২০০-৩০০ কিমি.। কোথাও কোথাও ভূগর্ভেও রেলগাড়ি (Tube railways) চলে। বিভিন্ন জিনিসপত্র **পরিবহনের ব্যবস্থা** সম্পর্কে **বৈচিত্র্য** আরও বেশী। যেমন, দুধের গাড়ী, পেট্রোলের

গাড়ী অনেক বড় শহরেই দেখা যায়। রেলগাড়ীতেও আছে অনেক বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা। আর জাহাজের মধ্যেও কতক কাষ্ঠবাহী, কতক তৈলবাহী, কতক মাংসবাহী, কতক গমবাহী। এরূপ বহু রকমের জাহাজই এখন চলাচল করে। তারপর খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনেক ক্ষেত্রেই ভূগর্ভস্থ নলের (Pipe) মাধ্যমে পরিবহন করা হয়।

পরিবহনের এরূপ বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থার সহিত কতকগুলি বিষয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রথমতঃ, বিভিন্ন স্থানের নানাপ্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ (বনজ, খনিজ, কৃষিজ ও প্রাণিজ সম্পদ্) সংগ্রহ ও সেগুলিকে উপযুক্ত সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হাট, বাজার অথবা শিল্পকেন্দ্র প্রভৃতি উপযুক্ত স্থানে প্রেরণের জন্য প্রয়োজনমত পরিবহন ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। আজও এদেশে ধান, পাট প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে ধীরে ধীরে নৌপথে বা গরু, মহিষের গাড়ির সাহায্যে পাঠানো হয়। কিন্তু আখ, বাঁট প্রভৃতি ট্রাক ও লরি বা রেলপথে অতিদ্রুত শিল্পকেন্দ্রে পাঠানো বিশেষ প্রয়োজন। বস্তুতঃ শিল্পকেন্দ্রের উন্নতির সহিত পরিবহন ব্যবস্থার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি নগর ও বন্দরের এবং ইহাদের আশপাশের উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা এসকল স্থানের বিভিন্ন শিল্পের উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক। আজকাল অনেক জিনিসই দেশের বিভিন্ন অংশে, এমন কি বিদেশে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় ও ব্যবহৃত হয়। এবিষয়ে সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজন।

যাতায়াত ও পরিবহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবস্থার (তুলনামূলক) সুবিধা-অসুবিধা—যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার চারিটি ধরন প্রধান। ইহাদের তুলনামূলক সুবিধা-অসুবিধা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(ক) **স্থলপথ বা রাস্তা**—আদি মানুষ যাতায়াতের উদ্দেশ্যে প্রথমে স্থলপথ বা রাস্তা তৈরী করিয়াছিল। শহরে, নগরে, গ্রামে, হাটে, বাজারে, পাহাড়ে, পর্বতে, বনে কৃষিক্ষেত্রে, খনি অঞ্চলে, পশুপালনের মাঠে, অর্থাৎ যেখানে মানুষেরই প্রয়োজন তাহার **অধিকাংশ স্থানেই** দরকার মত **স্থলপথ** বা রাস্তা তৈরী করা যায়। সেজন্য যে-কোন **দেশের বিভিন্ন অংশের** মধ্যে, এমন কি **বিদেশের** সকল **প্রধান অংশের** সহিত **যোগাযোগের** উদ্দেশ্যে ইহাই **সর্বোত্তম ব্যবস্থা**। যে সকল জায়গাতে নৌপথে, রেলপথে, বা বিমানপথে যাওয়া যায় না, সেরূপ অনেক জায়গাতেই স্থলপথে যোগাযোগ সম্ভবপর। এজন্য স্থলপথ ব্যবহার করে সর্বাপেক্ষা অধিক লোক। রেলপথ তৈরার তুলনায় স্থলপথ তৈরী করা সহজ, খরচও কম। রেলপথ ও বিমান-পথে যাতায়াত ও পরিবহনের ব্যয়ের তুলনায় স্থলপথে যাতায়াত ও পরিবহনের খরচ সাধারণতঃ অনেক কম। (অবশ্য নদীনালা ও জলাভূমিময় অঞ্চলে অথবা মরুভূমি ও উচ্চ

পর্বতে স্থলপথ তৈরী করা ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য।) তাহাছাড়া স্থলপথে যাতায়াত সর্বাপেক্ষা অধিক নিরাপদ। দেশরক্ষা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিপদে স্থলপথে বিস্তর সাহায্য প্রেরণ করা যায়। তারপর প্রায় সকল রকম জিনিসই স্থলপথে কমবেশী পরিবহন করা যায়। বর্তমানে স্থলপথসমূহের ক্রমশঃ উন্নতির ফলে এবং আগেকার গরু, মহিষের গাড়ীর পরিবর্তে দ্রুতগতি মোটরগাড়ী, বাস, লরি প্রভৃতি চালনার সুযোগে রাস্তার গুরুত্ব অনেক বাড়িয়াছে। তার উপর রেল স্টেশন, বিমান স্টেশন, স্টীমার স্টেশন প্রভৃতির সহিত ইহাদের (প্রতিযোগিতার পরিবর্তে) যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে স্থলপথের গুরুত্ব ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে।

(খ) **রেলপথ**—প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে বাষ্প শক্তি আবিষ্কারের পর হইতে রেল-পথে যাতায়াতের সূত্রপাত। প্রথমে উত্তরপশ্চিম ইউরোপে ইহার আরম্ভ। ক্রমশঃ পৃথিবীর অন্যান্য অংশে রেলপথ বিস্তৃত হয়। বিমানপোত ভিন্ন অপর সকল প্রকার যানবাহন অপেক্ষা রেলগাড়ী অধিক দ্রুত যাতায়াত করে। ইউরোপে ও উত্তর আমেরিকায় অনেক রেলগাড়ী ঘণ্টায় ২০০-৩০০ কিমি বেগে চলে। প্রায় সকল প্রকার মালপত্রই রেলপথে কমবেশী বহন করা যায়। রেলগাড়ীর সাহায্যে অধিক পরিমাণে জিনিসপত্র দ্রুত সরবরাহের সুযোগ না থাকিলে বৃহৎ শিল্পের উন্নতি সম্ভবপর নয়। অবশ্য রেলপথ প্রথম তৈরীর জন্য খরচ বেশী। তবে রেলপথ দীর্ঘস্থায়ী এবং পরিণামে রেলপথে যাতায়াত ও পরিবহনের খরচ স্থলপথে যাতায়াত ও পরিবহনের খরচের তুলনায় কম। এসকল কারণে বর্তমানে পৃথিবীর প্রত্যেক উন্নত অংশে রেলপথসমূহ বিস্তৃত হইয়াছে এবং তাহাদের মাধ্যমে সর্বাপেক্ষা অধিক জিনিসপত্র পরিবহন করা হইতেছে। অধিক সংখ্যক লোকের একসঙ্গে যাতায়াতের পক্ষেও রেলগাড়ী সর্বোত্তম। রেলপথ তৈরীর জন্য দৃঢ় সমভূমি আবশ্যক। তবে নদীর উপর সেতু তৈরী এবং পাহাড়ের মধ্য দিয়া সুড়ঙ্গ (Tunnel) তৈরী করিয়াও বহু রেলপথ বিস্তৃত হইতেছে। দেশরক্ষা, দুর্ভিক্ষ নিবারণ প্রভৃতি কাজে রেলপথের গুরুত্ব অনেক বেশী। তবে বন্যার ফলে অনেক সময় রেলপথের বিস্তর ক্ষতি হয় এবং তাহা মেরামতের খরচও খুব বেশী। একটি রেলগাড়ী চালাইবার জন্য মাত্র ৩।৪ লোক প্রয়োজন, কিন্তু ইহাদের সামগ্রিক পরিচালনার জন্য প্রচুর লোকজন ও সরঞ্জাম আবশ্যক।

(গ) **জলপথ বা নৌপথ**—স্থলপথ বা রাস্তা ও রেলপথ তৈরী ও মেরামতের মত এখানে পথ (নৌপথ) তৈরী ও মেরামতের খরচ নাই। এসকল পথে যাতায়াতের জন্য সাধারণতঃ ট্যাক্সও দিতে হয় না। জলরাশির উপরিভাগ (Surface) সমতল বলিয়া এরূপ পথে যাতায়াতের জন্য কম শক্তি প্রয়োজন। মাত্র দুইজন লোক একখানা

যাত্রী ও মাল বোঝাই নৌকা চালনা করতে পারে। স্টীমার, জাহাজ প্রভৃতি পরিচালনার জন্যও রেলপথ ও বিমানপথের পরিচালনার তুলনায় লোকজন, কর্মচারী, অফিস প্রভৃতি কম আবশ্যক। ফলে নৌপথে মালপত্র পরিবহন ও মানুষের যাতায়াতের খরচ কম। বিশেষতঃ দাঁড়, বৈঠা, পাল প্রভৃতির খরচ নিতান্তই অল্প। নৌপথে জিনিস পরিবহনের সময় মাঝপথে নৌকা বা স্টীমার পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয় না। অথচ রেলপথে যাতায়াত ও পরিবহনের সময় অনেক ক্ষেত্রে তাহা করা হয়। তাহাছাড়া সাধারণতঃ নৌপথে পরিবহনের খরচ কম বলিয়া খুব ভারী জিনিস জলপথেই পরিবহন করা হয়। প্রবল ঝড় ও বন্যার সময় নৌপথে যাতায়াত ও পরিবহনের পক্ষে অসুবিধা ঘটে। অন্য সময় এই পথে দুর্ঘটনা কম হয়। তবে জলপথে বহনের জন্য সময় প্রয়োজন খুব বেশী এবং ফল, শাকসবজি, মাছ, মাংস প্রভৃতি সংরক্ষণের উপযুক্ত সুব্যবস্থা না থাকিলে এই সকল জিনিস নৌপথে পরিবহন করা যায় না। তারপর শীতল অঞ্চলে শীতকালে জল জমিয়া যাওয়ার ফলে সমুদ্র ও নদীতে এবং উষ্ণমণ্ডলে কতক নদীতে গ্রীষ্মকালে জল শুকাইয়া যাওয়ার ফলে নৌপথে যাতায়াত করা যায় না।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের জলপথ বা নৌপথসমূহ দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত :—(১) অভ্যন্তরীণ নৌপথ ও (২) সমুদ্রপথ। বিভিন্ন দেশের নানাস্থানে অনেক প্রশস্ত ও গভীর খাল আছে। এরূপ কতক খাল নদ-নদীসমূহের সহিত স্বাভাবিকভাবে যুক্ত। আবার বিভিন্ন নদীকে পরস্পরের সহিত যুক্ত করিবার জন্য কতক খাল কাটাও হইয়াছে। এরূপ স্বাভাবিক বা মানুষের কাটা খালের মধ্যে অনেকগুলি নৌকা, লঞ্চ, প্রভৃতির যাতায়াতের উপযোগী। তাহাছাড়া অনেক দেশের বিভিন্ন নদীর বহু অংশে নৌকা, লঞ্চ, স্টীমার প্রভৃতি যাতায়াত করে। এগুলিই বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথ। ইহারা দেশের শিল্প, বাণিজ্য এবং মানুষের যাতায়াত ও মালপত্র পরিবহনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

তাহাছাড়া মহাসাগরসমূহ এবং তাহাদের অংশস্বরূপ সাগর, উপসাগরগুলি আধুনিক কালে পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে যাতায়াত ও পরিবহনের পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক। পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশ সামুদ্রিক পথে যাতায়াত ও পরিবহনের সুযোগ সবচেয়ে বেশী পরিমাণে গ্রহণ করিতেছে। ফলে, ইহারা কেবলমাত্র ব্যবসা বাণিজ্যেই উন্নতি লাভ করে না, সাগরাদির উপর ইহাদের প্রাধান্যও বিস্তর।

বিমানপথ—এই পথে সর্বাপেক্ষা কম সময়ে যাতায়াত করা যায়। যেমন, মাত্র ২ ঘণ্টাতে কলিকাতা হইতে দিল্লীতে এবং ২০ ঘণ্টার কম সময়ে কলিকাতা হইতে

লণ্ডনে পৌছানো যায়। দেশের বিভিন্ন অংশে দ্রুত যাতায়াত ও জিনিস, চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রেরণ, শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা এবং দুর্ভিক্ষ বন্যা প্রভৃতি বিপদের সময় দ্রুত সাহায্য দান প্রভৃতি কাযে বিমানপথের উপযোগিতা সর্বাপেক্ষা অধিক। সাগর, মহাসাগর, মরুভূমি, পর্বত সকলের উপর দিয়াই বিমানপোত চলাচল করে। বস্তুতঃ পৃথিবীর অধিকাংশ বিমানই সামরিক কাজে ব্যবহৃত হয়। বিমানপথে যাতায়াত সম্পর্কে নানা সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এ সম্পর্কে কতক অসুবিধা উল্লেখযোগ্য যেমন, বিমানপোত তৈরী, মেরামত, পরিচালনা প্রভৃতি কাজে ব্যয় সর্বাপেক্ষা অধিক। তাহাছাড়া বিমানপথে ভারী জিনিসপত্র বহন করার পক্ষেও অসুবিধা অনেক। তাই জরুরী চিঠিপত্র ও দামী অথচ কম ভারী জিনিসই বিমানপথে অধিক পরিবহন করা হয়। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের সকল প্রধান নগর, বন্দর ও শিল্পকেন্দ্রই বিমানপথে পরস্পরের সহিত যুক্ত।

পরিবহন ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন ও সংহতি স্থাপন—বিভিন্ন ধরনের পরিবহন ব্যবস্থার সমন্বয়-সাধন ও সংহতি-স্থাপন দ্বারা উহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ত্রুটিবিচ্যুতি অনেক পরিমাণে দূর করা সম্ভব। সাধারণতঃ বিভিন্ন জাতীয় (রেলপথ, স্থলপথ, নৌপথ) পরিবহন ব্যবস্থার পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, পাশাপাশি বা প্রায় সমান্তরাল ভাবে বিস্তৃত রেলপথ ও স্থলপথে লোকজন ও মালপত্র সমান দূর পথ পরিবহনের হার সম্পর্কে পার্থক্য যথেষ্ট। ফলে, পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে সাধারণ মানুষের ও জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি হয়। এজন্য রেলপথ ও প্রধান স্থলপথকে সাধারণতঃ খুব পাশাপাশি বিস্তৃত হইতে দেওয়া উচিত নহে। তাহাছাড়া সমগ্র দেশ ও জাতির মঙ্গলের বিষয় চিন্তা করিয়া যানবাহন ব্যবস্থা ও পথঘাটের উন্নতি-বিধান করা আবশ্যক। প্রধান স্থলপথের ও রেলপথের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব দূর করিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এবং যথাসম্ভব অন্যান্য পথের সহিত ইহাদের যোগাযোগের ব্যবস্থা করা উচিত। ইহাতে প্রধান রাস্তা এবং সহযোগী অপ্রধান রাস্তা (Feeder road) সকলেরই গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়। বস্তুতঃ এই উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে প্রায় ৬০টি **জাতীয় সড়ক** (National highways) তৈরী করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে সংযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আবার বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বা প্রাদেশিক পথ এবং জেলাপথ প্রভৃতির মাধ্যমে সমগ্র দেশের প্রত্যেকটি অংশকে পরস্পরের সহিত যুক্ত করিবার এবং সর্বত্র যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য চেষ্টা হইতেছে।

কেবলমাত্র স্থলপথ ও রেলপথের মধ্যে যোগাযোগের বন্দোবস্ত করিলেই আদর্শ

ব্যবস্থা হয় না। দেশের সর্বাপেক্ষা অধিক স্থান যাহাতে বিভিন্ন স্থলপথের মাধ্যমে রেলপথ, বিমানপথ ও নৌপথের সহিত যুক্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপ যোগাযোগ ও বিভিন্ন পথের পরিচালনা সম্পর্কে সমন্বয় সাধনের ফলে বিষয়ের গুরুত্ব (urgency) অনুসারে জিনিসপত্র ও লোকজনের দ্রুত যাতায়াত ও পরিবহনের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর। উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে অনেক সময় বিভিন্ন জিনিস স্থলপথে, রেলপথে বা নৌপথে আসিয়া অপর কোন রেলস্টেশন বা স্টীমার স্টেশনে কিছুকাল পড়িয়া থাকে। ফলে, বহু জিনিস নষ্ট হয় বা হারাইয়া যায়।

আফ্রিকার কেপ-টু-কায়রো পথ পরিবহন-ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪,০০০ কি. মি., অর্থাৎ ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের দৈর্ঘ্যের প্রায় দ্বিগুণ। এই পথের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পৌছিতে ১৫ দিনের বেশী সময় প্রয়োজন। এই পথের উত্তর ও দক্ষিণ অংশে রেলপথে এবং মধ্যভাগে মোটর ও নৌপথে যাতায়াত করিতে হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও যানবাহন ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের ফলে দিল্লী, প্যারিস, মস্কো, শিকাগো প্রভৃতি নগর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র (Nerve-centre)। আর এজন্যই অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাকে বলা হয় 'ইউরোপের স্বাভাবিক রাজধানী (Natural capital of Europe)।

বাণিজ্যপথ ও বাণিজ্যকেন্দ্র

বাণিজ্যপথ ও অর্থ নৈতিক কার্যকলাপ—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের স্থলপথ, রেলপথ, নৌপথ প্রভৃতি মানবসমাজের বসতি ও যাতায়াতের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে বিভিন্ন দেশের নানাপ্রকার অর্থ নৈতিক কার্যকলাপের (যেমন, কৃষি, পশুপালন, বনজ ও খনিজ সম্পদ সংগ্রহ ও তাহাদের সরবরাহ, শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি) এবং কৃষ্টি বা সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থাদি প্রভৃতির সহিতও ইহাদের সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। যেমন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের জন্য প্রচুর যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কৃষিসার প্রভৃতির সরবরাহ প্রয়োজন। আবার উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের সদ্ব্যবহারের জন্যও ইহাদিগকে উপযুক্ত বিক্রয়কেন্দ্র, ভোগকেন্দ্র বা শিল্পকেন্দ্রে পরিবহন আবশ্যক। আর বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য সম্বন্ধে একদিকে শিল্পের উপাদান, কয়লা, আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র, কলকব্জা প্রভৃতি শিল্পের কেন্দ্রে সরবরাহ করা দরকার, অন্যদিকে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য শিল্পকেন্দ্র হইতে হাট, বাজার, শহর, বন্দর প্রভৃতিতে পরিবহনের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন।

এসকল বিষয়ের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং পরস্পরের উপর অত্যধিক

নির্ভরতার ফলে কখন কখন এরূপ প্রশ্ন ওঠে—বিভিন্ন প্রকার পরিবহন ব্যবস্থার ফলে শিল্পের উন্নতি হয়, না শিল্পদ্বারা পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হয়? অথবা বাণিজ্যপথের উন্নতি দ্বারা বাণিজ্যের উন্নতি হয়, না বাণিজ্যের উন্নতির ফলে বাণিজ্যপথের উন্নতি হয়?

দুই একটি উদাহরণ আলোচনা করিলে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে।

আমাদের দেশে উত্তর ভারতে বহু পূর্বেও পশুপালন এবং কৃষিকার্যদ্বারা নানাপ্রকার ফসল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। ক্রমশঃ এখানে স্থলপথ, নৌপথ ও রেলপথের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হইতেছে। কানাডার প্রেইরি অঞ্চলেও রেলপথ বিস্তারের ফলে গমের চাষ ও গমজাত দ্রব্য তৈরীর কেন্দ্রগুলির অসামান্য উন্নতি হইতেছে। এজন্য বলা হয় যে '**রেলপথেই ক্যানাডার উন্নতি**' ("Railways have been the making of Canada")। তারপর গঙ্গা, সিকিয়াং, সেন্ট লরেন্স, রাইন, এমন কি ক্ষুদ্র টেমস নদীর মধ্য দিয়া যাতায়াত ও পরিবহনের উন্নতির সহিত লক্ষ্য করা যায় আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইহাদের তুলনায় দীর্ঘতর ওব, ইয়েনিসি, লেনা, আমুর, কঙ্গো, আমাজন প্রভৃতি নদীর পরিবহনের ক্ষমতা নিতান্ত কম। ফলে, তাহাদের আশপাশের জায়গারও শিল্পবাণিজ্যে উন্নতি কম। এরূপ বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে লক্ষ্য করা যায়, **বাণিজ্যপথের উন্নতির সহিত** বিভিন্ন অঞ্চলের **অর্থনৈতিক উন্নতি** বা অগ্রগতির **সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ**।

আবার বিভিন্ন স্থানের অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে যে বাণিজ্যপথের প্রসার ও উন্নতি হয়, তাহারও উদাহরণ অসংখ্য। যেমন, এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বহুকাল যাবৎ **স্থলপথে** বাণিজ্য চলিয়া আসিতেছে। তারপর **আফ্রিকার দক্ষিণদিক্ ঘুরিয়া সমুদ্রপথ** (Cape route) আবিষ্কারের পর হইতে উভয় অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার এবং নানাবিষয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি হইতে লাগিল আরও বেশী। তারপর বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের সূত্রে এশিয়ার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশের অতুল সম্পদের সহিত ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম অংশের দেশগুলির ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ার পর হইতেই প্রধানতঃ ঐ সকল দেশের (বিশেষতঃ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের) অধিকতর উন্নতির সুবিধা বিধানের উদ্দেশ্যে কাটা হইল **সুয়েজ খাল**। ঠিক তেমনই ভাবে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম অংশের সহিত তাহাদের পূর্ব অংশের ও অন্যান্য মহাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধির ও যাতায়াতের সুবিধার জন্য কাটা হইয়াছে **পানামা খাল**। তারপর সোভিয়েট ইউনিয়নের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের অনুরূপ আর একটি বিরাট রেলপথ নির্মিত হইতেছে।

এসকল উদাহরণের সাহায্যে দেখা যায়, বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বা ফল-স্বরূপ বাণিজ্যপথের উন্নতি হয়। তবে সমগ্র বিষয়টি পরস্পরের সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে এ সকল পথে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহের অর্থনৈতিক উন্নতি হইতেছে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী। সুয়েজ খাল কাটার পর একদিকে ইউরোপ, অন্যদিকে পূর্ব আফ্রিকা, এশিয়া ও ওশিয়ানিয়ার বিভিন্ন অংশের শিল্প-বাণিজ্যের ও অন্যান্য অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতি হইতেছে খুব বেশী। পানামা খাল কাটার পর উত্তর আমেরিকার পশ্চিম অংশের উন্নতি হইতেছে প্রচুর। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যায়, যাতয়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উন্নতিবিধান করে, আবার অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার পথের উন্নতি হয়। স্বভাবতঃ পৃথিবীর যে সকল অংশ **অর্থনৈতিক** হিসাবে অধিক **উন্নত**, তথায় যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থাও স্বভাবতঃ অধিক **উন্নত**। অনুন্নত অংশে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা খুবই খারাপ।

পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান বাণিজ্যপথ—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের কয়েকটি প্রধান বাণিজ্যপথের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(১) স্থলপথ

প্রাচীনতম কালে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে **কেবলমাত্র স্থলপথেই** মানুষ যাতায়াত করিত। আজও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যাতায়াত ও পরিবহনের **প্রধান উপায়** স্থলপথ। এখন ইহাদের মোট দৈর্ঘ্য রেলপথের মোট দৈর্ঘ্যের ১২ গুণের অধিক। ইহাদের মধ্যে সিকি ভাগ বাঁধান, আর অর্ধেক অংশ বাঁধান না হইলেও বৎসরের অধিকাংশ সময় মোটরগাড়ি ও অন্যান্য **যানবাহনের** যাতায়াতের **উপযোগী**। কেবলএক অংশ স্থলপথে যানবাহনের সাহায্যে অধিক জিনিসপত্র পরিবহন সম্ভবপর নয়। অর্থাৎ সেগুলি ব্যাপক বাণিজ্যের উপযোগী নয়। তবে এই সকল পথ মানুষের যাতায়াতের পক্ষে উপযোগী।

প্রধান স্থলপথগুলি **যাতায়াত ও পরিবহনের** পক্ষে **সর্বোত্তম** (Highways)। কোন কোন দেশে প্রধান স্থলপথগুলিকে **জাতীয় সড়ক** (National Highways) বলা হয়। আমাদের ভারতের বিভিন্ন অংশে বর্তমানে প্রায় ৬০টি জাতীয় সড়ক আছে। প্রধান **সড়কের সাহায্যে** নিম্নলিখিত অঞ্চলে জিনিসপত্র **পরিবহনের** (Highway transportation) **ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা ব্যাপক**। যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডার দক্ষিণ অংশ, পশ্চিম ইউরোপ, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের পশ্চিম (ইউরোপীয়)

অংশ, জাপান এবং ভারত। এসকল স্থানে স্থলপথের বিস্তার সর্বাপেক্ষা অধিক। তারপর দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বদিকের অংশ, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণপূর্ব অংশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার স্থান।

যুক্তরাষ্ট্র—এদেশের **স্থলপথের দৈর্ঘ্য** পৃথিবীতে **সর্বপ্রথম** (৮০ লক্ষ কি. মি. ; অর্থাৎ এদেশের রেলপথের মোট দৈর্ঘ্যের ১৬ গুণ।) পৃথিবীর মোট স্থলপথের প্রায় ⅓ অংশ এদেশে। এখানে গড়ে প্রতি বর্গ কি মি স্থানে এক কি মি. স্থলপথ আছে। এসকল পথে ৯ কোটির অধিক মোটরগাড়ি, প্রায় ২ কোটি ট্রাক এবং ৮ লক্ষ বাস যাতায়াত করে। ইহাদের মোট সংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর **মোট মোটরগাড়ির** (ট্রাক, বাস সহ) **অর্ধেকের অধিক**। এত অধিক সংখ্যক গাড়ি (গড়ে প্রতি ২·৫ জনে একখানা) থাকার ফলে এদেশের সমুদয় লোকের পক্ষে একই সময়ে গাড়িতে যাতায়াত সম্ভবপর।

ক্যানাডা—এদেশের দক্ষিণ অংশেও স্থলপথ প্রায় যুক্তরাষ্ট্রের মত বিস্তৃত এবং এই অঞ্চলে দুই দেশের পথসমূহ পরস্পরের সহিত যুক্ত। এদেশের লোকসংখ্যা খুব কম এবং তাহাদের সংখ্যার তুলনায় মোটরগাড়ির সংখ্যা অধিক (গড়ে প্রতি তিনজনে একখানা)। কাজেই এদেশের দক্ষিণ অংশেও স্থলপথে যাতায়াত ও পরিবহন সম্বন্ধে প্রায় যুক্তরাষ্ট্রের মতই ব্যবস্থা। তবে এদেশের অন্যান্য অংশের অবস্থা এরূপ নহে।

পশ্চিম ইউরোপ—এখানকার প্রশস্ত স্থলপথের (Highways) দৈর্ঘ্য (সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র ব্যতীত) পৃথিবীর মোট ঐ জাতীয় পথের প্রায় ২০%। আর এখানকার মোটরগাড়ির সংখ্যা পৃথিবীর মোট মোটরগাড়ির প্রায় ২৫%। কাজেই এখানে স্থলপথে যাতায়াত ও পরিবহনের সুযোগ **পৃথিবীতে দ্বিতীয়** (যুক্তরাষ্ট্রের পরে)।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র—এদেশের স্থলপথসমূহ ইউরোপীয় অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। এখানকার প্রধান **নগর বন্দর ও শিল্প-কেন্দ্রসমূহের** আশপাশের প্রধান স্থলপথের অবস্থা প্রায় **যুক্তরাষ্ট্রের** মত। এদেশের উত্তরদিকের বিরাট সরলবর্গীয় বৃক্ষের **অরণ্য অঞ্চলে** এবং পূর্বদিকে সাইবেরিয়ার অন্যান্য অংশে স্থলপথ **খুব কম**। তাহাছাড়া এদেশে যাত্রীবাহী **মোটরগাড়ি** খুব **কম**। তাহাদের তুলনায় মালপত্র বহনের উপযোগী **ট্রাকের** সংখ্যা **অন্ততঃ ৫ গুণ**।

জাপান—এশিয়ার মধ্যে এদেশে স্থলপথের দৈর্ঘ্য সর্বাপেক্ষা অধিক (সমগ্র এশিয়ার ⅓ অংশের বেশী)। তাহাছাড়া এদেশের মোটর গাড়ির সংখ্যাও এশিয়াতে সর্বাপেক্ষা অধিক (সমগ্র মহাদেশের ⅔ অংশের অধিক)। এদেশে যাত্রীবাহী মোটর

গাড়ির তুলনায় ট্রাকের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। কাজেই মালপত্র পরিবহন সম্পর্কে ইহাদের গুরুত্ব অধিক।

ভারত -আমাদের দেশে স্থলপথের দৈর্ঘ্য এখন প্রায় ১৩ লক্ষ কিমি; সমগ্র এশিয়াতে একমাত্র জাপানের পরে। এদেশে প্রায় ৬০টি **জাতীয় সড়ক** (National highways) আছে। তাহাছাড়া **এশিয়ান হাইওয়ে** এদেশের উপর দিয়া উত্তর পশ্চিমে ইউরোপের দিকে এবং দক্ষিণ পূর্বে সিঙ্গাপুরের দিকে বিস্তৃত। এদেশের বিভিন্ন অংশে ২০ লক্ষের অধিক বাষ্পচালিত গাড়ি (স্কুটার সহ) যাতায়াত করে। এদেশের মোটরগাড়ির সংখ্যাও এশিয়াতে দ্বিতীয় (জাপানের পরে)।

পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান দেশে স্থলপথে যাতায়াত ও পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত মোটরগাড়ির সংখ্যা এখন (১৯৭১ ৭২) নিম্নরূপ।

দেশ	যাত্রীবাহী মোটরগাড়ি (লক্ষ)	বাস, ট্রাক (লক্ষ)	মোট (লক্ষ)
যুক্তরাষ্ট্র	৯২৮	২২২	১১৫০
পশ্চিম জার্মানী	১৫১	১২	১৬৩
যুক্তরাজ্য	১২১	১৬	১৩৭
জাপান	৬৮	৫৫	১২৩
ক্যানাডা	৬৮	১৯	৮৭
অস্ট্রেলিয়া	৪২	১০	৫২
পূর্ব জার্মানী	১৩	৩	১৬
নিউ জীল্যাণ্ড	১০	২	১২
ভারত	৬	৪	১০
মিশর	০.৭	০.২	০.৯

(২) রেলপথ

পৃথিবীর দুইটি অংশে রেলপথসমূহ অধিক উন্নত :—(১) অ্যাংগ্লো-আমেরিকা ও (২) ইউরোপ এই দুই অঞ্চলের মধ্যে **অ্যাংগ্লো-আমেরিকার** অন্তর্গত **যুক্তরাষ্ট্রে** সমগ্র পৃথিবীর প্রায় ২৯% রেলপথ বিস্তৃত. তন্মধ্যে অধিকাংশ (৮০%) এ দেশের উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব অংশে। এদেশের রেলপথের কেন্দ্র **শিকাগো**। এখান হইতে অধিকাংশ রেলপথ পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। পূর্বদিকের রেলপথসমূহ জালের মত বিস্তৃত আর তিনটি বৃহৎ রেলপথ দেশের উত্তর অংশ দিয়া পশ্চিমদিকে

সমুদ্রগামী জাহাজ দেশের মধ্যভাগ পর্যন্ত অনায়াসে যাতায়াত করে। ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক—উভয় প্রকার বাণিজ্য এই পথের সাহায্যে বিশেষভাবে উপকৃত।

তারপর যুক্তরাষ্ট্রের **মিসৌরি-মিসিসিপি** (মোট দৈর্ঘ্য ৬,৪০০ কিমি) সে দেশের সর্বপ্রধান পণ্যবাহী নদী। মিসিসিপির প্রায় সমুদয় অংশ এবং মিসৌরির অধিকাংশ যাতায়াত ও পরিবহনের পক্ষে উপযোগী।

দক্ষিণ আমেরিকা

এই মহাদেশের **আমাজন** নদী ও ইহার বিভিন্ন উপনদীর মধ্য দিয়া ৪০০০ কি মি স্টীমার চলে, কিন্তু এখানকার দেশগুলি শিল্প ও অর্থনৈতিক বিষয়ে এখনও কম উন্নত বলিয়া এখানকার বাণিজ্যের পরিমাণ কম। আমাজনের উত্তরে **ওরিনকো** নদীর মাত্র ১৬০০ কি মি নাব্য। ইহাদের তুলনায় **লাপ্লাটা** নদীর গুরুত্ব বেশী। ইহার মধ্য দিয়া প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনা দেশের গম, মাংস, পশম প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানি হয়।

ইউরোপ

ইউরোপের মত এত কম আয়তনে এত বেশী নদী আর কোন মহাদেশে নাই। এখানকার কয়েকটি নদনদী কেবলমাত্র সুবৃহৎ সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের অন্তর্গত, আর কয়েকটি কেবলমাত্র (দ্বৈপ দেশ) যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত। বাকী প্রত্যেক নদী ও খালদ্বারা এখানকার একাধিক দেশের উপকার হইতেছে।

যুক্তরাজ্য—এদেশের **টেমস্, হাম্বার, সেভার্ন, মার্সে, ক্লাইড** প্রভৃতি নদীর দৈর্ঘ্য কম, কিন্তু প্রত্যেকটির মোহনা চওড়া ও গভীর বলিয়া ইহাদের মধ্য দিয়া বড় বড় জাহাজ দেশের মধ্য ভাগে বেশ কিছুদূর যাতায়াত করে। তাহাছাড়া ট্রেণ্ট ও মার্সে খাল, লীডস্ ও লিভারপুল খাল, এভন খাল, ক্যালিডোনিয়ান খাল, **ম্যাঞ্চেস্টার খাল** প্রভৃতির সাহায্যেও এদেশে মালপত্র পরিবহনের পক্ষে বিশেষ সুবিধা আছে।

ইউরোপের অন্যান্য নদী—ডেনিয়ুব দৈর্ঘ্যে এই মহাদেশের দ্বিতীয় নদী (ভল্গার পরে), কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে ইহাই **ইউরোপের সর্বপ্রধান** নদী। এই মহাদেশের **রাইন** নদীর মধ্য দিয়া পৃথিবীর মধ্যে **সবচেয়ে বেশী স্টীমার,** লঞ্চ প্রভৃতি জলযান যাতায়াত করে। তাহাছাড়া ফ্রান্সের **সীন, রোন,** পশ্চিম জার্মানীর **ওয়েজার, এলব,** পূর্ব জার্মানীর **ওডার,** ইটালির **পো** প্রভৃতি

বহু নদী যাতায়াত ও পরিবহনের পক্ষে বিশেষ উপকারী। পশ্চিম জার্মানীর মিটেল্‌ল্যাণ্ড বা মিড্‌ল্যাণ্ড খাল, ডর্টমুণ্ড-এমস্ খাল, **কিয়েল খাল**, ফ্রান্সের **বার্গাণ্ডি খাল**, মার্সাই-রোন খাল, মিডি খাল, সেণ্ট্রাল ক্যানেল প্রভৃতিও যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এশিয়া

এশিয়ার কয়েকটি নদী সোভিয়েট দেশের, কয়েকটি চীনের, কয়েকটি ভারতের ও কয়েকটি জাপানের অন্তর্গত। আর কয়েকটি একাধিক দেশের অন্তর্গত।

চীন—এদেশের **ইয়াংসি কিয়াং** এশিয়ার দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। ইহা যাতায়াত ও পরিবহনের পক্ষে উপকারী। ইহার উত্তরদিকের **হোয়াংহো** নদীতে অনেক বাঁধ দিয়া ইহার বন্যার প্রকোপ কমান হইয়াছে। এই দুই নদীর বদ্বীপকে যোগ করিয়াছে **গ্র্যাণ্ড ক্যানেল**। দক্ষিণের **সিকিয়াং** নদী দৈর্ঘ্যে ছোট, কিন্তু যাতায়াত ও পরিবহনের পক্ষে যথেষ্ট উপকারী।

এশিয়ার অন্যান্য নদী—ভারতের **গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র**, পাকিস্তানের সিন্ধু, বাংলাদেশের পদ্মা (গঙ্গা), ব্রহ্মদেশের ইরাবতী, সালুয়েন, থাইল্যাণ্ডের মেকং, মেনাম, ইরাকের সাত্-এল-আরব প্রভৃতি নদী নানা বিষয়ে উপকারী। জাপানের নদীগুলি খুবই ছোট।

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র—ভল্গা এদেশের কেবলমাত্র ইউরোপীয় অংশের উপর দিয়া প্রবাহিত এবং ইহাই সমগ্র ইউরোপের দীর্ঘতম নদী। ইহা এবং ডন, নীপার, নীস্টার, ডুগ্না প্রভৃতি নদী ও **মস্কো খাল**, বাল্টিক শ্বেত সাগর খাল প্রভৃতি দ্বারা এদেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যাতায়াত ও বাণিজ্যের সুবিধা আছে, কিন্তু সোজাসুজি বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগ নাই।

ওব, ইয়েনিসি ও লেনা নদী এদেশের কেবলমাত্র এশিয়ার অন্তর্গত অংশের উপর দিয়া প্রবাহিত। এগুলি জনবিরল ও তীব্র শীতল অঞ্চলের উপর দিয়া উত্তরদিকে এবং আমুর নদী উত্তরপূর্বদিকে বহিয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে **ওব** ও ইহার উপনদী **ইর্টিশ সহ** (ওব ইর্টিশ) **এশিয়ার দীর্ঘতম** নদী। কিন্তু ইহাদের জল মাসের পর মাস জমিয়া থাকে। তাই যাতায়াত ও পরিবহন সম্বন্ধে ইহাদের গুরুত্ব কম।

ভারত—এদেশের বিভিন্ন **নদী ও খালের** মধ্য দিয়া ৪০,০০০ কি মি জলপথে যাতায়াত করা যায়।

(১) **নদীপথ**—প্রধানতঃ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট বোর্ডের পরিচালনায়

কলিকাতা হইতে ভাগীরথী-হুগলি নদী ও সুন্দরবনের বিভিন্ন নদী ও খালের মধ্যদিয়া গিয়া কিছুদূর বাংলাদেশের যমুনার (**ব্রহ্মপুত্রের**) মধ্য দিয়া নৌপথে যাতায়াত করিতে হয়। পরে আসামের অন্তর্গত অংশের মধ্যদিয়া ডিব্রুগড় পর্যন্ত যাতায়াত করা যায়। তাহাছাড়া কলিকাতা হইতে **গঙ্গার** মধ্যদিয়া কানপুর পর্যন্ত নৌপথে যাতায়াত করা যায়। উভয়ক্ষেত্রে প্রায় ১,২৮০ কি মি নদীপথে প্রচুর জিনিসপত্র আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ফরাক্কা প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির ফলে ভাগীরথী নদীর মধ্য দিয়া অধিক জল প্রবাহিত করিতে পারিলে এবিষয়ে অধিক উন্নতি হইবে। এদেশের ছোটবড় অন্যান্য বহু নদীর মধ্যদিয়াও নানাস্থানে স্টীমার ও নৌকা যাতায়াত করে। তবে অনেক নদীতে বড় বড় বাঁধ দেওয়ার ফলে একটানা বহুদূর যাতায়াতের পক্ষে অসুবিধা ঘটিতেছে।

(২) **খালপথ**—এদেশের কতক বড় বড় **খালের** সাহায্যে জলসেচ এবং নৌকা চলাচলের বিশেষ সুবিধা আছে। তন্মধ্যে পঞ্জাবের পশ্চিম যমুনা ও সিরহিন্দ খাল, উত্তর প্রদেশের গ্যাঞ্জেস্ ক্যানেল, বিহারের শোন নদের খাল, তামিলনাড়ুর বাকিংহাম ক্যানেল, অন্ধ্র প্রদেশের কৃষ্ণা ও গোদাবরী খাল, উড়িষ্যার কোস্ট ক্যানেল এবং পশ্চিম-বঙ্গের হিজলি খাল, ইস্টার্ন ক্যানেল, **দুর্গাপুর-ত্রিবেণী** খাল প্রভৃতি প্রধান। বর্ষাকালে বহু জলাভূমির উপর দিয়াও নৌকা, ভেলা প্রভৃতি যাতায়াত করে। তাহাছাড়া বহু নদী ও উপনদীকে বিভিন্ন খালের সাহায্যে পরস্পরের সহিত যুক্ত করিয়া, বিশেষতঃ কলিকাতা-মাদ্রাজ-কোচিন-ম্যাঙ্গালোর খাল কাটিয়া যাতায়াত ও ব্যবসায় বাণিজ্যের আরও উন্নতি করা হইবে।

আফ্রিকা

এই মহাদেশের সর্বপ্রধান নদী **নীল**। ইহার এবং **কঙ্গোর**—উভয়ের প্রায় ১,৬০০ কি মি নাব্য। তবে ইহাদের মধ্য দিয়া বড় স্টীমার যাতায়াত করিতে পারে না। পশ্চিম আফ্রিকার **নাইজার** ও পূর্ব আফ্রিকার জাম্বেসী নদীর মধ্য দিয়াও কিছুদূর স্টীমার চলে।

অস্ট্রেলিয়া

মারে-ডার্লিং এখানকার একমাত্র বড় নদী। ইহার মধ্য দিয়া কিছুদূর স্টীমার চলাচল করে। এখানকার অন্যান্য নদী ক্ষুদ্র এবং যাতায়াতের পক্ষে অনুপযোগী।

(৪) সমুদ্রপথ

পূর্বকালে বিভিন্ন সাগর ও মহাসাগরকে মহাদেশসমূহের মধ্যে যোগাযোগের পক্ষে প্রবল বাধা বলিয়া মনে করা হইত। আর এখন নৌপথে যাতায়াতের

সুব্যবস্থার ফলে ইহারা দেশ-বিদেশের মধ্যে যাতায়াত ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পক্ষে সবচেয়ে বেশী সহায়ক। এখন (১৯৭৫) **জাপানের** সমুদ্রগামী জাহাজ সবচেয়ে বেশী। তারপর **যুক্তরাষ্ট্র**, যুক্তরাজ্য, নরওয়ে, ইটালি, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশের স্থান। (যুক্তরাজ্য এখন আর 'সমুদ্রের রাণী' নহে।)

নানাপ্রকার জাহাজ—সাগর মহাসাগরসমূহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের উপর দিয়া নানাপ্রকার জাহাজ চলাচল করে। তন্মধ্যে কতকগুলি কেবল উপকূলের ধারে ধারে চলে এবং **উপকূল বাণিজ্যের** (Coastal trade) পক্ষে সহায়তা করে। কতকগুলি **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের** (International trade) উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

সমুদ্রগামী জাহাজ **তিন** শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—(১) **লাইনার (Liner) জাহাজ**—এগুলি সবচেয়ে বড় ও দ্রুতগামী জাহাজ এবং নির্দিষ্ট সময়-তালিকা অনুসারে যাত্রী ও মালপত্র লইয়া নির্দিষ্ট পথে যাতায়াত করে। (২) **ট্র্যাম্প (Tramp) জাহাজ**—এগুলি লাইনারের চেয়ে কিছু ছোট এবং ইহাদের গতিবেগও কম। এগুলি সাধারণতঃ খাদ্য-দ্রব্য, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ, চর্ম, কাঠ প্রভৃতি কম দামের অথচ ভারী জিনিস বহন করে। এগুলি প্রয়োজনমত কয়েকটি স্টেশনে মাত্র যাতায়াত করে। (৩) **বাণিজ্য জাহাজ** (Merchant vessel)—এগুলি বিশেষ ধরনের ট্র্যাম্প জাহাজ। ইহাদের মধ্যে কোনটি তৈলবাহী (Oil tanker), কোনটি কাষ্ঠবাহী (Timber ship), কোনটি মাংসবাহী, কোনটি গমবাহী, কোনটি ফলবাহী।

প্রধান সমুদ্রপথ—প্রধান সমুদ্রপথ **নির্বাচনের** সময় একদিকে সাগর, মহাসাগরের অবস্থা, বিশেষতঃ উষ্ণ সমুদ্র স্রোতের গতি, পশ্চিমা বায়ু প্রবাহের অঞ্চল প্রভৃতি সুবিধাজনক অবস্থা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা হয়। অপরদিকে দুই পাশের দেশসমূহের লোকসংখ্যা, তাহাদের আর্থিক অবস্থা, প্রধান কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ, শিল্পদ্রব্য প্রভৃতি আমদানি-রপ্তানির সুযোগ, বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সুবিধা, কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি জ্বালানি (Fuel) সংগ্রহের সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। নিম্নলিখিত সমুদ্রপথে অধিক জাহাজ চলাচল করে।

(১) **উত্তর আট্‌লান্টিক পথ**—আট্‌লান্টিক মহাসাগরের উত্তর অংশের পূর্ব-দিকে ইউরোপ, আর পশ্চিমে উত্তর আমেরিকা। এই দুই মহাদেশ কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে উন্নত। ইহাদের লোকসংখ্যাও অধিক। তাই উত্তর আট্‌লান্টিক পথে যাতায়াতকারী জাহাজ প্রধানতঃ **ইউরোপের পশ্চিম উপকূলের** লণ্ডন, লিভারপুল, গ্ল্যাসগো, হামবুর্গ, এন্টোয়ার্প প্রভৃতি বৃহৎ বন্দরে এবং **উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের** নিউ ইয়র্ক, মন্ট্রিল, বাল্টিমোর, নিউ অর্লিন্স,

সোজাসুজি পূর্বদিকে অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জীল্যাণ্ডের দিকে। অনুরূপ পথে ওশিয়ানিয়ার গম, পশম, চর্ম, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার রবার, চা, টিন, আফ্রিকার হীরক, স্বর্ণ প্রভৃতি ইউরোপে যায়, আর সেখান হইতে এসকল দেশে ও মহাদেশে আসে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য।

(৪) **প্রশান্ত মহাসাগর পথ**—প্রশান্ত মহাসাগর পৃথিবীতে বৃহত্তম। ইহার উত্তর অংশের এক (পূর্ব) দিকে উত্তর আমেরিকা, অন্য (পশ্চিম) দিকে এশিয়া। আর দক্ষিণ অংশের এক (পূর্ব) দিকে দক্ষিণ আমেরিকা, অন্য (পশ্চিম) দিকে ওশিয়ানিয়া। বাষ্পীয় জলযান আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এত দূরে অবস্থিত মহাদেশগুলির মধ্যেও যোগাযোগ এবং বাণিজ্যের উন্নতি আরম্ভ হয়। তারপর **পানামা খাল** কাটিবার পর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পথের **গুরুত্ব** আরও বাড়িয়াছে। উত্তর আমেরিকার পশ্চিমদিকের **ভ্যাঙ্কুবার, সীয়াটল, সান্ ফ্রান্সিস্কো, লস্ এঞ্জেলস** প্রভৃতি বন্দর হইতে গম, কার্পাস, কাগজ, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, শিল্পদ্রব্য, খনিজ তৈল প্রভৃতি লইয়া জাহাজসমূহ সোজাসুজি পশ্চিমদিকে চলিয়া যায়। ঐ মহাসাগরের মধ্যভাগে তাহারা হাওয়াই দ্বীপের **হনলুলু** বন্দরে বিশ্রাম নেয়। তারপরে পূর্ব এশিয়ার **হংকং, সাংহাই, ইওকোহামা**, অস্ট্রেলিয়ার **সিড্‌নি** ও নিউ জীল্যাণ্ডের **অক্‌ল্যাণ্ড** প্রভৃতি বন্দরে আসে। এসকল জাহাজ ফিরিবার সময় ওশিয়ানিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ হইতে রেশম, চা, পশম প্রভৃতি নানা জিনিস লইয়া বিপরীতদিকে উত্তর আমেরিকাতে যায়।

(৫) **উত্তর মেরু পথ**—কয়েক বৎসর পূর্বে আণবিক শক্তির (Atomic energy) সাহায্যে সোভিয়েট দেশের জাহাজ 'লেনিন'-এর উত্তর মেরুর পথে ভ্রমণ করিবার ফলে ইহা জানা গিয়াছে যে ঐরূপ একখানা জাহাজের ঠিক পিছনে ২১ খানা জাহাজ অন্য প্রকার (কয়লা, খনিজ তৈল) শক্তির সাহায্যে চলিতে পারে। কিন্তু বেশী জাহাজ এভাবে যাইতে পারে না। কারণ, ওখানকার তীব্র শীতে জল শীঘ্রই আবার জমিয়া যায়। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মোটর-চালিত সোভিয়েট জাহাজ 'নভো-ভরোনেজ'-এর হাম্বুর্গ হইতে উত্তর মেরু পথে জাপানের দিকে যাত্রাদানের ফলে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে যাতায়াতের পথের দূরত্ব সুয়েজ খাল ও পানামা খাল পথের তুলনায় প্রায় ৮,০০০ কিমি কম এবং যাতায়াতের সময়ও প্রায় অন্ততঃ দুই সপ্তাহ কম। ভবিষ্যতে বড় বাণিজ্য জাহাজগুলির পক্ষে এই পথে নিয়মিতভাবে যাতায়াত সম্ভবপর হইলে পানামা খালপথ ও সুয়েজ খালপথের গুরুত্ব হ্রাস পাইবে।

(ঘ) সমুদ্রপথের সহিত যুক্ত প্রধান খালপথ

পৃথিবীর দুই অংশে দুইটি প্রধান খাল কাটিবার পর হইতে বিভিন্ন সমুদ্রপথের গুরুত্ব অনেক বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাদের বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

১। **সুয়েজ খালপথ বা ভূমধ্যসাগর-সুয়েজ খাল-এশিয়া-অস্ট্রেলিয়া জলপথ**—মিশর দেশের মূল ভূভাগ ও সিনাই উপদ্বীপের মাঝখানের সুয়েজ যোজকের মধ্য দিয়া সুয়েজ খাল কাটিয়া ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরকে পরস্পরের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। তাই ইহা একটি সামুদ্রিক খাল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এই পথে জাহাজ যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছে এবং তখন হইতে এই পথের গুরুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবলমাত্র উত্তর আটলাণ্টিক পথের চেয়ে কম জাহাজ, কম লোক ও মালপত্র এপথে যাতায়াত করিত। সে হিসাবে ইহা পৃথিবীর **দ্বিতীয় জলপথ** এবং একটি **ট্রাঙ্ক পথ** (Trunk Route)। এই খালটি প্রায় ১৬৫ কি মি দীর্ঘ। ইহার গভীরতা কম পক্ষে ১১ মি। ইহার তলদেশের বিস্তার কোথাও ৬০ মির কম নহে। এই খালপথে খুব বড় জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে না। এই খালটি অপেক্ষাকৃত বড় গ্রেট বিটার হ্রদ, আর তাহার উত্তরের ক্ষুদ্র টিমসা হ্রদ ও দক্ষিণের লিটল বিটার হ্রদের মধ্য দিয়া গিয়াছে। তবে পানামা অঞ্চলের মত এখানকার ভূপ্রকৃতি উঁচুনীচু নহে। তাই এখানে লক গেট নাই। তাহা হইলেও এই খালের দৈর্ঘ্য পানামা খালের দৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশী এবং এই খালের মধ্য দিয়া জাহাজ খুব ধীরে চলে। ফলে, এই খাল পার হওয়ার জন্য ১২-১৫ ঘণ্টা সময় লাগে। তবু ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ২১ হাজারের অধিক জাহাজ (যুদ্ধ জাহাজ সহ) এই পথে যাতায়াত করিয়াছে। এই খালের উত্তরে **সৈয়দ** বন্দর ও দক্ষিণে **সুয়েজ** বন্দর অবস্থিত। এই খাল মিশরের কর্তৃত্বাধীন। তাই এই পথে যাতায়াতের জন্য মিশর ভিন্ন অন্য সকল দেশকে উচ্চহারে শুল্ক দিতে হয়। ১৯৬৭ খ্রীঃ ইস্রায়েল দেশের সাহিত মিশরের যুদ্ধের সময় হইতে এই পথ বন্ধ ছিল। সম্প্রতি এই পথে আবার যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছে।

এই পথের এক প্রান্তে **ইউরোপ ও আফ্রিকা**, অন্য প্রান্তে **এশিয়া ও ওশিয়ানিয়া**। ইহাদের অন্তর্গত কতকগুলি দেশে লোকবসতি খুব বেশী এবং ইহারা নানাবিষয়ে উন্নত। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বও খুব বেশী। তাই সুয়েজ খাল কাটার ফলে এই পথের সহিত সংশ্লিষ্ট দেশগুলির বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইতেছে। এমন কি, **উত্তর আমেরিকার** বাণিজ্যও বৃদ্ধি হইতেছে। এই পথে বোম্বাই ও লণ্ডনের মধ্যে দূরত্ব অন্তরীপ পথের (Cape route) মাধ্যমে দূরত্বের তুলনায় প্রায় ৮০০ কি মি কম।

লোহিত সাগরের দক্ষিণ প্রান্তে **এডেন** বন্দর হইতে এই পথ পূর্বদিকে বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এক শাখা দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্বদিক দিয়া দক্ষিণে ডারবানের দিকে, দ্বিতীয় শাখা পূর্বদিকে **করাচি** ও **বোম্বাইয়ের** দিকে এবং তৃতীয় শাখা দক্ষিণ-পূর্বে **কলম্বোর** দিকে গিয়াছে। আবার কলম্বো হইতে একশাখা উপকূল বরাবর **কলিকাতা, চট্টগ্রাম** ও **রেঙ্গুন** হইয়া **সিঙ্গাপুরের** দিকে যায়, আর এক শাখা সোজাসুজি পূর্বদিকে অস্ট্রেলিয়ার **পার্থ** ও **সিড্‌নি** হইয়া নিউ জীল্যাণ্ডের দিকে যায়। এসকল বন্দরের মারফত অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জীল্যাণ্ডের পশম, মাংস, চর্ম, মালয়েশিয়ার রবার, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কাঠ, খনিজ তৈল, ভারত ও বাংলাদেশের পাট, পাটের তৈরী জিনিস, চা, তৈলবীজ, ভারত ও পাকিস্তানের কার্পাস, মধ্যপ্রাচ্যের খনিজ তৈল, পূর্ব আফ্রিকার কার্পাস প্রভৃতি ইউরোপে আমদানি হয়। এই পথে ইউরোপ হইতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয় নানাপ্রকার কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিল্প দ্রব্য।

(২) **পানামা খাল পথ**—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মাঝখানে পানামা যোজক এই দুই মহাদেশকে যুক্ত করিত। ফলে, উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল হইতে জাহাজে এই মহাদেশের এবং দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে যাইতে হইলে দক্ষিণ আমেরিকার দাক্ষণদিকের হর্ন অন্তরীপ ঘুরিয়া যাইতে হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে পানামা প্রদেশের পূর্বদিকে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে **কোলন** বন্দর হইতে পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে **পানামা** বন্দর পর্যন্ত পানামা খাল কাটা হইয়াছে। তখন হইতে এই দুই মহাসাগর পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়াছে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই পথে জাহাজের যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছে।

এই খালটি প্রায় ৮০ কি মি দীর্ঘ এবং বিভিন্ন অংশে ইহার গভীরতা কম পক্ষে ১৩ মি। ইহার তলদেশ ১০০-৩৩০ মি পর্যন্ত বিস্তৃত। কাজেই এই পথে যথেষ্ট বড় জাহাজ যাতায়াত করে এবং ইহা একটি **সামুদ্রিক খাল** (Ship canal)। এই খালের দুই পাশের ভূপ্রকৃতি বন্ধুর। এই খালের কতক অংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮ মি উঁচু গাটুন হ্রদের মধ্য দিয়া এবং কতক অংশ ১৮ মি উঁচু মিরাফ্লোরস হ্রদের মধ্য দিয়া বিস্তৃত। কাজেই এই পথে স্বাভাবিক ভাবে জাহাজ চলিতে পারে না। এখানে ১২টি লক গেটের সাহায্যে জল প্রয়োজনমত উঁচু-নীচু করিয়া প্রায় ৬-৮ ঘণ্টা সময়ে এক একটি জাহাজকে একদিক হইতে অন্যদিকে টানিয়া পার করা হয়। এই খাল যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন এবং এই পথে এদেশের জাহাজই চলে সবচেয়ে বেশী। অপর সকলকে শুল্ক দিয়া এই পথে জাহাজ চালাইতে হয়। এই

খাল কাটার ফলে নিউ ইয়র্ক ও সান্ ফ্রান্সিস্কোর মধ্যে দূরত্ব কমিয়াছে ১২,৬৪০ কি মি। এরূপ সুবিধার ফলে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রত্যেকের **পূর্ব** ও **পশ্চিম উপকূলের** মধ্যে, এমন কি সুদূর অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সহিত উত্তর আমেরিকার পূর্ব অংশ ও ইউরোপের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই পথে প্রায় ৭০০০ জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে এবং প্রায় সমান সংখ্যক জাহাজ বিপরীত দিকে যাতায়াত করিয়াছে।

পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান দেশের সমুদ্রপথে বাৎসরিক মালপত্র পরিবহনের হিসাব (১৯৭১) নিম্নে দেওয়া গেল—

দেশ	আমদানি (কোটিটন)	রপ্তানি (কোটিটন)	মোট পরিবহন (কোটিটন)	দেশ	আমদানি (কোটিটন)	রপ্তানি (কোটিটন)	মোট পরিবহন (কোটিটন)
যুক্তরাষ্ট্র			৪৭.৫	পশ্চিম			
ফ্রান্স	১৯	৪	২৩	জার্মানী	১০.৫	২.৪	১২.৯
যুক্তরাজ্য	১৪	৭	২১	অস্ট্রেলিয়া	৫	২.১	৭.১
সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র			১৭	ভারত	২.৫	৩	৫.৫

(৬) প্রধান আন্তর্জাতিক বিমানপথ

স্থলপথ, রেলপথ ও জলপথের মত বিমানপথও দুই ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি নিজ নিজ দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা অভ্যন্তরীণ বিমানপথ। আর কতক বিমানপথ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উপর দিয়া বিস্তৃত। এগুলি আন্তর্জাতিক বিমানপথ। নিম্নলিখিত কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিমানপথ বিখ্যাত।

পৃথিবীতে **যুক্তরাষ্ট্রের** বিমানপোত সবচেয়ে বেশী এবং এগুলি যাতায়াত করে সবচেয়ে বেশী জায়গাতে। এদেশের প্যান্ আমেরিকান ওয়ার্লড এয়ারওয়েজ (PANAM), ট্রান্স-ওয়ার্লড এয়ারলাইন্স্ (T. W. A.), ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স্ (U. A.), আমেরিকান এয়ারলাইন্স্ (A. A.) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিখ্যাত। তারপর **যুক্তরাজ্যের** স্থান। এদেশের ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন (B. O. A. C.), ব্রিটিশ ইউরোপীয়ান এয়ারলাইন্স্ (B. E. A.), কান্টাস এম্পায়ার ওয়ারওয়েজ (QANTAS) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিখ্যাত। তাহাছাড়া সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের এয়ারোফ্লোট, ফ্রান্সের এয়ার ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ডসের রয়াল ডাচ্

এয়ারলাইন্‌স্ (K. L. M.), ইটালির এলিটালিয়া, পশ্চিম জার্মানীর লুফট্‌হান্‌সা প্রভৃতি বিখ্যাত। **ভারতের** এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানপোত (A. I.) প্রায় ৩০টি দেশে যাতায়াত করে। পাকিস্তান ইণ্টারন্যাশন্যাল এয়ারওয়েজ (P. I. A.), ওরিয়েণ্ট এয়ারওয়েজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বিমানপোতও বিদেশে যাতায়াত করে।

এসকল **বিমানপোত প্রতিষ্ঠান** বিভিন্ন মহাদেশের কয়েকটি নির্দিষ্ট পথে যাতায়াত করে। যেমন—

আমেরিকা-ইউরোপ-এশিয়া বিমানপথ—এই পথের প্রধান বিমান স্টেশনগুলি এরূপ :—নিউ ইয়র্ক — লণ্ডন — প্যারিস — রোম — বেইরুট — করাচি — কলিকাতা — রেঙ্গুন — ব্যাঙ্কক — হংকং — ম্যানিলা – টোকিও — হনলুলু। অন্য পথ — নিউ ইয়র্ক — স্যান্ ফ্রান্সিকো — হনলুলু — ম্যানিলা — হংকং — ক্যান্টন প্রভৃতি।

ইউরোপ-এশিয়া-অস্ট্রেলিয়া বিমানপথ—ইহার প্রধান স্টেশন—লণ্ডন—মার্সাই—এথেন্স—কায়রো — বাগ্‌দাদ — করাচি — দিল্লী — কলিকাতা — রেঙ্গুন ব্যাঙ্কক—সিঙ্গাপুর—জাকার্তা—ডারউইন—সিড্‌নি।

ইউরোপ-আফ্রিকা বিমানপথ—এই পথের প্রধান স্টেশন—লণ্ডন—আলেকজান্দ্রিয়া—খার্টুম ; একশাখা খার্টুম কেপ টাউন, অপর শাখা খার্টুম-ল্যাগস।

ইউরোপ-আমেরিকা বিমানপথ—এই পথের প্রধান স্টেশন—লণ্ডন—নিউ ইয়র্ক—কিউবা—ভ্যাল্‌পারিসো—বুয়েনস্ আইরেস।

সোভিয়েট বিমানপথ—এই পথের প্রধান স্টেশন—মস্কো—তাসখন্দ (কাজাকস্থান)—ওমস্ক—ইর্খুর্টস্ক—চিতা—ব্লাডিভস্টক।

পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান দেশের অসামরিক বিমানপথে যাতায়াত ও পরিবহনের হিসাব নিম্নে (১৯৭১) দেওয়া গেল।

দেশ	যাত্রীসংখ্যা (লক্ষ)	মালপত্র পরিবহন (লক্ষ টন)	বিমানপথ ভ্রমণের দৈর্ঘ্য (কোটি কিমি)	দেশ	যাত্রী সংখ্যা (লক্ষ)	মালপত্র পরিবহন (লক্ষ টন)	বিমানপথে ভ্রমণের দৈর্ঘ (কোটি কিমি)
যুক্তরাজ্য	১৫৮	২'৮	৩২	পশ্চিম জার্মানী	৭৫	২	
অস্ট্রেলিয়া	৭২	১'২	১৯	সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র	৭৮০		৬
ভারত	২৬		৬'৪	ব্রেজিল	২৯	০'৩	
যুক্তরাষ্ট্র			৫১০	ক্যানাডা	১২৫		

ভারতে যাতায়াত ও পরিবহন

যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব—আগেকার তুলনায় যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং যথেষ্ট উন্নতিও হইতেছে। বস্তুতঃ একদিকে উদ্ভিজ্জ, কৃষিজ, খনিজ ও প্রাণিজ সম্পদ, শিল্প, বাণিজ্য, লোকবসতি প্রভৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হইতেছে। অপরদিকে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাজনক স্থানে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও লোকবসতি বৃদ্ধি হইতেছে।

১৯৪৭ খ্রীঃ আমাদের দেশের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা ছিল নিতান্ত অনুন্নত। তাই স্বাধীনতালাভের পর এদেশের প্রত্যেক পঞ্চবার্ষিক প্রকল্পে মোট অর্থবরাদ্দের প্রায় ২৫% নির্দিষ্ট হইয়াছে এবিষয়ে উন্নতির উদ্দেশ্যে। গত ২৪/২৫ বৎসরে এসকল বিষয়ে অগ্রগতির বিবরণ ও বর্তমান অবস্থা নিম্নে অতিসংক্ষেপে আলোচিত হইল।

স্থলপথ—১৯৪৭ খ্রীঃ এদেশে মোট স্থলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ৪ লক্ষ কিমি'র কম। তন্মধ্যে **গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, ডেকান রোড** প্রভৃতি বড় রাস্তা এবং কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই প্রভৃতি প্রধান নগর ও শিল্পকেন্দ্রের আশপাশে স্থলপথ ছিল অধিক উন্নত।

স্বাধীনতালাভের পরে উন্নতি ও বর্তমান অবস্থা—স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের স্থলপথসমূহের উন্নতির উদ্দেশ্যে একদিকে পুরাতন পথ, সেতু প্রভৃতির মেরামত ও সংস্কার, অন্যদিকে বহু নূতন ও প্রশস্ত পথ, সেতু প্রভৃতি তৈরী হইতে থাকে। উড়িষ্যার কটকে **মহানদীর** উপর **সড়কসেতু** এদেশে নূতন সেতুর মধ্যে বৃহত্তম। তাহাছাড়া বিহারে গঙ্গার উপর মোকামা সেতু, পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার উপর ফরাক্কা ব্যারেজ, রূপনারায়ণের উপর কোলাঘাট সেতু, আসামে ব্রহ্মপুত্রের উপর পাণ্ডুর নিকটবর্তী সেতু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসকল ব্যবস্থার ফলে

এখন এদেশে স্থলপথের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩ লক্ষ কিমি (১৯৪৭ খ্রীঃ তুলনায় তিনি

গুণের বেশী)। এদেশের স্থলপথগুলি (নূতন তৈরী পথ ও আগেকার পথসহ) তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত।

(১) **জাতীয় সড়ক (ন্যাশন্যাল হাইওয়ে)**—এই সড়কগুলি এদেশের সর্বপ্রধান স্থলপথ। এদেশে এপ্রকার প্রায় ৮০টি সড়ক (N. H.) আছে। ইহাদের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৯,০০০ কি মি। দেশের মধ্য অংশের রাজ্যগুলিতে এরূপ পথের দৈর্ঘ্য অধিক। এদেশের জাতীয় সড়কগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিখ্যাত।

১নং সড়ক (N.H.I.)—দিল্লী হইতে অমৃতসর হইয়া পাকিস্তানের সীমা পর্যন্ত।

২নং (N H.2.)—দিল্লী হইতে আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ হইয়া কলিকাতা। (আগেকার গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড)।

৩নং—আগ্রা হইতে গোয়ালিয়র, ইন্দোর হইয়া বোম্বাই।

৪নং—বোম্বাই হইতে ব্যাঙ্গালোর হইয়া মাদ্রাজ।

৫নং—কলিকাতা হইতে ভুবনেশ্বর, বিশাখাপটনম্ হইয়া মাদ্রাজ।

৬নং—কলিকাতা হইতে নাগপুর হইয়া বোম্বাই।

(পশ্চিমবঙ্গে ৫নং ও ৬নং পথ মিলিত পথ।)

৭নং—বারাণসী হইতে নাগপুর, হায়দরাবাদ, ব্যাঙ্গালোর হইয়া কন্যাকুমারী।

(ইহাই এই দেশের দীর্ঘতম জাতীয় সড়ক।)

৮নং—দিল্লী হইতে উদয়পুর, আহ্মদাবাদ হইয়া বোম্বাই।

পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় সড়ক—এই রাজ্যে ৫নং ও ৬নং জাতীয় সড়ক অভিন্ন। এখানে আরও কয়েকটি জাতীয় সড়ক উল্লেখযোগ্য। ৩৪নং সড়ক কলিকাতা হইতে শিলিগুড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত। ৩১নং সড়ক শিলিগুড়ির মধ্য দিয়া পশ্চিমে বিহার ও পূর্বদিকে আসাম পর্যন্ত এবং ৩১এ নং সড়ক শিলিগুড়ি হইতে গ্যাংটক (সিকিমের রাজধানী) পর্যন্ত বিস্তৃত। ৩২নং সড়ক পুরুলিয়ার উপর দিয়া বিস্তৃত। ৪১নং সড়ক হলদিয়া বন্দরকে ৫ | ৬নং সড়কের সহিত যুক্ত করিতেছে।

হিমালয় অঞ্চলে জাতীয় সড়ক—হিমাচলপ্রদেশের পাঠানকোট হইতে জম্মু ও কাশ্মীরের জম্মু, নেহেরু টানেল (বানিহাল গিরিপথ) ও শ্রীনগর হইয়া লেহ্ পর্যন্ত একটি জাতীয় সড়ক আছে। লেহ'র (৩৫২২ মি উচ্চ) নিকটবর্তী অংশ **পৃথিবীর উচ্চতম স্থলপথ**। পঞ্জাবের জলন্ধর হইতে শ্রীনগর হইয়া বড়মূলা পর্যন্তও একটি জাতীয় সড়ক আছে। হরিয়ানার আম্বালা হইতে হিমাচল প্রদেশের সিমলা হইয়া তিব্বতের সীমান্ত পর্যন্ত একটি জাতীয় সড়ক বিস্তৃত। ইহাকে হিন্দুস্থান-তিব্বত রোডও বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি হইতে সিকিমের গ্যাংটক পর্যন্তও একটি জাতীয় সড়ক আছে।

(২) **রাজ্যসড়ক (স্টেট হাইওয়ে)**—রাজ্যসমূহের বিভিন্ন অংশে বহু প্রশস্ত স্থলপথ আছে। এগুলি সাধারণতঃ জাতীয় সড়কের সহিত যুক্ত। তামিলনাড়ুতে রাজ্য সড়কের দৈর্ঘ্য এদেশের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম।

(৩) **জেলা ও গ্রাম সড়ক**—এসকল পথে জেলার প্রধান শহর, শিল্পকেন্দ্র, বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলির সহিত গ্রাম অঞ্চলের ও বিভিন্ন রাজ্য-সড়কের যোগ আছে।

স্থলপথে যানবাহন—এদেশের বিভিন্ন অংশের স্থলপথে ২০ লক্ষের অধিক বাস, মোটরগাড়ি, ট্রাক, লরি, জীপ প্রভৃতি **বাষ্পচালিত গাড়ি** যাতায়াত করে। ইহাদের মধ্যে ২০% কেবলমাত্র মাল বহনের গাড়ি। নানাপ্রকার গাড়ির ব্যবহার সম্পর্কে রাজ্যসমূহের মধ্যে (১৯৭৫ খ্রীঃ) **মহারাষ্ট্রের** স্থান প্রথম, **উত্তরপ্রদেশ** দ্বিতীয়, **দিল্লী** তৃতীয় ও **পশ্চিমবঙ্গ** চতুর্থ। আজকাল বিভিন্ন **দূরপাল্লার** বাস, **অন্তঃরাজ্য** বাস, ট্রাক প্রভৃতি দেশের এক অংশ হইতে অপর অংশে যাতায়াত ও পরিবহনের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। তাহাছাড়া দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে জিনিসপত্র দ্রুত পরিবহনের সুবিধার জন্য জাতীয় পারমিট বা অনুমতি প্রকল্পের আওতায় সমগ্র দেশকে **পাঁচটি অঞ্চলে** বিভক্ত করা হইতেছে। উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চল ইতিমধ্যে গঠিত হইয়াছে। পূর্ব অঞ্চলও গঠিত হইবে।

উপরিলিখিতরূপ উন্নত ধরনের ব্যবস্থা ভিন্ন এদেশের গ্রাম অঞ্চলে আছে গরু, মহিষের গাড়ি, মরুপ্রায় অঞ্চলে আছে উটের দল। পার্বত্য অঞ্চলে রোপওয়েগুলিও বিশেষ উপকারী।

(খ) **রেলপথ**—দেশের **বৃহত্তম সংখ্যক লোকের** এক স্থান হইতে অন্যত্র **দ্রুত যাতায়াত** ও অধিক পরিমাণ জিনিসপত্রের দ্রুত **পরিবহনের** পক্ষে রেলগাড়ির গুরুত্ব খুব বেশী। এদেশে **সর্বপ্রথম** রেলপথ তৈরী হয় বোম্বাই হইতে কল্যাণ পর্যন্ত। তারপর কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জের নিকট পর্যন্ত (১৮৫৩ খ্রীঃ)। ইহার পর রেলপথ বিস্তৃত হয় ভাগীরথী-হুগলি নদীর দুই তীরে ও আশপাশে এবং বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রধান নগর ও শিল্পকেন্দ্রের নিকটবর্তী স্থানে। এভাবে রেলপথের বিস্তারের ফলে ১৯৪৭ খ্রীঃ এদেশে রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৫৩,০০০ কি মি। তখন বিভিন্ন অংশের রেলপথ E. I. Railways. B N. Railways, B.B.C.I. Railways প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল এবং এগুলি পরিচালিত হইত পৃথক পৃথক সংস্থাদ্বারা।

রেলপথের উন্নতি—স্বাধীনতা লাভের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে রেলপথের উন্নতি আরম্ভ হয়। যেমন, সরু (মিটার গেজ) রেলপথের পরিবর্তে তৈরী হইতে

থাকে প্রশস্ত (ব্রড গেজ) রেলপথ। বিভিন্ন নদী ও খালের ওপর সেতু ও কতক রেলপথ তৈরীর ফলে রেলপথের মধ্যে সরাসরি যোগ স্থাপিত হয়। এরূপ সেতুর মধ্যে বিহারের শোন সেতু দীর্ঘতম; আর পশ্চিমবঙ্গের ফরাক্কা ব্যারেজ পৃথিবীর দীর্ঘতম ব্যারেজ। রেলগাড়ী চালাইবার জন্য বাষ্পীয় ইঞ্জিনের পরিবর্তে ডিজেল রেল-ইঞ্জিন ও বৈদ্যুতিক রেল-ইঞ্জিনের ব্যবস্থা হইতেছে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে। আর রেলওয়ের সমস্ত ব্যবস্থা সুপরিচালনার উদ্দেশ্যে রেলপথসমূহের অঞ্চল বিভাগ ও জাতীয়করণ (সরকার দ্বারা পরিচালনার ব্যবস্থা) হইয়াছে। কেন্দ্রীয় রেলওয়ে বোর্ডের প্রধান কার্যালয় দিল্লীতে।

রেলপথের গুরুত্ব—নানা বিষয়ে উন্নতির ফলে এখন এদেশে রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৬০,০০০ কিমির অধিক; সমগ্র **পৃথিবীতে তৃতীয়** (যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের পরে)। এসকল পথে প্রতিদিন (১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ) ১০,৮০০ ট্রেন যাতায়াত করে। এগুলি বহন করে দৈনিক গড়ে ৭০ লক্ষ মানুষ ও ৫.৫ লক্ষ টন জিনিস। এখন রাজধানী এক্সপ্রেসগুলি প্রতি ঘণ্টায় ১২০ কিমির অধিক বেগে যাতায়াত করে। মেল ট্রেন, এক্সপ্রেসগুলিও চলে ঘণ্টায় ১০০-১১০ কিমি বেগে।

রেলপথের অঞ্চলসমূহ—১৯৫১ খ্রীঃ এদেশের রেলপথসমূহ আটটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়। ১৯৬৬ খ্রীঃ আর একটি অঞ্চল সৃষ্টি হয়। ফলে, তখন হইতে এদেশের রেলপথ-সমূহ **৯টি** অঞ্চলে (Ralways Zones) বিভক্ত। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

(১) **নর্দান রেলওয়েজ** (দৈর্ঘ্য ১০,৬৮৭, কিমি)—ভারতের উত্তর অংশে (হিমাচল প্রদেশ, পঞ্জাব, ও হরিয়ানা সম্পূর্ণ এবং উত্তর প্রদেশের পশ্চিম অংশ ও রাজস্থানের উত্তর অংশে) এই রেলপথ বিস্তৃত। সেজন্য ইহাকে **উত্তর অঞ্চলের** রেলপথ বলে। এখানকার প্রধান কার্যালয় **নূতন দিল্লীতে**।

এই রেলপ দিল্লী, এলাহাবাদ ও আগ্রাতে সেণ্ট্রাল রেলওয়েজের সহিত, আগ্রা, মথুরা ও রেওয়ারিতে ওয়েস্টার্ন রেলওয়েজের সহিত; বেরিলি, লক্ষ্ণৌ, ও বারাণসীতে নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়েজের সহিত; কানপুরে সেণ্ট্রাল ও নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়েজের সহিত এবং মোগলসরাইতে ইস্টার্ন রেলওয়েজের সহিত যুক্ত। ভারতের রাজধানী **দিল্লী** উত্তর প্রদেশের রাজধানী **লক্ষ্ণৌ**, হিমাচল প্রদেশের রাজধানী **সিমলা**, পঞ্জাব ও হরিয়ানার যুক্ত রাজধানী **চণ্ডীগড়** এই রেলপথে অবস্থিত। **অমৃতসর, ভাতিন্দা, কানপুর, আগ্রা, এলাহাবাদ, বারাণসী** প্রভৃতিও এই রেলপথে অবস্থিত। উত্তর ভারতের কার্পাস, চিনি, চর্ম, পশম, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিল্প এই রেলপথ দ্বারা উপকৃত।

(২) **ওয়েস্টার্ন রেলওয়েজ** (দৈর্ঘ্য ১০,১৬৭ কিমি)—ভারতের পশ্চিম অংশে (গুজরাট সম্পূর্ণ, মহারাষ্ট্রের উত্তর অংশ, রাজস্থানের অধিকাংশ ও মধ্যপ্রদেশের পশ্চিম অংশে) এই রেলপথ বিস্তৃত। সেজন্য ইহার নাম **পশ্চিম অঞ্চলের** রেলপথ। এখানকার প্রধান কার্যালয় **বোম্বাইতে** (চার্চ গেট)।

এই রেলপথ আগ্রা, মথুরা, ও রেওয়ারিতে নর্দার্ন রেলওয়েজের সহিত এবং জলগাঁও ভূপাল ও বিনাতে সেণ্ট্রাল রেলওয়েজের সহিত যুক্ত। মহারাষ্ট্রের রাজধানী **বোম্বাই**, গুজরাটের রাজধানী **গান্ধীনগর**, রাজস্থানের রাজধানী **জয়পুর** ও মধ্যপ্রদেশের রাজধানী **ভূপাল** এবং **আমেদাবাদ, বরোদা, উজ্জয়িনী, উদয়পুর** প্রভৃতি নগর ও **কান্দলা** বন্দর এই রেলপথে অবস্থিত। ভারতের পশ্চিম অংশের কার্পাস, রাসায়নিক ও প্রস্তর শিল্প এই রেলপথ দ্বারা উপকৃত।

(৩) **সেণ্ট্রাল রেলওয়েজ** (দৈর্ঘ্য ৬,০১৩ কিমি)—ভারতের মধ্য অংশে (মধ্যপ্রদেশের অধিকাংশ, মহারাষ্ট্রের মধ্য অংশ, উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণ অংশ, অন্ধ্র-প্রদেশের পশ্চিম অংশ ও কর্ণাটকের উত্তর অংশে) এই রেলপথ বিস্তৃত। সেজন্য ইহার নাম **মধ্য অঞ্চলের** রেলপথ , প্রধান কার্যালয় **বোম্বাইতে** (ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস)।

এই রেলপথ দিল্লী, আগ্রা ও এলাহাবাদে নর্দার্ন রেলওয়েজের সহিত ; জলগাঁও, খাণ্ডোয়া ভূপাল ও বিনাতে ওয়েস্টার্ন রেলওয়েজের সহিত ; মথুরাতে নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়েজের সহিত ; কানপুরে নর্দার্ন ও নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়েজের সহিত ; নাগপুর, কাটনি ও জব্বলপুরে সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়েজের এবং মন্মদ, পুণা ও পূর্ণাতে সাউথ সেণ্ট্রাল রেলওয়েজের সহিত যুক্ত। মহারাষ্ট্রের রাজধানী **বোম্বাই**, মধ্যপ্রদেশের রাজধানী **ভূপাল**, ভারতের রাজধানী **দিল্লী** এবং **ঝাঁসি, এলাহাবাদ, নাগপুর, কাটনি** প্রভৃতি নগর এই রেলপথে অবস্থিত। ভারতের মধ্যভাগের কার্পাস, সিমেণ্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিল্প এই রেলপথ দ্বারা উপকৃত.

(৪) **নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়েজ** (দৈর্ঘ্য ৪,৯৭৭ কিমি —ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশে (উত্তর প্রদেশের মধ্য ও উত্তর-পূর্ব অংশ ও বিহারের উত্তর অংশে) এই রেলপথ বিস্তৃত। সেজন্য ইহাকে বলা হয় **উত্তরপূর্ব অঞ্চলের** রেলপথ। এখানকার প্রধান কার্যালয় উত্তর প্রদেশের **গোরক্ষপুরে**।

এই রেলপথ লক্ষ্ণৌ ও বেরিলিতে নর্দার্ন রেলওয়েজের সহিত ; মথুরাতে সেণ্ট্রাল রেলওয়েজের সহিত ; এলাহাবাদ ও পাটনাতে ইস্টার্ন রেলওয়েজের সহিত ; কানপুরে নর্দার্ন ও সেণ্ট্রাল রেলওয়েজের সহিত ; বারাণসীতে সেণ্ট্রাল ও ইস্টার্ন রেলওয়েজের সহিত এবং কাটিহার ও পূর্ণিয়াতে নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়েজের সহিত যুক্ত। উত্তর-

প্রদেশের রাজধানী **লক্ষ্ণৌ** এবং **মোরাদাবাদ, বেরিলি, আলিগড়, এলাহাবাদ, কানপুর, বারাণসী, দ্বারভাঙ্গা, বারাউনি** প্রভৃতি নগর এই রেলপথে অবস্থিত। দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের চিনি, কার্পাস, পাট প্রভৃতি শিল্প এই রেলপথদ্বারা উপকৃত।

(৪) **ইস্টার্ন রেলওয়েজ** (দৈর্ঘ্য ৪,২২৯ কিমি)—ভারতের পূর্ব অংশে (উত্তর-প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ, বিহারের মধ্য ও দক্ষিণ অংশ এবং পশ্চিমবঙ্গে) এই রেলপথ বিস্তৃত। সেজন্য ইহাকে **পূর্ব অঞ্চলের রেলপথ** বলা হয়। এখানকার প্রধান কার্যালয় **কলিকাতাতে**।
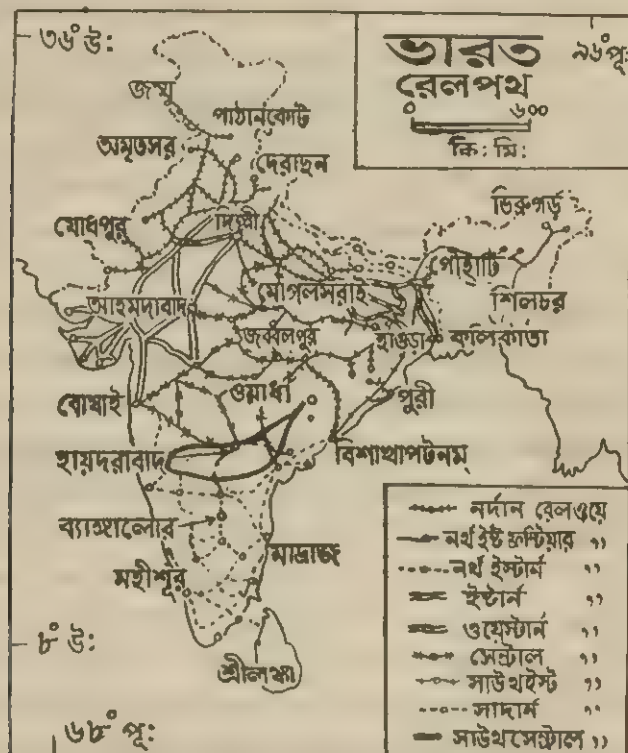
এই রেলপথ এলাহাবাদ ও পাটনাতে নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়েজের সহিত ; মোগল-সরাইতে নদার্ন রেলওয়েজের সহিত ; বারাউনিতে নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়েজের সহিত এবং গোমো ও আসানসোলে সাউথ-ইস্টার্ন রেলওজের সহিত যুক্ত। পশ্চিম-বঙ্গের রাজধানী **কলিকাতা**, বিহারের রাজধানী **পাটনা** এবং **হাওড়া, দুর্গাপুর, আসানসোল, রাণীগঞ্জ, চিত্তরঞ্জন, ধানবাদ** প্রভৃতি নগর এই রেলপথে

অবস্থিত। ভারতের পূর্ব অঞ্চলের কয়লা, অভ্র প্রভৃতি খনিজ সম্পদ ও পাট, কার্পাস, ইস্পাত প্রভৃতি শিল্প এই রেলপথ দ্বারা উপকৃত।

(৬) **নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়েজ** (দৈর্ঘ্য ৩,৬২৮ কিমি)—ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে (পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশ হইতে আসামের পূর্বসীমা পর্যন্ত) এই রেলপথ বিস্তৃত। সেজন্য ইহাকে **উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের** রেলপথ বলে। এখানকার প্রধান কার্যালয় আসামের **গৌহাটিতে** (মালিগাও)।

এই রেলপথ কাটিহার ও পূর্ণিয়াতে নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়েজের সহিত এবং বারাউনিতে ইস্টার্ন রেলওয়েজের সহিত যুক্ত। **কাটিহার, শিলিগুড়ি, নিউ জলপাইগুড়ি, গৌহাটি, লামডিং, তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, শিলচর,** প্রভৃতি শহর, নগর এই রেলপথে অবস্থিত। শিলিগুড়ি হইতে সরু রেলপথে বা মোটরপথে **দার্জিলিং** এবং গৌহাটি হইতে মোটরপথে **শিলং** (মেঘালয়ের রাজধানী), **দিশপুর** (আসামের রাজধানী) প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিতে হয়। ভারতের পূর্ব-সীমান্তের চা, পাট, তৈল শোধন প্রভৃতি শিল্প, প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তৈলের উৎপাদন এই রেলপথ দ্বারা উপকৃত।

(৭) **সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়েজ** (দৈর্ঘ্য ৬,৮৪২ কিমি)—ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে (পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ, বিহারের দক্ষিণ অংশ, উড়িষ্যা ও অন্ধ্র-প্রদেশের উত্তর অংশ ও মধ্যপ্রদেশের পূর্ব অংশে) এই রেলপথ বিস্তৃত। সেজন্য ইহাকে **দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের** রেলপথ বলে। এখানকার প্রধান কার্যালয় **কলিকাতাতে**।

এই রেলপথ হাওড়া, আসানসোল ও গোমোতে ইস্টার্ন রেলওয়েজের সহিত; জব্বলপুর, নাগপুর ও কাটনিতে সেন্ট্রাল রেলওয়েজের সহিত এবং কোটাপালেমে (বিশাখাপটনমের পাশে) সাউথ-সেন্ট্রাল রেলওয়েজের সহিত যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী **কলিকাতা**, উড়িষ্যার রাজধানী **ভুবনেশ্বর** এবং **জামসেদপুর, রৌরকেল্লা ভিলাই, নাগপুর, পুরী, কটক** প্রভৃতি নগর ও **বিশাখাপটনম্** বন্দর এই রেলপথে অবস্থিত। ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজ সম্পদ এবং লৌহ ও ইস্পাত, কার্পাস, পাট প্রভৃতি শিল্প এই রেলপথ দ্বারা উপকৃত।

(৮) **সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়েজ** (দৈর্ঘ্য ৬,১৭৫ কিমি)—ভারতের মধ্যভাগের দক্ষিণ অংশে (অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণ অংশ, মহারাষ্ট্রের পশ্চিম অংশ ও কর্ণাটকের উত্তর অংশে) এই রেলপথ বিস্তৃত। সেজন্য ইহাকে দক্ষিণ-মধ্য অঞ্চলের রেলপথ বলে। এখানকার প্রধান কার্যালয় অন্ধ্রপ্রদেশের **সেকেন্দ্রাবাদে**।

এই রেলপথ পুণা, মন্মদ ও পূর্ণাতে সেন্ট্রাল রেলওয়েজের সহিত; কোটপালেমে

(বিশাখাপটনমের পাশে) সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়েজের সহিত এবং হুবলি, রায়চুর ও গুন্তুরে (নেলোরের দক্ষিণে) সাদার্ন রেলওয়েজের সহিত যুক্ত। অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী **হায়দরাবাদ** এবং **শোলাপুর, ওয়ারঙ্গল, বিজয়ওয়াদা,** প্রভৃতি নগর ও **মর্মগাঁও** বন্দর এই রেলপথে অবস্থিত। দেশের দক্ষিণ মধ্য অঞ্চলের কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ লৌহ প্রভৃতি খনিজ সম্পদ ও কার্পাস, তামাক প্রভৃতি শিল্প এই রেলপথ দ্বারা উপকৃত।

(৯) **সাদার্ন রেলওয়েজ** (দৈর্ঘ্য ৭,৬৪৫ কিমি) —ভারতের দক্ষিণ অংশে (কর্ণাটকের দক্ষিণ অংশ, তামিলনাড়ু ও কেরালাতে) এই রেলপথ বিস্তৃত। সেজন্য ইহাকে **দক্ষিণ অঞ্চলের** রেলপথ বলে। এখানকার প্রধান কার্যালয় **মাদ্রাজে**।

এই রেলপথ হুবলি, রায়চুর ও গুন্তুরে সাউথ-সেণ্ট্রাল রেলওয়েজের সহিত যুক্ত। তামিলনাড়ুর রাজধানী **মাদ্রাজ,** কর্ণাটকের রাজধানী **ব্যাঙ্গালোর,** কেরালার রাজধানী **ত্রিবান্দ্রম্** এবং **মহীশূর, পণ্ডিচেরী,** প্রভৃতি নগর ও **কোচিন, ম্যাঙ্গালোর, ধনুস্কোদি** প্রভৃতি বন্দর এই রেলপথে অবস্থিত। ভারতের দক্ষিণ অংশের কার্পাস, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতি শিল্প এই রেলপথ দ্বারা উপকৃত।

রেলপথের সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চল—এদেশের উত্তর ও উত্তর পূর্ব দিকের **পার্বত্য অঞ্চল** ও দক্ষিণদিকের **দ্বীপসমূহ** রেলপথের সুবিধা হইতে বঞ্চিত। পশ্চিমঘাট, বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্বতেও কয়েকটি মাত্র অংশের (ফাঁকের) মধ্যদিয়া রেলপথ বিস্তৃত।

(গ) **নৌপথ** –এদেশে নৌপথে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা **অতিপ্রাচীন**। তখন দেশের বিভিন্ন নদনদী ও খালে যাতায়াত করিত কাঠের ছোট নৌকা, আর সমুদ্রে চলিত বড় নৌকা (**জাহাজ**)। সেগুলি চলিত **দাঁড়** ও **বায়ুবেগে** (কাপড়ের পালের সাহায্যে)। পশ্চিমে আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং পূর্বদিকে যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ (বর্তমান ইন্দোনেশিয়া), চীন ও জাপানে **বাণিজ্য উপলক্ষে** যাতায়াত করিত এসকল জাহাজ। ক্রমশঃ নদী ও খালপথে লঞ্চ, স্টীমার প্রভৃতির প্রচলন হয়, আর বিদেশে যাতায়াত ও পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয় (ইস্পাতের) জাহাজ।

নৌপথের উন্নতি—গঙ্গা ও অন্যান্য অনেক নদী ও খাল কালক্রমে মজিয়া যাওয়ার ফলে ১৯৪৭ খ্রীঃ অভ্যন্তরীণ নৌপথের যথেষ্ট দুরবস্থা ছিল। তখন সমুদ্রপথে জাহাজের পরিবহন ক্ষমতাও ছিল খুব সামান্য (মাত্র ২ লক্ষ টন)। স্বাধীনতালাভের পর নৌপথে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি আরম্ভ হয়। অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে সেণ্ট্রাল ইন্‌ল্যাণ্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ট্রান্সপোর্ট প্রভৃতি সংস্থার এবং সমুদ্রপথে যাতায়াত ও পরিবহন সম্পর্কে শিপিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া ও দেশের বিভিন্ন বন্দরের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এখন (১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ) এদেশের
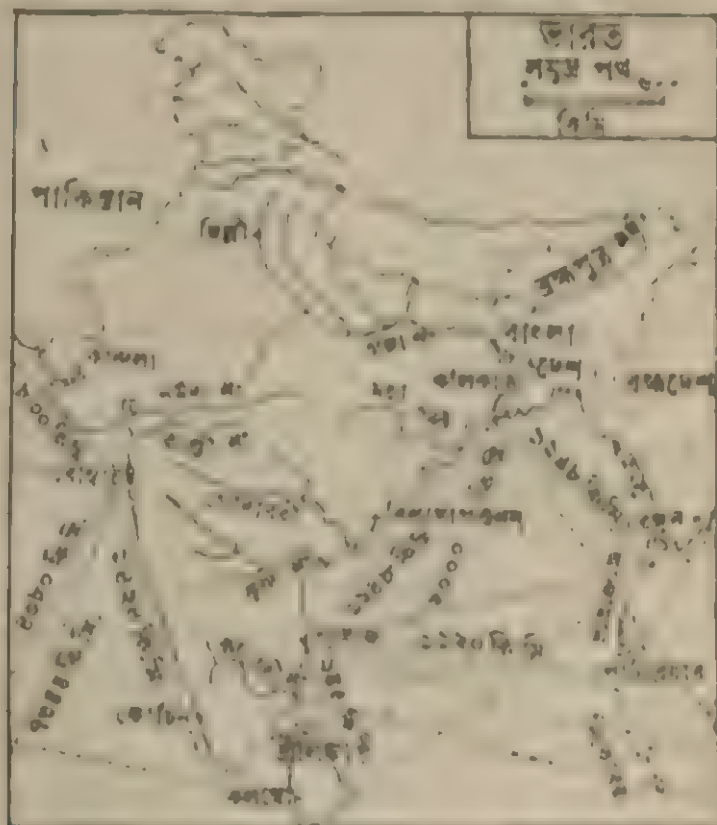
নৌশক্তি (জাহাজ, স্টীমার প্রভৃতি) এশিয়াতে দ্বিতীয় (জাপানের পরে) এবং জাহাজগুলির **পরিবহন ক্ষমতা** ১৯৪৭ খ্রীঃ তুলনায় ২২ গুণের বেশী (৪৫ লক্ষ টনের অধিক)। এদেশের নৌপথসমূহ দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত—অভ্যন্তরীণ নৌপথ ও সমুদ্রপথ। ইহাদের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

অভ্যন্তরীণ নৌপথ—এদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথ দুইভাগে বিভক্তঃ—(১) নদীপথ ও (২) খালপথ।

(১) **নদীপথ**—এদেশের নদনদীসমূহের মোট দৈর্ঘ্য বহু হাজার কিমি; তাহার মধ্যে ১৪,১০০ কিমির অধিক নাব্য। স্টীমার চলে মাত্র ২০% অংশে (প্রায় ৩০০০ কিমি)। নদীসমূহের মধ্যে **গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র** প্রধান। কলিকাতা হইতে ভাগীরথী ও গঙ্গার মধ্য দিয়া কানপুর পর্যন্ত (প্রায় ১২৮০ কিমি) এবং সুন্দরবনের নদী, খাল, বাংলাদেশে যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) ও আসামে ব্রহ্মপুত্রের মধ্য দিয়া ডিব্রুগড় পর্যন্ত প্রায় (১২৮০ কিমি) স্টীমার চলে। ভাগীরথীর তীরে **কলিকাতা** ও ব্রহ্মপুত্রের তীরে **সাদিলাপুর** (গৌহাটির পাশে) বন্দর নৌপথে যাতায়াত ব্যবস্থার কেন্দ্র। **মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা** ও **কাবেরী** নদীর নিম্ন অংশেও নৌকা চলে।

(২) **খালপথ**—এদেশের বিভিন্ন নদীর সহিত যুক্ত প্রধান খালগুলি জলসেচ, যাতায়াত ও পরিবহনের পক্ষে সহায়ক। ইহাদের মধ্যে হরিয়ানার **যমুনা** ও **সিরহিন্দ** খাল, উত্তরপ্রদেশের **গ্যাঞ্জেস ক্যানেল** (গঙ্গাখাল), বিহারের **শোন খাল,** পশ্চিমবঙ্গের **দুর্গাপুর-ত্রিবেণী খাল, হিজলি খাল, ইস্টার্ন ক্যানেল,** উড়িষ্যার **বদ্বীপ খাল,** অন্ধ্রপ্রদেশের **বাকিংহাম,** কোম্মামুর ও অন্যান্য খাল, **গোদাবরী খাল** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কেরালার উপকূলের এবং সুন্দরবনের খালগুলিও বিশেষ উপকারী।

এদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথে (বিভিন্ন নদী ও খালপথে) আসামের চা ও কাঠ; পশ্চিমবঙ্গের কাঠ; বিহার ও উত্তরপ্রদেশের চিনি, কার্পাস, তামাক; বিহার ও উড়িষ্যার কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ; অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর কার্পাস, তামাক, চীনাবাদাম প্রভৃতির পরিবহন সম্পর্কে খুব সুবিধা বেশী।

সমুদ্রপথ—এদেশের সমুদ্রপথ দুইভাগে বিভক্ত—উপকূল বাণিজ্যপথ ও দূর সমুদ্রপথ বা বৈদেশিক বাণিজ্যপথ। ইহাদের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(৩) **উপকূল বাণিজ্যপথ**—এদেশের উপকূলে আছে ১০টি প্রথম শ্রেণীর এবং প্রায় ১৬০টি ক্ষুদ্র বন্দর। এদেশের প্রায় ৬০টি জাহাজ, বহু স্টীমার ও নৌকা নানাপ্রকার মালপত্র লইয়া এসকল বন্দরের মধ্যে যাতায়াত করে। অন্তর্বাণিজ্য (বিভিন্ন রাজ্যের

মধ্যে বাণিজ্য) বা **অন্তঃরাজ্য বাণিজ্য** সম্পর্কে উপকূলপথের গুরুত্ব অধিক। কেরালা ও তামিলনাড়ুতে উপকূল বাণিজ্যের পরিমাণ বেশী।
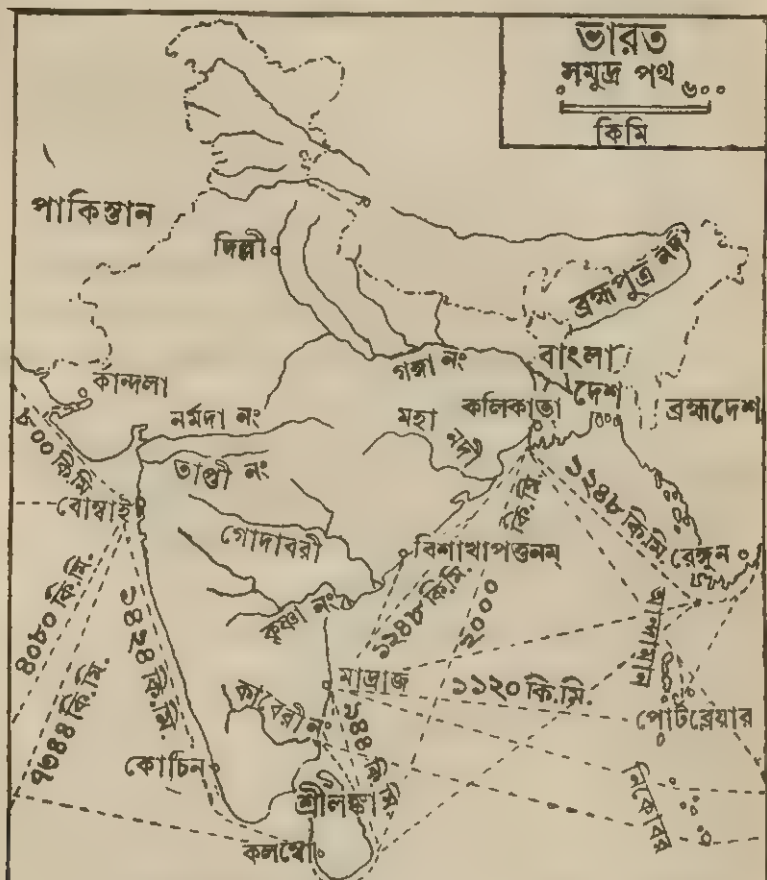
কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ হইতে নিকটবর্তী বৃহৎ বন্দরসমূহের পথের দূরত্ব

(৪) **বৈদেশিক বাণিজ্যপথ**—ভারত মহাসাগরের উত্তর সীমাতে এদেশের অবস্থিতি, পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের সহিত নৌপথে যোগাযোগ ও বাণিজ্যের সুবিধা, এদেশের রপ্তানিযোগ্য নানাপ্রকার সম্পদ এবং যথেষ্ট পরিমাণ জিনিস আমদানির প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ প্রভৃতি কারণে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য **গুরুত্বপূর্ণ**। এদেশের প্রায় ২০০টি জাহাজ এবং তাহাদের তুলনায় বহুগুণ বেশী (বাৎসরিক প্রায় ৭৩০০টি) বিদেশী জাহাজের মাধ্যমে এদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য চলে। (১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ

ইহাদের সাহায্যে মোট ৭৮০০ কোটি টাকার অধিক জিনিস এদেশে আমদানি-রপ্তানি হইয়াছে।)

আমদানির মধ্যে বর্তমানে যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, খনিজ তৈল, সার, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি এবং **রপ্তানির** মধ্যে লৌহ আকরিক, চা, পাটের তৈরী জিনিস (চট, থলে প্রভৃতি), কার্পাস বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাতের জিনিস (কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) অধিক। এদেশের দশটি প্রথম শ্রেণীর (Major) বন্দরের মাধ্যমে এই বাণিজ্য চলে। ইহাদের মধ্যে পশ্চিম উপকূলে কান্দলা, বোম্বাই, মর্মগাও, ম্যাঙ্গালোর*, কোচিন আর পূর্ব উপকূলের টুটিকোরিন*, মাদ্রাজ, বিশাখাপটনম্, পরাদীপ এবং কলিকাতা। গুরুত্ব হিসাবে **বোম্বাই** বন্দরের স্থান প্রথম, **কলিকাতা** দ্বিতীয়, **কোচিন** তৃতীয়। এসকল বন্দরের মারফত পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সহিত এদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি দেশের সহিত এদেশের বাণিজ্যের পরিমাণ অধিক।

(ঘ) **বিমানপথ** –সকল প্রকার অসামরিক যান-বাহনের মধ্যে বিমানপোতের গতি **দ্রুততম** এবং এগুলি পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি, সাগর, মহাসাগরের উপর দিয়া পৃথিবীর যে কোন অংশ হইতে অপর **যে কোন অংশে** যাতায়াত করে। অবশ্য বিমানপথে যাতায়াত ও পরিবহনের ব্যয় অধিক।

এদেশে সম্ভবতঃ অতিপূর্বে বিমানপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল। (রামায়ণে পুষ্পক-রথে রামের গমন, মেঘের আড়ালে থাকিয়া ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ প্রভৃতির উল্লেখ আছে।) তবে আধুনিক **অসামরিক বিমানপোতের** চলাচল আরম্ভ হয় ১৯৩২ খ্রীঃ।

উন্নতিবিধান—১৯৪৭ খ্রীঃ এদেশে কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজে চারিটি প্রথম শ্রেণীর এবং নাগপুর, কানপুর, হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থানে কিছু ছোট বিমানবন্দর ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে বিমানপথে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এখন এদেশে আছে **কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই** ও **মাদ্রাজে** চারিটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং দেশের বিভিন্ন অংশে আছে অন্য ৪৮টি বিমানবন্দর। এখন হিমালয় অঞ্চলে শ্রীনগর, কুলু উপত্যকায় ভুন্তার, মণিপুরে ইম্ফল (ইম্ফলে) এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও আছে (ছোট ধরণের) বিমানস্টেশন। ফলে, এখন দেশের প্রায় **সকল অংশে** বিমানপথে যাতায়াত সম্ভবপর। এখন (১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ) এদেশে অসামরিক বিমান পোতের সংখ্যা ৯৩০ এর অধিক। ১৯৫৩ খ্রীঃ এদেশে বিমানপথে যাতায়াত ব্যবস্থার জাতীয়করণ (সরকার কর্তৃক পরিচালনার ব্যবস্থা) হইয়াছে। এখন **ইণ্ডিয়ান**

*এই দুই বন্দর ১৯৭৪ খ্রীঃ প্রথমশ্রেণীর বন্দরে উন্নীত হয়।

এয়ার-লাইনস্-এর অধীনে কতক বিমানপোত এদেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরে এবং আশপাশের বাংলাদেশ, নেপাল, ব্রহ্মদেশ ও শ্রীলঙ্কাতে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করিতেছে। **এয়ার ইণ্ডিয়ার** অধীনে কতক বড় বড় বিমানপোত দেশের চারিটি আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দর হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের ২৭টি দেশে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করে।
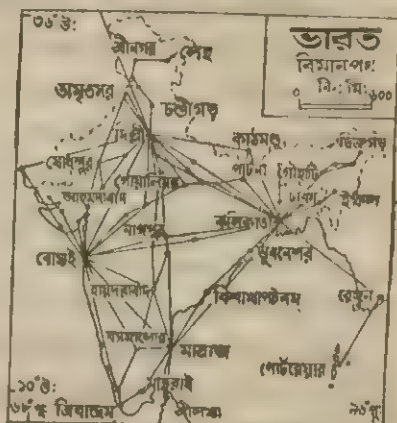
বর্তমানে (১৯৭৪-৭৫ খ্রীঃ) এদেশের বিমানপোতসমূহ প্রতিবৎসর ৬½ কোটি কিমির বেশী (অর্থাৎ ১৯৪৭ খ্রীঃ তুলনায় তিনগুণের অধিক) পথ যাতায়াত করে। আর এসকল বিমানপোতে যাতায়াত করেন বাৎসরিক **গড়ে ৩৮½ লক্ষের অধিক** (১৯৪৭ খ্রীঃ তুলনায় ১১ গুণের বেশী) **লোক** এবং এসকল বিমানপোত বহন করে ৬½ **কোটি কেজির** অধিক (১৯৪৭ খ্রীঃ তুলনায় ১৭ গুণের অধিক) **জিনিসপত্র**।

আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দরসমূহ—পালাম (দিল্লী), **কলিকাতা** (দমদম), **সান্তাক্রুজ** (**বোম্বাই**) ও **মীনম্বক্কম্** (**মাদ্রাজ**)—এদেশের চারিটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ভারতীয় বিমান ভিন্ন বিদেশী বিমানও এদেশের এই চারিটি বিমানবন্দরে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করে। ইহাদের মধ্যে **পালাম** (**দিল্লী**) বিমানবন্দরের স্থান এদেশে প্রথম। এখান হইতে **এয়ার ইণ্ডিয়ার** বিমানপোত কায়রো, লণ্ডন, মস্কো প্রভৃতি বিমানবন্দরে প্রতিদিন যাতায়াত করে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ হইতে এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানপোত বিদেশের কতক বন্দরে প্রতিসপ্তাহে ২১ বার নিয়মিতভাবে যাতায়াত করে। এই চারিটি বিমানবন্দর পরিচালনার দায়িত্ব ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টস অথরিটি অব ইণ্ডিয়ার (IAAI) উপর ন্যস্ত।

এই চারিটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যে সকল **বিদেশী বিমানপোত** নিয়মিতভাবে যাতায়াত করে। তাহাদের মধ্যে ব্রিটিশ ওভারসিজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন (BOAC), প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজ (PANAM), ট্রান্স-ওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজ (TWA), সোভিয়েট এয়ারওয়েজ (AEROFLOT), এয়ার ফ্রান্স, জাপান এয়ারলাইনস্ (JAL), বাংলাদেশ বিমান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের বিমানপোত **কলিকাতা** হইতে ঢাকাতে প্রতিদিন একাধিক বার, রেঙ্গুন ও কাঠমণ্ডুতে একবার ও চট্টগ্রামে সপ্তাহে ২।৩ বার যাতায়াত করে। **বোম্বাই** ও **মাদ্রাজ** হইতে কলম্বো দৈনিক একবার বিমানপোত যাতায়াত করে। (অবশ্য এসকল ব্যবস্থা প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করা হয়।) কলিকাতা ও দেশের অপর তিনটি প্রধান বিমানবন্দরের মধ্যে প্রতিদিন কয়েকবার বিমানপোতে যাতায়াতের সুযোগ আছে। তাহাছাড়া এই চারিটি বিমানবন্দর হইতে দেশের অধিকাংশ প্রধান বিমানবন্দরে দৈনিক একবার এবং কতক বিমানবন্দরে সপ্তাহে ২।৩ বার বিমানপোত যাতায়াত করে। সাধারণতঃ নিকটবর্তী অঞ্চল অনুসারে যাতায়াতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়। যেমন, কলিকাতা হইতে পূর্বাঞ্চলের আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, উড়িষ্যা, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে বিমানপোত অধিক যাতায়াত করে।

অন্যান্য বিমানবন্দর—অমৃতসর, শ্রীনগর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, পাটনা, গৌহাটি, আমেদাবাদ, নাগপুর, হায়দরাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, কোচিন প্রভৃতি এদেশের অন্যান্য প্রধান বিমানবন্দর।

চিঠি ও অন্যান্য জিনিস পরিবহন—কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজ হইতে ডাকবাহী বিমানপোত প্রতি রাত্রে **নাগপুরে** মিলিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে **ডাক বিনিময়** করে। ইহার ফলে চিঠিপত্র অতি অল্প সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছান সম্ভবপর। কতক বিমানপোত নিয়মিতভাবে মালপত্র পরিবহন করে। অবশ্য ডাকবাহী এবং যাত্রীবাহী বিমানপোতেও কিছু মালের যাতায়াত করার ব্যবস্থা আছে।

অনুশীলনী

১। প্রাচীনকালের তুলনায় আধুনিক কালে স্থলপথে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার কিরূপ উন্নতি হইয়াছে? আধুনিক ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ২। আধুনিক কালে জলপথে যাতায়াত ও পরিবহন সম্পর্কে কিরূপ ব্যবস্থা হইতেছে? উত্তর ও দক্ষিণ সমুদ্রপথ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। সুয়েজ খাল ও পানামা খালপথের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৩। রেলপথে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা আলোচনা কর। পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান আন্তর্জাতিক রেলপথের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ কর। ৪। বিমানপথে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা কি? পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান বিমানপথের বিষয় উল্লেখ কর। ৫। ভারতে কোন্ জাতীয় স্থলপথ বর্তমানে সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ? এদেশে ৫টি প্রধান জাতীয় সড়কের (মানচিত্রের সাহায্যে) কোন্‌টি কোথা হইতে কোথা পর্যন্ত বিস্তৃত তাহা লিখ। পশ্চিম-

বঙ্গের উপর দিয়া কোন্ কোন্ জাতীয় সড়ক বিস্তৃত? ৬। এদেশে রেলপথের কয়টি অঞ্চল আছে? কি কি? কোন্ অঞ্চলের কার্যালয় কোথায়? নিম্নলিখিত রেলপথগুলির কোন্টি দেশের কোন্ কোন্ রাজ্যে অধিক বিস্তৃত? নর্দান রেলওয়ে, সেন্ট্রাল রেলওয়ে, সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ে, নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে ও ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে। দেশের কয়লাখনি অঞ্চলে কোন্ রেলপথ বিস্তৃত? কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্যন্ত এবং কলিকাতা হইতে নাগপুর পর্যন্ত যাইতে কোন্ কোন্ রেলওয়ে পড়ে? কলিকাতা হইতে বোম্বাই (নাগপুর হইয়া) এবং কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ যাইতে হইলে কোন্ কোন্ রেলওয়ে অঞ্চলের উপর দিয়া যাইতে হয়? দেশে পাটশিল্প, চা শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রধান অঞ্চল কোন্ কোন্ রেলপথে অবস্থিত? দেশের কোন্ কোন্ অংশ রেলপথের সুযোগ হইতে বঞ্চিত? ৭। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের কতটুকু নৌপথে যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হয়? আমাদের অধিকাংশ চা কিভাবে কলিকাতায় আসে? দুর্গাপুর ত্রিবেণী খালদ্বারা পশ্চিমবঙ্গের কি উপকার হইতে পারে? এদেশের কোন্ কোন্ অংশে উপকূল বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ? এদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে কোন্ বন্দরের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক? এবিষয়ে কলিকাতা বন্দরের অসুবিধার কারণ কি? এদেশে আর কোন কোন প্রধান শ্রেণীর বন্দর আছে? ৮। এদেশের অসামরিক বিমানপোত পরিচালনা করেন কাহারা? বিমানপথে দেশের মধ্যে ও বিদেশে যাতায়াত সম্পর্কে কি ব্যবস্থা প্রচলিত? এদেশে কয়টি আন্তর্জাতিক বিমানস্টেশন আছে? কি কি? যে সকল আন্তর্জাতিক বিমান কোম্পানির বিমানপোত নিয়মিতভাবে এদেশের প্রধান বিমানস্টেশনে যাতায়াত করে, তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৫টির নাম লিখ। এদেশে ডাকের চিঠিপত্র পরিবহন সম্পর্কে বিমানপথের ভূমিকা কিরূপ?

একাদশ অধ্যায়

পৃথিবীতে জনসংখ্যার বণ্টন

পৃথিবীর বর্তমান (১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে) জনসংখ্যা প্রায় ৪০০ কোটি। মাত্র ১৫ বৎসর আগে (১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে) এই সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০ কোটি। পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যার অর্ধেকের অধিক বাস করেন এশিয়ার দক্ষিণপূর্ব অংশে। অধিক লোকবসতির দ্বিতীয় অঞ্চল ইউরোপের পশ্চিম ও মধ্য অংশ, তৃতীয় অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরপূর্ব অংশ এবং চতুর্থ অঞ্চল সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের পশ্চিম অংশ।

পৃথিবীর **বিভিন্ন মহাদেশের** আয়তন* ও বর্তমান (১৯৭৪-৭৫) **লোকসংখ্যা** মোটামুটি হিসাবে নিম্নরূপ :—

মহাদেশ	আয়তন (কোটি বর্গ কিমি)	পৃথিবীর মোট স্থলভাগের কত অংশ	লোকসংখ্যা (কোটি)	পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার কত অংশ
এশিয়া	৪·৩৫	৩০%	২৩০	প্রায় ৫৮%
আফ্রিকা	২·৯৪	২০%	৩০	" ৮%
উত্তর আমেরিকা	২·৩	১৬%	৩৩	" ৮%
দক্ষিণ আমেরিকা	১·৮	১২%	২০	" ৫%
ইউরোপ	০·৯৯	৭%	৮০	" ২০%
ওশিয়ানিয়া	০·৭৭	৫%	১·৬	" ০·৪%

লোকবসতি হিসাবে **এশিয়ার** স্থান পৃথিবীতে বরাবর **প্রথম**। বর্তমানে এই মহাদেশে বাস করেন পৃথিবীর প্রায় ৫৮% লোক, অথচ এখানকার ভূভাগের আয়তন পৃথিবীর মোট স্থলভাগের মাত্র ৩০%। এ বিষয়ে আরও বৈশিষ্ট্য এই যে এই মহাদেশের **দক্ষিণপূর্ব** অংশে (পৃথিবীর মোট স্থলভাগের মাত্র ৫% স্থানে) বাস করেন পৃথিবীর **অর্ধেকের অধিক** মানুষ। এ বিষয়ে এখানকার উর্বর সমভূমি, কৃষির উপযোগী (মৌসুমী) জলবায়ু এবং সহজ যাতায়াত ব্যবস্থার প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানকার দেশসমূহের মধ্যে **চীনের** লোকসংখ্যা পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক (পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০%)। উপরিলিখিত বিভিন্ন বিষয়ে সুবিধার জন্য সেদেশেরও মাত্র ১৫-২০% স্থানে বাস করেন সেদেশের ৯০% মানুষ। সেদেশের বাকী

* অ্যান্টার্কটিকা, গ্রীনল্যাণ্ড ও অন্যান্য দ্বীপের আয়তন প্রায় ১৫ কোটি বর্গ কিমি, অর্থাৎ পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় ১০%

৮০% ভূমি উচ্চ পর্বত, মালভূমি বা মরুপ্রকৃতির জলবায়ু প্রভৃতি কারণে লোকবসতির পক্ষে প্রায় অযোগ্য। তারপর **ভারতের** জনসংখ্যা পৃথিবীর দেশসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় (পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১৪%)। এদেশের আয়তন চীনের তুলনায় অনেক কম। এখানকার উচ্চ পর্বত, মালভূমি প্রভৃতির আয়তনও কম। এদেশের প্রায় অর্ধেক ভূভাগে (উত্তর ভারতের সমভূমি ও উভয় উপকূলের সমভূমি) বাস করেন দেশের অধিকাংশ মানুষ। লোকবসতির ঘনত্ব হিসাবে এশিয়ার অন্তর্গত **বাংলাদেশের** উদাহরণ সমগ্র পৃথিবীতে দেশ হিসাবে অতুলনীয়। অবশ্য, পাশে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও প্রায় একই জাতীয়। আর কেরালা রাজ্যের লোক-বসতির ঘনত্ব ইহা অপেক্ষাও অধিক। এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে ইহাদের প্রায় **বিপরীত অবস্থা** (অর্থাৎ লোকবসতির ঘনত্ব অত্যন্ত কম) দেখা যায় ইরান ও ইরাকে (তথাকার মরুপ্রায় অবস্থার জন্য) এবং আফগানিস্থানে (তথাকার পার্বত্য ভূপ্রকৃতি ও শুষ্ক জলবায়ুর জন্য)।

লোকবসতি হিসাবে **ইউরোপের** বৈশিষ্ট্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মহাদেশে বাস করেন পৃথিবীর প্রায় ২০% মানুষ, অথচ এখানকার আয়তন মোট স্থলভাগের মাত্র ৭%। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে এই মহাদেশের পশ্চিম ও মধ্য অংশের ভূপ্রকৃতি (সমভূমি), নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, সহজ যাতায়াত ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রভাব খুব বেশী। **বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস** (এদেশের ২০% জোয়ারের সময় জলমগ্ন থাকে), **যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানী** প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলিতে লোকবসতির ঘনত্ব এই মহাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক। আর উত্তরপশ্চিম অংশের দেশগুলিতে তীব্র শীতল জলবায়ুর জন্য লোকবসতি সর্বাপেক্ষা কম। (সুইডেনে লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিমিতে মাত্র ২০।) এই সম্পর্কে **সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের** নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। এই দেশের আয়তন পৃথিবীতে দেশসমূহের মধ্যে প্রথম, অথচ দেশের উত্তর অংশের জলবায়ু তীব্র শীতল (তুন্দ্রা অঞ্চল) ও তাহার দক্ষিণে দেশের মধ্যভাগের বিস্তীর্ণ অংশ তৈগা অরণ্য অঞ্চল। (পৃথিবীর বৃহত্তম সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি।) ফলে, এদেশের অধিকাংশ (৮০%) লোক বাস করেন দেশের পশ্চিম (ইউরোপীয়) অংশে।

উত্তর আমেরিকা ও আফ্রিকার প্রত্যেকের আয়তন মোট স্থলভাগের ১৬-২০%, অথচ ইহাদের প্রত্যেকটিতে বাস করেন মোট জনসংখ্যার মাত্র ৮%। **আফ্রিকার** ভূপ্রকৃতি (অধিকাংশ মালভূমি), বিরাট মরুভূমি, গহন বন প্রভৃতি এরূপ অবস্থার জন্য দায়ী। এই মহাদেশের একমাত্র **মিশরে** নীলনদের উপত্যকা ও বদ্বীপে এবং পশ্চিমে

নাইজেরিয়ার আর্দ্র সমভূমি অংশে লোকবসতি অধিক। অপরদিকে **লিবিয়া** ও **দক্ষিণপশ্চিম আফ্রিকার** বহুস্থান মরুপ্রকৃতির জলবায়ুর জন্য প্রায় জনহীন।

উত্তর আমেরিকার ক্যানাডা তীব্র শীতল জলবায়ু, পার্বত্য ভূপ্রকৃতি ও সরলবর্গীয় বৃক্ষের বিরাট বনভূমির জন্য লোকবসতির পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক। সেদেশের অধিকাংশ লোক বাস করেন দেশের দক্ষিণপূর্ব অংশে। **যুক্তরাষ্ট্রের** সর্বাপেক্ষা অধিক লোক বাস করেন সে দেশের উত্তর ও উত্তরপূর্ব অংশে এবং দেশের বিভিন্ন উপকূল অঞ্চলে। সে দেশের পশ্চিমদিকের বিরাট অংশ পার্বত্য ভূমির জন্য লোকবসতির পক্ষে অযোগ্য।

দক্ষিণ আমেরিকার আয়তন মোট স্থলভাগের ১২%, অথচ তথায় বাস করেন পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫%। তথায় ভূ-প্রকৃতি হিসাবে অসুবিধা (উচ্চভূমি অথবা নিম্ন জলাভূমি), জলবায়ুর অসুবিধা (নিরক্ষীয় জলবায়ু, মরুপ্রায় জলবায়ু), যাতায়াতের অসুবিধা, গভীর বন (পৃথিবীর গভীরতম নিরক্ষীয় অরণ্য) প্রভৃতি এপ্রকার অবস্থার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী। বস্তুতঃ এই মহাদেশের অন্তর্গত **কোন দেশেরই** লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিমিতে গড়ে ২০।২১ জনের বেশী নহে। অথচ এশিয়ার একটি মাত্র দেশ (ইরান) ভিন্ন আর কোথাও লোকবসতি সম্পর্কে এরূপ দুরবস্থা দেখা যায় না।

অস্ট্রেলিয়ার আয়তন কম (পৃথিবীর মোট ভূ-ভাগের প্রায় ৪%)। তার উপর দেশের অধিকাংশ মরুপ্রায় ভূমি। ফলে, এখানকার লোকবসতি অতি তুচ্ছ (পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ০·৪% এর কম)। পাশের **নিউ জীল্যাণ্ডের** জলবায়ু অপেক্ষাকৃত ভাল বলিয়া এখানকার লোকবসতির ঘনত্ব তুলনামূলক ভাবে কিছু বেশী।

পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের অন্তর্গত **প্রধান দেশগুলির** লোকসংখ্যা * ও লোকবসতির ঘনত্ব নিম্নে দেওয়া গেল।

এশিয়া

দেশ	লোকসংখ্যা (লক্ষ)	লোকবসতির ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমিতে)	দেশ	লোকসংখ্যা (লক্ষ)	লোকবসতির ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমিতে)
ভারত	৫৫০০	১৭৮	ভিয়েটনাম সমাজ-তান্ত্রিক দেশ	৩৮৩	১১৯
চীন	৭৮৭২	৮২			
জাপান	১০৫০	২৮২	ইরান	৩০০	১৯

* ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ বা তাহার পরবর্তী সময়ের হিসাব অনুসারে।

দেশ	লোকসংখ্যা (লক্ষ)	লোকবসতির ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমিতে)	দেশ	লোকসংখ্যা (লক্ষ)	লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি) বর্গ কিমিতে)
ইন্দোনেশিয়া	১২৭৭	৬৭	ইরাক	৯৫	২২
বাংলাদেশ	৭৫০	৫৩০	পাকিস্তান	৪৩০	৫৪
ব্রহ্ম যুক্তরাষ্ট্র	২৮৯	৪৩	তুরস্ক	৩৫৭	৪৭
কোরিয়া উত্তর	১৪৩	১২০	আফগানিস্থান	১৬৯	২৫
কোরিয়া দক্ষিণ	৩১৫	৩২০	শ্রীলঙ্কা	১২৭	১৯৬
মালয়েশিয়া	১০৮	৩৩	নেপাল	১০০	৭২

ইউরোপ

দেশ	লোকসংখ্যা (লক্ষ)	লোকবসতির ঘনত্ব	দেশ	লোকসংখ্যা (লক্ষ)	লোকবসতির ঘনত্ব
যুক্তরাজ্য	৫৩৮	২৩৪	চেকোশ্লোভাকিয়া	১৪৪	১১২
ফ্রান্স	৫১৫	৯৪	অস্ট্রিয়া	৭৫	৮৯
বেলজিয়াম	৯৭	৩২৩	হাঙ্গারী	১০৪	১১২
নেদারল্যাণ্ডস	১৩৩	৩৯৪	ইটালি	৫৪০	১৭৯
জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক বা পশ্চিম জার্মানী	৬১৫	২৪৭	পোল্যাণ্ড	৩২৯	১০৫
			গ্রীস	৮৮	৬৮
জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক বা পূর্ব জার্মানী	১৭০	১৫৮	স্পেন	৩৩৮	৭০
			পর্তুগাল	৮৭	৯৬
সুইডেন	৮১	২০	রোমানিয়া	২০৫	৮৬
যুগোশ্লাভিয়া	২০৩	৮০	বুলগেরিয়া	৮৫	৭৭
			সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র	২৪৬৩	১১

উত্তর আমেরিকা

দেশ	লোকসংখ্যা (লক্ষ)	লোকবসতির ঘনত্ব	দেশ	লোকসংখ্যা (লক্ষ)	লোকবসতির ঘনত্ব
যুক্তরাষ্ট্র	২০৩২	২৩	মেক্সিকো	৪৮২	২৫
ক্যানাডা	২১৬	২			

আফ্রিকা

দেশ	লোকসংখ্যা (লক্ষ)	লোকবসতির ঘনত্ব	দেশ	লোকসংখ্যা (লক্ষ)	লোকবসতির ঘনত্ব
মিশর	৩৩৭	৩৩	ইথিওপিয়া	২৪৩	২৪
সুদান	১৫৫	৬	কেনিয়া	১১৫	১৯

দেশ	লোকসংখ্যা (লক্ষ)	লোকবসতির ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমিতে)	দেশ	লোকসংখ্যা (লক্ষ)	লোকবসতির ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমিতে
লিবিয়া	২০	১.২	ট্যাঞ্জানিয়া	১২২	৮৮
য়্যালজিরিয়া	২৩	৭	জাইরে (কঙ্গোগণতন্ত্র)	২৩৩	১০
মরক্কো	১৫৪	৩৪	মোসাম্বিক	৮২	১১
নাইজেরিয়া	৬০০	১৬০	মালাগাসি	৭৬	১৩
য়্যাঙ্গোলা	৫৭	৫	জাম্বিয়া	৪০	৫
দক্ষিণপশ্চিম আফ্রিকা	৮	১	দক্ষিণ আফ্রিকা গণতন্ত্র	২১৪	১৮
রোডেশিয়া	৫৮	১৫	সোমালি গণতন্ত্র	২৯	৪

দক্ষিণ আমেরিকা

দেশ	লোকসংখ্যা (লক্ষ)	লোকবসতির ঘনত্ব	দেশ	লোকসংখ্যা (লক্ষ)	লোকবসতির ঘনত্ব
ব্রেজিল	৯৪৫	১১	পেরু	১৩৬	১৪
আর্জেন্টিনা	২৩৫	৮	বলিভিয়া	৫০	৫
চিলি	১০০	১৪	প্যারাগুয়ে	১৩	৬
ভেনিজুয়েলা	১০৮	১২	উরুগুয়ে	২৮	১৫
কলম্বিয়া	২৩২	২১	ইকোয়েডর	৬০	১৪

ওশিয়ানিয়া

দেশ	লোকসংখ্যা (লক্ষ)	লোকবসতির ঘনত্ব	দেশ	লোকসংখ্যা (লক্ষ)	লোকবসতির ঘনত্ব
অস্ট্রেলিয়া	১৩০	১৭	নিউ জীল্যাণ্ড	২৯	১১

আদর্শ লোকবসতি—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকসংখ্যা ও লোকবসতির ঘনত্ব সম্পর্কে দেখা যায় অসামান্য পার্থক্য। এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ, জাপান, ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতির লোকবসতির **ঘনত্ব** অত্যন্ত **বেশী**। কাজেই এসকল দেশের লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিলে লোকের বসতি সম্বন্ধে স্থানাভাব এবং জীবিকা অর্জন সম্পর্কে উপযুক্ত সুযোগের অভাব অনিবার্য। আমাদের ভারত এবং ইউরোপের আরও অনেক দেশেরও যে সকল অংশে লোকবসতি অতিনিবিড়, তথায়ও এইরূপ

সমস্যা ক্রমশঃ অধিকতর জটিল বা কঠিন হইতে বাধ্য। অপর দিকে উত্তর আমেরিকা, ওশিয়ানিয়ার অষ্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশে লোক-সংখ্যা ও লোকবসতির ঘনত্ব এত কম যে তথায় উপযুক্ত সংখ্যক লোকের অভাবে বর্তমানে দেশের সকল প্রকার সম্পদের প্রয়োজনমত সদ্ব্যবহার ও অর্থ নৈতিক উন্নতি সম্ভবপর নহে।

প্রায় পরস্পর বিপরীত এই দুই অবস্থার মধ্য অবস্থা, অর্থাৎ যে দেশ বা স্থানের লোকসংখ্যা তথাকার যাবতীয় সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের পক্ষে আদর্শস্থানীয় (বেশী বা কম নহে), তথাকার **লোকবসতি আদর্শ স্থানীয়** (Optimum population) বলা হয়। অবশ্য যে-কোন স্থান বা দেশের **উন্নতির আদর্শ অবস্থা** (Optimum condition) কেবল তথাকার জনসংখ্যা বা লোকবসতির ঘনত্বের উপর নির্ভর করে না। এ সম্বন্ধে দেশের বা অঞ্চলের প্রাকৃতিক অবস্থা (ভূপ্রকৃতি, নদনদী, মৃত্তিকা, জলবায়ু প্রভৃতি), মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জীবিকা অর্জনের সুযোগ (কৃষি, খনিজ ও অন্যান্য সম্পদ সংগ্রহ, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি), যাতায়াত ও পরিবহন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাবও যথেষ্ট।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এক দেশেরও বিভিন্ন অংশের মধ্যে এ সকল বিষয়ে পার্থক্য প্রচুর। সেজন্য এ সকল স্থানের অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতির সুযোগ সম্পর্কেও পার্থক্য খুব বেশী। আবার যে সকল স্থানে উন্নতির সুযোগ অধিক, তাহাদের মধ্যে অনেক জায়গাতে লোকসংখ্যা আর বেশী বৃদ্ধি প্রায় অসম্ভব। তাই এসকল বিষয়ে সমস্যাও অনেক। কেবলমাত্র স্থানীয় ভাবে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নহে। সমগ্র পৃথিবীর পক্ষেই এরূপ সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। কারণ, অনেক বিষয়েই বিভিন্ন দেশের পক্ষে **সমষ্টিগত ভাবে সমাধান** প্রয়োজন। এখানে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে **সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ** (United Nations Organisation) সংগ্রামের ভিত্তিতে দারিদ্র্য ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া চলিয়াছে। বস্তুতঃ পৃথিবীর বহু দেশের লোক এই সংস্থার মাধ্যমে মানবসমাজের স্বাস্থ্যের উন্নতি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, তাহাদের জন্য অধিক খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ও তাহাদের সুষম বণ্টন ও পরিবহনের জন্য সচেষ্ট। এভাবে নানা বিষয়ে সহযোগিতার দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের অর্থ নৈতিক উন্নতি ও সুখ স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থার জন্য আরও বেশী চেষ্টা ও সহযোগিতা আবশ্যক।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি—আমাদের প্রত্যেকের পরিচিত বিভিন্ন পরিবারের উদাহরণ হইতে আমরা সহজেই লক্ষ্য করিতে পারি কিভাবে পরিবারের

জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। পৃথিবীর সর্বত্র এই অবস্থা চলিতেছে। **পৃথিবীর জনসংখ্যা** সম্পর্কে গত ৩২৫ বৎসরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোটি হিসাবে) নিম্নে দেওয়া গেল।

মহাদেশ	১৬৫০ খ্রীঃ	১৭৫০ খ্রীঃ	১৮০০ খ্রীঃ	১৯০০ খ্রীঃ	১৯৭০ খ্রীঃ
এশিয়া	৩৩	৪৮	৬০	৯৪	২৩০
ইউরোপ	১০	১৪	১৯	৪০	৮০
আফ্রিকা	১০	১০	৯	১২	৩০
উত্তর আমেরিকা	০·১	০·১	০,৬	৮	৩৩
দক্ষিণ আমেরিকা	১	১	২	৬	২০
ওশিয়ানিয়া	০·২	০·২	০·২	০·৬	১·৬
মোট—	৫৫	৭৩	৯২	১৬১	৩৯৫

উপরের বিবরণ হইতে লক্ষ্য করা যায় যে ১০০ বৎসরে (১৬৫০-১৭৫০ মধ্যবর্তী) পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ৩৩% বৃদ্ধি হইয়াছে। তখন **এশিয়া** মহাদেশে লোক বাড়িয়াছে সবচেয়ে বেশী (৫০%) তারপরই **ইউরোপে** (৪ %)। অন্যান্য মহাদেশ-গুলিতে তখন লোক বৃদ্ধির পরিমান মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। প্রধানতঃ লোকের অভাব বশতঃ তখন ঐ সকল মহাদেশের নানাপ্রকার সম্পদ প্রায় অজ্ঞাত বা নিরপেক্ষ সামগ্রী ছিল। তথায় আর্থিক উন্নতির সুযোগের বিষয়ও অজানা ছিল। তাহার পরবর্তী ৫০ বৎসরে (১৭৫০ ১৮০০) পৃথিবীর লোকসংখ্যা বড়িয়াছে ২৫%। এশিয়া এবং ইউরোপ—এই দুই মহাদেশেই তখনকার লোক বৃদ্ধির হার প্রায় ঐ জাতীয় (২৫%)। কিন্তু **উত্তর আমেরিকাতে** তখন লোক বাড়িয়াছে ৫ গুণ, আর **দক্ষিণ আমেরিকাতে** দ্বিগুণ। যদিও এই দুই মহাদেশের তখনকার লোকসংখ্যা ছিল খুব কম, তবু তখনকার লোক বৃদ্ধির হার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওশিয়ানিয়াতে তখনও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি নগণ্য। অপরদিকে আফ্রিকাতে তখন লোকসংখ্যা কিছু (প্রায় ১০%) হ্রাস পাইয়াছে।

ইহার পরবর্তী ১০০ বৎসরে (১৮০০-১৯০০) পৃথিবীর লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে প্রায় ৭০%। ঐ সময় **এশিয়ার** লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে ঐ অনুপাতে কম (৫৭%), কিন্তু **ইউরোপে** বাড়িয়াছে অনেক বেশী (১১০% এর অধিক)। **উত্তর আমেরিকাতে** তখনকার লোকসংখ্যা **বৃদ্ধির** হার **অস্বাভাবিক** (১২ গুণের অধিক)। ঐ সময়ে উত্তর আমেরিকার, বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা ও সুযোগ

ইউরোপীয় জনসমাজকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। ঐ সময়ে (১৮০০-১৯০০) **দক্ষিণ আমেরিকাতে ও ওশিয়ানিয়াতে** লোকবৃদ্ধি হইয়াছে দ্বিগুণ। এমন কি, আফ্রিকাতেও তখনকার লোকবৃদ্ধির হার মধ্যম (৩৩%)। ইহার পরবর্তী ৭৫ বৎসরে (১৯৭০-১৯৭৫) পৃথিবীতে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে ১৫০%। এই সময় **এশিয়া, আফ্রিকাতে ও ওশিয়ানিয়াতে** লোকবৃদ্ধির হার প্রায় ঐ জাতীয় (১৫০%)। **ইউরোপে** তখনকার লোকবৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে কম (১০০%)। **উত্তর আমেরিকাতে** তখনকার লোকবৃদ্ধির হার তিনগুণ, **দক্ষিণ আমেরিকাতে** প্রায় আড়াই গুণ। ইহার প্রধান কারণ তখনও এই দুই মহাদেশের বিভিন্ন অংশে নূতন সম্পদের আবিষ্কার ও অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতির সুযোগ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে উপরিলিখিত হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে নানা বিষয়ের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ কতকগুলি বিষয় **জনসংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক।** যেমন, বিবাহ ও জন্মের হার বৃদ্ধি, অন্য স্থান হইতে জন সমাগম, জীবিকা অর্জন ও আর্থিক বিষয়ে উন্নতির সুযোগ, সামাজিক নিরাপত্তা, মানসিক শান্তি, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, প্রয়োজনীয় আহার ও বিশ্রাম প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার ফলে দীর্ঘ জীবন লাভ ইত্যাদি কারণে যে-কোন স্থানের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়। অপর কতকগুলি বিষয় **জনসংখ্যা হ্রাসের বা কমের** পক্ষে উপযোগী। যেমন, দেশত্যাগ, উপযুক্ত কাজের অভাব বা অন্য কারণে জীবিকা অর্জনের পক্ষে অসুবিধা ও আর্থিক উন্নতির পক্ষে বাধা, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব প্রভৃতি কারণে লোকসংখ্যা হ্রাস পায়। তারপর রোগ, প্রাকৃতিক বিপদ প্রভৃতি কারণে মৃত্যুর হার স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় বৃদ্ধি হয়। এই দ্বিতীয় প্রকার কারণগুলি যাহাতে প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক।

১৬৫০-১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং ওশিয়ানিয়াতে **জনসংখ্যা** প্রায় **স্থির** (Static) ছিল এবং এশিয়া ও ইউরোপেও ৪০-৪৫%-এর বেশী বৃদ্ধি হয় নাই। কিন্তু ইহার পরবর্তী ৫০ বৎসরে (১৭৫০-১৮০০ খ্রীঃ) জনসংখ্যা কোথাও ২৫%-এর কম বাড়ে নাই, বরং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতে ২ হইতে ৫ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ ১৭৬৯ খ্রীঃ স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কার ও অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়। আর উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতে (নূতন মহাদেশ) নূতন নূতন সম্পদের বিবরণ, জীবিকা অর্জন ও আর্থিক অবস্থার উন্নতির সুযোগ প্রভৃতি বিষয় মানুষকে সেদিকে আকৃষ্ট করে। ইহার

পর হইতে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকাতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে দ্রুত উন্নতির ফলে লোকসংখ্যা অসামান্য ভাবে বাড়িয়াছে (ইউরোপে ১৮০০-১৯০০ খ্রীঃ ১১০% এবং ১৯০০—১৯৭০-৭৫ খ্রীঃ ১০০%)। উত্তর আমেরিকাতে ঐ সময় লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশী (১৮০০-১৯০০ খ্রীঃ ১২ গুণের বেশী, ১৯০০-১৯৭০-৭৫ খ্রীঃ ৩ গুণ)। দক্ষিণ আমেরিকাতে এবং ওশিয়ানিয়াতেও ঐ সময়ে লোকসংখ্যা দ্রুত বাড়িয়াছে (১৮০০-১৯০০ খ্রীঃ দ্বিগুণ এবং ১৯০০—১৯৭০-৭৫ খ্রীঃ ১½-২½ গুণ)। এমন কি এশিয়া ও আফ্রিকাতেও ১৯০০—১৯৭০-৭৫ খ্রীঃ লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে দেড় গুণ।

জনসংখ্য বৃদ্ধির সমস্যা—সমগ্র পৃথিবীতে এভাবে **লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দিকে প্রবণতা** সকলের পক্ষেই **দুশ্চিন্তার** কারণ। লোকসংখ্যা উপরিলিখিত হারে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে সমগ্র পৃথিবীতেই ভবিষ্যতে লোকের বসতি ও জীবিকা অর্জন সম্বন্ধে এমন অসুবিধার সৃষ্টি হইবে যে তাহার প্রতিকার করা সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ। এজন্য লোকসংখ্যা যাহাতে এভাবে বাড়িয়া না চলে, তাহার জন্য সকল দেশের পক্ষেই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে সরকারী নিয়ম ও আইনের সাহায্যও প্রয়োজন। তবে কেবল সরকারী ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিকার সম্ভব নয়। **সামাজিক ব্যবস্থাও** বিশেষ প্রয়োজন। এজন্য লোকের মধ্যে **জন্ম নিয়ন্ত্রণের** ও **পরিবার পরিকল্পনার** আবশ্যকতা ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে **শিক্ষার** প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। মানুষ যাহাতে **স্বেচ্ছায়** এসকল নিয়ম মানিয়া চলেন তাহার ব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজন।

অনুশীলনী

১। পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশী? এরূপ পাঁচটি দেশের নাম ও বর্তমান (১৯৭১-৭৫) লোকসংখ্যা লিখ। ২। পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি কিরূপ? কোন্ কোন্ মহাদেশে গত ১০০ বৎসরে অধিক সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়? এই প্রবণতা রোধ করা কেন প্রয়োজন? কি ভাবে তাহা রোধ করা যায়?

দ্বাদশ অধ্যায়

লোকবসতি

লোকবসতির পার্থক্য—পূর্বের (একাদশ) অধ্যায়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং পৃথিবীর কতক দেশের লোকসংখ্যা ও তাহাদের বণ্টনের বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থানের মধ্যে এবিষয়ে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা গিয়াছে। আবার যে-কোন রাজ্যের মধ্যেও এবিষয়ে পার্থক্য প্রচুর। নিম্নে পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ উল্লেখ করা গেল।

জেলা	১৯৭১ সেন্সাস অনুসারে লোকসংখ্যা (লক্ষ) ও (ঐ অনুসারে স্থান)	আয়তন (হাজার কিমি)ও (ঐ অনুসারে স্থান)	লোকবসতি (প্রতিবর্গ কিমিতে) (ঐ অনুসারে স্থান)
২৪পরগনা	৮৪.৫ (১)	১৩.৮ (১)	৬১২ (৪)
মেদিনীপুর	৫৫.১ (২)	১৩.৭ (২)	৪০২ (১০)
বর্ধমান	৩৯.২ (৩)	৭.০ (৩)	৫৬০ (৬)
কলিকাতা	৩১.৫ (৪)	০.১ (১৬)	৩১,৫০০ (১)
মুর্শিদাবাদ	২৯.৪ (৫)	৫.৩ (৭)	৫৫৫ (৭)
হুগলি	২৮.৭ (৬)	৩.১ (১৩)	৯২৬ (৩)
হাওড়া	২৪.২ (৭)	১.৫ (১৫)	১৬১৩ (২)
নদীয়া	২২.৩ (৮)	৩.৯ (১০)	৫৭২ (৫)
বাঁকুড়া	২০.৩ (৯)	৬.৯ (৪)	২৯৪ (১৩)
পশ্চিম দিনাজপুর	১৮.৬ (১০)	৫.২ (৮)	৩৫৮ (১২)
বীরভূম	১৭.৮ (১১)	৪.৫ (৯)	৩৬৯ (১১)
জলপাইগুড়ি	১৭.৫ (১২)	৬.২ (৬)	২৮২ (১৪)
মালদহ	১৬.১ (১৩)	৩.৭ (১১)	৪৩৫ (৮)
পুরুলিয়া	১৬.০ (১৪)	৬.৩ (৫)	২৫৪ (১৫)
কোচবিহার	১৪.১ (১৫)	৩.৪ (১২)	৪১৫ (৯)
দার্জিলিং	৭.৮ (১৬)	৩.১ (১৩)	২৫১ (১৬)

উপরিলিখিত হিসাব অনুসারে ইহা বুঝা যায় যে এই রাজ্যের ১৬টি জেলার মধ্যে কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও দার্জিলিং এই তিন জেলাতে জেলার আয়তন, লোকসংখ্যা ও লোকবসতির ঘনত্ব সম্পর্কে স্থানের (position) মোটামুটি মিল আছে। বাকী ১৩টি জেলাতে এই তিন বিষয়ে মিলের অভাব। বরং কয়েকটি ক্ষেত্রে অমিল

নিতান্ত অস্বাভাবিক রকমের। যেমন, জেলা হিসাবে কলিকাতার আয়তন সবচেয়ে কম (বৃহত্তম জেলা ২৪পরগনার প্রায় ১৩০ ভাগের এক ভাগ, এমন কি এই রাজ্যের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম জেলা হাওড়ারও ১৫ ভাগের এক ভাগ)। অথচ লোকবসতির ঘনত্ব হিসাবে কলিকাতার স্থান সকলের উপরে (২৪ পরগনা জেলার ৫০ গুণের বেশী, হাওড়া জেলারও প্রায় ২০ গুণ।)

বিভিন্ন জেলার পৃথক্ পৃথক্ অংশের মধ্যেও পার্থক্য অত্যন্ত বেশী। এমন কি, এই রাজ্যের ক্ষুদ্রতম জেলা কলিকাতার বিভিন্ন অংশের মধ্যেও পার্থক্য প্রচুর। মধ্য কলিকাতার (প্রাচীন কলিকাতা) [পূর্বদিকে শিয়ালদহ হইতে পশ্চিমে হুগলি নদী এবং উত্তরে মহাত্মা গান্ধী (হ্যারিসন) রোড হইতে দক্ষিণে ধর্মতলা রোড এলাকার] বসতির ঘনত্ব এখনও সর্বাপেক্ষা অধিক। এই মহানগরার উত্তর ও দক্ষিণদিকে ক্রমশঃ অধিক প্রসারের ফলে এ সকল অংশে লোকসংখ্যা পূর্বের তুলনায় ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। তবে এখনও নূতন এলাকাসমূহে লোকবসতির ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত কম। ২৪ পরগনা জিলার বিভিন্ন অংশের মধ্যে এই পার্থক্য অনেক বেশী। যেমন, আলিপুর (সদর মহকুমা) অঞ্চলের লোকবসতি সবচেয়ে বেশী (হাওড়া জেলার চেয়েও বেশী)। অথচ দক্ষিণে সুন্দরবন এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখনও প্রায় জনহীন।

পার্থক্যের কারণ—বিভিন্ন স্থানের লোকবসতির এপ্রকার পার্থক্য সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের প্রভাব সুস্পষ্ট। জনবসতির **হ্রাস-বৃদ্ধি** সম্পর্কে কোন **একটি** কারণ কখন কখন খুব **প্রবল** বা **প্রধান** হইলেও সাধারণতঃ একাধিক বা **বহু কারণের প্রভাবই** অধিক। ইহাদের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(ক) **প্রাকৃতিক কারণ**—ভূপৃষ্ঠে আদি মানুষের বসবাসের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত লোকবসতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিষয়ের প্রত্যক্ষ ও গৌণ, উভয় প্রকার সম্বন্ধ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। প্রাকৃতিক বিষয়সমূহের মধ্যে যে-কোন স্থানের ভৌগোলিক অবস্থিতি, ভূপ্রকৃতি, ভূগঠন (শিলা ও মৃত্তিকা), নদনদী, জলবায়ু, জল প্রাপ্তির সুযোগ, বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ (উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদ), যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে-কোন অংশেই এসকল বিষয়ের প্রভাবে মানুষের বসতি সম্বন্ধে বিস্তর পার্থক্য সুস্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশে সুন্দরবন, উত্তর অংশে দার্জিলিঙের পার্বত্য ভূমি, ভারতের উত্তর অংশে হিমালয় অঞ্চল, এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার উত্তর অংশে তুন্দ্রা অঞ্চল, দক্ষিণ আমেরিকার ও আফ্রিকার মধ্যভাগে গভীর অরণ্য অঞ্চল, আফ্রিকার উত্তর অংশে সাহারা মরু অঞ্চল প্রভৃতির উদাহরণ এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। আবার

উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় সমভূমি, এদেশের দক্ষিণে উপকূলের সমভূমি, ইউরোপের পশ্চিম অংশের সমভূমি প্রভৃতির নামও উপরিলিখিত বিষয়ে বিশেষ উদাহরণ হিসাবে গণ্য।

(খ) **অর্থনৈতিক কারণ**—লোকবসতির সহিত মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সুযোগ সুবিধার সম্পর্ক সর্বদাই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তবে পূর্বকালের তুলনায় বর্তমানে অর্থনৈতিক বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রভাব ক্রমশঃ অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। অবশ্য তৃণভূমি অঞ্চল ও বন অঞ্চলের তুলনায় কৃষি অঞ্চলে ও খনি অঞ্চলেই জীবিকা অর্জনের ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সুযোগ অধিক। সুতরাং **বনভূমির** ও **তৃণভূমির** আশপাশের তুলনায় **কৃষি অঞ্চল** ও **খনি অঞ্চলে** লোকবসতি অধিক। **শিল্পকেন্দ্র, শহর, নগর** প্রভৃতি স্থানে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সুযোগ আরও বেশী। তাই এসকল স্থানে লোকবসতিও অনেক বেশী। পৃথিবীর যে-কোন অংশেই ইহার উদাহরণ দেখা যায়।

ভারতের প্রায় ৭০% লোক কৃষিজীবী এবং গ্রামের অধিবাসী। কিন্তু গ্রামের লোকবসতির ঘনত্বের তুলনায় শহর, নগর, শিল্পকেন্দ্র প্রভৃতির লোকবসতির ঘনত্ব বহুগুণ বেশী। বিশেষতঃ কলিকাতার প্রায় সমুদয় (৯৮%) উপার্জনক্ষম লোক ব্যবসা, বাণিজ্য, চাকুরি প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে জীবিকা অর্জন করেন। এখানকার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের সুযোগ পশ্চিমবঙ্গের অন্য সকল জায়গার তুলনায় অধিক। ফলে, এখানকার লোকবসতির ঘনত্ব প্রায় অস্বাভাবিক রকম বেশী। (প্রতি বর্গ কিমিতে গড়ে ৩০,০০০-এর অধিক, অথচ পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বর্গ কিমিতে গড়ে ৫০৪)।

(গ) **সামাজিক কারণ**—আগেকার দিনের তুলনায় এখন সামাজিক নিয়ম কানুন, বিধি ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এসকল পরিবর্তনের সহিত লোকবসতির সম্পর্ক যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ। পূর্বে অনেক দেশেই বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ফলে, লোকসংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধিরও সুযোগ ছিল। পৌরাণিক কাহিনী ও ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে এ বিষয় জানা যায়। অপরদিকে ইদানীং বহুবিবাহ, বাল্য বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক প্রথার বিলোপের ফলে জনসংখ্যা আগেকার মত বৃদ্ধির সুযোগ কম।

(ঘ) **শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কারণ**—পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র অজ্ঞতা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার প্রভৃতি ক্রমশঃ দূর হইয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি হইতেছে। বিশেষতঃ মানবসমাজের **স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, বিজ্ঞান** প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা ও **প্রযুক্তিবিদ্যার** ক্রমশঃ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে **সাংস্কৃতিক বিষয়েও** যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশ, এশিয়ার জাপান, আমাদের ভারত প্রভৃতি দেশে

এসকল বিষয়ে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জন্ম ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিশেষ প্রবণতা দেখা যাইতেছে। গ্রামের তুলনায় শহর, নগর, প্রধান শিল্পকেন্দ্র প্রভৃতি স্থানে এসকল বিষয়ের প্রভাব বেশী।

(ঙ) **রাজনৈতিক কারণ**—কোন কোন স্থানের লোকবসতি সম্পর্কে দেশের রাজনৈতিক প্রভাব খুব বেশী। আগেকার দিনে দেশের শাসনকর্তার নির্দেশে কখন কখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ দেওয়া হইত। এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে এসকল বিষয়ে সুবিধা দেওয়া হয়, আবার কখনও বা তাহার বিপরীত ব্যবস্থা করা হয়। যেমন, উত্তর আমেরিকার আবিষ্কারের পর ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশের বহু লোক তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য যাইতে আরম্ভ করেন। **যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা** ঘোষণার পর সে ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। **অস্ট্রেলিয়া** আবিষ্কারের পর ইংরেজগণ এখানে আসিতে আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ এখানে **অশ্বেতকায়ের প্রবেশ** ও স্থায়ীভাবে **বসবাস** নিষিদ্ধ হইয়াছে। ফলে, এখানকার লোকবসতি সম্পর্কে রাজনৈতিক প্রভাবের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। তারপর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা ও একই সঙ্গে নূতন পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির ফলে পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম দিকের অংশ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক ভারতে আসেন। ফলে, ভারতের পূর্ব অংশে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে ও পশ্চিম অংশে দিল্লী, পঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যে লোকবসতি হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রেও রাজনৈতিক প্রভাবের প্রাধান্য সুস্পষ্ট।

(চ) **ঐতিহাসিক কারণ**—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বহু ঐতিহাসিক বিষয়ও লোকবসতি সম্পর্কে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অতি প্রাচীন কালে **আর্যগণ আমাদের দেশে** আগমন করিয়া উত্তর ভারতে তাঁহাদের প্রথম বসতি স্থাপন করেন। পরে ধীরে ধীরে দেশের অন্যান্য অংশে বসতি বিস্তৃত হয়। পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে **শক, হুন, মঙ্গোল** প্রভৃতি জাতির লোক এদেশে **আগমন** করেন। তাহাদের মধ্যে অনেকের এদেশে স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপনের ফলে এদেশ **"মহামানবের মিলনস্থল"**। **উত্তর আমেরিকার** আদি অধিবাসী **রেড ইণ্ডিয়ানগণ** আজও তথাকার ইউরোপীয় বংশধরগণের তুলনায় অনুন্নত। আর **অস্ট্রেলিয়ার** আদি অধিবাসী **মাওরি জাতি** এখন সংখ্যায় নিতান্ত নগণ্য এবং অত্যন্ত অনুন্নত অবস্থায় সে দেশে বসবাস করেন।

(ছ) **আকস্মিক কারণ**—কখন কখন ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি আকস্মিক প্রাকৃতিক কারণেও কতক স্থানের লোকবসতির বিস্তর ক্ষতি হয়। কখন কখন কতক শহর, গ্রাম প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

লোকবসতির অঞ্চলসমূহের বৈশিষ্ট্য—বিভিন্ন স্থানের লোকবসতি, স্বাভাবিক

ভাবে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি, তাহাদের সামাজিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন অংশকে নিম্নলিখিত তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। ফলে, লোকবসতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তিনটি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

(ক) **প্রগতিশীল** (Dynamic) **অঞ্চল**—শিল্পকেন্দ্র, শহর, নগর, বন্দর প্রভৃতি ও আশপাশের কৃষি অঞ্চল এবং খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ স্থান এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এসকল স্থানের অধিকাংশ মানুষ শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়েও উন্নত। তাহাদের **আর্থিক অবস্থার উন্নতির সুযোগ অধিক** এবং লোকবসতি স্বভাবতঃ ঘন। এদেশের নিম্নলিখিত স্থানসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। যেমন, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, হরিয়ানা, পঞ্জাব, গুজরাটের অধিকাংশ, মহারাষ্ট্রের অধিকাংশ ও তামিলনাড়ু।

(খ) **সম্ভাবনাপূর্ণ** (Prospective) **অঞ্চল**—আমাদের দেশের বিস্তীর্ণ স্থান এই অঞ্চলের অন্তর্গত। বর্তমানে এখানকার লোকের প্রধান উপজীবিকা কৃষি ও বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প। তবে ভবিষ্যতে এসকল স্থানে বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য উপায়ে অর্থনৈতিক **উন্নতির সম্ভাবনা** খুব বেশী। দেশের উত্তরপূর্ব অংশে আসাম উপত্যকা, পশ্চিমে রাজস্থানের মধ্যভাগ হইতে পূর্বদিকে মধ্যভারত মালভূমি এবং দক্ষিণে উড়িষ্যা হইতে অন্ধ্র প্রদেশের প্রায় দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত মালভূমি অঞ্চল ও কর্ণাটকের মধ্য অংশ এখানকার অন্তর্গত।

(খ) **সমস্যাপূর্ণ** (Problematic) **অঞ্চল**—প্রাকৃতিক ও অন্যান্য কারণে নানা সমস্যার জন্য কতক অঞ্চলের খুব শীঘ্র অধিক উন্নতির সম্ভাবনা কম। এদেশের রাজস্থানের পশ্চিম অংশ, হিমালয় অঞ্চল প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

গ্রাম অঞ্চলের বসতি

পৃথিবীর যে-কোন দেশের **শহর, নগর ও গ্রাম অঞ্চলের** মধ্যে লোকের বসতি, জীবনধারা এবং নানাপ্রকার কাজকর্ম সম্বন্ধে **পার্থক্য** বিস্তর। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকাতে গ্রাম্য জীবন ও নাগরিক জীবনের মধ্যে পার্থক্য কম, আর এশিয়া ও আফ্রিকাতে পার্থক্য অধিক। বিশেষতঃ আমাদের দেশের ৭০% লোক গ্রাম অঞ্চলে বাস করেন। তাঁহাদের অধিকাংশের (৭০%) জীবিকা কৃষি ও নানাপ্রকার কুটীর শিল্প। সুতরাং ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক যে তাঁহারা কৃষিজমির আশপাশের সুবিধাজনক স্থানে ঘরবাড়ি তৈরী করিয়া বাস করেন। চাষের সর্বোৎকৃষ্ট জমিতে ঘরবাড়ি তৈরী করিলে কৃষিজ সম্পদের উৎপাদন কমিয়া যায়। আবার এরূপ চাষের জমি হইতে অধিক দূরে

বাস করিলে চাষের কাজের পক্ষে অসুবিধা হয়। এপ্রকার বিভিন্ন বিষয় এবং বসতি, যাতায়াত ও পরিবহন প্রভৃতি সংক্রান্ত সুবিধা বিবেচনা করিয়া অধিকাংশ গ্রাম্য বাড়ি তৈরী হয়। গ্রাম্য বসতি (Rural settlements) সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য।

ছড়ানো (Dispersed) **বসতি**—উপরিলিখিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাবে এদেশের বেশীর ভাগ গ্রাম্য লোকের বসতি বা ঘরবাড়ি **চাষের অঞ্চলের** বিভিন্ন অংশে **ছড়ানো** (Dispersed)। গ্রাম অঞ্চলে লোকের বসবাস সম্পর্কে এই নীতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও মোটামুটি হিসাবে লক্ষ্য করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে ও পশ্চিম ইউরোপের উন্নত দেশসমূহেও চাষের বিভিন্ন **খামার** (Agricultural Farms) এভাবে ছড়ানো। **তৃণভূমি অঞ্চলের** বসতি সম্পর্কেও এই ব্যবস্থাই সুস্পষ্ট। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের জনবসতি সম্পর্কিত মানচিত্র লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে **বসতি নির্দেশকারী বিন্দুগুলি** দেশের অধিকাংশ স্থানে **ছড়ানো** রহিয়াছে। অবশ্য লোকের বসতি সম্পর্কে প্রাকৃতিক সুবিধা ও জীবিকা অর্জন, যাতায়াত প্রভৃতি বিষয়ে সুযোগের পার্থক্য অনুসারে কোথাও বিন্দুগুলি অধিক **ঘন,** কোথাও বেশী **ফাঁকা** বা দূরে দূরে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে এরূপ বসতি ঘন, আর রাজস্থানে ও মধ্যভারতে ফাঁকা ফাঁকা।

রেখা অনুসারে (Linear) **বিস্তৃত বসতি**—মানুষের বসতি ও জীবিকা অর্জন, যাতায়াত প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণতঃ নদীর উপত্যকা অধিক সুবিধাজনক। তাহাছাড়া অপেক্ষাকৃত উন্নত অংশের (শহর, নগর, শিল্পকেন্দ্র প্রভৃতি) সকল দিকেই রাস্তা বা নদীর পাশে পাশে গ্রাম বা লোকের বসতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এরূপ ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায় দুইটি শিল্পকেন্দ্র, শহর বা নগরের মধ্যে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে তৈরী বিভিন্ন পথের পাশে পাশে। অনেক সময়ই এরূপ পথের ধারে লোকবসতি ও জীবিকা অর্জন, যাতায়াত প্রভৃতি বিষয়ে সুযোগ অধিক। ফলে,মানচিত্রে এরূপ বসতি এক একটি রেখা অনুসারে বিস্তৃত বলিয়া স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বদিকে এরূপ রেখা অধিকদূর বিস্তৃত, দক্ষিণে কম। দিল্লীকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকেই এরূপ রেখা বহুদূর বিস্তৃত। তাহাছাড়া গঙ্গা ও ইহার বিভিন্ন উপনদীর গতি অনুসারেও লোকবসতির রেখাগুলি সুস্পষ্ট।

পুঞ্জীভূত (Nucleated) **বসতি**—গ্রাম অঞ্চলের যে সকল স্থানে বসতি ও জীবিকা অর্জনের সুযোগ সর্বাপেক্ষা অধিক, এরূপ স্থানে বসতি সবচেয়ে বেশী ঘন বা পুঞ্জীভূত। এমন কি, অধিকাংশ গ্রামেরও কতক সুবিধাজনক অংশে বসতি অন্যান্য অংশের তুলনায়

অধিক। কতক ক্ষেত্রে এরূপ এক একটি অংশ এক একটি **শিল্পকে কেন্দ্র** করিয়া বড় হইয়া উঠে। সাধারণ চাষী ভিন্ন কুমার, কামার, তাঁতী প্রভৃতি গোষ্ঠীর লোকের এক একটী ছোট বা বড় পাড়া বা পল্লীও পশ্চিমবঙ্গের অনেক গ্রাম অঞ্চলে দেখা যায়। তারপর **বাণিজ্যকেন্দ্র** বা **'গঞ্জ'**, **বর্ধিষ্ণু** বা উন্নত **গ্রাম**, শিল্পকেন্দ্র প্রভৃতিকে **কেন্দ্র** করিয়া এরূপ পুঞ্জীভূত বসতির উদাহরণ সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম অংশ হইতে পশ্চিমদিকে রাজস্থান পর্যন্ত জলের **কূপকে কেন্দ্র** করিয়া পুঞ্জীভূত বসতির উদাহরণ বিস্তর।

শহর অঞ্চলের বসতি

গ্রাম অঞ্চলে বসতির জন্য মানুষ সাধারণতঃ বাসের উপযোগী ভূমি, স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, যাতায়াত ও পরিবহনের সুবিধা এবং সহজ উপায়ে জীবিকা অর্জন প্রভৃতি বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়া থাকে। বহু পূর্বে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র নিজেরাই উৎপন্ন করার জন্য বা স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের জন্য বিশেষ আগ্রাহী ছিল। সেজন্য তখন ব্যবসা-বাণিজ্য, যাতায়াত ও পরিবহন প্রভৃতির উপর কমই গুরুত্ব দেওয়া হইত। ক্রমশঃ অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হয়। আগে ধীরে পরিবর্তন হইত, আর এখন পরিবর্তন হইতেছে অতিদ্রুত। তাহার কারণও অনেক। তন্মধ্যে অতিদ্রুত হারে **ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি** (Population explosion) এবং তাহাদের নানাপ্রকার **চাহিদা পূরণ** সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এসকল কারণে এখন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র মানুষের মধ্যে **নগরমুখী মনোভাব** অত্যন্ত প্রবল। ইহার ফলে একদিকে **শহর, নগর** ও **বন্দরের সংখ্যা** ক্রমশঃ **বৃদ্ধি** হইতেছে। অন্যদিকে পুরানো ও আধুনিক সকল প্রকার শহর নগরেরই **ক্রমশঃ উন্নতি** হইতেছে। (কতক অতিপ্রাচীন নগর ইহার ব্যতিক্রম।)

শহর, নগরসমূহে লোকসংখ্যা (Urban settlements) **বৃদ্ধি** সম্পর্কে কতকগুলি **কারণ** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তন্মধ্যে **জীবিকা অর্জনের সুবিধা** সর্বপ্রধান। পৃথিবীতে অতিদ্রুত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষিকার্যের উপযোগী জমির উপর চাপ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। এখন আগেকার মত কেবলমাত্র কৃষিজ সম্পদ উৎপাদন করিয়া মানবগোষ্ঠীর ভরণ পোষণ সম্ভবপর নহে। কৃষিজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পও এখন আর যথোপযুক্ত নহে। তাই অন্য ভাবে জীবিকা অর্জনের উপর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। স্বভাবতঃ কৃষিজ, খনিজ ও অন্যান্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল **বৃহৎ শিল্পের** প্রাধান্য এবং তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত **দ্রুত**

যাতায়াত ও পরিবহন, ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি প্রভৃতির গুরুত্ব বাড়িতেছে। একারণে কৃষি অঞ্চল ও খনি অঞ্চলে এবং তাহাদের বাহিরে যাতায়াত ও পরিবহন ও অন্যান্য বিষয়ে (শ্রমিকও মূলধন সরবরাহ প্রভৃতি) সুবিধাজনক বহু স্থানে **শিল্পকেন্দ্র** গড়িয়া উঠিতেছে। যেমন, ছোটনাগপুর ও তাহার আশপাশে জামসেদপুর, বোকারো, দুর্গাপুর, বার্নপুর, রৌরকেল্লা ও ভিলাইতে স্থাপিত হইয়াছে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বৃহৎ কেন্দ্র। তারপর কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া ভাগীরথী-হুগলি নদীর পূর্ব ও পশ্চিম তীরে পাট, কার্পাস, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিল্পের কেন্দ্রসমূহের সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতিও ইহার সুস্পষ্ট উদাহরণ। ভারতের অন্যান্য অংশে দিল্লী, বোম্বাই, কানপুর, মাদ্রাজ প্রভৃতি নগরেও আছে এরূপ অনেক উদাহরণ। ফলে, এসকল স্থানে জীবিকা অর্জনের সুবিধার জন্য লোকবসতি খুব বেশী। পশ্চিম ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরপূর্ব অংশ প্রভৃতির উদাহরণও এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

শহর ও নগরসমূহের সৃষ্টি, ক্রমোন্নতি এবং তাহাদের লোকবসতি সম্পর্কে শিল্প ভিন্ন **অন্যান্য বিষয়েরও** যথেষ্ট **প্রভাব** দেখা যায়। **বাণিজ্যের** সুবিধার ফলেও অনেক স্থানে লোকবসতি খুব বেশী এবং এরূপ কতক স্থান শহর, নগরে পরিণত হয়। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের মত প্রধান নগরে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধার ফলে এই দুইটি নগর কেবলমাত্র প্রাদেশিক বা রাষ্ট্রীয় (পশ্চিমবঙ্গ বা মহারাষ্ট্রের) প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র নহে, এই দুইটি সমগ্র ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রধান কেন্দ্র। ফলে, এই দুই নগরে লোকবসতি খুব বেশী। এদেশের বিভিন্ন অংশের, এমন কি বিদেশের বহু ব্যবসায়ীও অনেক কাল এখানে বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন। এখন (ভারতের স্বাধীনতার পর) বিদেশের ব্যবসায়ীর সংখ্যা খুব কম।

যাতায়াত ও পরিবহন, রাজনৈতিক গুরুত্ব, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রাধান্য প্রভৃতি কারণেও বহু স্থান ক্রমশঃ শহর ও নগরে পরিণত হয়। তাই এসকল স্থানেও লোকবসতি ক্রমাগত বৃদ্ধি হয়। চণ্ডীগড়, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি নূতন শহর ইহার প্রধান উদাহরণ। এসকল স্থানে অল্প সময়ের মধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত উপরি-লিখিত কারণের সম্পর্ক অতিশয় স্পষ্ট।

বস্তুতঃ গ্রাম অঞ্চলের তুলনায় শহর ও নগরের উন্নতি ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে এসকল বিষয়ের প্রভাব এত বেশী যে অন্যান্য বহু বিষয়ে অসুবিধা উপেক্ষা করিয়াও শহর ও নগরে লোকবসতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। শহর, নগরে সাধারণতঃ গ্রামের মত সহজভাবে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে জলবায়ুও তেমন স্বাস্থ্যকর নয়। বসতির (ঘরবাড়ি তৈরীর) পক্ষে কখন কখন অসুবিধা প্রচুর। তবু প্রধানতঃ

জীবিকা অর্জনের সুবিধার জন্য শহর ও নগরে লোকবসতি খুব বেশী। অবশ্য শহর, নগরে **শিক্ষা, চিকিৎসা, আমোদপ্রমোদ** প্রভৃতি বিষয়ে সুবিধাও তথায় মানুষের ঘন বসতির পক্ষে প্রবল আকর্ষণ।

শহর ও নগরের কার্য

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের প্রাচীন ও আধুনিক শহর ও নগরসমূহের মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য প্রচুর। পুরানো শহরকে কেন্দ্র করিয়া চারিপাশে বিস্তৃত আধুনিক শহরের ঘরবাড়ি, পথঘাট, যানবাহন প্রভৃতি নানা বিষয়েই লক্ষ্য করা যায় বিস্তর পার্থক্য। তাহাছাড়া পুরানো শহর ও নগরের তুলনায় আধুনিক শহর ও নগরের কার্যকারিতা ও গুরুত্ব সম্বন্ধেও লক্ষ্য করা যায় বিশেষ তারতম্য ও কতক বৈশিষ্ট্য। কথন কথন এরূপ বৈশিষ্ট্য শহর বা নগরের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির মূল কারণ। বস্তুতঃ এসকল বিষয়কে ঐ সকল শহর বা নগরের প্রধান কার্যও (Function) বলা যায়। এ সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে উল্লেখ করা গেল।

পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, বাটানগর প্রভৃতি আধুনিক **শিল্পকেন্দ্র**। ইহাদের প্রধান কার্য এ সকল স্থানে কয়েকটি আধুনিক বৃহৎ শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সম্পর্কে সুযোগ দান। কানপুর, কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি নগর ইহাদের তুলনায় প্রাচীন। কিন্তু ইহাদেরও অন্যতম কাজ কতকগুলি শিল্পের জন্য বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা।

ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগও কতক শহর ও নগরের প্রধান কাজ। ফলে, উত্তর-বঙ্গের শিলিগুড়ি চা ব্যবসায়ের এবং ২৪ পরগনার ক্যানিং, ডায়মণ্ড হারবার প্রভৃতি মাছের ব্যবসায়ের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। ভারতের কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি ইহাদের তুলনায় বড় বাণিজ্যকেন্দ্র। সিঙ্গাপুর, টোকিও, লণ্ডন প্রভৃতি আরও বড় বাণিজ্যকেন্দ্র।

বিভিন্ন দেশ, রাজ্য প্রভৃতির **শাসন ব্যবস্থা** সম্পর্কে সুবিধা দানও কতক শহর ও নগরের প্রধান কার্য। চণ্ডীগড়, ভুবনেশ্বর, ভূপাল, নূতন দিল্লী প্রভৃতি আধুনিক শহর ইহার উদাহরণ। পুরাতন দিল্লী, হায়দরাবাদ, পুণা, নাগপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন শহর ও নগরও এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

শিল্প, সংস্কৃতি, ধর্ম আচরণ প্রভৃতি বিষয়ে সুযোগ সুবিধা প্রদান কতক শহর ও নগরের অন্যতম প্রধান কাজ। বারাণসী, হরিদ্বার, মাদুরাই প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। আমাদের দেশের বাহিরে মক্কা, মদিনা, জেরুসালেম প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্ররূপে এবং অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে জগদ্বিখ্যাত।

বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে **সেনাবাহিনীর** পক্ষে বিশেষ সহায়তাও

কতক শহর, নগরের প্রধান কাজ। প্রাচীন ভারতের গোয়ালিয়র, চিতোর, চুনার, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের পাঠানকোট, ব্যারাকপুর প্রভৃতি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

স্বাস্থ্য লাভের সুযোগ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ প্রভৃতি বিষয়ে সুযোগ দানও কতক শহর, নগরের প্রধান কাজ। শ্রীনগর, সিমলা, মুসৌরী, দার্জিলিং প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

শহর ও নগরের উন্নতি সম্পর্কে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটির **অধিক কারণে** ইহাদের সৃষ্টি ও উন্নতি হয়। ফলে, ইহাদের **কাজও একাধিক** বিষয়ে সুবিধা প্রধান। কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি বৃহৎ নগরের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

নগরের উন্নতি ও প্রসার

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতির ক্রমাগত উন্নতির ফলে বহু গ্রাম শহরে পরিণত হয়, আর শহর নগরে পরিণত হয়। এবিষয়ে ঐ সকল স্থানের প্রাকৃতিক অবস্থার গুরুত্বও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সমুদ্রের উপকূলে, নাব্য বৃহৎ নদীর তীরে ও বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চলে অবস্থিত স্থানের উপরিলিখিত ভাবে উন্নতির সুযোগ অধিক। এভাবে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানা প্রভৃতির সংখ্যা বাড়িতে থাকে, আর লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি হয়। ফলে, ইহাদের জন্য স্থান সঙ্কুলনের উদ্দেশ্যে শহর, নগর, বন্দর প্রভৃতির প্রসার অত্যাবশ্যক।

উপনগরী—অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন একটি নগরের ক্রমাগত উন্নতির ফলে যে পরিমাণ প্রসার প্রয়োজন, ঠিক সেই পরিমাণ স্থান ঐ নগরের আশপাশে নাই। অথচ সামান্য দূরে হয়ত সেরূপ স্থান আছে এবং তথায় শিল্পকেন্দ্র স্থাপন, যাতায়াত ও পরিবহন, লোকের বসবাসের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়েও প্রচুর সুযোগ আছে। এজন্য কখন কখন বড় বড় **শিল্পকেন্দ্রের কর্মীদের** জন্য **বাসস্থান** একটু দূরে গড়িয়া উঠে। এমন কি, অনেক বড় বড় রেলওয়ে স্টেশন, ওয়ার্কশপ প্রভৃতি কর্মীদের জন্যও বাসস্থান একটু দূরে স্থাপিত হয়। অবশ্য ঐ সকল স্থানে যাতায়াতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। কখন কখন এরূপ নূতন বসতি অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া **ছোট ছোট শহর** গড়িয়া উঠে। আবার অনেক সময় বৃহৎ নগর, শিল্পকেন্দ্র প্রভৃতির আশপাশে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গাতে নূতন নূতন **কলকারখানা স্থাপন** করিয়াও নূতন শহরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। কখন কখন একটি বৃহৎ শিল্পের বিভিন্ন অংশ তৈরীর জন্য বা অন্য ভাবে ঐ **শিল্পের প্রসারের** উদ্দেশ্যেও আশপাশে ছোট ছোট কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ক্রমশঃ

এভাবে ছোট শহরের উৎপত্তি হয়। ইহাদের উন্নতি অনেক পরিমাণে বৃহৎ নগরের উপর নির্ভরশীল। একারণে ইহাদিগকে **উপনগরী** (Satellite town) বলা হয়। কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই প্রভৃতি বৃহৎ নগরের পাশে **নূতন নূতন** শহরের প্রতিষ্ঠার উদাহরণ এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা হইতে দক্ষিণে যাদবপুর, সোনারপুর, বেহালা প্রভৃতি এবং উত্তরে বরাহনগর, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি স্থানে যে সকল শহর গড়িয়া উঠিয়াছে সেগুলি এবিষয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কখন কখন কতক প্রধান নগরের বিপরীত দিকে বা **নদীর অপর** তীরেও এরূপ উপনগরী গড়িয়া উঠে। যেমন, ভাগীরথী-হুগলির এক (পূর্ব) তীরে **কলিকাতা** ও অপর (পশ্চিম) তীরে **হাওড়া**। প্রকৃত পক্ষে এই দুইটি যুগ্ম-নগর। একটি অপরটির পরিপূরক। কলিকাতাতে রেলপথে যাতায়াতের এক কেন্দ্র শিয়ালদহ, অপর কেন্দ্র হাওড়া। ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও এরূপ উদাহরণ দেখা যায়। অন্ধ্রপ্রদেশে মুসী নদীর এক তীরে **হায়দরাবাদ** ও অন্য তীরে **সেকেন্দ্রাবাদ** এবং গুজরাটে সবরমতী নদীর দুই তীরেই **আহমদাবাদের** অবস্থিতি এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। ইউরোপে হাঙ্গেরী দেশের রাজধানী বুডাপেস্টের এক অংশ (বুডা) ড্যানিয়ুব নদীর এক তীরে, অপর অংশ (পেস্ট) ঐ নদীর অপর তীরে। এই দুই অংশ মিলিয়া রাজধানী **বুডাপেস্ট**।

বৃহৎ নগরের সম্প্রসারণ—বহু বৃহৎ নগর ও শিল্পকেন্দ্র গত এক শত বৎসর যাবৎ এত বেশী প্রসার লাভ করিতেছে যে তাহাদের আশপাশে উপনগরীর সংখ্যা ক্রমশঃ অতিদ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে, আশপাশের ছোট ছোট শহর ও শিল্প-কেন্দ্রগুলি ঐ বৃহৎ নগর ও শিল্পকেন্দ্রের অংশরূপে পরিণত হইতেছে। একারণে পুরানো লণ্ডনের তুলনায় **বৃহত্তর লণ্ডনের** (Greater London) আয়তন ও লোকসংখ্যা বহুগুণ বেশী। পুরানো বা আদি লণ্ডনের আয়তন ১০০ একরের কম ও লোকসংখ্যা প্রায় ২১ লক্ষ (১৯৭১), আর বৃহত্তর লণ্ডনের আয়তন ৪$\frac{১}{৩}$ লক্ষ একর (পুরানো লণ্ডনের ৬৫০ গুণ বেশী) এবং লোকসংখ্যা ৭৪ লক্ষ (১৯৭১)। বৃহত্তর লণ্ডন এখন **লণ্ডন কোনারবেশন** নামে পরিচিত।

আমাদের দেশেরও কয়েকটি উদাহরণ এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা কর্পোরেশনের বর্তমান (১৯৭১) লোকসংখ্যা ৩১ লক্ষের অধিক, আর **বৃহত্তর কলিকাতার** (Urban agglomeration) লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষের অধিক। ভাগীরথী-হুগলি নদীর পূর্ব তীরে উত্তরে নৈহাটি হইতে দক্ষিণে বজবজ-বিড়লাপুর এবং পশ্চিমতীরে বাঁশবেড়িয়া (হুগলি জেলা) হইতে দক্ষিণে উলুবেড়িয়া (হাওড়া জেলা) পর্যন্ত প্রায় ৮৫০ বর্গ কিমি স্থান এই অঞ্চলের অঞ্চলের অন্তর্গত। নদীর পশ্চিমতীরের

হুগলি, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, কোন্নগর, উত্তরপাড়া, হাওড়া প্রভৃতি এবং পূর্ব তীরের নৈহাটি, ইছাপুর, ব্যারাকপুর, টিটাগড়, দমদম, যাদবপুর, বাটানগর, বজবজ প্রভৃতি শহর ও শিল্পকেন্দ্র সহ আশপাশের বিস্তীর্ণ কৃষি অঞ্চলও এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এরূপ **বিভিন্ন ধরনের** স্থান এই অঞ্চলের অন্তর্গত বলিয়া এখানকার **আরবান এগ্লোমা-রেশন** (Agglomeration = পাঁচমিশালি জিনিসের সংমিশ্রণ) নামটি সার্থক। তারপর পশ্চিমবঙ্গের **আসানসোলের** লোকসংখ্যা ১½ লক্ষের অধিক (১৯৭১), আর তথাকার আশপাশসহ বৃহত্তর শিল্পকেন্দ্রের লোকসংখ্যা প্রায় ২½ লক্ষ।

পশ্চিমবঙ্গের বাহিরেও এরূপ উদাহরণ আছে। বিহারের **ধানবাদ** শহরের লোকসংখ্যা মাত্র ৮০,০০০ (১৯৭১), অথচ আশপাশ সহ (Urban agglomeration) লোকসংখ্যা প্রায় ৪½ লক্ষ। মহারাষ্ট্রের পশ্চিম অংশে **উল্লাসনগরের** লোকসংখ্যা ১½ লক্ষ (১৯৭১), আর আশপাশ সহ (Urban agglomeration) লোকসংখ্যা প্রায় ৩·৯ লক্ষ। তামিলনাড়ুর **তিরুনেলভেলির** লোকসংখ্যা এক লক্ষের সামান্য অধিক, অথচ আশপাশ সহ বৃহত্তর শহরের লোকসংখ্যা ২⅓ লক্ষ।

নগর ও তাহার পশ্চাৎভূমি

বন্দরের মত নগরসমূহেরও উন্নতি ও প্রসার তাহাদের আশপাশের বিভিন্ন স্থানের উন্নতির উপর নির্ভরশীল। কোন নগরের কেবলমাত্র নিজস্ব উন্নতির ফলে তথাকার (নগরের) প্রসার সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে ভারতের কয়েকটি প্রধান নগরের উদাহরণ সংক্ষেপে আলোচনা করিলে বিষয়টি স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের **কলিকাতা** ও আশপাশ মাত্র ২০০ বৎসর পূর্বে সামান্য গ্রাম ছিল। ক্রমে উন্নতিলাভের ফলে কলিকাতা প্রায় ১৪০ বৎসর (১৭৭৩-১৯৪১ খ্রীঃ) ছিল ভারতের রাজধানী ও সেই সময়ের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বন্দর। তারপর এখানকার রাজনৈতিক গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু আজও ইহা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী এবং ভারতের বৃহত্তম নগর ও সর্বপ্রধান শিল্পাঞ্চলের কেন্দ্র। এই বৃহৎ নগরের উন্নতির সহিত এখানকার পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরদিকে অবস্থিত বিভিন্ন রাজ্য ও দেশের উন্নতির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। ইহাই যে এই রাজ্যের সমুদয় অংশের প্রধান কেন্দ্র এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহাছাড়া পূর্বদিকে আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড মণিপুর, ত্রিপুরা, মিজোরাম, পশ্চিমদিকে বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশের প্রায় মধ্য অংশ এবং উত্তরে সিকিম রাজ্য এবং স্বাধীন নেপাল ও ভুটানের শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির সহিতও কলিকাতার সম্পর্ক অত্যন্ত অধিক। এসকল স্থান প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা মহানগরীর

পশ্চাৎভূমি (Hinterland)। এসকল স্থানের কেবলমাত্র বাণিজ্যদ্রব্য কলিকাতার মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি হয় না, ইহাদের নানাপ্রকার শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি, দেশবিদেশের সহিত ইহাদের যোগাযোগ প্রভৃতি বহু বিষয়ও কলিকাতার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রধান নগর ও বন্দরের গুরুত্বও একই কারণে খুব বেশী। **বোম্বাই**-এর পশ্চাৎভূমি প্রকৃত পক্ষে উত্তরে জম্মু ও কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্যন্ত বিস্তৃত। **মাদ্রাজের** পশ্চাৎভূমি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। অন্ধ্র-প্রদেশের দক্ষিণ অংশ, মধ্যপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর অনেক অংশ এই নগরের পশ্চাৎভূমি। **দিল্লী** নগরী গত ৬৫ বৎসরের অধিক কাল (১৯১১ খ্রীঃ ১১ ডিসেম্বর হইতে) ভারতের রাজধানী। এখানকার এরূপ রাজনৈতিক গুরুত্ব সাম্প্রতিক ঘটনা নহে। ইহার পূর্বেও বহু শত বৎসর ইহা এদেশের রাজধানী ছিল। বর্তমানে শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়েও এখানকার উন্নতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নগরের আশপাশের হরিয়ানা, পঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশের পশ্চিম অংশ, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ প্রভৃতির উন্নতির সহিত এখানকার উন্নতির সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। ফলে, এই সকল স্থানই এখানকার পশ্চাৎভূমি।

বস্তুতঃ উপরিলিখিতরূপ অবস্থার ফলে এক কালে **লণ্ডন** মহানগরী ছিল পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক রাজধানী এবং ঐ বিরাট অঞ্চল ছিল লণ্ডন নগরের পশ্চাৎভূমি।

অনুশীলনী

১। কোন স্থানের লোকবসতি কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক বিষয়ের উপর অধিক নির্ভরশীল? লোকবসতি সম্পর্কে আর কোন্ কোন্ কারণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য? এসম্পর্কে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণের গুরুত্ব বুঝাইয়া দাও। ২। লোকবসতির পার্থক্য অনুসারে বিভিন্ন স্থানকে প্রগতিশীল অঞ্চল, সম্ভাবনাপূর্ণ অঞ্চল ও সমস্যাপূর্ণ অঞ্চলরূপে বিভক্ত করার সার্থকতা কি? ৩। গ্রাম অঞ্চলের লোকবসতি কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর অধিক নির্ভরশীল? গ্রাম অঞ্চলে ছড়ানো, পুঞ্জীভূত ও রেখা অনুসারে লোকবসতি বিস্তারের কারণ কি? ৪। শহর ও নগর অঞ্চলে লোকবসতি বিস্তার সম্পর্কে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রভাব অধিক? বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৫। শহর ও নগরের কোন্ কোন্ কাজ উল্লেখযোগ্য? ৬। উপনগরী কাহাকে বলে? কলিকাতার উদাহরণ উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দাও। ৭। বৃহত্তর কলিকাতা বলিতে কি বুঝ? ভারতের আরও দুইটি নগরের বৃহত্তর এলাকা উল্লেখ কর। ৮। নগরের পশ্চাৎভূমি বলিতে কি বুঝ? কলিকাতা ও দিল্লীর উদাহরণ সহ বিষয়টি বুঝাইয়া দাও।

ব্যবহারিক ভুগোল

প্রথম অধ্যায়

মানচিত্র পাঠ

ভৌগোলিক উপকরণসমূহ—ভৌগোলিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ভ্রমণ, পর্যবেক্ষণ, পুস্তক ও পত্রিকা পাঠ প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ের গুরুত্ব খুব বেশী। এসকল কাজে নানাপ্রকার **উপকরণের** (Tools and equipment) সহায়তা বিশেষভাবে প্রয়োজন। তন্মধ্যে পুস্তক, পত্রিকা প্রভৃতি পাঠের মাধ্যমে ভৌগোলিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্লোব, নানাপ্রকার মানচিত্র, চিত্র, ছবি, ফটোগ্রাফ, রিলিফ মডেল প্রভৃতির গুরুত্ব বেশী। আর বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ, ভ্রমণ প্রভৃতির মাধ্যমে ভৌগোলিক জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার যন্ত্রপাতির সাহায্য প্রয়োজন। তন্মধ্যে বিভিন্ন প্রকার তাপমান যন্ত্র (থার্মোমিটার), চাপমান যন্ত্র (ব্যারোমিটার), বৃষ্টিমাপক যন্ত্র (রেইন্ গেজ), বায়ুর গতি নির্দেশক যন্ত্র (উইণ্ডভেন) প্রভৃতি, জমি জরিপের (সার্ভে) যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসকল যন্ত্রপাতি ও মানচিত্র প্রভৃতির সঠিক ব্যবহারের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

মানচিত্র—যে কোন স্থানের **ভৌগোলিক** বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের পক্ষে **সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়** ও সর্বাপেক্ষা সহজলভ্য **উপকরণ** মানচিত্র। বস্তুতঃ কেবলমাত্র ছাত্র-ছাত্রীগণের পক্ষে ভৌগোলিক জ্ঞান লাভের জন্য বা শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের পক্ষে তাহাদিগকে এবিষয়ে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে যে ইহা অত্যাবশ্যক, তাহা নহে। বর্তমানে নানা স্থানে ভ্রমণ, পর্যটন, শাসন সংক্রান্ত কার্য, দেশরক্ষা, কৃষি, শিল্প, যানবাহন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি যাবতীয় কার্য, দেশের **উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা** (নদীর উপর বাঁধ তৈরী, সেচকার্য, স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা, রেলপথ, স্থলপথ প্রভৃতির প্রসার) ইত্যাদি **যে-কোন কাজেই** মানচিত্রের ব্যবহার **অত্যাবশ্যক**।

এখন হইতে প্রায় ৪৫০০ বৎসর পূর্বে (সম্ভবতঃ ২৫০০ খ্রীঃপূঃ) শুকানো মাটির উপর ইরাক দেশের একটি অংশ সম্পর্কে যে মানচিত্র তৈরী হইয়াছিল, তাহাই **পৃথিবীর প্রাচীনতম** (সংরক্ষিত) মানচিত্ররূপে গণ্য।

পৃথিবীর যে কোন একটি নির্দিষ্ট অংশের, অথবা সমগ্র পৃথিবীর, বিবরণ মানচিত্রের মাধ্যমে লাভ করা সম্ভবপর। এই বিবরণ যথাসম্ভব নির্ভুল ভাবে বা ভূপৃষ্ঠের সঠিক স্থান অনুসারে দেখাইবার উদ্দেশ্যে মানচিত্র নির্দিষ্ট স্কেল অনুসারে তৈরী করা হয়। তারপর

পৃথিবীর আকৃতি প্রায় গোলাকার, অথচ মানচিত্র তৈরী হয় চ্যাপ্টা (সমতল) কাগজের উপর। সেজন্য মানচিত্র নির্ভুলভাবে তৈরীর উদ্দেশ্যে কতক গাণিতিক বিষয়ের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। তাহাছাড়া পৃথিবীর বিরাট আয়তনের তুলনায় মানচিত্রের আয়তন খুবই ছোট। তাই মানচিত্রে সাধারণতঃ প্রধান বা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নির্দেশ করা হয়। আর একই মানচিত্রে সকল বিষয় দেখাইবার জন্য চেষ্টা করা হয় না, পৃথক্ পৃথক্ বিষয় দেখাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মানচিত্র তৈরী ও ব্যবহার করা হয়। এজন্য মানচিত্রের উদ্দেশ্য (Objectives) এবং ব্যবহারও (uses) বিভিন্ন। তারপর বিভিন্ন বিষয় নির্দেশ করিবার সংকেত বা চিহ্নও (Legends or key) পৃথক্। ইহা ভিন্ন মানচিত্রে দিক্ (সাধারণতঃ উত্তর দিক) নির্দেশ করিবারও ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক।

বিভিন্ন প্রকার মানচিত্র—মানচিত্রসমূহ তাহাদের স্কেল ও উদ্দেশ্য অনুসারে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত।

স্কেল অনুসারে মানচিত্রসমূহ নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত।

(ক) **ক্যাডাস্ট্র্যাল ম্যাপ**—যে কোন দেশের সরকারী কাজকর্মের (আইন, আদালতের কাজ, খাজনা ও ট্যাক্স আদায় প্রভৃতি) উদ্দেশ্যে এই জাতীয় মানচিত্র তৈরী হয়। দেশের বিভিন্ন শহর, গ্রাম, ক্ষেত, খামার প্রভৃতি অংশের প্রত্যেক জমি যথাসম্ভব সঠিক ভাবে দেখাইবার উদ্দেশ্যে এসকল মানচিত্র বেশ **বড় স্কেল** অনুসারে (Large scale map) তৈরী হয়। আপেক্ষিক মাপ (মাইল, গজ প্রভৃতি) অনুসারে ভূপৃষ্ঠে এক মাইল দূরত্ব ক্যাডাস্ট্রাল ম্যাপে ২৫ ইঞ্চি দ্বারা নির্দিষ্ট। তাই, এরূপ মানচিত্রের স্কেল "২৫" = এক মাইল", অর্থাৎ ইহাদিগকে বলা হয় "২৫ ইঞ্চি মানচিত্র"। এ প্রকার মানচিত্রের স্কেল আনুপাতিক (Proportion) হিসাবে ১ : ২৫০০।

(খ) **টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ**—এই জাতীয় মানচিত্রের স্কেল **মধ্যম** মাপের অর্থাৎ খুব বড় (নক্সা বা ক্যাডাস্ট্রাল মাপের মত) নহে, আবার খুব ছোটও (ভূচিত্রাবলী বা দেওয়াল মানচিত্রের মত) নহে। এরূপ মানচিত্রে স্কেল আপেক্ষিক হিসাবে ১" = এক মাইল, ১" = ২ মাইল ইত্যাদি। আনুপাতিক হিসাবে এই জাতীয় মানচিত্রের স্কেল নিম্নরূপ :—১ : ৫০, ০০০ ; ১ : ৬২, ৫০০ ; ১ : ৬৩, ৩৬০ বা **১"=এক মাইল ; অথবা ১ : ১০০, ০০০।**

এই প্রকার মানচিত্রে পাহাড়, পর্বত, নদনদী, হ্রদ, বন প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয় এবং স্থলপথ, রেলপথ, সেচখাল, শহর, নগর প্রভৃতি মানবিক বিষয় যথাসম্ভব নির্ভুল ভাবে দেখান হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের জরিপ করিয়া বা নির্ভুল হিসাব অনুসারে

প্রাপ্ত বিবরণের (Data) ভিত্তিতে এরূপ মানচিত্র তৈরী হয়। এই মানচিত্রে (মধ্যম রকম স্কেল ব্যবহারের ফলে) ব্যক্তিগত জমির সীমা নির্দেশ করা সম্ভব নহে।

(গ) **ভূচিত্রাবলীর মানচিত্র**—বিভিন্ন দেশ বা তাহাদের বিভিন্ন অংশের, এমন কি কখন কখন সমগ্র পৃথিবীর যে কোন একটি বিষয় এক নজরে (at a glance) লক্ষ্য করিবার উদ্দেশ্যে খুব ছোট স্কেল অনুসারে এই জাতীয় মানচিত্র (Small scale map) তৈরী ও ব্যবহার করা হয়। এই জাতীয় পৃথক্ পৃথক্ মানচিত্রে নির্দিষ্ট স্থানের প্রাকৃতিক ও মানবিক যাবতীয় বিষয় লক্ষ্য করা যায়। ছাত্রছাত্রীগণের পক্ষে এই জাতীয় মানচিত্রের বা ভূচিত্রাবলীর ব্যবহার অত্যাবশ্যক।

দেওয়াল মানচিত্র—ভূচিত্রাবলীর মানচিত্র অপেক্ষাকৃত বড় আকারে তৈরী করিয়া এরূপ মানচিত্র তৈরী করা হয়। স্কুল, কলেজে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা দানের জন্য এই জাতীয় মানচিত্রের ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য অনুসারে মানচিত্র নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত।

(ঘ) **ভূপ্রকৃতি নির্দেশক মানচিত্র** (Relief maps)—এই জাতীয় মানচিত্রে নির্দিষ্ট স্থানের (কোন দেশ, মহাদেশ বা সমগ্র পৃথিবী অথবা তাহার কোন নির্দিষ্ট অংশের) প্রধান **পাহাড়, পর্বতসমূহের** বিস্তার, উচ্চতা, প্রধান শৃঙ্গসমূহের অবস্থান ও উচ্চতা প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের সাহায্যে পার্বত্য অংশের বিভিন্ন উপত্যকা, সমভূমি, মালভূমি প্রভৃতির অবস্থাও লক্ষ্য করা যায়। তাহাছাড়া **নদনদীসমূহের** উৎস বা উৎপত্তিস্থল, তাহাদের প্রবাহের দিক, বিভিন্ন উপনদী, শাখানদী প্রভৃতির গতিপথ, পরস্পরের মিলনস্থল প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় মানচিত্র প্রায় রিলিফ মডেলের মত কার্যকরী। অবশ্য এজন্য মানচিত্রে উপযুক্ত রং ব্যবহার করিয়া আলোচ্য বিষয়সমূহ সঠিক ভাবে নির্দেশ করা প্রয়োজন।

(ঙ) **জলবায়ু সংক্রান্ত মানচিত্র** (Climatic maps)—কতক স্থানের আবহাওয়ার অবস্থা নির্দেশ করিবার জন্য আবহ মানচিত্র (Weather map) তৈরী হয়। ইহাদের তুলনায় জলবায়ু সংক্রান্ত মানচিত্র অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

(চ) **উদ্ভিদ সংক্রান্ত মানচিত্র** (Vegetation maps)—এই জাতীয় মানচিত্রে বিভিন্ন দেশ বা মহাদেশের নানা জাতীয় উদ্ভিদের ও বন অঞ্চলের বিস্তার স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

(ছ) **লোকবসতি সংক্রান্ত মানচিত্র** (Population maps)—এই জাতীয় মানচিত্রে কোন দেশ বা মহাদেশের কোন্ কোন্ অংশে লোকবসতি ঘন, কোথায় কম

এবং বসতিসমূহ কিভাবে বিস্তৃত, ভূপ্রকৃতির সহিত তাহার সম্পর্ক কিরূপ—এসকল বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

(জ) **যানবাহন** (Transport and communication) **সংক্রান্ত মানচিত্র**—এই জাতীয় মানচিত্রে স্থলপথ, রেলপথ, নৌপথ, বিমানপথ প্রভৃতির বিস্তার এবং ভূপ্রকৃতি, লোকবসতি প্রভৃতির সহিত ইহাদের সম্বন্ধ প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়।

(ঝ) **জমির ব্যবহার** (Land use pattern) **প্রভৃতি সংক্রান্ত মানচিত্র**—এই জাতীয় মানচিত্রে দেশের কোন্ কোন্ অংশে কৃষিকার্য, শিল্প প্রভৃতি কিরূপ বিস্তৃত এবং তাহাদের সহিত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়ের সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

(ঞ) **রাজনৈতিক** (Political) **মানচিত্র**—এই জাতীয় মানচিত্রে রাজনৈতিক বিভাগসমূহ, প্রধান শহর, নগর, বন্দর, শিল্পকেন্দ্র প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়।

টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র পাঠ

এই জাতীয় মানচিত্রের বৈশিষ্ট্য—দেশের পৃথক পৃথক অংশের অবস্থা নির্দিষ্ট স্কেল অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ কাগজে (Topographical sheets) ছাপা হয়। কাজেই প্রত্যেক মানচিত্রে একটি ছোট জায়গার অবস্থা দেখান হইলেও মানচিত্রগুলি পাশাপাশি সাজাইয়া যে-কোন বিস্তীর্ণ অংশের অবস্থা জান যায়।

এরূপ মানচিত্র পাঠের উদ্দেশ্য ও ব্যবহার—সাধারণতঃ নিম্নলিখিত নানা উদ্দেশ্যে টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র ব্যবহৃত হয়।

(১) **প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ**—কোন অঞ্চল প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ বা পরিদর্শন ও জরিপের ফলে টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র আঁকা হয়। পরে ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান ঠিকমত চিনিবার (Recognition) জন্য এবং ঐ স্থান প্রয়োজন মত আবার জরিপ করিবার জন্য বা অন্যান্য উদ্দেশ্যে এই মানচিত্র ব্যবহৃত হয়।

(২) **সামরিক কার্য**—সামরিক উদ্দেশ্যে (দেশরক্ষা সংক্রান্ত সামরিক কলাকৌশল অবলম্বনের জন্য) এই মানচিত্র ব্যবহৃত হয়।

(৩) **শাসন সংক্রান্ত কার্য**—দেশের শাসন সম্পর্কিত নানা কাজে (সীমা নির্দেশ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, লোকবসতি প্রভৃতি নির্দেশ) এই মানচিত্র ব্যবহৃত হয়।

(৪) **ভূমির ব্যবহার** (Land use) **সংক্রান্ত কাজ**—দেশের ভূমি কোথায় কি ভাবে বা কাজে বর্তমানে ব্যবহৃত হয় ও ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহা স্থির করিবার জন্য এই মানচিত্র ব্যবহৃত হয়।

(৫) **দেশের ভৌগোলিক বিবরণ**—যে-কোন দেশের বিভিন্ন অংশের সঠিক ভৌগোলিক বিবরণ জানিবার উদ্দেশ্যে এই মানচিত্র খুব বেশী ব্যবহৃত হয়।

(৬) **ভ্রমণ, আবিষ্কার প্রভৃতি**—বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ, নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কারপ্রভৃতি কাজেও এরূপ মানচিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই জাতীয় মানচিত্রের পাঠ ও ব্যবহার সম্পর্কে তিনটি **বিভাগ** উল্লেখযোগ্য। (১) প্রাথমিক বিবরণ, (২) প্রাকৃতিক বিবরণ এবং (৩) মানবিক বা সাংস্কৃতিক বিবরণ।

(১) **প্রাথমিক বিবরণ**—এরূপ মানচিত্র অভিনিবেশ সহকারে পাঠের পূর্বে তাহার সম্পর্কে কতকগুলি প্রাথমিক বিবরণ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। মানচিত্রের মাধ্যমে কোন স্থানের ভৌগোলিক জ্ঞান অর্জনের পক্ষে এসকল বিষয় একান্ত আবশ্যক। অথচ
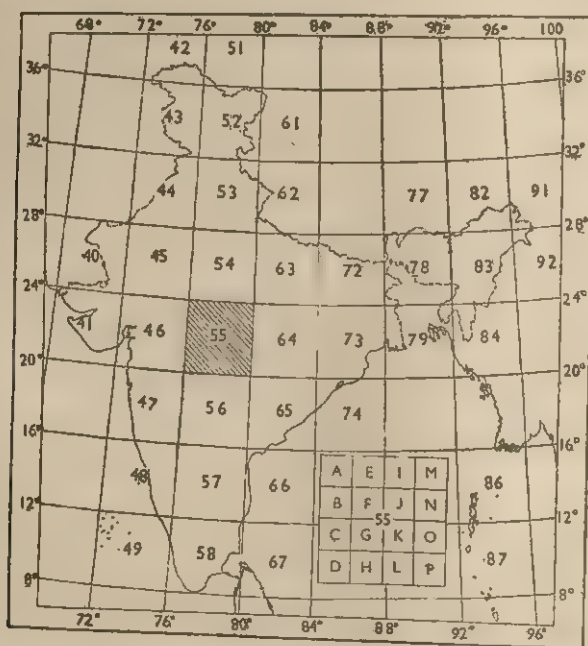
এ সকল বিবরণ পাওয়া যায় মানচিত্রের দুই পাশে (উপরে ও নীচে) যে সকল নির্দেশ থাকে তাহাদের মাধ্যমে। তাই ইহাদিগকে **মার্জিন্যাল বিবরণ** (Marginal Information) বলা হয়। এসম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য।

মানচিত্র পরিচিতি বা তাহা চিহ্নিতকরণ বা সনাক্তকরণ (Identification)—ভারতের টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্রসমূহের উপরদিকে মধ্যভাগে রাজ্যের নাম, বামপাশে জেলার নাম এবং ডান পাশে সীট নম্বর দেওয়া থাকে। উপরের মানচিত্রে

এদেশের বিভিন্ন অংশের টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্রের প্রধান **সীট নম্বর** দেওয়া গেল।
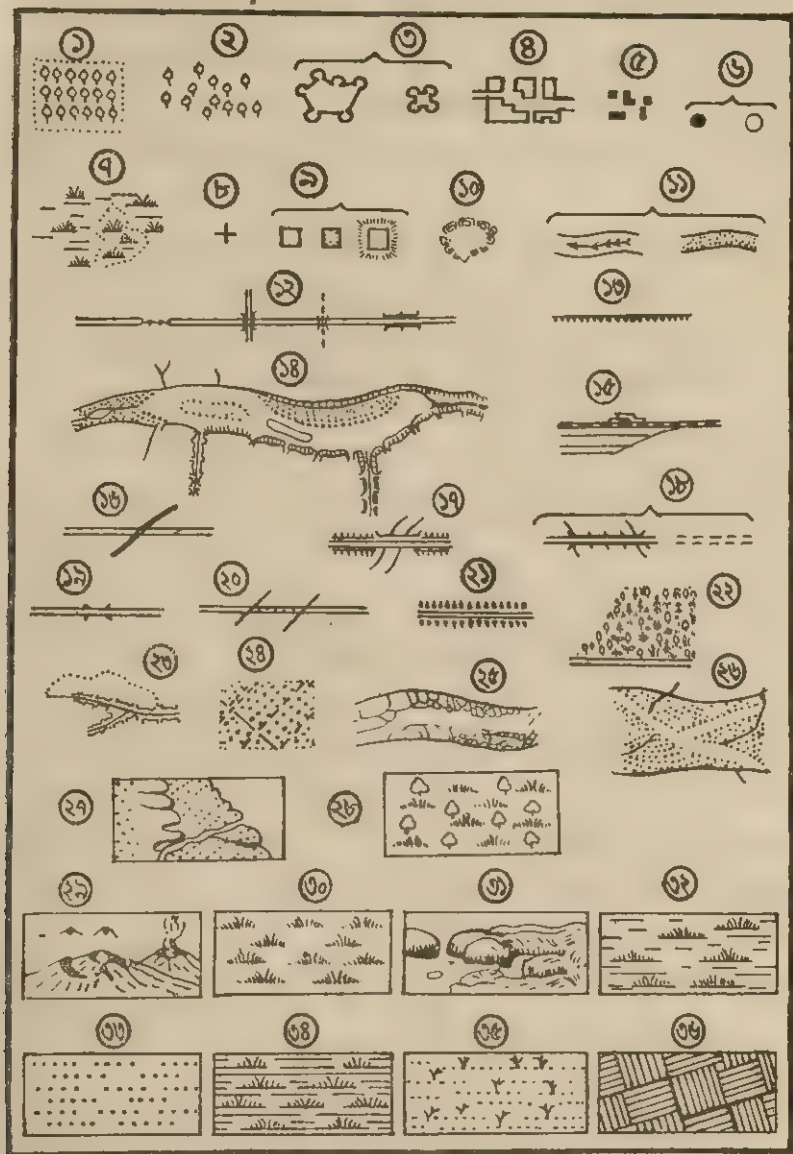
তাহাছাড়া মানচিত্রখানা কোন্ বৎসরের জরিপের (Survey) ভিত্তিতে তৈরী তাহাও লেখা থাকে।

মানচিত্রের নীচের দিকে মাঝখানে থাকে কোন্ বৎসর ঐ মানচিত্র ছাপা ও প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহা কোন্ স্কেল অনুসারে তৈরী। বিভিন্ন স্থানের মধ্যে **দূরত্ব নির্দেশ** করিবার **স্কেল** (Horizontal scale) এবং বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা নির্দেশ করিবার স্কেল বা **সমোচ্চ রেখাসমূহের** মধ্যে দূরত্ব (Contour interval)—দুইই নির্দেশ করা থাকে। তাহার পাশে মানচিত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে জেলাসমূহের অংশ নির্দেশ করা থাকে।

মানচিত্রের নীচে আরও থাকে মানচিত্রে বর্ণিত বিষয়সমূহ সঠিকভাবে লক্ষ্য করার কাজে সহায়তার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন **সঙ্কেত** (Legend or Key or Conventional signs)। পূর্ব (৪৭৫ পৃষ্ঠার) মানচিত্রে কতকগুলি প্রধান সঙ্কেত বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেওয়া গেল। আর এই দুই পৃষ্ঠায় (৪৭৬-৭৭) কোন্ সঙ্কেত দ্বারা কি বুঝায় তাহা নির্দেশ করা হইল।

১=ফুল বা ফলের বাগান।

২=বিভিন্ন গাছ (যেখানে গাছের সংখ্যা বেশী, সেখানকার চিহ্ন অধিক ঘন);

৩=দুর্গ ;

৪=গ্রাম বা লোকালয় ;

৫=বিচ্ছিন্ন বা পৃথক ভাবে অবস্থিত ঘরবাড়ী, দালান প্রভৃতি ;

৬=কূপ ;

৭=জলাভূমি এবং তাহার এক অংশ আবাদী জমি ;

৮=প্রস্রবণ ;

৯=পুকুর (জলপূর্ণ, শুষ্ক এবং উঁচু পাড় বা বাঁধ যুক্ত) ;

১০=প্রস্তরের খনি (Quarry)। কখন কখন তাহার মধ্যে সংখ্যা দ্বারা ইহার গভীরতা কত ফুট তাহা নির্দেশ করা হয় ;

১১=নদী (দুই তীরের রেখা দ্বারা ইহা কতটা চওড়া তাহা দেখান হইয়াছে এবং তীর চিহ্ন দ্বারা জল কোন্‌দিকে প্রবাহিত হয় তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে)। ডানদিকের বিন্দু বিন্দু চিহ্ন দ্বারা নদীর গতিপথে কোথায় বালুকারাশি সঞ্চিত হইয়াছে এবং নদীর গতি শুষ্ক তাহা বুঝান হইতেছে।

১২=খাল ও ইহার উপর যথাক্রমে বাঁধ, রাস্তা, সরু পথ ও জল বহন করিবার খাল ও পয়োনালি (Aqueduct) দেখান হইয়াছে।

১৩=বাঁধ (সাধারণতঃ নদীর ধারে)।

১৪=নদী ও ইহার তীর; কোন্ তীরের কোন্ অংশ কতটুকু উঁচু ও কোন স্থান কিরূপ ভাঙ্গা এবং কোথায় বালুকা, নুড়ি ইত্যাদি সঞ্চিত হইয়াছে তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে।

১৫=রেলপথ ও তাহার উপর রেলওয়ে স্টেশন। পাশে মাইলস্টোন (পূর্বে অপর কোন স্টেশন হইতে দূরত্ব মাইল হিসাবে দেখান হইত, এখন কিমি হিসাবে দেখান হয়। এবং রেলস্টেশনের পাশের রেলপথ বা Siding দেখান হইয়াছে;

১৬=রেলপথের উপর দিয়া রাস্তা কিভাবে বিস্তৃত হইয়াছে (Level crossing) তাহা দেখান হইয়াছে;

১৭=খাল ও সেতুর উপর দিয়া রেলপথের বিস্তার দেখান হইয়াছে;

১৮=নদীর উপর প্রশস্ত রাজপথের ডান দিকের কাঁচা রাস্তা দেখান হইয়াছে;

১৯=অপেক্ষাকৃত সরু ও অপ্রধান রাস্তা;

২০=নদীর উপর ফেরী বা খেয়া নৌকার সাহায্যে নদী পার হওয়ার স্থান, আর কোথাও হাঁটিয়া নদী পার হওয়ার সুবিধা থাকিলে তথায় Ford লেখা হয়;

২১=রেলপথ ও তাহার পাশে বাঁধ;

২২=বিভিন্ন গাছের ঘন বন; তাহার পাশ (এখানে দক্ষিণদিক্) দিয়া রাস্তা গিয়াছে;

২৩=ভাঙ্গা পাড়যুক্ত নদীর তীর ও পাশে আবাদী জমি (চারি দিকে সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে);

২৪=চা বাগান (Plantation);

২৫=নদীর গতিপথের দৃশ্য; বিভিন্ন প্রকার শিলাস্তূপ সঞ্চয়ের স্থান;

২৬=প্রশস্ত নদী; ইহার অধিকাংশ শুষ্ক ও বালুকাময়। মধ্যভাগের সাদা রঙের অংশের মধ্য দিয়া বর্তমানে জল প্রবাহিত হয়। অপেক্ষাকৃত সরু কাল রেখাদ্বারা নির্দিষ্ট অংশের মধ্যদিয়া সকল সময় জল প্রবাহিত হয় না। তাহা কখন কখন শুকাইয়া যায় ইহাই বুঝান হইতেছে।

২৭=তীরভূমি;

২৮=সাভানা (বৃক্ষযুক্ত তৃণভূমি);

২৯=আগ্নেয়গিরি;

৩০=তৃণভূমি;

৩১=ফিয়র্ড;

৩২=জলাভূমি;

৩৩=বালুকা ও নুড়ি;

৩৪=জোয়ার-ভাঁটার প্রভাবযুক্ত বিল;

৩৫=প্রায় শুষ্ক ভূমি;

৩৬=কৃষিক্ষেত্র।

অবস্থিতি—মানচিত্রে যে স্থানের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা কোথায় অবস্থিত, তাহা লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন। এই অবস্থিতি দ্রাঘিমান্তর ও অক্ষাংশের সাহায্যে

নির্ভুল ভাবে স্থির করা যায়। তাহাছাড়া ইহাদের সাহায্যে আয়তন এবং জলবায়ু সম্বন্ধেও কতক বিবরণ জানা যায়। অবশ্য মানচিত্রের নীচের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক মানচিত্র ভালভাবে লক্ষ্য করিয়াও মানচিত্রে অঙ্কিত বিভিন্ন স্থানের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

আয়তন—অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমান্তরের সাহায্যে মানচিত্রে বর্ণিত স্থানের আয়তন সাধারণ ভাবে নির্দেশ করা যায়। যেমন, প্রতি ডিগ্রি **অক্ষাংশে** ভূপৃষ্ঠের রৈখিক (Linear) মাপ গড়ে ১১০ কিমি.। তবে নিরক্ষীয় অঞ্চলে তাহা অপেক্ষা সামান্য (প্রায় এক কিমি) কম এবং মেরু অঞ্চলে সামান্য (প্রায় এক কিমি) বেশী। আর নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রতি ডিগ্রি **দ্রাঘিমান্তরের** রৈখিক মাপ প্রায় ১১২ কিমি, ৩০° উঃ বা দঃ অক্ষাংশে প্রায় ৯৬ কিমি, ৬০° উঃ বা দঃ অক্ষাংশে প্রায় ৫৫ কিমি, ৮০° উঃ বা দঃ অক্ষাংশে প্রায় ১৯ কিমি এবং সুমেরু ও কুমেরুতে ০ কিমি।
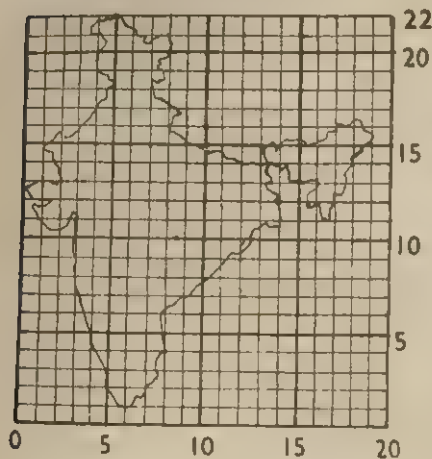
তাহাছাড়া সমুদয় অঞ্চলকে কতকগুলি বড় ও ছোট আয়ত ক্ষেত্রে বিভক্ত করিয়াও আয়তন স্থির করা যায়। পাশের চিত্রে তাহার নমুনা দেওয়া গেল। মানচিত্রে প্রকাশিত স্কেলের সাহায্যেও আয়তন স্থির করা হয়।

স্কেল—প্রত্যেক মানচিত্রই কোন-না-কোন স্কেল অনুসারে তৈরী হয়। ভূপৃষ্ঠের যে-কোন জিনিসের যে আয়তন বা যে-কোন দুইটি স্থানের মধ্যে যে দূরত্ব, মানচিত্রেও ঐ জিনিসের আয়তন বা ঐ দুইটি স্থানের দূরত্ব তাহার **অনুপাতে** (ratio) সমান। এই অনুপাত স্থির করা হয় স্কেলের সাহায্যে। যেমন, স্কেল "১ সেমি=১ কিমি" বলিলে বুঝা যায় ভূপৃষ্ঠে এক কিমি দূরত্ব মানচিত্রে এক সেমি দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। যে কাগজে মানচিত্র তৈরী হইবে, তাহার মাপ এবং মানচিত্রে যে সকল বিষয় দেখানো হইবে—এই দুইটি বিষয় বিবেচনা করিয়া মানচিত্রের স্কেল ঠিক করা করা হয়। যেমন, কোন মানচিত্রে কোন জিনিস নিতান্ত সাধারণ ভাবে দেখাইতে হইলে ছোট স্কেলের (যেমন, ১ : ৫০০০০; ১ : ১০০,০০ প্রভৃতি) মানচিত্র (Small scale map) তৈরী করা হয়। আর কোন মানচিত্রে কোন স্থানের খুঁটিনাটি জিনিস দেখাইতে হইলে

বড় স্কেলের (যেমন, ১ : ৫০০ ; ১ : ১০০০ ; ১ : ২৫০০, ১ : ৫০০০ প্রভৃতি) মানচিত্র তৈরী করা হয়।

মানচিত্রের স্কেল নির্দেশের ব্যবস্থা—মানচিত্রের স্কেল নিম্নলিখিত নানা পদ্ধতিতে নির্দেশ করা হয়।

(ক) **বিবৃতির** (Statement) **সাহায্যে**—স্কেল "এক সেন্টিমিটার এক কিলো-মিটারের সমান" এরূপ বিবৃতি দ্বারা বা স্কেল "১ সেমি=১ কিমি" এরূপ লেখা দ্বারা কতক মানচিত্রের স্কেল নির্দেশ করা হয়। এরূপ স্কেলের তাৎপর্য বুঝিবার জন্য সেন্টিমিটার, কিলোমিটার, গজ, মাইল প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত মাপের (measurement) সহিত সঠিক পরিচয় একান্ত আবশ্যক।

(খ) **গণিতের ভগ্নাংশের** (Numerical fraction) **সাহায্যে**—এক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠের দুইটি স্থানের মধ্যে দূরত্ব ও মানচিত্রে তাহাদের মধ্যে দূরত্বের অনুপাত একটি ভগ্নাংশের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। এরূপ ভগ্নাংশের লব (উপরের সংখ্যা) সর্বদাই ১ (এক)। এরূপ ভগ্নাংশকে Representative Fraction (সংক্ষেপে R.F.) বলা হয়।

ফলে, $R.\ F. = \dfrac{\text{মানচিত্রে দুইটি স্থানের দূরত্ব}}{\text{ভূপৃষ্ঠে ঐ স্থান দুইটির দূরত্ব}}$।

এই স্কেল বা অনুপাত (R. F.) দুই ভাবে নির্দেশ করা যায়। যেমন,

$$(১) \quad \frac{১}{১০০,০০০} \text{ বা } (২) \ ১ : ১০০,০০০ \text{।}$$

(গ) **রৈখিক মাপের স্কেলের** (Linear scale) **সাহায্যে**—মানচিত্রের নীচে একটি সরলরেখা আঁকিয়া এবং তাহাকে প্রয়োজনমত কয়েকটি ক্ষুদ্রতর ভাগে বিভক্ত করিয়া স্কেল নির্দেশ করা যায়। এই উদ্দেশ্যে ভূপৃষ্ঠের প্রকৃত দূরত্ব অনুপাতে রেখাটিকে বিভক্ত করা হয়। আর এই অনুপাতটি ঐ রেখার গায়ে স্পষ্টভাবে দেখানো হয়। ফলে,
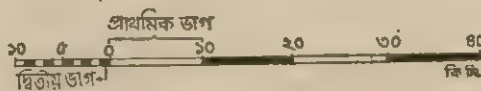
এই রেখার সাহায্যে বা তাহার বিভিন্ন অংশের সাহায্যে মানচিত্রে দুইটি স্থানের মধ্যে যে দূরত্ব বা মানচিত্রে দেখানো কোন একটি জিনিসের আয়তন জানা যাইবে। তারপর এই স্কেলের অনুপাত অনুসারে হিসাব করিয়া ঐ স্থান দুইটির সঠিক দূরত্ব বা জিনিসটির প্রকৃত আয়তন স্থির করা সম্ভব হইবে।

পূর্ব পৃষ্ঠার রৈখিক স্কেলে **প্রাথমিক ভাগে** (Primary division) ১০, ২০, ৩০, ৪০ প্রভৃতি কিমি দূরত্বের অনুপাত দেখান হইয়াছে এবং **দ্বিতীয় ভাগে** (Secondary division) ০, ৫, ১০ প্রভৃতি কিমি দূরত্ব দেখান হইয়াছে। কাজেই এই স্কেল অনুসারে মানচিত্রে যে-কোন দুইটি স্থানের মধ্যে যে দূরত্ব পাওয়া যাইবে, তাহার সাহায্যে স্কেলের গায়ে লেখা অঙ্কের অনুপাতে ঐ দুই স্থানের ভূপৃষ্ঠে প্রকৃত দূরত্ব জানা যাইবে।

ডায়াগন্যাল (Diagonal) **স্কেলের** সাহায্যে রৈখিক মাপের স্কেল অপেক্ষা আরও সূক্ষ্ম হিসাবে দূরত্ব স্থির করা যায়। নীচের চিত্রে নীচে 1, 2, 3 প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা রৈখিক মাপে ৪ সেমি দূরত্ব দেখান হইয়াছে। আর পাশে A B দূরত্ব এবং তাহার সোজাসুজি উপর দিকে U.V. দূরত্ব দ্বারা এক সেমিকে ১০টি ক্ষুদ্রতর ভাগে বিভক্ত করা

হইয়াছে। ইহাদের সাহায্যে ·1, ·2, ·3 প্রভৃতি সেমি মাপ দেখান সম্ভবপর। তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ভাগ অর্থাৎ ·01, ·02, ·03···8, ·81, 82 ··· ইত্যাদি ভাগ নির্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে A U এবং B V দূরত্বকেও সমান ১০ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার ফলে D, F, N প্রভৃতি যে-কোন অক্ষরের সমসূত্রে এরূপ ক্ষুদ্রতর বিভাগ হিসাব করিয়া মানচিত্রে প্রকৃত দূরত্ব স্থির করা যায়। আর তাহার সাহায্যে ভূপৃষ্ঠে প্রকৃত দূরত্বের সহিত অনুপাতও নির্দেশ করা যায়।

চিত্রসঙ্কেত বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন (Map legends)—মানচিত্রে প্রাকৃতিক (পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী, হ্রদ, জলাভূমি, তৃণভূমি, অরণ্য প্রভৃতি) এবং মানবিক বা সাংস্কৃতিক (স্থলপথ, রেলপথ, সেতু, গ্রাম, শহর, মন্দির প্রভৃতি) যে সকল বিষয় দেখান হয়, তাহাদের প্রত্যেকটি যাহাতে ঠিকমত নির্দেশ করিতে পারা যায় সেই উদ্দেশ্যে কতক সঙ্কেত চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এরূপ সঙ্কেত সাধারণতঃ সমগ্র পৃথিবীতে সমভাবে ব্যবহৃত হয় এবং এগুলি **সাঙ্কেতিক চিহ্ন** (Conventional signs) নামে পরিচিত। ৪৭৫ পৃষ্ঠার চিত্রে কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় সঙ্কেত দেখান হইল। পরের দুই পৃষ্ঠায় (৪৭৬-৭৭) কোন্ সঙ্কেত দ্বারা কোন্ জিনিস নির্দেশ করা হয় তাহা লেখা হইয়াছে।

মানচিত্র স্থাপন (Setting of the map)—মানচিত্র পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে তাহা এমন ভাবে স্থাপন করা উচিত যাহাতে মানচিত্রে নির্দিষ্ট উত্তরদিক্ ও প্রকৃত উত্তর দিক্ (True North) একই দিক্ হয়। [উত্তরদিক্ সাধারণতঃ ম্যাগনেটিক কম্পাসের সাহায্যে স্থির করা হয়। ইহাকে ম্যাগনেটিক নর্থ (Magnetic North) বলে। ইহা ভৌগোলিক উত্তর (Geographic North) বা প্রকৃত উত্তরদিক্ (True North) নহে। এই দুই উত্তরদিকের মধ্যে পার্থক্য টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্রে নির্দেশ করা থাকে।]

(২) **প্রাকৃতিক** (Physical) **অবস্থা**

টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্রের সাহায্যে ভূপ্রকৃতির অবস্থা প্রায় নির্ভুল ভাবে জানিতে পারা যায়। **পাহাড়, পর্বতের** বিস্তার, তাহাদের মধ্যবর্তী উপত্যকা, বিভিন্ন অংশের পর্বতশৃঙ্গ প্রভৃতি এই মানচিত্রে খুব স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা থাকে। তাহাছাড়া **সমোচ্চ-রেখার** (Contour) সাহায্যে ভূপ্রকৃতির ঢাল সহজেই লক্ষ্য করা যায়। আর এই ঢালের সাহায্যে **নদনদীর** প্রবাহের দিক বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হয়। নদীর জলের প্রবাহও (তীরের সাহায্যে) বুঝা যায়। এমন কি, জোয়ার-ভাঁটাও নির্দেশ করা থাকে। তাহাছাড়া বনভূমির বিস্তার, বিভিন্ন প্রকার গাছও লক্ষ্য করা যায়।

(৩) **মানবিক বা সাংস্কৃতিক** (Cultural) **অবস্থা**

নানাপ্রকার সাঙ্কেতিক চিহ্নের সাহায্যে কূপ, পুকুর, **লোকবসতি, যাতায়াত ও পরিবহনের** নানাপ্রকার ব্যবস্থা (সরু ও প্রশস্ত রেলপথ, স্থলপথ, নৌপথ, ফেরি প্রভৃতি) লক্ষ্য করা যায়। তারপর বিভিন্ন অংশের **ভূমির ব্যবহারও** (Land uses) লক্ষ্য করা যায়। **শহর, নগর, গ্রাম** প্রভৃতির অবস্থিতি ও গুরুত্বও (বড় বা ছোট অক্ষর ও অন্যান্য সাঙ্কেতিক চিহ্নের সাহায্যে) বুঝিতে পারা যায়।

(৪) **উপসংহার** (Conclusion) **ও মন্তব্য** (Remarks)

টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্রে জলবায়ুর অবস্থা নির্দেশ করা থাকে না। কিন্তু অবস্থিতি (অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমান্তর), ভূপ্রকৃতি প্রভৃতির সাহায্যে জলবায়ুর অবস্থা সাধারণ ভাবে বুঝিতে পারা যায়। স্বাভাবিক উদ্ভিদ্, নদনদী, লোকবসতি প্রভৃতির সহিত জলবায়ুর সম্পর্ক গভীর। কাজেই এসকল বিষয়ের আলোচনা সম্পর্কেও জলবায়ুর প্রভাব উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের খনি, বন প্রভৃতির অবস্থিতি লক্ষ্য করিয়া শিল্পের প্রতিষ্ঠা, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার প্রসার, লোকবসতি প্রভৃতি সম্পর্কেও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা আলোচনা করা যাইতে পারে।

টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র পাঠের নমুনা

এদেশের সমভূমি, মালভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলের মোট পাঁচটি মানচিত্রের কিছু কিছু অংশের পাঠের নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল। (মনে রাখিতে হইবে, ইহা নমুনা মাত্র—সম্পূর্ণ মানচিত্র পাঠের পূর্ণ বিবরণ নহে।)

(ক) সমভূমি অঞ্চল—নিম্নগঙ্গা সমভূমি

(১) পরিচিতি বা সনাক্তকরণ ও মার্জিন্যাল বিবরণ

(১) সার্ভে অব ইণ্ডিয়া কোয়ার্টার ইঞ্চি সীট নং ৭৯ এ (প্রথম সংস্করণ)—কৃষ্ণনগর

(২) বঙ্গদেশ (Bengal)

(৩) বর্ধমান, হুগলি, যশোহর, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা

(৪) জরিপ (Survey)—১৯১৬-১৭ এবং ১৯১৯-২০

(৫) স্কেল—এক ইঞ্চি = ৪ মাইল বা ১ : ২৫৩,৪৪০

(৬) অবস্থিতি—দ্রাঘিমান্তর ৮৮° পূঃ দ্রাঃ হইতে ৮৯° পূঃ দ্রাঃ এবং অক্ষাংশ ২৩° উঃ অঃ হইতে ২৪° উঃ অঃ।

(৭) আয়তন—দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৯½ মাইল ও প্রস্থ ৬৪ মাইল ; মোট আয়তন ৪৪৩৭ বর্গ মাঃ বা ১১,৩৭০ বর্গ কিমি।
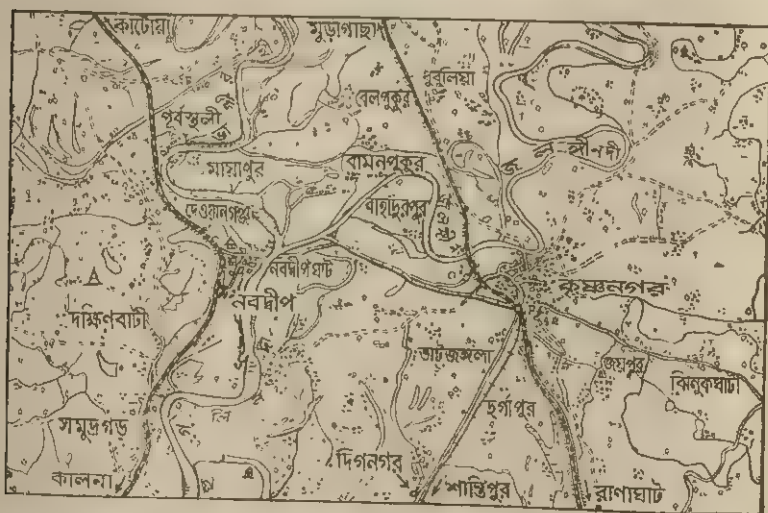
উপরোক্ত সীট অবলম্বন করিয়া অঙ্কিত মানচিত্রের একটি মাত্র অংশ উপরের চিত্রে দেখান হইয়াছে। তাহার ভৌগোলিক বিবরণ পাঠের নমুনা নিম্নরূপ।

(২) **প্রাকৃতিক অবস্থা**

ভূপ্রকৃতি—ইহা একটি সম্পূর্ণ সমতল অঞ্চল। তবে ভূমির ঢাল দক্ষিণদিকে। তাহার প্রমাণ, ভাগীরথী-হুগলি নদী দক্ষিণদিকে প্রবাহিত এবং জলঙ্গী নদী দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে আসিয়া নবদ্বীপের নিকট ভাগীরথী-হুগলি নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

নদনদী—এখানকার প্রধান নদী **ভাগীরথী-হুগলি**। ইহা এই অঞ্চলের উপর দিয়া দক্ষিণদিকে প্রবাহিত। **জলঙ্গী** নদী দক্ষিণপশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইয়া (কৃষ্ণনগরের পশ্চিমে) নবদ্বীপের নিকট ভাগীরথী-হুগলির সহিত মিলিত হইয়াছে। এই মিলন-স্থলের উত্তরে প্রধান নদীটির নাম ভাগীরথী ও দক্ষিণে হুগলি নদী। ইহা এবং জলঙ্গী উভয় নদীই অত্যন্ত আঁকাবাঁকা পথে (Meandering course) প্রবাহিত। ভাগীরথীর মায়াপুরের পাশের বাঁক ও জলঙ্গীর বাঁকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে কয়েকটি নদীর বিচ্ছিন্ন অংশ এবং অশ্বখুরাকৃতি হ্রদও আছে। এখানে কতক আলাদা হ্রদও আছে।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ্—এই অঞ্চলের সর্বত্র গাছপালা দেখা যায়। তবে ঘন বন নাই।

(৩) **মানবিক বা সাংস্কৃতিক অবস্থা**

যাতায়াত ও পরিবহন—এই অঞ্চলে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা নিম্নরূপ :

স্থলপথ—কৃষ্ণনগর হইতে একটি পাকা রাস্তা জয়পুর ও ঝিনুকঘাটার পাশ দিয়া দক্ষিণপূর্বদিকে গিয়াছে। ঐরূপ আর একটি পথ দুর্গাপুর ও দিগনগরের পাশ দিয়া দক্ষিণপশ্চিমে শান্তিপুরের দিকে গিয়াছে। তৃতীয় একটি পথ পশ্চিমে নবদ্বীপ ঘাটের দিকে গিয়াছে। তাহাছাড়া কাঁচা রাস্তাও আছে অনেক।

রেলপথ—এই অঞ্চলে দুইটি প্রশস্ত রেলপথ ও একটি সরু রেলপথ আছে। প্রধান রেলপথ কৃষ্ণনগর হইতে উত্তরে মুড়াগাছের দিকে ও দক্ষিণে রাণাঘাটের দিকে বিস্তৃত। কৃষ্ণনগর হইতে একটি সরু রেলপথ দক্ষিণপশ্চিমে শান্তিপুরের দিকে গিয়াছে। আর একটি প্রশস্ত রেলপথ নবদ্বীপ হইতে উত্তরে কাটোয়ার দিকে ও দক্ষিণে কালনার দিকে বিস্তৃত।

নৌপথ—ভাগীরথী-হুগলি যথেষ্ট চওড়া নদী। বর্ষাকালে এই নদীতে নৌকা, লঞ্চ প্রভৃতি যাতায়াত করে। জলঙ্গী নদীও তখন যাতায়াতের পক্ষে সহায়ক।

লোকবসতি—এখানকার প্রায় সর্বত্র চাষ আবাদ হয়। তাই এই অঞ্চলের প্রায় সকল অংশেই লোকবসতি আছে। এখানকার লোকালয়সমূহের মধ্যে **কৃষ্ণনগর** সর্বপ্রধান। (ইহা নদীয়া জেলার প্রধান শহর।) পশ্চিমে ভাগীরথী ও জলঙ্গীর মিলন-স্থলের নিকট অবস্থিত **নবদ্বীপও** একটি বিখ্যাত স্থান। ইহা সংস্কৃত শিক্ষার একটি

প্রধান কেন্দ্র এবং বিখ্যাত তীর্থ। (চিত্রে দেখা যায়, এখানে অনেক মন্দির আছে।) ইহার উত্তরে মায়াপুর, পূর্বস্থলী এবং কৃষ্ণনগরের উত্তরে ধুবুলিয়া, বেলপুকুর প্রভৃতিও প্রসিদ্ধ স্থান।

(৪) **উপসংহার**—এই অঞ্চলটি ২৩° উঃ অঃ ও ২৪° উঃ অ: এর মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণনগরের পাশ দিয়া কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩½° উঃ অঃ) পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। এখানকার অবস্থিতির জন্য এই অঞ্চল উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত এবং এখানকার জলবায়ু মৌসুমী প্রকৃতির। সমুদয় অংশের স্বাভাবিক উদ্ভিদ, কৃষিকার্য প্রভৃতি সম্পর্কে জলবায়ুর প্রভাব উল্লেখযোগ্য। উত্তম যাতায়াত ব্যবস্থার (বিশেষতঃ রেলপথ) জন্য কলিকাতার সহিত এখানকার যোগাযোগের সুবিধা খুব বেশী। ভাগীরথী-হুগলি নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি হইলে এখানকার অনেক বেশী উন্নতির সম্ভাবনা।

সমভূমি অঞ্চল—মধ্যগঙ্গা সমভূমি

(১) পরিচিতি বা সনাক্তকরণ ও মার্জিন্যাল বিবরণ

(১) সার্ভে অব ইণ্ডিয়া সীট নং ৬৩কে/১২ (অংশ)

(২) উত্তর প্রদেশ
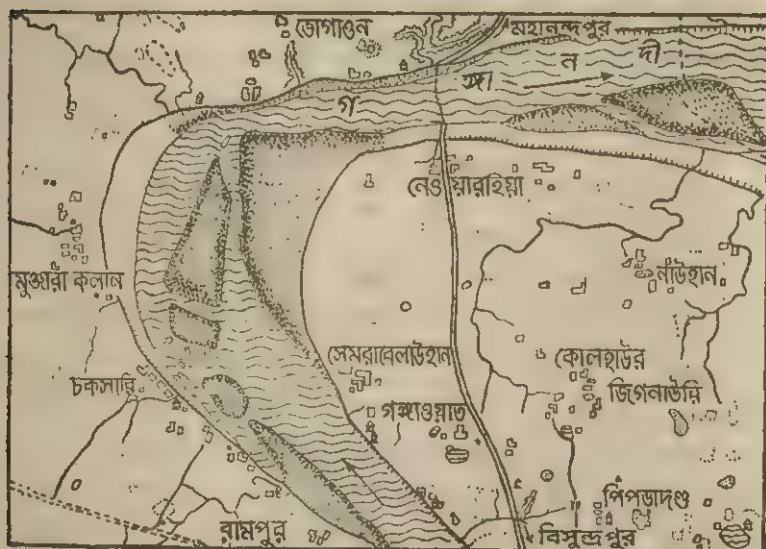
(৩) বারাণসী ও মির্জাপুর জেলা

(৪) স্কেল—এক ইঞ্চি = এক মাইল বা ১ : ৬৩, ৩৬০

(৫) অবস্থিতি—৮২° ৩০´ পূঃ দ্রাঃ ও ৮২° ৩৭´ ৩০´´ পূঃ দ্রাঃ এবং ২৫° ১০´ উঃ অঃ ও ২৫° ১৫´ উঃ অঃ এর অন্তর্গত।

(৬) আয়তন—৫$\frac{3}{4}$ মাইল × ৭$\frac{3}{4}$ মাইল বা ৪৪$\frac{1}{2}$ বর্গমাইল বা প্রায় ১১৫ বর্গ কিমি।

উপরোক্ত সীট অবলম্বন করিয়া অঙ্কিত মানচিত্রের একটি মাত্র অংশ পূর্ব পৃষ্ঠাতে দেখান হইয়াছে। তাহার ভৌগোলিক বিবরণ পাঠের নমুনা নিম্নরূপ।

(২) **প্রাকৃতিক অবস্থা**

ভূপ্রকৃতি—ইহা একটি সমভূমি অঞ্চল। ইহা মধ্যগঙ্গা সমভূমির অন্তর্গত। ফলে, এখানকার ভূমি নিম্নগঙ্গা সমভূমির তুলনায় সামান্য উচ্চ।

নদনদী—এখানকার একমাত্র নদী গঙ্গা। এখানে নদীটি দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে কিছুদূর গিয়া বাঁকিয়া পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। (তীর চিহ্নদ্বারা প্রবাহের দিক দেখান হইয়াছে।) নদীটি এখানে খুব চওড়া। তাহার গতিপথে আছে অনেক বালুচর। (সমভূমি অঞ্চলের উপর দিয়া অত্যন্ত ধীর গতিতে প্রবাহের ফল।) নদীর মাঝখানে সারা জল থাকিলেও দুই পাশের কিছু অংশ শুষ্ক। নদীর দুই তীরে দীর্ঘ বাঁধ দেখা যায়। (দাঁতের মত চিহ্ন।) তাহার কারণ, এই নদীতে প্রায়ই প্লাবন বা বন্যা হয়। তাহার প্রভাব হইতে দুই পাশের জমিকে রক্ষা করিবার জন্য বাঁধ দেওয়া হইয়াছে।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ—এই অঞ্চলে স্বাভাবিক উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত কম।

(৩) **মানবিক বা সাংস্কৃতিক অবস্থা**

যাতায়াত ও পরিবহন—এই অঞ্চলে যাতায়াত সম্পর্কে **নৌপথের** গুরুত্ব অধিক। **গঙ্গানদীর** গতিপথে কতক বালুচর থাকিলেও নদীটি যাতায়াতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। স্থলপথের মধ্যে একটি বাঁধান পথ উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। দক্ষিণ-পশ্চিম অংশেও আছে একটি পথ।

লোকবসতি—চাষ-আবাদের সুযোগের ফলে এখানে লোকবসতি প্রচুর; গঙ্গার দুই তীরেই বেশী। তবে গ্রামগুলি বড় নহে। এখানে বহু মন্দির আছে।

(৪) **উপসংহার**—এই অঞ্চলটি ২৫° উঃ অঃ এর সামান্য উত্তরে অবস্থিত। সুতরাং এখানকার জলবায়ুও উষ্ণ মৌসুমী প্রকৃতির। তবে এখানে নিম্নগঙ্গা সমভূমির তুলনায় বৃষ্টি কম। তাহা সত্ত্বেও বিস্তৃত সমভূমির উপর দিয়া গঙ্গার প্রবাহের ফলে এখানে প্রচুর বন্যা হয়। এখানকার মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর বন্যার প্রভাব খুব বেশী। এই বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ভাল ব্যবস্থা করিলে এখানকার প্রভূত উন্নতি হইবে।

(খ) নিম্ন মালভূমি অঞ্চল

(১) পরিচিতি বা সনাক্তকরণ ও মার্জিন্যাল বিবরণ

(১) সার্ভে অব ইণ্ডিয়া সীট নং ৬৩ কে/১২ (অংশ)

(২) উত্তর প্রদেশ

(৩) মির্জাপুর জেলা

(৪) স্কেল—এক ইঞ্চি=এক মাইল বা ১ : ৬৩, ৩৬০। সমোন্নতি রেখার ব্যবধান (Contour interval) ৫০ ফুট।

(৫) অবস্থিতি—৮২°৩০′ পূঃ দ্রাঃ হইতে ৮২°৩৭′৩০″ পূঃ দ্রাঃ মধ্যে এবং ২৫° উঃ অঃ হইতে ২৫° ৫′ উঃ অঃ মধ্যে।

(৬) আয়তন—৫১/২ মাইল × ৭১/২ মাইল বা ৪৪৩/৪ বর্গমাইল বা প্রায় ১১৫ বর্গ কিমি।

উপরোক্ত সীট অবলম্বন করিয়া অঙ্কিত মানচিত্রের একটি মাত্র অংশ উপরে দেখান হইয়াছে। তাহার ভৌগোলিক বিবরণ পাঠের নমুনা নিম্নরূপ।

(২) প্রাকৃতিক অবস্থা

ভূপ্রকৃতি—ইহা একটি মালভূমি অঞ্চল। (**বিন্ধ্য পর্বতের** পাদদেশের মালভূমির উত্তর অংশ।) এখানকার মাঝখানের বেশীর ভাগ জায়গা ৫০০ ফুটের অধিক উঁচু। **রাজঘাটের** নিকটবর্তী অংশ **সবচেয়ে বেশী উঁচু** (৫৭১ ফুট)। এখান হইতে ভূমি চারিদিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমদিকে ভূমির ঢাল কম, অর্থাৎ খুব ধীরে ঢালু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্বদিকে ভূমির ঢাল তাহা অপেক্ষা অধিক খাড়া, **উত্তরদিকে**

(রাজঘাটের ঠিক উত্তরে) ঢাল **সবচেয়ে বেশী খাড়া** (Scarp)। তারপর ৩৫০ ফুট পর্যন্ত নামিবার পর দেখা যায় অনেক জায়গা ঐ সমতলে অবস্থিত। উত্তরপূর্বদিকে নদীর দুই পাশে সামান্য জায়গার উচ্চতা ৩০০ ফুট। আবার উত্তরপূর্ব সীমান্তে ভূমি খুব সামান্য দূরত্বের মধ্যেই ৫০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হইয়া গিয়াছে। এখানেও ঢাল খুব খাড়া (Scarp)। এই অঞ্চলের দক্ষিণ অংশে দুইটি স্থান সামান্য উঁচু (৫৩৪ ফুট ও ৫৪২ ফুট)। ইহারা ফুলিয়ারির যথাক্রমে পশ্চিম ও উত্তরপূর্বদিকে অবস্থিত।

নদনদী—এই অঞ্চলের পূর্বদিকের সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়া কুয়ারিদারি নদী দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে প্রবাহিত। (দক্ষিণ অংশের ভূমির উচ্চতা ৪৫০ ফুট, উত্তর অংশে ৩০০ ফুট।) এই অঞ্চলের পশ্চিমে একটি হ্রদ আছে, নাম তান্দাদরি তাল (=হ্রদ)।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ—এখানে স্বাভাবিক উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত কম। তবে পাহাড়ের গায়ে গাছপালা আছে। কিন্তু ঘন বন নাই।

(৩) মানবিক বা সাংস্কৃতিক অবস্থা

যাতায়াত ও পরিবহন—এই অংশে কয়েকটি বাঁধান স্থলপথ আছে। একটি পথ এই অঞ্চলের দক্ষিণ অংশের ফুলিয়ারির পাশ দিয়া ও মধ্যভাগের রাজঘাটের পাশ দিয়া সোজাসুজি উত্তরদিকে গিয়াছে। রাজঘাটের উত্তরদিক হইতে একটি পথ পশ্চিমদিকে বিশ্বেশ্বরপুর ও চিংপুরের পাশ দিয়া বিস্তৃত হইয়াছে। আর একটি পথ পূর্বদিকে চলিয়া গিয়াছে। রাজঘাট ও বিশ্বেশ্বরপুরের প্রায় মধ্যস্থল হইতে একটি পথ দক্ষিণদিকে গিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া উভয় পথই দক্ষিণদিকে চলিয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলের দক্ষিণ অংশে ফুলিয়ারির পাশ দিয়া আর একটি পথ পশ্চিমদিকে প্রায় তান্দাদরি তাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা দক্ষিণদিকে বিস্তৃত সকল পথের সহিত যুক্ত।

লোকবসতি—এখানকার মাঝখানের উচ্চ অংশের লোকবসতি খুব কম। তবে সর্বোচ্চ অংশেই রাজঘাট অবস্থিত। এখানে লোকালয়গুলি উত্তর ও দক্ষিণ অংশেই অপেক্ষাকৃত বেশী। উত্তর অংশের নিম্ন (৩০০-৩৫০ ফুট) উচ্চতা ইহার একটি প্রধান কারণ। পশ্চিম অংশে হ্রদের আশপাশেও লোকবসতি অধিক।

উপসংহার—এই অঞ্চলও উষ্ণমণ্ডলে (২৫° উঃ অঃ নিকট) অবস্থিত। তবে এখানকার ভূপ্রকৃতি সামান্য উঁচু (নিম্ন মালভূমি)। জলবায়ু (বিশেষতঃ বৃষ্টিপাত) সম্পর্কে এরূপ উচ্চতার প্রভাব আছে। মাঝখানের উচ্চ অংশের পশ্চিম ও উত্তরদিকে বৃষ্টিপাত কম হওয়া স্বাভাবিক। (মৌসুমীবায়ু এখানে পূর্বদিক হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়।)

ছোটনাগপুর মালভূমি

(১) পরিচিতি বা সনাক্তকরণ ও মার্জিন্যাল বিবরণ

(১) সার্ভে অব ইণ্ডিয়া সীট নং ৭২ এল

(২) বিহার

(৩) ভাগলপুর, গয়া, হাজারিবাগ, মানভূম, মুঙ্গের ও সাঁওতাল পরগনা জেলা

(৪) স্কেল—এক ইঞ্চি = ৪ মাইল বা ১ঃ ২৫৩, ৪৪০

সমোন্নতি রেখার ব্যবধান (Contour interval) ২৫০ ফুট

(৫) অবস্থিতি—৮৬° পূঃ দ্রাঃ হইতে ৮৭° পূঃ দ্রাঃ এবং ২৪° উঃ অঃ হইতে ২৫° উঃ অঃ মধ্যে।

(৬) আয়তন—৬৯½ মাইল × ৬৪ মাইল বা ৪৪৩৭ বর্গমাইল বা ১১, ৩৬০ বর্গকিমি। উপরোক্ত সীট অবলম্বন করিয়া অঙ্কিত মানচিত্রের একটি মাত্র অংশ উপরে দেখান হইয়াছে। তাহার ভৌগোলিক বিবরণ পাঠের নমুনা নিম্নরূপ।

(২) প্রাকৃতিক অবস্থা

ভূপ্রকৃতি—ইহা ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ। এখানকার বেশীর ভাগ ১০০০ ফুটের অধিক উঁচু। এখানকার মধ্যভাগের পশ্চিম অংশে পাহাড়পুরের পূর্বদিকে **সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ** (১৩৬২ ফুট উঁচু)। তথা হইতে ভূমি চারিদিকে ঢালু। তবে চারি পাশে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত নীচু শৃঙ্গ আছে। উত্তরপশ্চিম সীমার নিকট শৃঙ্গটি ১১৭৭ ফুট, বাদগুণ্ডা কলানের নিকট শৃঙ্গটি ১২১৯ ফুট উঁচু। এই অঞ্চলের মধ্যভাগের গিরিডির

পূর্বদিকেও কয়েকটি ঐ জাতীয় উঁচু শৃঙ্গ আছে। উত্তরপূর্বে মহেশমুণ্ডার পাশে ১১৫১ ফুট, দক্ষিণপূর্বে জবরদহর পশ্চিমে ১১৩৪ ফুট ও পূর্বদিকে ১.৬৫ ফুট। এখানকার ভূপ্রকৃতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণসীমার নিকট ভূমি খুব নীচু হইয়া গিয়াছে; উচ্চতা ৮৩৭ ফুট। তাই ইহা স্পষ্ট যে ভূমি এখানে বেশ খাড়া ভাবে **দক্ষিণে ঢালু** হইয়া গিয়াছে।

নদনদী—এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য নদী **বরাকর** (দামোদরের উপনদী)। ইহা পশ্চিম সীমার মধ্যভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণপূর্বদিকে আসিয়া হঠাৎ দক্ষিণ দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। (এখানকার ভূমি দক্ষিণ দিকে ঢালু এজন্য অনেক পরিমাণে দায়ী।) এই অঞ্চলে অনেক ছোট নদীও আছে। অনেকগুলিই বরাকরের উপনদী। বালুকাযুক্ত অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহের ফলে এখানকার বেশীরভাগ নদীর পাড় ভাঙ্গা।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ—এই অঞ্চল ঘন বনে পরিপূর্ণ। এবিষয়ে ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ুর প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

(৩) মানবিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

যাতায়াত ও পরিবহন—মালভূমি অঞ্চল সত্ত্বেও এখানকার যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত। এখানকার প্রধান স্থলপথ গিরিডি হইতে দক্ষিণপশ্চিমে ও উত্তর-পূর্বদিকে বিস্তৃত। আর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ পথ গিরিডি হইতে দক্ষিণপূর্বে ও উত্তরপশ্চিমে গিয়াছে। তথা হইতে সোজাসুজি উত্তরদিকেও পথ গিয়াছে। স্পষ্টই বুঝা যায় গিরিডিই এই অঞ্চলের কেন্দ্র। তথা হইতে প্রশস্ত রেলপথ পূর্বদিকে মধুপুরের দিকে গিয়াছে। আবার একটি শাখা দক্ষিণদিকে ঘুরিয়া পশ্চিমে কাহারবাড়ি পর্যন্ত গিয়াছে। এখানে নদী আছে, কিন্তু ভূপ্রকৃতির অসুবিধার জন্য নৌপথে যাতায়াত সম্ভবপর নহে।

লোকবসতি—মালভূমি সত্ত্বেও এই অঞ্চলে লোকবসতি কম নহে। তাহার কারণ এখানকার অনেক স্থানের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। গিরিডি, পাহাড়পুর প্রভৃতির নাম এসম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহাছাড়া এই অঞ্চল ছোটনাগপুরের বিখ্যাত খনি অঞ্চলের অন্তর্গত। তন্মধ্যে গিরিডি ও কাহারবাড়ি উল্লেখযোগ্য। (সমগ্র ছোটনাগপুরেই নূতন নূতন খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হইতেছে।)

উপসংহার—এই অঞ্চলে ভূগর্ভে লুকান খনিজ সম্পদ ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে আবিষ্কারের ফলে এবং তারপর তাহাদের ও এখানকার বনজ সম্পদের সাহায্যে নূতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা খুব বেশী। ফলে, এখানকার অর্থনৈতিক উন্নতি হইবে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে এখানে লোকবসতি বৃদ্ধি পাইবে। এখানকার উপজাতি-গণের বৈশিষ্ট্যও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য।

(গ) পার্বত্য অঞ্চল

(১) পরিচিতি বা সনাক্তকরণ ও মার্জিন্যাল বিবরণ

(১) সার্ভে অব ইণ্ডিয়া সীট নং ৫৩ বি/১৩ (অংশ)

(২) হিমাচল প্রদেশ

(৩) স্কেল—এক ইঞ্চি=এক মাইল বা ১ ; ৬৩, ৩৬০

সমোন্নতি রেখার ব্যবধান (Contuor interval) ৫০ ফুট

(৪) অবস্থিত—১৬°৫২'৩০" পূঃ দ্রাঃ হইতে ১১° পূঃ দ্রাঃ এবং ৩০°৪৫' উঃ অঃ হইতে ৩০°৫০' উঃ অঃ মধ্যে

(৫) আয়তন—৭½ মাইল × ৫¾ মাইল বা ৪৩ বর্গ মাইল বা ১১০ বর্গ কিমি।

উপরোক্ত সীট অবলম্বন করিয়া অঙ্কিত মানচিত্রের মাত্র একটি অংশ উপরে দেখান হইয়াছে। তাহার ভৌগোলিক বিবরণ পাঠের নমুনা নিম্নরূপ।

(২) **প্রাকৃতিক অবস্থা** –ইহা বহিঃহিমালয় বা নিম্ন হিমালয় পর্বতের অন্তর্গত **সিবালিক পর্বতের** একটি অংশ। এখানকার উত্তরপূর্ব অংশ সর্বাপেক্ষা অধিক উচ্চ (৪২৫০ ফুট)। এখান হইতে ভূমি দক্ষিণদিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণপশ্চিম ও দক্ষিণদিকের সমোচ্চরেখার দিকে লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় এখানে পর্বত যেন প্রায় সমান্তরাল (Parallel) ভাবে ধাপে ধাপে নামিয়া গিয়াছে। তাহার মাঝে মাঝে ২/১টি ছোট শৃঙ্গ আছে। দক্ষিণদিকের তুলনায় পশ্চিমদিকের ঢালু কম। বস্তুতঃ সিবালিক পর্বতও হিমালয়ের অন্যান্য শাখা প্রশাখার বা শ্রেণীর মত **পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত।** সেজন্য পশ্চিমদিকের ভূমির উচ্চতা প্রায় পূর্বদিকের অংশের মত।

নদনদী –এখানে কোন বড় নদী নাই, কিন্তু ছোট নদী **অসংখ্য।** নদীগুলির উৎস উত্তরপূর্ব অংশের সর্বোচ্চ অঞ্চল। তথা হইতে অসংখ্য নদনদী উৎপন্ন হইয়া **ভূমির ঢাল অনুসারে** বিভিন্ন দিকে **বহিয়া গিয়াছে** (Radiate)। ভূমির ঢালের সহিত নদীর গতি ও প্রবাহের ঘনিষ্ট সম্পর্ক এখানে অতিশয় সুস্পষ্ট।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ –এই অঞ্চল বনপূর্ণ। এখানকার ভূপ্রকৃতি এবং বৃষ্টির জল ও উপর অংশের বরফ গলা জল উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। (ঘন সমোচ্চ রেখার জন্য চিত্রের দক্ষিণপশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে বনের চিহ্ন 'গাছ' দেখান হয় নাই।)

(৩) **মানবিক বা সাংস্কৃতিক অবস্থা**

যাতায়াত ও পরিবহন –পার্বত্যভূমি এবং ঘন বনের জন্য এখানে প্রশস্ত স্থলপথ নাই। তবে পাহাড়ের ঢাল অনুসারে পায়ে চলার সরু পথ যথেষ্ট আছে।

লোকবসতি –উচ্চ ভূপ্রকৃতি ও ঘন বনের জন্য এখানে লোকবসতি স্বভাবতঃ কম। বিশেষতঃ দক্ষিণপশ্চিম ও দক্ষিণদিকের ঢালে তাহা সুস্পষ্ট। কিন্তু পশ্চিমদিকে প্রায় সমোচ্চ অংশে বেশ কয়েকটি গ্রাম আছে। তবে এখানকার গ্রামগুলি সমভূমি অঞ্চলের গ্রামের মত ঘন বা বড় নহে। অনেক ক্ষেত্রেই এক একটি গ্রাম পরস্পর হইতে বেশ দূরে দূরে। যাতায়াত ও জীবিকা অর্জনের অসুবিধা এজন্য অনেক পরিমাণে দায়ী।

উপসংহার –এই অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদের ও বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ সম্পদের সাহায্যে কতক শিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর। তাহাছাড়া পশুপালনেরও ভাল ব্যবস্থা করা যায়। খনিজ সম্পদের সাহায্যে কতক শিল্পও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর। এসকল বিষয়ে উন্নতি হইলে এখানকার লোকবসতি বৃদ্ধি হইবে এবং তখন যাতায়াত ও পরিবহন প্রভৃতি বিষয়েও উন্নতি হইবে।

অনুশীলনী

১। স্কেল কাহাকে বলে ? মানচিত্র তৈরী ও পাঠের জন্য স্কেলের আবশ্যকতা কি ? রৈখিক স্কেলের তুলনায় ডায়াগন্যাল স্কেলের উপযোগিতা বেশী কেন ? স্কেল কি কি উপায়ে সাধারণতঃ নির্দেশ করা হয় ? ২। উদ্দেশ্য অনুসারে মানচিত্র কয়টি প্রধান ভাগে বিভক্ত ? ছোট স্কেল ও বড় স্কেলে তৈরী মানচিত্রের ব্যবহার সম্পর্কে কি পার্থক্য ? ক্যাডাস্ট্যাল মানচিত্র ও টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্রের মধ্যে পার্থক্য কি ? টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র পাঠের সময় কোন্ কোন্ বিষয় আলোচনা করা হয় ? ৩। ভারতের বিভিন্ন প্রকার ভূপ্রকৃতির তিন খানা টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র পাঠের বিবরণ লিখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূপ্রকৃতি বা ভূমির উচ্চতা প্রদর্শন

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশের উচ্চতা নিম্নলিখিত নানা পদ্ধতিতে নির্দেশ করা হয়।

(ক) **ভ্রূলেখা** (Hachures)—পাহাড়, পর্বতের বিভিন্ন দিকের ঢাল (slope) সমান নহে। কোন দিকে ঢাল কম (gentle) এবং কোথাও বেশী, কোথাও বা ভূমি খুব খাড়া (steep slope)। বিভিন্ন স্থানের ভূমির ঢাল সম্বন্ধে এরূপ বিভিন্ন অবস্থা বুঝাইবার জন্য পাহাড়, পর্বতের উপর হইতে নীচের দিকে খুব ছোট ছোট রেখা আঁকা হয়। যেখানে ভূমি কম ঢালু, সেখানকার রেখাগুলি কম বা খুব হালকা। আর যেখানে ভূমি বেশী ঢালু বা খাড়া, সেখানকার রেখাগুলি খুব ঘন। এরূপ ব্যবস্থাকেই ভ্রূলেখা বলা হয়। ইহার সাহায্যে ভূমির ঢাল সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা জন্মে, সঠিক ধারণা হয় না। অথবা কি মাপে ভূমির ঢালু বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে তাহা বুঝা যায় না।

(খ) **ছায়াপাত** (Shading)—পাহাড় পর্বতের উপর সূর্যের কিরণ পড়িবার ফলে তাহাদের কতক অংশ অধিক কাল আবার কতক অংশ অধিক ফর্সা দেখায়। একারণে পাহাড় পর্বতের উচ্চতা বুঝাইবার জন্যও কাল ও সাদা (Light and shade) চিহ্ন দেওয়া হয়। ইহাকেই বলা হয় ছায়াপাত। ইহার সাহায্যেও কোন স্থানের উচ্চতা সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা জন্মে।

কখন কখন এক একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের সমভূমি, মালভূমি, পর্বত প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য অন্য প্রকার চিহ্ন বা ছায়াপাতের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন, সমভূমি বুঝাইবার জন্য হয়ত মানচিত্রে সমভূমি অঞ্চলকে সাদা রাখা হয়, উচ্চ পর্বত

বুঝাইবার জন্য কাল রঙের রেখা আঁকা হয়। তাহার ফলে পর্বত কোন্ দিকে বিস্তৃত তাহা সহজেই বুঝা যায়। তারপর নিম্ন মালভূমি বুঝাইবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু দেওয়া হয় এবং উচ্চ মালভূমি বুঝাইবার জন্য ঐরূপ বিন্দু খুব ঘন ঘন দেওয়া হয় বা অন্য কোন প্রকার চিহ্ন দেওয়া হয়।

আবার কখনও বা বিভিন্ন প্রকার উচ্চতা বুঝাইবার জন্য পৃথক্ পৃথক চিহ্নও ব্যবহার করা হয়। যেমন, সাধারণতঃ ০ হইতে ২০০ মি পর্যন্ত উচ্চতা বুঝাইবার জন্য একপ্রকার চিহ্ন, ২০১ হইতে ৪০০ মি পর্যন্ত উচ্চতা বুঝাইবার জন্য দ্বিতীয় প্রকার চিহ্ন, ৪০১ হইতে ৬০০ মি পর্যন্ত অন্য প্রকার চিহ্ন ইত্যাদি।

(গ) **রঙ** (Colouring)—বিভিন্ন মানচিত্রে, বিশেষতঃ ভূচিত্রাবলীতে (Atlas), ভূমির উচ্চতা বুঝাইবার জন্য নানারকম রঙ ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় স্থলভাগের কম ও বেশী উচ্চতা বুঝাইবার জন্য একটি রঙকেই খুব হাল্কা হইতে ক্রমশঃ অধিক গাঢ় করিয়া ব্যবহার করা হয়। সেরূপ সমুদ্রের অগভীর অংশ হইতে ক্রমশঃ অধিক গভীর অংশ বুঝাইবার জন্যও একটি রঙকেই হাল্কা হইতে ক্রমশঃ অধিক গাঢ় করিয়া ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ সমুদ্রের বিভিন্ন অংশের গভীরতা বুঝাইবার জন্য নীল রঙ এবং ভূভাগের বিভিন্ন উচ্চতা বুঝাইবার জন্য হাল্কা সবুজ হইতে গাঢ় সবুজ রঙ ব্যবহৃত হয় আবার মালভূমির বিভিন্ন অংশের ক্রমশঃ অধিক উচ্চতা বুঝাইবার জন্য হাল্কা হল্‌দে হইতে আরম্ভ করিয়া গাঢ় হল্‌দে রঙ, কমলালেবু রঙ, ধূসর রঙ প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল বুঝাইবার জন্য খয়েরী রঙ ও গাঢ় খয়েরী রঙ ব্যবহার করা হয় এবং শেষে কাল রঙের রেখা আঁকা হয়। পর্বতের উপরিভাগের ও মেরু অঞ্চলের বরফাবৃত অংশ বুঝাইবার জন্য সাদা রঙ ব্যবহার করা হয়। এরূপ রঙীন মানচিত্র ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে বেশী উপকারী।

(ঘ) **ফটোগ্রাফ**—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের পাহাড়, পর্বতপূর্ণ অঞ্চলের ফটো তুলিয়া তাহার সাহায্যে ভূপ্রকৃতির অবস্থা সহজেই বুঝান যায়। এজন্য এরোপ্লেন হইতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ফটো (Aerial Photograph) তোলা হয়। স্পুটনিক, লুনিক প্রভৃতি কৃত্রিম উপগ্রহে ব্যবহৃত শক্তিশালী টেলিভিশান যন্ত্রের সাহায্যে চন্দ্রের উপরিভাগের বিভিন্ন অংশের ফটোচিত্র সংগ্রহ করা গিয়াছে।

(ঙ) **রিলিফ মানচিত্র** (Relief Map), **মডেল** (Model) **প্রভৃতি**—কাদা-মাটি, প্ল্যাস্টার অব প্যারিস, কাগজের মণ্ড (Paper pulp) প্রভৃতি উপাদানের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের রিলিফ মানচিত্র, মডেল প্রভৃতি তৈরী করিয়া ভূপ্রকৃতির অবস্থা সহজ ও সুন্দরভাবে বুঝান যায়। ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে ইহা

খুবই উপকারী। সঠিকভাবে রিলিফ মানচিত্র আঁকিতে হইলে একই অনুপাতে (same proportion) অনুভূমিক (Horizontal) ও উল্লম্ব (Vertical) স্কেল স্থির করা উচিত। তবে সেরূপ স্কেল অনুসারে মডেল মানচিত্র আঁকা প্রায় অসম্ভব। তাই সাধারণতঃ স্কেলের পরিবর্তন করিয়া রিলিফ মানচিত্র তৈরী করা হয়।

(চ) **সমোন্নতি বা সমোচ্চ রেখা** (Contour lines) –আজকাল জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও অন্যান্য বহু মানচিত্রে সমোচ্চ রেখার সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা বুঝান হয়। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানের সমুদ্রতল হইতে (above mean sea level) উচ্চতা স্থির করিয়া সমান উচ্চ স্থানসমূহকে এক একটি কাল্পনিক রেখার সাহায্যে যোগ করা হয়। এরূপ রেখাগুলিকে বলা হয় সমোন্নতি রেখা বা সমোচ্চ রেখা (Contours)। এক্ষেত্রে দুইটি স্কেল ঠিক করা দরকার—একটি স্থানসমূহের পাশা-পাশি দূরত্ব বুঝাইবার জন্য **অনুভূমিক** (Horizontal) স্কেল এবং অপরটি ইহাদের উচ্চতা বুঝাইবার জন্য **উল্লম্ব** (Vertical) স্কেল। এই দুই স্কেলের মধ্যে অনুপাতের (Ratio or proportion) বিশেষ পরিবর্তন করিলে মানচিত্র পাঠের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যেমন—অনুভূমিক স্কেলের অনুপাতে উলম্ব স্কেল খুব বড় করিলে মনে হইবে স্থানটি অতিরিক্ত উঁচু, আবার অনুভূমিক স্কেলের অনুপাতে উল্লম্ব স্কেল অত্যন্ত ছোট করিলে মনে হইবে স্থানটির উচ্চতা খুবই কম।

জরিপ বিভাগের মানচিত্রসমূহে ব্যবহৃত বিভিন্ন স্কেল—ভারতীয় জরিপ বিভাগের (Survey of India Department) প্রকাশিত আগেকার মানচিত্র অনুসারে অনুভূমিক স্কেল "১"=১ মাইল" হইলে পর পর দুইটি সমোন্নতি রেখার মধ্যে ব্যবধান বা উলম্ব স্কেল-পার্থক্য (contour interval) হয় ৫০ ফুট। আর কোন মানচিত্রে অনুভূমিক স্কেল "¼"=১ মাইল বা ১=৪ মাইল" হইলে পর পর দুইটি সমোচ্চ রেখার মধ্যে উচ্চতার ব্যবধান বা উলম্ব স্কেল-পার্থক্য হয় ২৫০ ফুট। ভবিষ্যতে সেন্টিমিটার, মিটার, কিলোমিটার, প্রভৃতি মাপের মানচিত্র পাওয়া যাইবে। সমোচ্চ বা সমোন্নতি রেখাগুলির পাশে পাশে উচ্চতার অঙ্ক লিখিয়া দেওয়া প্রয়োজন। তবে অনেক সময় সমোচ্চ রেখাগুলি এত গায়ে গায়ে আঁকা থাকে যে তাহাদের প্রত্যেকের পাশে উচ্চতার অঙ্ক লিখিয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। তাই সাধারণতঃ নির্দিষ্ট (৩ বা ৫) সংখ্যক সরু রেখার পর একটি মোটা রেখা আঁকা হয় এবং তাহার পাশে উচ্চতার অঙ্ক লেখা হয়। যেমন—৫০' ফুট অন্তর সমোচ্চ রেখাগুলির মধ্যে প্রত্যেক পঞ্চম রেখা অর্থাৎ ২৫০', ৫০০', ৭৫০', ১০০০' প্রভৃতি রেখা মোটা। আবার ২৫০' অন্তর সমোচ্চ রেখাগুলির মধ্যে প্রত্যেক চতুর্থ রেখা অর্থাৎ ১০০০', ২০০০', ৩০০০', ৪০০০' প্রভৃতি রেখা মোটা।

প্রস্থচ্ছেদ অঙ্কন

কোন স্থানকে একটি সরলরেখা বরাবর নীচের দিকে সোজাসুজি (Vertically) কাটিয়া ফেলিলে সেই কাটা রেখা বরাবর স্থানটির যে অবস্থা বা রূপ দেখা যায়, তাহা নির্দেশ করিবার জন্য তথাকার প্রস্থচ্ছেদ (Drawing of cross section) আঁকা হয়। কাজেই সমোন্নতি বা সমোচ্চরেখার সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের একটি অংশের বেশ কয়েকটি জায়গার উচ্চতা সাধারণভাবে বুঝান হয়। আর প্রস্থচ্ছেদের সাহায্যে একটি সরলরেখা বরাবর কয়েকটি স্থানের উচ্চতার অবস্থা আরও স্পষ্টভাবে বুঝান হয়। যে-কোন স্থানের কোন সরলরেখা বরাবর প্রস্থছেদ আঁকিতে হইলে প্রথমে ঐ স্থানের উপর দিয়া একটি সরলরেখা আঁকা দরকার। তারপর এই রেখাটি যে যে বিন্দুতে বিভিন্ন সমোচ্চ রেখাকে ছেদ করে তাহা লক্ষ্য করা হয়। তারপর ঐ সরলরেখা বরাবর একখানা কাগজ প্রয়োজনমত ভাঁজ করিয়া প্রত্যেকটি সমোচ্চ রেখার ছেদবিন্দুতে সেই কাগজের উপর দাগ দেওয়া হয়।

এবার পরপৃষ্ঠার চিত্রে AB এবং CD—এই দুই সরলরেখা অনুসারে দুইটি প্রস্থচ্ছেদ আঁকা হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে AB সরলরেখাটি আঁকা হইবে। তারপর এই রেখাটি যে যে বিন্দুতে বিভিন্ন সমোচ্চ রেখাকে ছেদ করিয়াছে তাহার প্রত্যেক স্থানে একটি চিহ্ন বা বিন্দু দেওয়া হইবে। আর সেই রেখা বরাবর একখানা কাগজ ভাঁজ করিয়া রাখিয়া তাহার উপর প্রত্যেকটি বিন্দুর সমোচ্চরেখার অঙ্ক লেখা হইবে। তারপর আলাদা কাগজে বা ছক কাগজে (Graph paper) একটি সরলরেখা আঁকা হইবে। তারপর ইহার উপর দুই প্রান্তে লম্ব আঁকিয়া তাহার পাশে বিভিন্ন উচ্চতা বুঝাইবার জন্য নির্দিষ্ট স্কেল অনুযায়ী দাগ দেওয়া হইবে। প্রয়োজনমত কয়েকটি উচ্চতা লিখিয়া রাখা হইবে। পরপৃষ্ঠার চিত্রে এ বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। এখন ঐ AB রেখা বরাবর যে সকল বিন্দু দেওয়া হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের উচ্চতা পাশের স্কেল অনুসারে নির্দেশ করা হইবে। অর্থাৎ ঐ AB রেখা অনুসারে যে রেখা আঁকা হইয়াছে তাহার প্রত্যেক বিন্দুর উপর নির্দিষ্ট উচ্চতা বুঝাইবার জন্য (পাশের স্কেল অনুসারে) এক একটি করিয়া বিন্দু দেওয়া হইবে। এখন এই বিন্দুগুলিকে একটি স্বাভাবিক রেখা দ্বারা যোগ করা হইবে। এই নূতন রেখাযুক্ত চিত্রকেই প্রস্থচ্ছেদ (Cross section) বলে।

এবার নীচের চিত্রের AC সরলরেখা অনুসারে প্রস্থচ্ছেদ আঁকিবার প্রণালী দেখান হইবে। এই উদ্দেশ্যে AC সরলরেখা যে সকল স্থানে বিভিন্ন সমোচ্চ রেখাকে
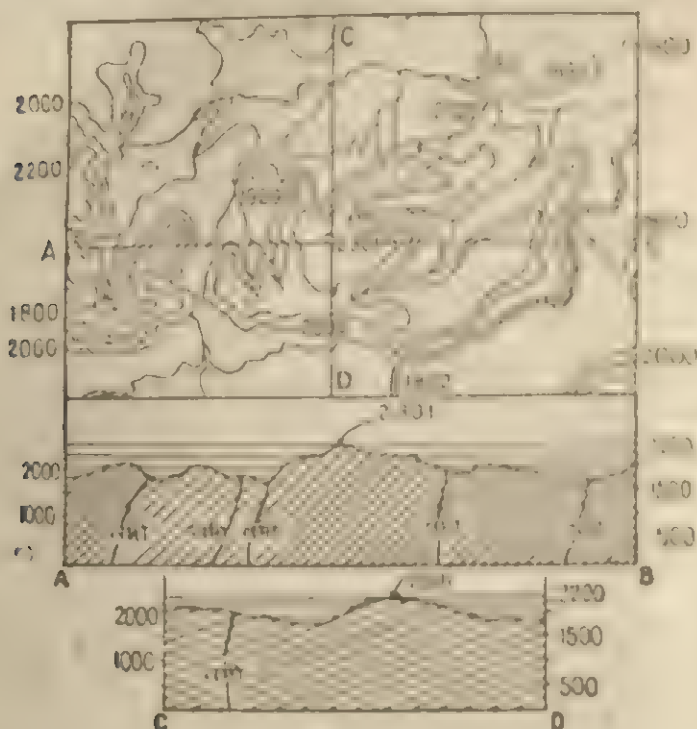
ছেদ করিয়াছে তাহা চিহ্নিত করা হইবে। তারপর AC রেখার দৈর্ঘ্য অনুযায়ী নীচে একটি সরলরেখা আঁকিয়া তাহার উপর যথাস্থানে উপরোল্লিখিত বিন্দুগুলি বসান হইবে। তারপর এরূপ প্রত্যেক বিন্দুর উপর পাশের স্কেল অনুসারে নূতন নূতন বিন্দু দিয়া তাহাদের প্রত্যেকের উচ্চতা নির্দেশ করা হইবে। তাহা হইলে নূতন বিন্দুগুলির প্রত্যেকটি ঐ AC রেখার প্রত্যেক ছেদবিন্দুর যথাযথ উচ্চতা নির্দেশ করিবে। এবার বিন্দুগুলিকে একটি স্বাভাবিক রেখা দ্বারা যোগ করিয়া প্রস্থচ্ছেদ আঁকা হইবে।

টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র (Topographical map sheet) অনুযায়ী বিভিন্ন অংশের প্রস্থচ্ছেদ আঁকিবার সময় অবশ্য এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমোচ্চ রেখার ছেদবিন্দু নির্দেশ করা প্রয়োজন। এরূপ ক্ষেত্রে প্রস্থচ্ছেদ আঁকিবার উদ্দেশ্যে একখানা পরিষ্কার সাদা কাগজকে ভাঁজ করিয়া বা না করিয়া প্রান্তটি নির্দিষ্ট সরলরেখার সহিত একেবারে মিলাইয়া (coincide) রাখা হইবে। তারপর যে যে বিন্দুতে ঐ রেখা

বিভিন্ন সমোচ্চরেখাকে ছেদ করিয়াছে, কাগজের উপর সে সকল বিন্দুতে চিহ্ন দেওয়া হইবে। তারপর প্রত্যেকটি বিন্দুর উপরদিকে স্কেল অনুসারে চিহ্ন (বিন্দু) দিয়া এবং তাহাদিগকে রেখা দ্বারা যুক্ত করিয়া প্রস্থচ্ছেদ আঁকা হইবে। এরূপ প্রস্থচ্ছেদ আঁকিবার সময় উল্লম্ব (Vertical) স্কেল এবং অনুভূমিক (Horizontal) স্কেল নির্দেশ করা প্রয়োজন।

সমোন্নতি রেখা বা সমোচ্চরেখা এবং প্রস্থচ্ছেদের সাহায্যে বিভিন্ন ভূমিরূপের অবস্থা নির্দেশ

সমোন্নতি রেখা ও প্রস্থচ্ছেদের বিভিন্ন চিত্রের সাহায্যে ভূপ্রকৃতির অবস্থা নির্দেশ করা যায়। এখানে (সিলেবাস অনুসারে) মাত্র তিনটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

(১) **ভূপ্রকৃতির হঠাৎ অত্যন্ত ঢালু অবস্থা** (Scarp or Escarpment) — নীচের চিত্রটিতে ডানপাশের B এর দিকে সমোচ্চরেখাগুলি অত্যন্ত গায়ে গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে। এই চিত্রের AB রেখা অনুসারে প্রস্থচ্ছেদ নীচে আঁকা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় ডানপাশের বিভিন্ন সমোন্নতি রেখার মধ্যে দূরত্ব বা ফাঁক কম।
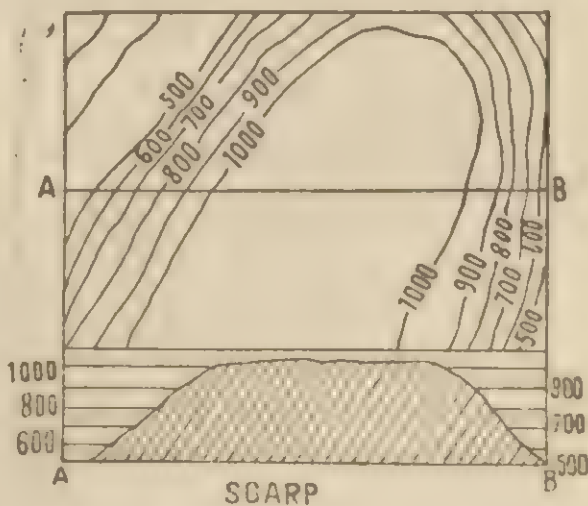
SCARP

স্পষ্ট বুঝা যায় এই অংশে ভূমি অত্যন্ত খাড়া। তারপর মাঝখানের বিস্তৃত অংশের উচ্চতা প্রায় সমান, অর্থাৎ মালভূমির অবস্থা। আর বাম পাশের অর্থাৎ A-র দিকে সমোচ্চরেখাগুলির মধ্যে ফাঁক বেশী, অর্থাৎ এখানে ভূমি ধীরে ঢালু (slope gentle) হইয়া গিয়াছে। কাজেই ডানপাশের অবস্থা অত্যন্ত খাড়া (Scarp) ।

(২) **বহিঃপ্রসৃত অংশ** (Spur)—পরপৃষ্ঠার উপরের চিত্রটিতে দেখা যায় সমোচ্চ-

রেখাগুলির ডানদিকে উচ্চতা বেশী এবং বামদিকে ক্রমশঃ কম। তাহাছাড়া এখানকার সমোচ্চরেখাগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এগুলির আকৃতি ইংরাজী অক্ষর V-এর মত। তাহার চওড়া অংশ ডানদিকে (উঁচু জায়গার দিকে) এবং সরু অংশ বামদিকে (নীচু জায়গার দিকে)। এখানে উপত্যকার (Valley) V-এর ঠিক বিপরীত অবস্থা। এখানে AB রেখা অনুসারে প্রস্থচ্ছেদ আঁকবার জন্য ঐ রেখার সহিত বিভিন্ন সমোচ্চ-রেখার ছেদাবিন্দু লক্ষ্য করিলেও কতক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। AB রেখার উপর অংশে ডানদিকে সমোচ্চরেখাগুলি পরস্পর কাছাকাছি, অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে দূরত্ব কম। কিন্তু AB রেখার উপর তাহাদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব যথেষ্ট বেশী। সম্পূর্ণ প্রস্থচ্ছেদটি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় উঁচু ডানদিক হইতে ক্রমশঃ বামদিকে ভূমি খুব ধীরে ঢালু হইয়া আসিয়াছে। কোন পাহাড়, পর্বতের পাদদেশে সমুদ্র থাকিলে, এবং এপ্রকার ভূপ্রকৃতি সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইলে তাহার যেরূপ বা ছবি দেখা যায়, এখানে ঠিক তাহাই দেখা যাইতেছে। তাই ইহাকে বহিঃ (বাহিরের দিকে) প্রসৃত (অগ্রসর বা বিস্তৃত হইয়া আছে, এমন) অবস্থা (*Spur*) বলা হয়।
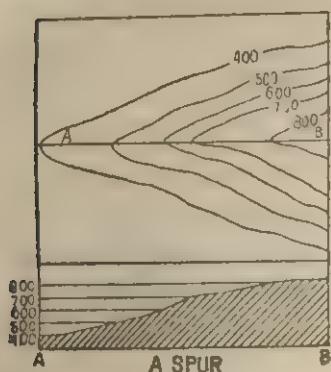
(৩) **নদীর উপত্যকা** (River Valley) **অবস্থা** — পাশের চিত্রটিতে সমোচ্চ রেখাগুলির আকৃতি ইংরাজী অক্ষর V-এর মত। তবে তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে V-এর চওড়া অংশ বাম-দিকে, অর্থাৎ এখানে সমোচ্চরেখা-গুলির সবচেয়ে কম সংখ্যার দিকে। তাই এই অংশে ভূপ্রকৃতি সবচেয়ে নীচু। আর যে রেখা দ্বারা নদীর গতি দেখান
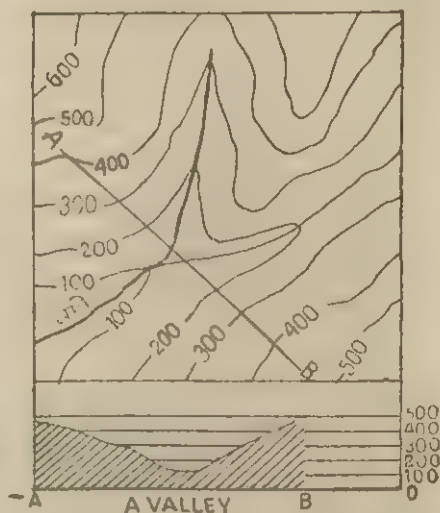
হইয়াছে, তাহার দুই পাশের V-আকৃতির সমোচ্চরেখাগুলির সকলের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। এখানে V-এর সরু অংশের উচ্চতা অধিক, চওড়া অংশের উচ্চতা কম। পাশে উপনদীর দিকে V-এর বৈশিষ্ট্যও সেরূপ। এখানে AB রেখা অনুসারে প্রস্থচ্ছেদ আঁকিয়া দেখা যায় এখানে ভূমি ক্রমশঃ মধ্যভাগের দিকে নীচু এবং তাহার মাঝখান দিয়া নদী বহিয়া গিয়াছে। নদীর বামদিকের সমোচ্চ রেখাগুলির মধ্যে ফাঁক একটু বেশী। তাই দেখা যায়, নদীর উপত্যকা অঞ্চলের বামপাশে ভূমি বেশী ধীরে ঢালু হইয়া গিয়াছে। ডানপাশে ভূমি বামদিকের তুলনায় একটু কম ঢালু, তবে তাহা মাত্রও খাড়া নয়।

অনুশীলনী

১। সমোচ্চ রেখা কাহাকে বলে? এরূপ রেখা কিভাবে আঁকা হয়? ২। প্রস্থচ্ছেদ কাহাকে বলে? পূর্বের (প্রথম) অধ্যায়ে বিভিন্ন চিত্রে যে সকল সমোচ্চ রেখা দেখান হইয়াছে, তাহাদের সাহায্যে অন্ততঃ দুইটি প্রস্থচ্ছেদ আঁক। এজন্য তোমার ইচ্ছামত সরলরেখা আঁকিয়া নিও। ৩। নদীর উপত্যকা ও বহিঃপ্রসৃত অংশের চিত্রের সমোচ্চ রেখার মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি? সমোচ্চ রেখার সাহায্যে ভূমির খাড়া ঢাল ও সহজ ঢাল চিনিবার উপায় কি?

তৃতীয় অধ্যায়

আবহ নিরূপণ

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বৎসরের বিভিন্ন সময়ে, এমন কি যে-কোন দিনেরও বিভিন্ন সময়ে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা, চাপ, বায়ুপ্রবাহের বেগ ও দিক্, মেঘ, বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য ঘটে। যে-কোন সময়ে (দিন, দিনের অংশ, সপ্তাহ প্রভৃতি) ভূ-পৃষ্ঠের যে-কোন স্থানে বায়ুমণ্ডলের এপ্রকার অবস্থাকে বলে তথাকার ঐ সময়ের **আবহাওয়া** (Weather)। মানবসমাজের দৈনন্দিন জীবন যাপন, যাতায়াত ব্যবস্থা, জীবিকা অর্জন প্রভৃতি প্রায় সকল কাজের সহিত বায়ুমণ্ডলের উপরিলিখিত বিষয় বা অবস্থার বা আবহাওয়ার সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ট। এজন্য প্রত্যহ বিশেষ যন্ত্রের সহিত নানা স্থানের **আবহাওয়া** নির্ণয় করা প্রয়োজন। এখানে ইহা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন যে আবহাওয়ার অবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া কাজ করিতে গেলে নানাপ্রকার অসুবিধা হইতে পারে। কাজেই মানবসমাজের সুবিধার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে আবহাওয়ার দৈনিক বিবরণ প্রচার করা হয়।

আমরা প্রত্যেকেই লক্ষ্য করি, প্রতিদিন সকাল হইতে দুপুরে, দুপুর হইতে সন্ধ্যায়, সন্ধ্যা হইতে মধ্য বা শেষ রাত্রিতে, আবার তখন হইতে ভোরে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার ক্রমাগত পরিবর্তন। কখনও লক্ষ্য করি বায়ুমণ্ডলের শান্ত ভাব, আবার কখনও দেখি ভীষণ ঝড়। কখনও দেখি প্রায় মেঘশূন্য আকাশ, আবার কখনও দেখি কাল মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলে। কোন দিন বা কিছুক্ষণ জোরে বৃষ্টি হয়, কখনও বা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়। আবার শীতপ্রধান দেশে বা উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে কখনও প্রবল তুষারপাত হয়, কখনও বা অতি সামান্য তুষার পড়ে। অর্থাৎ **আবহাওয়ার অবস্থার অনবরতই পরিবর্তন হইতেছে**। তাই একটু বেশী সময়ের আবহাওয়ার অবস্থা বুঝিবার জন্য প্রতিদিনের বিভিন্ন সময়ের উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে **দৈনিক গড়** অবস্থা নির্ণয় করা প্রয়োজন। এই উপায়ে ক্রমশঃ স্থির করা হয় **মাসিক গড়** অবস্থা এবং **বাৎসরিক গড়** অবস্থা। এভাবে দীর্ঘকালের (অন্ততঃ ৩০-৩৫ বৎসরের) আবহাওয়ার গড় অবস্থার সাহায্যে স্থির করা হয় প্রত্যেক স্থানের **জলবায়ুর** (Climate) অবস্থা। নানা স্থানের বিভিন্ন সময়ের আবহাওয়া ও জলবায়ুর অবস্থা লক্ষ্য করার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের বহু স্থানে অনেক ছোট-বড় আবহ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (Weather Observation centre) আছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান কেন্দ্রগুলিকে বলা হয় হাওয়া অফিস বা **আবহ অফিস** (Meteorological office)।

স্টীভেনসন স্ক্রীন

এই সকল কেন্দ্রে প্রতিদিনের **আবহ** (Weather) বা আবহাওয়ার অবস্থা নির্ভুলরূপে নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার মেঘের অবস্থা খালি চোখে বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্য করা হয়। আর বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা, চাপ, বায়ু-প্রবাহের দিক্, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির অবস্থা লক্ষ্য করা হয় বহু প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে।

ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার থার্মো-মিটার যন্ত্র সাধারণতঃ স্টীভেনসন স্ক্রীন (Stevension screen) নামে একপ্রকার বাক্সের মধ্যে রাখা হয়। ইহা কাঠের তৈয়ারী। চারিদিক খোলা জায়গাতে এবং ভূমি
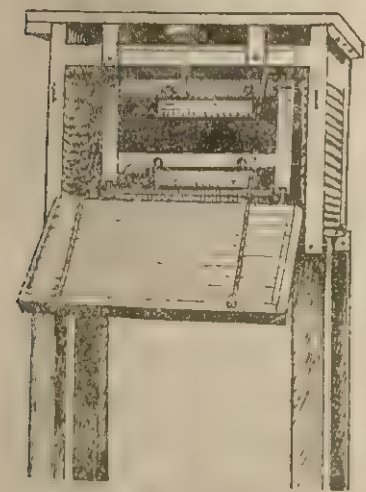
হইতে এক মিটারের উপরে ঐ বাক্সটি বসান হয়। তাই ইহার মধ্যে থার্মোমিটারগুলি ভূমি হইতে এক মিটারের অধিক (৪ ফুট) উঁচুতে থাকে। এই বাক্সের চারিপাশে দুইটি করিয়া দেওয়াল থাকে। তবে দেওয়ালের কাঠগুলি এমন ফাঁকা ফাঁকা যে তাহার মধ্য দিয়া বায়ু চলাচল করে, অথচ সূর্যের তাপ বাক্সের মধ্যস্থিত যন্ত্রের গায়ে সোজাসুজি (directly) লাগে না। তাহা ছাড়া সূর্যরশ্মি যাহাতে যন্ত্রের উপর সোজাসুজি প্রতিফলিত (reflect) হইতে না পারে ঐ উদ্দেশ্যে বাক্সের চারিপাশের দেওয়ালের বাহির দিকের রঙ সাদা।

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে এবং প্রয়োজনমত অন্যান্য সময়ে বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার পরিমাণ, চাপের পরিমাণ, বায়ুপ্রবাহের দিক্, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া নির্দিষ্ট কাগজে তাহা লিখিয়া রাখা হয়। অবশ্য আজকাল বড় বড় আবহাওয়া অফিসে ও অন্যান্য কতক স্থানে **আধুনিক স্বয়ংচালিত যন্ত্রপাতি** (Automatic recording instruments) ব্যবহৃত হয়। ইহাদের গায়ে জড়ান ছক কাগজের উপর বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা, চাপ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির বিভিন্ন সময়ের অবস্থা বা পরিমাণ বুঝাইবার জন্য আপনা হইতে দাগ বা চিহ্ন পড়ে। ইহাতে বায়ুমণ্ডলের অবস্থার প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং এরূপ বিবরণ অধিকতর নির্ভুল। তাই আমাদের যে সকল কাজকর্মের সহিত আবহাওয়ার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, সেগুলি সম্পাদনের পক্ষে ইহাদের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন। সংবাদপত্র, বুলেটিন প্রভৃতির মারফৎ ইহাদের বিজ্ঞপ্তির ফলে সাধারণ মানুষের অনেক সুবিধা হইতেছে।

আমাদের দেশে দিল্লী, কলিকাতা (আলিপুর), মহারাষ্ট্রের পুণা, তামিলনাড়ুর কোদাইকানল প্রভৃতি নগরে **আঞ্চলিক** প্রথম শ্রেণীর **আবহ অফিস** (Regional Meteorological centre) এবং বোম্বাইতে **আন্তর্জাতিক আবহকেন্দ্র** (International Meteorological centre) আছে। তাহাছাড়া মাদ্রাজ বন্দরের ৬০০ কি. মি. পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগরে নোমাড (Nomad) নামক জলযানে আছে **সামুদ্রিক স্বয়ংক্রিয় আবহ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র** (Marine automatic weather observation station)। পূর্ব গোলার্ধের (এশিয়া, আফ্রিকা, ওশিয়ানিয়া) আর কোথাও সমুদ্রে এরূপ বড় কেন্দ্র নাই।

ইহা ভিন্ন প্রত্যেক আঞ্চলিক কেন্দ্রের সহিত নিজ নিজ অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রসমূহের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। ঐ সকল ক্ষুদ্র কেন্দ্রের আবহাওয়ার বিবরণ আঞ্চলিক কেন্দ্রে প্রেরিত হয় এবং তথা হইতে প্রতিদিন নিজ নিজ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের আবহাওয়া

সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি (Bulletin) প্রকাশিত হয়। তাহাতে ঐ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সময়ের পূর্বের ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার অবস্থার বিবরণ লেখা থাকে। ইহা ভিন্ন পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়া সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী (Forecast) থাকে। যেমন—

তারিখ—৩১. ১১. ৭৬ ইং

স্থানের নাম	সর্বোচ্চ উষ্ণতা (°সে) (°ফা)	সর্বনিম্ন উষ্ণতা (°সে) (°ফা)	চাপ (মিঃ) (ইঃ")	বৃষ্টিপাত (")
কলিকাতা	২৭ ··৮১	১৩···৫৩	৯'১·· ৩০'০	০
কৃষ্ণনগর	২৭·· ৮১	৯···৪৯	৯'১···৩০'০	০
রাঁচি	২৪···৭৬	৮ ··৪৬	৯'১···৩০'১	০
শিলচর	২৬ ··৭৯	১৭ ··৬৩	৯'০···২৯'৮	০'১

১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ নভেম্বর তারিখের কলিকাতা কেন্দ্রের বিবরণের সংক্ষিপ্তসার :—

"সাধারণ আবহাওয়া চমৎকার। বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু মধ্যম বেগে প্রবাহিত হইতেছে। আসামের উত্তর পূর্ব অংশে এবং পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার উপকূলভাগে সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে" ইত্যাদি।

সকল দেশের চাষীরাই জলবায়ু ও আবহাওয়ার অবস্থা খুব ভালভাবে লক্ষ্য করিয়া জমি চাষ, জমিতে বীজ বোনা প্রভৃতি কাজ করেন। তারপর বিভিন্ন নৌকার মাঝি, জেলে প্রভৃতিও আবহাওয়ার অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই খাল ও নদীতে পাড়ি দেন। বড় বড় সেতু, পাকা বাড়ীর ছাদ প্রভৃতি ঢালাই করিবার উদ্দেশ্যে এই অবস্থা লক্ষ্য করা হয় আরও বেশী। কাজেই ইহাদের মত ছাত্রছাত্রীগণও কোন প্রকার যন্ত্রপাতি ভিন্নই আবহাওয়ার কতক অবস্থা (যেমন, মেঘ, বৃষ্টি প্রভৃতির অবস্থা) লক্ষ্য করিতে পারে। তবে তাহাদের নিজ নিজ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় বা শিক্ষিকা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে স্কুলের আবহ সম্পর্কিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিশেষ যত্নের সহিত প্রতিদিন বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা, চাপ, বায়ুপ্রবাহের দিক্, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া **স্থানীয় আবহাওয়া** নিরূপণ করা উচিত। সাধারণতঃ বাতপতাকার (Wind vane) সাহায্যে বায়ুপ্রবাহের দিক্, বাইনকুলার (Binocular) ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা দূরবীণের (Telescope) সাহায্যে আকাশে মেঘের অবস্থা ও পরিমাণ, নানাপ্রকার উষ্ণতামাপক যন্ত্রের (Thermometer) সাহায্যে বায়ুর উষ্ণতা, বৃষ্টিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে বৃষ্টির পরিমাণ, চাপমান যন্ত্রের (Barometer) সাহায্যে বায়ুর চাপ ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়।

পর্যবেক্ষণের নিয়ম—আবহাওয়ার অবস্থা প্রতিদিন **নির্দিষ্ট সময়ে** এবং প্রয়োজনমত অন্য সময়ে যথেষ্ট সাবধানতা ও মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করা আবশ্যক।

যখনই যে অবস্থা লক্ষ্য করা যায় তাহা তখনই ছাত্রছাত্রীদের 'নোটবুকে' বা আবহাওয়ার অবস্থা লিখিবার জন্য নির্দিষ্ট খাতাতে তারিখ, স্থান, সময়, অবস্থার বিস্তৃত বিবরণ প্রভৃতিসহ লিখিয়া রাখা উচিত। প্রয়োজনমত নক্সা, চিত্র, ছবি প্রভৃতিও আঁকা উচিত। পরে পরস্পরের লেখা মিলাইয়া এবং শিক্ষক মহাশয় বা শিক্ষিকা মহাশয়াকে তাহা দেখাইয়া ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া রাখা প্রয়োজন।

যন্ত্রপাতি ঠিকমত স্থাপন ও ব্যবহার—বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ঠিকমত স্থাপন ও ব্যবহারের উপর আবহাওয়ার অবস্থা নির্ধারণ অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। **বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক অবস্থা** (Natural condition) পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ উষ্ণতামাপক যন্ত্রগুলিকে স্টীভেনসন স্ক্রীন নামক বিশেষভাবে তৈয়ারী কাঠের বাক্সের মধ্যে ভূমি হইতে প্রায় এক মিটার উঁচু স্থানে রাখা হয়। তবে যেক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভবপর না হয়, তথায় ইহাদিগকে ঘরের কোন দেওয়ালের গায়ে এভাবে ঝুলাইয়া রাখা উচিত যাহাতে দরজা, জানালার মধ্য দিয়া বায়ু সহজে চলাচল করিতে পারে, অথচ যন্ত্রের গায়ে রোদ না লাগে। সেরূপ অবস্থায় এসকল যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের প্রায় স্বাভাবিক উষ্ণতার মাত্রাই নির্ণয় করা সম্ভব। বদ্ধ ঘরের মধ্যে বা আলমারীর মধ্যে এসকল যন্ত্র রাখিলে বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক অবস্থা কিছুতেই নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। চাপমান যন্ত্র (ব্যারোমিটার) এবং আর্দ্রতামাপক যন্ত্রকেও দেওয়ালের গায়ে ঝুলাইয়া রাখা উচিত। আর বৃষ্টিমাপক যন্ত্রকে সকল ক্ষেত্রেই ঘরের বাইরে খোলা উঠানে বা দালানের খোলা ছাদে $\frac{1}{3}$ মিটার উঁচুতে রাখা উচিত। বায়ুর বেগ এবং গতিনির্দেশ করিবার যন্ত্র ছাদের উপর বা ঐরূপ কোন ফাঁকা জায়গাতে স্থাপন করা আবশ্যক।

এসকল যন্ত্রপাতি খুব **সতর্কতার** সহিত ব্যবহার করা উচিত। কারণ, ইহাদের দাম খুব বেশী। তাহাছাড়া যন্ত্র সাবধানমত ব্যবহার না করিলে পর্যবেক্ষণের কাজ ঠিক হয় না। এমন কি শরীরের উষ্ণতা পরীক্ষা করিবার জন্য থার্মোমিটারটিও সাবধানে রোগীর শরীরে না লাগাইলে ভুলের ফল বিপজ্জনক হইতে পারে। তাহা ভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে কোন বিষয় কেবলমাত্র একবার পরীক্ষা না করিয়া পর পর তিন বার পরীক্ষা করা উচিত এবং তিন বারের অবস্থার সাহায্যে **গড় অবস্থা** স্থির করা আবশ্যক। উহাই অপেক্ষাকৃত নির্ভুল বলিয়া গণ্য।

দৈনিক পর্যবেক্ষণের বিষয়

প্রতিদিন আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয় :—গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ থার্মোমিটার, শুষ্ক-কুণ্ড ও আর্দ্র-কুণ্ড থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, বৃষ্টিমাপক যন্ত্র, বাতপতাকা ও বায়ুবেগ-মাপক যন্ত্র প্রভৃতি।

বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ও এই উষ্ণতামাপক বিভিন্ন যন্ত্র

কোন প্রকার যন্ত্রের সাহায্য ভিন্নই অনেক সময় বলিতে পারা যায় যে কোন্ দিন গরম বেশী, কোন্ দিন কম। তবে বিভিন্ন জিনিসের ও বায়ুমণ্ডলের সঠিক উষ্ণতা নির্ণয় করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার **উষ্ণতামাপক যন্ত্র** (Thermometer) ব্যবহৃত হয়।

[**তাপ** (Heat) বলিলে একটি শক্তি বুঝায়। ঐ শক্তিকে জল, বায়ু প্রভৃতি পদার্থের উপর যত অধিক প্রয়োগ (apply) করা যায়, পদার্থের **উষ্ণতা** (Temperature) ততই বৃদ্ধি হয়। কাজেই তাপ হইল কারণ, আর উষ্ণতা ফল। ইহারা এক নহে। আরও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে বিভিন্ন জিনিসের গঠন, উপাদান, পরিমাণ প্রভৃতি সম্পর্কে পার্থক্য বিস্তর ; তাই সমান তাপে সকল জিনিস সমান উষ্ণ হয় না।]

মানবদেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা 96·6°F—98·4°F ; এই উষ্ণতার পরিমাণ সাধারণতঃ 95°F-এর নীচে নামে না এবং 110°F-এর উপরে উঠে না। এই দুই সীমার যে-কোন একটি ছাড়াইলেই সমূহ বিপদের আশঙ্কা হয়। তাই এতদিন পর্যন্ত দেহের উষ্ণতা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত দৈহিক উষ্ণতামাপক(Clinical thermometer) যন্ত্রের গায়ে **ফারেনহিট** স্কেলের 95°F হইতে ক্রমশঃ বাড়িয়া 110°F পর্যন্ত উষ্ণতা লক্ষ্য করার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৭৭ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি হইতে **সেলসিউস**-এর আবিষ্কৃত **সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটার** চালু হইয়াছে। ইহার গায়ে ৩৫°সে হইতে আরম্ভ করিয়া ৪৩°সে পর্যন্ত উষ্ণতা লক্ষ্য করার ব্যবস্থা আছে। (৩৫°সে=৯৫°ফা ; ৪৩°সে=প্রায় ১১০°ফা।)

থার্মোমিটার যন্ত্রে ব্যবহৃত তরল পদার্থ—থার্মোমিটার যন্ত্রে নিম্নলিখিত তরল পদার্থ ব্যবহৃত হয়।

(ক) **পারদ**—প্রায় সকল উষ্ণতামাপক যন্ত্রে সরু কাচের নলের মধ্যে রূপার মত উজ্জ্বল পদার্থের একটি সরু রেখা দেখা যায়। ইহা বিশুদ্ধ পারদ (Mercury)। দেহের উষ্ণতামাপক যন্ত্র (Clinical thermometer), সাধারণ উষ্ণতামাপক যন্ত্র (Ordinary thermometer), সর্বোচ্চ উষ্ণতামাপক যন্ত্র (Maximum thermometer) প্রভৃতি যন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন জিনিসের উষ্ণতা স্থির করিবার উদ্দেশ্যে এই তরল পদার্থ (Thermometric substance) নানা কারণে ব্যবহৃত হয়। যথা :—

(১) ইহা অস্বচ্ছ পদার্থ (Non-transparent), অথচ রূপার মত উজ্জ্বল। কাজেই কাচের নলের বাহির হইতে ইহাকে স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়।

(২) পৃথিবীর বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে কতক ধাতুর মধ্য দিয়া তাপ সহজে পরিবাহিত হয়। এরূপ বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে পারদ যে-কোন উষ্ণ পদার্থের সংস্পর্শে আসিবামাত্র উহার সমপরিমাণ উষ্ণ হয়। অর্থাৎ কোন শীতল বস্তুর মধ্যে পারদ

থাকিলে ঐ বস্তুটি তাপের প্রভাবে যখন যে পরিমাণ উষ্ণতা লাভ করে, ঐ বস্তুর মধ্যস্থিত পারদও সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণ উষ্ণতা লাভ করে। তাহাছাড়া পারদের উষ্ণতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সেই পদার্থের তাপের বিশেষ কোন অপচয় হয় না, অর্থাৎ পারদকে সমপরিমাণ উষ্ণ করিয়াও ঐ পদার্থের তাপ প্রায় সমানই থাকিয়া যায়। আর (পারদের উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য) পদার্থের তাপের কোন পরিবর্তন হয় না বলিয়া পদার্থটির উষ্ণতারও কোন পরিবর্তন ঘটে না। কাজেই পারদের উষ্ণতা লক্ষ্য করিয়াই যে পদার্থের সংস্পর্শে পারদ উষ্ণ হয়, সেই পদার্থের বা বস্তুর সঠিক উষ্ণতা মাপা যায়। সুতরাং উষ্ণতামাপক যন্ত্রে পারদের ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক।

এ সম্পর্কে ইহা উল্লেখযোগ্য যে পারদের উষ্ণতা বৃদ্ধির তুলনায় জল বা অন্য কোন তরল পদার্থের উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য অনেক বেশী তাপ প্রয়োজন।

(৩) মানবদেহ, বায়ুমণ্ডল প্রভৃতি যে-কোন পদার্থের উষ্ণতা সামান্য বৃদ্ধি হইলেই ইহাদের উষ্ণতা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত থার্মোমিটারের মধ্যস্থিত পারদের আয়তন উষ্ণতা অনুপাতে সহজেই বৃদ্ধি হয়। কাজেই ঐ যন্ত্রের মধ্যস্থিত পারদের আয়তনের বৃদ্ধির পরিমাণ লক্ষ্য করিয়া নির্দিষ্ট পদার্থের উষ্ণতার পরিমাণ স্থির করা যায়।

(৪) পদার্থের উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে পারদের আয়তন সর্বত্র সমান হারে বৃদ্ধি হয়। বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে উষ্ণতামাপক যন্ত্রে ইহার উষ্ণতা বৃদ্ধি সম্বন্ধে পরিবর্তন হয় না। কাজেই নানা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইহার সাহায্যে যে উষ্ণতার পরিমাণ লক্ষ্য করা যায়, তাহার মধ্যে কোন পার্থক্য ঘটে না। তাই এই মাপ নির্ভরযোগ্য।

(৫) তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে কাচের নলের মধ্য দিয়া পারদ উঠানামার সময় ইহার কোন অংশই কাচের গায়ে লাগিয়া থাকে না। ফলে, এই পারদের পরিমাণ সর্বদা সমান থাকে, ইহার কোন অপচয় ঘটে না। তাহাছাড়া পারদ—39°C উষ্ণতাতে কঠিন হয় এবং 357 C উষ্ণতাতে বাষ্পে পরিণত হয়। এই দুই সীমার মধ্যবর্তী প্রায় 400°C উষ্ণতা পারদের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। এ কারণে উষ্ণতামাপক যন্ত্রে ইহার ব্যবহার একান্তই যুক্তিযুক্ত।

(৭) বিশুদ্ধ পারদ সংগ্রহ করাও কষ্টকর নয়।

(খ) **এল্‌কহল**—পারদ—39°C উষ্ণতাতে কঠিন হইয়া যায় বলিয়া তাহা (—39°C) অপেক্ষা কম উষ্ণতা বা সর্বনিম্ন উষ্ণতা মাপিবার উদ্দেশ্যে উষ্ণতামাপক যন্ত্রে পারদ ব্যবহার করা হয় না; পারদের পরিবর্তে **এল্‌কহল** (Alcohol) ব্যবহৃত

হয়। ইহা —39°C অপেক্ষা নিম্ন উষ্ণতাতেও তরল থাকে এবং —115°C উষ্ণতাতে জমিয়া কঠিন হয়। প্রধানতঃ এই সুবিধার জন্যই **সর্বনিম্ন উষ্ণতামাপক যন্ত্র** (Minimum Thermometer) তৈরীর উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়।

থার্মোমিটার যন্ত্রে তরল পদার্থ হিসাবে এল্‌কহলের ব্যবহার সম্পর্কে পারদের তুলনায় কতকগুলি অসুবিধা আছে। যেমন—এল্‌কহল স্বচ্ছ (Transparent)। সেজন্য ইহাকে রঙ করিয়া ঐরূপ যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়। উষ্ণ বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে ইহা ঐ বস্তুর উষ্ণতা কিছু পরিমাণে গ্রহণ করিয়া নিজে উষ্ণ হইয়া পড়ে। এজন্য ঐ বস্তুর উষ্ণতা কিছুটা কমিয়া যায়। কাজেই ইহার সাহায্যে কোন পদার্থের সঠিক উষ্ণতা স্থির করা যায় না। তাহাছাড়া থার্মোমিটারের কাচের নলের মধ্য দিয়া উঠা-নামার সময় এল্‌কহলের কতক অংশ নলের গায়ে লাগিয়া ঐ নলকে সিক্ত করে। ফলে, এল্‌কহলের কিছু অংশ অপচয় হয়। ইহা ভিন্ন ইহার উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার আয়তন সর্বদা সমান হারে বৃদ্ধি হয় না। এরূপ অসুবিধা সত্ত্বেও সর্বনিম্ন উষ্ণতা নির্ণয়ের পক্ষে পারদ ও অন্যান্য তরল পদার্থের তুলনায় ইহার ব্যবহার বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়া সেক্ষেত্রে ইহাই ব্যবহৃত হয়।

উষ্ণতামাপক যন্ত্রের হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক—উষ্ণতামাপক যন্ত্র তৈয়ারীর জন্য একটি অতিশয় সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত সরু কাচের নল ব্যবহৃত হয়। ইহার এক প্রান্তে একটি কুণ্ড (Bulb) থাকে। এই কুণ্ডটি ও নলের কতক অংশ পারদ দ্বারা পূর্ণ থাকে। নলের বাকি অংশ শুধু পারদবাষ্প দ্বারা পূর্ণ থাকে; তথায় অন্য কোন বাষ্প থাকে না। নলের অপর প্রান্ত তাপ দিয়া কাচ গলাইয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

এই যন্ত্রের কুণ্ডটিকে বরফের গুঁড়ার মধ্যে রাখিলে তাহার মধ্যস্থিত পারদ শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হয়। তখন এই যন্ত্রের মধ্যস্থিত পারদস্তম্ভের শেষপ্রান্ত (উপর দিকের সীমা) যেখানে নামিয়া আসে, তাহাকে বলে **হিমাঙ্ক** (Freezing point)। আর এই যন্ত্রের কুণ্ডকে ফুটন্ত জলের বাষ্পে রাখিলে ইহার মধ্যস্থিত পারদ প্রসারিত হয়। তখন এই যন্ত্রের অবস্থিত পারদস্তম্ভের শেষপ্রান্ত (উপরদিকের সীমা) যেখানে উঠিয়া যায় তাহাকে বলে **স্ফুটনাঙ্ক** (Boiling point)। পৃথিবীর কোথাও বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ উষ্ণতা স্বাভাবিক অবস্থায় স্ফুটনাঙ্ক পর্যন্ত উঠে না, আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সর্বনিম্ন উষ্ণতা হিমাঙ্ক পর্যন্ত নামে না; হিমাঙ্কের উপরে থাকে। কেবলমাত্র মেরু অঞ্চল, অত্যুচ্চ পর্বতের উপরিভাগ প্রভৃতি কতক স্থানে সর্বনিম্ন উষ্ণতা হিমাঙ্কের নীচে নামে। তাই পৃথিবীর বেশীর ভাগ জায়গাতে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ উষ্ণতা হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের মাঝখানে কোথাও-না-কোথাও থাকে। তাই বৎসরের বিভিন্ন সময়ে এ

সকল স্থানের বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা স্থির করিবার হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক চিহ্নযুক্ত এই প্রকার উষ্ণতামাপক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

এরূপ যন্ত্র তৈয়ারী করিবার জন্য যন্ত্রটির দুই মাথাতে (হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক) দুইটি দাগ কাটা হয় এবং এই দুই দাগের মাঝখানের বিভিন্ন অংশে উষ্ণতার মাত্রা দেখাইবার জন্য ঐ মধ্য অংশকে কতকগুলি সমানভাগে বিভক্ত করা হয়। বিভিন্ন প্রকার থার্মোমিটারে এরূপ ভাগ বুঝাইবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ সংখ্যা ব্যবহৃত হয় এবং তদনুসারে থার্মোমিটার বা উষ্ণতামাপক যন্ত্রসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা :—

(ক) **সেন্টিগ্রেড, ফারেনহিট্, ও রোমার থার্মোমিটার**—বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ১৮শ শতকে সুইডিশ জ্যোতির্বিদ **সেলসিউস** যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন তাহা **সেন্টিগ্রেড্** (Centigrade) থার্মোমিটারে ব্যবহৃত হয়। এই থার্মোমিটারে হিমাঙ্ক ০° সে ও স্ফুটনাঙ্ক ১০০° সে (সেলসিউস) দ্বারা নির্দিষ্ট। আর এই দুই সীমার মাঝখানে থাকে ১০০টি সমান ভাগ। এরূপ এক একটি ভাগকে বলে এক ডিগ্রী সে। যেমন, 0°C, 1°C, 2°C…99°C, 100°C।
এখন এরূপ থার্মোমিটারই সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয়।

থার্মোমিটার

এতকাল এই উদ্দেশ্যে যে স্কেলের থার্মোমিটার ব্যবহৃত হইত তাহার নাম **ফারেনহিট্** (Fahrenheit) থার্মোমিটার। ঐ থার্মোমিটারে হিমাঙ্ক ৩২° ফা ও স্ফুটনাঙ্ক ২১২° দ্বারা নির্দিষ্ট এবং দুই সীমার মাঝখানে থাকে ১৮০টি সমান ভাগ বা ১৮০° ডিগ্রী ফা। যেমন, 32°F, 33°F, 34°F…210°F, 211°F, 212°F। চিকিৎসকগণের ব্যবহৃত **ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারে** (Clinical thermometer) এতদিন 95°F হইতে 110°F তাপমাত্রা নির্দেশ করা হইত, আর এখন 35°C হইতে 43°C নির্দেশ করা হয়।

ইহা ভিন্ন **রোমার** (Reaumer) থার্মোমিটার নামে আর এক প্রকার উষ্ণতামাপক যন্ত্রও বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার পরিমাণ নির্ণয় করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তাহার হিমাঙ্ক ০° রো ও স্ফুটনাঙ্ক ৮০° রো দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কাজেই এই দুই সীমার মাঝখানে থাকে ৮০টি সমান ভাগ বা ৮০° ডিগ্রী রো। যেমন, 0°R, 1°R, 2°R…78°R, 79°R, 80°R।
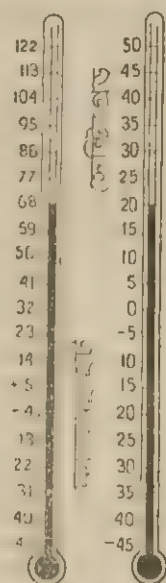
এরূপ বিভিন্ন প্রকার থার্মোমিটারের মাপ অনুযায়ী O°C, 32°F বা O°R উষ্ণতাতে জল বরফে পরিণত হয়। এই উষ্ণতামাত্রাকে বলা হয় হিমাঙ্ক (Freezing point)। অর্থাৎ যখন কোন একটি পাত্রের মধ্যস্থিত জলের মধ্যে উপরিলিখিত তিন প্রকার থার্মোমিটারের যে-কোন একটির বা একাধিক থার্মোমিটারের কুণ্ড প্রবেশ করাইবার পর এই যন্ত্রটি লক্ষ্য করিয়া দেখা যায় যে, এই যন্ত্রের মধ্যস্থিত পারদের মাপ হিমাঙ্কে নামিয়াছে, তখন দেখা যায় যে এই জল আর স্বাভাবিক তরল পদার্থ (জল) নহে, ইহা বরফে পরিণত হইয়াছে। তারপর হইতে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ক্রমশঃ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বরফ গলিতে আরম্ভ করে। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা যত বাড়িতে থাকে, জলের উষ্ণতাও ততই বাড়িতে থাকে। শেষ পর্যন্ত উষ্ণতার পরিমাণ যখন 100°C, বা 212°F, বা 80°R-এ পৌঁছে তখন জল বাষ্পে পরিণত হয়। এই উষ্ণতাপমাত্রাকে বলা হয় স্ফুটনাঙ্ক (Boiling point)। অর্থাৎ কোন একটি পাত্রের মধ্যস্থিত জলের মধ্যে এই প্রকার কোন একটি বা একাধিক থার্মোমিটারের কুণ্ড প্রবেশ করাইবার পর যখন দেখা যায় যে এই যন্ত্রের মধ্যস্থিত পারদের মাপ স্ফুটনাঙ্কে, তখন এই জল হইতে বাষ্প উঠে।

উপরিলিখিত তিন স্কেলের থার্মোমিটারের মধ্যে হিসাবের পার্থক্যের ফলে কোন একটি স্থানে যে-কোন একটি মুহূর্তে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার পরিমাণ এক হওয়া সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে উষ্ণতার পরিমাণ বিভিন্ন। যেমন, যে উষ্ণতাতে জল বরফে পরিণত হয় তাহার পরিমাণ সেন্টিগ্রেড্ থার্মোমিটার অনুযায়ী ০° সে, ফারেনহিট থার্মোমিটার অনুসারে ঐ উষ্ণতা ৩২° ফা এবং রোমার থার্মোমিটার অনুসারে তাহা ০° রো। কাজেই তাহাদের পরস্পরের মধ্যে হিসাবের সম্পর্ক জানা আবশ্যক। এই সম্পর্কটি নিম্নলিখিত ভাবে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতে পারে :—

$$\text{সেলসিউস}\left(\frac{C}{100}\right) = \text{ফারেনহিট}\left(\frac{F-32}{180}\right) = \text{রোমার}\left(\frac{R}{80}\right)$$

তবে সাধারণতঃ সেন্টিগ্রেড ও ফারেনহিট্ থার্মোমিটারই অধিক ব্যবহৃত হয়। কাজেই তাহাদের একটির সাহায্যে কোন এক সময়ে কোন স্থানে বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ উষ্ণতার মাত্রা লক্ষ্য করা যায়, এই উষ্ণতার মাত্রাকে অপরটি হিসাবে **পরিবর্তিত করিবার** পদ্ধতি নিম্নরূপ।

সেন্টিগ্রেড্ থার্মোমিটার অনুসারে নির্ধারিত উষ্ণতার মাত্রাকে (°C উষ্ণতামাত্রাকে) ফারেনহিট্ থার্মোমিটার অনুসারে নির্ধারিত উষ্ণতার মাত্রাতে (°F উষ্ণমাত্রাতে) পরিণত করিতে হইলে মনে রাখা আবশ্যক, সেলসিউস স্কেলের থার্মোমিটার অনুসারে

স্ফুটনাঙ্ক ও হিমাঙ্কের মধ্যে পার্থক্য ১০০° সে, ফারেনহিট্ স্কেলের থার্মোমিটার অনুসারে হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের মধ্যে পার্থক্য ১৮০° ফা।

অতএব, ১০০° সে = ১৮০° ফা

অথবা, ১° সে = $(\frac{১৮০}{১০০})^\circ$ ফা

= $\frac{৯}{৫}^\circ$ ফা

সুতরাং °সে × $\frac{৯}{৫}$ + ৩২° = °ফারেনহিট্।

সেন্টিগ্রেড্ থার্মোমিটার অনুযায়ী হিমাঙ্ক ০° সে, কিন্তু ফারেনহিট্ থার্মোমিটার অনুযায়ী হিমাঙ্ক ৩২° ফা বলিয়া কোন সময়ে সেন্টিগ্রেড্ থার্মোমিটার অনুযায়ী যে উষ্ণতামাত্রা লক্ষ্য করা যায়, তাহাকে $\frac{৯}{৫}$ দ্বারা গুণ করিয়া তাহার সহিত ৩২° ফা যোগ দিলে ফারেনহিট্ থার্মোমিটার অনুযায়ী ঐ সময়ের উষ্ণতা জানা যায়।

কাজেই কোন স্থানে কোন এক দিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা 22°C হইলে ফারেনহিট্ মাপে তখনকার উষ্ণতার পরিমাণ হইবে—

২২ × $\frac{৯}{৫}$ + ৩২ ডিগ্রী ফা

= ২২ × ১·৮ + ৩২ ”

= ৩৯·৬ + ৩২ ”

= ৭১·৬° ফা (71·6°F)

আবার ফারেনহিট্ মাপের উষ্ণতার অঙ্ককে (°F উষ্ণতামাত্রাকে) সেলসিউসে (°C উষ্ণতামাত্রাতে) পরিণত করিতে হইলে ৩২° ফা উষ্ণতা ০° সে উষ্ণতার সমান বলিয়া প্রথমেই ফারেনহিট্ থার্মোমিটার অনুযায়ী প্রাপ্ত উষ্ণতামাত্রা হইতে ৩২° ফা বাদ দিতে হয়। তারপর ইহাদের মধ্যে হিসাবের ব্যবধানের ফলে ১৮০° ফা = ১০০° সে বলিয়া ১°ফা = $\frac{১০০}{১৮০}^\circ$ সে

= $\frac{৫}{৯}^\circ$ সে।

সুতরাং (°ফা − ৩২°) × $\frac{৫}{৯}^\circ$ = ° সেলসিউস

কাজেই কোথাও কোন দিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ফারেনহিট্ থার্মোমিটারের মাপে 88°F উষ্ণতা হইলে সেলসিউস থার্মোমিটারের মাপে তাহা এরূপ হইবে

= (৮৮ − ৩২)$\frac{৫}{৯}^\circ$ সে

= ৫৬ × $\frac{৫}{৯}$ ”

= $\frac{৫৬ \times ৫}{৯}$ ”

= $\frac{২৮০}{৯}$ ”

= ৩১° সে (31°C)

(খ) ম্যাক্সিমাম্ ও মিনিমাম্ থার্মোমিটার—পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক স্থানেই দিবারাত্রির বিভিন্ন সময়ের উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। তাই পৃথিবীর সর্বত্র কাজের সুবিধার জন্য গড় উষ্ণতা ব্যবহার করা হয়। এই উদ্দেশ্যে যে-কোন স্থানের যে-কোন দিনের বিভিন্ন সময়ের উষ্ণতার সাহায্যে ঐ দিনের **গড়** (Average or Mean) **উষ্ণতা** স্থির করা হয়। সাধারণতঃ যে-কোন দিনের সর্বোচ্চ (Maximum) ও সর্বনিম্ন (Minimum) উষ্ণতামাত্রা জানিয়া তাহাদের সংখ্যাকে যোগ দিয়া ২ দ্বারা ভাগ করিয়া মোটামুটি হিসাবে ঐদিনের গড় উষ্ণতা জানা যায়।

$$\text{কোন দিনের গড় উষ্ণতা} = \frac{\text{ঐ দিনের সর্বোচ্চ উষ্ণতা} + \text{সর্বনিম্ন উষ্ণতা}}{২}$$

তারপর যে-কোন মাসের প্রতি দিনের গড় উষ্ণতামাত্রা যোগ করিয়া ঐ মাসের দিনসংখ্যার দ্বারা ভাগ করিয়া ঐ **মাসের গড়** উষ্ণতার পরিমাণ স্থির করা হয়:—

$$\frac{\text{১লা তারিখের গড় উষ্ণতা} + \text{২রা তারিখের গড় উষ্ণতা} + \cdots \text{শেষ তারিখের গড় উষ্ণতা}}{\text{মাসের দিন সংখ্যা}}$$

সেরূপ প্রত্যেক মাসের গড় উষ্ণতামাত্রা যোগ করিয়া তাহাকে ১২ দ্বারা ভাগ করিয়া **বাৎসরিক গড়** উষ্ণতার পরিমাণ স্থির করা হয়। যেমন—

$$\frac{\text{জানুয়ারীর গড় উষ্ণতা} + \text{ফেব্রুয়ারীর গড় উষ্ণতা} + \cdots + \text{ডিসেম্বরের গড় উষ্ণতা}}{১২}$$

ম্যাক্সিমাম থার্মোমিটার—বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতার প্রভাবে সাধারণ উষ্ণতামাপক যন্ত্রের নলের মধ্যস্থিত পারদস্তম্ভ প্রসারিত হয় ও উপরে উঠিতে থাকে, আবার উষ্ণতা কমিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা সঙ্কুচিত হইয়া নীচে নামিয়া আসে। ফলে, সর্বক্ষণ এই থার্মোমিটারের দিকে লক্ষ্য না রাখিলে ইহার সাহায্যে কোন দিনের বা কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ উষ্ণতা কত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। তাই কোন স্থানের যে-কোন দিনের বা সময়ের সর্বোচ্চ উষ্ণতামাত্রা যে-কোন সময়ে লক্ষ্য করিবার উদ্দেশ্যে **গরিষ্ঠ উষ্ণতামাপক যন্ত্র** (Maximum thermometer) ব্যবহৃত হয়। প্রতি দিন সকালবেলা এই যন্ত্র লক্ষ্য করিলে পূর্বের ২৪ ঘণ্টা সময়ের সর্বোচ্চ উষ্ণতার পরিমাণ জানিতে পারা যায়।

এই থার্মোমিটারের নলের মধ্যে পারদ থাকে। এ সম্পর্কে একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে **পারদের উপরদিকের সীমা** সকল অবস্থাতেই **উত্তল** (Convex)। স্প্রিং দ্বারা নলের সহিত যুক্ত একটি সরু চুম্বক সূচক (Index) পারদস্তম্ভের বাহিরে থাকে, কিন্তু তাহা নলের মধ্যস্থিত পারদের সংস্পর্শ পায়। কাজেই বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নলের মধ্যস্থিত পারদ যতই প্রসারিত হয়, ততই পারদের ধাক্কায় এই চুম্বক সূচক উপরে উঠিতে থাকে। এজন্য কোন দিনের বা নির্দিষ্ট সময়ের যে মুহূর্তে উষ্ণতা সর্বাপেক্ষা অধিক থাকে, সে সময়ে নলের মধ্যস্থিত পারদ সূচকটিকে এই থার্মোমিটার যন্ত্রের সর্বোচ্চ অবস্থায় ঠেলিয়া লইয়া যায়। পরে উষ্ণতা কমিবার ফলে এই যন্ত্রের মধ্যস্থিত পারদ সঙ্কুচিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সরিয়া নীচে চলিয়া আসে। কিন্তু সূচকটি তাহার সর্বোচ্চ উষ্ণতা নির্দেশ করিবার স্থান হইতে নড়ে না। কারণ, পারদস্তম্ভ সূচকের নীচে থাকে বলিয়া ইহা সঙ্কুচিত হওয়ার সময় সূচকটিকে নীচের দিকে নামাইতে পারে না। কাজেই সূচকের নীচের দিকের প্রান্ত বা পারদস্তম্ভের নিকটতর প্রান্ত দেখিয়াই উষ্ণতার পরিমাণ স্থির করা হয়। কারণ, এই পর্যন্তই পারদ প্রসারিত হয়। (সূচকের উপরদিকের প্রান্ত কোনক্রমেই সর্বোচ্চ উষ্ণতা নির্দেশ করে না।) সাধারণতঃ মধ্যাহ্নের পরই প্রত্যেক স্থানের উষ্ণতা সবচেয়ে বেশী হয় এবং অপরাহ্ন হইতে তাহা ক্রমশঃ কমিতে থকে। কাজেই মধ্যাহ্নের পরই এই যন্ত্র লক্ষ্য করিয়া যে-কোন দিনের সর্বোচ্চ উষ্ণতা জানা যায়। তবে সাধারণতঃ বিভিন্ন আবহকেন্দ্রে প্রতিদিন সকালে এই যন্ত্রের মধ্যস্থিত **সূচকটির পারদের নিকটতর প্রান্তের অবস্থিতি** লক্ষ্য করিয়া এই যন্ত্রের আশপাশের স্থানের বিগত ২৪ ঘণ্টার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্থির করা হয়।

মিনিমাম্ থার্মোমিটার—কোন স্থানের বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ উষ্ণতামাত্র নির্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে যেমন সাধারণ উষ্ণতামাপক যন্ত্র ব্যবহার করা সম্ভবপর নহে, তেমনই কোন স্থানের যে কোন সময়ের সর্বনিম্ন উষ্ণতা নির্ণয় করিবার জন্যও সাধারণ উষ্ণতা-মাপক যন্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব নহে। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় **লঘিষ্ঠ উষ্ণতা-মাপক যন্ত্র** (Minimum thermometer)। ইহার নলের মধ্যে পারদের পরিবর্তে থাকে এল্‌কহল (Alcohol)। কারণ, পারদ অপেক্ষা এল্‌কহল অধিক সহজে সঙ্কুচিত হয়। এই যন্ত্রের মধ্যেও একটি সূচক থাকে। তবে ইহা এই এল্‌কহলের মধ্যে থাকে। আরও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে **এল্‌কহলের উপরদিকের সীমা** সকল অবস্থাতে **অবতল** (Concave)। এল্‌কহল খুব হাল্কা তরল পদার্থ বলিয়া বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই যন্ত্রের নলের মধ্যস্থিত এল্‌কহল প্রসারিত হয়। তখন ইহা (এল্‌কহল) প্রসারিত হইয়া এই সূচকের পাশ দিয়া উপরদিকে উঠিয়া আসে, কিন্তু ইহা অত্যন্ত হাল্কা বলিয়া সূচকের নীচের দিক্ হইতে সূচককে ঠেলিয়া উপরদিকে তুলিতে পারে না। কাজেই ঐ অবস্থায় সূচকটি তাহার স্থান হইতে নড়ে না। পরে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা কমিবার সঙ্গে সঙ্গে এই যন্ত্রের মধ্যস্থিত এল্‌কহল সঙ্কুচিত হয়।

তখন এই এল্‌কহল নীচের দিকে নামিয়া আসিবার কালে সূচককে কুণ্ডের দিকে নিয়া আসে। **এল্‌কহলের উপরিভাগ অবতল** (Concave) বলিয়াই এল্‌কহলের সঙ্কুচিত হওয়ার সময় তাহার মধ্যস্থিত **সূচককে** এভাবে (Surface tension বশতঃ) **টানিয়া আনা** সম্ভবপর। সূচকটি এভাবে থার্মোমিটারের কুণ্ডের দিকে নামিতে নামিতে ঐ দিনের যে মুহূর্তে সর্বাপেক্ষা কম উষ্ণতা থাকে, সে মুহূর্তে উহা ঐ দিনের বা ঐ সময়ের সর্বনিম্ন অবস্থায় সরিয়া আসে। পরে আবার বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের মধ্যস্থিত এল্‌কহল সূচকটির পাশ দিয়া উপর দিকে উঠিয়া যায়। কিন্তু সূচকটি ঐ অবস্থাতে স্থির (undisturbed) থাকে। কাজেই কোন দিনের শেষ রাত্রির পর যে-কোন সময়ে এই **সূচকের** (কুণ্ড হইতে) **দূরের প্রান্তের অবস্থিতি** দেখিয়া (কারণ, সঙ্কুচিত এল্‌কহল মাত্র ঐ পর্যন্ত নামিতে পারে) ঐ দিনের ঐ সময় পর্যন্ত সর্বনিম্ন উষ্ণতা জানা যায়।

এক্ষেত্রে সূচকের কুণ্ডের নিকটতর প্রান্ত সর্বনিম্ন উষ্ণতামাত্রা নির্দেশ করে না। সাধারণতঃ মধ্যরাত্রির পরই প্রত্যেক স্থানের উষ্ণতার পরিমাণ সবচেয়ে বেশী হ্রাস-প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সবচেয়ে কমিয়া যায় এবং পর দিবস বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা আবার বাড়িতে আরম্ভ করে। কাজেই যে-কোন দিন সকাল বেলা মিনিমাম্ থার্মোমিটারের সূচকটি লক্ষ্য করিলেই ইহার কুণ্ড হইতে দূরের প্রান্তের অবস্থিতি দেখিয়া ঐ স্থানের পূর্বদিনের সর্বনিম্ন উষ্ণতার পরিমাণ জানিতে পারা যায়। বস্তুতঃ প্রত্যহ সকাল বেলাই একটি নির্দিষ্ট সময়ে ম্যাক্সিমাম্ ও মিনিমাম্ উভয় প্রকার থার্মোমিটারের মধ্যস্থিত সূচকের অবস্থিতি লক্ষ্য করিয়া তাহার পূর্বের ২৪ ঘণ্টার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতামাত্রা স্থির করা হয়।

রাদারফোর্ড থার্মোমিটার (Rutherford Maximum and Minimum thermometer)—বিভিন্ন স্থানের প্রত্যেক দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতামাত্রা লক্ষ্য করিবার জন্য সাধারণতঃ রাদারফোর্ড থার্মোমিটার ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে একটি গরিষ্ঠ ও একটি লঘিষ্ঠ উষ্ণতামাপক যন্ত্র একটি ফ্রেমে উপরে-নীচে লাগান থাকে। এগুলি সর্বদাই অনুভূমিক (Parallel to the ground) থাকে। প্রতিদিনই সকালে নির্দিষ্ট সময়ে ইহাদের দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে প্রত্যেক যন্ত্রের মধ্যস্থিত পারদ বা এল্‌কহল হইতে সূচক বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। ঐ অবস্থায়ই ম্যাক্সিমাম্ থার্মোমিটারের সূচকটির পারদের নিকটতর প্রান্তের অবস্থিতি এবং মিনিমাম্ থার্মোমিটারের সূচকটির দূরের প্রান্তের অবস্থিতি লক্ষ্য করিয়া উষ্ণতামাত্রা লিখিয়া রাখা হয়। তারপর ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যস্থিত চুম্বক-সূচককে অপর একটি চুম্বকের সাহায্যে প্রত্যেক যন্ত্রের

মধ্যস্থিত **পারদ বা এল্‌কহলের সংস্পর্শে** আনিয়া দিতে হয়। ম্যাক্সিমাম্ থার্মো-মিটারে সূচকের নীচের প্রান্তকে পারদস্তম্ভের উত্তল (Convex) সীমার সংস্পর্শে আনা হয়। আর মিনিমাম্ থার্মোমিটারে সূচকের উপরের প্রান্তকে এল্‌কহলস্তম্ভের অবতল (Concave) সীমার সংস্পর্শে আনিয়া দিতে হয়। তাহা না করিলে সঠিক উষ্ণতা-মাত্রা (Correct reading of temperature) জানা যায় না। এভাবে উষ্ণতা লক্ষ্য করিয়া সাধারণ কাগজে অঙ্ক (Figures) দ্বারা মানচিত্রে সমোষ্ণ রেখা (Isotherm) আঁকিয়া অথবা ছক কাগজে চিত্র বা লেখচিত্র (Graph) আঁকিয়া উষ্ণতার পরিমাণ ও হ্রাস-বৃদ্ধি প্রকাশ করা হয়।

সিক্সের থার্মোমিটার যন্ত্র (Six's thermometer)—কোন স্থানের গড় উষ্ণতা মাত্রা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে পৃথক্ ম্যাক্সিমাম্ থার্মোমিটার ও পৃথক্ মিনিমাম্ থার্মোমিটার ব্যবহার না করিয়া কখন কখন এমন একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয় যাহাতে এক সঙ্গে ম্যাক্সিমাম্ ও মিনিমাম্ উভয় প্রকার থার্মোমিটার যন্ত্রের ব্যবস্থা থাকে। এই যন্ত্রের আকৃতি কতকটা ইংরেজী U-এর মত। এই যন্ত্রের থার্মোমিটারগুলি খাড়া (Vertical) অবস্থায় থাকে, রাদারফোর্ডের থার্মোমিটারের মত অনুভূমিক থাকে না। এরূপ যন্ত্রে নীচের দিকে (বাঁকের উভয় পাশে কিছুদূর পর্যন্ত) পারদ থাকে এবং উপর দিকে দুই বাহুতে থাকে এল্‌কহল। আর প্রত্যেক বাহুর এল্‌কহলের মধ্যে থাকে একটি করিয়া চুম্বক সূচক। এরূপ একটি (বামদিকের) বাহু লঘিষ্ঠ উষ্ণতামাপক যন্ত্রের (মিনিমাম্ থার্মোমিটার) কাজ করে, আর অপরটি (ডানদিকের) গরিষ্ঠ উষ্ণতামাপক যন্ত্রের (ম্যাক্সিমাম্ থার্মোমিটারের) কাজ করে। এরূপ প্রত্যেকটি বাহুর উপরদিকে একটি করিয়া কুণ্ড থাকে। গরিষ্ঠ থার্মোমিটারের উপরদিকের কুণ্ডটির উপর অংশ সম্পূর্ণভাবে এল্‌কহল দ্বারা পূর্ণ থাকে না; ইহা আংশিকভাবে শূন্য থাকে। আর লঘিষ্ঠ থার্মোমিটারের উপরদিকের কুণ্ডটি সম্পূর্ণরূপেই এল্‌কহল দ্বারা পূর্ণ থাকে।
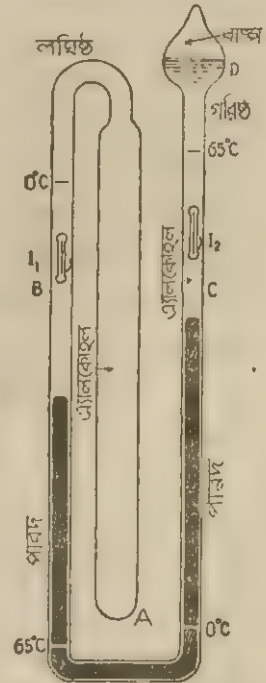
উপরের চিত্রে এই যন্ত্রের নির্দিষ্ট অংশে পারদ, এল্‌কহল এবং সূচক দুইটির

কোন এক সময়ের অবস্থান দেখান হইয়াছে। ডানদিকের গরিষ্ঠ উষ্ণতামাপক যন্ত্রের (Maximum thermometer) উপরদিকের আংশিকভাবে শূন্য বা ফাঁকা (Partial vacuum) স্থানে এল্‌কহল বাষ্প আছে। বায়ুমণ্ডলের অধিক উষ্ণতার ফলে এই যন্ত্রের গরিষ্ঠ উষ্ণতামাপক অংশের এল্‌কহল প্রসারিত হইয়া উপরের ঐ শূন্য স্থানের দিকে অগ্রসর হয়। এই যন্ত্রের বাম দিকের বাহুর লঘিষ্ঠ উষ্ণতামাপক যন্ত্রের উপর দিকের অংশেও একটি কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডটি ডানদিকের বাহুর গরিষ্ঠ উষ্ণতামাপক যন্ত্রের উপরদিকের কুণ্ডটির মত বন্ধ থাকিতে পারে, আবার খোলাও থাকিতে পারে। তবে লঘিষ্ঠ উষ্ণতামাপক যন্ত্রের উপরদিকের এল্‌কহলের কুণ্ডটি এল্‌কহল দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ। কাজেই বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এই লঘিষ্ঠ থার্মোমিটার যন্ত্রের এল্‌কহল প্রসারিত হয়, কিন্তু তাহার পক্ষে উপরদিকের এল্‌কহল দ্বারা পূর্ণ কুণ্ডের মধ্যে স্থানলাভ করা অসম্ভব। তাহা নীচের দিকে নামিয়া আসে। কিন্তু তখন এই অংশের এল্‌কহলের মধ্যস্থিত সূচকটি নড়ে না। অথচ এই বাহুর উপরদিকের এল্‌কহল নামিয়া আসিয়া নীচের পারদের উপর চাপ দেয়। তখন এই চাপের ফলে ডানদিকের বাহুর গরিষ্ঠ উষ্ণতামাপক যন্ত্রের (Maximum thermometer) মধ্যস্থিত পারদ উপরদিকে উঠিয়া আসে। সে সময় ইহা গরিষ্ঠ উষ্ণতামাপক যন্ত্রের সূচকটিকেও উপরে ঠেলিয়া তোলে এবং এই পারদস্তম্ভের উপরদিকের এল্‌কহলকেও উপরদিকে ঠেলিয়া দেয়। এই যন্ত্রের উপরদিকের কুণ্ডটি আংশিকভাবে ফাঁকা বা শূন্য থাকার ফলে নীচের পারদের ধাক্কায় প্রসারিত এল্‌কহল সহজেই এই শূন্য অংশে স্থান লাভ করিতে পারে।

তারপর বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা যখন ক্রমশঃ কমিতে থাকে তখন বামদিকের বাহুর লঘিষ্ঠ উষ্ণতামাপক যন্ত্রের উপরদিকের এল্‌কহল সঙ্কুচিত হয় ও উপরের কুণ্ডের দিকে উঠিয়া যায়। তখন এই সঙ্কুচিত এল্‌কহলের জন্য তাহার নীচের দিকে যে আংশিক ভাবে ফাঁক সৃষ্ট হয় তাহা পূরণের উদ্দেশ্যে এই বাহুর নীচের অংশে যে পারদ থাকে তাহা এই বাহুর উপরদিকের কুণ্ডের দিকে অগ্রসর হয়। ফলে, ডানদিকের বাহুর গরিষ্ঠ উষ্ণতামাপক যন্ত্রের পারদও নীচের দিকে নামে। কিন্তু এই (গরিষ্ঠ থার্মোমিটার যন্ত্রের) অংশের পারদ এভাবে নামিয়া গেলেও এই বাহুর পারদের উপরদিকের সূচকটি সর্বোচ্চ উষ্ণতা নির্দেশ করিবার অঙ্কেই থাকিয়া যায়। আরও দেখা যায়, বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা যতই কমিতে থাকে বামদিকের অংশের পারদের উপরদিকের এল্‌কহল ততই সঙ্কুচিত হইতে থাকে ও উপরে কুণ্ডের দিকে যাইতে থাকে। আর এই এল্‌কহলের নীচের অংশের পারদও বামদিকের বাহুর উপরদিকে অর্থাৎ কুণ্ডের দিকে উঠিতে থাকে।

তখন এই পারদের ধাক্কায় তাহার উপরদিকে এল্‌কহলের সহিত তাহার মধ্যস্থিত সূচকটিও কম উষ্ণতা নির্দেশ করিবার অঙ্কের দিকে সরিতে থাকে।

ইহার পর বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বামদিকের বাহুর লঘিষ্ঠ থার্মোমিটার যন্ত্রের এল্‌কহল প্রসারিত হইয়া বামদিকের কুণ্ড হইতে নীচের দিকে সরিয়া আসিলেও সূচকটি পূর্বের অবস্থাতেই (সর্বনিম্ন উষ্ণতা নির্দেশ করিবার অঙ্কেই) থাকিয়া যায়। কাজেই প্রতিদিন সকালে নির্দিষ্ট সময়ে এরূপ একটি মাত্র থার্মোমিটার যন্ত্র লক্ষ্য করিয়া (তাহার বাম বাহুতে লঘিষ্ঠ উষ্ণতামাপক যন্ত্র এবং ডান বাহুতে গরিষ্ঠ উষ্ণতামাপক যন্ত্র থাকার ফলে) পূর্ববর্তী ২৪ ঘণ্টার বা কোন নির্দিষ্ট সময়ের সর্বোচ্চ উষ্ণতা ও সর্বনিম্ন উষ্ণতামাত্রা লক্ষ্য করা হয় ও ইহাদের মধ্যস্থ সূচক দুইটিকে নিজ নিজ অংশের পারদ ও এল্‌কহলের সংস্পর্শে আনিয়া দেওয়া হয়।

থার্মোগ্রাফ (Thermograph)—বর্তমানে অনেক স্থানে ম্যাক্সিমাম্ ও মিনিমাম্ থার্মোমিটারের চেয়ে আরও সহজ এবং নির্ভুল যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ্য করা হয়। কিভাবে মিনিটে মিনিটে, সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে উষ্ণতা বৃদ্ধি হয় এবং হ্রাস পায় তাহাও এই যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্য করা যায়। ইহা একটি ঘূর্ণায়মান **তাপলেখ** যন্ত্র। ইহাতে একটি চোঙ থাকে এবং তাহা সর্বদা নির্দিষ্ট গতিতে একই দিকে আবর্তন করে (Revolving cylinder)। এই চোঙের গায়ে একটি সরু কলম এভাবে লাগান থাকে যেন উষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চোঙের উপরিস্থিত ছক কাগজে (Graph paper) তদনুরূপে উঁচু নীচু দাগ পড়ে। এই দাগ দেখিয়া যে-কোন সময়ের উষ্ণতা, কোন দিনের সর্বোচ্চ উষ্ণতা, সর্বনিম্ন উষ্ণতা প্রভৃতি জানিতে পারা যায়। এমন কি, বিভিন্ন দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়।

বায়ুর চাপ পরীক্ষা ও চাপমান যন্ত্র

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক **টরিচেলি** ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কাচের নল ও পারদের সাহায্যে খুব সহজ উপায়ে বায়ুর চাপ **পরীক্ষা** (Torichelli's experiment) করিয়াছিলেন। এরূপ পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ৭৬ সেন্টিমিটারের (৩০" ইঞ্চির) অধিক দীর্ঘ একটি একমুখ বন্ধ কাচের নল পারদ দ্বারা পূর্ণ করা হয়। তারপর খোলা মুখটি হাতের আঙুল দিয়া চাপিয়া ধরিয়া নলটিকে উল্টাইয়া একটি পারদপূর্ণ বাটিতে বা পারদপূর্ণ অন্য কোন পাত্রে উপুড় করিয়া তথাকার পারদের সংস্পর্শে রাখা হয়। (নলের পারদ ও পাত্রের পারদের মধ্যে কোন ফাঁক রাখা হয় না)। তারপর হাতের আঙুল সরাইয়া নেওয়া হয়। সমুদ্রসমতলে (Sea level) পরীক্ষা করিলে দেখা যায় নলের মধ্যস্থিত পারদের কতক

অংশ নীচের বাটির বা পাত্রের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে এবং নলের মধ্যে যে পারদ অবশিষ্ট আছে, তাহার উচ্চতা খাড়াভাবে মাপিলে (Vertical height) ৭৬ সেন্টি-মিটার বা প্রায় ৩০″। নলটি খাড়া, কাৎ বা হেলান যে ভাবেই থাকে না কেন, এই নলের মধ্যস্থিত পারদস্তম্ভের উপরদিকের সীমা হইতে নীচের বাটির পারদের উপরিসীমা বা ঐ সমতল (Level) পর্যন্ত খাড়া মাপ (Vertical height) ৭৬ সেন্টিমিটার বা ৭৬০ মিলিমিটার বা ৩০″ ইঞ্চি।

আর যদি পাহাড়, পর্বত প্রভৃতি উচ্চ ভূমিতে এরূপ পরীক্ষা করা হয়, তবে দেখা যায় নলের মধ্যে যে পারদ ছিল তাহা আরও নীচে নামিয়া গিয়াছে। সমভূমি অপেক্ষা পাহাড়, পর্বত প্রভৃতি উঁচু জায়গাতে (২৫০০ মি উচ্চতা পর্যন্ত) সাধারণতঃ ৫০০ মিঃ উচ্চতায় ৩৬ হইতে ৪৪ মি মি হিসাবে বায়ুর চাপ কম। কাজেই বুঝা যায় যে প্রত্যেক স্থানের বায়ুর চাপের পরিবর্তনের জন্যই নলের মধ্যস্থিত পারদ এভাবে উঁচু-নীচু হইয়া থাকে।

এসম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে প্রকৃত ব্যাপারটি এরূপ। যে বাটির বা অপর কোন পারদপূর্ণ পাত্রের উপর পারদপূর্ণ নলটি উপুড় করা হয়, সেই পাত্র বা বাটির মধ্যস্থিত (কিন্তু নলের বাহিরের) পারদের উপর বায়ুর চাপ পড়িতেছে। কেবল ঐ বাটির বা পাত্রের পারদের যে অংশটি নল দ্বারা আবদ্ধ, তথায় বায়ুর সোজাসুজি চাপ পড়িতেছে না। এদিকে উপুড়-করা নলটি নীচের পাত্র বা বাটির মধ্যে এভাবে আছে যে বাটির মধ্যস্থিত পারদ ঐ নলের মধ্যস্থিত পারদের সঙ্গে যুক্ত (মাঝখানে কোন ফাঁক নাই)। এপ্রকার পাত্রস্থিত তরল পদার্থের (পারদসহ) উপর বায়ুর চাপ সম্পর্কে আমরা জানি যে, যে-কোন পাত্রের মধ্যস্থিত সংযোগযুক্ত (ফাঁকশূন্য) যে-কোন তরল পদার্থের কোন তলের (Surface) উপর সর্বত্র উপরিস্থিত বায়ুর চাপের পরিমাণ সমান। কাজেই বাটির মধ্যস্থিত পারদের যে অংশ নলের বাহিরে থাকে তাহার উপর বায়ুর যতটুকু চাপ পড়ে, নলের মধ্যস্থিত পারদের চাপ তাহার ঠিক সমান। (নলের মধ্যস্থিত পারদস্তম্ভের ওজনকেই পারদের চাপ বলা হয়।) যদি নলের মধ্যস্থিত পারদের চাপ নলের বাহিরে ঐ বাটির মধ্যস্থিত অন্যান্য অংশের পারদের উপর বায়ুর চাপের সমান না হয়, তবে নলের ভিতর ও বাহিরের পারদের উপর বায়ুর চাপ সমান না হওয়া পর্যন্ত নীচের পাত্রের পারদের কিছু অংশ পারদকে নলের মধ্যে উপর দিকে উঠিয়া যায়।

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, যে-কোন স্থানে **বায়ুর চাপ যত বেশী,** তথায় ঐরূপ নলের মধ্যস্থিত **পারদের উচ্চতা তত অধিক**। অপর পক্ষে বাটির মধ্যস্থিত পারদের উপর বায়ুর চাপ যত কম, তাহার পক্ষে নলের মধ্যস্থিত পারদকে তত কম পরিমাণে ঠেলিয়া রাখা সম্ভবপর, অর্থাৎ নলের মধ্যস্থিত পারদের উচ্চতা তত কম। এ সম্পর্কে

একটি সহজ পরীক্ষা করিতে পারা যায়। পারদপূর্ণ একটি কাচের নলকে একটি পারদ-পাত্রের মধ্যে উপুড় করিয়া রাখা হয়। তারপর কাচের নলসহ পারদ-পাত্রটিকে বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্রের প্লেটের উপর রাখিয়া একটি কাচের জার দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হয়। সমুদ্রসমতলে এই অবস্থায় নলের মধ্যস্থিত পারদের উচ্চতা ৭৬ সেন্টিমিটার বা ৩০" ইঞ্চি। ইহার পর পাম্পের সাহায্যে খুব ধীরে ধীরে জারের ভিতর হইতে বায়ু টানিয়া বাহির করিলে দেখা যায় যে নলের মধ্যস্থিত পারদও ধীরে ধীরে নামিয়া যাইতেছে।

উপরিলিখিত উপায়ে বায়ুর চাপ সম্পর্কে পরীক্ষাকালে আর একটি বিষয়ও মনে রাখা দরকার—বাটির মধ্যস্থিত পারদের (উপরের তলের) উপরে ঐ নলের মধ্যে যে পারদ থাকে তাহার চাপ যতক্ষণ কম থাকে ও বাটির মধ্যস্থিত পারদের উপর বায়ু-মণ্ডলের বা বায়ুর চাপের সমান না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাটির মধ্য হইতে পারদ নলের মধ্যে উপর দিকে উঠিতে থাকে। এভাবে নলের মধ্যে পারদ উঠিবার ফলে যখন নলের মধ্যস্থিত পারদের চাপ আর বাটির মধ্যস্থিত পারদের উপর বায়ুর চাপ সমান হয়, তখনই নলের মধ্যস্থিত পারদ স্থির থাকে। কাজেই বাটির পারদের (উপরের তলের) উপর **নলের** মধ্যে যে **পারদ** থাকে তাহার **ওজনই বায়ুর চাপের সমান**। এজন্যই এই নলের মধ্যস্থিত পারদের ওজন লইয়াই বায়ুর চাপ স্থির করা হয়।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে কাচের নলের ব্যাস (Diameter) ১" ইঞ্চি হইলে সমুদ্রসমতলে (Sealevel) নলের মধ্যস্থিত পারদের উচ্চতা হয় ৭৬ সেন্টিমিটার বা ৭৬০ মিলিমিটার বা প্রায় ৩০" এবং ঐ পারদের ওজন হয় প্রায় ১৫ পাউণ্ড বা প্রায় ৬'৮ কে জি। নলের মধ্যস্থিত পারদের এই ওজন তথাকার বায়ুর চাপের সমান। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে **সমুদ্র সমতলে একবর্গ ইঞ্চি** পরিমিত স্থানে বায়ুর চাপ **প্রায় ১৫ পাউণ্ড বা ৬'৮ কেজি**।

ফোর্টিন ব্যারোমিটার—বৈজ্ঞানিক টরিচেলির বায়ুচাপ পরীক্ষার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার চাপমানযন্ত্র তৈয়ারী হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কিউ (Kew), ফোর্টিন (Fortin) এবং য়্যানিরয়েড (Aneroid) ব্যারোমিটার উল্লেখযোগ্য। এসকল যন্ত্রের সাহায্যে আধুনিক **মিলিমিটার** মাপ এবং পূর্বে প্রচলিত **ইঞ্চির** মাপ—এই উভয় মাপে বায়ুর চাপ নির্ণয় করা হয়।

এখন ফোর্টিন ব্যারোমিটার সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। ইহার সহিত কিউ ব্যারোমিটারের বিশেষ পার্থক্য নাই। ইহাদের নিম্ন অংশে একটি পারদপূর্ণ পাত্র থাকে ও তাহার সহিত একটি ৭৬ সেন্টিমিটারের অধিক দীর্ঘ কাচের নল খাড়াভাবে সংযুক্ত থাকে। প্রথম অবস্থায় এই নলটির উপরের মুখ খোলা ও নীচের মুখ বন্ধ থাকে।

এই নলটিকে বিশুদ্ধ শুষ্ক পারদ দ্বারা পূর্ণ করা হয় এবং খোলা মুখটিকে আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া উল্টাইয়া নীচের পারদের পাত্রে উপুড় করিয়া পারদের সংস্পর্শে রাখা হয়। কাজেই এই যন্ত্রের মধ্যে এই নলটি যখন থাকে, তখন তাহার উপরের মুখ বন্ধ ও নীচের মুখ খোলা। ফলে, নলের ভিতরের পারদ কিছুটা নামিয় তারপর তাহা স্থির থাকে। বায়ুর চাপের পার্থক্যবশতঃ এই নলের মধ্যস্থিত পারদস্তম্ভের উচ্চতা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়।
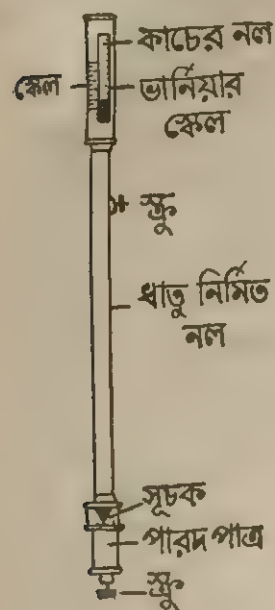
পারদপূর্ণ নলটি যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায় সেজন্য ইহাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ইহার বাহির দিকে একটি ধাতুনির্মিত নল (Jacket) থাকে। এই ধাতব নলের গায়েই বায়ুর চাপমাত্রা লক্ষ্য করিবার জন্য এক পাশে আঁকা থাকে মিলিমিটার স্কেল। অন্য পাশে আঁকা থাকে ইঞ্চি স্কেল। পারদপূর্ণ পাত্রের মধ্যস্থিত পারদের উপরিভাগ (Surface level) হইতে কাচের নলের মধ্যস্থিত পারদস্তম্ভের উচ্চতার সাহায্যে যে-কোন স্থানের বায়ুমণ্ডলের চাপ স্থির করা হয়। তাই নলের মধ্যস্থিত পারদের উচ্চতাকে বলা হয় চাপের উচ্চতা (Barometric height)।

বায়ুর উষ্ণতার সহিত ইহার চাপের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। সেজন্য ব্যারোমিটার যন্ত্রের গায়ে একটি থার্মোমিটারও লাগান থাকে। উভয় যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর উষ্ণতা ও চাপের সম্পর্ক এবং ইহাদের পরিবর্তন লক্ষ্য করা হয়।

সমুদ্রসমতলে (Sea level) এই যন্ত্রের মধ্যস্থিত নলের পারদস্তম্ভের উচ্চতা প্রায় ৭৬০ মি.মি.। কেবলমাত্র তথায় খুব বেশী শীত পড়িলে বায়ুর চাপ বৃদ্ধি হয় এবং সেরূপ ক্ষেত্রে নলের মধ্যস্থিত পারদের উচ্চতা কিছু বৃদ্ধি হয়। অপর দিকে, যদি কোথাও উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়, অথবা যন্ত্রটিকে যদি ক্রমশঃ অধিক উচ্চভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়, তবে ঐ অবস্থায় বায়ুর চাপ কমিবার সঙ্গে সঙ্গে নলের মধ্যস্থিত পারদের উচ্চতাও ৭৬০ মি. মি. হইতে কমিয়া যায়। সাধারণতঃ নলের মধ্যস্থিত পারদ খুব ধীরে ওঠা-নামা করে, এমন কি কখন কখন বহু সময় পর্যন্ত প্রায় স্থির থাকে। কাজেই যদি কখনও কোথাও দেখা যায় যে ঐ যন্ত্রের মধ্যস্থিত পারদ হঠাৎ অধিক নীচে নামিয়া যায়,

তাহা হইলে বুঝা যায় যে তথায় বায়ুর চাপ হঠাৎ খুব বেশী কমিয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় তথায় শীঘ্রই ঘূর্ণবাত (Cyclone) বা ঝড় বৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ব্যারোমিটার লক্ষ্য করিবার প্রণালী—কোন স্থানের বায়ুর **চাপের পরিমাণ** ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভের সাহায্যে নিম্নলিখিত ভাবে স্থির করা হয়। সমুদ্রসমতলে বায়ুর চাপ প্রায় ৭৬০ মিলিমিটার বা মোটামুটি হিসাবে ২৯·৯২" বা প্রায় ৩০" ইঞ্চি। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে অথবা একই স্থানে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার পরিমাণ সমান থাকে না। তাহার ফলে একই স্থানে বিভিন্ন সময়ে অথবা বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে বায়ুর চাপেরও পরিবর্তন ঘটে। এইরূপ চাপের পরিমাণ হিসাব করিবার জন্য প্রথমেই লক্ষ্য করা হয়, ধাতু নির্মিত নলের নীচে যে হাতির দাঁতের বা হাড়ের সূচক (Ivory Index) আছে তাহার অগ্রভাগ অথবা নিম্নতম অংশ বা শেষ বিন্দুটি নীচের পারদপূর্ণ পাত্রের পারদের ঠিক উপরিভাগ স্পর্শ করিয়াছে কি না। এ সম্পর্কে মনেরাখা দরকার, এই সূচকটি নীচের পাত্রের পারদের ঠিক উপরিসীমা স্পর্শ করামাত্র উভয় অংশের পারদের (নলের মধ্যস্থিত পারদের সহিত নীচের পাত্রের পারদের) যোগ স্থাপিত হয়। অর্থাৎ ঠিক তখনই নীচের পাত্রের পারদের উপর বায়ুমণ্ডলের যে চাপ পড়ে, তাহা নলের মধ্যস্থিত পারদস্তম্ভকে উপরদিকে তখনকার অবস্থা পর্যন্ত ঠেলিয়া রাখে। অর্থাৎ বায়ুর চাপ নলের মধ্যস্থিত পারদের এই উচ্চতার সমান। আর ব্যারোমিটারের আইভরি সূচকটি নীচের পাত্রের পারদের উপরিসীমা স্পর্শ না করিলে, অর্থাৎ নীচের পাত্রের পারদের উপরিসীমা ও সূচকের মধ্যে একটুও ফাঁক থাকিলে নীচের পাত্রের পারদের উপর বায়ুমণ্ডলের চাপ নলের মধ্যস্থিত পারদের উচ্চতার সমান হইতে পারে না। আবার সূচকটির কিছুমাত্র অংশ নীচের পাত্রের পারদের মধ্যে প্রবেশ করিলেও নীচের পাত্রের পারদের উপর বায়ুমণ্ডলের চাপ নলের মধ্যস্থিত পারদের উচ্চতার সমান হয় না।

পিতলের নল
কাচের নল
চামড়া
আইভরি পয়েণ্ট (সূচক)
পারদ
চামড়া
নড়াইবার স্ক্রু
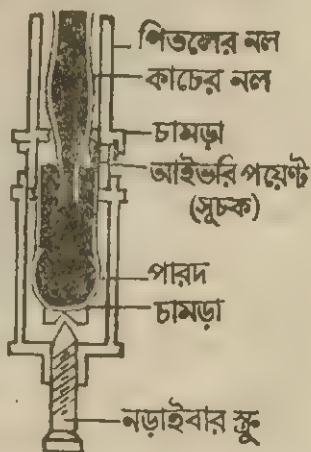
সূচকের অগ্রভাগ নীচের পাত্রের পারদের উপরিভাগকে ঠিক স্পর্শ করিবামাত্র এই সূচকের অগ্রভাগকে চাপের পরিমাণ মাপিবার স্কেলের ০ (শূন্য) অঙ্ক ধরিয়া উপরদিকে গণনা করা হয়। অর্থাৎ ঐ **সূচকের অগ্রভাগ**

(Ivory point) হইতেই নলের মধ্যস্থিত পারদের উচ্চতা মাপিবার **স্কেল আরম্ভ** হয়। কাচের নলের মধ্যস্থিত পারদকে প্রয়োজনমত উপর বা নীচের দিকে নাড়িবার জন্য এই যন্ত্রের নীচে স্ক্রু (Screw) আছে। ইহাকে সাবধানে প্রয়োজনমত নাড়াইয়া নলের মধ্যস্থিত পারদস্তম্ভকে সূচকের অগ্রভাগের সঙ্গে মিলাইয়া * দিতে হয়। এ সম্পর্কে দেখা যায়, পারদপাত্রের নীচের দিকে একটি চামড়ার থলে আছে। স্ক্রুটি ঘুরাইলে থলেটির নীচের ভাগ উঠানামা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পারদের উপরিতলও উঠিয়া বা নামিয়া ঐ সূচককে স্পর্শ করে। চামড়ার থলের মধ্য দিয়া বায়ু চলাচল করিতে পারে, কিন্তু পারদ বাহিরে আসিতে পারে না। উভয় অংশের পারদের মধ্যে যোগ স্থাপিত হওয়ার মুহূর্তে নলের মধ্যস্থিত পারদের সীমা লক্ষ্য করিয়া এবং তাহার পাশের স্কেল দেখিয়া ঐ সময়ে উক্ত স্থানের বায়ুর চাপের পরিমাণ স্থির করা হয়।

ভার্নিয়ার স্কেল ও তদনুসারে সঠিক মাপ লইবার প্রণালী (Vernier scale reading)—ব্যারোমিটার যন্ত্রে পারদপূর্ণ নলের বাহির দিকে যে ধাতুনির্মিত নল থাকে তাহার গায়ে মিলিমিটার স্কেল ও ইঞ্চি স্কেল লেখা থাকে। এই সাধারণ স্কেল বা মূল স্কেল অথবা প্রধান স্কেল (Main scale) লক্ষ্য করিয়া যে-কোন স্থানে ও যে-কোন সময়ে বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিমাণ মোটামুটিভাবে অর্থাৎ এক দশমিক স্থান পর্যন্ত স্থির করিতে পারা যায়। তাই আরও সূক্ষ্ম বা যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে চাপের পরিমাণ হিসাবের জন্য মূল স্কেলের পাশে ভার্নিয়ার স্কেল (Vernier seale) নামে অপর একটি স্কেলের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। ভার্নিয়ার স্কেলের আয়তন থাকে ছোট এবং তাহাকে সহজেই মূল বা সাধারণ স্কেলের পাশে পাশে নাড়িবার ব্যবস্থা থাকে।

ভার্নিয়ার স্কেলের সাহায্যে উভয় স্কেলের মধ্যে স্থির সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া পারদের উচ্চতা অর্থাৎ বায়ুর চাপ সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর হিসাব করা হয়। এই উদ্দেশ্যে **ভার্নিয়ার স্কেলের নিম্ন সীমা** বা ০ (নিম্নতম চিহ্ন) যাহাতে **পারদস্তম্ভের উপদিকের সীমা স্পর্শ*** করে তাহার ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য ভার্নিয়ার স্কেলের সহিত যুক্ত স্ক্রুকে প্রয়োজনমত ঘুরাইতে হয়। তারপর যে মুহূর্তে দেখা যায় যে ভার্নিয়ার স্কেলের নিম্নসীমা নলের মধ্যস্থিত পারদস্তম্ভের উপরদিকের সীমা স্পর্শ করিয়াছে, তখন ঐ চিহ্ন হইতে কত দাগ উপরে ভার্নিয়ার স্কেল ও মূল স্কেলের চিহ্ন বা দাগ মিলিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করা হয়। এ সম্পর্কে মনে রাখা প্রয়োজন যে পারদের উপরদিকের সীমা উত্তল (Convex)। পূর্বেই ব্যারোমিটারের মূল বা প্রধান বা সাধারণ স্কেল ও ভার্নিয়ার

* এই যন্ত্রে পারদপূর্ণ নলের পিছন দিকে একটি ছোট কিন্তু পরিষ্কার আয়না থাকে। সেদিকে তাকাইলে সূচকটি নীচের পাত্রের পারদের ঠিক উপরসীমা স্পর্শ করিয়াছে কিনা তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

স্কেলের মধ্যে স্থির সম্পর্ক (Vernier constant) ঠিক করা হইয়াছে। এখন ভার্নিয়ার স্কেলের কত সংখ্যক দাগচিহ্নে উভয় স্কেলের দাগ (ভার্নিয়ার স্কেলের একটি দাগ ও মূল স্কেলের একটি দাগ) মিলিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করা হয়। এরূপ মাপ পর পর তিনবার নিয়া তাহার গড় নিলেই তাহা সাধারণতঃ নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করা হয়। তারপর ভার্নিয়ার স্কেলের নিম্নসীমা (০) হইতে ১, ২, ৩ প্রভৃতি উপরদিকে গুণিয়া ঐ স্কেলের যত সংখ্যক দাগে ব্যারোমিটারের মূল বা সাধারণ স্কেলের কোন একটি দাগ মিলিত হইয়াছে, ভার্নিয়ার স্কেলের দাগের সেই সংখ্যাকে উভয় স্কেলের মধ্যে স্থির সম্পর্ক (Vernier constant) দ্বারা গুণ করা হয়। পূর্বে ব্যারোমিটারের মূল বা সাধারণ স্কেল অনুসারে ঐ সময়ের বায়ুর চাপের পরিমাণ সম্পর্কে যে সাধারণ মাপ স্থির করা হইয়াছে, তাহার সহিত এই নূতন সংখ্যাকে যোগ দিতে হয়। এ ভাবেই ব্যারোমিটারের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের চাপের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

(ক) **সেন্টিমিটার ও মিলিমিটার স্কেল** (Centimetre and millimetre scale)—ব্যারোমিটারে সাধারণতঃ সেন্টিমিটার এবং মিলিমিটার স্কেল ব্যবহৃত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে মূল বা সাধারণ স্কেলে ৭৫, ৭৬, ৭৭ প্রভৃতি মাপে বিভিন্ন সেন্টিমিটার বুঝায় (৭৫ সেন্টিমিটার=৭৫০ মিলিমিটার ; ৭৬ সেন্টিমিটার=৭৬০ মিলিমিটার)। আর ভার্নিয়ার স্কেল অনুসারে মূল স্কেলের ১·৯ সেন্টিমিটার বা ১৯ মিলিমিটারকে (19 mm) ভার্নিয়ার স্কেলের ২০ ভাগের সমান করিয়া একটি ভার্নিয়ার স্কেল তৈরী করা হয়। কাজেই এক্ষেত্রে মূল স্কেলের এক এক ক্ষুদ্র ভাগ হইল এক সেন্টিমিটারের $\frac{১}{১০}$ ($\frac{১}{১০}$ সেঃ মিঃ)=·১ সেঃ মিঃ বা ১ মিঃ মিঃ। আর মূল স্কেলের এরূপ ১৯ ভাগ বা ১৯ মিঃ মিঃ হইল ভার্নিয়ার স্কেলের ২০ ভাগের সমান। অর্থাৎ এরূপ ভার্নিয়ার স্কেলের এক ভাগ হইল মূল স্কেলের এক ভাগের $\frac{১৯}{২০}$ অংশ অর্থাৎ $\frac{১৯}{২০}$ মিঃ মিঃ। অতএব মূল স্কেলের এক ভাগের সহিত ভার্নিয়ার স্কেলের এক ভাগের পার্থক্য হইল মূল স্কেলের $১-\frac{১৯}{২০}=\frac{২০-১৯}{২০}=\frac{১}{২০}$=মূল স্কেলের ·০৫ অংশ ('05 of main scale)।

∴ মূল স্কেলের সহিত ভার্নিয়ার স্কেলের স্থির সম্পর্ক (Vernier constant)= মূল স্কেলের এক ভাগ (এক্ষেত্রে ১ মিঃ মিঃ) × উভয় স্কেলের পার্থক্য (এক্ষেত্রে ·০৫)।

=১ মিঃ মিঃ × ·০৫

=·০৫ মিঃ মিঃ

মনে করা যাক, ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভের উপরদিকের সীমা মূল স্কেলের ৭৬·২ সেঃ মিঃ বা ৭৬২ মিঃ মিঃ-এর উপর যেখানে উঠিয়াছে সেখানে ভার্নিয়ার স্কেলের ৩ দাগে মূল স্কেলের একটি দাগ মিশিয়া গিয়াছে। কাজেই এখানে মূল স্কেল অনুসারে পারদ-

স্তম্ভের উপরিসীমা ১৬'২ সেঃ মিঃ বা ১৬২ মিঃ মিঃ এর চেয়ে বেশী। আর ভার্নিয়ার স্কেলের ৩ দাগে মূল স্কেলের একটি দাগ মিশিয়াছে বলিয়া এই দুই স্কেলের স্থির সম্পর্ক (Vernier constant) অনুসারে পারদের উপরিসীমা

=১৬২+(৩×'০৫) মিঃ মিঃ

=১৬২+'১৫ মিঃ মিঃ=১৬২'১৫ মিঃ মিঃ
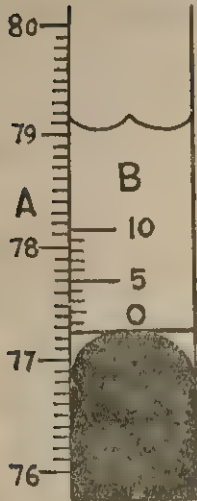
মূল ও ভার্নিয়ার স্কেল

ব্যারোমিটারের উপরদিকের অংশের একটি চিত্র পাশে দেওয়া হইয়াছে। তাহার বাম পাশে সেন্টিমিটার অনুযায়ী মূল বা সাধারণ স্কেল দেওয়া হইয়াছে। এখানে সেন্টিমিটার স্কেলের পাশে ভার্নিয়ার স্কেলটিতে মূল স্কেলের ৯ ভাগ হইল ভার্নিয়ার স্কেলের ১০ ভাগের সমান। কাজেই এক্ষেত্রে মূল স্কেল ও ভার্নিয়ার স্কেলের স্থির সম্পর্ক (Vernier constant) হইল ১ মিঃ মিঃ×'১ ='১ মিঃ মিঃ।

পাশের চিত্রটিতে ব্যারোমিটারের নলের মধ্যস্থিত পারদস্তম্ভের উপরদিকের সীমা মূল স্কেল অনুসারে ৭৭২ মিঃ মিঃ-এর উপর রহিয়াছে। আরও দেখা যায়, ভার্নিয়ার স্কেলের নিম্নসীমা ঐ পারদ-স্তম্ভের উপরিসীমাকে স্পর্শ করিয়াছে এবং ভার্নিয়ার স্কেলের ৫ দাগ মূল স্কেলের একটি দাগের সহিত মিলিয়াছে। কাজেই এক্ষেত্রে নলের মধ্যস্থিত পারদের উচ্চ সীমা

=৭৭২ মিঃ+(৫×'১ মিঃ মিঃ)

=৭৭২+'৫ মিঃ মিঃ

=৭৭২'৫ মিঃ মিঃ বা ৭৭'২৫ সেঃ মিঃ।

(খ) **মিলিবার স্কেল** (Millibar scale)—আজকাল বায়ুর চাপ স্থির করিবার জন্য মিলিবার (mb.) মাত্রা অধিক ব্যবহৃত হয়। ইহার মাত্রা (Unit) হইল ডাইন (Dyne)। ইহা দ্বারা একটি শক্তি বুঝায়। প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার স্থানের উপর ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) ডাইনের চাপের পরিমাণকে বলা হয় এক বার (Bar) ইহাকে আবার ১০০০ ভাগ করিয়া এক এক ভাগকে বলা হয় **মিলিবার** (Millibar ; সংক্ষেপে mb.)

ইঞ্চি ও বারের (Bar) সহিত মিলিবারের (mb) সম্পর্ক নিম্নরূপ :—
১" পারদের চাপ = প্রায় ৪৩ মিলিবার। আর ১.০১৩ বার (Bar) = ১০.১৩ ডেসিবার (decibar) = ১০১.৩ সেন্টিবার (centibar) = ১০১৩ মিলিবার (mb.)

(গ) **ইঞ্চি স্কেল** (Inch scle)

এক্ষেত্রে সাধারণ স্কেল বা মূল স্কেলে ১" ইঞ্চিকে সমান দশ ভাগ করিয়া '১", '২" ইত্যাদি মাপ দেখান হয়। আর ঐরূপ ৯ ভাগ বা '৯" ইঞ্চিকে সমান দশ ভাগ করিয়া ভানিয়ার স্কেলে দেখানো হয়। অর্থাৎ ভানিয়ার স্কেলের ১০ ভাগ হইল মূল স্কেলের ৯ ভাগের সমান। সুতরাং ভানিয়ার স্কেলের প্রত্যেক ভাগ হইল মূল স্কেলের এক ভাগের $\frac{৯}{১০}$ অংশ। কাজেই মূল স্কেলের প্রত্যেক ভাগ ও ভানিয়ার স্কেলের প্রত্যেক ভাগের মধ্যে পার্থক্য হইল মূল স্কেল ভাগের হিসাবে $১ - \frac{৯}{১০} = \frac{১}{১০}$ = অর্থাৎ মূল বা সাধারণ স্কেলের '১ ('1 of main scale)।

এদিকে মূল স্কেলের প্রত্যেক অংশ হইল এক ইঞ্চির $\frac{১}{১০}$ অংশ বা '১"।

∴ মূল স্কেলের সহিত ভানিয়ার স্কেলের স্থির সম্পর্ক (Vernier constant) হইল মূল স্কেলের ১ ভাগ (অর্থাৎ '১") × উভয় স্কেলের পার্থক্য ('১) = '১" × '১ = '০১"।

মনে করা যাক, কোন এক সময়ে একটি কোর্টিন বারোমিটারের মূল বা সাধারণ স্কেল দেখিয়া লক্ষ্য করা গেল যে পারদ স্তম্ভের উপরিসীমা মূল স্কেলের ২৯'৯" এর সামান্য উপরে উঠিয়াছে। এখন ভানিয়ার স্কেলটির সহিত যুক্ত স্ক্রুর সাহায্যে এই স্কেলের নিম্নসীমাকে নলের মধ্যস্থিত পারদস্তম্ভের উপরদিকের সীমাকে ঠিক স্পর্শ করাইবার পর লক্ষ্য করা গেল যে ভানিয়ার স্কেলের ৩ সংখ্যক দাগে মূল স্কেলের একটি দাগ মিশিয়াছে। কাজেই এখন সঠিক চাপের পরিমাণ স্থির করিবার উদ্দেশ্যে ভানিয়ার স্কেলের ৩ দাগ সংখ্যাকে বা ৩ কে মূল স্কেলের সহিত ভানিয়ার স্কেলের স্থির সম্পর্ক বা Vernier constant (এক্ষেত্রে ০১") দ্বারা গুণ করা হয়। পূর্বে মূল স্কেল অনুযায়ী যে মাপ (২'৯৯") লক্ষ্য করা গিয়াছে তাহার সহিত ভানিয়ার স্কেলের এই দাগ সংখ্যাকে (এক্ষেত্রে ৩) উভয় স্কেলের স্থির সম্পর্ক (Vernier constant) দ্বারা (এক্ষেত্রে '০১" দ্বারা) গুণ করিয়া যে গুণফল পাওয়া যায়, তাহা যোগ করিলেই বায়ুমণ্ডলের সঠিক চাপের পরিমাণ জানা যায়।

কাজেই এক্ষেত্রে পারদের উচ্চতা হইল ২৯'৯" + (৩ × '০১")
= ২৯'৯" + '০৩"
= ২৯ ৯৩"

*যন্ত্রটির এই অংশের পিছন দিকে চীনামাটির একটি পরিষ্কার প্লেট থাকে। সেদিকে তাকাইলে ভানিয়ার স্কেলের নিম্নসীমা নলের মধ্যস্থিত পারদের উপরদিকের সীমা স্পর্শ করিয়াছে কি না তাহা স্পষ্ট দেখা যায়।

এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে উপরে ইঞ্চি মাপের স্কেল (১" কে ১০ সমান ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগ '১") এবং ঐ সঙ্গে যে ভানিয়ার স্কেলের (ভানিয়ার স্কেলের ১০ ভাগ মূল স্কেলের ৯ ভাগের সমান) কথা বলা হইল, তাহা ভিন্ন ইঞ্চি মাপেরই অন্য প্রকার মূল ও ভানিয়ার স্কেল থাকিতে পারে। যথা—

মূল স্কেলের এক ইঞ্চিকে ২০ সমান ভাগ করিয়া অর্থাৎ প্রত্যেক ভাগকে $\frac{১}{২০}$ ইঞ্চি বা '০৫" ধরিয়া এক প্রকার মূল স্কেল থাকে। এরূপ ২৪ ভাগকে ভানিয়ার স্কেলে ২৫ ভাগের সমান করিয়া অন্য প্রকার ভানিয়ার স্কেল তৈয়ারী করা হয়। এক্ষেত্রে মূল স্কেলের এক ক্ষুদ্র ভাগ হইল এক ইঞ্চির ২০ ভাগের ১ ভাগের সমান, অর্থাৎ $\frac{১}{২০}$ = '০৫"। আর মূল স্কেলের এরূপ ২৪ ভাগ হইল ভানিয়ার স্কেলের ২৫ ভাগেরসমান। অর্থাৎ এরূপ ভানিয়ার স্কেলের এক ভাগ হইল মূল স্কেলের $\frac{২৪}{২৫}$ অংশ। অতএব এক্ষেত্রে মূল স্কেলের এক ভাগের সহিত ভানিয়ার স্কেলের এক ভাগের পার্থক্যহইল মূল স্কেলের $১ - \frac{২৪}{২৫} = \frac{২৫-২৪}{২৫} = \frac{১}{২৫}$ = অর্থাৎ মূল বা সাধারণ স্কেলের '০৪ ('04 of main scale).

এক্ষেত্রে মূল স্কেলের সহিত ভানিয়ার স্কেলের স্থির সম্পর্ক (Vernier constant) হইল মূল স্কেলের এক ভাগ (এক্ষেত্রে ০'০৫") × উভয় স্কেলের পার্থক্য (এক্ষেত্রে '০৪)

= '০৫" × '০৪

= '০০২"

এক্ষেত্রে যদি কোন ব্যারোমিটার যন্ত্রে মূল স্কেলের ২৯'৯" দাগের পর ঠিক পূর্বের মত ভানিয়ার স্কেলের ৩ দাগে মূল স্কেলের কোন দাগ মিশিয়া যায় তাহা হইলে এখানে পারদের উপরিসীমা হইবে

২৯'৯" + (৩ × '০০২")

= ২৯'৯" + '০০৬"

= ২৯'৯০৬"

অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার—পারদপূর্ণ ফোর্টিন ব্যারোমিটার বা এই জাতীয় কিউ ব্যারোমিটার অত্যন্ত সূক্ষ্ম (delicate) যন্ত্র, আর ইহাদের দৈর্ঘ্য বেশ বড়। সেজন্য ইহাদিগকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে (fixed) রাখিয়া ইহাদের সাহায্যে তথাকার বায়ুর চাপ স্থির করা হয়। ইহাদিগকে এক স্থান হইতে অন্যত্র বহন করা ও প্রত্যেক স্থানে সঠিকভাবে ব্যবহার করা অসুবিধাজনক। তাই ছোট আকৃতির এবং দেখিতে কতকটা ঘড়ির মত অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার (Aneroid Barometer) যন্ত্র প্রয়োজনমত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নিয়া বায়ুর চাপ স্থির করা হয়। ইহার সাহায্যে চাপের পরিমাণ স্থির করার কাজও সহজ।

এই যন্ত্রটিতে কোন পারদস্তম্ভ বা অন্য কোন তরল পদার্থ থাকে না। ইহা খুব হাল্কা ও বহন করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। তাই যাহারা পর্বতে আরোহণ করেন, বিমানে চলাচল করেন ও স্পুটনিক বা ঐরূপ কোন কৃত্রিম গ্রহের সাহায্যে মহাশূন্যে ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই যন্ত্রটি বিশেষ উপকারী ও একান্ত প্রয়োজনীয়। এই যন্ত্রটির নিরাপত্তার জন্য ইহাকে একটি ঘড়ির মত ধাতব ফ্রেমে রাখা হয়। ধাতুনির্মিত এই গোলাকার কৌটার মধ্যে একটি প্রকোষ্ঠ থাকে। এই কৌটাকে যথাসম্ভব বায়ুশূন্য করিয়া তাহার মধ্যে সামান্য উঁচু ও ফাঁপা একটি ধাতব স্তম্ভ রাখা হয়। আর কৌটার মুখ একটি পাতলা ঢেউ-খেলান স্থিতিস্থাপক ধাতব পাত (thin led of elastic metal) দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কৌটার উপরে একটি স্কেল থাকে। নির্ভরযোগ্য পারদপূর্ণ ফোর্টিন ব্যারোমিটারের সাহায্যে মিলাইয়া এই স্কেলে চাপের পরিমাণ স্থির করা থাকে।

কৌটার মুখের ঢেউ-খেলান পাতের উপর বায়ুর যে পরিমাণ চাপ পড়ে তাহা এই পাতকে চাপের অনুপাতে নমিত করে। এই চাপ আবার কৌটার মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম ও তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন (sensitive) যন্ত্রের Lever-এর উপর পড়ে। তখন ইহাদের সংলগ্ন নির্দেশক (Pointer) এই ব্যারোমিটারের উপরে গোলাকার স্কেলের উপর ঘুরিয়া চাপের পরিমাণ নির্দেশ করে। এরূপ ব্যারোমিটার একই স্থানে ব্যবহৃত হইলে সাধারণতঃ স্কেলের উপর নির্দিষ্ট অবস্থাতে "Stormy", "rain", "fair", "very dry" ইত্যাদি লেখা থাকে। কাজেই এই যন্ত্রের নির্দেশক দেখামাত্র তখনকার ঐ সময়ের আবহাওয়ার অবস্থা জানা যায়।

অল্টিমিটার (Alti-metre)—কোন কোন ব্যারোমিটার যন্ত্রে এমন ব্যবস্থা আছে যে, তাহা সঙ্গে লইয়া যে-কোন স্থানে পৌছাইলেই সমুদ্রতল হইতে তথাকার উচ্চতা কত, তাহা জানা যায়। এরূপ ব্যারোমিটারকে অল্টিমিটার বলে।

সাইফন (Siphon) **ব্যারোমিটার**—ইহাও কাচের নলের সাহায্যে তৈরী এক প্রকার চাপমান যন্ত্র। এই যন্ত্রেও পারদ ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্রটি একটি কাঠের গায়ে খাড়া বা লম্বভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। তাহার পাশে থাকে একটি স্কেল এবং একটি থার্মোমিটার। এই স্কেল দেখিয়া চাপের পরিমাণ, আর থার্মোমিটারের সাহায্যে উষ্ণতার পরিমাণ জানা যায়। যন্ত্রটির আকৃতি ইংরেজী U-এর মত; এক দিকের বাহু লম্বা, অন্য দিকের বাহু ছোট। দুই দিকের বাহুরই উপর অংশ বন্ধ। ছোট বাহুটির উপর অংশে একটি ছিদ্র আছে। দুই বাহু নীচে যেখানে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত, সেই অংশ অত্যন্ত সরু। ফলে, যন্ত্রটি কোন কারণে কাৎ হইলে বা হেলিয়া পড়িলেও ছোট বাহুর উপর

অংশের ছিদ্রের মধ্য দিয়া বায়ু প্রবেশ করিয়া বড় বাহুতে যাইতে পারে না। কাজেই কাৎ অবস্থায়ও এই যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর চাপের পরিমাণ স্থির করা যায়। এই যন্ত্রটি বেশ হাল্কা। কাজেই ইহার মধ্যে পারদ ব্যবহৃত হইলেও ইহাকে এক স্থান হইতে অন্যত্র নেওয়া যায়।

ব্যারোগ্রাফ (Barograph) **বা বায়ু-চাপলেখ বা বায়ু-প্রেষলেখ যন্ত্র—** ব্যারোগ্রাফ যন্ত্রে একটি ঘূর্ণায়মান চোঙের গায়ে একটি কলম এরূপভাবে লাগান থাকে যেন বায়ুর চাপ হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চোঙের উপরিস্থিত ছক কাগজে (Graph paper) উঁচু-নীচু দাগ পড়ে। এই যন্ত্রের সাহায্যে যে-কোন স্থানে যে-কোন সময়ে বায়ুর চাপের পরিমাণ ও তাহার পরিবর্তন স্থির করা যায়।

বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আর্দ্রতা-মাপক যন্ত্র

বায়ুর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রায় ৭৯% যবক্ষারজান (Nitrogen) ও প্রায় ২১% অম্লজান (Oxygen)। আর বাকী সমুদয় উপাদানের পরিমাণ হইল ১%-এর কম। কাজেই বায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্প বা আর্দ্রতার পরিমাণ নিতান্তই তুচ্ছ। অথচ পৃথিবীর যে-কোন স্থানের আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর এবং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন উদ্ভিদ, জীবজন্তু প্রভৃতির জন্ম, ইহাদের খাদ্য, আকৃতি, আয়তন-ইত্যাদির সহিত জলীয় বাষ্পের সম্পর্ক খুব বেশী। বায়ুর মধ্যে কখন কি পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে তাহা **শুষ্ক- ও আর্দ্রকুণ্ড থার্মোমিটার** (Dry- and Wet-bulb thermometer) বা **হাইগ্রোমিটার** (Hygrometer) যন্ত্রের সাহায্যে (বায়ুর উষ্ণতার পার্থক্য অনুযায়ী) স্থির করা হয়।

শুষ্ক- ও আর্দ্রকুণ্ড থার্মোমিটার যন্ত্রে পাশাপাশি দুইটি থার্মোমিটার আছে। তন্মধ্যে একটি সাধারণ থার্মোমিটার। ইহার সাহায্যে বায়ুর উষ্ণতার পরিমাণ জানা যায়। অপর থার্মোমিটারের কুণ্ডটি (Bulb) মসলিন বা অন্য কোন মিহি সূতার কাপড়ের ন্যাকড়া দ্বারা জড়াইয়া রাখা হয়। এই ন্যাকড়ার বাকী অংশ নীচে কুণ্ড হইতে সামান্য দূরে জলের পাত্রের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা হয়। তাহার ফলে ন্যাকড়াটি সর্বদা ভিজা থাকে। এরূপ ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ। বায়ুতে **জলীয় বাষ্প** যত **কম** থাকে, ভিজা ন্যাকড়া তত তাড়াতাড়ি শুকায়; অর্থাৎ জলীয় পদার্থের তত বেশী বাষ্পীভবন হয় এবং এই কুণ্ড তত তাড়াতাড়ি শীতল হয়। ইহার ফলে ন্যাকড়াজড়ান থার্মোমিটারের **উষ্ণতার** মাত্রা তত কমিয়া যায়। আর বায়ুতে **জলীয় বাষ্প** যত **বেশী** থাকে, এই ন্যাকড়া তত বেশী দেরীতে শুকায়; অর্থাৎ জলের বাষ্পীভবন তত কম হয় এবং ন্যাকড়াজড়ান কুণ্ড তত কম শীতল হয়। অর্থাৎ এই থার্মোমিটারে **উষ্ণতার** মাত্রা তত **অধিক** থাকে।

জলের পাত্রটি কুণ্ডের ঠিক নীচে রাখা উচিত নহে। এভাবে রাখিলে এই পাত্র হইতে উত্থিত জলীয় বাষ্পের খানিকটা প্রভাব এই কুণ্ডের গায়ে লাগে। তাহাছাড়া পাত্রের জলের উপরিভাগ হইতে কুণ্ডটি পর্যন্ত ন্যাক্‌ড়া বা মসলিন বা পলিতা সামান্য লম্বা হইলে যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা নির্ণয়ের পক্ষে ভাল। তবে ন্যাক্‌ড়া বা মসলিনের দোষে বা অন্য কোন কারণে ইহা অতিরিক্ত ভিজা থাকিলে অথবা জলের পাত্রটি বেশী দূরে থাকার ফলে বা অন্য কোন কারণে মসলিন বা ন্যাক্‌ড়া ঠিকমত না ভিজিলে এই যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর আর্দ্রতা ঠিকমত মাপা যায় না।

শুষ্ক- ও আর্দ্রকুণ্ড থার্মোমিটার অনুযায়ী বায়ুর আর্দ্রতা নির্ণয়ের প্রণালী —যে-কোন সময়ে পাশাপাশি অবস্থিত শুষ্ককুণ্ড ও আর্দ্রকুণ্ড থার্মোমিটার দুইটির উষ্ণতার মাত্রা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে ইহাদের উষ্ণতার পরিমাণ পৃথক্‌। এজন্য প্রথমে ইহাদের উষ্ণতার পার্থক্য স্থির করা হয়। এই **পার্থক্য** মত **কম,** অর্থাৎ দুইটিরই উষ্ণতামাত্রা যত কাছাকাছি, বায়ুর **আর্দ্রতা** (Humidity) তত **বেশী**। বর্ষাকালে অধিক বৃষ্টির সময় বা তাহার ঠিক আগে বা পরে এরূপ পার্থক্য থাকে সামান্য বা নামমাত্র। অপরদিকে এদেশে প্রায় সমগ্র শীতকালে ও গ্রীষ্মকালের প্রথমভাগে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের অভাব বশতঃ ইহাদের উষ্ণতামাত্রার মধ্যে পার্থক্য থাকে খুব বেশী।

শুষ্ক ও আর্দ্রকুণ্ড থার্মোমিটার

শুষ্ক- ও আর্দ্রকুণ্ড থার্মোমিটারের উষ্ণতার পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া পর পৃষ্ঠায় তালিকার সাহায্যে উক্ত সময়ের বায়ুর আর্দ্রতার পরিমাণ নিম্নলিখিত উপায়ে স্থির করা হয়।

মনে করা যাক, কোন এক স্থানে যখন শুষ্ক-কুণ্ড বা সাধারণ থার্মোমিটারের উষ্ণতা-মাত্রা ৭০° ফা, তখন তথায় আর্দ্রকুণ্ড থার্মোমিটারের উষ্ণতামাত্রা ৬০° ফা। কাজেই তখন তথায় উভয় থার্মোমিটারের উষ্ণতার পার্থক্য ১০° ফা। পরপৃষ্ঠার তালিকা অনুসারে তখন ঐ স্থানের বায়ুর আর্দ্রতার পরিমাণ প্রায় ৫৩%। অন্য এক ক্ষেত্রে দেখা গেল শুষ্ক-কুণ্ড থার্মোমিটার অনুযায়ী উষ্ণতা ৭০° ফা এবং আর্দ্র কুণ্ড থার্মোমিটারের
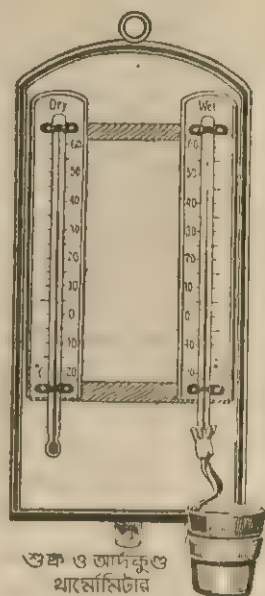
শুষ্ক-কুণ্ড থার্মো-মিটারের উষ্ণতামাত্রা	শুষ্ক- ও আর্দ্রকুণ্ড থার্মোমিটারের উষ্ণতার পার্থক্য (°ফা)														
	৫°	৬°	৭°	৮°	৯°	১০°	১১°	১২°	১৩°	১৪°	১৫°	১৬°	১৭°	২০°	২৫°
°ফা	বায়ুতে আর্দ্রতার পরিমাণ (শতকরা বা % হিসাবে)														
৫০°	৬৫	৫৮	৫১	৪৫	৩৮	৩২	২৬	২০	১৪	৮	২				
৫১	৬৫	৫৯	৫২	৪৬	৪০	৩৪	২৮	২২	১৬	১০	৪				
৫২	৬৬	৬০	৫৩	৪৭	৪১	৩৫	২৯	২৩	১৭	১২	৬	১			
৫৩	৬৭	৬০	৫৪	৪৮	৪২	৩৬	৩১	২৫	১৯	১৪	৮	৩			
৫৪	৬৭	৬১	৫৫	৪৯	৪৩	৩৮	৩২	২৬	২১	১৫	১০	৫			
৫৫	৬৮	৬২	৫৬	৫০	৪৪	৩৯	৩৩	২৮	২২	১৭	১২	৭	১		
৫৬	৬৯	৬৩	৫৭	৫১	৪৫	৪০	৩৫	২৯	২৪	১৯	১৩	৮	৩		
৫৭	৬৯	৬৩	৫৮	৫২	৪৬	৪১	৩৬	৩১	২৫	২০	১৫	১০	৫		
৫৮	৭০	৬৪	৫৮	৫৩	৪৭	৪২	৩৭	৩২	২৭	২২	১৭	১২	৭		
৫৯	৭০	৬৫	৫৯	৫৪	৪৮	৪৩	৩৮	৩৩	২৮	২৩	১৮	১৪	৯		
৬০	৭১	৬৫	৬০	৫৫	৪৯	৪৪	৩৯	৩৪	২৯	২৪	২০	১৫	১১		
৬১	৭১	৬৬	৬১	৫৫	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	২৬	২১	১৭	১২		
৬২	৭১	৬৬	৬১	৫৬	৫১	৪৬	৪১	৩৬	৩২	২৭	২২	১৮	১৪		
৬৩	৭২	৬৭	৬২	৫৭	৫২	৪৭	৪২	৩৭	৩৩	২৮	২৩	১৯	১৫		
৬৪	৭৩	৬৮	৬২	৫৮	৫৩	৪৮	৪৩	৩৮	৩৪	২৯	২৫	২১	১৭		
৬৫	৭৩	৬৮	৬৩	৫৮	৫৩	৪৯	৪৪	৪০	৩৫	৩১	২৬	২২	১৮		
৬৬	৭৩	৬৯	৬৪	৫৯	৫৪	৪৯	৪৫	৪১	৩৬	৩২	২৮	২৩	১৯		
৬৭	৭৪	৬৯	৬৪	৬০	৫৫	৫০	৪৬	৪১	৩৭	৩৩	২৯	২৫	২১		
৬৮	৭৪	৭০	৬৫	৬০	৫৬	৫১	৪৭	৪২	৩৮	৩৪	৩০	২৬	২২		
৬৯	৭৪	৭০	৬৫	৬১	৫৬	৫২	৪৭	৪৩	৩৯	৩৫	৩১	২৭	২৩		
৭০	৭৫	৭০	৬৬	৬১	৫৭	৫৩	৪৮	৪৪	৪০	৩৬	৩২	২৮	২৪		
৭১	৭৫	৭১	৬৬	৬২	৫৮	৫৩	৪৯	৪৫	৪১	৩৭	৩৩	২৯	২৬		
৭২	৭৬	৭১	৬৭	৬২	৫৮	৫৪	৫০	৪৬	৪২	৩৮	৩৪	৩০	২৬		
৭৩	৭৬	৭২	৬৭	৬৩	৫৯	৫৫	৫১	৪৭	৪৩	৩৯	৩৪	৩১	২৭		
৭৪	৭৭	৭২	৬৮	৬৩	৫৯	৫৫	৫১	৪৭	৪৩	৪০	৩৬	৩২	২৮		
৭৫	৭৭	৭২	৬৮	৬৪	৬০	৫৬	৫২	৪৮	৪৪	৪০	৩৭	৩৩	৩০		
৭৬	৭৭	৭৩	৬৯	৬৪	৬০	৫৭	৫৩	৪৮	৪৫	৪১	৩৮	৩৪	৩১		
৭৭	৭৭	৭৩	৬৯	৬৫	৬১	৫৭	৫৩	৪৯	৪৬	৪২	৩৯	৩৫	৩২		
৭৮	৭৮	৭৩	৬৯	৬৫	৬১	৫৮	৫৪	৫০	৪৬	৪৩	৩৯	৩৬	৩৩		
৭৯	৭৮	৭৪	৭০	৬৬	৬২	৫৮	৫৪	৫১	৪৭	৪৩	৪০	৩৭	৩৩		
৮০	৭৮	৭৪	৭০	৬৬	৬৩	৫৯	৫৫	৫১	৪৮	৪৪	৪১	৩৮	৩৪	২৫	১০

°কা	৫°	৬°	৭°	৮°	৯°	১০°	১১°	১২°	১৩°	১৪°	১৫°	১৬°	১৭°	২০°	২৫°
৮১°	৭৮	৭৪	৭০	৬৭	৬৩	৫৯	৫৫	৫২	৪৮	৪৫	৪১	৩৮	৩৫	২৬	১১
৮২	৭৯	৭৫	৭১	৬৭	৬৩	৬০	৫৬	৫৩	৪৯	৪৬	৪২	৩৯	৩৬	২৭	১২
৮৩	৭৯	৭৫	৭১	৬৭	৬৪	৬০	৫৬	৫৩	৫০	৪৬	৪৩	৪০	৩৭	২৭	১৩
৮৪	৭৯	৭৫	৭১	৬৮	৬৪	৬০	৫৭	৫৩	৫০	৪৭	৪৪	৪০	৩৭	২৮	১৫
৮৫	৭৯	৭৫	৭২	৬৮	৬৫	৬১	৫৮	৫৪	৫১	৪৭	৪৪	৪১	৩৮	২৯	১৬
৮৬	৮০	৭৬	৭২	৬৮	৬৫	৬১	৫৮	৫৫	৫১	৪৮	৪৫	৪২	৩৯	৩০	১৭
৮৭	৮০	৭৬	৭২	৬৯	৬৫	৬২	৫৮	৫৫	৫২	৪৯	৪৬	৪২	৪০	৩১	১৮
৮৮	৮০	৭৬	৭৩	৬৯	৬৫	৬২	৫৯	৫৫	৫২	৪৯	৪৬	৪৩	৪০	৩২	১৮
৮৯	৮০	৭৭	৭৩	৬৯	৬৬	৬৩	৫৯	৫৬	৫৩	৫০	৪৭	৪৪	৪১	৩২	১৯
৯০	৮১	৭৭	৭৪	৭০	৬৭	৬৩	৬০	৫৭	৫৪	৫০	৪৭	৪৪	৪১	৩৩	২০
৯১	৮১	৭৭	৭৪	৭০	৬৭	৬৩	৬০	৫৭	৫৪	৫১	৪৮	৪৫	৪২	৩৪	২১
৯২	৮১	৭৭	৭৪	৭০	৬৭	৬৪	৬০	৫৭	৫৪	৫১	৪৮	৪৫	৪৩	৩৪	২২
৯৩	৮১	৭৮	৭৪	৭১	৬৮	৬৪	৬১	৫৮	৫৫	৫২	৪৯	৪৬	৪৩	৩৫	২৩
৯৪	৮১	৭৮	৭৪	৭১	৬৮	৬৫	৬১	৫৮	৫৫	৫২	৪৯	৪৭	৪৪	৩৬	২৪
৯৫	৮২	৭৮	৭৫	৭১	৬৮	৬৫	৬২	৫৯	৫৬	৫৩	৫০	৪৭	৪৪	৩৬	২৪
৯৬	৮২	৭৮	৭৫	৭২	৬৯	৬৫	৬২	৫৯	৫৬	৫৩	৫০	৪৮	৪৫	৩৬	২৫
৯৭	৮২	৭৮	৭৫	৭২	৬৯	৬৫	৬২	৫৯	৫৬	৫৪	৫১	৪৮	৪৫	৩৭	২৬
৯৮	৮২	৭৯	৭৫	৭২	৬৯	৬৬	৬৩	৬০	৫৭	৫৪	৫১	৪৯	৪৬	৩৮	২৬
৯৯	৮২	৭৯	৭৫	৭২	৬৯	৬৬	৬৩	৬০	৫৭	৫৪	৫২	৪৯	৪৬	৩৮	২৭
১০০	৮২	৭৯	৭৬	৭২	৬৯	৬৬	৬৩	৬০	৫৮	৫৫	৫২	৪৯	৪৭	৩৯	২৮
১০১	৮৩	৭৯	৭৬	৭৩	৭০	৬৭	৬৪	৬১	৫৮	৫৫	৫৩	৫০	৪৭	৩৯	২৯
১০২	৮৩	৭৯	৭৬	৭৩	৭০	৬৭	৬৪	৬১	৫৮	৫৬	৫৩	৫০	৪৮	৪০	২৯
১০৩	৮৩	৭৯	৭৬	৭৩	৭০	৬৭	৬৪	৬২	৫৯	৫৬	৫৩	৫১	৪৮	৪০	৩০
১০৪	৮৩	৮০	৭৭	৭৪	৭১	৬৮	৬৫	৬২	৫৯	৫৭	৫৪	৫১	৪৯	৪১	৩০
১০৫	৮৩	৮০	৭৭	৭৪	৭১	৬৮	৬৫	৬২	৫৯	৫৭	৫৪	৫২	৪৯	৪১	৩১
১০৬	৮৩	৮০	৭৭	৭৪	৭১	৬৮	৬৫	৬৩	৬০	৫৭	৫৫	৫২	৫০	৪২	৩১
১০৭	৮৩	৮০	৭৭	৭৪	৭১	৬৮	৬৬	৬৩	৬০	৫৭	৫৫	৫২	৫০	৪২	৩২
১০৮	৮৩	৮০	৭৭	৭৪	৭২	৬৯	৬৬	৬৩	৬১	৫৮	৫৫	৫৩	৫০	৪৩	৩৩
১০৯	৮৪	৮১	৭৮	৭৫	৭২	৬৯	৬৬	৬৩	৬১	৫৮	৫৬	৫৩	৫১	৪৩	৩৩
১১০	৮৪	৮১	৭৮	৭৫	৭২	৬৯	৬৬	৬৪	৬১	৫৯	৫৬	৫৪	৫১	৪৪	৩৪
১১১	৮৪	৮১	৭৮	৭৫	৭২	৬৯	৬৭	৬৪	৬১	৫৯	৫৬	৫৪	৫১	৪৪	৩৪
১১২	৮৪	৮১	৭৮	৭৫	৭২	৭০	৬৭	৬৪	৬২	৫৯	৫৭	৫৪	৫২	৪৫	৩৫
১১৩	৮৪	৮১	৭৮	৭৫	৭৩	৭০	৬৭	৬৫	৬২	৬০	৫৭	৫৫	৫২	৪৫	৩৫
১১৪	৮৪	৮১	৭৮	৭৫	৭৩	৭০	৬৭	৬৫	৬২	৬০	৫৭	৫৫	৫৩	৪৬	৩৬
১১৫	৮৪	৮১	৭৯	৭৬	৭৩	৭০	৬৮	৬৫	৬৩	৬০	৫৮	৫৫	৫৩	৪৬	৩৬

°শা	৩০°	৩৫°	৪০°	৪৫°
৮১°				
৮২				
৮৩	১			
৮৪	২			
৮৫	৩			
৮৬	৪			
৮৭	৫			
৮৮	৬			
৮৯	৭			
৯০	৯			
৯১	১০			
৯২	১১			
৯৩	১১	১		
৯৪	১২	২		
৯৫	১৩	৩		
৯৬	১৪	৪		
৯৭	১৫	৫		
৯৮	১৬	৬		
৯৯	১৭	০		
১০০	১৭	৮		
১০১	১৮	৯		
১০২	১৯	১০	১	
১০৩	২০	১০	২	
১০৪	২০	১১	৩	
১০৫	২১	১২	৪	
১০৬	২২	১৩	৫	
১০৭	২২	১৩	৬	
১০৮	২৩	১৪	৬	
১০৯	২৩	১৫	৭	
১১০	২৪	১৫	৮	১
১১১	২৫	১৬	৮	২
১১২	২৫	১৭	৯	২
১১৩	২৬	১৭	১০	৩
১১৪	২৬	১৮	১১	৪
১১৫	২৭	১৯	১১	৫

উষ্ণতা ৬৫° ফা। এখানে উভয় থার্মোমিটারের উষ্ণতার পার্থক্য মাত্র ৫° ফা। তাই তালিকা অনুযায়ী এক্ষেত্রে বায়ুর আর্দ্রতার পরিমাণ প্রায় ৭৫%। তৃতীয় এক ক্ষেত্রে দেখা গেল, শুষ্ককুণ্ড থার্মোমিটারের উষ্ণতা ৭০° ফা, আর্দ্রকুণ্ড থার্মোমিটারের উষ্ণতা ৫৫° ফা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে উভয় থার্মোমিটারের উষ্ণতার পার্থক্য ১৫° ফা। ফলে, এক্ষেত্রে আর্দ্রতার পরিমাণ প্রায় ৩২%।

একই সময়ে বিভিন্ন স্থানের বা একই স্থানের বিভিন্ন সময়ে দুইটি (শুষ্ক ও আর্দ্রকুণ্ড) থার্মোমিটারের উষ্ণতার পার্থক্য সমান হইলেও এরূপ সকল ক্ষেত্রে আর্দ্রতার পরিমাণ সমান থাকে না। বরং উষ্ণতার পার্থক্য সমান সত্ত্বেও শুষ্ককুণ্ড বা সাধারণ থার্মোমিটারের **উষ্ণতার পরিমাণ** যত অধিক, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের বা **আর্দ্রতার পরিমাণ তত বেশী**। অবশ্য, ঠিক গণিতের অনুপাতে (proportionately) ইহা বাড়ে না। যেমন—

সাধারণ বা শুষ্ককুণ্ড থার্মোমিটারের উষ্ণতামাত্রা	শুষ্ক- ও আর্দ্রকুণ্ড থার্মোমিটারের উষ্ণতার পার্থক্য			বায়ুতে আর্দ্রতার পরিমাণ		
	(ক)	(খ)	(গ)	(ক)	(খ)	(গ)
	৫°ফা	১০°ফা	১৫°ফা			
৫৫°ফা	"	"	"	৬৮%	৩৯%	১২%
৭০°ফা	"	"	"	৭৫%	৫৩%	৩২%
৮৫°ফা	"	"	"	৭৯%	৬১%	৪৪%
১০০°ফা	"	"	"	৮২%	৬৬%	৫২%
১১৫°ফা	"	"	"	৮৪%	৭০%	৫৮%

বৃষ্টিমাপক যন্ত্র ও তাহার সাহায্যে বৃষ্টির পরিমাণ মাপিবার প্রণালী

কোন স্থানে যে কোন সময়ে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় সাধারণতঃ তাহার প্রায় [illegible] অংশ বাষ্পে পরিণত হয়, প্রায় [illegible] অংশ মাটির মধ্যে নীচে চুঁয়াইয়া যায় এবং প্রায় অনেক অংশ ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া ভূমির ঢাল অনুযায়ী নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়। এই বৃষ্টির জলের কোন অংশ এরূপ কোন প্রকারে কিছুমাত্র পরিবর্তিত, পরিচালিত বা নষ্ট না হইয়া সম্পূর্ণরূপে সেখানেই জমিয়া থাকিলে অর্থাৎ কোন উপায়ে ইহার কিছুমাত্র অংশ কমিয়া বা সরিয়া না গেলে, অথবা অন্য কোথাও হইতে জল আসিয়া ইহার পরিমাণ কিছুমাত্র বৃদ্ধি না হইলে, এই জলের গভীরতা মাপিয়াই তথায় বিভিন্ন সময়ের বৃষ্টির পরিমাণ স্থির করা সম্ভবপর। মনে করা যাক, কোন স্থানে নির্দিষ্ট ৮ ঘণ্টা সময়ে

যে পরিমাণ বৃষ্টি হইয়াছে, ঠিক তাহা দ্বারা ঐ স্থানের ঐ সময়ের বৃষ্টির জলের গভীরতা হইল ১" বা এক ইঞ্চি ; অর্থাৎ ঐ স্থানে উক্ত ৮ ঘণ্টার বৃষ্টির পরিমাণ এক ইঞ্চি।
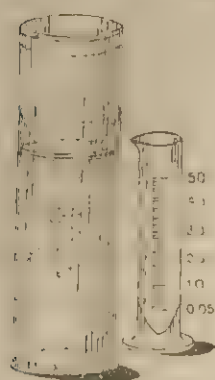
যে-কোন স্থানের যে-কোন সময়ের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্থির করিবার উদ্দেশ্যে **বৃষ্টিমাপক যন্ত্র** (Rain gauge) ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ ৮" ব্যাসযুক্ত ২০" লম্বা চোঙ্গ (Cylinder) তৈরী করিয়া তাহার মুখে বা একটু নীচে ৮" ব্যাসযুক্ত একটি ফাঁদল (Funnel) এভাবে বসান থাকে যেন চোঙ্গের মুখে যেটুকু বৃষ্টির জল পতিত হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে ফাঁদলের মধ্য দিয়া চোঙ্গের ভিতরে গিয়া জমিতে পারে। এই যন্ত্রকে সাধারণতঃ কোন **উন্মুক্ত স্থানে** ভূমি হইতে এক ফুট *. **উঁচুতে** এভাবে স্থাপন করা হয় যেন কেবলমাত্র বৃষ্টির জল ভিন্ন অন্য কোন জল তাহার মধ্যে যাইতে না পারে। আরও লক্ষ্য করা হয়, এই যন্ত্রের ভিতরের জল যেন কোন উপায়ে চুয়াইয়া বাহিরে আসিতে না পারে বা সহজে বাষ্পে পরিণত হইতে না পারে। ফাঁদলের মধ্যে যে জল পড়ে তাহার কতক অংশ যাহাতে ছিট্‌কাইয়া বাহিরে যাইতে না পারে এই উদ্দেশ্যে ফাঁদলের বাহির দিক্ ২-৩ ইঞ্চি খাড়া (vertical) থাকে। নির্দিষ্ট সময়ের (৮ ঘণ্টা, ২৪ ঘণ্টা ইত্যাদি) পরে ঐ চোঙ্গের ভিতর কি পরিমাণ বৃষ্টির জল সঞ্চিত হয় তাহা স্থির করিবার জন্য ঐ নির্দিষ্ট সময় পর পর চোঙ্গের ভিতর সঞ্চিত জল চোঙ্গের গায়ের দাগ অনুসারে মাপিয়া, ঐ স্থানে ঐ সময়ের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্থির করা হয়। কখনও বা নির্দিষ্ট দাগযুক্ত কাচের গ্লাসের মত পাত্রে (Measuring glass) ঐ সময়ের বৃষ্টির জল ঢালিয়া বৃষ্টির পরিমাণ স্থির করা হয়।

চোঙ্গের মুখের ফাঁদলের বা ফানেলের ব্যাস ৮" হইলে, ফাঁদলের মুখের আয়তন হয় প্রায় ৫০ বর্গ ইঞ্চি। [সাধারণতঃ πr^2-এই সূত্র অনুসারে কোন বৃত্তাকার স্থানের আয়তন (area) নির্ণয় করা হয়। $\pi = \frac{২২}{৭}$ এবং ৮" ব্যাসযুক্ত ফাঁদলের r (ব্যাসার্ধ) = ৪"। কাজেই ফাঁদলের মুখের আয়তন হইল $\frac{২২}{৭} \times ৪^২ = \frac{২২}{৭} \times ১৬ = \frac{৩৫২}{৭} = ৫০\cdot৩$ বর্গ ইঞ্চি।] ৫০ বর্গ ইঞ্চি আয়তন বিশিষ্ট স্থানে কোন সময়ে ১ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টি

* কিন্তু ঐ যন্ত্রকে ভূমি হইতে ৩-৪ ফুট উঁচুতে রাখিলে বৃষ্টির সময় একটু জোরে বায়ু প্রবাহিত হইলে বৃষ্টির কিছু অংশ সোজাসুজি ফাঁদলের মধ্যে না পড়িয়া বাহিরে গিয়া পড়ে। আর যন্ত্রটি ঠিক মাটিতে বা ছাদের উপর রাখিলেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ণয় সম্পর্কে অসুবিধা হয়। কারণ, কিছু বৃষ্টির জল চোঙ্গের পাশে মাটিতে বা ছাদে পড়িবার পর তাহার কতক ছিটকান অংশ আসিয়া চোঙ্গের মধ্যে পড়িতে পারে।

হইলে এই বৃষ্টির প্রকৃত পরিমাণ হয় ৫০×১=৫০ ঘন ইঞ্চি। যেহেতু এই বৃষ্টির জলের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে ফাঁদলের মধ্য দিয়া চোঙ্গের ভিতর যাওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, সেজন্য চোঙ্গের মধ্যে ৫০ ঘন ইঞ্চি (cubic inches) জল সঞ্চিত হইলেই বুঝা যায় যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই চোঙ্গের মুখে বা এই স্থানে এক ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে।

আর যদি ফানেলের ব্যাস হয় ৫″, তাহা হইলে ইহার মুখের আয়তন হয় প্রায় ১৯·৬ বর্গ ইঞ্চি [$\frac{২২}{৭} \times \frac{৫}{২} \times \frac{৫}{২} = \frac{৫৫০}{২৮} = ১৯·৬$]। এরূপ ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই চোঙ্গের মধ্যে ১৯·৬ ঘন ইঞ্চি জল সঞ্চিত হইলে বুঝা যায় যে তথায় ঐ সময়ে এক ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে। আর যদি তখন ঐ ৫″ ব্যাসযুক্ত চোঙ্গের মধ্যে সঞ্চিত জল মাপিয়া দেখা যায় যে তাহার পরিমাণ ৫০ ঘন ইঞ্চি, তবে বুঝা যায় যে ঐ নির্দিষ্ট সময়ে তথায় (৫০ ÷ ১৯·৬) প্রায় ২$\frac{১}{২}$ বৃষ্টি হইয়াছে।

যাহাতে উপযুক্ত মাপের পাত্রের (Measuring glass) সাহায্যে চোঙ্গের মধ্যে সঞ্চিত জল মাপিয়া বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ঠিকমত জানা যায়, এই উদ্দেশ্যে এ সকল কাঁচের পাত্রের বা গ্লাসের গায়ে দাগ কাটা থাকে। স্বভাবতঃ গ্লাসগুলির ব্যাস চোঙ্গের তুলায় অনেক কম বা সরু। তাই এই গ্লাসের মধ্যে জল ১″ ইঞ্চির অনেক বেশী উঁচু হইলেও তাহার পরিমাণ ৮″ ব্যাসযুক্ত ফানেলের মধ্যে ১″ জলের সমান হয় না। বস্তুতঃ এরূপ গ্লাসের সাহায্যে একবারে মাত্র এই জাতীয় ফানেলের হিসাবে $\frac{১}{২}$″ পরিমাণ জল মাপিবার ব্যবস্থা আছে। আর ঐ মাপ যাহাতে ঠিক হয় সেজন্য $\frac{১}{২}$″ জলকে ৫০ সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া মাপিবার অর্থাৎ ·০১″ পরিমাণ জল ঠিকভাবে মাপিবার ব্যবস্থা আছে। তাই এরূপ গ্লাসের এক একটি বিভাগ ·০১″।

অনুশীলনী

১। সাধারণ থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহৃত হয় কেন? লঘিষ্ঠ থার্মোমিটারে এল্‌কহল ব্যবহারের কারণ কি? ২। ফারেনহিট ও সেলসিউস থার্মোমিটারের কোন্‌টির হিমাঙ্ক কত ডিগ্রি, আর স্ফুটনাঙ্কই বা কত ডিগ্রি? ৮০° ফা=কত ডিগ্রি সে? ৩। শুষ্ক- ও আর্দ্রকুণ্ড থার্মোমিটারের সাহায্যে কিভাবে বায়ুর আর্দ্রতা স্থির করা হয়? শুষ্ককুণ্ড থার্মোমিটারের উষ্ণতা ৮০ ফা, আর আর্দ্রকুণ্ড থার্মোমিটারের উষ্ণতা ৬৫° ফা, ৭০° ফা ও ৭৫ ফা। কোন্ সময়ে আর্দ্রতার পরিমাণ কত? ৪। ব্যারোমিটারের সাহায্যে বায়ুর চাপ কিভাবে নির্ণয় করা হয়? এরূপ মাপ নেওয়ার জন্য ভার্নিয়ার স্কেলের প্রয়োজন কি? ৫। বৃষ্টিমাপক যন্ত্র কোথায় স্থাপন করিবে? এই যন্ত্রের সাহায্যে কিভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্থির করা হয়? এই যন্ত্রকে ব্যারোমিটার ও থার্মোমিটারের মত ঘরের মধ্যে রাখিলে কি অসুবিধা হয়?

চতুর্থ অধ্যায়

ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা ও জলবায়ুর অবস্থা নির্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে মানচিত্রে রেখাঙ্কন

যে-কোন স্থানের আবহাওয়া ও জলবায়ুর অবস্থা বিভিন্ন সংখ্যা দ্বারা (Figures) বা ঐ সকল সংখ্যার সাহায্যে অঙ্কিত লেখচিত্র (Graph), স্তম্ভ (Column), মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে নির্দেশ করা হয়।

সাধারণতঃ একটিমাত্র স্থানের কয়েক দিনের অবহাওয়ার অবস্থা অথবা কোন মাসের বিভিন্ন দিনের বা বৎসরের বিভিন্ন মাসের (অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের) জলবায়ুর কোন একটি বিষয়ের অবস্থা (যেমন, উষ্ণতা) নির্দেশ করিবার জন্য লেখচিত্র (Graph) আঁকা হয়। আর অপর একটি বিষয়ের (যেমন, বৃষ্টিপাত) অবস্থা বুঝাইবার জন্য স্তম্ভ (Column) আঁকা হয়। আর বহু স্থানের একটি বিষয়ের (কোন দিনের বা মাসের বায়ুর উষ্ণতা, বায়ুর চাপ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি) নির্দেশ করিতে হইলে মানচিত্রের সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

সেরূপ ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা নির্দেশ করিবার জন্যও সাধারণতঃ মানচিত্রের সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে সমোন্নতি বা সমোচ্চ রেখা (Contours) অঙ্কন—ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা নির্দেশ করিবার জন্য যতগুলি সম্ভব স্থানের সমুদ্রতলের গড় অবস্থা হইতে উচ্চতা (Altitude above mean sea level) নির্ণয় করা হয়। তারপর যে অঞ্চলের স্থানসমূহের উচ্চতা নির্দেশ করা হইবে, তথাকার মানচিত্র আঁকা বা সংগ্রহ করা হইবে। ইহার পর ঐ মানচিত্রে এক একটি বিন্দু দ্বারা নির্দিষ্ট স্থানগুলিকে যথাস্থানে (প্রত্যেকটির ভূপৃষ্ঠে নিজ নিজ অবস্থান অনুসারে) নির্দেশ করা হইবে। তারপর প্রত্যেক স্থানের প্রকৃত উষ্ণতাকে মানচিত্রে নির্দিষ্ট বিন্দুর পাশে পাশে লেখা হইবে। এবিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে যে, যে বিন্দু দ্বারা যে স্থান নির্দেশ করা হইবে, সেই স্থানের **প্রকৃত উচ্চতার অঙ্কও** যেন ঠিক সেই বিন্দুর পাশে লেখা হয়।

এভাবে বিন্দুগুলির পাশে পাশে লেখা অঙ্কগুলি দেখিয়া সমোন্নতি বা সমোচ্চরেখা আঁকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সবচেয়ে কম উচ্চতার অঙ্ক ও সবচেয়ে বেশী উচ্চতার অঙ্ক লক্ষ্য করিয়া কত **দূরত্ব** বা **ব্যবধান** অনুসারে (Interval) সমোচ্চরেখা আঁকা হইবে তাহাও স্থির করা হইবে। সাধারণতঃ ছোট জায়গার মানচিত্র হইলে বিভিন্ন

স্থানের উচ্চতার ব্যবধান কম হয় এবং এরূপ ক্ষেত্রে স্বল্প ব্যবধান অনুসারে সমোচ্চরেখা আঁকা হয়। যেমন, আগেকার হিসাবে ২৫′, ৫০′, ১০০′ ব্যবধানে সমোচ্চরেখা আঁকা হইত। এখন ১০ মি, ২০ মি ব্যবধানে সমোচ্চরেখা আঁকা হইতে পারে। আর বহুদূর বিস্তৃত অংশে সাধারণতঃ বিভিন্ন স্থানের উচ্চতার মধ্যে পার্থক্য অধিক। তাই, এরূপ ক্ষেত্রে (কোন মহাদেশ বা সমগ্র পৃথিবী) আগেকার হিসাবে ২৫০′, ৫০০′, ১০০০′ প্রভৃতি দূরত্ব অনুসারে সমোচ্চ রেখা আঁকা হইত। এখন ১০০ মি, ২০০ মি প্রভৃতি ব্যবধানে সমোচ্চরেখা আঁকা হইতে পারে।

পরের পৃষ্ঠার চিত্রটিতে বিভিন্ন বিন্দু দ্বারা কতকগুলি কাল্পনিক স্থানের অবস্থান নির্দেশ করা হইয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেকটির পাশে পাশে অঙ্ক লিখিয়া তাহাদের প্রত্যেকটির প্রকৃত উচ্চতা নির্দেশ করা হইয়াছে।

এখানে বিভিন্ন স্থানের উচ্চতার মধ্যে ৪০০ মি সবচেয়ে কম এবং ৮৬০ মি সবচেয়ে বেশী। সুতরাং এখানে ১০০ মি ব্যবধানে (At intervals of 100 metre) ৪০০, ৫০০, ৬০০, ৭০০ ও ৮০০ মি অনুসারে পাঁচটি সমোচ্চরেখা আঁকা যাইতে পারে। এখানে এতগুলি সমোচ্চরেখা না আঁকিয়া ৬০০ মি ও ৭০০ মি—এই দুইটি সমোচ্চরেখা আঁকিবার পদ্ধতি দেখান হইল।

০০ মি সমোচ্চরেখা আঁকিবার জন্য দেখা যাইতেছে যে চিত্রের উপর দিকে মাত্র দুইটি স্থানের উচ্চতা ৬০০ মি. কাজেই এই অঞ্চলের আর কোন্ কোন্ স্থানের উচ্চতা ৬০০ মি হইতে পারে তাহা স্থির করা আবশ্যক। চিত্রের বাম পাশে দেখা যাইতেছে ৬৩০ মি উচ্চতা নির্দেশক বিন্দুর ডান দিকে ৫৭৫ মি ও ৫১০ মি নির্দেশক দুইটি স্থান আছে। এবার দুইটি রেখার সাহায্যে ইহাদের প্রত্যেকটিকে বাম পাশের ৬৩০ মি নির্দেশক বিন্দুর সহিত যোগ করা হইবে। তাহার পর ৫৭৫ —৬৩০ মি-এর মাঝে যেখানে ৬০০ মি উচ্চতা থাকা সম্ভব তাহা (মোটামুটি দূরত্ব অনুসারে বা proportionately) স্থির করিয়া এই রেখার উপর একটি বিন্দু দেওয়া হইবে। (এই বিন্দু দ্বারা ঐ রেখার উপর স্থান নির্দিষ্ট হইবে তথাকার উচ্চতা আনুমানিক ভাবে ৬০০ মি)। এভাবে ৫১০—৬৩০ মি এর সংযোগকারী রেখার উপরও যে স্থানের উচ্চতা ৬০০ মি হওয়া সম্ভব, তাহা একটি বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হইবে। তারপর বামদিকের ঐ স্থান দুইটির নীচে ৫৬০—৬১০ মি নির্দেশক রেখা আঁকিয়া তাহার উপরও ৬০০ মি উচ্চতা নির্দেশ করিবার জন্য বিন্দু দেওয়া হইবে। তাহার পর আরও নীচে ৫৭৫ মি উচ্চতা নির্দেশক দুইটি বিন্দুর প্রত্যেকটিকে ৬৫০ মি নির্দেশক বিন্দুর সহিত যোগ করা হইবে। এবং ইহাদের প্রত্যেকটির উপর ৬০০ মি নির্দেশক বিন্দু দেওয়া হইল। চিত্রের প্রায়

মাঝখানে ৫৮০—৩২০ মি রেখার উপরও ৬০০ মি নির্দেশ বিন্দু দেওয়া হইবে। আরও উপরে চিত্রের ডানপাশে ৫২০—৬৩০ মি নির্দেশক রেখাতেও ৬০০ মি নির্দেশক বিন্দু দেওয়া হইবে। এবার ৬০০ মি উচ্চতা নির্দেশক এই সমুদয় বিন্দুগুলিকে একটি স্বাভাবিক রেখা আঁকিয়া যোগ করা হইবে। ইহাই ৬০০ মি সমোচ্চরেখা (Contonr)। ফুটরুলের সাহায্যে সরলরেখা আঁকা হইবে না। কারণ, প্রকৃত উচ্চতার পরিবর্তন মোটামুটি স্বাভাবিক ভাবেই হইয়া থাকে। কোন সরলরেখা অনুসারে পরিবর্তন হয় না।
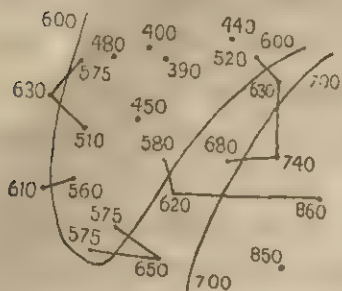
এবার চিত্রের ডান পাশের অংশে মাত্র একটি বিন্দুর উচ্চতা ৭০০ মি লক্ষ্য করা গেল। তাহার নীচে ৬৩০—৭৪০, ৬৮০—৭৬০, ৬২০—৮৬০ প্রভৃতি বিভিন্ন রেখার উপর ৭০০ মি নির্দেশ করিবার জন্য পৃথক পৃথক বিন্দু আগেকার পদ্ধতি অনুসারে দেওয়া হইবে। এবার এই সকল (৭০০ মি উচ্চতা নির্দেশক) বিন্দুকে স্বাভাবিক রেখার সাহায্যে যোগ করা হইবে। ইহা দ্বারা ৭০০ মি সমোচ্চরেখা আঁকা হইবে।

চিত্রের বিভিন্ন অংশের প্রত্যেক বিন্দুর পাশের অঙ্ক লক্ষ্য করিয়া বুঝা যায় যে স্থানটির দক্ষিণপূর্ব অংশ সবচেয়ে বেশী উঁচু, এবং উত্তর দিকে তাহা ক্রমশঃ ঢালু। এখানে সমোচ্চরেখাগুলি আঁকিবার পর এই অবস্থা আরও ভালভাবে বুঝিতে পারা যায়। এখানেই সমোচ্চরেখা আঁকিবার সার্থকতা। তাহাছাড়া প্রত্যেক বিন্দুর ঠিক পাশে পাশে উচ্চতা লেখা কখনও সম্ভবপর নয়। লিখিতে চেষ্টা করিলে মানচিত্র ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধা হয়। সাধারণতঃ কয়েকটি বিশেষ স্থানের [সাধারণতঃ সর্বোচ্চ অংশসমূহের (peak) উচ্চতাই অঙ্ক দ্বারা নির্দেশ করা হয়।]

পর পৃষ্ঠার চিত্রখানাতে উপরের চিত্রের তুলনায় অনেক বেশী জায়গার অবস্থান বিন্দুদ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। আর তাহাদের প্রত্যেকটির পাশে পাশে অঙ্ক লিখিয়া তাহাদের উচ্চতা নির্দেশ করা হইয়াছে।

এই চিত্রে দেখা যাইতেছে যে নীচের (দক্ষিণ) দিকে উচ্চতা সবচেয়ে কম। সর্বনিম্ন উচ্চতা ১৬০ মি। তাহার পাশে দুইটি স্থানের উচ্চতা ২০০ মি। তথা হইতে ক্রমশঃ উপর (উত্তর দিকে) উচ্চতা বাড়িয়া গিয়াছে। বামপাশে সর্বোচ্চ উচ্চতা ৬১০ মি। আর চিত্রের ডানপাশেও উচ্চতা ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে। ডানপাশের (পূর্ব দিকে) মধ্যভাগেই উচ্চতা সবচেয়ে বেশী; সর্বোচ্চ উচ্চতা ৭৩০ মি। এবার এসকল স্থানের

উচ্চতা নির্দেশ করিবার জন্য ১০০ মি ব্যবধানে (100m interval) ২০০, ৩০০, ৪০০, ৫০০, ৬০০ ও ৭০০ মি সমোচ্চরেখা আঁকা হইবে।
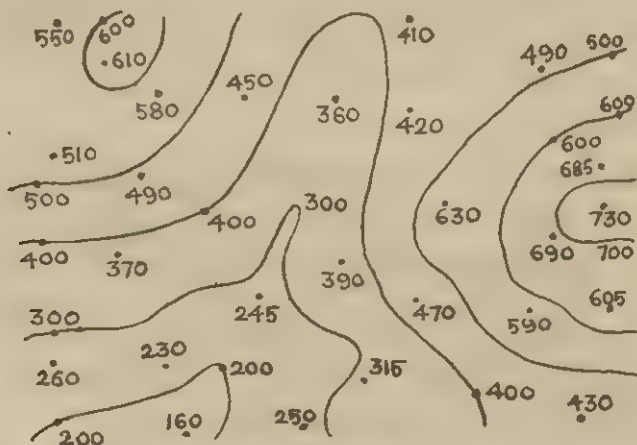
এই উদ্দেশ্যেও আগেকার নিয়ম অনুসারে কাজ হইবে। যেমন, ২০০ মি সমোচ্চ-রেখা আঁকিবার জন্য ২০০ মি নির্দেশক বিন্দু দুইটি লক্ষ্য করিতে হইবে। তারপর ১৬০—২৬০, ১৬০—২৩০, ১৬০—২৪৫, ১৬০—২৫০, এরূপ কয়েকটি সরলরেখা আঁকিতে হইবে। তারপর তাহাদের প্রত্যেকটির উপর পূর্বের নিয়ম অনুসারে ২০০ মি নির্দেশক বিন্দু বসাইতে হইবে। তারপর ঐ বিন্দুগুলিকে স্বাভাবিক ভাবে যোগ করিতে হইবে। এভাবে ২০০ মি সমোচ্চরেখা আঁকা হইবে। (তবে এই চিত্রে বিভিন্ন বিন্দুকে যোগ করার সরলরেখা আঁকিয়া দেখান হইল না।) উপরিলিখিত উপায়ে ৩০০ মি, ৪০০ মি, ৫০০ মি, ৬০০ মি এবং ৭০০ মি সমচ্চোরেখাও আঁকা হইবে।

এবার এই চিত্রে আঁকা বিভিন্ন সমোচ্চরেখা লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে এই অঞ্চলের ভূমির পূর্ব ও পশ্চিম (বিশেষতঃ উত্তরপশ্চিম) অংশে উচ্চতা সবচেয়ে বেশী এবং এই দুই অংশ হইতে তাহা দক্ষিণে ঢালু হইয়া গিয়াছে।

মানচিত্রে সমোষ্ণরেখা (Isotherm) অঙ্কন

কোন একটি দেশের বা মহাদেশের কতকগুলি স্থানের কোন একটি সময়ের **উষ্ণতার অবস্থা** বুঝাইতে হইলে প্রথমে তখনকার রেখাচিত্র বা রেখামানচিত্র (Outline map) আঁকা হয়। তারপর মানচিত্রে এই জায়গাগুলিকে নির্দিষ্ট স্থানে এক একটি বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হয়। ইহার পর বিভিন্ন স্থানের প্রকৃত উষ্ণতার পরিমাপকে সমুদ্রতলে পরিণত (reduced to sea level) করা হয় এবং এই

পরিবর্তিত উষ্ণতার অঙ্ক প্রত্যেক স্থানের পাশে পাশে লেখা হয়। এবার যে সকল স্থানের পরিবর্তিত উষ্ণতার পরিমাণ সমান, তাহাদিগকে এক একটি স্বাভাবিক রেখাদ্বারা যুক্ত করা হয়। স্থানটি ছোট এবং তথাকার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতার মধ্যে ব্যবধান কম হইলে ২° বা ৫° সে অন্তর সমোষ্ণরেখা আঁকা হয়। আর স্থানটি বিস্তীর্ণ এবং তথাকার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতার মধ্যে ব্যবধান অধিক হইলে ১০°,২০° সে অন্তর সমোষ্ণরেখা আঁকা হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের কয়েকটি **প্রধান স্থানের** সমুদ্র-সমতল হইতে উচ্চতা এবং তাহাদের জানুয়ারী মাসের ও জুলাই মাসের বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার পরিমাণ (গড় অঙ্ক) ডিগ্রি সেলসিউস হিসাবে এই পৃষ্ঠা ও পরপৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

স্থানের নাম	উচ্চতা* (মিটার)	উষ্ণতা (°সে) জানুয়ারী	উষ্ণতা (°সে) জুলাই	স্থানের নাম	উচ্চতা* (মিটার)	উষ্ণতা (°সে) জানুয়ারী	উষ্ণতা (°সে) জুলাই
			এশিয়া মহাদেশ				
এডেন	২৯	২৭	৩৪	করাচি	—	১৫	৩২
আঙ্কারা	৯০৫	৪	২৯	কাঠমণ্ডু	—	১৭	২৯
বাগদাদ	৩৮	১৬	৪৩	লাহোর	২১৪	২১	৩৮
ব্যাঙ্কক	—	৩১	৩২	মাদ্রাজ	—	২৯	৩৬
বোম্বাই	—	২৮	২৯	ম্যানিলা	১৫	৩০	৩১
কলিকাতা	—	২৭	৩২	নূতন দিল্লী	২১৭	২১	৩৬
কলম্বো	—	৩০	২৯	পিকিং			
চুংকিং	২২৯	৯	৩৪	(বিজিং)	৪০	২	৪২
জাকার্তা	—	২৮	৩০	রেঙ্গুন	—	৩১	১৯
হংকং	৩৩	১৭	৩০	সিওল	—	০	২৯
জেরুসালেম	৮১০	১৩	৩০	সাংহাই	—	৮	৩২
কাবুল	১৮১৬	২	৩৩	তেহরান	১২২০	৮	৩৮
উলানবাটোর	—	−১৯	২২	টোকিও	—	৯	২৮
			সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র				
লেনিনগ্রাড	—	−৫	২২	মস্কো	১৪৬	−৬	১৫
আর্কেঞ্জেল	—	−১৩	১৮	ওডেসা	—	−২	২৬
স্বার্ডলোভস্ক	—	−১৪	২১	ভ্লাডিভস্টক	—	−১১	২২
ইয়াকুটস্ক	১০০	−৪৩	২৩				

স্থানের নাম	উচ্চতা* (মিটার)	উষ্ণতা (°সে) জানুয়ারী	উষ্ণতা (°সে) জুলাই	স্থানের নাম	উচ্চতা* (মিটার)	উষ্ণতা (°সে) জানুয়ারী	উষ্ণতা (°সে) জুলাই
ইউরোপ							
আমস্টার্ডম	—	৪	২১	বার্সিলোনা	৯৫	১৩	২৭
বেলগ্রাড	—	৩	২৯	বার্লিন	—	২	২৩
এডিনবরা	—	৬	১৮	জেনিভা	৪০৬	৪	২৫
হামবুর্গ	—	২	২১	হেলসিঙ্কি	—	−৩	২২
লিসবন	—	১৩	২৬	লণ্ডন	—	৭	২৩
বুডাপেস্ট	১৩০	৩	২৮	মাদ্রিদ	৬০২	৮	৩০
মিউনিখ	৫২৭	১	১২	অসলো	৯৬	−১	২৩
প্যারিস	—	৬	২৫	রোম	—	১২	৩১
ভিয়েনা	২০১	১	২৫	জুরিখ	৫৭০	৯	৩০
উত্তর আমেরিকা							
এডমন্টন	৬৫৮	−৯	২৩	মন্ট্রিল	৩০	−৬	২৬
কুইবেক	—	−৮	২৫	ভ্যাঙ্কুবার	—	৫	২৩
উইনিপেগ	২৪২	−১৪	২৬	বোস্টন	—	২	২৭
শিকাগো	১৯০	০	৭৭	হনলুলু	—	২৫	২৮
ফোনিক্স	১১১২	১৮	৪০	লস এঞ্জেলস	—	১৮	২৭
নিউ অর্লিন্স	—	১৭	৩২	নিউ ইয়র্ক	—	৩	২৮
সল্ট লেক সিটি	১২৮৯	২	৩৩	সান ফ্রান্সিস্কো	—	১৩	১৭
ওয়াশিংটন	—	৬	৩০	গুয়াটেমালা	১৫০৩	২০	২৬
হাভানা	৬১	২৬	৩২	কিংস্টন	—	৩০	৩২
মেক্সিকো সিটি	২৩০৭	১৯	২৩	মিয়ামি	—	২৩	৩১
ওশিয়ানিয়া							
ডারউইন	—	৩২	৩০	মেলবোর্ন	—	২৬	১৩
পার্থ	৬০	২৯	১৭	সিডনি	৪৩	২৬	১৬
অকল্যাণ্ড	৭	২৩	১৩	ওয়েলিংটন	—	২১	১২

স্থানের নাম	উচ্চতা* (মিটার)	উষ্ণতা (°সে) জানুয়ারী	উষ্ণতা (°সে) জুলাই	স্থানের নাম	উচ্চতা* (মিটার)	উষ্ণতা (°সে) জানুয়ারি	উষ্ণতা (°সে) জুলাই
দক্ষিণ আমেরিকা							
এন্টোফাগাস্টা	—	২৫	১৭	বোগোটা	২৬৬২	১৯	১৮
বুয়েনস আইরেস	—	২৯	১৪	লাপাজ	—	১৭	১৭
লিমা	—	২৮	১৯	মানাওস	—	৩২	৩৪
মন্টিভিডিও	—	২৮	১৪	প্যারামারিবো	—	২৯	৩০
কিটো	২৭৫৭	২২	২২	রিওডি জেনিরো	—	২৯	২৪
সাও পাওলো	৭৯৫	২৭	২২				
আফ্রিকা							
আক্রা	৬৪	৩০	২৭	আদ্দিস আবাবা	২৪৪৪	২৪	২১
কায়রো	১১৬	১৮	৩৬	য়্যালিয়ার্স	—	১৫	২৮
ক্যাসাব্লাঙ্কা	৫৬	১৭	২৬	কেপ্‌টাউন	—	২৬	১৭
এন্টেবে	১১৭১	২৭	২৫	ডাকার	—	২৬	৩১
খার্টুম	৩৮৫	৩২	৬৮	জোহান্সবার্গ	১৬৮০	২৬	১৭
লুয়াণ্ডা	১৭২	২৮	২৩	লিওপোল্ডভিল	৩০০	৩০	২৭
নাইরোবি	১৬৭৭	২৫	২১	মোগাডিস্থ	—	২৯	২৮
ত্রিপলি	—	১৬	২৯	স্যালিসবারি	১৪৬৫	২৬	২১
টিউনিস	—	১৪	৩২	জাঞ্জিবার	—	৩২	২৮

মানচিত্রে সমোষ্ণ রেখা আঁকিবার উদ্দেশ্যে প্রথমে বিভিন্ন স্থানের প্রকৃত উষ্ণতার পরিমাণকে সমুদ্র-সমতলের হিসাবে (গড়ে ১৫৫ মি উচ্চতায় ১° সে কম*, এই হিসাবে) পরিবর্তিত করা হয় (Converted to sea level)। তারপর প্রত্যেক স্থান-নির্দেশক বিন্দুর পাশে পাশে পরিবর্তিত উষ্ণতার অঙ্ক লেখা হয়। উপরের তালিকাতে জানুয়ারী মাসের উষ্ণতার পরিমাণ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় মাত্র তিনটি স্থানের তখনকার উষ্ণতা ৩২° সে। অপর দুইটি স্থানে উষ্ণতা ৩১° সে। অথচ বেশ

উচ্চতা (মি)	উষ্ণতা (°সে)	উচ্চতা (মি)	উষ্ণতা (°সে)	উচ্চতা (মি)	উষ্ণতা (°সে)
−৫০০	১৮'৩	১৫০০	৫'২	৩৫০০	−৭'৮
০	১৫	২০০০	২	৪০০০	−১১
৫০০	১১'৭	২৫০০	−১'২	৪৫০০	−১৪'২
১০০০	৮'৫	৩০০০	−৪'৫	৫০০০	−১৭'৫

কয়েকটি জায়গাতে উষ্ণতা ২৬° হইতে ২৯° সে। কাজেই ইহাদের সাহায্যে ৩০° সে সমোষ্ণরেখা আঁকা যায়। তারপর মাত্র একটি জায়গাতেও ২০° সে উষ্ণতা নাই, কিন্তু অনেক জায়গাতেই ১৪।১৫° সে হইতে ২৫।২৬° সে উষ্ণতা। ইহাদের সাহায্যে ২০° সে সমোষ্ণরেখা আঁকা যায়। এই নিয়মে ১০° সে, ০° সে −১০° সে, −২০° সে সমোষ্ণরেখাও আঁকা হইবে। এগুলি প্রকৃতপক্ষে **সমুদ্রতলের সমোষ্ণরেখা** (Sea level Isotherm)। সমোচ্চরেখা আঁকার পদ্ধতির মত পদ্ধতি এখানেও অবলম্বন করা হয়।

জানুয়ারী মাসের সমোষ্ণরেখার মানচিত্রের সাহায্যে স্পষ্ট বুঝা যায় যে তখন **দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল**। দক্ষিণ গোলার্ধে অষ্ট্রেলিয়ার মধ্য হইতে পশ্চিম
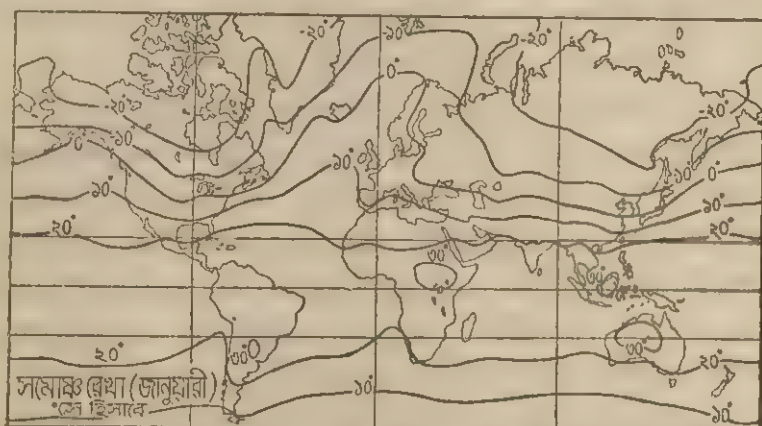
অংশ, মধ্য আফ্রিকার কতক জায়গা ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যভাগের কতক স্থানে এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলের ইন্দোনেশিয়াতে তখনকার উষ্ণতার পরিমাণ পৃথিবীর মধ্যে

সবচেয়ে বেশী (৩০° সে'র অধিক)। **উত্তর গোলার্ধে** তখন **শীতকাল**। উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার মধ্যভাগ হইতে উত্তর অংশের বহু স্থানে তখন উষ্ণতার পরিমাণ হিমাঙ্কের নীচে। উত্তরদিকের বহু স্থানে তখনকার উষ্ণতা –২০° সে'র নীচে।

মানচিত্রে **জুলাই** মাসের সমোষ্ণরেখা আঁকিবার উদ্দেশ্যে পূর্বের মত বিভিন্ন স্থানের ঐ সময়ের প্রকৃত উষ্ণতার পরিমাণকে সমুদ্রতলের হিসাবে (গড়ে ১৫৫ মি উষ্ণতায় ১° সে কম) পরিবর্তিত করা হয়। তারপর প্রত্যেক স্থান-নির্দেশক বিন্দুর পাশে পাশে পরিবর্তিত উষ্ণতার অঙ্ক লেখা হয়। উপরের তালিকাতে দেখা যায় কোন স্থানের উষ্ণতাই ১০° সের কম নয়। আর ৩০° সের অধিক উষ্ণতাও খুব কম। মাত্র ৩।৪টি স্থানে। তাই এক্ষেত্রে যেসকল স্থানের উষ্ণতা ২৫° হইতে ৩৫° সের মধ্যে তাহাদের সাহায্যে ৩০° সে সমোষ্ণরেখা আঁকা হয়। তারপর ১৫° সে হইতে ২৫° সের মধ্যে যে সকল স্থানের উষ্ণতা তাহাদের সাহায্যে ২০° সে সমোষ্ণরেখা আঁকা হয়। আর যে সকল স্থানের উষ্ণতা তাহা অপেক্ষা কম (১০° সের মত বা সামান্য বেশী) তাহাদের সাহায্যে ১০° সে সমোষ্ণ রেখা আঁকা হয়। এই সময়ের সমোষ্ণ রেখার মানচিত্রে দেখা যায় যে তখন **উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল**। তখন মধ্য এশিয়ার দক্ষিণ অংশ, উত্তর আফ্রিকা এবং উত্তর আমেরিকার মধ্য ও দক্ষিণদিকের বহু স্থানে উষ্ণতা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী (৩০° সে'র অধিক)। এই অঞ্চল হইতে উত্তর ও দক্ষিণে উষ্ণতা ক্রমশঃ কম। উত্তর গোলার্ধের প্রায় উত্তর সীমা দিয়া ১০° সে সমোষ্ণরেখা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। এই (উত্তর) গোলার্ধে স্থলভাগ অধিক বিস্তৃত বলিয়া গ্রীনল্যাণ্ডের কতক অংশে তখনও উষ্ণতা হিমাঙ্কের নীচে।

সমপ্রেষরেখা বা সমচাপরেখা (Isobar) অঙ্কন

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের কয়েকটি **প্রধান স্থানের** জানুয়ারী মাসের ও জুলাই মাসের বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিমাণ (অঙ্ক) নিম্নে দেওয়া গেল।

স্থানের নাম	চাপ (মি বা) জানুয়ারী	চাপ (মি বা) জুলাই	স্থানের নাম	চাপ (মি বা) জানুয়ারী	চাপ (মি বা) জুলাই
		এশিয়া মহাদেশ			
এডেন	১০১৫	১০০৩	আঙ্কারা	৯০৪	৯০০
বাগদাদ	১০২২	৯৯৭	ব্যাঙ্কক	১০১৭	১০০৮
বোম্বাই	১০১৩	১০০৩	কলিকাতা	১০১৫	৯৯৮
কলম্বো	১০১২	১০০৮	জাকার্তা	১০১১	১০০৯

স্থানের নাম	চাপ (মি বা) জানুয়ারী	চাপ (মি বা) জুলাই	স্থানের নাম	চাপ (মি বা) জানুয়ারী	চাপ (মি বা) জুলাই
হংকং	১০২৪	১০০৭	জেরুসালেম	৯২৬	৯১৭
করাচি	১০১৮	৯৯৭	লাহোর	১০২০	৯৯৬
মাদ্রাজ	১০১২	১০০২	ম্যানিলা	১০১৬	১০০৯
নূতন দিল্লী	৯৯১	৯৭৩	পিকিং (বিজিং)	১০১৬	১০০৬
রেঙ্গুন	১০১৮	১০০৮			
টোকিও	১০১৭	১০১০	সাংহাই	১০২৩	১০০৪

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র

স্থানের নাম	চাপ (মি বা) জানুয়ারী	চাপ (মি বা) জুলাই	স্থানের নাম	চাপ (মি বা) জানুয়ারী	চাপ (মি বা) জুলাই
লেনিনগ্র্যাড	১০১৩	১০০৫	মস্কো	১০১৩	১০০৩
আর্কেঞ্জেল	১০২৩	১০০৫	ওডেসা	১০১৭	১০০৩
স্বার্ডলোভস্ক	১০১৬	১০০৫	ভ্লাডিভস্টক	১০২৩	১০১১
ইয়াকুটস্ক	১০২৪	১০১০			

ইউরোপ

স্থানের নাম	চাপ (মি বা) জানুয়ারী	চাপ (মি বা) জুলাই	স্থানের নাম	চাপ (মি বা) জানুয়ারী	চাপ (মি বা) জুলাই
বেওগ্র্যাড	১০১৭	১০১৫	বার্লিন	১০১৩	১০১০
জেনিভা	১০১৪	১০১৬	হাম্বুর্গ	১০১২	১০০৯
হেলসিঙ্কি	১০০৫	১০০৬	লিসবন	১০১৬	১০১৮
বুডাপেস্ট	১০১৭	১০১২	কোপেনহেগেন	১০১১	১০০৬
মুনিখ	১০১৪	১০১৫	অসলো	১০০৮	১০০৪
প্যারিস	১০১০	১০১৬	রোম	১০১১	১০১২
স্টকহোম	১০০৭	১০০৫	জুরিখ	১০১৩	১০১৫

উত্তর আমেরিকা

স্থানের নাম	চাপ (মি বা) জানুয়ারী	চাপ (মি বা) জুলাই	স্থানের নাম	চাপ (মি বা) জানুয়ারী	চাপ (মি বা) জুলাই
এডমণ্টন	১০২০	১০১৩	মন্ট্রিল	১০১৪	১০১২
টরণ্টো	১০২৩	১০১৪	ভ্যাঙ্কুবার	১০১৯	১০১৮
উইনিপেগ	১০১৯	১০১৪	একরেঞ্জ	১০১২	১০১৩
বোস্টন	১০১২	১০১২	শিকাগো	১০১৮	১০১৫
হনলুলু	১০১৮	১০১৭	মিয়ামি	১০১৮	১০১৭

স্থানের নাম	চাপ (মি বা) জানুয়ারী	চাপ (মি বা) জুলাই	স্থানের নাম	চাপ (মি বা) জানুয়ারী	চাপ (মি বা) জুলাই
নিউ অর্লিন্স	১০২০	১০১৫	নিউ ইয়র্ক	১০২০	১০১৫
সল্ট লেক সিটি	১০১৯	১০১২	সান ফ্রান্সিস্কো	১০২২	১০১৪
ওয়াশিংটন	১০১৭	১০১৪	ফোনিক্স	১০১৮	১০০৯
হাভানা	১০১৯	১০১৬	মেক্সিকো সিটি	১০১১	১০১২

ওশিয়নিয়া

স্থানের নাম	জানুয়ারী	জুলাই	স্থানের নাম	জানুয়ারী	জুলাই
ডারউইন	১০০৮	১০১৩	মেলবোর্ন	১০১৪	১০২২
পার্থ	১০১৪	১০১৭	সিডনি	১০১৫	১০১২
অকল্যাণ্ড	১০১৬	১০১৬	ওয়েলিংটন	১০১৪	১০১৩

দক্ষিণ আমেরিকা

স্থানের নাম	জানুয়ারী	জুলাই	স্থানের নাম	জানুয়ারী	জুলাই
বুয়েনস আইরেস	১০০৯	১০২১	লাপাজ	১০১৮	১০১২
ম্যারাকাইবো	১০১২	১০১০	মন্টিভিডিও	১০১২	১০২০
রিওডি জেনিরো	১০১২	১০২০	সান্টিয়োগো	১০১২	১০২০
সাও পাওলো	১০১২	১০১৯			

আফ্রিকা

স্থানের নাম	জানুয়ারী	জুলাই	স্থানের নাম	জানুয়ারী	জুলাই
আক্রা	১০১১	১০১৪	য়্যালজিয়ার্স	১০১৩	১০১৬
কায়রো	১০১৯	১০০৬	কেপ টাউন	১০১৩	১০২০
ক্যাসাব্লাঙ্কা	১০২২	১০১৬	ডাকার	১০১৩	১০১২
খার্টুম	১০১১	১০০৬	লিওপোল্ডভিল	১০১১	১০১৬
লুয়াণ্ডা	১০১০	১০১৬	নাইরোবি	১০০৫	১০০৮
টিউনিস	১০১৩	১০১৬			

পৃথিবীর মানচিত্রে সমচাপ রেখা বা সমপ্রেষ রেখা আঁকিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানের বায়ুমণ্ডলের প্রকৃত চাপের পরিমাণকে প্রথমে ১০০০ মিটার উচ্চতায় ৮৬ মি মি কম হিসাবে* এবং আরও উপরে আরও কম হিসাবে সমুদ্রতলে পরিবর্তিত (Reduced to sea level) করা হয়।

উচ্চতা (মি)	বায়ুর চাপ (মি মি)	উচ্চতা (মি)	বায়ুর চাপ (মি মি)	উচ্চতা (মি)	বায়ুর চাপ (মিমি)
-৫০০	৮০৬'২	১৫০০	৬৩৪'২	৩৫০০	৪৯৩'২
০	৭৬০	২০০০	৫৯৬'২	৪০০০	৪৬২'২
৫০০	৭১৬	২৫০০	৫৬০'১	৪৫০০	৪৩২'৯
১০০০	৬৭৪'১	৩০০০	৫২৫'৮	৫০০০	৪০৫'১

তারপর মানচিত্রে নির্দিষ্ট স্থানে বিন্দুদ্বারা স্থানসমূহকে নির্দেশ করা হয় এবং ইহাদের পাশে পাশে বায়ুর চাপের পরিবর্তিত অঙ্ক লেখা হয়। তারপর সাধারণতঃ নির্দিষ্ট মিলিবার (mb বা millibar বা মি বা) অন্তর **সমপ্রেষ** বা **সমচাপ রেখা** (Isobar) আঁকা হয়। কোন স্থানের এপ্রকার মানচিত্রকে **চাপ মানচিত্র** (Pressure map) বলে।

পূর্ব পৃষ্ঠার তালিকাতে ১০২৪ মি বা জানুয়ারী মাসের সবচেয়ে বেশী এবং ৯৯১ মি বা ঐ সময়ের সবচেয়ে কম বা নিম্নতম চাপের অঙ্ক। এই হিসাব অনুসারে ৬ মি বা অন্তর ৯৯৬, ১০০২, ১০০৮, ১০১৪ ও ১০২০ মি বা সমচাপ রেখা আঁকা হইল।

পর পৃষ্ঠায় **জানুয়ারী** মাসের সমপ্রেষ রেখা বা সমচাপ রেখা লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে তখন **দক্ষিণ গোলার্ধে** স্থলমণ্ডলের মধ্য অংশে [যেমন, দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যভাগ, আফ্রিকার মধ্য অংশ হইতে দক্ষিণদিকের মধ্যভাগ এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তর অংশ ও ইন্দোনেশিয়ার কতক অংশে] বায়ুর চাপের পরিমাণ খুব কম (১০০৮ মি বা)। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তখনই এসকল স্থানের পক্ষে **গ্রীষ্মকাল**। এই অঞ্চল হইতে উত্তর ও দক্ষিণ উভয়দিকে বায়ুর চাপ অধিক। উত্তর গোলার্ধে **এশিয়ার মধ্যভাগে** তখন তীব্র **শীত** এবং তথাকার বায়ুমণ্ডলে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উচ্চচাপ (১০৩২ মি বা)। উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগেও তখন প্রবল উচ্চচাপ (১০২০ মি বা)। অপর দিকে ইহাদের অল্প দূরে সমুদ্রে (আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর অংশে আইসল্যাণ্ডের পাশে ও প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর অংশে এলিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের পাশে) বিরাট স্থলভাগের মধ্যভাগের তুলনায় শীত কম। এবিষয়ে এসকল অংশের সমুদ্রে উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের (আটলান্টিকে উষ্ণ উপসাগর স্রোত এবং প্রশান্ত মহাসাগরে উষ্ণ কুরোশিয়া স্রোত) প্রভাব খুব বেশী। এপ্রকার উষ্ণতার জন্য এসকল অংশের তখনকার নিম্নচাপ উল্লেখযোগ্য (১০০২ মি বার কম, আইসল্যাণ্ডের পাশে ৯৯৬ মি বা।)

বায়ুর চাপের তালিকাতে দেখা যায় ৯৭৩ মি বা **জুলাই** মাসের সবচেয়ে কম বা নিম্নতম চাপের অঙ্ক। তবে ১০০২, ১০০৩ মি বা অঙ্কই অধিক। তাই এই মানচিত্রে ১০০২ মি বা সমচাপ রেখাই নিম্নতম। তারপর জানুয়ারী মাসের মত এক্ষেত্রেও ৬ মি বা অন্তর, অর্থাৎ ১০০৮, ১০১৪, ১০২০ মি বা অনুসারে বিভিন্ন সমচাপ রেখা আঁকা হইবে। সমোচ্চরেখা ও সমোষ্ণরেখা আঁকিবার নিয়ম অনুসারেই সমচাপরেখাও আঁকা হইবে। এই মানচিত্রের সমপ্রেষ রেখার সাহায্যে বুঝা যায় যে তখন **উত্তর গোলার্ধে**, বিশেষতঃ এশিয়ার দক্ষিণ অংশে বায়ুর চাপ সবচেয়ে কম (১০০২ মি বার কম)।

এসময় এখানে উষ্ণতা সবচেয়ে বেশী। দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীতকাল এবং বায়ুর চাপ সর্বাপেক্ষা অধিক। (আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের কতক অংশে ১০২৬ মি বার অধিক।)
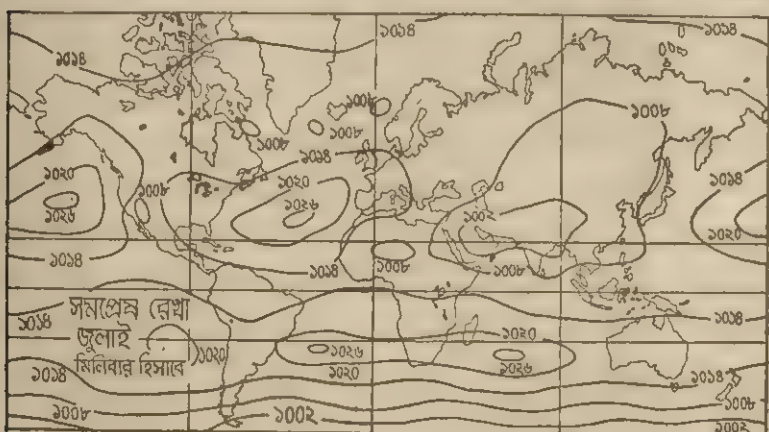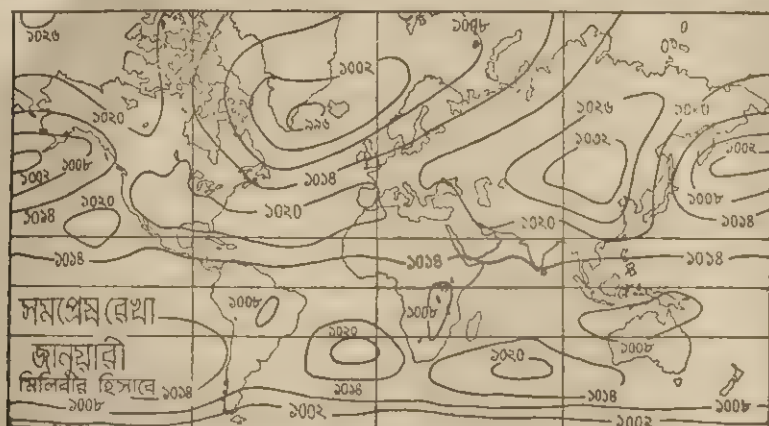
দৈনিক আবহ মানচিত্র—দৈনিক আবহাওয়ার সাধারণ চিত্রে (Synoptic chart) যে-কোন এক দিনে বা কোনও একটি সময়ে বহু স্থানের বায়ুর উষ্ণতা ও চাপের পরিমাণ এবং বায়ুপ্রবাহের দিক্ প্রভৃতি নির্দেশ করা হয়। এরূপ মানচিত্র আঁকিবার জন্য বিভিন্ন স্থানের উষ্ণতার ও চাপের পরিমাণকে প্রথমে সমুদ্র-সমতলের হিসাবে পরিবর্তিত করা হয়। তারপর একখানা মানচিত্রে বিন্দুদ্বারা একরূপ স্থানের অবস্থিতি নির্দেশ করা হয়। ইহার পর সমোষ্ণ রেখা, সমচাপ রেখা প্রভৃতি আঁকা হয়

ও বায়ুপ্রবাহের দিক্ প্রভৃতি নির্দেশ করা হয়। বিভিন্ন **আবহ কেন্দ্র** (Meteorological centre) হইতে এরূপ দৈনিক আবহ মানচিত্র (Daily Weather map) প্রকাশ করা হয়। যে-কোন স্থানের আবহাওয়ার অবস্থা আলোচনা, পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেওয়া (Weather forecast) এবং বিমানপোতের যাতায়াত প্রভৃতি বিষয়ে এরূপ মানচিত্রের উপযোগিতা অধিক। এজন্য আমাদের দেশে কলিকাতা, পুণা প্রভৃতি কেন্দ্রের আবহ মানচিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলনী

১। সমোচ্চরেখা কাহাকে বলে? এরূপ রেখা কিভাবে আঁকা হয়? ২। সমোষ্ণরেখা আঁকিবার জন্য প্রকৃত উষ্ণতাকে কিভাবে সমুদ্র সমতলের হিসাবে পরিবর্তন করা হয়? এরূপ পরিবর্তন করার কারণ কি? ৩। সমচাপ বা সমপ্রেষ রেখা আঁকিবার জন্য প্রকৃত চাপের অঙ্ককে কি ভাবে সমুদ্রসমতলের হিসাবে পরিবর্তন করা হয়? ৪। ভারতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থানের উষ্ণতা ও চাপের পরিমাণ অনুসারে সমোষ্ণরেখা ও সমোচ্চরেখা আঁক।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রধান শিলা ও খনিজ পদার্থ সনাক্তকরণ

এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায় কয়েকটি প্রধান শিলা ও তাহাদের গঠনকারী খনিজ পদার্থের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এখন এসকল শিলা ও খনিজ পদার্থকে কিভাবে সহজে সনাক্ত করা যায় (Identify) তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(ক) **কয়েক প্রকার শিলা**

(১) **গ্রেনাইট**—ইহা **ভূত্বকের নীচে** সঞ্চিত (Intrusive) এবং **খুব ধীরে** মিছরির দানার মত দানাতে পরিণত (slowly crystallised) **আগ্নেয়** (Plutonic) শিলার উল্লেখযোগ্য (typical) উদাহরণ। ইহার রঙ কাল, সাদা ও সবুজের মিশ্রণ। ইহার মধ্যে গঠনকারী উপাদান ফেলস্‌পারের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী (৬০%), কোয়ার্ৎজ (৩০%)। ইহার মধ্যে অভ্রের (Mica) পরিমাণও অধিক। গ্রেনাইটের গঠনকারী দানাগুলি (grains) মাঝারি হইতে মোটা (medium to coarse)। অবশ্য কচিৎ গঠনকারী উপাদানগুলি প্রায় সমান আকৃতির ও প্রায় সমানভাবে ছড়ান (evenly distributed) অবস্থায়ও থাকে। এই শিলার মধ্যে কোন স্তর নাই।

(২) **ব্যাসল্ট**—ইহা লাভা হইতে **উৎক্ষিপ্ত** (Extrusive) এবং খুব **দ্রুত শীতল** হইয়া (quickly cooled) **আগ্নেয়** শিলাতে পরিণত হয়। ইহার রঙ গাঢ় সবুজ, কাল, গাঢ় ধূসর প্রভৃতি। ইহার মধ্যে ফেলসপারের পরিমাণ অধিক। তবে ইহার মধ্যে ওলিভাইন (কখন কখন প্রচুর পরিমাণে), ম্যাগ্‌নেটাইট প্রভৃতি উপাদানও থাকে। ব্যাসল্টের গঠনকারী উপাদানগুলি অতি দ্রুত শীতল হওয়ার জন্য সকল সময় দানাযুক্ত (crystal) নয়। ইহার দানাগুলি প্রায় সমান আকৃতির (fine grained), এমন কি কখন কখন চকচকে (glassy)। এই শিলার মধ্যে কোন স্তর নাই।

(৩) **নীস**—ইহা আগ্নেয় **গ্রেনাইট** শিলা হইতে **রূপান্তরিত** বা **পরিবর্তিত** (Metamorphic) শিলা। ইহার আকৃতি কতকটা পাতার মত (Foliated rock)। ইহার মধ্যে অভ্রের পরিমাণ অধিক। তাই কাল অভ্রের (Biotite) পরিমাণ বেশী হইলে নীসের রঙ হয় অনেকটা কাল। আর সাদা ও কাল উপাদানের মিশ্র অভ্র (Muscovite) বেশী থাকিলে নীসের রঙ হয় মিশ্র। নীসের মধ্যে কোয়ার্ৎজ, ফেলস্‌পার, কখন কখন গারনেট, সিস্টোজ প্রভৃতি উপাদানও থাকে। ইহার মধ্যে কোন স্তর নাই।

(৪) **স্লেট**—ইহা কর্দম (শেল), কাদাপাথর (মাডস্টোন) প্রভৃতি **পাললিক** শিলা হইতে **রূপান্তরিত** বা **পরিবর্তিত** শিলা। ইহার রঙ নীল ও কাল রঙের

মিশ্রণ (নাম শ্লেট রঙ)। তবে কাল, ধূসর, সবুজ, লাল প্রভৃতি রঙও দেখা যায়। ইহার প্রধান উপাদান কর্দম স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয় বলিয়া এরূপ শিলাকে স্বচ্ছন্দে সরু পাতে **আলাদা** করা যায় (cleavage)। ইহার উপাদানের মধ্যে কর্দম, অভ্র, ক্লোরাইট প্রভৃতির পরিমাণ অধিক। অবশ্য কখন কখন (বিশেষতঃ ইংলণ্ডের উত্তর-পশ্চিম অংশের হ্রদ অঞ্চলে) অগ্ন্যুৎপাতের সময় উৎক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম টাফের (Fine tuff) সংমিশ্রণে উৎপন্ন শ্লেট পাওয়া যায়। ইহার রঙ রূপালি সবুজ (Silvery green)।

(৫) **বেলেপাথর** (Sandstone)—এরূপ শিলা সচরাচর বা সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। ইহা প্রধানতঃ বালুকাদ্বারা গঠিত **পাললিক** শিলা। তবে প্রায় গোলাকার কোয়ার্ৎজ, ফেলস্পার, অভ্র প্রভৃতিও দেখা যায়। বালুকার কণার আকৃতি কখন কখন খুব বড় (coarse), কখনও সূক্ষ্ম বা সরু (fine grained)। বালুকা-কণাগুলি সাধারণতঃ ক্যাল্সাইট দ্বারা পরস্পরযুক্ত। তবে সিলিকাদ্বারাযুক্ত হইলে বেলেপাথরের রং হয় সাদা, আর হেমেটাইট বা লিমোনাইট দ্বারা যুক্ত হইলে পাথরের রঙ হয় ধূসর। বালুকাকণাগুলির সংযোগ কখন কখন খুব দৃঢ়; এরূপ পাথর শক্ত বা কঠিন। আর সংযোগ শিথিল হইলে পাথর হয় কোমল। এরূপ পাথরের রঙ ধূসর, হলদে, লাল প্রভৃতি। সবুজ রঙ কম। বেলেপাথরের মধ্যে স্তরগুলি সুস্পষ্ট।

(৬) **চুনাপাথর** (Limestone)—ইহা **পাললিক** শিলা। এরূপ শিলার মধ্যে ঝিনুক, শামুক প্রভৃতির দেহাবশেষ (অস্থি) প্রচুর। তাই এই শিলাতে চুনের ভাগ বেশী। একারণে এই শিলার উপর হাইড্রোক্লোরিক এসিডের ফোঁটা পড়িলে শিলা হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাহির হয় ও পাথরের উপর বুদ্বুদ সৃষ্টি হয়। এরূপ শিলা খুব কোমল। ইহার উপর সহজে দাগ পড়ে এবং ইহাদিগকে অনায়াসে কাটা যায়। এরূপ শিলার রঙ সাদা, হলদে, লালচে প্রভৃতি।

(খ) শিলা-গঠনকারী খনিজ পদার্থ

(৭) **কোয়ার্ৎজ**—ইহা সিলিকন ও অম্লজন (Oxygen) দ্বারা গঠিত। ইহা খুব হাল্কা জিনিস। ইহার রঙ সাধারণতঃ সাদা। তবে হলদে, লাল, সবুজ, নীল, ধূসর, প্রায় কাল প্রভৃতি রঙের কোয়ার্ৎজও অনেক। কোয়ার্ৎজের আভা কাচের মত, কতক স্বচ্ছ ও কতক অস্বচ্ছ। ইহা খুব শক্ত। ইহার ছয়টি দিক্ থাকে, কিন্তু ভাঙ্গিলে টুকরার পাশগুলি হয় বাঁকা। গ্রেনাইট, বেলেপাথর প্রভৃতির মধ্যে কোয়ার্ৎজের পরিমাণ খুব বেশী।

(৮) **ফেলস্পার**—ইহা মধ্যম রকম শক্ত পদার্থ। গ্রেনাইটের মধ্যে ইহার পরিমাণ প্রচুর। ইহার দুইটি বিভাগ। (ক) **অর্থোক্লেজ** ফেলস্পারের রঙ সাধারণতঃ সাদা

বা রঙ হীন। তবে ধূসর, লাল, সবুজ রঙও দেখা যায়। ইহা যেমন তেমন ভাবে ভাঙে না, সাধারণতঃ স্তর অনুসারে আলাদা হয়। (খ) **প্ল্যাজিওক্লেজ** ফেলস্পারের রং সাধারণতঃ ধূসর, কচিৎ সাদা।

(৯) **অভ্র** (Mica)—ইহা খুব কোমল ও হাল্কা পদার্থ। গ্রেনাইটের মধ্যে ইহার পরিমাণ প্রচুর। ইহার মধ্যে স্তর অনেক এবং স্তরগুলি সহজে আলাদা (cleavage) করা যায়। এজন্য অভ্রের টুকরাকে 'Book of Mica' বলা হয়। ইহার দুইটি প্রধান ভাগ—(ক) **মাস্কোভাইট** মাইকা প্রায় রঙ হীন, সামান্য মেটে বা সবুজ, কিন্তু স্তরগুলি স্বচ্ছ, তাহাদের রঙ সাদা। (খ) **বায়োটাইট** মাইকার রঙ গাঢ় সবুজ, ধূসর বা কাল। তাহাছাড়া (গ) **এম্বার** মাইকা নামে তৃতীয় বিভাগও আছে। ইহার রঙ (Amber)। যে সকল শিলার মধ্যে ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ অধিক, তাহাদের মধ্যে এই জাতীয় অভ্র দেখা যায়।

(১০) **হেমাটাইট** (Hematite)—বিভিন্ন লৌহ আকরিকের (Iron ore) মধ্যে ইহার পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। ইহার মধ্যে খুব বেশী (৭০%) লৌহ থাকে। তাই ইহার রঙ লাল, কখন কখন কাল। ইহা হাতে ঘসিলে লাল দাগ পড়ে।

(১১) **গ্যালেনা** (Galena)—এই খনিজ পদার্থ হইতে সীসা (Lead) পাওয়া যায়। ইহার রঙ প্রায় গাঢ় ধূসর বা প্রায় কাল। ইহা খুব নরম, হাতে ঘসিলে কাল দাগ পড়ে। তাই ইহা লেখার পেন্সিল (Lead pencil) তৈরীর উপাদান।

(১২) **গ্র্যাফাইট** (Graphite)—ইহা কোমল, অস্বচ্ছ (opaque) ও হাল্কা স্তরযুক্ত (flaky) পদার্থ। খুব সামান্য উষ্ণতা ও চাপে ইহা গঠিত হয়।

(১৩) **চাল্কোপাইরাইট** (Chalcopyrite)—ইহা একটি অস্বচ্ছ (opaque) পদার্থ। আলোর সাহায্যে দেখা যায় ইহার রঙ পিতলের মত হলদে।

(ক) **শিলাসমূহ** সনাক্ত করিয়া সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে লেখা হয়।

১। **গ্রেনাইট** (Granite)

কোন্ জাতীয় শিলা—প্লুটোনিক (Plutonic ingreous)

দানার (grains) আকৃতি—মোটা (coarse)

উপাদান—ফেলস্পার * সবচেয়ে বেশী (৬০%), কোয়ার্টজ * (২০-৪০%), অভ্র (বায়োটাইট বা মাস্কোভাইট)। কখন কখন এপেটাইট (Apatite), জিরকন (Zircon) ও ম্যাগনেটাইট (Magnetite)। কোন কোন ক্ষেত্রে টুরমালিন (Turmaline), টোপাজ (Topaz), কেওলিন (Kaoline) প্রভৃতি।

* সিলিকার পরিমাণ প্রায়ই ৭০% এর অধিক। সোডা ও পটাশের

পরিমাণও অধিক (৫-১২%)। একটিমাত্র ফেলসপার যুক্ত গ্রেনাইটকে বলা হয় হাইপারসলভাস (Hypersolvus) গ্রেনাইট, আর দুইটি ফেলসপার যুক্ত গ্রেনাইটকে বলা হয় সাবসলভাস (Subsolvus)। এ্যালকালি (Alkali) ফেলসপার ও কোয়ার্টজযুক্ত গ্রেনাইটকে বলা হয় এ্যালাসকাইট (Alaskite)।

রঙ—কালো, সাদা ও সবুজের মিশ্রণ।

প্রাপ্তিস্থান—ভূত্বকের নীচে সঞ্চিত (Intrusive) আগ্নেয় শিলাতে।

আকৃতি—প্রায় অসংখ্য রকম, ডাইক (Dyke), সিল (Sill), প্লাগ (Plug), বস (Boss) প্রভৃতি। সবচেয়ে বড় আকৃতি ব্যাথোলিথ (Batholith)।

২। **ব্যাসল্ট** (Basalt)

কোন জাতীয় শিলা—আগ্নেয়। ৯০% এর অধিক আগ্নেয় শিলা এই জাতীয়।

দানার আকৃতি—সূক্ষ্ম (fine grained), কখন কখন কাঁচের মত (glassy)।

উপাদান—ফেলসপার (প্রধানতঃ প্লাজিওক্লেজ), ম্যাগনেটাইট, কখন কখন অলিভাইন (Olivine), কোয়ার্টজ, হর্নব্লেণ্ড (Hornblende), হাইপারস্থীন (Hypersthene) প্রভৃতি।

রঙ—গাঢ় সবুজ, গাঢ় ধূসর, কাল।

প্রাপ্তিস্থান—সাধারণতঃ লাভাপ্রবাহের সঙ্গে; কখন কখন ফাটলের (Fissure) মধ্য দিয়া উৎক্ষিপ্ত (erupted)। ডাইক ও সিলের [illegible] সূক্ষ্ম আগ্নেয় শিলাকেও কখন কখন ব্যাসল্ট বলা হয়। স্থানে স্থানে ব্যাসল্টের সঞ্চয় হাজার হাজার মিটার গভীর। যেমন, আইসল্যাণ্ড, দাক্ষিণাত্য মালভূমি, উত্তর আমেরিকার পশ্চিম অংশে কলাম্বিয়া নদীর অববাহিকা।

৩। **নীস** (Gneiss)

কোন্ জাতীয় শিলা—রূপান্তরিত (Formed during highgrade metamorphism)। তবে ইহার উৎপত্তি সম্পর্কে পার্থক্য প্রচুর।

দানার আকৃতি—মধ্যম রকম মোটা (fairly coarse)

উপাদান—এই শিলার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কতকগুলি বিভাগ (band) থাকে। সাধারণতঃ সিস্টোজ (Schistose) ও গ্র্যানুলোজ (Granulose) ব্যাণ্ড একটির পর অন্যটি একভাবে সাজান থাকে। তবে ব্যাণ্ডগুলি সমান পুরু নহে, কোন কোন ব্যাণ্ড মাত্র এক মিমি পুরু, আবার কোনটি বা কয়েক সেমি পুরু।

বা রঙ হীন। তবে ধূসর, লাল, সবুজ রঙও দেখা যায়। ইহা যেমন তেমন ভাবে ভাঙে না, সাধারণতঃ স্তর অনুসারে আলাদা হয়। (খ) **প্ল্যাজিওক্লেজ** ফেলস্‌পারের রং সাধারণতঃ ধূসর, কচিৎ সাদা।

(৯) **অভ্র** (Mica)—ইহা খুব কোমল ও হাল্কা পদার্থ। গ্রেনাইটের মধ্যে ইহার পরিমাণ প্রচুর। ইহার মধ্যে স্তর অনেক এবং স্তরগুলি সহজে আলাদা (cleavage) করা যায়। এজন্য অভ্রের টুকরাকে 'Book of Mica' বলা হয়। ইহার দুইটি প্রধান ভাগ—(ক) **মাস্কোভাইট** মাইকা প্রায় রঙ হীন, সামান্য মেটে বা সবুজ, কিন্তু স্তরগুলি স্বচ্ছ, তাহাদের রঙ সাদা। (খ) **বায়োটাইট** মাইকার রঙ গাঢ় সবুজ, ধূসর বা কাল। তাহাছাড়া (গ) **এম্বার** মাইকা নামে তৃতীয় বিভাগও আছে। ইহার রঙ (Amber)। যে সকল শিলার মধ্যে ম্যাগ্‌নেসিয়ামের পরিমাণ অধিক, তাহাদের মধ্যে এই জাতীয় অভ্র দেখা যায়।

(১০) **হেমাটাইট** (Hematite)—বিভিন্ন লৌহ আকরিকের (Iron ore) মধ্যে ইহার পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। ইহার মধ্যে খুব বেশী (৭০%) লৌহ থাকে। তাই ইহার রঙ লাল, কখন কখন কাল। ইহা হাতে ঘসিলে লাল দাগ পড়ে।

(১১) **গ্যালেনা** (Galena)—এই খনিজ পদার্থ হইতে সীসা (Lead) পাওয়া যায়। ইহার রঙ প্রায় গাঢ় ধূসর বা প্রায় কাল। ইহা খুব নরম, হাতে ঘসিলে কাল দাগ পড়ে। তাই ইহা লেখার পেন্সিল (Lead pencil) তৈরীর উপাদান।

(১২) **গ্র্যাফাইট** (Graphite)—ইহা কোমল, অস্বচ্ছ (opaque) ও হাল্কা স্তরযুক্ত (flaky) পদার্থ। খুব সামান্য উষ্ণতা ও চাপে ইহা গঠিত হয়।

(১৩) **চাল্কোপাইরাইট** (Chalcopyrite)—ইহা একটি অস্বচ্ছ (opaque) পদার্থ। আলোর সাহায্যে দেখা যায় ইহার রঙ পিত্তলের মত হলদে।

(ক) **শিলাসমূহ** সনাক্ত করিয়া সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে লেখা হয়।

১। **গ্রেনাইট** (Granite)

কোন্ জাতীয় শিলা—প্লুটোনিক (Plutonic ingreous)

দানার (grains) আকৃতি—মোটা (coarse)

উপাদান—ফেলস্‌পার * সবচেয়ে বেশী (৬০%), কোয়ার্ৎজ * (২০-৪০%), অভ্র (বায়োটাইট বা মাস্কোভাইট)। কখন কখন এপেটাইট (Apatite), জিরকন (Zircon) ও ম্যাগনেটাইট (Magnetite)। কোন কোন ক্ষেত্রে টুরমালিন (Turmaline), টোপাজ (Topaz), কেওলিন (Kaoline) প্রভৃতি।

* সিলিকার পরিমাণ প্রায়ই ৭০% এর অধিক। সোডা ও পটাশের

পরিমাণও অধিক (৫-১২%)। একটিমাত্র ফেলসপার যুক্ত গ্রেনাইটকে বলা হয় হাইপারসলভাস (Hypersolvus) গ্রেনাইট, আর দুইটি ফেলসপার যুক্ত গ্রেনাইটকে বলা হয় সাবসলভাস (Subsolvus)। এলক্যালি (Alkali) ফেলসপার ও কোয়ার্ৎজযুক্ত গ্রেনাইটকে বলা হয় য়্যালাসকাইট (Alaskite)।

রঙ—কালা, সাদা ও সবুজের মিশ্রণ।

প্রাপ্তিস্থান—ভূত্বকের নীচে সঞ্চিত (Intrusive) আগ্নেয় শিলাতে।

আকৃতি—প্রায় অসংখ্য রকম; ডাইক (Dyke), সিল (Sill), প্লাগ (Plug), বস (Boss) প্রভৃতি। সবচেয়ে বড় আকৃতি ব্যাথোলিথ (Batholith)।

২। **ব্যাসল্ট** (Basalt)

কোন জাতীয় শিলা—আগ্নেয়। ৯০%-এর অধিক আগ্নেয় শিলা এই জাতীয়।

দানার আকৃতি—সূক্ষ্ম (fine grained), কখন কখন কাঁচের মত (glassy)।

উপাদান—ফেলসপার (প্রধানতঃ প্লেজিওক্লেজ), ম্যাগ্‌নেটাইট, কখন কখন ওলিভাইন (Olivine), কোয়ার্ৎজ, হর্নব্লেণ্ড (Hornblende), হাইপারস্থীন (Hypersthene) প্রভৃতি।

রঙ—গাঢ় সবুজ, গাঢ় ধূসর, কাল।

প্রাপ্তিস্থান—সাধারণতঃ লাভাপ্রবাহের সঞ্চয়; কখন কখন ফাটলের (Fissure) মধ্য দিয়া উৎক্ষিপ্ত (erupted)। ডাইক ও সিলের অতি সূক্ষ্ম আগ্নেয় শিলাকেও কখন কখন ব্যাসল্ট বলা হয়। স্থানে স্থানে ব্যাসল্টের সঞ্চয় হাজার হাজার মিটার গভীর। যেমন, আইসল্যাণ্ড, দাক্ষিণাত্য মালভূমি, উত্তর আমেরিকায় পশ্চিম অংশে কলাম্বিয়া নদীর অববাহিকা।

৩। **নীস** (Gneiss)

কোন্ জাতীয় শিলা—রূপান্তরিত (Formed during highgrade metamorphism)। তবে ইহার উৎপত্তি সম্পর্কে পার্থক্য প্রচুর।

দানার আকৃতি—মধ্যম রকম মোটা (fairly coarse)

উপাদান—এই শিলার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কতকগুলি বিভাগ (band) থাকে। সাধারণতঃ সিস্টোজ (Schistose) ও গ্র্যানুলোজ (Granulose) ব্যাণ্ড একটির পর অন্যটি এভাবে যেন সাজান থাকে। তবে ব্যাণ্ডগুলি সমান পুরু নহে; কোন কোন ব্যাণ্ড মাত্র এক মিমি পুরু, আবার কোনটি বা কয়েক সেমি পুরু।

বিভাগ—মূল শিলার পার্থক্য অথবা শিলার গঠন সম্পর্কে পার্থক্য অনুসারে নীস বহু ভাগে বিভক্ত। যেমন, প্যারানীস (Paragneiss) পাললিক শিলা হইতে উৎপন্ন; অর্থোনীস (Orthogneiss) আগ্নেয় শিলা হইতে উৎপন্ন; লিট-পার-লিট (Lit-par-lit) নীস, ইনজেকশন (Injection) নীস, সিগ্রিগেশন (Segregation) নীস প্রভৃতি।

রং—কাল, ধূসর প্রভৃতি।

৪। **শ্লেট** (Slate)

কোন্ জাতীয় শিলা—রূপান্তরিত (Low grade metamorphic)-আর্গিলেশাস শিলা (Argillaceous rock)।

দানার আকৃতি—অতিশয় সূক্ষ্ম (very fine)

ফাটলের (Cleavage) চিহ্ন—স্পষ্ট

উপাদান—উষ্ণ অবস্থাতে রূপান্তরিত (thermal metamorphism) শ্লেট শিলাতে নূতন উপাদান (খনিজ পদার্থ) যুক্ত হওয়ার ফলে দাগ (Spots or clots of incipient new minerals) দেখা যায়। এরূপ উপাদানের মধ্যে পাইরাইট (Pyrite), আণ্ডালুসাইট (Andalusite) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রঙ—নীল ও কাল রঙের মিশ্রণ (শ্লেট রঙ) অধিক। কাল, ধূসর, সবুজ, লালও আছে।

৫। **বেলেপাথর** (Sandstone)

কোন্ জাতীয় শিলা—পাললিক (Sedimentary), এরেনেশাস (Arenaceous) শিলা।

পরিবেশ বা সৃষ্টির অঞ্চল (Environment—ভূপৃষ্ঠের অতি বৃহৎ ও গভীর অঞ্চল (Geosyncline), মহীসোপান (Continental shelf), মহাদেশের সীমান্তে অবস্থিত পর্যঙ্ক বা গভীর অংশ (Basins or continental margins), পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যবর্তী বা পাশের নিম্নভূমি (বিশেষতঃ লাল বেলেপাথর Red sandstone সৃষ্টি), নদীর বদ্বীপ (বিভিন্ন প্রকার দাগ বা চিহ্নযুক্ত পাললিক শিলা), মরুভূমি (বালিয়াড়ির অংশযুক্ত বেলেপাথর) হ্রদ প্রভৃতি।

বহির্গঠন (External form)—খুব পুরু অথবা সঙ্কীর্ণ স্তরও হইতে পারে এবং অনুভূমিক (horizontal) দিকে বিস্তৃত।

অভ্যন্তরীণ গঠন (Internal structure)—উপাদানসমূহের স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, আবার মিশ্র বা মিশান গঠন হইতে পারে।

রঙ—ধূসর, হলদে, লাল বেশী, সবুজ ও অন্য রঙ কম।

স্তরসমূহের বৈশিষ্ট্য ও চিহ্ন—বিভিন্ন স্তরে জলের ঢেউয়ের (ripple) চিহ্ন, জীবজন্তুর পায়ের দাগের চিহ্ন, বৃষ্টির ফোঁটার দাগ প্রভৃতি থাকিতে পারে। কখন কখন অন্য জাতীয় শিলার উপরও সৃষ্টি হইতে পারে। যেমন, শেলের উপর বেলেপাথর। কখন কখন অন্য জাতীয় শিলার অনুপ্রবেশ (Injection structure) হইতে পারে, আবার কতক অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া বা ভাঙ্গিয়াও যাইতে পারে (Collapse structure)।

৬। **চুনাপাথর** (Limestone)

কোন্ জাতীয় শিলা—পাললিক, প্রধানতঃ কার্বনেট (carbonate)

উপাদান ও বৈশিষ্ট্য—প্রধানতঃ ক্যালসাইট (calcite) ও ডোলোমাইট (dolomite)। কার্বনডাই অক্সাইডের ফোঁটা পড়িলে বুদ্বুদ বাহির হয়। কিছু বালুকা ও কর্দমও আছে।

বিভাগ—(১) অর্গ্যানিক (Organic) ও (২) কেমিক্যাল (Chemical) চুনাপাথরকে বলা হয় অটোকথনাস (Autochthonous) চুনাপাথর। (৩) ক্লাসটিক (Clastic) চুনাপাথরকে বলা হয় এলকথনাস (Allochthonous) চুনাপাথর।

পরিবেশ—সমুদ্র অথবা স্বচ্ছ জলের জলাশয়। জল সাধারণতঃ উষ্ণ ও পরিষ্কার।

রঙ—লালচে, সাদা, ধূসর প্রভৃতি।

(খ) **শিলা-গঠনকারী খনিজ পদার্থসমূহ** সনাক্ত করিয়া সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে লেখা হয়।

১। **কোয়ার্ৎজ** (Quartz) (সিলিকা)

গঠন (Composition)—SiO_2

কঠিনতা (Hardness)—৭ (মোহর স্কেল অনুসারে)

স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি (Specific gravity)—২.৬৫

ক্রিস্ট্যাল সিস্টেম ও বৈশিষ্ট্য (Crystal system and habit)—ষড়্ভুজ (Hexagonal) পিরামিড/পিজম ; মুখ বা দিক্‌গুলি অসম (inregularly developed) ; যথেষ্ট ভারী ও আয়তনবিশিষ্ট (massive) ; কণাগুলি সুস্পষ্ট (granular)।

রঙ—প্রায় রঙ শূন্য (সাদা) ; মলিন পদার্থের (impurities) জন্য রঙ যুক্ত।

দ্যুতি (Lustre)—কাচের মত (vitreous)।

দাগ (Streak)—সাদা

ফাটলের চিহ্ন (cleavage)—শূন্য বা চিহ্নহীন

ভগ্ন অংশ (Fracture)—উঁচু-নীচু (conchoidal)

প্রাপ্তিস্থান (Occurence)—কতক এসিডযুক্ত আগ্নেয় শিলা, অনেক রূপান্তরিত শিলা এবং কতক পাললিক শিলা।

২। **ফেলস্‌পার** (Feldspar or Felspar)

কঠিনতা—৬'৫

স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি—২'৫৫—৩'৩৯

রাসায়নিক শ্রেণী—টেক্টোসিলিকেট (Tectosilicate)

বিভাগ—পটাসিয়াম ফেলসপার ($KAlSi_3O_8$) ; সোডিয়াম ফেলসপার ($NaAlSi_3C_8$) ; ক্যালসিয়াম ফেলসপার ($CaAl_2Si_2O_8$) এবং বেরিয়াম ফেলস্‌পার (প্রায় দেখা যায় না) ($BaAl_2Si_2O_8$)।

ফাটলের চিহ্ন—স্পষ্ট ; নিম্নতলের প্রায় সমান্তরাল (parallel to the basal plane)। দ্বিতীয় ফাটলের চিহ্ন প্রায় ৯০° কৌণিক। কতক ক্ষেত্রে খুব সহজ ভাবে জড়ান (simple twinning), আবার কতক ক্ষেত্রে জটিল (complex) ভাবে জড়ান (পরস্পরের সহিত সমকোণীভাবে)।

প্রাপ্তিস্থান—পেগম্যাটাইট, আগ্নেয়শিলা, রূপান্তরিত শিলা এবং কতক শুষ্ক অঞ্চলের পাললিক শিলা।

৩। **অভ্র** (Mica)

কঠিনতা—২—৪

স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি—২'৪—৩'৪

ক্রিস্ট্যাল সিস্টেম ও বৈশিষ্ট্য—মনোক্লিনিক (Monoclinic)

রাসায়নিক শ্রেণী—ফিলোসিলিকেট (Phyllosilicate)

ফাটলের চিহ্ন—স্পষ্ট ; নিম্নতল অনুসারে সম্পূর্ণ (Perfect basal cleavage)।

বিভাগ—ডাইকট্রাহেড্র্যাল-মাস্কোভাইট—$K_2Al_4(Si_6Al_2)O_2(OH, F)_4$

পরিমাণ—সবচেয়ে বেশী। রঙ—স্তরগুলি প্রায় বর্ণহীন (সাদা) এবং স্বচ্ছ। তবে পুরু অভ্রস্তূপের রঙ সামান্য মেটে বা সবুজ এবং অস্বচ্ছ। দাগ—সাদা। ট্রাইওকট্রাহেড্র্যাল বায়োটাইট $K_2(Mg, Fe'' Fe'', Al)_6(Si_{6-5} Al_{2-3}) O_{20}(OH, F)_4$ এবং ফ্লোগোপাইট (Phlogopite)—$K_2(Mg, Fe'')_6 (Si_6, Al_2)O_{20}(OH, F)_4$—রঙ ধূসর হইতে কাল। প্রায় প্রত্যেক রকম আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলাতে প্রচুর পাওয়া যায়।

দাগ—সাদা।

প্রাপ্তিস্থান—মাস্কোভাইট—প্রধানতঃ এ্যাসিড আগ্নেয় (Plutonic) শিলা; যেমন গ্রেনিট, পেগম্যাটাইট ইত্যাদি। তাহা ছাড়া সিস্ট, নীস্ (gneiss)। বায়োটাইট—সকল রকম আগ্নেয় শিলা ও কতক রূপান্তরিত শিলা।

৪। **হেমাটাইট** (Hematite)

গঠন—Fe_2O_3

কঠিনতা—৫—৬

স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি—৫'২৬

ক্রিস্ট্যাল সিস্টেম ও বৈশিষ্টা—ষড়ভূজ (Hexagonal), দানাযুক্ত (granular), প্লেইটি (platy)—হাইড্রোক্লোরিক এসিডে গলিয়া যায়—লৌহ উৎপাদক

রাসায়নিক শ্রেণী—অক্সাইড (Oxide) বা হাইড্রক্সাইড (Hydroxide)

দ্যুতি (Lustre)—ধাতব (Metallic)—মেটে (Earthy)

দাগ (Strike)—লাল-পাংশু (brown)

রঙ—লাল হইতে কাল, ইস্পাত-ধূসর (Steel grey)

প্রাপ্তিস্থান—আগ্নেয়শিলা, কতক পাললিক শিলা

ফাটলের চিহ্ন—শূন্য

৫। **গ্যালেনা** (Gelena)

গঠন—Pbs

কঠিনতা—২'৫—৩

স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি—৭'৫৭—৭'৫৯

ক্রিস্ট্যাল সিস্টেম ও বৈশিষ্ট্য—আইসোমেট্রিক (Isometric), দানাযুক্ত ও স্তূপাকার (granular also massive)

রাসায়নিক শ্রেণী—সালফাইড (Sulfide)

দ্যুতি—ধাতব (Metallic)

রং—ধূসর (Lead grey), অস্বচ্ছ (Opaque)

ফাটলের চিহ্ন—স্পষ্ট

প্রাপ্তিস্থান—আগ্নেয় শিলা (Hydrothermal veins)

৬। **গ্র্যাফাইট** (Graphite)

গঠন—C

কঠিনতা—১—২

স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি—২'১—২'২

ক্রিস্ট্যাল সিস্টেম ও বৈশিষ্ট্য—সাধারণতঃ পাতার মত (faliated), স্তূপাকার, মেটে ষড়্‌ভূজ

দ্যুতি—ধাতব (Metallic)

রঙ—কাল ও লোহার মত ধূসর

দাগ—কাল ও উজ্জ্বল

ফাটলের চিহ্ন—স্পষ্ট

প্রাপ্তিস্থান—রূপান্তরিত শিলা, কতক পাললিক শিলা (চুনাপাথর) ও কতক আগ্নেয় শিলা (পেগম্যাটাইট)।

৭। **চাল্কোপাইরাইট** (Chalcopyrite)

গঠন—$CuFe_2S_4$

কঠিনতা—৪

স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি—৪'২

ক্রিস্ট্যাল সিস্টেম ও বৈশিষ্ট্য—টেট্রাহেড্র্যাল, জড়ান, সাধারণতঃ স্তূপাকার। তামা উৎপাদক

রাসায়নিক শ্রেণী—সালফাইড

দ্যুতি—ধাতব

রঙ—পিত্তলের মত হলদে

দাগ—সবুজ-কাল

ফাটলের চিহ্ন—অস্পষ্ট

অনুশীলনী

১। বেলেপাথর, গ্রেনাইট ও নীস কি ভাবে চিনিবে? পরীক্ষা করিয়া দেখাও।

২। অভ্র কি ভাবে চিনিবে? কোয়ার্ৎজ কি ভাবে চিনিবে? পরীক্ষা করিয়াদেখাও।